CENTRAL LIBRARY

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত

ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক এম. এ., পি এইচ. ডি.
বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৭

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীরণবীর দাশগুপ্ত কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড কলি-৯ হইতে প্রকাশিত।

B782·42162095414
B575
C2

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৮৪

BCU 2975

GS 2499

মূল্য : ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা)

17414

মুদ্রণে :
শ্রীরাধারমণ বসাক
শ্রীকান্ত প্রেস
৭৫ বৈঠক খানা রোড
কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত

প্রথমখণ্ড : ভূমিকা

CENTRAL LIBRARY

ভূমিকা

১

কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যসমালোচক মনে করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া নাগরিক বাঙালীর সর্বাত্মক জাগরণ সম্ভব হইয়াছে, তাহা মূলতঃ ইংরেজি-শিক্ষিত কলিকাতার আবহাওয়ায় লালিত ভদ্র বাঙালী অর্থাৎ 'বাবু' সমাজের ব্যাপার। তাহার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব যতই বিপ্লবাত্মক হোক, গ্রামীণ বাঙালীর জীবন ও মানসিকতার সঙ্গে এই দ্বৈপায়ন নাগরিক আদর্শের বিশেষ কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। কলিকাতার হোগলার বন ও গোলপাতায়-ছাওয়া মাটির ঘরবাড়ী ভাঙিয়া চুরিয়া শ্বেতদ্বীপের ময়দানবেরা যে নূতন শহর গড়িল, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের এক অভিনব বিকাশ হইল, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা ভদ্রসমাজের মধ্যে বন্দী হইয়া ছিল। নগরের বাহিরে যে বিশাল দেশ পড়িয়া আছে, যেখানে সভ্যতার আলোক বহুদিন প্রবেশের পথ পায় নাই, সেখানকার কথা, সে অঞ্চলের মানুষগুলির চিত্র তো অস্পষ্টই রহিয়া গেল।

কেহ কেহ রোমান্টিক আবেগ ও বৈচিত্র্যপিয়াসী মনের তাড়নায় গ্রাম-জীবনের কিছু কিছু ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাস্তবের বড়ো একটা মিল ছিল না। লেখকেরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত তথ্যাদির অভাব কল্পনার দ্বারা একপ্রকার পুরাইয়া লইতেন। কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামের প্রান্তে যাহারা বাস করিত, যাহাদের একটা বড়ো অংশই জলচল ছিল না, তাহাদের জীবন ও মনের খবর কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ রাখিত না। তাহাদের স্থূল জীবনযাপনের সঙ্গে যে একটা সূক্ষ্মতর অধিমানসের জীবন জড়াইয়া ছিল, যাহা তাহাদের উৎসবানুষ্ঠান, ব্রতকৃত্য, কৃষিকার্য প্রভৃতির মধ্যে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পাইত, সে বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনার সূচনা হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তাহার সঙ্গে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তাহা যে দেশের বৃহৎ জীবন ও আদর্শের নিকটতম আত্মীয়, সে বিষয়ে কৌতূহলী ব্যক্তিরা সচেতন হইলেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে—পাশ্চাত্ত্য

CENTRAL LIBRARY

অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতের দলও নৃবিজ্ঞানের সাহায্যে এদেশের নিম্নশ্রেণী ও কৃষি-সমাজের দেহ-মনের জরিপ শুরু করিয়া দিলেন। ফলে এতদিন যাহারা অবহেলার পাত্র হইয়া গ্রামপ্রান্তে অবস্থান করিতেছিল, এবার বিংশ শতাব্দীর আলোকিত প্রাঙ্গণে তাহাদের ডাক পড়িল। পণ্ডিতেরা পাঁজিপুঁথি মিলাইয়া তাহাদের গোত্রকুল নির্ণয়ে ব্যস্ত হইলেন। ক্রমে তাহাদের ঘরবাড়ী, আচার-আচরণ, জীবনধারণের বিবিধ প্রণালী প্রভৃতি ব্যাপার রীতিমতো আলোচনার বিষয় হইল। কিন্তু তখনও একটা প্রধান কাজ ভালো করিয়া শুরু হয় নাই। তাহাকেই আমরা লোকসাহিত্য বলিয়া সাধারণভাবে নির্দেশ করিয়া থাকি।

জনসাধারণের মৌখিক সাহিত্য, গান, ছড়া, কবিতা, লোকাভিনয়, ধর্মীয় ব্রতকৃত্য, প্রাত্যহিক জীবনসংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত ছড়া পাঁচালী মুখে মুখে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা বাহত বিশুদ্ধ সাহিত্য নহে, কিন্তু যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য গড়িয়া ওঠে, সেই জীবনকে অবলম্বন করিয়াই এই সমস্ত গ্রাম্য মৌখিক ছড়া, পাঁচালী, গানের উদ্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই সমস্ত গ্রাম্য গাথা ও গীতিকা সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এদিক হইতে অসাধ্যসাধন করিলেন। রেভাঃ লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর নাগরিক দৃষ্টি এই গ্রামীণ আদর্শের দিকে ফিরাইতে পারিয়াছিলেন। তখন গ্রামে গ্রামে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, পল্লীর পালাগান সংগ্রহের ধুম পড়িয়া গেল। পল্লীসাহিত্য, গ্রাম্যসাহিত্য বলিয়া যে এরূপ একটা বিশাল ব্যাপার রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দীনেশচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং স্যর আশুতোষের আনুকূল্যে আগাইয়া আসিলেন। এই সমস্ত পল্লীর মৌখিক গান ছড়া ব্রতকথা সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইল, কিছু কিছু মুদ্রিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিল। মোটকথা বিশ শতকের দুই-তিন দশকের মধ্যেই কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ বুঝিতে পারিল যে, কলিকাতার বাহিরে যে বৃহৎ দেশ পড়িয়া আছে তাহা নিষ্ফলা ও বন্ধ্যা নহে। তুলোট কাগজে যেমন উচ্চ বর্ণেরা গান ও

CENTRAL LIBRARY

পাঁচালী রচনা করিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য নামক এক প্রকাণ্ড ব্যাপার সমাধা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি নিরক্ষর ভদ্রেতর সমাজেও গান-ছড়া-পালা-পাঁচালীর নিতান্ত অপ্রতুলতা ছিল না। তবে তাহা কালির অক্ষরের মধ্যে ধরা পড়ে নাই, অধিকাংশই মুখে মুখে রচিত হইত, মুখে মুখেই ফিরিত। এই মৌখিক গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও যে বিশুদ্ধ শিল্পলক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কোন-কোনটি ভদ্রসাহিত্যের তুলনায় কোনোমতেই যে নিকৃষ্ট নহে তাহা রসিক পাঠক বুঝিতে পারিল। রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেকথা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করিলেন। ক্রমে কয়েকটি পালাগানের অনুবাদ বিদেশে পৌঁছাইল, সাগরপারের পণ্ডিত ও রসিক মানুষেরা এই সমস্ত গ্রাম্য গান ও গীতিকায় এক নূতন স্বাদ পাইলেন।

ইতিপূর্বে রামমোহন, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিচিত্র স্বরূপ পশ্চিমবিশ্বের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই সময়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা ভারত-সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থের মধ্য দিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনজন বাঙালীই বিদেশীর নয়নে, শুধু বাংলা নহে, সমগ্র ভারতের এই গৌরবময় মূর্তি তুলিয়া ধরিলেন। পরাধীনতার কলঙ্ক প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুশীলনের দ্বারা অনেকটা দূর হইল। কিন্তু গ্রাম্য বাংলার অশিক্ষিত সমাজের মৌখিক ছড়া-গানের মধ্যেও যে এত শিল্পসুষমা লুকাইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিশ শতকের শুরু হইতে যেভাবে গ্রাম্য মৌখিক সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও রসভোগ চলিয়াছে তাহার সূত্র প্রধানতঃ নাগরিক সাহিত্যাদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এবং বলাই বাহুল্য, এ-বিচার লোকসাহিত্যের যথার্থ বিচার নহে। ভদ্র সাহিত্য হইতে পাঠকগণ যে রসের আনন্দ ও পাঠের তৃপ্তিলাভ করিতেন, ছড়া-পাঁচালী সংগ্রাহকগণ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, গ্রাম্য সাহিত্যও ভদ্র সাহিত্যের অনুরূপ; শিক্ষিত জন উহা হইতেও বিশুদ্ধ সাহিত্যের রসানন্দ লাভ করিতে পারেন। এ যেন খিড়কির দরজা দিয়া গ্রাম্য সাহিত্যকে ভদ্রসাহিত্যের খাস-দরবারে অনুপ্রবেশ করাইবার চেষ্টা। আসলে গ্রাম্য মৌখিক সাহিত্য যে ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি এবং ইহার ধরণ-ধারণ ভদ্রসাহিত্যের অবিকল 'ট্রু-কপি' নহে, ইহা সর্বাগ্রে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। গ্রাম্য সাহিত্য একটা বিশেষ ধরণের

CENTRAL LIBRARY

জীবনচর্যা হইতে উত্থিত হইয়াছে যাহাকে আমরা লোকচর্যা, লোকযান বা লোকবৃত্ত নাম দিতে পারি ; এবং এই সমস্ত আচার-আচরণ মূলতঃ নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের ফলিত শাখাবিশেষ। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জনতত্ত্ব—এইগুলি হইতেছে লোকসাহিত্যের বাতাবরণ। সুতরাং লোকসাহিত্যকে শুধু বিশুদ্ধ কাব্য-সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে তাহার প্রতি যথোচিত সুবিচার করা হইবে না। এতদিন ধরিয়া বাংলা লোকসাহিত্যের যে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে, বলিতে বাধা নাই, তাহা বোধ হয় যথার্থ লোকসাহিত্য ও লোকচর্যা আলোচনার বিহিত মার্গ নহে। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থানে, বিশেষ ধরণের ভূ-স্তরকে কেন্দ্র করিয়া তদনুকূল জীবন যাপন করিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমস্ত নৃগোষ্ঠী ভদ্রজনের দৃষ্টি ও কৌতূহলের বাহিরে বাস করিয়াছে, তাহাদের সমাজ ও জীবনের বাহিরে রাখিয়া এই সমস্ত লোকসাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারিত হইতে পারে না। লোকসাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শে ততটা বিচার্য নহে, কারণ ইহার অনেকটাই রস-সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইতে পারে নাই। কিন্তু মানবজীবন ও সমাজের যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে, নরগোষ্ঠীর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার প্রয়োজন, লোকসাহিত্যের সহায়তা সর্বাধিক প্রয়োজন। ইদানীং বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্বের সন্ধানী আলোক ফেলিয়া লোকসাহিত্যের অন্ধগুহার দুর্জ্ঞেয়তা দূর করার চেষ্টা চলিতেছে। যে কয়জন তরুণ গবেষক এই আদর্শের নিরিখে বাংলা লোকসাহিত্যের শ্রেণী বিন্যাস, বর্গীকরণ ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক অন্যতম। এইজন্য তাঁহার 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' শীর্ষক বিশাল সংগ্রহ ও গবেষণা পুস্তক সম্বন্ধে দুই-চারি কথা লিপিবদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়াছি।

২

ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে' অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া উত্তরবঙ্গের রাজবংশী-সমাজে-প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের গান, ছড়া ও নাটগীত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সমস্ত সংগ্রহকে সুবিন্যস্ত করিয়া সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ একটি স্বল্পজ্ঞাত অঞ্চল, সেখানকার জনজীবন ও জনচিত্ত সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং তাহা হইতে নব নব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার জন্য লোকবৃত্তে-আসক্ত যে-কোন কৌতূহলী পাঠক

CENTRAL LIBRARY

ডঃ ভৌমিককে অন্তর হইতে সাধুবাদ দিবেন। ইহার সঙ্গে আমার অভিনন্দনও যুক্ত করিয়া দিলাম।

তাঁহার এ গবেষণার একটি বৈশিষ্ট্য, যাহা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, তাঁহার এ সংগ্রহ মূলতঃ জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক। রাজবংশী সমাজ ও জীবনের একটা বিশেষ ধরণের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় তাহাদের সমাজে-প্রচলিত ছড়া-গানে কতটা রক্ষিত হইয়াছে, বোধ হয় ডঃ ভৌমিক সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, এই রীতিটি বিশুদ্ধ সাহিত্যকেন্দ্রিক নহে, ইহা মূলতঃ বৈজ্ঞানিক, বস্তুভিত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পন্থা। এ প্রমাণপুঞ্জ 'পাথুর‍্যা প্রমাণ' নহে, ইহা প্রধানতঃ বাঙ্‌ময়। এই গবেষক সূক্ষ্মতর শিল্প-উপাদান হইতে বস্তু-প্রত্যয়ের ইন্দ্রিয়গম্য জগতে নামিয়া আসিয়া আধুনিক লোকবৃত্ত গবেষণার আদর্শ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া বাংলা গ্রাম্য সাহিত্য সম্পর্কে অধিকাংশ আলোচনা-গবেষণা ভব্য সাহিত্যবোধের নাগরিক পথ ধরিয়া চলিতেছিল। কিন্তু লোককাব্য-কথা-গাথা-গীতিকাকে কেবলমাত্র সাহিত্যাদর্শ ধরিয়া বিচার করা যায় না। লোকসাহিত্যের অর্ধেকের বেশীটাই যে নৃতত্ত্বের এবং সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, এই কথাটা ইতিপূর্বে বাংলা লোকগীতি ও গাথা আলোচনায় যেন পাশ কাটাইয়া যাওয়া হইত। ডঃ ভৌমিক সে পথ ছাড়িয়া বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করিয়া লোকচর্যা ও লোকবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম্য কাব্য-কবিতা, গান, প্রবাদ প্রভৃতিকে লোকবিজ্ঞানের সহিত অন্বিত করিয়া লোকজীবনের তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে দু'-একজন পাশ্চাত্ত্য নৃবিজ্ঞানী এই আদর্শে ভারতবর্ষীয় আদিবাসী সমাজে কিছু কিছু গবেষণাকর্ম পরিচালনা করিয়াছেন। বর্তমান লেখক সেই রীতি-নীতি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং বলাই বাহুল্য, তিনি এই সংগ্রহ ও আলোচনায় একটি অজ্ঞাত দেশ ও সমাজের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

শুধু রাজবংশী সমাজ কেন, প্রায় তাবৎ ভদ্রেতর কৃষিসমাজ, কচিৎ-কদাচিৎ অরণ্য-পর্বত-কান্তারবাসী, এমন কি মরুচারী যাযাবর সমাজের উৎসব, অনুষ্ঠান, সামাজিক আচার ও ব্রতকৃত্যের প্রধান বাহন হইতেছে গান, ছড়া, পাঁচালী ও লোকনাট্য। ভদ্র ভব্য সাহিত্য জীবনকে কেন্দ্র করিলেও প্রতিদিনের জীবনচর্যার

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে তাহার যোগ কখনো স্পষ্ট, কখনো বা অদৃশ্যপ্রায়। কিন্তু লোকসাহিত্য, গান ইত্যাদিকে লোকজীবনের মূল সত্তা বলা যাইতে পারে। ইহাকে জানিলে লোকজীবনের তত্ত্বও সহজে অবধারণ করিতে পারা যায়। লেখক এই বিশাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কাব্যকলাকুতূহলা নিবারণের জন্য নহে। একটি গ্রাম্য, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য কী, অথবা কী-কী, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে তাহাদের জীবন কোন্ উপাদান সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহাদের বারো মাসের উৎসব, আচার, ব্রত, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়া একটি প্রান্তীয় অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছে, লেখক সেই সমস্ত কথা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া বিশেষ অঞ্চল হইতে অসংখ্য গান সংগ্রহ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি সে কথা সবিস্তারে বলিয়াছেন। তাহা পড়িয়া আমার মনে হইল, তিনি বোধ হয় এই কথা বলিতে চাহেন যে, শুধু কাব্যাদর্শের নিরিখে যেমন লোকসঙ্গীত বিচার্য নহে, তেমনি কেবলমাত্র নৃতাত্ত্বিক মাপজোখই লোকসাহিত্য ও লোকচর্যার মূল্য নির্ণয়ে যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না। লোকসাহিত্যের যথার্থ আলোচনায় এই দুইটিকে সমানুপাতিক ভাবে মিলাইতে হইবে, এবং আনন্দের কথা—লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে পথে অবলীলাক্রমে পদচারণা করিয়াছেন, যাহা হয়তো নূতন দৃশ্যপট উন্মোচিত করিয়া দিতে পারে। অপরদিকে, যাঁহারা এই সমস্ত সংগ্রহ হইতে ভূমিচারী একটি নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন, তাঁহারাও ইহা হইতে অনেক চিন্তাগ্রাহ্য তথ্য পাইবেন। অর্থাৎ যাঁহারা কাব্যসরোবরের রাজহংস নন, নিতান্তই অনুসন্ধিৎসু এবং বৈজ্ঞানিক-নৃতত্ত্বে-আসক্ত গদ্যময় মানুষ, তাঁহারাও এই সংগ্রহ হইতে অঞ্চলবিশেষের নৃতত্ত্ব, সমাজ, পরিবার ও গোষ্ঠীর অন্তর্জীবন সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর উপাদান হাতের কাছেই পাইবেন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া একাধিক 'থীসিস' রচনা করা যায়। গ্রন্থের পরিশিষ্টে গানগুলির সুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ রায় এ বিষয়ে সঙ্গীতরসিকের কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছেন। মোটকথা লোকসাহিত্য যে লোকবৃত্তের প্রধান উপাদান, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ খুলিয়া দিবার জন্য ডঃ ভৌমিক যে সমস্ত ছড়া ও গান সংগ্রহ করিয়াছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা শুধু একটি প্রান্তীয় অঞ্চলেরই

CENTRAL LIBRARY

নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসাহিত্য ও লোকজীবনের গবেষণায় প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিবে।

কৃষিনির্ভর, জালোপজীবী ও কিরাতশ্রেণীর নানা 'কৌম' বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলে ছড়াইয়া বাস করিতেছে। বোধ হয় ইহারা প্রাগৈতিহাসিক কালের স্মৃতিবহ মানবগোষ্ঠী। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য মনোভাব ও স্মার্ত-প্রকৃতি বাহিরের দিক হইতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলেও এই সমস্ত ভদ্রেতর সমাজে উচ্চবর্ণের পালিশ পড়িবার অবকাশ পায় নাই। মার্জিত সমাজের সহিত সংসর্গের ফলে উচ্চকোটির দেবদেবীর বিশ্বাস ও আচারবিচার এই সমস্ত প্রাচীন মানুষের জীবনধারাকে যৎকিঞ্চিৎ স্পর্শ করিলেও তাহাদের গাত্রাবরণ তুলিয়ে ফেলিলে আসল মূর্তি বাহির হইয়া পড়িবে। একালে এইসব অনাদৃত ও অবহেলিত সম্প্রদায়কে উপাদানহিসাবে গ্রহন করিয়া কিছু কিছু নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতত্ত্বভিত্তিক গবেষণা শুরু হইয়াছে। কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও অনুসন্ধান লোকবৃত্তের স্বরূপনিরূপণে যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না। লোকায়ত মনঃপ্রকৃতির আর একটি দিক আছে—যেটিকে বলিতে পারি অধিমানসের জীবন। 'অধিমানস' বলিতে আমরা কোনো দুরূহ রহস্যবাদী 'কাল্ট্' বা দার্শনিক চিন্তাকে নির্দেশ করিতেছি না। অঞ্চলবিশেষের সাধারণ মানুষেরও একপ্রকার জীবনপ্রত্যয় ও জীবনজিজ্ঞাসা আছে, যাহার সংবাদ হয়তো নাগরিক ভদ্রসমাজ ততটা রাখেন না, তাহার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও নানা তথ্য এই সংগৃহীত গান-ছড়া হইতে পাওয়া যাইবে।

৩

ডঃ ভৌমিক লোকসাহিত্য সংগ্রহ ব্যাখ্যানে যে সমগ্র বাংলাদেশকে নির্বাচিত করেন নাই, সেজন্য তাঁহার রীতিপদ্ধতি ও ব্যাখ্যাপ্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। লোকজীবন আলোচনার জন্য নানা অঞ্চল হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া একটি মালায় না গাঁথিয়া এক-একটি অঞ্চলকে বাছিয়া লওয়াই প্রয়োজন। তিনি শুধু উত্তরাঞ্চলের একটি বিশেষ শ্রেণীকে নির্বাচিত করিয়া তাহাদের জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং তাহার সহিত সম্পৃক্ত গানগুলির যোগাযোগ নির্ণয়কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পরিধি সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে আলোচনা ভাসাভাসা না হইয়া সংহত আকার লাভ করিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পরিশ্রম করিয়া এই সমস্ত গান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কায়িক শ্রমটাও কম নহে। নিতান্ত প্রাণের টান না থাকিলে এভাবে কেহ গ্রাম ঝোপ্‌জঙ্গল ঢুঁড়িতে পারে না। বিশেষতঃ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শহুরে সংস্কার এই সমস্ত কাজে বাধা সৃষ্টি করে, পুঁথিপড়া বিদ্যা প্রাপ্ত উপকরণকে ইচ্ছামতো ঘুরাইয়া ভদ্র-ভব্য করিয়া তোলে, ফলে তাহার মাটির স্বাদগন্ধ বিলকুল পাল্টাইয়া যায়। ইতিপূর্বে সংগৃহীত কিছু কিছু লোকবৃত্তের উপাদানে যে এইরূপ হস্তাবলেপ পড়ে নাই, এমন কথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না। তবে ডঃ ভৌমিকের বিশাল সংগ্রহ ও তাহার বিস্তৃত ভূমিকা পড়িয়া মনে হইল, পূর্ব হইতে তিনি কোনো মনগড়া থিওরি খাড়া করিয়া তাহারই ফুটরুল দিয়া গ্রাম্য মানুষগুলির মনের কথাকে মাপজোখ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যে সমস্ত গান ও ছড়া তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইগুলির মারফতে অঞ্চলবিশেষের জনচিত্ত বুঝিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন সিদ্ধান্ত চমকপ্রদ। তাঁহার সংগৃহীত গানের মধ্যে প্রেমের গানের সংখ্যাই বেশী। প্রেম-প্রণয় লোকজীবনকে কীভাবে এবং কতখানি বেষ্টন করিয়া থাকে, ইহার সঙ্গে লোকসমাজের সম্পর্কই বা কোথায়, ইত্যাকার নানা প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে, এবং তিনি তাহার নৃতাত্ত্বিক ও সমাজভিত্তিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ও তথ্যগত। বিনা প্রমাণে তিনি কোন কথাই কলমবন্দী করেন নাই। এইরূপ নিশ্ছিদ্র বিশ্লেষণরীতি লোকবৃত্তের আলোচনায় এবং সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করিবে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ শুধু এই একটি কথাই উল্লেখ করিলাম। পাঠকগণ এই সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহারা নিজেরাই রাজবংশী জীবনধারায় মূল স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন এবং সংগ্রাহকের বিশ্লেষণ পদ্ধতির যৌক্তিকতাও স্বীকার করিবেন।

আমরা এই বিশাল সংগ্রহ হইতে একটি স্বল্পপরিচিত জনগোষ্ঠীর কর্ম-নর্ম-ধর্ম জীবনের যে বিচিত্র পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে মনে হইতেছে, ডঃ ভৌমিকের মতো বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ও সহৃদয় গবেষক ও সংগ্রাহক পাইলে বাংলা দেশের আঞ্চলিক লোকজীবনের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা

CENTRAL LIBRARY

সহজ হইবে। তিনি একাকী নিজ চেষ্টায় প্রায় অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, তাঁহার খনিত পথে নূতন পথিকের অভিযান শুরু হইলে বাংলা লোক-জীবন, লোকধর্ম ও লোক-মানসিকতার একটি তথ্যগত মানচিত্র নির্মাণ আপেক্ষাকৃত সহজ হইত।

পরিশেষে এই সংকলনের সংগ্রাহক ও ব্যাখ্যাকার ডঃ শ্রীমান নির্মলেন্দু ভৌমিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। একালে পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাকর্ম ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। এখন সহজিয়া পথের দিকেই যেন ঝোঁকটা বেশী। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হাটমাঠ চষিয়া ফেলিয়া লোকমুখ হইতে গান, ছড়া, পাঁচালী সংগ্রহ যে কত কঠিন তাহা যাহারা এপথে যৎকিঞ্চিৎ বিচরণ করিয়া থাকেন তাঁহারা বুঝিবেন। শুধু সংগ্রহই নহে, তাহাকে আবার বিচার বিশ্লেষণ করা, শ্রেণীবর্গে সজ্জিত করা, স্তূপাকার বস্তুপিণ্ড হইতে একটি চেতন সত্তার আবিষ্কার সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের মতোই পরম আনন্দময়—অন্তত পাঠকের পক্ষে। যিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, অর্থ ব্যয় করিয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা একটি অনালোকিত অঞ্চলে কৌতূহল সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি বাঙালী জাতি ও সমাজের হইয়া একটি মহামূল্যবান কর্ম সম্পাদন করিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কে এখন কিছু কিছু অনুসন্ধিৎসু পাঠক উৎসাহিত হইয়াছেন, সুতরাং ডঃ ভৌমিকের এই পরিশ্রমব্যর্থ হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে।

বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৭

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

॥ প্রারম্ভিকা ॥

১. নাম-পরিচয় :

'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ' নামটি আমাদেরই দেওয়া। ইহা দ্বারা প্রধানত আমরা বিভক্ত বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলাকেই বুঝাইতেছি। বঙ্গ-বিভাগের ফলে এই জেলা হইতে পাঁচটি থানা বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ;—রাজনৈতিক কারণেই ওই সকল অঞ্চল বর্তমান গ্রন্থের বাহিরে রহিল।

জলপাইগুড়ি ছাড়া, কোচবিহার ও দার্জিলিঙ জেলার সামান্য অংশও ইহাতে পাওয়া যাইবে। কোচবিহারের হলদিবাড়ী এবং দার্জিলিঙের শিলিগুড়ি সাংস্কৃতিক দিক দিয়া জলপাইগুড়ির নিকটবর্তী বলিয়া এই দুই অঞ্চলকেও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ'—এই নামটি ব্যবহার করিবার পিছনে একটি বিশেষ কারণ আছে। অবিভক্ত বঙ্গে উত্তরবঙ্গ বলিতে রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলাকে বুঝাইত। কোচ ও রাজবংশী সমাজকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করিয়া রঙপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল। এই তিনটি জেলাই উত্তরবঙ্গের প্রান্ত-ভাগ।

মানচিত্রের দিকে লক্ষ করিলে কিন্তু দার্জিলিঙ জেলাকেই বঙ্গদেশের প্রান্ত ভাগ বলিতে হয়। কিন্তু, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই,—ভৌগোলিক দিক দিয়া দার্জিলিঙ বঙ্গদেশে হইলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া ইহা মূলত নেপাল-তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ বলিতে আমরা রঙপুর-কোচবিহার-জলপাইগুড়িকেই বুঝাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে রঙপুর, এবং কোচবিহার-জলপাইগুড়ির সামান্য অংশ অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোচবিহারের সংস্কৃতি রঙপুর-জলপাইগুড়ি হইতে খানিকটা পৃথক বলিয়া প্রধানত ইহাকেও বাদ দিয়াছি।

সুতরাং, 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত' বলিতে আমরা উল্লিখিত অঞ্চলের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক এবং পশ্চিম-কামরূপী উপভাষায় (দ্রঃ ডাক্তার শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : ওরিজিন এণ্ড ডেভলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃঃ ১৪০) রচিত লোক-সঙ্গীত সমষ্টিকে বুঝিয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

২. বিষয়-নির্বাচন :

আমাদের বাঙলা লোক-সাহিত্যের গবেষণা অতি-ব্যাপ্তিতে দুষ্ট। কেহ কেহ, সমগ্র বাঙলা দেশের লোক-সাহিত্য লইয়া বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন। সমগ্র দেশকে পটভূমিকা রাখিয়া লোক-সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ সেই দেশে এবং তখনি রচিত হইতে পারে—যখন সেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলের এবং প্রতিটি উপজাতি ও আদিবাসীদের জীবন-খচিত লোক-সাহিত্য সংগ্রহ-কার্য শেষ হইয়াছে। তাহা না করিয়া সমগ্র দেশের পট-ভূমিকায় লোক-সাহিত্য একবারেই রচনা করিলে তাহার সম্পূর্ণতা সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিতে বাধ্য।

কোনো বিশেষ একটি অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিবাসীদের লোক-সাহিত্য নিঃশেষে সংগ্রহ ও আলোচনার মধ্যে একটি নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ থাকে। সমগ্র দেশকে অবলম্বন করিয়াও যে নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ থাকে না, তাহা নহে। কিন্তু যেখানে বাঙলার প্রতিটি অঞ্চলের এইরূপ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, সেখানেই তাহা করিতে গেলে অসম্পূর্ণ হয়,—ইহাই বলিতেছি।

এই কারণেই বাঙলার উত্তর প্রান্তস্থিত একটি জন-জীবনের গানকে গবেষণার বিষয়রূপে বাছিয়া লইয়াছি। এইরূপে প্রতিটি অঞ্চল হইতে গান সংগ্রহ করিয়া এক-একখানি গ্রন্থ রচিত হউক। অতঃপর তাবৎ বাঙলার পটভূমিকায় বাঙলার লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিলে, উহাকে আর ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে না॥

৩. বিষয়-বিন্যাস :

আলোচ্য গ্রন্থটি মোট দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডের নাম 'ভূমিকা', দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'সংগ্রহ'। 'সংগ্রহ'-খণ্ডে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত গান সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রতিটি গানের নীচে অপরিচিত শব্দের অর্থ ও টীকা দিয়াছি। লোক-সঙ্গীত-সংগ্রহের একটা ঐতিহাসিক দিকও আছে। এইজন্য প্রত্যেকটি গানের সংগ্রহের তারিখ এবং যাঁহার নিকট হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার নাম-ঠিকানাও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

'ভূমিকা'-অংশে সংগৃহীত গান সম্পর্কে আলোচনা এবং যে লোক-সমাজ হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

বর্তমান সঙ্কলনের গানগুলি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজকে ভিত্তি করিয়া রচিত। তাহাদের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পর্কে সামান্য কিছু জানা না থাকিলে, সাংস্কৃতিক দিকটিও ভালো করিয়া জানা যাইবে না। এইজন্য, প্রথম অধ্যায়েই রাজবংশীদের ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পর্কে সামান্য দুই-চারি কথা বলা হইয়াছে। অনাবশ্যক মনে হওয়ায় রাজবংশী জাতির সহিত কোচগণের কি সম্পর্ক, কোচ ও রাজবংশীদের উপর মেচ উপজাতির প্রভাব কিরূপ ও কতখানি—প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজবংশীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়াছি। এই পরিচয় রাজবংশীদের জীবনের বিভিন্ন দিককে অবলম্বন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজবংশি-অধ্যুষিত অঞ্চলের নদী ও স্থানের নামের বিশেষত্ব এবং স্থান-বাচক প্রত্যয়াদি; সমাজ জীবনে পালনীয় বিবিধ আচার, যথা, জাত্যশৌচ, মৃতাশৌচ, অন্নপ্রাশন, নারীর প্রথম ঋতুমতী হইবার জন্য অনুষ্ঠান, বিবাহ ইত্যাদি; সন্তানের নামকরণের বৈশিষ্ট্য, পরস্পরকে সম্বোধন, পদবী, গোত্র ইত্যাদি; গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাদি; ঘর-বাড়ীর নির্মাণ-পদ্ধতি, রন্ধনপ্রণালী, বস্ত্র-অলঙ্কার-তৈজসাদির বিশেষত্ব; কৃষি-পদ্ধতি, কৃষিজ দ্রব্যের নাম; মাস-বৎসর-দিন-ঋতু-তিথির নাম ও গণনা-পদ্ধতি; লোক-বিশ্বাসাদি; ধর্ম-জীবন এবং বিভিন্ন দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতাদের নাম ও পূজা-পদ্ধতি; মেলা ও উৎসব—প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল তথ্যের আলোকে সঙ্কলিত গানগুলি পড়িলে গানগুলির মর্মোদ্ধার করা সহজতর হইবে।

এই একই উদ্দেশ্য লইয়া তৃতীয় অধ্যায়টি রচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের একটি রূপরেখা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদিও বর্তমান গ্রন্থের বিষয় প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত, তবুও লোক-সাহিত্যের অন্যান্য দিক—যথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ও কথা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য দিকের পটভূমিকায় সঙ্কলিত সঙ্গীতগুলি পড়িলে উহাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়গুলিতে সঙ্কলিত গানগুলির আলোচনা ধারাবাহিকভাবে করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

দ্বাদশ অধ্যায়ে গানগুলির রচনাভঙ্গির কিছু পরিচয় দিয়াছি। 'ধুয়া' ও 'পুনরাবৃত্তি'—কি এবং উহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়; অর্থহীন পদ, পদসমষ্টি বা বাক্যাংশ দিয়া পঙক্তির পাদপূরণ; বাক্য গঠনের মধ্যে বিশেষত্ব; একই গানের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপের ব্যবহার, সাদৃশ্য ও সাংকেতিকতা; বিশিষ্ট উপমা-অলঙ্কার প্রভৃতি সম্পর্কে স-উদাহরণ আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে। রচনারীতির এই বিশেষত্বগুলি কতখানি লোক-সঙ্গীতের তাহাও লক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইখানে প্রথম খণ্ড শেষ হইল।

দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ 'সংগ্রহ'-অংশের গানগুলি সাজাইবার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রীতির অনুসরণ লক্ষ করা যাইবে। এই খণ্ডে মোট আটটি অধ্যায় আছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে যখনই লোক-সঙ্গীত গাওয়া হয়, তখন প্রথমেই গাওয়া হয় 'বন্দনা' গান। এই জন্য 'বন্দনা' গান দিয়াই প্রথম অধ্যায়টি রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দুইটি আসলে একই অধ্যায়ের দুইটি অর্ধ। এই অধ্যায় দুইটির নাম 'বর্ষ-পরিক্রমা'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাসের এবং তৃতীয় অধ্যায়ে কার্তিক হইতে চৈত্র মাসের ব্রত-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কীয় গান সঙ্কলিত হইয়াছে। 'বারোমাসিয়া' গানে যেহেতু বারোমাসের নামোল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই হেতু বারোমাসিয়া গানও তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তে সংযোজিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়টির নাম 'জীবন-ছন্দ'। এই অধ্যায়ে একটি মানুষের পূর্ণ জীবনকে আদর্শরূপে রাখিয়া, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরের গান ক্রমান্বয়ে সাজানো হইয়াছে। সমগ্র অধ্যায়টি পাঠ করিবার পর একটি মানুষের জীবনের সকল দিক সহজেই যাহাতে পাঠকের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে, সেইজন্য এই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

মানুষের জীবনের লঘু মুহূর্তের গানগুলি এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য গীত অবসর-গীতিগুলি একটি গুচ্ছে আবদ্ধ করিয়া নাম দিয়াছি 'আনন্দ-গীতি'। ইহাই পঞ্চম অধ্যায়।

ইতর প্রাণীর নাম উল্লেখ করিয়া বিবিধ গান সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু, গানগুলির মধ্যে ইতর প্রাণীরা মুখ্যস্থান পায় নাই,—মানুষই সেখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে 'ইতরপ্রাণী ও মানুষ'।

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম অধ্যায়ে বিবিধ ভক্তির গান সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার নাম 'ভক্তি-গীতি'। যে সকল গান কোনো বিশেষ একটা শ্রেণীতে পড়ে না, সেই সকল গান লইয়া অষ্টম অধ্যায়টি রচিত হইয়াছে এবং উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিচিত্র'॥

৪. সংগ্রহ ও পাঠ :

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীতের কোনো সঙ্কলন ইহার পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তবে, জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন সম্পাদিত 'লিঙ্গুইস্‌টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'-র পঞ্চম খণ্ডে এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে কিছু কিছু খুচরা গান প্রকাশিত হইয়াছে বটে। গ্রীয়ারসন-সংগৃহীত গানগুলির মধ্য হইতে দুই-একটি এবং জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদি হইতে দুই-একটি গান লওয়া হইয়াছে। পাদটীকায় যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

বাকি সমস্ত গানই মৎ-কর্তৃক প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রহকালে গানগুলি যেমনটা শুনিয়াছি, তেমনিই লিখিয়াছি। সচেতনভাবে কোথাও তাহা বিকৃত করিবার চেষ্টা করি নাই। যাঁহাদের নিকট হইতে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সাধারণ চাষী ও গৃহস্থ, সাক্ষরতা প্রায় কাহারই নাই। কোনো গানকে পাল্টাইবার মতো প্রতিভা বা কোনো গানকে বিকৃত করিবার সাহস ইহাদের না থাকিবারই কথা। এইজন্য মনে হয় গানগুলি বিকৃত হয় নাই।

যে সকল গানের অতিরিক্ত 'কথা' বা 'কথান্তর' পাইয়াছি, সংশ্লিষ্ট গানের নীচে তাহাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

সমস্ত গানগুলিই গায়ক বা রচয়িতাদের মুখ হইতে শোনা। কাজেই, বর্তমান আকারে উপস্থিত করিবার সময় পঙ্‌ক্তি ভাঙিয়া মিল অনুযায়ী স্তবকের রূপ দিয়াছি আমরাই। তৎসম ও তদ্‌ভব শব্দের বানানে চলিত অভিধানের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। দেশী শব্দের বানান যেমন শুনিয়াছি, তেমনই লিখিয়াছি।

যাঁহাদের নিকট হইতে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম-ঠিকানা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। প্রতিটি গান, কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

CENTRAL LIBRARY

গানগুলির সংগ্রহকাল—১৯৫৭ হইতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

৫. বিচার:

'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত' নামে সঙ্গীত সঙ্কলন হইলেও আসলে ইহার বিচার সঙ্গীতের দিক হইতে করা হয় নাই, করিবার কোনো বাসনাও আমাদের ছিল না। মোটামুটিভাবে সহজ নৃতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ হইতেই গানগুলি বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু, এই 'সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ' অভিজাত সাহিত্যের নহে। গানগুলিকে লোকসাহিত্যের নিদর্শন রূপে গ্রহণ করিয়া, যে লোকসমাজ হইতে তাহা উৎসারিত হইয়াছে, সেই লোকসমাজের সাংস্কৃতিক বিশেষত্বকে পটভূমিকা রাখিয়া, লোকসাহিত্যের দৃষ্টিকোণ হইতেই ব্যাখ্যা, বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। প্রতিটি গান বিচার করিবার কালে কখনই তাহা বিশেষভাবে একজনের ব্যক্তিগত মনোভাবের ফল রূপে বিচার করা হয় নাই; সর্বত্রই তাহা রাজবংশী সমাজের সমষ্টিগত মানসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাকেই বলিতেছি সহজ নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ। লোক-সাহিত্যকে যেমন পুরাটাই নৃতত্ত্ব বলা যায় না, তেমনি সবটাই উহার সাহিত্য নহে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণই আমাদের কাছে প্রকৃত দৃষ্টিকোণ বলিয়া মনে হয়। ইদানীং কেহ কেহ অবশ্য শ্রমজীবন ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে ভিত্তি করিয়া লোক-সঙ্গীতের বিচার করিতেছেন। যেমন, শ্রদ্ধাস্পদ লোকসঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, লোকসঙ্গীতের কোনো বিশেষ একজন রচয়িতা নাই, সমগ্র সমাজই উহার রচয়িতা। এই উক্তির প্রকৃত অর্থ বোধ হয় এই: লোকসঙ্গীতের রচয়িতা রূপে বিশেষ একজনকে স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যায়, তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত মানস অপেক্ষা যে বিশিষ্ট লোক-সমাজের তিনি সভ্য, সেই সমাজের বিশিষ্ট মানসটাই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়;—অনেক গান লক্ষ করিয়া ইহাই আমরা বুঝিয়াছি।

মূলত এই রচনাগুলি গান,—সুতরাং ইহাদের সাঙ্গীতিক দিক ফেলিবার নহে। সেই কথা মনে রাখিয়াই পরিশিষ্টে আলোচ্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল সম্পর্কে দুইটি প্রবন্ধ যোজনা করিয়া দিয়াছি।

৬. ঋণ ও কৃতজ্ঞতাস্বীকার:

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা হইতে শুরু করিয়া প্রকাশনা পর্যন্ত সকল কর্মে আমি

CENTRAL LIBRARY

বহুজনের সাহায্য ও সৎ-পরামর্শ লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, অপরিচিত—সকল ধরণের মানুষই আছেন। আঠারো বৎসর পর তাঁহাদের অনেকেরই নাম স্মরণ করিতে পারিতেছি না, অনেকেই ইতিমধ্যে স্বর্গত হইয়াছেন, সকলের উদ্দেশেই আমি প্রীতি ও প্রণাম জানাইতেছি।

তবুও কয়েকজনের নামোল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহাকে সকলের আগে স্মরণ করি, তিনি আমার আচার্য স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়। ১৯৫৭ হইতে ১৯৬০—এই তিন বৎসর আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক' ছিলাম। ডাঃ দাশগুপ্তের অধীনে, তাঁহারই নির্দেশনায় এই কাজ শুরু ও শেষ করি। এই গ্রন্থের মূল পরিকল্পনাও তাঁহারই। লোকসাহিত্য সম্পর্কে যখন গবেষণা খুব একটা অগ্রসর হয় নাই, তখন সেই বিষয়কে গবেষণার মর্যাদা দান তাঁহার দৃষ্টির উদারতার প্রমাণ দেয়। সংগ্রহ কর্মে, গবেষণা-পত্র টাইপ করিতে, ও গানগুলি রেকর্ড করাইতে, সর্বপ্রকারে তিনি আমাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করিয়াছিলেন,—অর্থ ও উপদেশ উভয় দিক দিয়াই। ১৯৬০ সনেই এই গ্রন্থ পি, এইচ, ডি, ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত হয় এবং পরবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা উক্ত ডিগ্রির জন্য অনুমোদন করেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ছাড়া ডাঃ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু ইহার অপর দুই পরীক্ষক ছিলেন। ইহাদের আমার প্রণাম জানাই।

ডাঃ দাশগুপ্তই এই গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশনার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালে গ্রন্থটির প্রথম ফর্মাও প্রায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। আজ বহু জল ঘোলা করিয়া এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হইতেছে, তখন তিনি ইহলোকে নাই। তাঁহারই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইতেছি।

অনায়াসেই এই গ্রন্থ আরো বছর কয়েক পূর্বেই প্রকাশিত হইতে পারিত ; এবং তেমনি অকারণেই আরো কয়েক বৎসর বিলম্বিতও হইতে পারিত,—যদি ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ডঃ শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যাপারটিকে তৎপরতার সহিত গ্রহণ না করিতেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম-ভার গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই থামিয়া-থাকা গ্রন্থটির প্রকাশনার

CENTRAL LIBRARY

জন্য সক্রিয় হন, মূলত তাঁহারই জন্য এই গ্রন্থ আজ প্রকাশিত হইল, রকমারি ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ইহার জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন,—তাঁহাকে আমার বহু প্রণাম জানাই।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক, আমার প্রীতিভাজন, ডঃ শ্রীতুষারকান্তি মহাপাত্রের কর্ম-তৎপরতার কথা স্মরণ করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা পুঁথিশালার কর্মী শ্রীসুকুমার মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের রচনা কাল হইতে মুদ্রণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা এ যুগে দুর্লভ। স্বেচ্ছায় এবং নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার করাই এই ভদ্রলোকের প্রকৃতি। 'শ্রীকান্ত প্রেসে'র কর্মী ও কর্তৃপক্ষকেও তাহাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দিই। শ্রীমধুময় রক্ষিত এবং শ্রীবিশ্বরঞ্জন সান্যাল—যাঁহারা এই গ্রন্থটি 'টাইপ' করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কার্সিয়াং ও শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্রের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীতশিল্পী, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত 'আমাদের কথা' নামে শারদ সঙ্কলনে (১৩৮৩) উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার অংশ বিশেষ এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন দত্ত এবং লেখক শ্রীবাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি বহু জনের সহায়তা লাভ করিয়াছি। যাঁহারা আমাকে গানগুলি গাহিয়া শুনাইয়াছেন, রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। গায়ক গায়িকাদের কথা পরিশিষ্টে বলিয়াছি। অন্যান্যদের মধ্যে ইঁহাদের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে: জলপাইগুড়ি শহরের শ্রীসুহৃদদেব রায়কত, শ্রীজীবনবন্ধু লাহিড়ী, শ্রীমতী কনকবালা রায়, শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল, শ্রীনিখিল ঘটক। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া যখন এই গানগুলি সংগ্রহ করিতেছিলাম তখন যাঁহারা আমাকে আতিথ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন: স্বর্গত গুরুদাস রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায়, ফজলুল হক, স্বর্গত চাম সিং ওঝা, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবুধমোহন রায়, শ্রীবিনয় মিত্র, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়

CENTRAL LIBRARY

রায়, কামিনীমোহন রায়, কেশবচন্দ্র দাস, আব্দুল বারী। বহু নাম-না-জানা গৃহস্থ স্বেচ্ছায় যেভাবে আমাকে আশ্রয় দান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহাতে অভিভূত হইয়াছি। অনিচ্ছায় কাহারও নাম অনুল্লিখিত থাকিলে, ক্ষমা চাহিতেছি।

এই জাতীয় গ্রন্থ কখনই ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না, হয়ও নাই। অল্পবয়সে এই বই লিখিয়াছিলাম, এখন তাহার পর আঠারো বৎসর চলিয়া গিয়াছে, নিজেরই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পাল্টাইয়াছে, তথাপি পুরাতনকে পুরাতন রাখিয়াই প্রকাশ করিলাম। কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে এবং সেইদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। এই বই পড়িয়া কাহারও কিছুমাত্র ভালো লাগিলে নিজেকে ধন্য মানিব। ইতি,

বাঙলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৮৩

বিনীত—
নির্মলেন্দু ভৌমিক

স্বর্গত আচার্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

॥ মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ॥

সূচীপত্র

॥ প্রথমখণ্ড : ভূমিকা ॥

ভূমিকা : ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...
প্রারম্ভিকা : ...
প্রথম অধ্যায় : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ : রাজবংশীসমাজ ... পৃ. ১-৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি ... পৃ. ৬-৩৩
তৃতীয় অধ্যায় : লোক-সাহিত্য : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ ... পৃ. ৩৪-৬১
চতুর্থ অধ্যায় : বন্দনা ... পৃ. ৬২
পঞ্চম অধ্যায় : বর্ষ-পরিক্রমা : বৈশাখ-আশ্বিন ... পৃ. ৬৩-১০৫
ষষ্ঠ অধ্যায় : বর্ষ-পরিক্রমা : কার্তিক-চৈত্র ... পৃ. ১০৬-১৫৪
সপ্তম অধ্যায় : জীবন-ছন্দ ... পৃ. ১৫৫-২৫৬
অষ্টম অধ্যায় : আনন্দ-গীতি ... পৃ. ২৫৭-৩০৩
নবম অধ্যায় : ইতরপ্রাণী ও মানুষ ... পৃ. ৩০৪-৩৫১
দশম অধ্যায় : ভক্তিগীতি ... পৃ. ৩৫২-৩৭৭
একাদশ অধ্যায় : বিচিত্র ... পৃ. ৩৭৮-৩৮২
দ্বাদশ অধ্যায় : রচনাভঙ্গি ও রূপতত্ত্ব ... পৃ. ৩৮৩-৪১১

॥ দ্বিতীয় খণ্ড : সংগ্রহ ॥

প্রথম অধ্যায় : বন্দনা ... পৃ. ১—৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : বর্ষ-পরিক্রমা : বৈশাখ-আশ্বিন :

[মেছেনী : পৃ. ৭—৪৪ ॥ শিবখেলা : পৃ. ৪৫—৪৬ ॥ হুদ্‌মা, হুহুমা, হুহুমচুকা, জলতুকা : পৃ. ৪৭—৫৯ ॥ জিতুয়া : পৃ. ৬০—৬৫]

তৃতীয় অধ্যায় : বর্ষ-পরিক্রমা : কার্তিক-চৈত্র

[গোরু-চুমানী : পৃ. ৬৬ ॥ চোর-চুন্নী : পৃ. ৬৭—১১১ ॥ নয়া খোয়া : পৃ. ১১২—১১৬ ॥ পুষুণা : পৃ. ১১৭ ॥ হোলি : পৃ. ১১৮—১৪৫। মদনকাম : পৃ. ১৪৬—১৫১ ॥ পাগলাপীর : পৃ. ১৫২ ॥ ঘাটোপূজা : পৃ. ১৫৩—১৫৭ ॥ বিষুয়া, বিষুমা : পৃ. ১৫৮—১৫৯ ॥ বারোমাসিয়া : পৃ. ১৬০—১৬৩]

চতুর্থ অধ্যায় : জীবন-ছন্দ

[ছোয়ানিন্দানী ও ছোয়াভুল্‌কানী : পৃ. ১৬৪—১৮২ ॥ ভাত-ছোয়ানী : পৃ. ১৮৩—১৮৪ ॥ ফুলফুটানী : পৃ. ১৮৫—১৯১ ॥ বড়,

CENTRAL LIBRARY

হাউদালি, চেঙ্গেড়া ভুলা, বন্ধু-নাচানী : পৃ. ১৯২—২২১ ॥ গার্হস্থ্য-জীবন : পৃ. ২২২—২৪৯ ॥ বাউদিয়া : পৃ. ২৫০—২৫৩ ॥ কালার উদ্দেশে : পৃ. ২৫৩—২৫৮ ॥ মাঝির গান : পৃ. ২৫৮—২৬১ ॥ তেলেঙ্গার গান : পৃ. ২৬১—২৬৩ ॥ বিচিত্র : পৃ. ২৬৪—২৬৮ ॥ বিহোর গান : পৃ. ২৬৯—৩০৩ ॥ বট-পাকুড়ের বিবাহের গান : পৃ. ৩০৩ ॥ গর্ভবতীর প্রতি : পৃ. ৩০৪ ॥ কর্ম-জীবন : ধান-কাটা : পৃ. ৩০৫—৩০৬ ॥ ধান ভুকানিয়া : পৃ. ৩০৬—৩১১ ॥ মাছ-মারা : পৃ. ৩১২ ॥ কাঠ কুড়ানো : পৃ. ৩১৩ ॥ চরকা-কাটা : পৃ. ৩১৩—৩১৪ ॥ ওঝালি : পৃ. ৩১৫—৩৫৪ ॥ মড়া-খোয়া : পৃ. ৩৫৫—৩৫৬ ॥ মুন-মাটি : পৃ. ৩৫৭—৩৫৮ ।]

পঞ্চম অধ্যায় : আনন্দগীতি :

[ফাক্‌সালি ও খ্যাচেরা : পৃ. ৩৫৯—৩৭৬ ॥ মুখা-খেলা : হালুয়া-হালুয়ানী : পৃ. ৩৭৭—৩৮১ ॥ কালুয়া-ভেলুয়া : পৃ. ৩৮১—৩৮২ ॥ অসিক বোলানদার : পৃ. ৩৩৮ ॥ নলুয়া-নলুয়ানী : পৃ. ৩৮৩—৩৮৬ ॥ রঙ-পাঁচালি : গুলাপীশোরীর পালা : পৃ. ৩৮৭ —৪০৫ ॥ খাস-পাঁচালি : কাঙ্গভাঙা টেঙ্‌পাড়ীর পালা : পৃ. ৪০৬—৪৩৪ ॥ মান-পাঁচালি : মুকচাটু গঁসাইয়ের পালা : পৃ. ৪৩৫—৪৫৬]

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইতরপ্রাণী ও মানুষ

[ভাওী-খেলী : পৃ. ৪৫৭—৪৫৯ ॥ বাঘ-নাচানী : পৃ. ৪৬০ ॥ ফান্দাইত্‌ : পৃ. ৪৬১—৪৬৪ ॥ তেলেঙ্গার গান : মৎস্যবিষয়ক : পৃ. ৪৬৫—৪৬৮ ॥ মৈষালি : পৃ. ৪৬৯—৪৭৮ ॥ বিরুয়া : পৃ. ৪৭৯—৫০০ ॥ সোনারায়ের গান : পৃ. ৫০১]

সপ্তম অধ্যায় : ভক্তি-গীতি :

[গারাম পূজার গান : পৃ ৫০২ ॥ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন গীতাবলী : পৃ. ৫০৩—৫০৭ ॥ তুর্ক্‌া ও মনঃশিক্ষা : পৃ. ৫০৮—৫১০ ॥ দেহতত্ত্ব : ৫১১ ॥ ষাইটোন : পৃ. ৫২২—৫৪১]

অষ্টম অধ্যায় : বিচিত্র

[নটুয়া : পৃ. ৫৪২—৫৪৩ ॥ অন্যান্য বিচিত্র বিষয়ের গান : পৃ. ৫৪৪—৫৪৮]

পরিশিষ্ট : ক : ঋণাঞ্জলি : পৃ. ৫৪৯—

পরিশিষ্ট : খ : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল প্রসঙ্গ

CENTRAL LIBRARY

প্রথম অধ্যায়

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ : রাজবংশী সমাজ

॥ ১ ॥

প্রধানত জলপাইগুড়ি-রঙপুর জেলার আহেল বাসিন্দাদের বলা হয় 'রাজবংশী'; এই রাজবংশীদের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া, তাহাদেরই উপভাষায় রচিত সঙ্গীত-সমষ্টি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

কোচবিহারের কোচ-উপজাতিগণের এক বিরাট অংশ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত এই কোচসম্প্রদায়ই কালক্রমে 'রাজবংশী' নামে পরিচিত হয়, অনেকে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকেন।

রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। পরশুরাম একবিংশবার ক্ষত্রিয়দের নিপাত করিয়াছিলেন। এই পরশুরামের ভয়েই নাকি রাজবংশিগণ নিম্নবঙ্গ হইতে পলায়ন করিয়া উত্তরবঙ্গে আত্মগোপন করে। রঙপুরের ইটাকুমারী গ্রাম নিবাসী কবি রতিরাম দাস একটি জাগের গানে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন :

হায় রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশুরামের ভয় এ বড় মরম।
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাছি।
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি॥[১]

শ্রীমণিরাম কাব্যভূষণ নামক জনৈক লেখক তাঁহার "রাজবংশী ক্ষত্রিয়-দীপক" (১৩১৮) নামক গ্রন্থে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অমরকোষের নজির উল্লেখ করিয়া 'রাজন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ক্ষত্রিয়'। কোচগণের সহিত রাজবংশীদের আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্যের কথাও তিনি লিখিয়াছেন।

নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য রাজবংশীদের এতই উৎসাহ বাড়ে যে, ১৩১৭ সালে সভা ডাকিয়া, কোচবিহার, আসাম, কলিকাতা,

১ রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩১৫, চতুর্থ সংখ্যা।

CENTRAL LIBRARY

নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, উত্তরবঙ্গ এবং কাশীর বিভিন্ন সংস্কৃত পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে। শ্রীমণিরাম কাব্যভূষণ তাঁহার পুস্তকে তাহা সঙ্কলিত করিয়াছেন।

পণ্ডিতজনেরা কিন্তু রাজবংশীদের এই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এ সম্পর্কে ডাক্তার শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি :

'The masses of the North Bengal areas are very largely of Bodo origin, or mixed Austric-Dravidian-Mongoloid, where groups of peoples from lower Bengal and Bihar have penetrated among them. They can now mainly be described as Koch, i. e. Hinduised or semi-Hinduised Bodo who have abandoned their original Tibeto-Burman speech and have adopted the Northern dialect of Bengali (which has a close affinity with Assamese) ; and when they are a little too conscious of their Hindu religion and culture and retain at the same time some vague memory of the glories of their people, particularly during the days of Viswa Simha and Nara-narayāna, they are proud to call themselves Raj-bamsis and to claim to be called Ksatriyas ; yet they are quite content at the same time, for the sake of Political advantages, to be classed as a 'Scheduled Caste'[১],……

রাজবংশিগণ ক্ষত্রিয় হউক বা না হউক, ইহা সত্য, রঙপুরের রাজবংশীদের সহিত জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের পার্থক্য আছে। জলপাইগুড়ির রাজবংশী মেয়েরা 'পাটানী' পরে, উদূখলে ধান ভানে এবং বিধবা বিবাহ-প্রথা চলিত আছে। রঙপুরের রাজবংশীদের মধ্যে ইহা চালু নাই। জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের ধর্মজীবনেও মেচ-বোডো প্রভাব লক্ষ করা যায়॥

॥ ২ ॥

কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। বিভিন্ন পুরাণে ও তন্ত্রে এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম উল্লিখিত এবং এই রাজ্যের চতুঃসীমা

১ Kirata-jana-Krti (1951) : PP. 60-61

CENTRAL LIBRARY

বর্ণিত হইয়াছে। করতোয়া নদী হইতে দিকরবাসিনী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বে দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল। ইহা দৈর্ঘ্যে একশত যোজন এবং প্রস্থে ত্রিশ যোজন ছিল। এই হিসাবে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী ভূভাগ, ভোটানরাজ্য, রঙপুর ও কোচবিহার কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আসাম-বুরঞ্জীতে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রঙপুর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল[১]।

প্রাগ্‌জ্যোতিরপুরের ইতিহাস খানিকটা পৌরাণিক, খানিকটা প্রকৃতই ইতিহাস। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী-পুত্র নরককে কামরূপ রাজ্য প্রদান করেন। কামরূপ তখন চারিটি খণ্ডে বা 'পীঠে' বিভক্ত ছিল। এই চারিটি পীঠের নাম হইল,—রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও সুমারপীঠ। কোচবিহার, রঙপুর ও জলপাইগুড়ি রত্নপীঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজা নরক কালক্রমে প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিনাশ সাধন করিয়া তদীয় পুত্র ভগদত্তকে কামরূপ রাজ্য প্রদান করেন। মহাভারতের সভাপর্ব ও দ্রোণপর্বে ভগদত্তের নাম আছে।

কোনো তন্ত্রমতে নরকের বংশের বিলুপ্তির পর শূদ্রবংশীয়গণ রাজত্ব করেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা পৃথু। চাকলা, বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাঁহার রাজধানী ছিল।

শূদ্রবংশের পর পাল বংশ রাজত্ব করেন। ধর্মপাল এই বংশের প্রথম রাজা। ধর্মপালের পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রকে ধর্মপালের ভ্রাতৃজায়া মীনাবতী পরাভূত করেন। অতঃপর মীনাবতীর পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হন। ভবচন্দ্রের বোকমির অনেক গল্প চলিত আছে।

নীলধ্বজ নামক এক ব্যক্তি পালবংশীয় রাজাদের পরাভূত করেন। নীলধ্বজ কান্তেশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পর যথাক্রমে চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর রাজা হন।

'গোসানীমঙ্গল' নামক এক কাব্যের মতে, কামরূপ রাজ্যের প্রথম নৃপতি হইলেন শ্রীবৎস। অতঃপর ভগদত্ত ওই রাজ্যের রাজা হন। জামবাড়ী

১ গুণাভিরাম বড়ুয়া : অসম বুরঞ্জী (১৮৮৪), প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৮

গ্রামে ভক্তেশ্বর নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি ছিলেন মহাদেবের ভক্ত। মহাদেবের আশীর্বাদেই ভক্তেশ্বরের পত্নী অঙ্গনা বা রঙ্গনার গর্ভে কান্তেশ্বরের জন্ম হয়।

কান্তেশ্বরের মন্ত্রীর নাম ছিল শশিপত্র। শশিপত্রের পুত্র না-কি কান্তেশ্বরের পত্নীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। এই জন্যে মন্ত্রীপুত্র নিহত হন। ফলে, শশিপত্র গৌড়ের মুসলমান নরপতি হোসেন শাহ্‌কে কান্তেশ্বরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং হোসেন শাহের হাতেই কান্তেশ্বর বন্দী হন (খ্রীঃ ১৪৯৮)।

কান্তেশ্বরের পর দেশে অনেকদিন অরাজকতা চলে। অতঃপর হাজো নামক এক ব্যক্তি কামরূপের অনতিদূরে এক রাজ্য স্থাপন করেন। হাজো কোচগণের প্রধান ছিলেন। তাঁহার ছিল দুই কন্যা—হীরা ও জীরা। কোচ ও মেচগণের মধ্যে একতা আনয়ন করিবার জন্য হাজো হারীয়া নামক এক মেচ দলপতির সহিত তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন। হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ এবং জীরার গর্ভে শিশুসিংহের জন্ম হয়। বিশ্বসিংহ বাহুবলে কামরূপ রাজ্য জয় করেন এবং শিশুসিংহ তাঁহার মন্ত্রী হন। পরে শিশুসিংহকে তিনি বৈকুণ্ঠপুরের (জলপাইগুড়ি) রাজ্যটি উপহার দেন।

অপর একটি মতে বলা হয়, ভোটানের অন্তর্গত চিকনা নামে পর্বতে হারীয়া নামক এক মেচ প্রধানের হীরা ও জীরা নামীয়া দুই পত্নী ছিল। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন; এবং হীরার গর্ভে, শিবের ঔরসে বিশ্বসিংহ ও শিশুসিংহের জন্ম হয়।

বিশ্বসিংহ কোচবিহারের আদি রাজা না হইলেও তাঁহারই নামে কোচরাজাদের বিশ্ববংশীয় বলা হয়। বিশ্বসিংহ শিবের ঔরসজাত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশকে শিববংশ বলা হয়। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজা হন[১]।

ইহার পর হইতে কোচবিহারের ইতিহাস সকলেরই জানা।

১ ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কোচবিহারের ইতিহাস (১২৮৯), পৃঃ ৬৭-৯০

বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কোচগণের একাংশ হিন্দুধর্মে দীক্ষা লয়। ইহারাই পরবর্তী কালে 'রাজবংশী' নামে পরিচিত হয়[১]। অবশ্য এই সকল মতামত রাজবংশিগণ স্বীকার করিতে চাহেন না।

১ রাজবংশিগণের উৎপত্তি ও তাহাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানিবার জন্ত নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য :

1. W. W. Hunter : Statistical Account of Bengal, Vol. X
2. H. H. Risley : The Tribes & Castes of Bengal (1891)
3. N. N. Vasu : Social History of Kamrup, Vol. 1,2,3.
4. A study on the Physical characters of the Rajbansis : Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. XII, No. 1, 1947.
5. Dr. Suniti Kumar Chatterjee : Kirata-Jana-Krti (1951)
6. John F. Grunning : District Gazatteers : Jalpaiguri (1911)
7. A. Mitra : District Hand Books : Jalpaiguri (1951)

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

॥ ১ ॥

কোনো একটি সমাজের নিজস্ব বিশিষ্ট পরিচয় নিহিত থাকে সেই সমাজের দেওয়া স্থান, নদী ইত্যাদির নামের মধ্যে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশি-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থান ও নদীর নামগুলি লক্ষ করিলে সেই সমাজের আন্তর পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের স্থান-বাচক বিশিষ্ট প্রত্যয় হইল,—'গুড়ি', 'মারি' ও 'কাটা'। 'গুড়ি' প্রত্যয়কে ডাক্তার শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক প্রভাবজাত। 'গুড়ি' সাধারণত বৃক্ষ-নামের উত্তর বসিয়া থাকে : জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, শিমুলগুড়ি, বৈরাতিগুড়ি, চাঁপাগুড়ি, হরিতালগুড়ি, বৈড়িগুড়ি, কাঁঠালগুড়ি, পঙ্কোলগুড়ি, ভাণ্ডীগুড়ি প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। কেহ-কেহ 'গুড়' শব্দের অর্থ 'সমষ্টি' বা 'সমূহ' বলিয়া নির্দেশ করেন।

বৃক্ষ ছাড়াও 'গুড়ি' প্রত্যয় পাওয়া যায়। আলিপুরদুয়ার তহসিলের ভাটিবাড়ী পরগণার তলেশ্বরগুড়ি ও মহাকালগুড়ির নাম করা যাইতে পারে। তলেশ্বর ও মহাকাল ওই অঞ্চলের গ্রামদেবতাগণের নাম; নদী নামের উত্তরও 'গুড়ি' মিলে। ৩১৭-সংখ্যক গানে 'ঝিমিলাগুড়ি' নামে এক নদীর নাম পাওয়া গিয়াছে। 'ঝিমিলা' যদি আসলে 'ঝুমুর' নদীর নাম হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, 'গুড়ি' ব্যক্তি-নামের উত্তরও ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত ভল্‌কা তহসিল ও পরগণার 'কামাখ্যাগুড়ি' তালুকের নাম করা যায়। 'কামাখ্যা' দেবতার নামের উত্তর এখানে 'গুড়ি' বসিয়াছে।

স্থানবাচক শব্দে বৃক্ষ নামের ব্যবহার প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের এক বিশেষত্ব। বৃক্ষ নামের সহিত বিচিত্র প্রত্যয়াদি ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, মরিচ-বাড়ী, শিশুবাড়ী, শালবাড়ী, তুণবাড়ী, আমবাড়ী, খয়ার খাল, বোরা গাড়ী (বোরো ধান গাড়া হয় যেখানে) খয়ের বাড়ী, হলদি বাড়ী ইত্যাদি।

বৃক্ষের সহিত স্থানবাচক অপর এক প্রত্যয় 'ঝাড়' 'জঙ্গল' অর্থে আসিয়া গিয়াছে : ডাঙ্গুয়া ঝাড়, ঝাড় মাগুরমারি, ঝাড় আল্‌তা গ্রাম।

CENTRAL LIBRARY

স্থানবাচক প্রত্যয় 'মারি' সাধারণত মৎস্য-নামের পশ্চাৎ আইসে। যথা: শিঙ্গিমারি, ধারিকামারি, পুঁটিমারি, বোয়ালমারি, চ্যাঙমারি, মাগুরমারি, মোয়ামারি, খলিসামারি, ইত্যাদি।

'কাটা' দিয়া স্থানের নাম নির্দেশ করা হইয়া থাকে: নাগরাকাটা, মোগলকাটা, গায়েরকাটা, ফালাকাটা, শিবকাটা, খয়েরকাটা।

'বাড়ী' দিয়া স্থানের নাম নির্দেশ করা খুবই সাধারণ ব্যাপার। যেমন, ওয়াশাবাড়ী, রিয়াবাড়ী, বাতাবাড়ী, আটিয়াবাড়ী, ওদলাবাড়ী, চৈবাড়ী।

জলপাইগুড়ি জেলার এক বিরাট অংশ একদা ভুটিয়া, মেচ, গারো, টোটো প্রভৃতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং এখনও আছে। তাই দেখা যায়—অনেক ভুটিয়া, গারো, মেচ, টোটোর নামানুযায়ী স্থানের নাম হইয়াছে। নীচে তাহার দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইল।

ময়নাগুড়ি তহসিলের চ্যাঙমারি পরগণার 'বসুসভা' তালুকের নামে ভুটিয়া ছাপ আছে। ভুটিয়া 'সুবা' অর্থাৎ প্রধানগণ যেখানে বিশ্রাম লইত, কালক্রমে তাহারই নাম হইয়াছে 'বসুসভা'। এইরূপে আলিপুরদুয়ার তহসিলের বক্সা পরগণার 'সুভাগঞ্জ' তালুকের নাম হইয়াছে। ময়নাগুড়ি তহসিলেরই একটি স্থানের নাম 'ভোটপাট্টি'—স্পষ্টতই ইহা ভোটগণের পট্টি ছিল। দক্ষিণ ময়নাগুড়ি পরগণার 'ভাঙ্গামাল্লি' নামে একটি তালুক আছে। 'মাল্লি' শব্দের অর্থ 'রাস্তা'। ভুটিয়াগণ কর্তৃক নির্মিত একটি রাস্তার ভগ্নাবশেষ এইখানে আছে এবং তাহা হইতেই ইহার এই নাম হইয়াছে। ফালাকাটা তহসিলের মড়াঘাট পরগণার নাগরাকাটা' ও 'ভুটনীর ঘাট' নামে দুইটি তালুক আছে। 'নাগরা' এক ভুটিয়ার নাম ছিল। জনৈকা ভুটিয়া রমণীর নাম হইতে 'ভুটনীর ঘাট' নাম আসিয়াছে।

ময়নাগুড়ি তহসিলের চ্যাঙমারি পরগণার 'সাও-গাঁও' নামক তালুক 'সাও' নামীয় জনৈক মেচের নামে হইয়াছে। ফালাকাটা তহসিলের মড়াঘাট পরগণার 'টুনডু', 'ধুলাগাঁও', 'রাঙ্গালি বাজনা' প্রভৃতি তালুকের নাম বিভিন্ন মেচের নাম হইতে আসিয়াছে। আলিপুর তহসিলের বক্সা পরগণার 'পাটকাপাড়া', 'লতাবাড়ী' এবং 'আটিয়াবাড়ী' তালুকের নাম; ভল্‌কা তহসিল, ভল্‌কা পরগণার 'মোরকঘাটা' তালুকের নাম যথাক্রমে

CENTRAL LIBRARY

'পাটকা', 'লোটা', 'আটিয়া' ও 'মোরা' নামীয় মেচগণের নামানুযায়ী। 'মেচপাড়া' নামে আলিপুর তহসিলে একটি জায়গা আছে।

ময়নাগুড়ি তহসিলের দক্ষিণ ময়নাগুড়ি পরগণার 'সাকোঝোরা' তালুকের নাম 'সাকো' নামীয় এক গারোর নামানুযায়ী হইয়াছে। ফালাকাটা তহসিলের মড়াঘাটা পরগণার 'গারোখুটা' তালুকের নামে গারোর উল্লেখ আছে।

আলিপুর তহসিলের ভাটিবাড়ী পরগণার 'টোটোপাড়া' তালুকের নাম হইতে সহজেই বোঝা যায়—ইহা টোটো উপজাতিগণের নিবাসস্থল ছিল। চ্যাঙমারি পরগণার 'টোটোগাঁও' তালুকের নামের মধ্যেও টোটোদের উল্লেখ আছে।

সম্পন্ন রাজবংশীর নামানুযায়ীও স্থানের নাম হইয়াছে। ময়নাগুড়ি তহসিলের চ্যাঙমারি পরগণার 'সেঙ্গাপাড়া' তালুক 'সেঙ্গা' নামীয় এক রাজবংশীর নামানুযায়ী হইয়াছে। দক্ষিণ ময়নাগুড়ি পরগণার 'ভুহুকভাঙ্গা' ও 'উল্লাডাব্‌রি' তালুক 'ভুহুক' ও 'উল্লা' নামীয় দুই ব্যক্তির নামে। 'ডাব্‌রি' শব্দের অর্থ জমির খণ্ড বা টুক্‌রা। ফালাকাটা তহসিলের মড়াঘাট পরগণার 'গোদেয়ারকুটি' তালুকের নাম 'গোদেয়া' নামীয় এক রাজবংশীর নামে হইয়াছে।

'কোট' শব্দের অর্থ হইল 'দুর্গ'। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানে একদা কতকগুলি দুর্গ ছিল। সেই অনুযায়ী বাগরাকোট, ডালিংকোট, কিল্‌কোট প্রভৃতি স্থানের নাম আসিয়াছে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য বিশেষত্বের জন্যও স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে। ময়নাগুড়ি তহসিলের দক্ষিণ ময়নাগুড়ি পরগণার 'দোমহনী' তালুকের নাম হইয়াছে ইহা তিস্তা ও চেল নামীয় নদীর দুই মুখের সঙ্গমস্থল বলিয়া। এই তহসিলেরই 'দোলাইগাঁও' তালুকের নাম হইয়াছে ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি বলিয়া, কারণ 'দোলা' শব্দটির অর্থ 'নিম্নভূমি'। এইরূপ, বাঘ জল খাইতে আসিত বলিয়া তালুকের নাম হইয়া গিয়াছে 'বাগ্‌জান'; ব্যাঙ ডাকে বলিয়া তালুকের নাম দেওয়া হইয়াছে 'ব্যাঙকান্দি'। মাছ ধরিবার জন্য এক রকমের বাঁশের সরঞ্জামকে বলা হয় 'জাকই'। ইহা দেখিতে তিনকোণা। যেহেতু গ্রামটি দেখিতে তিনকোণা, সেই হেতু ফালাকাটা

CENTRAL LIBRARY

তহসিলের মড়াঘাটা পরগণার একটি তালুকের নাম হইয়াছে—'জাকইকোনা'। 'কোনা' কথাটির অর্থ 'টি', অর্থাৎ 'জাকইটি'। এই তহসিলেরই মাদারীহাট পরগণায় 'পরং' নামে একটি নদী আছে। পরং নদীর পরপারে যে গ্রাম অবস্থিত, তাহার নাম হইয়াছে 'পরংপার'।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানের নাম অনুসন্ধান করিলে নানা কৌতুকাবহ সংবাদ মিলে। অনেক স্থানের নামের পশ্চাৎ এই অঞ্চলের আদিম সংস্কৃতি লুকাইয়া আছে।

নদীর নামের মধ্যেও এই অঞ্চলের আদিম সংস্কৃতির পরিচয় মিলে। অনেক নদী ও ঝোরার নাম পাওয়া যায়,—যাহাদের সহিত 'তি' ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তি' কথাটির অর্থ মেচ-বোডো ভাষায় 'জল'। এইজন্য নদী ও নদী-সংলগ্ন স্থানের নামে 'তি' যুক্ত হইয়াছে। যেমন, তিস্তা, মুরতি, কুরতি তাসাতি, রাঙ্গাতি, নামাতি, গীতি, জুরান্-তি, জিতি, নিম্তি। ইহা ছাড়া, লীশ্, ঘিশ্, চেল, পরং, গাদোং, গারোখুটা, গোলান্তি, ডুডুয়া, চাপোর, পোরার প্রভৃতি নদীর নামের মধ্যে অবাঙালী ছাপ স্পষ্ট।

॥ ২ ॥

এইবার রাজবংশীদের সামাজিক জীবনের কথা বলি।

"অন্যান্য হিন্দুদিগের ন্যায় রাজবংশিয়গণ প্রসবের ঘর পৃথক প্রস্তুত করেন না।...সন্তানোৎপত্তির পর এক মাস পর্যন্ত প্রসূতি অশুচি থাকে,......। অপদেবতার আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য কণ্টকময় বৃক্ষ ঘরের দ্বারের চতুঃপার্শ্বে সংলগ্ন করিয়া রাখে। জন্মনের পরক্ষণেই কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোক বাঁশের নেউল দ্বারা নাড়ী কর্তন করে। এই স্ত্রীলোককে সন্তান চিরকাল দ্বিতীয় মাতার ন্যায় মনে করে এবং তাহাকে নাড়ীকাটা মাই বলিয়া সম্বোধন করে। ত্রয়োদশ দিবসে নাপিত আসিয়া প্রসূতি ও সন্তানের নখ কাটিয়া দেয় এবং পুরোহিত কতক জল লইয়া তন্মধ্যে তুলসীপত্র, আতপচাউল, দূর্বা ও বিল্বপত্র সংস্থাপন করিয়া কতকগুলি মন্ত্রপাঠ করে এবং সেই জল প্রসূতির ও সন্তানের গাত্রে এবং বাড়ীর অন্যান্যের গাত্রে ছিটাইয়া দেয়। নিম্নশ্রেণীর রাজবংশিগণ জন্মনের পরে দশদিবসের মধ্যেই নামকরণ করে কিন্তু

একটু সম্পন্ন ব্যক্তিরা জ্যোতিষদ্বারা দিন ঠিক করিয়া শুভক্ষণ বুঝিয়া তৃতীয় সপ্তম বা ত্রিংশৎ দিবসে নামকরণ করে।"[১]

উল্লিখিত বিবরণের সহিত ডি. এইচ. ই. সাণ্ডারের রিপোর্টের মিল নাই। সাণ্ডার লিখিয়াছেন, সাত হইতে নয় দিন পর্যন্ত জননীর অশৌচ কাল। কেবল মেয়েরাই এই সময় তাহার কাছে যাইতে পারিবে, কোনো পুরুষ নয়। অশৌচকাল উত্তীর্ণ হইলে নাপিত আসিয়া নবজাতকের নখ কাটিয়া ও সামান্য মাথা কামাইয়া দেয়। সন্তান জন্ম হওয়াকে বলে 'পষ্টি'। নাড়ীকে বলে 'নাড়া'।[২]

সন্তানের জন্ম হইলে সাধারণত কুলার উপর শোয়াইয়া বাঁশের চাঁচড়ি দিয়া নাড়ী কাটিয়া পাটের সূতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। নাড়ী কাটিবার জন্য অনেক সময় 'দাইয়ানী' ডাকা হয়। সন্তান প্রসবে বাধা উপস্থিত হইলে একটি পাত্রে জল ভরিয়া, ঝাঁটার তিনটি কাঠি দিয়া ক্রমাগত উহাতে আঘাত করিতে থাকিলে প্রসব সুগম হয় বলিয়া বিশ্বাস আছে। বর্তমান সংকলনের ৩১৭-সংখ্যক গানের 'বামুনতির সন্তান প্রসব' অংশ হইতে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়। শিলাবৃষ্টির শিল-ধোয়া জল খাওয়াইলে সহজে প্রসব হয়, এইরূপ বিশ্বাসও রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

কোনো কোনো অঞ্চলে সন্তানের জন্মের পর সন্তানের জনক তিনদিন অস্নাত থাকিয়া অশৌচ পালন করিয়া থাকে। তিনদিন পর স্নান করিয়া পিতা সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া থাকে। এই সময় পড়শীরা নবজাতকের পিতার সহিত রঙ্গ-কৌতুকাদি করে। অবশ্য এই আচার খুব বেশী সংখ্যক রাজবংশীদের মধ্যে চলিত নাই।

মস্তক মুণ্ডণের পর সন্তানের নামকরণ করা হয়। নামগুলি অদ্ভুত। এই জন্যই রাজবংশীদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—

ঠগে নষ্ট করে গাঁও
আর বাপ-মা নষ্ট করে ছাওয়ার নাও॥

সাধারণত সন্তানের জন্মের দিন, ক্ষণ, মাস, ঋতু, বৎসর, ধরিয়া নামকরণ করা হইয়া থাকে। দিন হিসাবে নাম: দেবারু—রবিবার,

১ কোচবিহারের ইতিহাস (১২৮৯): শ্রীভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩
২ আদম শুমারি—১৯৫১: জলপাইগুড়ি

CENTRAL LIBRARY

ইহাকে 'দেওবার' বলা হয়। সমারু—সোমবার। মঙ্গালু—মঙ্গলবার। বুধারু—বুধবার। বিসারু, বিষাতু—বৃহস্পতিবার। শুকারু—শুক্রবার। শনিয়া শনিবার।

ক্ষণ হিসাবে নাম: পোহাতু—ভোর বেলায় জন্ম যাহার। সাকালু—সকালে জন্ম যাহার। দুপরিয়া—দুপুরে জন্ম যাহার। সৈসাঞ্জু, সঞ্জুয়া—সন্ধ্যা বেলায় জন্ম যাহার। আতিয়া, রাতিয়া—রাত্রিবেলার জন্ম যাহার।

পক্ষ হিসাবে নাম: যোনাকু—শুক্লপক্ষে জন্ম হইলে। আন্ধারু—কৃষ্ণ পক্ষে জন্ম হইলে। আমাসু—অমাবস্যার দিন জন্ম হইলে।

মাস হিসাবে নাম: বৈশাগু—বৈশাখ মাস। জটিয়া—জ্যৈষ্ঠ মাস। আষাঢ়ু—আষাঢ় মাস। শাওনা—শ্রাবণ মাস। ভাদু—ভাদ্র মাস। কাতিয়া, কাতিরাম—কার্তিক মাস। অগণা—অগ্রহায়ণ মাস। পুষু—পৌষ মাস। মঘা—মাঘ মাস। ফাগুনা—ফাল্গুন মাস। চৈতালু, চৈতা—চৈত্র মাস। মেয়ে হইলে অগোণশোরী, পুষুণা প্রভৃতি নাম হইবে।

ঋতু হিসাবে নাম: ঝড়ু—ঝড়-বৃষ্টির কালে জন্ম যাহার। গাদল—বর্ষাকালে জন্ম যাহার। হিয়ালু—শীতের দিনে জন্ম যাহার। বৎসর হিসাবেও নাম রাখা হয়। যেমন, আকালের বৎসরে জন্মিলে নাম হইবে—আকালু।

সন্তানের গুণানুসারেও নাম রাখা হয়। যেমন, কান্দুড়া—যে কাঁদে বেশি। কাশুয়া—যে কাশে বেশি। নিন্দালু—যে ঘুমায় বেশি। নিরালু—যাহার ক্রোধ বেশি নাই। গোদড়া—যে দেখিতে মোটা। উপাসু—যে দেখিতে রোগা। চান্দিয়া- টাকওয়ালা মাথা যাহার।

পুরুষদের নামের উত্তর সাধারণত 'ইয়া', 'উ', 'উয়া' প্রত্যয় আইসে। মেয়েদের নামের উত্তর 'নী', ও '-শ্বরী' হইতে 'শোরী' বসিয়া থাকে। যথা যথা: পুষুণী, জলেশোরী, নিন্দেশোরী।

মেয়েদের কয়েকটি বিশিষ্ট নাম এই: সাতাসী—সাত মাসে জন্ম যাহার। আঁদারী—অন্ধকার পক্ষে জন্ম যাহার। টেপেরী—প্লীহার জন্ম পেট 'টেপা' মাছের মতো যাহার। কোণা—সূতিকা ঘরের কোণা কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে যাহাকে। অন্যান্য অর্থহীন নাম: উষণী, পারো, সুকই, জউলী, পাতানী, বুদো, বেঙী, মন্থে, হিন্দে, টংসী, টেঁসো, গেন্‌জী, ভিকো, দমো, ডেমেরী, মনো, চেম্‌ড়ী, শীতো, জলো, সিন্দে, বাগ্‌নী, হাইতো,

CENTRAL LIBRARY

স্থবলী, মাইলো, ঝাপ্‌ড়ী, ঝনুঝনী, ইত্যাদি। অন্যান্য নামের জন্য 'ভাষা পরিচয়' অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। মেয়েদের মতো পুরুষদেরও অর্থহীন নাম আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহা উল্লিখিত হইল না।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামের জন্য এবং শিশু, পুরুষ ও মেয়েদের সম্বোধন, প্রাপ্ত-বয়স্ক নর-নারীদের পরস্পরের সাধারণ ও সম্ভ্রমার্থক সম্বোধনের জন্য যথাক্রমে 'ভাষা পরিচয়' অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি সম্বোধন পাওয়া যায়, যে গুলি কোনো ব্যক্তির পেশা ও ব্যবসায় অনুযায়ী হইয়া থাকে। অনেক সময় পেশা-গত সম্বোধন নাম বলিয়া উল্লিখিত হয়। নীচে তাহার সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

-ইয়া-প্রত্যয় : কাপ্‌ড়িয়া—কাপড় বিক্রেতা। বল্‌দিয়া—বলদের পিঠে চাপাইয়া যে চাউল ইত্যাদি বিক্রয় করে। কাগজিয়া—কাগজ বিক্রেতা। বাদিয়া—চর্মকার ও ঢোল বাদক।

-উয়া-প্রত্যয় : গাছুয়া—তেলি। মাছুয়া—জেলে।

-তি-প্রত্যয় : পানাতি—পান বিক্রেতা। গুয়াতি—স্থপারি বিক্রেতা। এইরূপ, গুড়াতি, স্থনাতি।

-আল-প্রত্যয় : গীদাল—গীত ব্যবসায়ী। ছাওয়াল—পূজাদির সময় যাহারা বলি দেয়।

-আই,-আ,-ঈ-প্রত্যয় : মাস্‌ড়া—মাস মাস বেতন লইয়া যাহারা অপরের কৃষিকর্ম করে। ঠাঁটারী—কাঁসা-পিতলের বাসন নির্মাতা। ডাওয়াই—বাঁশের কুলা-ডালা প্রস্তুত কারক।

"সপ্তম, নবম কিংবা একাদশ মাসে ভাত-ছোঁয়া অর্থাৎ অন্নারম্ভ হয়। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এই উপলক্ষ্যে পূর্ব-পুরুষের শ্রাদ্ধাদি করে কিন্তু নীচ শ্রেণীর রাজবংশিগণ আতপ চাউল এবং পক্ক কদলী উৎসর্গ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। রাজবংশীদিগের মধ্যে অধিকারী নামক যে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারাই অন্নারম্ভের কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, পুরোহিতের আবশ্যক করেনা। এক জলপূর্ণ ঘট মধ্যে সিন্দুরের পুতলি আঁকিয়া তাহাতে আম্রপল্লব ও স্থপারি বৃক্ষের পত্র সংস্থাপন করে এবং একখানা চালনের উপর পাঁচটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে তৈলবাতি লাগাইয়া দেয়, ইহাকে চালন বাতি বলে। সন্তানকে ইহার নিকটে আনে ও মুখে ভাত

CENTRAL LIBRARY

দেয়। নিজ বাটীর এবং প্রতিবেশীর সধবা স্ত্রীলোকগণ একত্র হইয়া চারিদিকে অবস্থান করে। সাধারণতঃ মাতামহীই প্রথম গ্রাস মুখে দিয়া থাকে।"[১] সাণ্ডারের রিপোর্ট অনুযায়ী শিশুর মামাই প্রথমে তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দেয়। এই সময় গান গাহিবার প্রথা আছে। এ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের 'ভাত-ছোঁয়ানি'র গানগুলি এবং তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

"ষষ্ঠ, দ্বাদশ কি অষ্টাদশ মাসে বালক কি বালিকা সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। বাড়ীর বাহিরে কোনো স্থান মনোনীত করিয়া তাহার চতুর্দিকে নিশান গাড়ে এবং একটি চরকা তথায় স্থাপন করে। বুড়ীমা নামক দেবতার আশীর্বাদে প্রথম চুল জন্মে বলিয়া কর্তিত চুলগুলি সেই দেবতার নিকট লইয়া যায় অথবা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। রাজা হইতে নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিও এই বিধি প্রতিপালন করিয়া থাকেন।"

"হিন্দু প্রণালী অনুসারে বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্বেই চূড়াকরণ হয়। এই কার্যে প্রথমে অধিকারী তণ্ডুল ও পক্ব কদলী দেবতার নামে উৎসর্গ করে। পরে নাপিত সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করতঃ কর্ণের লতি বৃক্ষের কাঁটা অথবা লৌহ বা রৌপ্য নির্মিত কাঁটা দ্বারা ছেদ করিয়া দেয়। সময়ে সময়ে সেজার কাঁটাও ব্যবহার করে।"[২]

বালিকাগণের জীবনে যখন প্রথম রজোদর্শন ঘটিয়া থাকে তখন এক অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। প্রথম ঋতুমতী হওয়াকে বলা হয় 'ফুল-ফুটানি'। যতোদিন না পর্যন্ত বালিকা রজঃস্বলা হয় ততদিন পর্যন্ত তাহাকে 'পাট-গাবুর' বলা হয়। ফুল-ফুটানির বর্ণনা ও গানের পরিচয়ের জন্য উহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ছেলে ও মেয়ে বড়ো হইয়া উঠিলে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়। রাজবংশী যুবক-যুবতীর প্রেমের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যাপণ প্রথার অস্তিত্ব, বিভিন্ন প্রকার বিবাহ, বিবাহের সময় পালনীয় আচারাদি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রেম ও বিবাহের গানের আলোচনা প্রসঙ্গে সবিস্তার লিখিয়াছি।

গার্হস্থ্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-সম্পর্ক কেমন, পরিবারের মধ্যে জায়া-পতির নিজের নিজের এবং যুগ্ম-ভূমিকার স্বরূপ কি—এ সম্পর্কে

১ কোচবিহারের ইতিহাস (১২৮৯) : পৃঃ ২৩-২৪

২ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪

CENTRAL LIBRARY

প্রেমের গানের প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। ঘর-কন্নার অবশ্য পালনীয় মেয়েলি কাজ ছাড়াও রাজবংশী মহিলাগণ মরশুমের সময় স্বামীর সহযোগিরূপে ধান গাড়িয়া ও কাটিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, হাতে চাদর-কম্বল প্রস্তুত করাও মেয়েদের একটি কাজ। রান্না-বাড়া, ধান ভানা, সন্তান পালন ইত্যাদি তো আছেই। রাজবংশী মেয়েরা হাটে-বাজারে যাইয়া সওদা বা বেসাতি দুই-ই করিয়া থাকে। মাঠে-ঘাটে যাইয়া দলবদ্ধ ভাবে মেয়েরাই জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এবিষয়ে ৩১৩ ও ৩১৩ক-সংখ্যক গান দুইটি পঠিতব্য। বাড়ীর বাহির হইবার কালে রাজবংশী সধবাগণ হাতে একটি সুপারি-কাটা কাটারি লইয়া চলে। ইহা তাহাদের এয়োতির একটি চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাতে Mana আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

সধবা নারীর সন্তান লাভে বিলম্ব হইলে কিংবা সন্তান আদৌ না হইলে, 'জিগা' গাছের সহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে সই পাতাইবার প্রথা আছে। 'জিগা' গাছ অমর, ইহার ডাল রোপণ করিলেও তাহা হইতে নতুন গাছ হয়,—ইহারই বলে বিশ্বাস করা হয়, ইহার সৃষ্টিক্ষমতা অসাধারণ। সন্তানকামী সধবা তাই এই গাছের সহিত সই পাতাইয়া থাকে। বন্ধ্যা নারীকে বলা হয় 'বাঞ্জী' বা 'ভাঞ্জী'। সমাজে ও পরিবারে বন্ধ্যাকে হেয় হইয়া থাকিতে হয়। ৪২৯-সংখ্যক গানে তাহার পরিচয় আছে।

অপুত্রক ও উত্তরাধিকারীহীন বিধবারা অনেক সময় বট গাছের সহিত পাকুড় গাছের বিবাহ দিয়া থাকে। এই বিবাহেও লৌকিক জগতের বিবাহের সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করা ও গান গাওয়া হয়। বট-পাকুড়ের বিবাহ দিলে পুণ্য বাড়ে, এইরূপ ধারণা বাঙলা দেশের অন্যত্রও প্রচলিত আছে। বর্তমান সংকলনের ৩০২-সংখ্যক গানটি একখানি বট-পাকুড়ের বিবাহের গান।

অসুখ-বিসুখ হইলে বাড়ীতে ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিবার রেওয়াজ তেমন নাই। ওঝা ডাকিয়া পূজা করা হয় এবং ওঝা আসিয়া নানা দেবতা-উপদেবতাদের উদ্দেশে গান গাহিয়া ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে রোগীর মঙ্গল কামনায়। মন্ত্রপূত জল, ঘি, তেল, লবণদ্বারা অসুখ ইত্যাদি সারিয়া থাকে—এইরূপ বিশ্বাস আছে।* ইহাকে বলে, 'জল-করা,' 'নুনপড়া,' 'তেলমারা'। ইহা ছাড়া 'ভূত চালান,' 'দেও চালান,' ইত্যাদিও আছে। গ্রামের কেহ একজন কাহারও অনিষ্ট করিলে চাহিলে Black Magic

CENTRAL LIBRARY

এবং নিজের ইষ্ট সাধন করিতে White Magic-এর আশ্রয় লইয়া থাকে। অপরের অনিষ্ট সাধন করিবার মন্ত্রকে বলে 'নাগান-বাহান'। এই কাজের পরিণাম শুভ নয়। যে ওঝা এই কাজ করিয়া থাকে, সে নির্বংশ হইয়া যায়। ওঝালি কাজের জন্য ওঝা গামছা, ধুতি, পাঁঠা, পারাবত ইত্যাদি ছাড়াও টাকা-পয়সাও লইয়া থাকে। ওঝালি গান কেমন করিয়া করা হয়, তাহার বিবরণের জন্য 'ওঝালি' গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মৃতদেহ সংকার করিবার রীতি ও প্রথা, অশৌচকালের পরিমাণ এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে জানিবার জন্য 'মড়া-খোয়া' গানের আলোচনা পঠিতব্য।

রাজবংশীদের পদবীর মধ্যে 'রায়' ও 'বর্মণ'-ই প্রধান। মেয়েরা নামের উত্তর 'বর্মণী' ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, 'দাস', 'তন্ত্র', 'দেবনাথ' প্রভৃতি পদবীও পাওয়া যায়। এই সকল পদবী খাঁটি রাজবংশী পদবী বলিয়া মনে হয়না। গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা সকলেই বলে 'কাশ্যপগোত্র'।

একশ বছরের পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার একটি প্রধান অংশ, বিশেষত তিস্তার পূর্বভাগ, ভুটিয়াগণের অধিকৃত ছিল এবং উহাদের দ্বারাই ওই অংশ শাসিত হইত। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ভুটিয়াগণ কতকগুলি পদের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সকল পদের অধিকারিগণের উত্তর পুরুষ, বর্তমানে উহা পদবীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। 'কাজী', 'বসুনিয়া', 'মল্লিক' প্রভৃতি পদবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার মতো। পদবীগুলি ভুটিয়া পদ হইতে আসিয়াছে। 'কাজী' পদের অর্থ হইল, যাহার কন্যা রাজার স্ত্রী; যে তহসিলদার জরিমানা, বিচার ও বন্দী করিতে পারিত, তাহার পদের নাম 'মল্লিক'; 'মল্লিকের' পুত্রের পদবী 'গাবুর'। অনেক মেচের 'গাবুর' পদবী আছে। জমি ইত্যাদি সংরক্ষণ ব্যাপারে যাহার অধীনে পাইক-বরকন্দাজ থাকিত তাহার পদকে বলা হইত 'বসুনিয়া'।

রাজবংশী সমাজের অন্যান্য পদ এই: মহৎ—গ্রামের প্রধান। কতম—বিচারক। কোটোয়াল—পিওন। বড়ুয়া—রাজার জামাই। কারকুন—খাজনা আদায়কারী। টারোই—খাজনা আদায়কারী। টাকুরিয়া—যে খাজনা আদায় করে। মেচ ব্যক্তিকে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ পদবী। গ্রামের মণ্ডল খাজনা আদায় করিয়া টাকুরিয়াকে দিত, টাকুরিয়া তাহা ভুটিয়াদের দিত। 'পাখা-ধরা', 'ছাতা-ধরা', 'ঝারি-ধরা' ইত্যাদি নামেও পদ ছিল।

CENTRAL LIBRARY

॥ ৩ ॥

রাজবংশীদের দৈনন্দিন জীবন সরল ও অনাড়ম্বর। নীচে ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল।

রাজবংশীদের বাড়ীতে সাধারণত চারি ভিটায় ঘর থাকে। ঘরগুলি খড়ের দোচালা। বেড়া ছেঁচা বাঁশের, তাহার উপর মাটি-গোবর দিয়া নিকানো। ভিটা দেড় হইতে আড়াই ফুট পর্যন্ত উচ্চ। টিনের বাড়ী থাকা সম্পদের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। যাহার সুপারির বাগান আছে তাহাকেও সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া মনে করা হয়।

চারি ভিটার ঘর ছাড়াও বাহিরে বসিবার ঘর থাকে। ইহাকে বলে 'ডারীঘর'। ঘর-বাড়ীর বিশিষ্ট অংশগুলির নাম কি, তাহা জানিবার জন্য 'ভাষা-পরিচয়' অধ্যায়ে শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বাড়ীর বাহিরে, সাধারণত উত্তরপূর্ব কোণে, ছোটো ছোটো (তিন সাড়ে তিন ফুট উচ্চ) কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে ঠাকুর ইত্যাদি রাখা হয়। ঠাকুর বলিতে অধিকাংশই কুড়াইয়া পাওয়া প্রস্তর খণ্ড। ইহা ছাড়া, মাটির ঢিবি করিয়া বিষহরি, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি রাখা হয়। শুভকর্মের প্রাক্‌কালে উত্তরপূর্ব কোণে শ্বেত পতাকা উড়ানো হয়। ধর্ম সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তৃত করিয়া বলা হইবে।

বাড়ীতে পাকা কুয়া প্রায় কাহারই থাকে না। মাটির কুয়ার জলই সাধারণত খাওয়া হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাঁশ ঝাড় থাকে। কুয়াগুলি সাধারণত এই বাঁশঝাড়ের তলায় খনন করা হয়।

রাজবংশিগণ সাধারণত যৌথপরিবারেই বাস করিয়া থাকে। পরিবারস্থ সকলের সম্পর্ক-ঘটিত সম্বোধনের জন্য 'ভাষা-পরিচয়' অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ইহাদের খাদ্যদ্রব্যগুলির নাম, পরিধেয় বস্ত্র, শয্যাদ্রব্য, অলঙ্কার ও তৈজসাদির নামের জন্য 'ভাষা-পরিচয়' অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সেখানে ইহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অলঙ্কার সবই রূপার। 'শাঁখামুঠি' হইল পাঁচ বা সাতটি শাঁখার সমষ্টি। সেইজন্য অনেক সময় 'পাঁচ শাঁখা মুঠি', 'সাত শাঁখা মুঠি' বলিয়া ইহা নির্দেশিত হয়। কৌলীন্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, ততো বেশি সংখ্যার শাঁখামুঠি তাহারা পরিয়া থাকে। ইহাদের রন্ধন

CENTRAL LIBRARY

প্রণালীর রীতি সম্পর্কে কিছু-কিছু তথ্য বর্তমান সংকলনের দুই-একটি গান হইতে জানা যায়। যেমন,

ওরে তেপথার বেগোরি দিয়া
আন্দিসে নাফার আমল। ...
চালকুমুড়া-নাফা শাক
ছেঁকা দিয়া আন্দিসে তাক।

অর্থাৎ কুল দিয়া 'নাফা' শাকের অম্বল রাঁধা হইয়াছে। চাল কুমড়া ও 'নাফা'শাকের মধ্যে 'ছেঁকা' দিয়া শাক রাঁধিয়াছে। 'ছেঁকা' হইল, কলাগাছের গোড়া পোড়াইয়া, সেই ছাইয়ের লবণাক্ত জল। ইহা লবণের বদলে খুব খাওয়া হইয়া থাকে। 'ছেঁকা'-র উল্লেখ বহু গানেই মিলে :

ছেঁকাশাক আন্দেছো বাপোই,
ঘিত্ কুমুড়ার পাত।

যে-কোনো তরকারিকেই 'শাক' বলা হয়। যেমন আলুর তরকারিকে বলা হয় 'আলু শাক'। 'ত্যালোতে ভাজিয়া আঠাইস শৌলের পহনা' অর্থাৎ তেল দিয়া শোলমাছের বাচ্চা ভাজিয়া রাখিয়ো।

শুকনা মাছ রাজবংশিগণ খুবই খাইয়া থাকে। ইহাকে বলে 'চাম্‌ঠা' বা 'শুক্‌টা'। শুকনা মাছ ও মানকচু উদূখলে কুটিয়া তাহাতে বিবিধ মশলা দিয়া দলা করিয়া রাখা হয়। ইহাকে বলে 'শিদল'। এই 'শিদল' পান্তাভাতের সহিত খাইতে ইহারা খুবই ভালবাসে : 'পান্তা ভাতত্ শিদল-সানা যেমন সোয়াদ লাগে।' লাউয়ের পাতায় এই 'শিদল' পোড়াইয়াও খাওয়া হয়। তাহাকে বলে 'পাতাও' :

খুঁড়িয়া বতুয়ার আগাল
ডিমার ভাজি, কৈতরের ছাও—
নাউর পাতোত্ করিয়া দে
শিদলের পাতাও॥

অর্থাৎ কাঁটাওয়ালা বেথো শাকের কুশি, ডিমভাজা, কচি পায়রার মাংস ও 'শিদলের' পাতাও আমাকে রাঁধিয়া দে।

CENTRAL LIBRARY

পাটের শাক দিয়া শোল মাছ, এবং 'চ্যাঙ' মাছ পোড়াইয়া তাহাতে লেবু দিয়া খাওয়া হয় :

ভিজা মাওালের খড়ি আথায় দিয়া
শৌল মাছ আন্দিছ্‌ শশুর পাটাশাক দিয়া।
বইসো, বইসো শশুর, ভাতো বাড়িয়া ;
চ্যাং মাছ পুড়িয়া থুইসুঁ জামুরি চিপিয়া॥

আমের মুকুল দিয়াও শোল মাছ রাঁধিয়া খাওয়া হয়। এই জন্যই একটি প্রবাদে আছে,

যদি অহে মোর কোপালে,
দেখা হবে আমের মউলে
আর বিলের শৌলে॥

কচুর গোড়া হইতে বাহির হওয়া লম্বা শিকড়কে বলা হয় 'বই' বা 'নতি'। ইহাও খাওয়া হয়। মুখী কচুকে বলা হয় 'সজি'। একটি গান হইতে শুয়োর খাইবার উল্লেখ পাই। পাটের শাক খুব খাওয়া হয়। শুকনা পাটের পাতাও তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে বলে 'শুকাতি'। কলা গাছের ক্ষার দিয়া রাঁধা পাটের শাককে বলে 'পেল্‌কা'।

চাউল ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সকাল বেলায় খাওয়া হয়। ভাজা চাউলকে বলে 'ভুরভুরা'। চিঁড়ার সহিত তেল ও মুন খাওয়া হয়। কিন্তু 'আলোয়া চিঁড়া' অর্থাৎ যে চিঁড়ার ধান সিদ্ধ করা হয় না, তাহাতে মুন খাইলে দোষ হয়। দুধের সঙ্গে মুন খাইতে দেখিয়াছি। চায়ের সহিত দুধ খাইবার প্রথা কিছুদিন আগেও চলিত ছিল না। একটি গান হইতে মুন দিয়া লাল চা খাইবার কথা পাওয়া যায়।

মাছের মধ্যে ইহারা ছোটো ছোটো মাছই বেশি খাইয়া থাকে। এই সকল মাছের নামের জন্য 'ভাষা-পরিচয়' অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সামাজিক নিমন্ত্রণাদির সময় দই-চিঁড়াই খাওয়ানো হয়। মাংস ইত্যাদি সকলের শেষে খাওয়া হয়।

খেলাধূলার মধ্যে বসিয়া খেলাই বেশি। বড়োদের জন্য বাহিরে খেলিবার খেলা নাই বলিলেই চলে। বালক-বালিকারা ঘরে বসিয়া হাতের উপর হাত রাখিয়া তাহা দোলাইতে দোলাইতে 'আঙুলদোলা খেলা' খেলে এবং

CENTRAL LIBRARY

ছড়া বলে। ছড়া বলিয়া অনেক খেলা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের লোকসাহিত্যের পরিচয় দিবার কালে কয়েকটি ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছি। অন্যান্য খেলার মধ্যে 'বার পাইতা', 'ছাম খোটোই', ঢোপ, চুটকি, খাপ, ফুতি, নেধাইপাটি, তুতুরাতুত, ঘোড়াখাই, মুকাটুহু, ছোড়ে বচাছো, কাউয়া ঢাপি-ঢুপি, বিষহরির মত বান্ধা প্রভৃতি খেলা উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে রাজবংশীদের কৃষি-পদ্ধতি ও মাছমারার কথাও বলিতে হয়।

মাছমারা রাজবংশীদের নিকট এক আনন্দের বিষয়। নদী ও খাল-নালায় ইহারা মাছ ধরিয়া থাকে খাল-নালায় মাছ ধরিবার সময় সাধারণত ইহারা দলবদ্ধ হইয়া মাছ ধরে। শরৎ কালের শেষ হইতে বসন্তকাল পর্যন্ত মাছ ধরা হয়। এক-একটি খাল বা নালায় পাড়ার যুবক-প্রৌঢ়-কিশোরেরা দলবদ্ধ ভাবে যাইয়া হানা দেয়। প্রথমে জল ছেঁচিয়া জল কমাইয়া তারপর হুড়াহুড়ি করিয়া মাছ ধরিয়া একত্র জমা করা হয়। পরে সেই মাছ সবাই ভাগ করিয়া নেয়। মাছ ধরিবার সময় কি কি সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় এবং উহাদের আকৃতি কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য জন্ এফ্ গ্রুনিং সম্পাদিত ১৯১১ সনের জলপাইগুড়ির ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য।

এইভাবে জল ছেঁচিয়া মাছ ধরিবার রীতি মেয়েদের মধ্যেও চালু আছে। দলবদ্ধভাবে মাছ ধরিবার এই আনন্দ একটি গানেও ব্যক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে বর্তমান সংগ্রহের ৩১২-সংখ্যক গানটি পঠিতব্য।

নদীতে মাছ ধরিবার সময় অনুরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়। গ্রামের সবাই মিলিয়া নদীর একটি বিশেষ স্থানে বাঁশ ইত্যাদি দিয়া জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া দেয়। বাঁশের ফাঁক দিয়া জল চলিয়া যায়, কিন্তু স্রোতে ভাসিয়া আসা সব মাছ বাঁশের মাচার ভিতর উঠিয়া আসে। ইহাকে বলে 'জান পাতা'। এখানেও প্রতিদিন মাছ একত্র জমা করিয়া, পরে সবাই সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়।

এইবার রাজবংশীদের কৃষি-জীবন ও কৃষি-পদ্ধতির কথা বলি।

যে জমিতে পাট, কলাই ও আশুধান্য হয়, তাহাকে বলে 'উচা'। যে জমিতে হৈমন্তিক ধান্যাদি হয়, তাহাকে বলে 'দোলা' বা 'দহলা'। যে জমিতে ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এবং তামাক, আলু, শাক-সব্জী উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহাকে বলে 'ভাঁট'। ঘর ছাওয়ার জন্য খড় হয় যে

B-R·4216209541 4
B 575
C2
CENTRAL LIBRARY

জমিতে তাহাকে বলে 'খেড়বাড়ী'। এইরূপ, বাঁশ-বাগানকে বলে 'বাঁশ বাড়ী'।

ধান, পাট ও তামাক—এই গুলিই রাজবংশীদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ধান বৎসরে দুইবার মাত্র রোপণ করা হয়: আশুধান অর্থাৎ বিত্রি বা 'ভাদই'; এবং আমন ধান অর্থাৎ 'হেঁউতি'। বিভিন্ন প্রকার আশুধান্যের নাম: গড়িয়া, ধনকাচাই, জাবর শাইল, নেলপাই, বোয়ালদার, মালাশিরা, বচি, চাপালো, পাড়াসী, ছাতনডুম্রা, ইত্যাদি।

আমন ধানেরও বিভিন্ন নাম আছে। সরু আমন ধান: বিন্নফুল, গোলাপ ভোগ, জগন্নাথ ভোগ, উকনিমধু, দাউদখানি, পক্ষীরাজ, পক্ষতজিরা, দুধকলম, চন্দনচুড়, কাটারডাপ। মধ্যম রকমের মোটা আমন ধান: বেত, পাকড়ী, পানি শাইল, কচুদানা, এন্দুর শাইল (ইন্দ্রশালী), ইত্যাদি। মোটা ধানের মধ্যে কালা শাউলা প্রভৃতি।

ধান রোপণ, কর্তন এবং ধানের বিভিন্ন স্তরের সহিত পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণের জন্য মেছেনীর ও নবান্নের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ধান রোপণ করা হয় কলম করিয়া। প্রথমে ধানের চারা তৈরি করিয়া তারপর একটি-একটি করিয়া ধান রোপণ করা হয়। ইহাকে বলে 'রোয়া গাড়া' বা 'ওয়া গাড়া'। পুরুষদের সহিত মেয়েরাও ধান গাড়িয়া ও কাটিয়া থাকে।

লাঙল দিয়া কর্ষিতব্য জমির চতুর্দিকে প্রথম দাগ দেওয়াকে বলে 'আতর মারা'। কর্ষণের জন্য লাঙল-জোয়ালে বলদ বাঁধাকে বলে 'হালজোড়া'।

ধান রোপণ করিবার সময় রৌদ্র-বৃষ্টি এড়াইবার জন্য বাঁশপাতা দিয়া তৈরি বর্তুলাকার ছত্রকে বলে 'ঝাঁপি'। গাছ হইতে ধান পৃথক করাকে বলে 'মলান করা' বা 'মাড়া'। খড়-কুটা ও তুষকে ধান হইতে পৃথক করিবার জন্য কুলা দিয়া হাওয়া দেওয়াকে বলে 'বাও দেওয়া'। ধান কাটিয়া আনিয়া স্তূপীকৃত করাকে বলা হয় 'পুঁজানো' এবং যে স্থানে ধান পুঁজি করিয়া রাখা হয় তাহাকে বলে 'খলান' বা 'খলতা'। যে বাঁশের যন্ত্রদ্বারা ধানের স্তূপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরানো যায়,—তাহাকে বলে 'কাউড়ী'। চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য ধান সিদ্ধ করাকে বলে ধান 'উবাণো'। ধান ভানাকে বলে 'বারা বানা', 'বারা ভুকা', 'বারা কুটা'। ঢেঁকির প্রচলন নাই।

BCU 2975

CENTRAL LIBRARY

উদুখলে ধান ভানা হয়। যাহাতে ধান থাকে তাহাকে 'ছাম' ও মুষলকে 'গাইন' বলা হয়।

পাট-কে বলা হয় 'পাটা' বা 'কোষ্টা'। পাটের ক্ষেতকে বলা হয় 'পাটাবাড়ী'। 'মেষ্টা' ও 'কুস্কুরা' অপর দুই ধরণের পাট। কুস্কুরা শোণ জাতীয় গাছ, ইহার আঁশে মাছ ধরার সুতা, জাল ইত্যাদি তৈরি হয়।

তামাককে বলা হয় 'তামাকু' বা 'তাংকু'। তামাকের ক্ষেতকে বলা হয় 'তাংকু বাড়ী'। বিভিন্ন প্রকার তামাকের নাম : জাত ভেলেঙ্গি, শগুনভেলেঙ্গি, গোছড়া, নাও খোল, সেন্দুর খতুয়া, সুরুজমুখী, বাহুয়া, ইত্যাদি। 'হামাকুর' নামীয় এক ধরণের কড়া তামাক আছে, ইহা পানের সহিত খাওয়া হয়।

সরিষাকে বলা হয় 'সইষা'। 'রাই', 'টোড়া', 'জাতি', প্রভৃতি বিভিন্ন সরিষার নাম। ডালের মধ্যে 'খ্যাসারিকালাই', 'টাউড়ীকালাই' (মাষ কলাই) ও 'কুলটি কালাই' উল্লেখযোগ্য।

কাঁচা সুপারি গর্তে রাখিয়া পচানো হয় এবং তারপর খাওয়া হয়। ইহাকে 'মজাগুয়া' বলে।

কচুও অনেক প্রকার আছে : আঁটিয়া কচু, মানাকচু, বাঁশকচু, বই কচু। মুখী কচুকে 'সজি' বলা হয়।

ইক্ষুকে বলা হয় 'কুশিয়ার'। ইক্ষুর বিভিন্ন নাম : খেড়ী, হেগুামুখী, মুগী (লম্বা আখ), বোম্বাই (লাল মোটা আখ), কাজলা (কালো সরু আখ)।

ক্ষেত্রে শত্রুজনের বিষ-নজর এড়াইবার জন্য কিম্ভূত মূর্তি রাখা হয়। ইহাকে 'নজর কাটা' বলে। ৩২৮-সংখ্যক গানে ইহার উল্লেখ আছে।

"৬০ সিক্কা ও ৯০ সিক্কা ওজনে সের ধরিয়া এক সের পরিমাণ তণ্ডুল যে বেত্র নির্মিত পাত্রে ধরে, তাহাকে 'টালা' বলে।" তিন টালায় এক 'দোন' হয়। ২০ দোনে হয় এক 'বিশ'। ১৬ বিশে এক 'পৌটি'।"

তুলা-কে বলা হয় 'বাঙ্গা'। তুলা হইতে টাকুতে সুতা তৈরি করিয়া তাঁত বোনা এবং পাট দিয়া থলে, শতরঞ্চ, কম্বল, চাঁদোয়া ইত্যাদি তৈরি করা রাজবংশী রমণীর গৃহকর্মের অন্তর্ভুক্ত। রাজবংশী রমণীগণের এই কর্তব্য খুব সম্ভব আসামী ও মেচগণের নিকট হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে। পাট দিয়া যে

17414
GS 2499
বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার

কম্বল তৈরি করিয়া থাকে মেয়েরা, তাহাকে 'ঝালক চাটি', 'শেণিয়া ধোকোড়া' ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে।

এইবার রাজবংশীদের দৈনন্দিন জীবনের অপরাপর দিকগুলি সম্পর্কে বলা হইতেছে।

মাসের নাম : বৈশাখ, জ্যাঠ্, আষাঢ়, শাওণ, ভাদোর, আশিন, কাতি, আগণ (অঘণ), পুষ, মাঘ্, ফাগুন, চৈত্। জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়পুর-রঙধামালী অঞ্চলে অনেক সময় জ্যৈষ্ঠ মাসকেই বৎসরের প্রথম মাস ধরা হয়। এ বিষয়ে এই সঙ্কলনের 'বারোমাসিয়া' গানটি দ্রষ্টব্য। উহাতে জ্যৈষ্ঠ হইতে বৎসর গণনা করা হইয়াছে।

সংক্রান্তিকে বলা হয় 'দোমাসিয়া'।

পক্ষ : জোনাক (শুক্ল), আন্ধার (কৃষ্ণ)।

তিথি : পুন্নিমা (পূর্ণিমা), আমাসী (অমাবস্যা)।

প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি তিথি ১ ঘটি, ২ ঘটি, ৩ ঘটি ইত্যাদি নামে উল্লিখিত হয়।

বারের নাম : দ্যাও (রবি), সম, মঙ্গোল, বুদ, বিস্তি, শুকুর, শনি।

ঋতু : বাইস্যা (বর্ষা), হেঁউতি (হেমন্ত), জাড় (শীত) দেওয়া (মেঘ), পানি (বৃষ্টি), দুন-পানি-পাথর (ঝড়, শিলাবৃষ্টি), চড়ক পড়া (বাজ পড়া), দেওয়া চিলকানো (বিদ্যুৎ চমকানো), হিম, কুহা (কুয়াসা)।

সংখ্যা : সাধারণত সকলে এক হইতে কুড়ি পর্যন্তই গণিয়া থাকে। কুড়ির অধিক হইলে কতো কুড়ি হইল, তাহাই উল্লিখিত হয়।

সময় : পোহাত (ভোর); বেহান, সাকাল, রাত্তি-পোহিল্ (সকাল); মই-জুড়ানি (বেলা ১১-১২টা); শুন-দুফোর—ভরা দুপুর ; বেলা-ঘুরিচে (বেলা পড়া); ভাটি বেলা (বিকাল); সাঞ্ঝা, দৈসাঞ্ঝ, (সন্ধ্যা), আত্তি (রাত্রি)।

রাজবংশীদের মধ্যে নানা প্রকার লোক-বিশ্বাস (Superstitions) চলিত আছে। নীচে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইল।

কোন মেয়ের চুল কোঁকড়া (মটুক কেশী) এবং দাঁত সরু (চিরুন দাঁতী) হইলে কুলক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়।

রবিবার ও বৃহস্পতিবার দিন বাঁশ কাটা হইলে সেই বাঁশ ঝাড় নষ্ট

CENTRAL LIBRARY

হইয়া যায়। বাড়ীর পূর্বদিকে বন-কাঁঠাল ('ভাউয়া' গাছ), উত্তর দিকে 'জিগিনি' গাছ, উত্তর এবং পূর্বদিকে তেঁতুল গাছ এবং পশ্চিম দিকে তাল গাছ থাকিলে তাহাতে রোগ-শোক-অমঙ্গলাদি হয়। বাড়ীর পূর্বদিকে তাল গাছ এবং দক্ষিণ দিকে তেঁতুল গাছ থাকাকে শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়।

পানের বরজ সর্বদাই বাড়ীর উত্তর অথবা পশ্চিম দিকে থাকা বাঞ্ছনীয়। কালো বিড়াল এবং কাল গাইকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। হলুদ বিড়াল অমঙ্গলের সূচনা করিয়া থাকে।

ময়নাগুড়ি অঞ্চলে সোমবার ধান রোপণ করিলে এবং বুধবার কন্যার বিবাহ দিলে অঘটন ঘটে বলিয়া বিশ্বাস আছে। অবশ্য সকলেই ইহা বিশ্বাস করে না। আলিপুর দুয়ার অঞ্চলে আবার বিশ্বাস আছে,—বুধবার দিন ছাড়া অন্য সব দিনেই ধান্য রোপণ করা চলে। এই দিন নাকি ধানের চারা গজায়। বুধবার দিন কেহ ধান্যাদি ধার দেয় না বা গোলাঘর খোলে না। কোনো স্থানে যাইবার সময় হলকর্ষণরত কৃষকের মুখ দেখিলে অমঙ্গল ঘটে। ৩১৭-সংখ্যক গান হইতে ইহা জানা যায়।

নতুন জায়গায় ঘর তুলিবার পূর্বে, চতুর্দিকে চারিটি বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া পাটের সুতা দিয়া একটির সহিত অপরটি বাঁধিয়া রাখা হয়। একরাত্রি এইভাবে রাখিবার পর, ওই সুতা যদি অচ্ছিন্ন থাকে, তবে তাহাকে শুভঘটনা বলিয়া মনে করা হয়। সুতা সর্বত্র ছিন্ন হইয়া গেলে, ওই স্থানে ঘর তোলা হয় না। অনেক সময়, চারি কোণে চারিটি কলাগাছ রোপণ করিয়া, মধ্যস্থানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। কিছু তুলসীপাতা ও পাঁচ-ছয়টি আতপ চাউল সেই গর্তে দিয়া, সন্ধ্যাবেলায় একটি বাঁশের ঝুড়ি দিয়া তাহা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। পরদিন প্রভাতে যদি সব কিছুই ঠিকমতো দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। চালগুলির মধ্যে যদি কোনো একটি হারাইয়া যায়, তবে যাহারা সেই স্থানে নির্মিত গৃহে বাস করিবে, অন্নাভাবে তাহারা কষ্ট পাইবে,—এইরূপ বিশ্বাস আছে।

ভাদ্রমাসে কলমী শাক খাইতে নাই। খাইলে সে মাশান ঠাকুরের নাড়ী চিবাইবে। ৩১৭-সংখ্যক গানে ইহা বলা হইয়াছে। বটপাকুড়ের গাছের ডাল দিয়া রাঁধিতে নাই। ৩১৩-ক সংখ্যক গানে ইহার উল্লেখ আছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ ৪ ॥

অন্যান্য লোকসমাজের মতো রাজবংশীসমাজও স্বভাবতই ধর্ম-ভীরু। ইহাদের ধর্মজীবন বিচার করিলে দেখা যাইবে, পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবী অপেক্ষা নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গড়া উপদেবতা-উপদেবীর সংখ্যাই অধিক। পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবী নামে ইহাদের সংস্কারে উপস্থিত থাকিলেও, দেব-দেবীদের স্বভাবে ও আচরণে পার্থক্য আছে। নীচে ইহাদের ধর্মজীবন সম্পর্কে সামান্য দুই-চারি কথা বলা হইল।

রাজবংশী সমাজে সর্বাপেক্ষা যিনি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, তিনি হইলেন 'গারাম ঠাকুর' অর্থাৎ গ্রাম দেবতা। গারামের কোনো মূর্তি নাই। রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া বিচিত্র শিলাখণ্ডকেই গভীর ভক্তিতে স্থাপন করিয়া দেবতা-জ্ঞানে পূজাদি নিবেদন করিয়া থাকে। গ্রামের কোনো বিশেষ স্থানে অথবা কোনো বৃক্ষতলে, অথবা পথের ধারে গারামের 'থান' থাকে। অধিকাংশ স্থলেই গ্রামদেবতার শীতাতপ নিবারণের জন্য স্থায়ী গৃহ থাকে না। ভাঙা টিন বা খড় দিয়া ছাওয়া বেড়া-শূন্য তিন-চার-ফুট উচ্চ কুটীরেই গারাম অবস্থান করিয়া থাকেন। অনেকে বাড়ী হইতে কিছু দূরে, পূর্বদিকে গারাম ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচ বা সাতটি কুটীর নির্মাণ করিয়া দেয়। দই ও চিঁড়া দিয়া ইহার নৈবেদ্য দিতে হয়। 'মেছেনী' ব্রতের সময় দেবী তিস্তার প্রতীক তৈরি করিবার জন্য গারামতলা হইতেই মাটি লইয়া যাওয়া হয় এবং প্রথম দিন মেছেনীর শোভাযাত্রা ও ব্রতের উদ্বোধন এই গারামতলাতেই করা হয়। 'মেছেনী-'কে বরণ করিবার সময় গারাম দেবতাকে কেন যে মুসলমানী প্রথায় দুই বাহু বাড়াইয়া 'সালাম' জানানো হয়, তাহা বোঝা যায় না।

প্রথম ধান্য রোপণের ও ধান্য কর্তনের দিন; নবান্নের সময়, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের পূর্বে; কলেরা-বসন্ত দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মহামারীর প্রতিকার কল্পে, অথবা আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ-আপদ এড়াইবার জন্য গারাম দেবতা পূজা পাইবেন সর্বাগ্রে। আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সমগ্র সমাজের তরফ হইতে বারোয়ারি ভাবে গারামের পূজা দেওয়া হয়।

গারাম দেবতা সাধারণত আঞ্চলিক। বিভিন্ন গ্রামের গারামের নাম

CENTRAL LIBRARY

বিভিন্ন। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে গারামের অনেক নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 'ঢেনা গারাম', 'সইন্যাসী গারাম' এবং 'শালেশ্বিরী মহারাজ'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। 'ঢেনা গারাম' অবিবাহিত ব্যক্তিদের উপাস্য। 'সইন্যাসী গারামের' বাহন হইল হাতী এবং নামে 'সন্ন্যাসী' হইলেও আসলে ইনি গৃহস্থের উপাস্য। 'শালেশ্বিরী' আসলে পুরুষ দেবতা, ইনি ব্যাঘ্রবাহন। সাধারণত শিকারিগণ শিকার বা কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি উপলক্ষে অরণ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে ব্যাঘ্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহার পূজা করিয়া থাকে। শালেশ্বরী আসলে মেচদের অরণ্য-দেবতা। ইহার পূজাতে ডিম, মুরগী ইত্যাদি লাগে। মুরগীর গলায় জবা ফুলের মালা পরাইয়া শেষে শালেশ্বরীর নামে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত ধূপগুড়ি থানার গ্রামদেবতার নাম 'ডং-ঢোরা' বা 'ঢাং-ডিং'। কেহ-কেহ ইহাকে 'বাবা ধূপগুড়ি'ও বলিয়া থাকে। ইনি বেত্র-পাণি। হাতে ইহার 'ডাং' অর্থাৎ যষ্টি আছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ডাং-ধরা', মূর্দ্ধন্যীভবন হইয়া 'ডাং-ঢোরা'। ইহার নৈবেদ্যে বিচিওয়ালা কলা এবং দই-চিঁড়া অবশ্যই দিতে হইবে।

প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামদেবতাই পুরুষ। মহিলা গ্রাম দেবীরূপে 'তিস্তা' ও 'ময়না'-বুড়ীর নাম শোনা যায়। বোদা থানার (বর্তমানে ইহা বাঙলাদেশে) গ্রামদেবী ছিলেন 'তিস্তাবুড়ী'। ফালাকাটা তহসিলে মাদারিহাট পরগণায় 'ভাণ্ডারনী' নাম্নী এক গ্রামদেবী আছেন। ফালাকাটা তহসিলের মড়াঘাট পরগণার দলগাঁও ও সরুগাঁও তালুকের নাম 'দল' ও 'সরু' নামীয় দুই গ্রামদেবতার নামে হইয়াছে বলিয়া অনেকের অনুমান।

আলিপুর তহসিলের ভাটিবাড়ী পরগণায় 'তলেশ্বর' ও 'মহাকাল' নামীয় দুই গ্রামদেবতা আছেন। ইঁহাদের নামেই তালুক দুইটির নাম হইয়াছে 'মহাকালগুড়ি' ও 'তলেশ্বরগুড়ি'। ভাল্কা তহসিলের ভাল্কা পরগণার কামাখ্যাগুড়ি তালুকের নাম কামাখ্যা নামীয় গ্রামদেবীর নাম হইতে হইয়াছে।

শালেশ্বিরী গারামের প্রসঙ্গে 'কণ্ঠপাল' নামীয় বনদেবতার নাম স্মরণীয়। 'শালেশ্বরী' হইলেন শালবনের অর্থাৎ ব্যাপকার্থে অরণ্যের দেবতা, ইহার আসল নাম 'কণ্ঠপাল'। হাতী, বাঘ, গণ্ডার-বাইসনের উপদ্রব বাড়িয়া গেলে

CENTRAL LIBRARY

কিংবা অরণ্য হইতে কাষ্ঠাহরণ করিবার পূর্বে, কণ্ঠপালের পূজা দিতে হয়। গ্রাম দেবতা রূপেও ইনি ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের গ্রাম দেবতা ইনিই। কণ্ঠপাল সম্পর্কে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কামারভিটা পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত পানিকোয়াড়ি গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত ওঝা চাম সিং-এর কাছে শোনা যায়: কণ্ঠপাল ছিলেন পাল বংশের এক রাজা। সমগ্র বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ছিল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। করতোয়া ও নীম নদীর সংযোগস্থলে শিমুলগুড়ি নামক গ্রামে ছিল তাঁহার রাজধানী। শোনা যায়, বহুদিন আগে শিমুলগুড়িতে ঢিবির আকারে মন্দিরের মতো একটি ধ্বংসাবশেষ ছিল। এই ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রতিদিন দুইটি বিরাট কুকুর বাহির হইয়া আসিত। ইহারাই কণ্ঠপালের বাহন। আজও নাকি সেই কুকুর দুইটিকে কেহ-কেহ দেখিয়া থাকেন।[১]

একটি মাটির ঢিবি রচনা করিয়া উহাকেই কণ্ঠপালের মূর্তিজ্ঞানে ধূপ-দীপ-বলি-নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া কণ্ঠপালের পূজা করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে কণ্ঠপালের প্রভাব নাই।

গ্রামদেবতা-বনদেবতার পরই উল্লেখ করিতে হয় 'বিষহরি' বা মনসার নাম। রাজবংশি-সমাজজীবনে বিষহরির প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক। বিবাহ-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিষহরির গান করিতে হয়। শ্রাবণ-সংক্রান্তি উপলক্ষে জলপাইগুড়ির রাজবাটীতে এখনও বিরাট মেলা বসিয়া থাকে।

এই বিষহরি বিভিন্ন নামে ও মূর্তিতে ভক্তজনের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। 'কানী বিষহরি', 'মাটিয়া বিষহরি', 'পদ্মা বিষহরি', ইত্যাদি বিষহরির বিচিত্র নাম। বিষহরির সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা হইল,—গৃহদেবীরূপে ইহার উপাসনা। সম্পন্ন রাজবংশী গৃহস্থের বাটীতে বিষহরির মৃন্ময় মূর্তি প্রতিদিন পূজিত হইয়া থাকে।

রাজবংশী গৃহস্থের বাড়ীতে তুলসী তলায় তুলসী গাছের পার্শ্বে দুইটি ছোটো ছোটো ঢিবি রচনা করা হয়। এই ঢিবির একটি হইলেন বিষহরি। মাটির ঢিবি বলিয়া ইহাকে 'মাটিয়া বিষহরি' বলা হয়। অপর ঢিবিটার নাম গৃহস্থের ধর্মসংস্কার অনুযায়ী রাখা হয়। কেহ উহাকে ধর্মঠাকুর বলে, কেহ

১ উত্তরপথ (জলপাইগুড়ি) : বৈশাখ, ১৩৬৫

CENTRAL LIBRARY

কেহ হয়তো শিব কিংবা নারায়ণ বলিয়া থাকে। কোনো গৃহস্থ যখন তাহার বাস্তভিটা পরিবর্তন করিয়া অন্যত্র যায়, তখন ওই ঢিবি দুইটি হইতে কিঞ্চিৎ মাটি সঙ্গে লইয়া যায় এবং নতুন বাড়ীতে নতুন ঢিবি রচনা করিবার সময় সেই মাটি মিশাইয়া দেয়। ইহার অর্থ, গৃহস্থের সহিত গৃহদেবতাও স্থান পরিবর্তন করিলেন।

রাজবংশিগণ বিষহরির মূর্তি অপর দুই ভাবে রচনা করে—মাটি ও শোলা দিয়া। বিষহরির মৃন্ময় মূর্তিতে তিনি যুগল-হংসবাহনা, হস্তে সর্প ও বরাভয় মুদ্রা। শোলার মূর্তিতে চাল-চিত্র থাকে। এই চাল-চিত্রে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়া যাওয়া লখিন্দের শব, ভেলায় উপবিষ্টা বেহুলা ইত্যাদি থাকে। নীচে বিষহরির নেতা নাম্নীয় সখীর শোলামূর্তি, মাঝে বিষহরির মূর্তি। এই বিষহরির নাম 'পদ্মা বিষহরি' বা 'কানী বিষহরি'। সারা বৎসর ধরিয়া, যে কোনো সময়ে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন বা আপদে-বিপদে বিষহরির পূজা হইতে পারে। তবে বৈশাখ ও ভাদ্রমাসের ইহার পূজা বেশি হইয়া থাকে।

বিষহরির প্রসঙ্গে 'বাইটন' বা 'বাইট্টোন'-দেবীর কথাও আসে। ধূপগুড়ি থানায় বিবাহের পূর্বে অনেকেই বিষহরির গান না গাহিয়া বাইটনের গান গাহিয়া থাকে। বাইটন দেবী বিষহরির কৃপায় সন্তানবতী হইয়া ছিলেন। সেই সন্তানদ্বয়ের বিবাহ কালে, দেবী বিষহরির পূজা দিতে ভুলিয়াছিলেন বলিয়া অধিবাসকালে তাহাদের মৃত্যু হয়। পরে বিষহরির আশিসেই তাহারা বাঁচিয়া উঠে। বাইটনের পূজা-বিধি ও মূর্তি এবং গান সম্পর্কে বাইটনের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কালী ও ধর্মঠাকুর রাজবংশীদের অপর দুই উল্লেখযোগ্য দেবতা। অনেক বন্দনা গানে ও মন্ত্রসঙ্গীতে ধর্মঠাকুরের নামোল্লিখিত হইয়াছে। 'ওক্সালি' গানের মধ্যে অন্যান্য সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ জানাইবার পূর্বে ইহাকেই আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। ধর্মঠাকুরের নামে রাজবংশিগণ বাড়ীর উত্তরপূর্বকোণে শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দেয়। অনেক সময় একটি ছাগলের শিঙে সিঁদুর দিয়া ধর্মঠাকুরের নামে ছাড়িয়া দেয়। অন্যান্য উপকরণের সহিত ডিমও ধর্মঠাকুরের পূজায় দেওয়া হয়। বোদা-পঁচাগড় অঞ্চলে ধরম ঠাকুরের নামে মহারাজার দীঘিতে পূজা দেওয়া হয় এবং বনভোজন করা হয়।

কালী ধর্মঠাকুরেরই কন্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। 'মাশান' হইলেন কালীর পুত্র। শিব ধর্মঠাকুরের জামাই। ধর্মজীবনে ধর্মঠাকুরের এতো প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ধর্মমঙ্গলের গান এই অঞ্চলে প্রচলিত নাই। ধর্মঠাকুর, শিব ও কালী সম্পর্কে জানিবার জন্য 'ওঝালি' গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

'ওঝালি' গানগুলি হইতেই বিভিন্ন অপদেবতা ও উপদেবতার নাম জানিতে পারা যায়। এই সমস্ত দেব-দেবীর মধ্যে বিকৃত অঙ্গের দেবী 'গাঙ্গো', 'খিয়ালী-পইরী', 'জৈরী-পইরী', 'হিঁয়ালী-পইরী', 'কান্দনা-পইরী' প্রভৃতি পরী; 'থানেশ্বিরী', 'গইয়াত', 'মাহাকাল' প্রভৃতি উপদেবতা; 'কালাকুক্‌রী,' 'গহিলী' প্রভৃতি অপদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

খচ্‌পীর, মাদারপীর, সইত্যপীর, কানীপীর প্রভৃতি পীর-দেবতাও রাজবংশিগণ কর্তৃক ভক্তিভরে পূজিত হইয়া থাকেন। ৩১৭-সংখ্যক গানের 'নামানি' অংশে খচ্‌পীরের নাম পাওয়া গিয়াছে। ১৩৫-সংখ্যক গানে পাওয়া যাইতেছে কানীপীরের নাম। গ্রামের শৃগাল-কুকুর ক্ষেপিলে কিংবা মহামারী দেখা দিলে ইহার নামে বাঁশ উত্তোলন করিলে বিপদ কাটিয়া যায়,—এইরূপ বিশ্বাস আছে। এ সম্পর্কে অধিকতর তথ্যের জন্য 'পাগ্‌লা পীরের' আলোচনা দ্রষ্টব্য। সত্যপীরের প্রভাব তো সর্বত্র। সত্যপীরের নাম করিয়া গানও আছে—বর্তমান সংকলনে অবশ্য তাহা সংযোজিত হয় নাই।

স্ত্রীদেবতাগণের মধ্যে লক্ষ্মী, চণ্ডী, শুবচনী (ছিবচনী), বসুমতী (বাসমাতা), বরমাণী, মেছেনী, ঘাটো, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মী বিবিধ: ডাকলক্ষ্মী, অঘণ লক্ষ্মী, পৌষ লক্ষ্মী; 'মেছেনীর' আলোচনা কালে ইহাদের পরিচয় দিয়াছি। 'ছিবচনী' হইলেন 'শুবচনী'—ইনি পরিবারের শুভ সূচনা করিয়া থাকেন। অনেক সময় শুবচনীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। 'বাসমাতা' হইলেন ক্ষেত্রদেবতা, ইহার আশিসেই শস্যাদি জন্মে। ৪২৯-সংখ্যক গানের 'বসানি' অংশে 'বাসোমাতার' নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩৮-সংখ্যক গানে 'বরমাণী'-র নাম পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে:

ভাদর মাসোত্তে সাধুরে ভাদর কামুনী।
ফুলো-জলো দিয়া পূজা করে বরমাণী ॥—সং ১৩৮

চণ্ডী ক্রুদ্ধা দেবী রূপে কল্পিতা। কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি ইহারই রোষে

CENTRAL LIBRARY

হইয়া থাকে। 'মেছেনী' ও 'ঘাটো'-র পরিচয় সম্পর্কে উহাদের গানের আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

'হুদুমা' হইলেন মেঘ-দেবতা। 'জিতুয়া' জিমূতবাহন। 'অথাইপথাই' পথের দেবতা। ইহাদের পূজা ও পরিচয়ের জন্য হুদুমা ও জিতুয়ার গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য। 'অথাই-পথাই'-এর পরিচয়ের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রাজবংশিগণ হয় শৈব নয় বৈষ্ণব। যাহারা শৈব, শিব তাহাদের উপাস্য বটে, কিন্তু, বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক ও প্রবল প্রভাব এড়ানো কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। বৈষ্ণবের তুলসী, তিলক ও খোল-কীর্তনের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের ফলেই দেহতত্ত্ব, তুক্কা, 'মনঃশিক্ষা' ও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গীতাবলী রচিত হইয়াছে।

অতঃপর বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উদ্‌যাপিত রাজবংশীদের কয়েকটি ধর্মাচার সম্বন্ধে বলা দরকার।

বৈশাখ মাসে অঙ্গনের তুলসী গাছের দুই পাশে দুইটি বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া, আড়া তৈরি করিয়া, মাঝখানে একটি মাটির ঘট ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ঘটটির তলায় ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রপথে দূর্বাঘাস গুঁজিয়া দেওয়া হয়। তারপর, ঘটটিতে জল ভরিয়া দিলে, ফোঁটায় ফোঁটায় সেই জল তুলসী গাছের উপর পড়ে। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া বাড়ী হইতে অমঙ্গল দূর করিবার জন্য প্রত্যহ সেই ঘটে জল ঢালা হয়।

আষাঢ় মাসের ৭ই তারিখ হইতে ১০ই তারিখ পর্যন্ত 'অম্বুবাচী' হয়; ইহাকে বলে 'আমাতি'। এই দিন পথেঘাটে বালক ও কিশোরেরা পথ-যাত্রীর পথরোধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পূজার চাঁদা আদায় করিয়া থাকে। অনেক স্থানে বাঁশগাছের সদ্য-উঠা চারাগাছকে 'আমাতি'-ঠাকুর করা হয়।

জন্মাষ্টমীর দিন একটি অনুষ্ঠান করা হয়। ইহাকে বলে কাদোখেলা। কাদার মধ্যে দই ছড়াইয়া দিয়া দুইজন দৈহিক শক্তির পরীক্ষা দিয়া থাকে। কিশোর ও নব-যুবকেরাই ইহার প্রধান উৎসাহী।

ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে মৃত পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা হয়। ইহা এক অবশ্য পালনীয় ধর্মাচার। ইহাকে বলে 'কইনাগত্'। ১০২-সংখ্যক গানে ইহার উল্লেখ আছে।

বিজয়া দশমীর দিন ভুয়ার্সে ভাণ্ডারনী দেবীর পূজা হয় এবং মেলা বসিয়া থাকে।

দুর্গা পূজার পরদিন অর্থাৎ একাদশীর দিন বাড়ীর গৃহিণী লাঙল-জোয়ালকে তেল-সিঁদুর দিয়া পূজা করেন। ইহাকে বলে, 'হালযাত্রা'।

কার্তিক মাসের একাদশীর দিন উপবাস করিবার এবং কীর্তনাদি শুনিবার প্রথা আছে। এই একাদশীকে 'থান একাদশী' বলা হয়। কেহ কেহ ১১ই কার্তিক পরিবারের সকলের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির আশায় পুরা একদিন উপবাস করিয়া থাকে।

কালীপূজার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে বাড়ীর গৃহিণী বাড়ীর রাখাল ও গোরুকে বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া বরণ করিয়া থাকেন। ইহাকে বলে 'গোরুচুমানি'। ইহার পরিচয় সম্পর্কে 'গোরুচুমানি'-র গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে পূর্বপুরুষের অস্থি লইয়া, গদাধর নদীতীরে যখন বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই নদীতে দেওয়া হয়। অনেকে নৈহাটি বা মনিহারী ঘাটের গঙ্গাতেও অস্থি দিয়া থাকে। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে জল্পেশে যাইয়াও অনেকে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকে। জল্পেশে সতীদেহের বামঅঙ্গ পড়িয়াছিল। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানকার মেলা জলপাইগুড়ি জেলার বৃহত্তম মেলা।

বারুণী উপলক্ষে করতোয়া বা অন্য যে নদী উত্তর বাহিনী,—সেখানে স্নান করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে এই দিন দেবতার উদ্দেশে নদী বা জলাশয়ে ডিম ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

ফাল্গুন সংক্রান্তির দিন গোয়ালঘর হইতে ঝাঁটার তিনটি কাঠিতে করিয়া গোবর লইয়া কোন তে-রাস্তার মোড়ে যাইয়া পূজা করা হয়। ইহাকে বলে 'জাড়-কাটানি' বা 'গো-ফাগুনা'। বর্তমান সংকলনের ১৩৮-সংখ্যক গানে পাই :

ফাল্‌গুনো মাসোতে কইন্যা গো-ফাগুনার গুণ।
ওই মতন জলিয়া অঠে তোর মনের আগুন॥—সং ১৩৮

দোল পূর্ণিমার পূর্বদিন হয় 'ধুলিয়া'। ইহা বসন্তোৎসব। ইহার বিবরণ ও পরিচয়ের জন্য 'হোলি'-গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে হয় শিবের গাজন।

CENTRAL LIBRARY

এই শিবের গাজন উপলক্ষে পাড়ার কিশোর ও যুবকগণ 'ভক্তিয়ার' হইয়া, ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া, হাতে শিবের ত্রিশূল লইয়া গান গাহিয়া বেড়ায়। এই গানকে বলে, 'গমীরা গান'। সহজেই বোঝা যায় 'গম্ভীরা' হইতে ইহা আসিয়াছে। কিন্তু, গম্ভীরার সহিত নামের সাদৃশ্য ছাড়া গমীরার অপর কোন সম্পর্ক নাই। গমীরায় প্রেমের গানই বেশি গাওয়া হয়। প্রেমের গান সাধারণ প্রেমের গানের মতো বলিয়া গমীরার গান পৃথকরূপে বর্তমান সংকলনে সংযোজিত হয় নাই।

বিষুবসংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তিকে বলা হয় 'বিষুয়া'। বিষুয়া' বা 'বিষুমা' উপলক্ষে পালনীয় আচার ও গীত গানের পরিচয়ের জন্য 'বিষুয়া'-র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এইবার রাজবংশীদের পূজা-প্রথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলিতেছি।

ইহাদের পূজার নৈবেদ্য প্রধানত দই, চিঁড়া এবং বিচিওয়ালা কলা। দুধ ও আতপচালের সহিত কোনো কোনো দেবতাকে ইহারা ডিমও নিবেদন করিয়া থাকে। পূজায় তুলসী পাতা ব্যবহৃত হয়। হাতে প্রস্তুত মোটা ধূপ এবং দীপ জ্বালানো হয়। ঘৃতদীপকে বলা হয় ঘিয়ের 'ভোগা'। বলি হিসাবে পায়রা, পাঁঠাই সাধারণত দেওয়া হয়। অনেকে পায়রা বা পাঁঠা বলি না দিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। পাঁঠা বা পায়রা বলি দিবার সময় খড়্গ ব্যবহৃত হয় না। পায়রার ঘাড় হেঁচকা টানে ছিঁড়িয়া সেই দেহ দেবতাকে নিবেদন করা হয়। অনুরূপ ভাবে পাঁঠার দেহও দুইতিন জনে মিলিয়া ঘাড় মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া লওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অস্ত্রদ্বারা কাটা পাঁঠার মাংস সামাজিক অনুষ্ঠানে কেহ খায় না।

পূজাস্থানে দেবতার বেদীর উপর শোলা-নির্মিত চিত্রিত ফলক ঝুলাইবার প্রথা আছে। ইহাকে 'ডোলা' বলে। এই 'ডোলা' দেখিতে গোল এবং ইহার উপর নানা ছবি আঁকা থাকে। বর্তমান সংকলনের ১৫৮-সংখ্যক গানে আছে : 'গঁসাইর ঘর ভাই ডোল ডোলাইসে'। অর্থাৎ পূজাবেদীতে 'ডোলা' দোলাইয়া দিয়াছে।

পূজার পুরোহিতকে বলা হয় 'অধিকারী'। মন্দিরের পরিচারকদের বলা হয় 'দেউশি', বা 'ধেন্‌ধা' বা 'দেহরি'। কোথাও কোথাও মন্দিরের ভৃত্যকে 'টউলিয়া'-ও বলা হয়। পূজা করিবার সময় পুরোহিতের হাতে

CENTRAL LIBRARY

একটি সরু বেত থাকে। কোনো কোনো সময় পুরোহিতের পায়ে নূপুরও থাকে।

কখনও দেবতার প্রভাব কোনো কোনো 'অধিকারী' আপনার উপর গ্রহণ করেন। ইহাকে বলে 'ভর' উঠা। যাঁহার উপর দেবতার 'ভর' হইয়া থাকে তাঁহাকে বলে 'ভওরিয়া'। 'ভওরিয়া'-র নিকট ভক্তগণ প্রশ্ন করিয়া থাকে। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপদ-আপদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া উহার সমস্যার সমাধান জানিয়া লয়। 'ভওরিয়া'-র উপর যখন 'ভর' হয় তখন তিনিই যেন দেবতা হইয়া যান এবং সকলকে 'ভক্ত রে' বলিয়া সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়া থাকেন। এই সময় তিনি উদ্দাম ভঙ্গিতে নাচিতে থাকেন এবং দেহে স্বেদ কম্প্র ইত্যাদি দেখা যায়,—চোখ লাল হইয়া অস্বাভাবিক দেখায়॥

॥ ৫ ॥

পরিশেষে, রাজবংশীদের আনন্দ-উৎসবের কথা বলিব। ইহারা স্বভাবতই সংগীত-প্রিয়। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরই ইহারা সংগীত দিয়া বিশেষিত করিয়া লয়।

সাধারণত সন্ধ্যাবেলায় একত্র হইয়া ইহারা গান গাহিয়া থাকে। গোরু চরাইবার কালে বা হলকর্ষণ করিবার সময় গান গাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদির নাম : দোতরা, সারিন্দা, বেনা, বাঁশী, খোল, জুড়ি। করতাল, শানাই ইত্যাদি। মেয়েদের গানে সাধারণত কোনো বাদ্যযন্ত্র হয় না,—করতালি দিয়াই ইহারা গান গাহে।

আনন্দ-উৎসবের প্রসঙ্গে 'মেলা'-র কথাও আসে। জলপাইগুড়ি জেলাতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে সকল মেলা বসিয়া থাকে,—তাহার সব কয়টিই কিছু রাজবংশী সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। মেলাগুলির মধ্যে শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ীর মনসা-মেলা, ময়নাগুড়ি থানার বিজয়া দশমীর 'ভাণ্ডারনীর' মেলা; ও শিবচতুর্দশীতে জল্পেশ মেলা; ফালাকাটা থানার মালসাগাঁওর বারুণী স্নানের মেলা এবং গৌরীর হাটের চড়কের মেলা উল্লেখযোগ্য॥

এই অধ্যায় রচনা করিতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে :

১ ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স : জলপাইগুড়ি (১৯১১)
২ ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকস্ : জলপাইগুড়ি (১৯৫১)
৩ কোচবিহারের ইতিহাস : (১২৮৯) ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩১২, ১ম সংখ্যা
৫ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ লোক-সাহিত্য : প্রান্ত উত্তরবঙ্গ ॥

॥ ১ ॥

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা আছে। বর্তমান গ্রন্থে যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় কেবলই গান, তবুও প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাইবার জন্য উহার অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। এইজন্য এই অধ্যায়ে লোক-সাহিত্যের অপর শাখাগুলি যথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, উপকথা (রূপকথা), প্রভৃতির সম্পর্কে সামান্য দুই-চারি কথা বলিতেছি। এইগুলিকে পটভূমিকা রাখিলে লোক-সঙ্গীতের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাইবে।

প্রথমে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ছড়া সম্পর্কে বলিতেছি।

ছড়াকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ছড়া আছে যাহা শিশুর ছড়া, কতকগুলি ছড়া প্রাপ্তবয়স্কদের ছড়া। শিশুর ছড়ার মধ্যেও ভাগ আছে। যেমন, শিশুকে ভুলাইবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ছড়া—এবং শিশুর নিজেকে নিজে শুনাইবার ছড়া। শিশুর জ্ঞান হইলে ছেলে ও মেয়েদের ছড়াও পৃথক হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ছড়াকেও—স্ত্রী ও পুরুষের দিক হইতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেহেতু স্ত্রী ও পুরুষের জীবন ও মানসিক গড়নের মধ্যে পার্থক্য আছে, সেইহেতু উভয়ের ছড়াও পৃথক।

ছেলেভুলানো ছড়াগুলি বর্তমানে সংকলনে সংকলিত হইয়াছে ঘুমপাড়ানি গানের সহিত। আমাদের আলোচ্য বিষয় গান হইলেও ছড়া দুই-একটি সংকলিত করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে, অসংকলিত কয়েকটি ছড়ার পরিচয় দেওয়া হইবে।

ছেলেভুলানো ছড়ার সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য ঘুমপাড়ানি গানের পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। গৃহকোণে বসিয়া বালক-বালিকাদের খেলার বিভিন্ন ছড়া আছে। সন্ধ্যাবেলায় অথবা বৃষ্টির দিনে ঘরে গোল হইয়া বসিয়া বালক-বালিকাগণ এক ধরণের' খেলা খেলিয়া থাকে। সকলে জোড়াসন করিয়া বসিয়া পড়ে।

CENTRAL LIBRARY

তাহার পর একজন তাহার হাতটি প্রত্যেকের ভাঁজকরা হাঁটুর ফাঁকে গুঁজিয়া দিয়া এই ছড়াটি বলে :

ডমনারে ডুমুনি—
শোড়া মাছের ঘুমুনি।
শাক খায়, শুকাতি খায় :
ডম্‌না বেটা কুন্‌ঠে অয়॥···

এই ধরণের অপর একটি খেলা হইল' আঙ্‌ুল দোলা' খেলা। বালিকারাই ইহা বেশি খেলিয়া থাকে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের ডান ও বাম হাত একের পর এক স্থাপন করিয়া সমবেত ভাবে তাহা দোলাইতে দোলাইতে তাহা বলা হয়,—

ইছন-বিছন ধাপুরি বিছন
তাতে আছে মোগলকাটা।
মোগলকাটা নড়ে চড়ে
আইকুমারী ডাক পাড়ে।
এলে রে, বেলে রে,
ফুল ছিঁড়িবা' গেলো রে।
ফুলের মান্‌ডালা ফুল
ছিরি আংটি হাত কাট্॥

এই বলিয়া সকলের উপরের হাতটি নামাইয়া লওয়া হয়। তারপর আবার ছড়াটি বলিয়া সকলের উপরের হাত নামানো হয়। এই ভাবে খেলা চলিতে থাকে।

ঘরে বসিয়া খেলিবার একটি ছড়া এই :

এল্লে ঘুঘু, বেল্লে ঘুঘু
সকল ঘুঘুর চোর।
মাটিয়া ঘুঘু ডিমা পাড়ে
নোটোর আর পোটোর॥
নোট্‌কো রে নটুয়া
ভইবের খটুয়া।

CENTRAL LIBRARY

ভঁইয়ের তলে
বারো বাতি জ্বলে ॥
জ্বলুক বাতি, পুড়ুক ত্যাল—
আম কুড়িতে পাকা ব্যাল।
ব্যাল গেইল্ ফাটিয়া,
চুকাক খাইল্ চাটিয়া ॥

ঘরে বসিয়া খেলিবার ছড়া আরো একটি এই :

নয়া চান্, নয়া চান্,
কাপড়-খেতা ভিড়ি' বান্।
কাপড় নিগাইল্ চোরে,
বগ্‌ধুল্-ধুল্ করে ॥
বগ্‌ধুলক পিটিবার গেনু
ভঁাড়াইস্ সাপের নাগাল পানু।
ভঁাড়াইস্ সাপের বড়য় বিষ
এত্থন খানু ভ্যাড় বিশ ॥

খেলার মধ্যে কেহ হারিয়া গেলে তাহাকে বা তাহাদের ছড়া কাটিয়া ক্ষেপানো হইয়া থাকে। এই ধরণের একটি ছড়া এই :

পালাডি মাইয়া পালায় রে,
কালাই বাড়ী দিয়া রে।
কালাই নিগাইল্ চোরে,
শুকিনা মাইয়া মোরে ॥

যে ছেলে খেলায় হারিয়া গিয়াছে, তাহাকে 'মেয়ে' বলিয়া ধিক্কার দেওয়া হইতেছে। এই ধরণের অপর একটি ছড়া এই :

ঠগালু তে ঠগালু
নাল পুকুটি দেখালু।
নাল পুকুটিত্ এক গুড়ি
ছাওয়া হউক তোর দেড় বুড়ি।
সেই ছাওয়ার বাপ মুই
'—' ফেলা ভাওয়ারী তুই।

CENTRAL LIBRARY

রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে কেহ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে, রঙ্গ করিয়া তাহার বন্ধুরা ছড়া কাটে :

বহু, বহু, বহু,
ইটা বাড়ীত্ পহু।
হাত ধরিয়া অঠা বহু,
তোরে মাইয়া হনু॥

এখানেও দেখা যাইতেছে, যে ছেলে পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে 'মেয়ে' বলিয়া নিন্দা করিয়া তামাসা করা হইতেছে। ঠিক এই ধরণেরই অপর একটি ছড়া পাওয়া গিয়াছে :

পাগ্‌লা নিগায় নাঙ্গল জোঙ্গাল
পাগ্‌লি নিগায় মই।
বেলায় ভিত্তি দেখিতে পাগ্‌লি
চিতোর হয়া পইল্॥

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পথ চলিতেছিল ; কতোখানি বেলা হইয়াছে, দেখিবার জন্য স্ত্রী যখন সূর্যের দিকে তাকাইল, তখন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।

খেলিতে খেলিতে অকারণে কোনো বালককে ক্ষেপাইয়া রঙ্গ করা খুবই সাধারণ ব্যাপার। নিম্নের ছড়াটি তাহার দৃষ্টান্ত :

নাঙ্গট-গাড়ি ধুম্বা
বাপে খাইল্ চুম্বা।
বাপে দিলেক তাড়ি'
যা ভাতারের বাড়ী॥

অর্থাৎ ধেড়ে খোকা উলঙ্গ হইয়া পিতার কোলে উঠিয়াছিল, এই ব্যাপার লইয়া তাহাকে ক্ষেপানো হইতেছে।

বৃষ্টি নামাইবার জন্য বা থামাইবার জন্য বালকেরা অনেক সময় ছড়া কাটিয়া থাকে। নিতান্তই রঙ্গ করিয়া হয়তো একজন বলিল,

আয় রে পানি ঝিম্-ঝিম্।
পাঠা কাটিয়া দিম্ দিম্॥

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন তাহার উল্টা ছড়া কাটিল :

যারে পানি ঘুরিয়া।
শিদল দিম্ পুড়িয়া॥

পূর্বের সেই বালক তখন বলে :

আইসেক পানি ঝাঁকে ঝাঁকে।
শিদল খাবো গাছে গাছে॥

এই প্রসঙ্গে 'নেবুর পাতায় করমচা, হে বৃষ্টি থেমে যা' ছড়াটি স্মর্তব্য।

উপরের ছড়াগুলি হইতে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বালকদের খেলিবার বা রঙ্গ-তামাসার ছড়ার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাইবে।

প্রাপ্ত-বয়স্ক নারী ও পুরুষদের ছড়াও আছে। এ সম্পর্কে ধান ভানার সময় যে ছড়া মেয়েরা বলে, কিংবা চরকা কাটিবার সময় যে ছড়া কাটা হয়, 'কর্মজীবনের' পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা করিয়াছি। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের মন্ত্রধর্মী ছড়ার জন্য 'ওঝালি' গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য। মেয়েদের ছড়ার মধ্যে একটি প্রধান দিক হইল ব্রত-পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে কথিত ছড়া। রাজবংশীদের মধ্যে এইরূপ ছড়া কাটার রীতি দেখি নাই।

সামাজিক দিক দিয়া দেখিলে একপ্রকার ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলির ব্যবহারিক দিকটিই প্রধান। যেমন, নিমন্ত্রণ খাইবার পূর্বে, নিমন্ত্রণ-কারীর কেহ একজন সেখানে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর সে এই ছড়াটি বলে,

উপরে বহে মেঘ-মেঘালি
পবনে বহে বাও।
ঘর মইধ্যে এক পাকোয়ানী
ধীরে ধীরে খাও॥
বলি হে সাধু,
মধুরসে পানি।
হরে হরে জয়॥

অর্থাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিলেও তোমাদের তাড়াতাড়ি খাইবার দরকার নাই, তোমরা ধীরে ধীরে খাও। এইরূপ ছড়া কাটাকে বলা হয় 'ডাকা দেয়া'। সহজেই বোঝা যায় 'ডাক' দেওয়া হইতেই ইহা আসিয়াছে।

কতকগুলি ছড়া আছে, যেগুলি প্রবাদমূলক। 'প্রবাদে-'র পরিচ্ছেদে সেইগুলি আলোচিত হইয়াছে।

॥ ২ ॥

ছড়ার পর ধাঁধার কথা আসে।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত ধাঁধাগুলি জিজ্ঞাসা করিবার ভঙ্গি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে,—সেগুলি আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য একদা রচিত হইয়াছিল। বিবাহ-বাড়ীতে বা অন্য কোনো আনন্দানুষ্ঠানে এখনও সেখানে ধাঁধার লড়াই হইয়া থাকে। অনেক সময় পান খাইতে-খাইতে এই লড়াই হয় বলিয়া কোনো কোনো অঞ্চলে ইহাকে 'গুয়া-কাটা ফাক্‌রি' বলা হইয়া থাকে। এমনও হইয়া থাকে যে, পান তৈরি করিয়া হাতে পান দিয়া, মুখে একটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হইল : এবং সেই সঙ্গে এই কথাও বলিয়া দেওয়া হইল, উত্তর না দিয়া এই পান মুখে দিতে পারা যাইবে না। সুতরাং উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত সেই পান খাওয়া যায় না।

জলপাইগুড়িতে ধাঁধাকে বলা হয়, 'ফাক্‌রি'। সহজেই বোঝা যায় 'ফক্কিকা' হইতে ইহা আসিয়াছে। 'কূট প্রশ্ন করা' এই অর্থে 'ফক্কিকারি' শব্দটি চলিত বাঙলায় চালু আছে।

কেহ-কেহ আবার 'ফাক্‌রি-'কে 'শিলুক-'ও বলিয়া থাকেন। 'শ্লোক' হইতে 'শোলোক' এবং তাহা হইতে 'শিলুক' হইয়াছে। রঙপুর ও কোচবিহার জেলায় আবার 'শোলোক' হইতে 'ছিল্‌কা' হইয়াছে, যাহার অর্থ ধাঁধা নয়,—নীতি বাক্য। সেখানে সুভাষিত উক্তিকেও 'ছিল্‌কা' বলা হইয়া থাকে।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ধাঁধাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[১] যেমন : ১. প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কীয় ২. ফুলফল-তরুলতা সম্পর্কীয় ৩. পশু-পাখী-কীট-পতঙ্গ সম্পর্কীয় ৪. মানুষের দেহ সম্পর্কীয় ৫. ঘরোয়া জীবন ও সাংসারিক বস্তু সম্পর্কীয় ৬. হাট-বাজার সম্পর্কীয় ৭. কোনো একটি বিশেষ দৃশ্য বা কাহিনী-ঘটিত ৮. পৌরাণিক ব্যাপার-ঘটিত। প্রতি ধরণের ধাঁধার পাঁচটি করিয়া উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১ ধাঁধার এই শ্রেণী বিভাগের পরিকল্পনা একান্ত ভাবেই আমার। এই গ্রন্থ ১৯৫০ সনে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং অধুনা প্রকাশিত একটি প্রকাণ্ড ধাঁধা সংগ্রহ-গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগের পরিকল্পনা দ্বারা আমি প্রভাবিত হই নাই। ধাঁধার এইরূপ শ্রেণী ভাগ করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের বহু পূর্বেই আমি একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। দ্রষ্টব্য : উত্তরবঙ্গের ধাঁধা-সংগ্রহ (প্রবন্ধ পত্রিকা: আষাঢ়, ১৩৬৭ : পৃঃ ৮৯-১০৪)।

CENTRAL LIBRARY

১. প্রাকৃতিক জগৎ :

।ক। নোহার জাল, সনার ছিটি।
একশও বগুলার দুইখান পুঁঠি ॥
—উঃ আকাশ, ইন্দ্রধনু, চন্দ্র-সূর্য ও তারা।

জলপাইগুড়ির রাজবংশিগণ এক ধরণের জাল তৈরি করে, সেগুলি দেখিতে চার কোণা। দুইটি বাঁশের বাতা ধনুকের মতো বাঁকা করিয়া আড়াআড়ি ভাবে দিয়া সেই জালটিকে আটকাইয়া রাখে। এখানে, আকাশ হইল জাল, ধনুকের মতো বাতা দুইটি হইল ইন্দ্রধনু। একশ 'বগুলা' অর্থাৎ বক হইল তারা, এবং পুঁঠি মাছ দুইটি হইল চন্দ্র ও সূর্য।

।খ। উত্তরতি হিরির্-গিরির্
দখিনতি বান ;
গোছি মাছটা ডিমা পাড়ে
পাথরের সমান।
আছড়াইতে ভাঙ্গে না,
হাতের টিপ সহে না ॥
—উঃ বৃষ্টির ফোঁটা।

বৃষ্টি পড়িতেছে, উত্তর-দক্ষিণে বান ডাকিয়া গেল। জলের দীর্ঘ ধারা যেন 'গোছি' মাছের মতো লম্বা। সেই জলের ধারা যখন নদীর উপর পড়িল তখন সে একটি বিন্দু—যেন সেই মাছের ডিম। সে ডিম পাথরের মত শক্ত, কেননা, উঁচু আকাশ হইতে পড়িলেও তাহা ভাঙ্গে না। কিন্তু, সে ডিম এতোই পল্‌কা যে হাতের নাড়াও সহে না।

।গ। ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্, ঝিঙ্গার ফুল –
চৌদ্দ আজায় করে মূল।
তাঁহো না পায় ঝিঙ্গার ফুল ॥
—উঃ নক্ষত্র।

দূর হইতে তারাকে ঝিঙ্গার ফুলের মতো দেখায়।

।ঘ। যায় তে যায়, ফিরি' না আসে।
—উঃ নদী।

CENTRAL LIBRARY

।ঙ। হাতী যায় দিম্‌-দিম্‌, ঘোড়া যায় নাপে।
এই শিলুক বুঝি' দে রে বর্মার বাপে॥
বর্মার বাপের নাম ঘোকোলডিং।
এই শিলুক বুঝিতে খাবে চৌদ্দ দিন॥
—উঃ ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প যখন হয়, হাতী দৌড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়।

২. ফুল-ফল-তরু-লতা॥

।ক। গা ছিল্‌-ছিল্‌, পাত ঢেপা,
ফলকিনা তোর থোকা থোকা।
ছয় দরোজা, তিনখান কোঠা
টিকার পাশে থাকে মাথা॥
—উঃ ভেরেণ্ডার ফল।

ভেরেণ্ডার পাতা বেশ বড়ো-বড়ো হয়, থোকায় থোকায় উহার ফল ধরে। এক-একটি ফলের মধ্যে তিনটি বিচি থাকে এবং ছয়টি ভাগ থাকে।

।খ। একনা বুড়ী, সারা গায়ে ফুসুড়ী।
—উঃ কাঁঠাল।

।গ। আজার বেটী কেশেরী—
চুলি মেলে আথারী-পাথারী॥
—উঃ পুঁই শাকের গাছ।

জাঙলার উপর পুঁই শাকের গাছ ছড়াইয়া পড়ে, যেন কেশবতী নারী চুল মেলিয়া দেয়।

।ঘ। একনা বুড়ী খই ভাজে—
মানুষি দেখিলে দুয়ার ঢাকে॥
—উঃ লজ্জাবতী লতা।

।ঙ। হিতি গেনু, হুতি গেনু, গেনু মণ্ডল ঘাট।
একনা কইনা দেখি' আসিনু—
ষোলো সারি দাঁত॥
—উঃ ভুট্টা।

এক-একটি ভুট্টার গায়ে ষোলো সারি করিয়া দানা থাকে।

CENTRAL LIBRARY

৩. পশুপাখী-কীট-পতঙ্গ :

(ক) আট ঠ্যাং, ষোলো গাঁঠু
জাল ফেলাছে শুকান ঠেঁটু।
মাছ না ফান্দে, ফান্দে পানি—
সাকালে উঠিয়া শুকান ঠেঁটু করে টানাটানি॥
—উঃ মাকড়সা।

মাকড়সার আটটি পা, তাহাতে ষোলোটি ভাজ। উহার জালে মাছ পড়ে না, শিশির বিন্দু আটকাইয়া থাকে।

(খ). চাইরটা বোতল আছে মধু ভরা;
কুলুপো নাই, কালাপো নাই,—
আছে উব্‌ড়ি করা॥
—উঃ গোরুর দুধের বাঁট।

(গ) হাট গেলে হাসে কে ?
—উঃ গোরু।

গোরুর বয়স বিচার করিবার জন্য উহার দাঁত বাহির করিয়া দেখা হয়।

(ঘ) অট্‌কট্‌, জট্‌কট্‌—
দুয়ার বান্ধে কট্‌কট্‌॥
—উঃ শামুক।

(ঙ) ঝাড়-বাড়ী হাতে নিক্‌লিল্‌ পেরেত॥
মাথাখান তার স্যাড়েত-ব্যাড়েত॥
—উঃ জোঁক।

জোঁক চলিবার সময় মাথা নাড়াইতে নাড়াইতে চলে।

৪. মানুষের দেহ-বিষয়ক :

(ক) আজার বেটী কামলী—
ভিজিবা' পারি, শুখিবা' না পারি॥
—উঃ জিহ্বা।

জিহ্বা সর্বদাই ভেজা থাকে।

(খ) একনা পোখোরি, মাছ পিল্‌-পিল্‌ করে।
একটুক্‌ কুটুরা পইলে, বড়ো মুস্কিল করে॥
—উঃ চোখ।

।গ। খোকোত্ পাহু, আছেড়ে মাহু।

—উঃ নাকের শিকনি ফেলা।

৫. ঘরোয়া জীবন ও সাংসারিক বস্তু :

।ক। একনা চুয়াত্ মাছ পিল্-পিল্ করে।

জলকেনা শুকালে সোগায় আশা করে॥

—উঃ ভাত সিদ্ধ হওয়া।

।খ। একনা বুড়ী,—

সাকালে উঠিয়া করে

খেহুরা-খেহুরি॥

—উঃ ঝাঁটা।

।গ। ইরকিচি, বিরকিচি—

নাই চোচা, নাই বিচি॥

—উঃ লবণ।

।ঘ। বাই গে বাই,

ঘর আছে তে দুয়ার নাই॥

—উঃ ডিম।

।ঙ। আগ দিয়া বাঘ যায়—

ন্যাটো দিয়া জল খায়॥

—উঃ প্রদীপ-শিখা।

প্রদীপ-শিখাকে বলা হইয়াছে বাঘ। সেই বাঘের লেজ যেন সলিতা। সলিতার তেল টানাকে জল খাওয়া বলা হইয়াছে।

৬. হাট-বাজার সম্পর্কীয় :

।ক। হাট গেলে কানা হয় কে?

—উঃ দইয়ের হাঁড়ী।

দইয়ের হাঁড়ী ঢাকিয়া রাখা হয়,—এই জন্ম দইয়ের হাঁড়ীকে কানা বলা হইয়াছে।

।খ। হাট গেলে চড় খায় কে?

—উঃ মাটির হাঁড়ী।

CENTRAL LIBRARY

।গ। শিলুক শুল্‌কানির মাও—
নাকত্‌ দড়ি, পিঠিত্‌ ঘাও।
হাট যাছে ভকুয়ার মাও॥
—উঃ তুলাদণ্ড।

তুলাদণ্ডের দুই দিকে দড়ি পরানো থাকে, এবং মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। ইহাকেই বলা হইয়াছে নাকের দড়ি ও পিঠের ঘা।

৭. বিশেষ কোনো দৃশ্য বা কাহিনী-ঘটিত ঃ

।ক। চুপুলুং চ্যাং—
চাইর মাথা বারো ঠ্যাং॥
—উঃ গাই দোহানো।

গাই দোহাইবার সময় একজন বাছুর ধরে, অপর একজন দোহন করে। দুইজন মানুষের দুইটি মাথা এবং চারিটি পা; এবং গরু ও বাছুরের দুইটি মাথা, আটটি পা—সব মিলিয়া চারিটি মাথা ও বারোটি পা।

।খ। ধুপ্‌ করিয়া পইল্‌, চুপ কইল্‌।
—উঃ গাছ হইতে ফল পড়া।

।গ। টিকি ধরিয়া আনুং—
আছেড়েয়া পানুং।
দুই ঠ্যাং বেদেরেয়া
ঘোকোর-ঘোকর নাগানুং।
—উঃ ধান গাছ পোতা।

ধানের গোছা-করা চারা আছাড়াইয়া, শিকড়ের আলগা মাটি ঝাড়িয়া ফেলিয়া, দুই পা ফাঁক করিয়া ধান রোপণ করা হয়।

।ঘ। ভরেয়া দিবা' সম্‌ কান্দে, ভরেয়া দিলে হাসে।
—উঃ শাঁখা পরানো।

।ঙ। দুই ঠ্যাং চাড়ায়, দিমু ভরায়;
দিমু ঠাসি', গেইল্‌ ফাটি॥
—উঃ জাঁতি দিয়া সুপারি কাটা।

CENTRAL LIBRARY

৮. বিচিত্র, পৌরাণিক ব্যাপার-ঘটিত :

।ক। তিরি-পুরুষের বাইশটা কান—
এই কথার দিয়া মান
তারপর খাও গুয়া-পান।
—উঃ দশানন রাবণ ও তাঁহার স্ত্রী।

।খ। চিত্-চিত্ পাখেনা—
নাগেয়া দিলে ছাড়ে না।
—উঃ মানুষের নাম।

পিতামাতা একবার সন্তানের নামকরণ করিলে সহজে তাহা পরিবর্তিত হয় না।

। ৩ ।

প্রবাদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া আলোচনা করা যায়।

১ কৃষিজীবন ও প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কীয় প্রবাদ :

কৃষিকর্ম সম্পর্কে কৃষকেরা সাধারণত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রবাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ভালো জমির লক্ষণ কি, কেমন করিয়া জমির আলি বাঁধিতে হয়, কোন্ মাসের কোন্ সময় হইতে বৃষ্টি পড়িতে শুরু করে, কখন হইতে ধান রোপণ করিতে হইবে, কখন ধান কাটা উচিত—এ সকল ব্যাপারেই তাহারা প্রবাদ ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। নীচে জলপাইগুড়ির রাজবংশী-সমাজের কয়েকটি এই ধরণের প্রবাদ দেওয়া হইল :

খুর-খুর চাষ
লক্ষীর বাস।

অল্প অল্প করিয়া চাষ করিলে জমিতে ধান ভালো হয়।

ঠেলা-গোরুর পেলা ধান।
দৌড়া-গোরুর নেউড়া ধান।

ঠেলিয়া লাঙল লইয়া যে বলদ চলে, সেই বলদ অনেক ধান ফলাইতে পারে। যে গোরু দৌড়াইয়া চলে, লাঙলের ফাল মাটিতে অধিক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে না, ফলে ফলনও ভালো হয় না।

হালুয়াক দেখিয়া যায় বয় হাল।
তার দুঃখো চিরকাল।

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ অপর কৃষকের দেখাদেখি যে চাষ করে, নিজের গরজে করে না, তাহার ফসল ভালো হয় না।

হালুয়ার চিন্ আইলের দাতিত্।

অর্থাৎ কৃষকের কৃষিকর্মের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় আলি বাঁধার মধ্যে।

চোশা গোরু হালুয়ার বৈরী।

অবাধ্য গোরু কৃষকের শত্রু।

আগ ধায়া বান্ধে আলি।
তাঁয়ে খায় শোল-বহালি॥

আগে যে আলি বাঁধিতে পারে, সে শোল-বোয়াল মাছ খাইতে পারে অর্থাৎ লাভবান হয়।

ধান হইল্ বড়ো ধন, আর ধন গাই।
কিছু ধন সনা-উপা, আর সব ছাই॥

ধান ও গোধনই কৃষকের বড়ো সম্পদ।

হালুয়ার হাল, জালুয়ার জাল
অউদে, বাতাসে, জলে তার
পিঠি হয় লালে লাল।
সগায় তাক দেয় গাল—
আরো ভুলিবা' দেহার ছাল॥

প্রাকৃতিক জগৎ ও আবহাওয়া সম্পর্কেও প্রবাদ আছে।

যদি পইল্ জ্যাঠ্—
দেওয়ার মাথা হইল্ হ্যাট্॥

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ করে।

ফাগুন মাসের জাড়ে
ভৈষের শিং নড়ে॥

ফাল্গুন মাসের শীতে মহিষও কষ্ট পায়।

২. মনুষ্য-চরিত্র সম্পর্কীয় প্রবাদ॥

চিলাদাঁতী, খড়মপায়া, সাপ-নেঙ্গা চুল।
হাতে হাতে গাওয়াইলেক বানিয়ার জাতিকুল॥

CENTRAL LIBRARY

যাহার দাঁত সরু, পায়ের মধ্যভাগ উঁচু এবং চুল অল্প, সেই রমণী সত্বর বিধবা হয়।

ধনী ধনী মেলা
আন্ধা ভাতোত্ দিল্ ঠেলা।
ডাইল-তোরকারি খাউক বেশি
তাও মারি'ফেলাইল্ খাসি।
প্যাট ভরতি খাইল্
সল্ফে-সল্ফে দিন কাটাইল্।
নিধনীয়া গেইল্ ধনীর পাছ
পুছা-গোৎসা দূরে থাক্
ধর ডাউকী, মার মাস।

ধনীকে ধনীই আদর করে, কিন্তু নির্ধনকে করে না।

জাতে না ছাড়ে জাতের পানি
হল্দি না ছাড়ে অং।
সাত ধোয়া দি শুকটা আন্দো
তাও না ছাড়ে গন্।

অর্থাৎ হলুদ ও শুকনা মাছের রঙ ও গন্ধ যায় না।

মাছো মইধ্যে উই
শাকো মইধ্যে পুঁই।
ভাইলো মইধ্যে ঠাকুরি
ইষ্ট মইধ্যে শাশুড়ী।

শাশুড়ীকে এখানে খুব সম্মান দেওয়া হইয়াছে।

মাও গুণে ছাও, কুলা গুণে বাও

মা ভালো হইলে সন্তানও ভালো হয়। প্রায় ওই ভাবেই অপর একটি প্রবাদ এই :

দই কিনি যায় মারত্ খাল।
কইনা আনি যায় মাওটা ভাল্।

CENTRAL LIBRARY

অল্প-অল্প বৃষ্টি যেমন বাড়ীর অঙ্গন পিছল করে, তেমনি যে অপরের কান ভারি করে, সে সংসারের শান্তি ব্যাহত করে :

আগিনা নষ্ট করে ছিম্-ছিম্ পানি।
ঘর নষ্ট করে কান-ভাঙ্গানী॥

গর্ব করা তাহারই সাজে, গর্ব করিবার মতো গুণ আছে যাহার। কুলা কোনো বস্তুকে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু যেহেতু চালুনিতে ঝাড়িতে গেলে সবই পড়িয়া যায়, সেই হেতু উহার গর্ব করা সাজে না :

কুলা যে গরব করে, ঝাড়ি'পছরি' তোলে।
চাল্নি যে গরব করে দের্-দেরেয়া পড়ে॥

বৈদ্যের মাতা রোগী, কামারের দায়ে ধার থাকে না, সূত্রধরের ঘর ভাঙা এবং তাঁতীর ছেলে বস্ত্রহীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার যাহা সর্বাগ্রে প্রাপ্য সে তাহা পায় না :

বৈদ্যের কাতলা মাও
কামারের ঘেচ্‌কাটা দাও।
ছুকরন্দের ভিজে মাথা
তাঁতীর ছাওয়ার গালাত্‌ কেঁথা॥

ঘোড়া দেখিলেই খোঁড়া হইবার মতো লোক দেখিলে কাজের কথা মনে পড়ে :

ঘাটাত্‌ পাইলং কামার।
দাও গড়ে' দাও হামার॥

যে দোষ করিল, সে পলাইয়া গেল, শাস্তি পাইল অপর একজন নির্দোষ :

ধান খায়া গেইল্‌ হাতী
ছামের গালাত্‌ দড়ি॥

যে লোক মুখে কথা বলে বেশি, দেখা হইলে ভক্তিকরে বেশি, তাহারাই সুবিধা পাইলে অনিষ্ট করিয়া থাকে :

মুখে চুপুড়িচাটাং, বসনে ফড়িফাটাং
দেখা হলে লম্বা সেলাম দেয় ;
সুবিধা পালে দেহার ছাল্‌টা তুলে
যাবার কালে দাগা দিয়া যায়॥

CENTRAL LIBRARY

কলহপ্রিয় রমণী কলহের উপলক্ষ না পাইলে শিমুল গাছের সহিত গা ঘষিয়া সেই শিমুল গাছের সহিতই ঝগড়া করিয়া থাকে :

কন্দলী বুড়ী কন্দল না পায়।
শিমিলার গছত্ টিকা ঘচলায়॥

ছোটোলোকের কথাই সার, পাকুড়ের পাতার যেমন কাঁপুনিই সম্বল :

ছোটোলোকের বড়ো কাথা।
ফড়্-ফড়্ করে যেইনং পাখুড়ির পাতা॥

৩. নীতিমূলক প্রবাদ :

অধিক উঁচু হইলে বাতাসে পড়িয়া যায়, অধিক নীচু হইতে ব্যাঙেও লাথি মারে :

অধিকো ঢাঙ্গা না হও বাতাসে হেলায়।
অধিকো খাটো না হও ব্যাঙে নেদায়॥

এক-একটি রসুনের মধ্যে অনেকগুলি কোষ থাকিলেও সেই সবগুলি মিলিয়া একটি রসুন ; কিন্তু একটি পেঁয়াজের মধ্যে অনেকগুলি স্তরের আবরণ থাকিলেও একতা নাই। অর্থাৎ ভিন্নতা থাকিলেও একতা থাকা সম্ভব :

অসুনে অসুনে গোটা।
পিঁয়াজি ফেরকেটা॥

কপালে যাহার দুর্গতি আছে, দানধর্মে সেই দুর্গতি যায় না, স্নান করিলে যায় না পাপ :

দানে দুর্গতি না খণ্ডে।
ছিন্নানে না খণ্ডে পাপ॥

বড়ো মানুষের ধন না থাকিলেও বড়োত্ব নষ্ট হয় না :

মহতের ছাওয়া যদি হয় ধনে হীন।
তেওঁ না ছাড়ে তাঁয়ে মহতীয়া চিন্॥

যে একমুখে অনেক কথা বলে, সে ঘৃণ্য :

যার কাথা এক, তাঁয়ে স্বর্গে-মর্ত্তে নাগে ঠেক।
যার কাথা দুই, তাক টানিয়া ছতি থুই।
যার কাথা তিন, তাক দেখিতে নাগে ঘিণ॥

CENTRAL LIBRARY

নিজের কানে না শোনা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করিতে নাই :

যাক নাই শুনো আপন কানে।
তাক নাই পইতাও গুরুর কওনে॥

৪. কাহিনীমূলক প্রবাদ :

ভাগ্যে যাহার বিপদ লেখা নাই, বহু বিপদেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। একদিন একটি বিলের মাছ বন্যার জলে হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়াছিল, এক হাড়ী তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল এবং এক কাঠা ধানের বদলে মাছটিকে বিক্রয় করিয়াছিল। ক্রেতা যখন মাছটিকে কাটিতেছিল তখন হঠাৎ একটি চিল আসিয়া মাছটিকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। চিলটি যখন মাছটিকে লইয়া সেই বিলের উপর দিয়া যাইতেছিল, মাছটি তখন হঠাৎ পড়িয়া গেল। অর্থাৎ বিলের মাছ বিলেই ফিরিয়া গেল :

যাঁয় নাই খায় টিপ্‌টিপার ঘাও
তারে আগোত্‌ যায়া টিপ্‌টিপাও।
একদিন উঠিনু মুই জ্যাঠ্‌ মাসের বানে
হাড়ী বেটা ব্যাচেয়া খাইল মোক
এক কাঠা ধানে।
ধুলাত নটপটিয়া কাটিল্‌ কানকাশা ;
চিলা বেটা দেখাইল্‌ মোক
স্বর্গে-মর্তে তামাশা।
যে গুণে চিলা বেটা
মোক নিয়া গেইল্‌ বিলে—
ঝটপটিয়া কোপালগুণে
পড়িনু আবার জলে।

প্রবাদটি বলিবার সময় কেবল প্রথম দুইটি সারিই বলা হয়।

৫. সামাজিক, পারিবারিক, বিচিত্র :

যাহার সামান্য ধান নাই, তাহার জন্য ঢেঁকি আনা মূঢ়তা :

বিল্‌কানিত্‌ না আটে ধান।
তার ভানে ছাম-গাইন আন্‌।

CENTRAL LIBRARY

এদিকে ধান নাই, ওদিকে ধান মাপিবার 'দোন' (বাঁশের তৈরি ডালি বিশেষ)-টি বৃহৎ, অর্থাৎ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি :

ধান নাই তার দোন বড়ো ॥

রাজবংশীদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চলিত আছে। একটি প্রবাদে বলা হইতেছে, একটি বউই পালন করিতে পারে না, আবার তাহার উপর একটি বিধবা-বিবাহ করিতে চায় ; অর্থাৎ যাহার আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা নাই, সে চায় শৌখিনতা করিতে :

পুবিয়া-পছিয়া বায়ে নড়ে ভাতের হাঁড়ী।
একনা মাইয়া পুষি'র না পায়,
আরো চান্দায় আড়ী ॥

ঠিক এই ভাবেরই অপর একটি প্রবাদ এই :

তিত্ কইল্লার পাত—
এক মগীর ভাত দিবা' না পারে
আর এক মগীর সাধ ॥

নদীতে জল নাই, মাছ নাই, তবু বক মাছের প্রত্যাশা করিতেছে, অর্থাৎ অসম্ভব জিনিস প্রত্যাশা করা :

খাল-বিলত্ জল নাই,
বগুলা শসারী ॥

কেহ 'পাকা ধানে মই দিলে' বলা হয় :

বাপই, তোর য্যানং গুণ—
আন্দা শাগত্ তুই দিস্ নুন ॥

প্রয়োজনীয় বস্তুর তুলনায় প্রয়োজনীয় বস্তু বেশি থাকিলে বলা হয় :

ভাত ভাজিবার খোলা নাই,
আধা ছয় বুড়ি ॥

কিংবা,

কপালে নাই তোর সিন্দুক,
ছোড়ানির ঝোপ।

'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি' হইলে বলা হইবে :

ছাওয়ার মাও না কান্দে, বাপ না কান্দে,
কান্দে গাঁওর নাউয়া ॥

17414

কলিকাতা বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

উন্নতিকামী মানুষের পরিচয় শৈশবকালেই পাওয়া যায়, যে তুলার গাছে তুলা হইবে, চারা গাছ দেখিয়াই তাহা বুঝা যায় :

যে বাঙ্গা ফলে,—
তার দোপাতারিতে চিন্ ॥

'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়', তাহা হইলে মানুষ আকাশ-পাতাল হাঁটিয়াও চেষ্টা করে :

যদি থাকে মনত্,
থাকে না কেনে দেশের কোণত্ ॥

'কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই' এই ভাব জানাইতে :

উদে মারে মাছ, খাটাসে করে তিন ভাগ ॥

খরচ বেশি হইলেও কাজ ভালো করিয়া করিতে হয়। মেয়ের বিবাহ দিবার সময় খরচ বেশি হইলেও সমর্থ পুরুষ দেখিয়া বিবাহ দেওয়া দরকার, নয়তো অল্পদিন পরেই বিধবা মেয়েকে পুনরায় বিবাহ দিবার খরচের মধ্যে পড়িতে হয় অর্থাৎ 'পেনি ওয়াইজ, পাউণ্ড ফুলিশ' :

বুড়া বর মাইক দিনু,
কাজত্ কোন না করনু
একবারের কাম দুইবার করনু ॥

॥ ৪ ॥

লোক-সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হইল 'কথা'। 'কথা' বিভিন্ন রকমের হইতে পারে : রূপকথা (উপকথা), নীতিকথা,- ব্রতকথা। 'কথা'-সাহিত্যকে মোট দুই ভাগে ভাগ করা চলে : এক, আনুষ্ঠানিক, যেমন—ব্রতকথা। দুই, অনানুষ্ঠানিক, যেমন,—রূপকথা (উপকথা), নীতিকথা।

প্রথমে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ব্রতকথা সম্পর্কে বলা যাইবে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সকল ব্রতেরই 'কথা' নাই। একটি ব্রত আছে, যাহার 'কথা' গদ্য করিয়া না বলিয়া গান করা হয়,—যেমন যাইটোনের ব্রতকথা। গানখানি বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে এবং ভক্তিগীতির অধ্যায়ে ইহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

নীচে জলপাইগুড়ি জেলায় চলিত দুইটি ধর্মীয় 'কথা' দিলাম। পূজার সময় কেন শঙ্খ বাজানো হয়, সে সম্পর্কে রাজবংশীদের মধ্যে একটি গল্প চলিত

CENTRAL LIBRARY

আছে। বাড়ীর তুলসীতলায় কোন পূজা করিবার পর, গল্পটি কথিত হয় :

"অ্যানেক দিন আগত্ একটা নোক অধিকারীর মন্তর শিখিছে। অয় ঠাকুর‍ক স্থাবা দিলে, ঠাকুরটা আসিয়া চকরটাত্ বসিয়া স্থাবা খায়। সগায় এই বাদে অধিকারীক ডাকায়। একদিনা ত্থাশের আজাটা আরো শুনিচে অধিকারীর কাথা। অয় বোলে স্থাবা দিলে ঠাকুরটা আসিয়া স্থাবা খায়। আজাটা সেলা হুকুম দিলেক, যাও অধিকারীটাক ডাকায় আনো। অধিকারীটা সেলা হাল বহাবার ধইচ্চে। আজার নোকটা আসিয়া অধিকারীক কহচে, চল্, তোক আজায় ডাকাইসে। আজার বাড়ীত্ স্থাবা দিবা' নাগে। অধিকারীটা কহছে, মুই যাবা' ন' হাও। এইনং স্থাবা দিয়া মোর গিরস্তি কাম ন' হয়। আজার নোক কহচে, মুই তোক হাল বহবার বাদে একনা নোক আছুঁ। তুই যত্ক্ষণ স্থাবা দিয়া নাই আসিস্ ততক্ষুণ অয় তোর হাল বহিবে। অধিকারীটা সেলা আজার বাড়ীত্ গেইল্ স্থাবা দিবা'। ঠাকুর দেখিবার বাদে ওইঠে ঢেরলা মান্ষি গট হইসে। অধিকারীটা মন্তরে কহচে, ঠাকুরটা ভাবেছে খোপ,—এতোলা মান্ষির আগত্ যায়া কেনং করি' খাইম। ঠাকুর না আসে। হিতি হালুয়াটা হাল বভা' ধইচ্চে, হালো ছেড়িয়া দিবা' না পারায়। বেলা হইল মই-জুড়ানি। ঠাকুরটা সেলা ভাবেচে, ঢের মান্ষি কষ্ট পাছে মোর বাদে। হিতি আরো অধিকারীর মনটা আউলি যাছে তো যাছে, ঠাকুরটা কেনে বা না আসে। ঠাকুরটা সেলা আসিল্; তামান মান্ষি দেখিল্। স্থাবা দিয়া অধিকারীটা সেলা বাড়ীর মুখত্ আইসেছে। ঠাকুরটা আধা ঘাটাত্ অধিকারীক কহচে, স্থাখ বা', মুই সোদায় তোরঠে আসিব' পারু' ন' হায়। তুই একনা কাম করেক, মোর এই শংটা নে তুই। স্থাব-পূজা সাজায় সেলা শংটাত্ তুই ফুঁক নাগাইস। ওইঠে হাতে মুই শুনা' পালে তোর স্থাবা মুই ওইঠে হাতে খাইম। ঠাকুরটার কাথা শুনিয়া অধিকারীটা শংটা নিলে। ঠাকুরটার নগত্ দোসরা মন্তর পালে। এই মন্তরটা শুনা' পালে ঠাকুরটা স্থাবার গোড়ত্ নাই আইসে, কিন্তুক শংটাত্ ফুঁক দিলে ঠাকুরটা ওইঠে থাকি' পূজা-পানি খায়।"[১]

১ 'জনমত' পত্রিকা (জলপাইগুড়ি)

CENTRAL LIBRARY

সরল বাঙলা করিলে কাহিনীটি এই হয় : একজন পুরোহিত (অধিকারী) ছিল। সে পূজা করিলে স্বয়ং ভগবান আসিয়া পূজা গ্রহণ করিতেন। দেশের রাজা তাহা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেক মন্ত্র আওড়াইবার পর সেদিন ভগবান আসিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, রোজ-রোজ পূজা গ্রহণ করিতে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি বলিলেন, পূজার পর শঙ্খ বাজাইতে, শাঁখের শব্দ শুনিয়া স্বর্গ হইতেই তিনি পূজা গ্রহণ করিবেন।

জিতাষ্টমী বা 'জিতুয়া'-র সময় বলা হয় 'জিতুয়া'-র ব্রতকথা। এই ব্রতকথাটি 'জিতুয়া'-র পরিচ্ছেদে সংকলিত হইয়াছে। সন্তান কামনায় নারীরা এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন করা হয় 'অথাই-পথাই' ব্রত। পরিবারস্থ সকলের অটুট স্বাস্থ্য কামনায় এই ব্রত করা হয়। এই ব্রত করা হয় সন্ধ্যা বেলায়, কোনো পথের উপর। রাখালরা এই পূজায় পৌরোহিত্য করে। রাত্রিবেলা সকলে নির্ভয়ে ও নিরাপদে যেন পথ চলিতে পারে, ইহাও এই ব্রত করিবার অপর এক উদ্দেশ্য। পথের মাঝে 'বিন্না'ঘাসের ঝোপ স্থাপন করিয়া, এবং তাহার পার্শ্বে একটি গোরু খেদাইবার লাঠি রাখিয়া, বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সহকারে এই পূজা করা হয়। 'বিন্না'র ঝোপের উপর চন্দ্রাতপের মতো করিয়া একটি ছাতা মেলিয়া দেওয়া হয়। পূজার পর এই ব্রতকথাটি বলা হয় :

"সুখিনী-দুখিনী দোনো বইনি। দোনো বইনি হাট যাছে। দুখিনীটা বড়ো বইনি। সুখিনীটা কহচে, 'হা' গে বাই, তুই কার বলে হাট যাছিত্—
—অথের বলে, না পথের সুকে ?'

ছোটো বইনি সুখিনী কহিল্, 'বাই গে বাই, হাট যাছুঁ পথের সুকে। তুই আরো যাছিত্ কার সুখে ?' এই কাথা কহিবা' সাত-সাত সুখিনীর ঠ্যাং-গাও অবশ হয়া গেইল্। দোনো বইনি সেলা কান্দিবা' ধইল্।

সেলা একঝন নোখোলিয়া ওইঠে আসিয়া দোনো বইনিক পুছিলেক, 'তমরা কাঁয়। কিতায় ভানি তমরা কান্দি'র ধইস্‌সেন ?'

দুখিনী-দুখিনী সেলায় অমহার তামান কাথা কহিল্। নোখোলিয়াটা সেলা কহিল্ অথাই-পথাই স্তাবা করিবা'।

CENTRAL LIBRARY

সুখিনী-দুখিনী দোনো বইনি সেলায় নোখোলিয়াক পুছে, 'কেনং করি' অখাই-পখাই স্যাবা দিবা' নাগে?'

নোখোলিয়া কহিল, 'নাগে একনা বিয়ার গছ, বাঁশের ছাতি একনা, আর পেনাটি নাগে একটা। খরচ করিবা' নাগে, বিচিয়া কলো, কাঁঠোল, নোটকো, ভাউহা, চুচিলা, পিঁয়াজি, চুঁড়া, দহি, মিঠাই, সেন্দুর আর ধুপ। একটা নোখোলিয়াক দি' স্যাবা দিবা' নাগে। নোখোলিয়াটাক গিলিবার নাগে আর এইলা কাথা কভা' নাগে।'[১]

এই ব্রতকথা শুনিবার সময় শ্রোতারা মাঝে মাঝে সমস্বেত ভাবে বলে 'হু'।

হোলির সময় বলা হয় 'চুলিয়া' বা 'ধুলিয়া' রাজার গল্প। হোলির পরিচ্ছেদে গল্পটি সংকলিত হইয়াছে।

কেহ রাতকানা হইলে ওঝা পূজা করিবার পর একটি কাহিনী বলেন। ওঝালি গানের আলোচনা প্রসঙ্গে সেটি বলিয়াছি।

আনুষ্ঠানিক ব্রত-কাহিনীগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল ঐহিক সুখশান্তি কামনা। সে লক্ষণ উপরের ব্রত-কাহিনীগুলি পড়িলেই লক্ষ করা যাইবে।

এইবার অনানুষ্ঠানিক কথা-সাহিত্যের কথা বলি। রূপকথা (উপকথা) পর্যায়ের কিছু-কিছু রচনা বহুদিন পূর্বে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ, বিশেষতঃ রঙপুর জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 'নাদিম পরামানিকের পাঁঠা',[২] 'জগন্নাথী বিলাই',[৩] 'নাটামানিক বান্দা-কাটা'[৪] এবং 'বাহা সে বান্ধব'[৫] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে 'নাদিম পরামানিকের পাঁঠা' প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের এক প্রিয় উপকথা। বিভিন্ন অঞ্চলে উপকথাটি চলিত আছে। ইহার কাহিনী সংক্ষেপে এই : নাদিম নামীয় এক ধূর্ত ব্যক্তির একটি পাঁঠা ছিল, ধূর্তের নিকট থাকিয়া পাঁঠাটিও ধূর্ত হইয়া উঠে। একদিন জঙ্গলে ঘাস খাইতে গিয়া

১ 'জনমত' পত্রিকা (জলপাইগুড়ি)

২ রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৬, প্রথম সংখ্যা

৩ রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭, দ্বিতীয় সংখ্যা

৪ রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, দ্বিতীয় সংখ্যা

৫ রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯ প্রথম সংখ্যা,

CENTRAL LIBRARY

সে পথ হারাইয়া ফেলে। তারপর কিরূপে একটি চিতা বাঘ ও একদল শৃগালের হাত হইতে সে রক্ষা পাইল, কাহিনীতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

রূপকথা (উপকথা) গদ্যে বলা হইলেও মাঝে মাঝে উক্তি-প্রত্যুক্তির কিছু-কিছু ছড়া বা গানে দেওয়া হয়। বর্তমান রচনা টিতেও ইহা মিলে

'জগন্নাথী বিলাই' আর একটি উপকথা (রূপকথা)। এক ধূর্ত ও ঝগড়াটে বিড়ালকে শাস্তি দিবার জন্য বাড়ীর লোকেরা উহার গলায় শুক্‌না মাছের মালা পরাইয়া বনে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। বিড়াল সেই শুক্‌না মাছ খাইতেও পারে না, ছিঁড়িতেও পারে না। বনে অনেক ইঁদুর ছিল, কিন্তু গলায় শুক্‌না মাছের মালা থাকিবার জন্য সে ইঁদুরও খাইতে পারে না। এক ইঁদুর তাহা লক্ষ করিয়া কহিল, তুমি কেন ইঁদুর খাইতেছ না? বিড়াল কহিল, সে ধার্মিক সাজিয়াছে। ইঁদুর তাহা শুনিয়া বিড়ালের পদধূলি লইবার জন্য কাছে আসিতেই বিড়াল তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। পরে অবশ্য ইঁদুরনীর সহায়তায় ইঁদুর মুক্তি পাইল। এইরূপে ধূর্ত বিড়াল জব্দ হইল।

'নাটামাণিক বান্দা-কাটা' কথাটি একটি প্রেম-কাহিনী। ইহাতে বিশেষত্ব তেমন কিছুই নাই। 'বাহা সে বান্ধব' কথাটি প্রেমকে ভিত্তি করিয়া রচিত একটি নীতি-কথা। রূপকথার (উপকথা) মতো ইহাতে একটি রাজপুত্র আছে, হঠাৎ একটি যুবতী কন্যার সাক্ষাৎও মিলে ইহাতে, তারপর যথারীতি ঐই রাজপুত্র ও ধনীকন্যার পরিণয়ে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। কাহিনীটির মধ্যে একটু নীতি-কথা আছে। তাহা এই :

রাজপুত্র একদিন শিকার করিতে করিতে বহুদূর চলিয়া যায়। ক্লান্ত হইয়া এক দীঘির পারে সে বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। শ্রান্তি দূর হইলে সে আপন মনে গাহিল,

দীগ্‌ঘি সে সরোবর, চন্দ্রে সে দীপ।
ভাই সে বান্ধব, আর তিরী সে রসিক॥

নিকটেই ছিল কন্যা। সে উত্তর দিল,

মেঘ সে সরোবর, আন্ধি সে দীপ।
বাহা সে বান্ধব, অয়ে সে রসিক॥

অর্থাৎ দীঘি ক্ষুদ্র, মেঘ হইতেই সে জল পায় : চোখ না থাকিলে চন্দ্রের

CENTRAL LIBRARY

শোভা মিথ্যা; ভাই চিরদিন বান্ধব থাকে না, আপনার বাহুবলই প্রকৃত বান্ধব এবং স্ত্রী রসিক নয়,—রসিক অন্ন।

উপরে উল্লিখিত উপকথা-রূপকথাগুলির মধ্যে দেখা যাইবে, এইগুলি কাল্পনিক কাহিনী হইলেও ইহাদের কল্পনা বাস্তব মাটি ছাড়িয়া বেশি দূরে যাইতে পারে নাই। রূপকথার নায়িকা ধনীকন্যা হইয়াও আপন হাতে তরকারির গাছে বারি সিঞ্চন করে। রূপকথাগুলির মধ্যে কল্পনার যে একটা উদ্দাম ও বল্গাহীন বিহার লক্ষ করা যায়, বর্তমান রূপকথার মধ্যে তাহা নাই।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে আরো এক ধরণের 'কথা' প্রচলিত আছে। নিসর্গজগৎই এই 'কথা'গুলির বিষয়। সাধারণত ঠাকুরমা-দিদিমারাই সন্ধ্যাবেলা এই 'কথা'গুলি বলিয়া থাকেন। এই জন্য এই সকল কথা-কে বলে 'আবোর ধান ধুপুরি' বা 'আবোর ধান ধুপ্‌রি' অর্থাৎ 'ঠাকুরমার ঝুলি'। নীচে এই ধরণের কয়েকটি 'কথা' দেওয়া হইল :[১]

১ ঠাকুরমা সপ্তর্ষিমণ্ডল সম্পর্কে বলিতেছেন :

হুই সাতটা তারা গোল হয়য়া বসি' আছে। অক্ কহে সাত ভাইয়া। হুলা তারা ডুবিবা'ন' হায়। নড়াচড়া করিবা' ন'হায়। হুলা তারা চুপ করিয়া বসিয়া অভে। সাত ভাইয়া টেপ্‌সিয়া, সাতঠে আছে বসিয়া॥

২ ঠাকুরমা 'কালপুরুষ' সম্পর্কে বলিতেছেন :

হোর্ ভাখেক সারি করিয়া থাকিয়া আছে তিনটা তারা। হুটাক আরো বলে কড়া-কাটিয়া তারা (কালপুরুষ)। পইসাঞ্জে আগাতি (পূর্বদিকে) উঠিবে, আর সাকালে পছিমতি (পশ্চিমদিকে) দেওয়াটার পোড়ত্ যায়য়া ডুবিবে॥

৩ ঠাকুরমা 'সন্ধ্যাতারা' সম্পর্কে বলিতেছেন :

হোর্ দ্যাখ্, পছিমতি বড়ো তারাটা কেনং ডপ্‌ডপ্ করি' জ্বলেছে। হুটাক কয় বোলে পইসাঞ্জিয়া তারা। হুটা পইসাঞ্জে উঠে আরো পইসাঞ্জ গুজুরিলে ডুবিয়া যায়॥

৪ ঠাকুরমা 'রামধনু' সম্পর্কে বলিতেছেন :

১ 'কথা'-গুলি ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে গৃহীত। এ জন্য তাঁহার প্রতি ঋণ স্বীকার করিতেছি। পূর্বোদ্ধৃত 'অথাই-পথাই'-এর ব্রতকথাটিও তাঁহার সংগ্রহ হইতে লওয়া।

CENTRAL LIBRARY

হোব্ জাথ্, আগাতি উঠিসে 'মেঘের-ঘাটা' (রামধনু)। হুটাক আরো বলে, 'বাক্-ধুম্কা' (রামধনু)। বাক্-ধুম্কা উঠিসে, এলায় জল আসিবে। বাক্ধুম্কাটা বেঁকা হয়া নদীটাত্ হালি' পইছে। নদীহাতে টানি' জল অঠাচে। যেইলা জল টানি' আঠাল্, ওইলা সেলা দেওয়া হাতে পড়েচে। বাক্-ধুম্কার তিনটা অং আছে—প্যাল্কাতি (নীলাভ), হোল্দিয়া, আর নীল। আরো বাক্-ধুমকাটা দেওয়ার গা'ত্ (মেঘের উপর) বেশিখন না নহে। পানি পড়িল্, উয়াও পালাইল্। মান্ষিলা খোপ করি' দেখুক, বাক্ধুমকাটা দেওয়ার নগত্ মিটিয়া (মিলাইয়া) গেইল্। যেলা পানি উছুলিবা' ধরিবে' সেলায় উয়ায় পালাবে॥

৫ ঠাকুরমা একসঙ্গে রৌদ্র-বৃষ্টি (কানা-মেঘা) হওয়া সম্পর্কে বলিতেছেন :

হাড়িয়া কোণাত্ (বায়ু কোণে) জল পইল্। আগাতি (পূর্বদিকে) জল আসিল্ নাই। হিলা কানা-ম্যাঘা। কুন্তি পানি হইল্, কুন্তি হইল্ নাই। চিকালুর বাড়ীত্ জল পড়েছে, তো হুই দোলাবাড়ীত্ (ধানের জমিতে) জল নাই পড়ে। নগতে আসিল্, নগতে গেইল্। হুতি আরো সেলা দেখা যাচে ওউদ। ওউদও আছে, জলও আছে। সেলায় কালা শিয়ালটার বিহো হচে॥

৬ ঠাকুরমা 'বায়ুকোণের মেঘ' সম্পর্কে বলিতেছেন :

হাড়িয়া কোণত্ (বায়ুকোণে) একখান কালা কিল্-কিল্ ম্যাঘ নাগিছে, দেখিচিত্। এলায় হাড়িয়া কোণত্ দেওয়া ডাকিবে। ওইঠে একটা বুড়া আছে। আর উয়ার বুড়ীটা আছে কাংক্র কোণত্ (অগ্নিকোণে)। বুড়ীটা এলা বুড়াটাক ডাকাবে। বুড়ীটা সেলায় কভে (কহিবে) বুড়াক ডাকিবা'। সেলা বুড়াটা ধরিবে সাজিবা'। উয়ার নগত্ সাজিবে তামান বীরলা। মেঘা আরো মেঘী সাজিয়াও বুড়ার নগত্ গিরিজিবে। গছ-বিরু (বৃক্ষ-গাছ ইত্যাদি) ঘর-বাড়ী ভাঙ্গি' দিবে। যেলা খোপ বাতাস উঠিবে, সেলা হবে দুন (ঝড়)। দুন-পানি হলে সেলা পড়িবে পাথর (শিলা)। সেলা দিবা' নাগে তিস্তা-বুড়ীটার দহাই। বুড়া আর বুড়ীটা এখেটে হয়া মেঘা আর মেঘীক পাঠাইল্। হুমুরা যায়া দেওয়া চিল্কাইল্, দিমিত-দিমিত্ করিয়া পানি পড়িল॥

CENTRAL LIBRARY

এই ধরণের 'কথা' প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের খুবই পাওয়া যায়। ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ গ্রহ-তারা-নক্ষত্র সম্পর্কে এই অঞ্চলের আহেল বাসিন্দাদের ধারণা কিরূপ, এই সকল কথার মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় মিলে॥

॥ ৫ ॥

উপরে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার (গান ছাড়া) একটি রূপরেখা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইল। বাহির হইতে বিচার করিলে, সংগীতের সংগ্রহ-গ্রন্থে ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ-কথার আলাচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা থাকিলে রাজবংশী লোক-সংগীতগুলির রস-গ্রহণের পথ সুগম হইবে। এই দিক হইতে দেখিলে উপরের ছড়া-প্রবাদ-কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর মনে না হইতেও পারে।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে আরো কতকগুলি গান গীত হইয়া থাকে,—যাহা বর্তমান সংকলনে গ্রথিত হয় নাই। সেই সকল গানগুলি কি এবং কেমন, এবং কেনই বা তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে সংযোজিত হইল না, তাহার কারণ এইখানে বলিতেছি।

পরিত্যক্ত গানগুলির মধ্যে তিন ধরণের গানের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা, বিষহরির গান (মনসা ভাসানের-গান), কুশানীর গান (লব-কুশের কাহিনী, রামায়ণ অবলম্বনে) এবং সত্যপীরের গান।

বিষহরির গান রাজবংশীদের সব চেয়ে প্রিয় গান। শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, চূড়াকরণ প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় বিষহরির গান গীত হইবেই। সারা বছর ধরিয়াই ইহা গীত হইতে পারে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল—গৃহদেবীরূপে বিষহরির উপাসনা। ইহা বঙ্গদেশের অন্যত্র কোথাও চলিত আছে কিনা, জানি না। বিষহরি বিবিধ রকমের আছেন, পূর্বের অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

বিষহরির গান বিভিন্ন রকমে করা যাইতে পারে। এক, নাচিয়া-গাহিয়া, অভিনয় করিয়া, মনসা-পাঁচালি গাওয়া যাইতে পারে। দুই, পুতুল-নাচের মধ্য দিয়া মনসা-কাহিনী উপস্থাপিত হইতে পারে। শেষোক্তরূপে মনসা-কাহিনী উপস্থাপনা করিবার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম।

CENTRAL LIBRARY

কাহিনী কিন্তু সর্বত্র এক এবং পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে চলিত মনসা-কাহিনীর সহিত অভিন্ন। তবে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটিই গীত হইতে দেখা যায়। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গলের পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীআশুতোষ দাসের সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে। জলপাইগুড়ির গ্রামাঞ্চল হইতে আমরা যে একটি খাতা পাইয়াছি, উক্ত গ্রন্থের সহিত উহার পাঠ প্রায় অভিন্ন। বর্তমান সংকলন হইতে মনসা-মঙ্গলকে বাদ রাখিবার ইহাই প্রধান কারণ।

বর্তমান সংকলনে মনসা-মঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা অপর কয়েকটি দিক হইতে অনুভূত হইতে পারে। যেমন, ইহার ভাষার দিক, সুরের দিক, গায়ন পদ্ধতির দিক। সর্বোপরি গানের অন্তর্ভুক্ত 'ধুয়া'-গুলির স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

ভাষার সম্পর্কে বলিব, সংকলিত ৪৩৫টি গানের মধ্য দিয়া পশ্চিম কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িয়াছে। মনসা-মঙ্গলের সুরের মধ্যেও এই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের সুরই মুখ্য। সুতরাং এই দুই দিক দিয়া ইহার অনুপস্থিতি খুব একটা হানিকর বলিয়া মনে হয় না।

'ধুয়া'-গুলি গায়কদের নিজস্ব রচনা। এইগুলির মধ্য দিয়া তাঁহাদের গান বাঁধিবার ক্ষমতার পরিচয় মিলে। কিন্তু, বর্তমান সঙ্কলনে গ্রথিত বিবিধ খুচরা গানগুলিই অনেক সময় 'ধুয়া'রূপে বিষহরির গানে ব্যবহৃত হয় বলিয়া 'ধুয়া'-গুলির সংকলনের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিলেও চলে।

তবে, বিষহরির গানের গায়ন-পদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষত্ব হইল— 'মুখা বাঁশী' নামে বাঁশের এক ধরণের বাঁশীর ব্যবহার। এই বাঁশীর বিশেষত্ব হইল, ইহাতে নয়টি ছিদ্র থাকে ; কিন্তু প্রয়োজন হয় মাত্র সাতটির। সকলের ইহা বাজাইবার নিয়ম নাই। ইহার সুরও বিচিত্র। এক ভাবে ফুঁ দিয়া ব্যাগ-পাইপের মতো ইহা বাজাইতে হয়, ঠিক সাপ-খেলানো সুরের মতো ইহার সুর হয়। বিষহরির গান ছাড়া অপর কোনো গানে ইহা বাজাইবার নিয়ম নাই।

যে সকল কারণে বিষহরির গান সঙ্কলিত হয় নাই, প্রায় সেই একই কারণে কুশানীর গান ও সত্যপীরের গান অসঙ্কলিত রহিল। কুশানীর গান আসলে রামায়ণ গান, লবকুশের জীবন এই কাহিনীর বিষয়। কিন্তু, ইহার কাহিনী জানা এবং ভাবা ও সুর অন্য গান হইতেও মিলে।

CENTRAL LIBRARY

সত্যপীরের গান সমস্ত বাঙলাদেশেই চলিত আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট একজন পীরও আছেন। 'পীর মাহাত্ম্য কাহিনী উদ্ভূত হইয়াছিল পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে'[১]। উত্তরবঙ্গের 'রঙ্গপুর-বর্ধনকুটীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা (১১৯৪ সালের) লইয়া কৃষ্ণ হরিদাস একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঘটনা কৃষ্ণ হরিদাসের সমসাময়িক হওয়া সম্ভব।...কৃষ্ণ হরিদাসের কাব্যের প্রথম ও প্রধান অংশ হইতেছে মূল কাহিনী, মালঞ্চার পালা'[২]। মালঞ্চার পালা জলপাইগুড়ি হইতে আমরাও সংগ্রহ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, কৃষ্ণ হরিদাসের অন্যান্য পালাগুলি অদ্যাপি জলপাইগুড়ি-রঙ্গপুর জেলায় গীত হইতেছে। আমাদের সংগৃহীত মালঞ্চার কাহিনী এবং ডা: শ্রীসুকুমার সেন উল্লিখিত কাহিনী এক। কাজেই মালঞ্চার কাহিনী নতুন করিয়া সঙ্কলিত করিবার কোনো প্রশ্ন উঠে না। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতেও একদা ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

মালঞ্চার পালাগানে মৈদানব রাজার কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে কেহ-কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তস্‌লিমুদ্দীন আহ্‌মেদ নামীয় জনৈক প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "পীরের মাতা হিন্দু-কন্যা যাবৎ সাব্যস্ত না হয়, তাবৎ মালঞ্চা তাঁহার জন্মস্থান বলা যাইতে পারে না[৩]।"

বহুগানে, বিশেষত বন্দনা গানে, ধর্ম-ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূজা-পদ্ধতিতে ধর্ম-ঠাকুরকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম-ঠাকুরের এতোখানি গভীর প্রভাব থাকিলেও ধর্ম-মঙ্গলের গান প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে অনুপস্থিত।

পৃথ্বীরাজ নামে ভিতরগড়ের (বর্তমানে ইহা বাঙলাদেশে) এক রাজা ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধ-কাহিনী লইয়া একটি দীর্ঘ গীতিকা ওই অঞ্চলে প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। রাজনৈতিক কারণেই এই গান সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই॥

১ শ্রীসুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৮), পৃ: ৯০৫

২ শ্রীসুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৮), পৃ: ৮১৯-৮২২

৩ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩২২, ১ম সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বন্দনা ॥

দিক, দেবতা ও শ্রোতার আশিস মাথায় লইয়া গান আরম্ভ করিবার রীতি অনেক প্রাচীন। লোকসাহিত্যে এই রীতিটি আজও চালু আছে।

বর্তমান সংগ্রহের বন্দনা-গানগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে। দিক, দেবতা-কে তো গানের প্রারম্ভে বন্দনা করা হইয়াছেই, উপরন্তু সাময়িক ঘটনা এবং সেই প্রসঙ্গে দেবতার সম্পর্কের উল্লেখও বাদ পড়ে নাই।

১-সংখ্যক গানটিতে বিভিন্ন দিক এবং স্থানীয় দেবতা-উপদেবতাকে বন্দনা করা হইয়াছে। ২-সংখ্যক গানে ধান-চালের অভাবে এবং দেশের দুর্দশায় গায়ক বিপদ-কাণ্ডারী হরির ভরসা নিয়াছেন। ৩-সংখ্যক গানে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও অতিবৃষ্টির কথা। ৪-সংখ্যক গানে সংসার-জালায় জলিয়া গায়ক জগজ্জননীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিতেছেন। বন্দনা গানের মধ্যে গায়কের এই ব্যক্তিগত আকুতির প্রকাশ অলোচ্য অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ৫-সংখ্যক গানে এই অঞ্চলের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পালাগান ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। গানটির মধ্যে কয়েকটি পুরাতন পালার নাম পাওয়া যায়, এই দিক দিয়া গানটির বিশেষত্ব আছে।

বর্তমান সংকলনে আরো কয়েকটি বন্দনাগান সংকলিত হইয়াছে: চোর-চুন্নী-গানের প্রথমে একটি এবং 'গুলাপীশ্বরীর পালা,' 'কাঙ্‌ভাঙ্গা-ঢেঙ্‌পাড়ীর পালা', ও 'মুকচাটু গঁসাইর পালা'—প্রত্যেকটির প্রথমে একটি করিয়া বন্দনা গান আছে।

'গুলাপীশ্বরীর পালা' ও 'মুকচাটু গঁসাইর পালা'র বন্দনা গানের অংশ বিশেষে গায়ক তাঁহার ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন এবং দেবীর নিকট ভরসা চাহিতেছেন॥

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম অধ্যায়

বর্ষপরিক্রমা : বৈশাখ-আশ্বিন

॥ মেছেনী ॥

॥ ১ ॥

'মেছেনী' জলপাইগুড়ি জেলার মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো ব্রত। পাড়ায় পাড়ায় এই মেছেনী-ব্রত প্রচুর উৎসাহ ও ভক্তি সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। মেছেনী-ব্রতের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হইল—ইহা একা করা হয় না, দল বাঁধিয়া করা হইয়া থাকে।

'মেছেনী' হইলেন দেবী তিস্তা। তিস্তা জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে বড়ো নদী,—মেছেনী নাম দিয়া সেই নদীকেই পূজা করা হইয়া থাকে।

দেবী তিস্তা অর্থাৎ মেছেনী দেবীরা পাঁচ বোন। এই পাঁচবোনের নাম জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেন—ইহারা কালী, দুর্গা, তিস্তা, মনসা ও শীতলা[1]। তিস্তাই পাঁচবোনের মধ্যে বড়ো এবং গানে তাঁহার নামই সর্বাধিক উল্লিখিত হইয়া থাকে।

আসলে তিস্তার অন্য চার বোন কিন্তু কালী, দুর্গা, মনসা বা শীতলা নহেন। বর্তমান সংগ্রহের ৬ক-সংখ্যক গানে তিস্তার অপর চার বোনের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা হইলেন—শুছিলক্ষ্মী, ডাকলক্ষ্মী, অঘণলক্ষ্মী ও পৌষলক্ষ্মী। এই চারজন লক্ষ্মীর অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই মেছেনী ব্রতের মূল উৎস বাহির হইয়া পড়ে।

মেছেনী-ব্রত উদ্‌যাপিত হয় বৈশাখ মাসে। সমস্ত বৈশাখ ভরিয়া কুমারী-সধবা-বিধবারা দল বাঁধিয়া এই ব্রত পালন করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাস বছরের প্রথম মাস,—এই সময় হইতেই কৃষকেরা আউশ ও আমন ধান রোপণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ধানের জন্য চাই জল,—সেই জলের আধার হইল নদী—এবং জলপাইগুড়ির প্রধান নদী হইল তিস্তা।

১ মতান্তরে—মেচ্‌নী (মেছেনী), কুচ্‌নী, কালী, বিষহরি ও তিস্তাবুড়ী। এই মতানুযায়ী মেচ্‌নী ও তিস্তাবুড়ী ভিন্ন।

বছরের প্রথম মাসে, প্রচুর পরিমাণে শস্য পাইবার জন্য দেবী তিস্তাকে আরাধনা করা হইয়া থাকে, যাহাতে তিনি ধান্যক্ষেত্রকে সুজলা-সুফলা করিয়া রাখেন। এই জন্যই ৬৪-সংখ্যক গানে বলা হইয়াছে—"হাল-হাতিয়ার-সুখ্‌খো-শান্তি তমার চরণে।"

এইবার অপর চার বোনের কথা বলিতেছি।

বছরের প্রথম যেদিন ক্ষেত্রে ধান রোপণ করা হয়, সেই দিন এক গুচ্ছ ধানের চারার সহিত কলা, কচু, পাট, হলুদ প্রভৃতির চারা একত্র বাঁধিয়া জমির এক কোণে কাদা করিয়া রোপণ করা হয়। তাহার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে পাঁচটি বা সাতটি ধানের কলম-চারা রোপণ করা হয়। প্রথম চারা রোপণ করিবার সময় 'গোছা' বা গুচ্ছ বাঁধিয়া রোপণ করা হয় বলিয়া এই দিনের অনুষ্ঠানকে 'গুছিবোনা', 'গোছলপানা' বা 'গোচিবোনা' বলা হইয়া থাকে এবং এই অনুষ্ঠানের দেবীকে 'গোছিলক্ষ্মী' বা 'গুছিলক্ষ্মী' বলে। গুছি বুনিয়া সেখানে ধুপ-দীপ জ্বালানো হয়[১]।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে ধানের শীষ্‌ বাহির হইতে থাকে—এইরূপ বিশ্বাস কৃষকদের মনে আছে। এইদিন ভোর বেলায় গৃহস্থ তাহার সমস্ত শস্যক্ষেত্রে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মুখে এই বলিয়া 'হাঁক' দেয়:

> সুরা সুরা,
> খড়েয়া-নেন্দুর-পোকা-মাকড় দূর হয়।
> আকসোর হা, মহালক্ষ্মী খেইল্‌ খেলা।
> খাটো নাঙলের ভীষণ ইশ্‌।
> হামার ধানের বড়ো শীষ্‌।
> সোণার ধান আউল-বাউল।
> মোর ধানে খালি চাউল[২]।

১ District Hand Books (Jalpaiguri) : Appendix—IV (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত ডি. এইচ. ই. সাণ্ডারের রিপোর্ট)।

২ সাণ্ডারের রিপোর্টে এই ছড়ার কথান্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, ইহা ধানের ফুল দেওয়ার দিন বলা হইয়া থাকে। সাণ্ডার ইহা কোন্‌ অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানি না, তবে ছড়ার অন্তর্নিহিত অর্থ ও অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে এই ছড়া ডাকলক্ষ্মীর বলিয়াই মনে হয়।

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ আমার জমি হইতে ইঁদুর-পোকা-মাকড় দূর হউক। মহালক্ষ্মীর কৃপাতে আমার ধানের বড়ো শীষ বাহির হউক এবং অন্যের ধানে কেবল তুষ থাকিলেও আমার ধান যেন চাউলে ভরা থাকে।

হাঁক দিয়া আশ্বিন-সংক্রান্তির দিনে এই ছড়া বলা হয় বলিয়া এই দিনের অনুষ্ঠানকে 'ডাক' এবং উহার দেবীকে 'ডাকলক্ষ্মী' বলা হইয়া থাকে।

পয়লা অগ্রহায়ণ আর একটি অনুষ্ঠান করা হয়,—ইহাকে বলে 'ধানের ফুল দেওয়া'। অগ্রহায়ণ মাসে ইহা করা হয় বলিয়া এই অনুষ্ঠানের দেবীকে 'অঘনলক্ষ্মী' বলা হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই দিন প্রথম ধান কাটা হইয়া থাকে। এবং প্রথম ধান কাটেন গৃহিণী। ডালায় বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া গৃহিণী এবং বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া ক্ষেতে যায় এবং কলাপাতার অগ্রভাগ দিয়া পাকা ধানের গুচ্ছ মোড়াইয়া গৃহিণী বাম হাতে তাহা কাটিয়া বাড়ী আনেন[১]। ধান কাটিবার সময় গৃহিণী এই ছড়াটি বলেন :

কলোর পাত্তে বান্দি' ধান
কাটি' উঠাচুঁ ঘরে।
ভরিয়া অহ মাগে ডোলা বেড়ি'
ভরিয়া অহ গোলা ঘরে॥
খড়েয়া বান্দি, নেন্দুর বান্দি
বান্দি আজি নেকেনাই।
বারো মাসে তেরো পার্বণ
তমার বরে পাই॥

ইহার পর হইতে ধান কাটা আরম্ভ হয়।

ধান কাটিয়া আনিয়া বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের পরিষ্কার জায়গায় পুঁজি করিয়া রাখা হয়।[২] পৌষ-সংক্রান্তির দিন চারিদিকে বাঁশের কঞ্চি পুঁতিয়া হলুদে সূতা রঙ করিয়া সেই পুঁজিকে ঘিরিয়া পূজা করা হয় এবং তাহার

১ ধান কাটিয়া ঘরে উঠানো হয় কিরূপে, তাহার বর্ণনা নবান্নের পরিচ্ছেদে দিয়াছি।

২ অনাবশ্যক বোধে এই সময়ের খুঁটিনাটির বর্ণনা দিলাম না। সাঁওতালের রিপোর্টে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

CENTRAL LIBRARY

পর ধান মাড়া হইতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের দেবীকে পৌষ-লক্ষ্মী বলা হয়। সুতা দিয়া ধানের পুঁজিকে ঘিরিবার সময় গৃহিণী এই ছড়াটি বলিয়া থাকেন :

হলুদ দিয়া ছবায় সুতা
ঘেরা দিচুঁ পুঁজে ;—
বরিষ ঘুরিয়া আসিস মাগে,
খাবা দিমো তোকে॥
পিঠা দিমো, মিঠা দিমো,
দিমো দুধের ক্ষীর।
অচল হয়য়া অহিস্ মাগে
মোর ঘরতে থির॥
পৌষলক্ষী মহালক্ষী,
হলুদো বরণ ;
পাঙ্ক বহিনি এক ঠাঁই
আধো আজি চরণ॥[১]

উপরের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, বড়ো বোন তিস্তাদেবীকে বৈশাখ মাসে কেন আরাধনা করা হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে জলে আধার তিস্তাদেবীকে তুষ্ট করা হয়, তারপর গুছিলক্ষী, ডাকলক্ষী, অঘণলক্ষী ও পৌষলক্ষী—এই চারিবোন—ধানের চারিটি স্তরের প্রতীক—প্রত্যেককে আরাধনা করা হয়। বৈশাখ মাসে বড়ো বোন তিস্তার বন্দনা প্রসঙ্গে গীত হয়—

তিস্তাবুড়ীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালি ;
আনন্দে বরিয়া নেহ গে
হমার পাঙ্ক বহিনি॥—সং ৬ক

তারপর পৌষ মাসে আসিয়া সেই ধানের পুঁজিকে উদ্দেশ করিয়া বলা

১ সমস্ত ছড়াগুলি শ্রীগুরুদাস রায় (পিরিমারি, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।

CENTRAL LIBRARY

হইল: "পঞ্চবহিনি এক ঠাঁই আগো আজি চরণ"। স্পষ্টই বুঝি, এই পাঁচবোন একটি ধানের ক্রমবিকাশের পূর্ণ প্রতীক।

'মেছেনী' শব্দটির অর্থ কী, বহু জনকে সে প্রশ্ন করিয়াছি। কিন্তু, কেহই তাহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। অনুসন্ধানে আমি যাহা জানিয়াছি, নীচে তাহা জানাইলাম।

'মেছেনী'-ব্রতের অপর নাম 'ভেদৈখেলী' বা 'ভেদইখেলী'। 'ভেদৈ' বা 'ভেদইখেলী' শব্দটির অর্থভেদ করিতে পারিলেই 'মেছেনী' কথাটিরও অর্থ বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভেদৈ বা ভেদই শব্দটির অর্থ কেহ করিতে পারেন নাই।

'মেছেনী' নামের মধ্যে আসাম ও জলপাইগুড়ির সীমান্তস্থিত মেচ উপজাতির নামের ছোঁয়া আছে বলিয়া মনে হয়। এই মেচগণ আসামের সীমান্ত হইতে জলপাইগুড়ির সীমান্তে প্রাচীন কাল হইতে বসবাস করিতেছে। এই মেচ ভাষায় "দেই" শব্দটির অর্থ 'জল'।[১]

ডাক্তার ক্যাম্পবেল ছাড়া শিক্ষিত দুই-একজন মেচের নিকটও ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি, মেচগণ প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বিবিধ দেবতা-উপদেবতাকে পূজা দিবার সময় তিস্তানদীকেও পূজা করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, প্রতিবৎসর দুই বার নদী-দেবতাকে পূজা করা হইয়া থাকে—বৈশাখ মাসের প্রথম সাতদিন (সাধারণ ক্ষেত্রে) এবং আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন (সাধারণ ক্ষেত্রে)। যে কোনো নদী বা জলাশয়কেই পূজা করিবার প্রথা মেচদের মধ্যে খুবই দেখা যায়। বৃহৎ জলাশয়কে ইহাদের ভাষায় বলা হয় 'দৈমা'; ছোটো নদীকে বলা হয় 'দৈসা'। গভীর নদীকে বলা হয় 'দৈক্রং'। তিস্তাকে ইহারা বলেন 'টিস্টা বড়াই।' জলপাইগুড়ির অপর এক নদী কালজানা—তাহাকে বলেন 'আলাইখুংড়ী',—তাহারও উপাসনা ইহারা করিয়া থাকেন।[২]

এই তথ্য হইতে জানিতেছি, নদী-নামের পূর্বে 'দেই' (যাহার অর্থ মেচ

১ Journal of the Asiatic Society of Bengal: Dr. A. Gampbell: Notes on the Mechis (1839-VIII. P. 627). ক্যাম্পবেল লিখিয়াছেন: 'Dice'

২ এই তথ্য জানাইয়াছেন শ্রীবীরেন ব্রহ্মমণ্ডল (সীতালি মণ্ডল পাড়া: পোঃ মধু চা-বাগান, জলপাইগুড়ি)। ইনি নিজেও মেচ।

ভাষায় 'জল') শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং নদী-উপাসনা মেচদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

মেচদের নদীদেবী 'আলাইখুংড়ী' রঙপুর জেলাতেও অপরিচিতা নহেন। রঙপুরের একটি 'জাগ-গানের' পদে পাই :

কুঁড়া আছে বাঁশদহ নদী আলাইকুড়ী।
কালী আছেন জাগ্রত আরো আছেন বুড়ী॥[1]

এই প্রসঙ্গে 'তিস্তা' শব্দটির অর্থ কী, তাহাও প্রণিধান করিবার মতো। বোডো ভাষায় 'তি' শব্দটির অর্থ 'জল'।[2] ব্রহ্মপুত্র নদীকে বোডো ভাষায় বলা হয় 'দিহাং'। কাছাড়ের বোডো-ভাষীরা নিজেদের পরিচয় প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদীর নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে ডাক্তার শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন.

"...they (অর্থাৎ কাছাড়ীরা) have preserved the memory of their original home through their own name for themselves, Dima-sa, 'Sons of the Big-water',—that is the Brahma-putra."[3]

তি, দি, দৈই মেচ ও বোডো ভাষায় যাহার অর্থ জল, এবং নদীকে যাহারা বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন,—তিস্তা নাম তাহাদেরই দেওয়া। এবং 'তিস্তা'-কে উপাসনা করিবার রীতি তাহাদেরই নিকট হইতে লওয়া বলিয়া অনুমান করি।

'তিস্তা'-নামের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেও[4] ইহা বোডো ভাষা হইতেই লওয়া। এই প্রসঙ্গে মেচ ও বোডো উপজাতিগণের সম্পর্ক এবং আসাম-

১ রঙ্গপুরের জাগের গান : রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩১৫, ২য় সংখ্যা।

২ ইরাবতী, তিতাস (ত্রিপুরা জেলার একটি নদীর নাম) প্রভৃতি নদীর নাম লক্ষণীয়। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ঝোরা-র নামের সহিত 'তি' এখনও আছে। যেমন, নিমতি ঝোরা চা-বাগান, বুরান্-তি চা-বাগান।

৩ Kirata-jana-krti (1951), P. 67.

৪ দ্র: বিশ্বকোষ : ৮ম ভাগ, পৃঃ ২৪৪-৪৫। ডব্‌লু, ডব্‌লু, হাণ্টার কালীপুরাণের এক কাহিনী 'তিস্ত' নামের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশ্বকোষে এই তথ্য ভুল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

জলপাইগুড়ি-নেপাল সীমান্তে ইহাদের অবস্থানের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

"...পশ্চিমে ভোটান দুয়ার হইতে কোশীনদী পর্যন্ত হিমালয়ের পার্বত্য-তরাই প্রদেশে এবং উত্তরবঙ্গের মেচী নদীর কূলে ইহাদের (অর্থাৎ মেচদের) বাস আছে। সাধারণের বিশ্বাস, নদীতট মেচজাতির বাসভূমি বলিয়া সেই নদীও মেচী নামে আখ্যাত হইয়াছে।"[১]

এডওয়ার্ড্ ডাল্টন্ প্রমুখ জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, মেচ ও কাছাড়িগণ অভিন্ন, অন্তত একই উৎস হইতে উদ্ভূত। এই মেচেরা বিভিন্ন উপজাতির সংশ্রবে আসিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেকের দ্বারাই অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহারা রাজবংশী বলিয়াই পরিচয় দেয়। ডাল্টন্ আরো লিখিয়াছেন,

"...they (অর্থাৎ মেচেরা) call themselves, and no doubt are, Bodo or boro, which means a great people..."[২]

মেচগণের মধ্যে অনেক উপবিভাগ আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের মেচগণ নিজেদের বোড়ো বলিয়া থাকে।[৩]

বি. এইচ্. হজসন্ ও ডাক্তার লাথ্হামের মতে বোড়ো ও ধীমালগণই মেচদের প্রধান শাখা। হজসন্ লিখিতেছেন,

Among all the nuemerous gods, Jupitar pluvius as typified by the rivers commands a reverence, second to none with the Dhima'ls, second to one or two only with the Bodos···A good many of the house hold or national divinities of the Bodos are elemental gods, chiefly rivers ...The supreme gods of the Dhima'ls are termed Wa'rang-Berang, literally, the Old ones, or father and mother of the gods They likewise are a wedded pair, whose proper names are respectively 'Pachima' and Tima'i or

১ বিশ্বকোষ : ১৪শ ভাগ, পৃঃ ৩৭২-৭৩।

২ Edward Twite Dalton: Descriptive Ethnology of Bengal (1872) PP-89-92 (Quoted in A. Mitra's Tribes and Castes of West Bengal (1951) P. 227.

৩ District Hand Books: Jalpaiguri. (Census-1951.)

CENTRAL LIBRARY

Timang, of whom the latter is undoubtedly the Tista river, and the former, I believe the river Dharla".[১]

অপর একজন লেখক জানাইতেছেন, "উভয় জাতিই (মেচ ও ধীমালগণ) তিস্তা ও ধরলা নদীদ্বয়কে বরুণ প্রতিরূপ জ্ঞানে উপাসনা করে।"[২]

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইবে, আসাম-উত্তরবঙ্গ-নেপাল সীমান্তের উপজাতি অধিবাসী, মেচ (বোডো, টিমাল, ধীমালগণ যাহাদের শাখা)-গণের মধ্যে তিস্তা-উপাসনা আছে এবং তাহাদের নিকট হইতেই জলপাইগুড়ির রাজবংশিগণ ইহা লইয়াছে। 'তি', দি, দেই প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝিলে 'ভেদৈ' কথাটির আংশিক অর্থ উদ্ধার করা যায়।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানীয় উপদেবতার নামের পশ্চাৎ 'দেই' শব্দটি জুড়িয়া দিবার প্রবণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ির অন্তঃপাতী বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে বনদেবতা শালেশ্বরী (ইনি মেচদেবতা)-র পূজার সময় যে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাতে বিভিন্ন উপদেবতার নাম পাই, এবং অনেকেরই নামের উত্তর 'দৈ' জুড়িয়া দেওয়া হয়। মন্ত্রটি এই,

"শালেশ্বরী মহারাজা, আজলদৈ, ফুলমতী, গণেশ্বরী, নাশাতী, খপাতী, সহাদৈ, মাহাদৈ, রক্তি, শক্তি, ভূক্তি, সনারায়, উপারায়, বিপদাস, জগবন্ধু, জগন্নাথ।"[৩]

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে পূজায় এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়া থাকে, সেই পূজার উদ্দিষ্ট দেবতা মেচ এবং পূজার প্রথাও মেচদের মতো।

উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে অন্তত ছটি নাম পাইতেছি, যাহাদের নামের উত্তর 'তী' (তি) আছে; তিনটি নাম পাইতেছি, যাহাদের পশ্চাৎ 'দৈ' আছে। তাহা হইলে, যেখানে দেখিতেছি, মেচদের দেবতার নামের উত্তর 'দৈ' আছে, সেখানে 'ভেদৈ' শব্দটিও মেচদের এবং খুব সম্ভব তিনি মেচদের

১ B. H. Hodgson : Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1849, Part II.

২ দারজিলিঙ্গের ইতিহাস (১২৮৭ : ১৮৮০) : হরিমোহন সান্ন্যাল, পৃঃ ১১৪-১১৫।

৩ জনমত (জলপাইগুড়ি) শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৬৫।

দেবী।[১] ইহার উপর, 'ভেদৈ খেলীর' অপর নাম 'মেছেনী' শব্দটি হইতেও আমাদের অনুমানের সমর্থন মিলিতেছে।

'মেচ' শব্দটি হইতে 'মেছেনী' আসা খুবই স্বাভাবিক। কামরূপী উপভাষায় বর্গের প্রথম বর্ণকে দ্বিতীয় বর্ণরূপে উচ্চারণ করিবার প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে।[২]

'ভে' কথাটির অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই।

॥ ২ ॥

গৃহদেবী ও গ্রামদেবীরূপে তিস্তার উপাসনা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষিত হইয়া থাকে। ১৮০৯ খ্রীঃ অঃ ডাক্তার বুকানন হ্যামিলটন তাঁহার 'অ্যাকাউন্ট অফ্ রঙপুর'-এ লিখিয়াছিলেন, ফকিরগঞ্জ থানার[৩] গ্রামবাসীদের প্রধান দেবতা হইলেন তিস্তা।

"The chief deity of the villagers is Buri'-Tha'-Kura'ni', the goddesss of the Ti'sta'."[৪]

বুকানন হ্যামিলটন জলপাইগুড়ির অন্তঃপাতী বোদাপরগণার (বর্তমানে ইহার বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব তাঁহার বইতে হ্যামিলটনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৫]

বি. এইচ্. হজসনের মন্তব্য হইতে পূর্বেই জানিয়াছি,—বোডো-ধীমাল-গণের বিশ্বাসমতো দেবী তিস্তার স্বামী ধরলা। এখানে পাইতেছি, তাঁহার পুত্রের নাম। বর্তমান সংগ্রহের কোনো গানে মকরের নাম নাই। তবে,

১ 'দৈ' ব্যক্তিনামের উত্তরও পাই। রাজবংশীসমাজে মেয়েদের একটি প্রিয়নাম হইল 'মানিক দৈ'। থাইটন নাম্নী দেবীর অপর নাম হইল 'শরদৈ' বা 'শরদই'।

২ এ বিষয়ে 'ভাষাপরিচয়' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সেখানে ইহার অনেক উদাহরণ দিয়াছি।

৩ ফকিরগঞ্জ থানাই আধুনিক জলপাইগুড়ি। ১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ ১লা জানুয়ারী শহর জলপাইগুড়ির পত্তন হয়। তাহার পূর্বে ইহা রঙপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪ Quoted in W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal (1872), Vol. X. P. 265.

৫ "Buri Thakurani, the Goddess of the Tista ; her son, Magar, the Crocodile...."—Ibid, P. 269

CENTRAL LIBRARY

দুই-একটি গানে ধরলা দেবী তিস্তার স্বামীরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে বর্তমান সংগ্রহের ৩৫-সংখ্যক গানটি দ্রষ্টব্য।[১]

কাহারো কাহারো মতে ধরলা নদীরই অপর নাম তোরসা।[২] তোরসা জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের এক নদী। বহু প্রেমের গানে এই তোরসা নদীর নাম পাই।

"ত্রিস্রোতা নদীর একস্থানে দেবীর বাম পদ পড়িয়াছিল, তথায় দেবীর নাম ভ্রামরী···। ···জলপাইগুড়ি জেলার অধীন বোদার অন্তর্গত শালবাড়ী গ্রামে তিস্তানদীতে এই পীঠস্থান থাকার উল্লেখ আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকের নিকট ভ্রামরী দেবী বলিলে কেহ বুঝিতে পারে না। তাহারা দেবীকে বোদেশ্বরী বলিয়া জানে। এই স্থান বোদাচাকলার অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয় দেবী 'বোদেশ্বরী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।"[৩]

"এই নদী তটে (অর্থাৎ তিস্তার তটে) জলপাইগুড়ি জিলার বোদা এলাকায় শালবাড়ী গ্রামে পীঠস্থান। দেবীর নাম ভ্রমরী এবং ভৈরবের নাম ঈশ্বর।"[৪]

কিন্তু এই ভ্রামরী বা বোদেশ্বরীর সহিত তিস্তাবুড়ীর কোনই সম্পর্ক নাই। তিস্তাবুড়ী সম্পূর্ণ ই লৌকিক দেবতা।

তিস্তাবুড়ী তাঁহার অপর চারি বোনসহ লৌকিক দেবীরূপে জনগণ-কর্তৃক পূজিতা হন। এই প্রসঙ্গে নীচের উদ্ধৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য :

"In most cases the village deities are conceived as females. Sometimes the deities of the different villages are supposed to be related to one another as sisters; the most common number being seven...

১ H. H. Risly-ও তাঁহার The Tribes and Castes of Bengal (1891) Vol. 1, PP. 491-500 তে তিস্তাবুড়ীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

২ T. H. Lewin তাঁহার Account of the Kuch Behar State (Kuch Behar, 1876) গ্রন্থে। এ সম্পর্কে আরো দ্রঃ—District Hand Books Jalpaiguri (Census-1951)-P CXIX. নদী ও স্থানের নামের উত্তর 'সা'-এর প্রয়োগ বোড়ো-কাছারী ভাষারই লক্ষণ। এইরূপ অপর উদাহরণ—'চালসা'।

৩ দিনাজপুর পত্রিকা : পৌষ, ১৩২৩।

৪ শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র তত্ত্বনিধি : বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ (১৩১২) : পৃঃ ৮২

The tradition of the goddesses of neighbouring villages being related as sisters is widely distributed throughout aboriginal and semi-aboriginal areas in India. The number of the sister varies, but it must be one of the following, three, five, seven, nine, eleven ; at any rate, an odd number.

Sometiemes the suffix budi, meaning on old woman, is added to the local name of a village goddess".[১]

স্থানীয় দেবীকে 'বুড়ী'রূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবার রীতি বাঙলা দেশে মোটেই দুর্লভ ব্যাপার নয়।[২] তবে, তিস্তাবুড়ীর ব্যাপারে বিশেষত্ব হইল, ইঁহারা পাশা-পাশি বা বিভিন্ন গ্রামে পূজিতা হন না, একই সঙ্গে পূজা পান এবং তিস্তাবুড়ীই তাহাদের মধ্যে প্রধান। 'মেছেনী'রূপে তিস্তাবুড়ীকে যখন উপাসনা করা হয়, তখন তিনি যতো না গ্রামদেবী, তাহার চেয়ে বেশী বিশেষ একটি দেবী, বিশেষত কৃষি-কর্মের দেবী। 'মেছেনী' যদি গ্রামদেবী হইতেন, তবে মেছেনী দেবীকে গারাম-তলায় (অর্থাৎ গ্রামদেবতার স্থানে) নামাইয়া পূজা করা হইত না। মেছেনীই তিস্তা বটে, কিন্তু গ্রামদেবীরূপে তিস্তার অপর একটি বিশেষত্ব আছে।

। ৩ ।

এইবার মেছেনী-ব্রতের পরিচয় দিতেছি।

সাধারণত বিষুব-সংক্রান্তির দিন, অথবা, বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে, অথবা বৈশাখ মাসের যে কোন দিন হইতে মেছেনী-ব্রত শুরু করা যায়। এই ব্রত কেহ একা করে না,—এক-এক পাড়ায় এক-একটি দল গড়া হয় এবং সেই দলের একজন করিয়া দল-নেত্রী থাকে।

এই দলনেত্রীকে বলা হয় 'মারেয়ানী'। বয়স্কা বিধবারাই সাধারণত মারেয়ানী হইয়া থাকে। ব্রত-চারিণীরাই কেহ একজনকে মারেয়ানী নির্বাচিত করে ; এবং পর-পর সাতবৎসর মারেয়ানী হইতে পারিলে সামাজিক সম্মান এবং পারলৌকিক পুণ্য বাড়ে বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে।

১ Man in India (Jenuary-March-1955) pp. 20-30.

২ Journal of the Asiatic Society of Bengal-1941. VII pp. 177-78.

CENTRAL LIBRARY

একটি বাঁশের চুবড়ির ভিতর একদলা এঁটেল মাটি হইল দেবী তিস্তার প্রতীক। প্রতি বৎসর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চুবড়িস্থিত সেই এঁটেল মাটির দলা সবখানিই ফেলিয়া দেওয়া হয় না, যত্ন করিয়া মারেয়ানী তাহা ঘরে তুলিয়া রাখেন এবং পরের বৎসর ব্রত উদ্‌যাপনের সময় গারাম-তলা হইতে পবিত্র মাটি আনিয়া তাহার সহিত পূর্ববৎসরের মাটি খানিকটা মিশাইয়া দেন। এইরূপে, একই মাটির ডেলাকে বৎসরের পর বৎসর দেবীর প্রতীকরূপে গণ্য করা হইতে থাকে।

বাঁশের চুবড়ির ভিতর সেই মাটির ডেলার উপর কিছু ফুল, আতপ চাউল, কাঁচা দুধ বা দই, সিঁদুর ইত্যাদি দেওয়া হয়, তাহার পর এক টুকরা সাদা কাপড় দিয়া সেই চুবড়িটিকে ঢাকিয়া নেওয়া হয়। একটি ছাতাকে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করিয়া লওয়া হয়। মারেয়ানী সেই ছাতা মাথায় ধরিয়া, ডান কাঁধে দেবীর ডালা লইয়া আগাইয়া চলেন। পিছনে থাকে দল বাঁধিয়া অন্যান্য ব্রতচারিণীরা। তাহারা কোঁচড়ে দই ও ফুল দিয়া আতপ চাউল মাখিয়া লয় এবং পথ চলিতে চলিতে মারেয়ানী মাথায়-ধরা সেই ছাতার প্রতি তাহা ছিটাইতে থাকে।[১]

প্রথম যে দিন ব্রত উদ্বোধন করা হয়, সেদিন মারেয়ানীকে পুরোভাগে রাখিয়া সকলে প্রথমে গারাম-তলায় (গ্রামদেবতার স্থানে) আসে। সেইখানে ছাতা পাতিয়া দেবীর ডালা নামানো হয়, এবং গারাম-দেবতাসহ অন্যান্য সকল উপদেবতার বন্দনা করিয়া তিস্তাবুড়ীকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে অনুরোধ করা হয়। এই সময় গীত গানের মধ্য দিয়া দেবী তিস্তাকে স্বর্গ হইতে 'নামানো' হয় বলিয়া এই গানের নাম 'নামানি'। এই দিন ধুপ-দীপ জ্বালিয়া পূজাও দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ৬ক ও ৮খ-সংখ্যক গানগুলি দ্রষ্টব্য।

গারাম-দেবতাকে বন্দনা করিবার সময় মারেয়ানী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুসলমানদের মতো দুই হাত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে 'সালাম' জানান। গানে গাওয়া হয়,—"গাঁয়ের গারাম সালাম রে" (সং ৬)।

ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। নাচ ও গানই তাহার মধ্যে প্রধান। আমোদ-আহ্লাদের দিকটিই তখন প্রধান হইয়া উঠে। এই জন্যই বলা হয় 'মেছেনী খেলী' বা 'ভেদৈ খেলী'। ব্রতকে

১ এই ছাতা ও চাউল ছড়ানো বৃষ্টি বা জলের স্পষ্ট আভাস দেয়।

খেলারূপে বিশেষিত করিবার মধ্যে সত্যই এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রতের উদ্বোধন ও পরিসমাপ্তি ছাড়া অপর কোথাও ভক্তিভাব নাই,—নাচ-গান-আমোদ-উল্লাসই ইহাতে প্রধান হইয়া দাঁড়ায়।

ব্রত উদ্বোধন করিবার পর বেশ কয়েকদিন ধরিয়া মেছেনীর ডালা বাড়ী-বাড়ী লইয়া গিয়া নাচ-গান করা হইয়া থাকে। কিন্তু কতদিন ধরিয়া এই ব্রত করা চলিবে, তাহার কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। বৈশাখ মাসের যে কোনো দিন যেমন এই ব্রত শুরু করা যায়, তেমনি যে কোনো দিন ইহা শেষ করিয়াও দেওয়া যায়। তবে, সাধারণ ক্ষেত্রে কেহই এক সপ্তাহ নাচ-গান না করিয়া শেষ করে না। সাধারণত বৈশাখ সংক্রান্তির দিন ব্রত শেষ করিয়া দেওয়া হয়। তিস্তার পূর্বপারে, বিশেষত ধূপগুড়ি অঞ্চলে এই ব্রতচারিণীরা প্রতি হাটে যাইয়াও শোভাযাত্রা করে এবং অন্তত দুইটি হাট (তাহা হইলে পনেরো দিন হয়) ঘুরিয়া ব্রত শেষ করে।

বাড়ী-বাড়ী মেছেনীর ডালা বহিয়া নাচ-গানই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। মারেয়ানীর গৃহে দেবীর ডালা থাকে। প্রতিদিন বিকালের দিকে ব্রতচারিণীরা সকলে আসিয়া মারেয়ানীর গৃহে সমবেত হয়। মারেয়ানী তাঁহার মাথায় রঙীন ছাতা মেলিয়া ধরিয়া ডান কাঁধে দেবীর ডালা বহিয়া আগাইয়া চলেন। পিছনে থাকে অন্যান্য সবাই। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাইবার পথে গান করা হইয়া থাকে। রাস্তায় হাঁটিবার সময় এই গান গাওয়া হয় বলিয়া এই সময়ে গীত গানকে 'রাস্তাহাটা', 'পাথারিয়া' বা 'পথ-বেড়ানি' গান বলা হয়। 'নামানি' মেছেনী গানের প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় হইল 'পাথারিয়া' গান।

গান গাহিয়া শোভাযাত্রার আকারে ব্রতচারিণীরা গৃহস্থ-বাড়ীতে আসিয়া ঢোকে। কিন্তু ছুট করিয়া বাড়ীতে ঢোকা চলিবে না। বাড়ীর দরজাতে পা দিবার সময় সময়োপযোগী গান গাহিতে হইবে। বাড়ীতে ঢুকিবার সময় এই গান গাওয়া হয় বলিয়া, এই গানকে বলা হয় 'বাড়ীঢুকা' গান। ইহা মেছেনী গানের তৃতীয় পর্যায়। শোভাযাত্রাকারিণীগণ যখন গৃহদ্বারে আসিয়া 'বাড়ীঢুকা' গান গাহিতে থাকে, তখন সেই বাড়ীর গৃহিণী যদি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদের প্রত্যুদ্গমন না করেন, তাহা হইলে সেই গৃহিণীকে নিন্দা করিয়া তৎক্ষণাৎ গান বাঁধিয়া ফেলা হয়। এই গানগুলিও

'বাড়ীঢুকা' গানের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান সংগ্রহের ৩১ক ও ৩২ সংখ্যক গান দুইটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শোভাযাত্রা করিয়া ব্রতচারিণীগণ যখন গৃহদ্বারে আসিয়া 'বাড়ীঢুকা' গান গাহিতে থাকে, তখন সেই বাড়ীর গৃহিণী তাহাদের আহ্বান জানান। গৃহিণী অঙ্গনের মধ্যস্থলে বেশ কয়েক বাল্‌তি জল ঢালিয়া খানিকটা জায়গা পিছল করিয়া দেন, তারপর পূর্বদিকে একটি পিঁড়ি পাতিয়া দেন। তখন মারেয়ানী আসিয়া ছাতা পাতিয়া সেই পিঁড়ির উপর দেবীর ডালা নামান। দেবীর ডালা গৃহস্থের অঙ্গনে নামাইবার সময়ে গান গাওয়া হইয়া থাকে। এই সময়ে গীত গানদ্বারা দেবীকে গৃহস্থ-বাড়ীতে 'বসানো' হইয়া থাকে, সেই জন্য এই গানকে বলা হয় 'বসানি গান'। গৃহিণী দেবীকে উপবেশন করিবার জন্য পিঁড়ি দিয়া একটি থালায় কিছু ফুল, দুধ, আতপ চাউল, সিঁদুর ইত্যাদি দিয়া থাকেন। মারেয়ানী গৃহিণীর দেওয়া সেই মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দিয়া দেবীকে বরণ করেন। বরণ করাকে বলা হয় 'চুমানো'। দেবীকে 'চুমাইবার' (অর্থাৎ বরণ করিবার) সময়ও গান করা হয় এবং সেই গানকে বলা হয় 'চুমানি'। 'বসানি' ও 'চুমানি' মেছেনী গানের চতুর্থ পর্যায়। অনেক সময় 'বসানি' ও 'চুমানি' গান মিলিয়া যায় এবং কোনটা বসানি গান ও কোনটা চুমানি গান, ঠিক ঠাহর করিয়া উঠা যায় না।

মেছেনী গানের পঞ্চম পর্যায় হইল 'নাচানি'। নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, নাচের সহিত গাওয়া হয় বলিয়া এই সকল গানকে 'নাচানি' বা 'নাচানিয়া' গান বলা হইয়া থাকে। মেছেনী নাচের বিশেষত্ব লক্ষ করিবার মতো। অঙ্গনে বাল্‌তি-বাল্‌তি জল ঢালিয়া স্থানটিকে খুব পিছল করিয়া লওয়া হয়। তারপর, যাহারা নাচিবে, তাহারা দেবীর ডালার চতুর্দিকে গোল হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেকে ডানদিকে অর্ধেক কোণা করিয়া, দুই হাতে 'পাটানী' (রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র)-র কোণা তুলিয়া ধরিবে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে, মাটির সহিত দুই পা জোড়া করিয়া ঘষিতে-ঘষিতে (অর্থাৎ স্কেটিং করিবার ভঙ্গিতে) বৃত্তাকারে সবাই ডান দিকে ঘুরিতে থাকিবে এবং দুই হাতে পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল বাতাসে আন্দোলিত করিতে থাকিবে। যাহারা নাচিবে, তাহারা গাহিবে না। যাহারা গাহিবে, তাহারা করতালি দিয়া নৃত্য-ছন্দের অনুযায়ী

CENTRAL LIBRARY

গান গাহিবে। বৈশাখ মাসে সহজেই জল শুকাইয়া যায়, এইজন্ত ঘন-ঘন জল ঢালিয়া স্থানটিকে পিছল করা হইতে থাকে। নৃত্যের গানের সহিত করতালি দেওয়া হয় বলিয়া, কোনো কোনো অঞ্চলে এই গানের সুরকে 'থাপুরি' বলা হইয়া থাকে। গৃহিণীর অনুরোধ মতো দুই-চারিখানি সঙ্গীত-সম্বলিত নাচ দেখানো হইয়া থাকে। সাধারণত বৃদ্ধা ও কিশোরী মেয়েরাই নাচে, যুবতী মেয়েরা প্রায় নাচেই না।

নাচ হইয়া গেলে গৃহিণী সাধ্যমত চাউল বা ধান ডালা ভরিয়া আনিয়া পূজার চাঁদা হিসাবে দেন। সেই সময়ে, শোভাযাত্রাকারিণীদের পান-সুপারি খাইতে দিতে হয়।

ইহার পর মেছেনী গানের ষষ্ঠ পর্যায়: 'উঠানী'। অর্থাৎ এই গান গাহিয়া দেবীকে সেই বাড়ী হইতে উঠাইয়া লওয়া হইল। দেবীকে এই গানদ্বারা উঠাইয়া লওয়া হয় বলিয়া এই গানের নাম 'উঠানি'। 'উঠানি' গানে নানা রঙ্গ-তামাশা করা হইয়া থাকে। গৃহিণী যদি অল্প পরিমাণ ধান বা চাউল দেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কৃপণ আখ্যা দিয়া নিন্দা করিয়া গান রচনা হইয়া থাকে। ৫১-সংখ্যক গানখানি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী যাইয়া আবার সেই একই প্রকার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। এক বাড়ীর 'উঠানি' গান গাহিয়া, পথে আসিয়াই আবার 'পাথারিয়া' গান ধরা হইয়া থাকে। দুইটি মেছেনীদলের রেষারেষিও হইয়া থাকে। পথে দুই দলের সাক্ষাৎ হইলে উভয় দল কবির লড়াইয়ের মতো গানে লড়াই করিয়া থাকে। এক গ্রামের দল অপর গ্রামের কলঙ্ক-কাহিনী লইয়া গান গায় এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামের দল গানেই তাহার জবাব দিয়া থাকে। অনেক সময় দই মারেয়ানীর ব্যক্তিগত জীবনের উপরও কটাক্ষ করিয়া গান গাওয়া হয়। এই সময় উপস্থিত-ক্ষেত্রে গান রচনা করিবার ক্ষমতা কাহার বেশি, তাহা প্রমাণিত হয়।

ব্রতচারিণীদের খুশি অনুযায়ী দিন কয়েক এই ভাবে বাড়ী-বাড়ী নাচিয়া-গাহিয়া ধান-চাউল-পয়সা-কড়ি যোগাড় করিয়া একদিন সে বৎসরকার মতো ব্রত শেষ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাই মেছেনী গানের সপ্তম ও শেষ পর্যায়। সংগৃহীত চাঁদা হইতে পূজার জন্ত উপচার ক্রয় করা হইয়া থাকে। শেষে, একদিন সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলিয়া নিকটস্থ কোনো নদী বা

CENTRAL LIBRARY

জলাশয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। কলাগাছ কাটিয়া তাহা দিয়া একটি ছোট ভেলা (ভুরা) তৈরি করা হয়। তাহাতে ধূপ-দীপ জ্বালিয়া, বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া, যে ডালা ধরিয়া এ কয়দিন নাচা-গাওয়া হইয়াছিল, তাহা স্থাপন করা হয়। মারেয়ানী তখন নদীর পারে সেই ভেলাকে পূজা করেন। পূজার শেষে, সকলে মিলিয়া সেই ভেলা তিস্তাদেবীর উদ্দেশে ভাসাইয়া দেয়। তারপর, সংগৃহীত চাল-ডাল ইত্যাদি রাঁধিয়া-বাড়িয়া নদী-তীরে বসিয়া খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে।

মেছেনী গানের এই শেষ পর্বটিকে বলা হয় 'ভুরা-ভাসানি' বা 'যাত-সিনানী'। 'ভুরা-ভাসানি' কেন বলা হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'যাত' শব্দের অর্থ হইল—ভীড়, মেলা, উৎসব, ইত্যাদি[১]। সকলে মিলিত হইয়া সেদিন নদী-তীরে স্নান করে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে কেবল মারেয়ানী সকলের তরফ হইতে স্নান করেন।

মুসলমানগণও দেবী তিস্তার উপাসনা করিয়া থাকেন। মুরগীর গলায় এক টুক্‌রা সাদা কাপড় বাঁধিয়া তাহা দেবী তিস্তার উদ্দেশে উড়াইয়া দেন। ৫২-খ সংখ্যক গানটি এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য।

মেছেনী গান মূলত মেয়েদের। কোথায়ও পুরুষেরা এই গান ও ব্রত করে না। জলপাইগুড়ির এক বৃদ্ধ রাজবংশীর মুখে শুনিয়াছি, বহুদিন পূর্বে তাঁহাদের পাড়ায় একদল পুরুষ এই মেছেনীব্রত করিয়াছিল। কিন্তু, গানের পূর্বে তাঁহারা শাড়ী ও সিঁদুর পরিয়া মেয়ে সাজিয়া লইয়াছিল॥

॥ ৪ ॥

উপরে মেছেনী গানের সাতটি পর্বায়ের কথা বলিয়াছি। এইবার সেই গানগুলির পরিচয় দিতেছি।

উল্লিখিত সাতটি পর্যায়ের মধ্যে 'পাথারিয়া' ও 'নাচানিয়া' গানের মধ্যেই বিশেষত্ব খুঁজিয়া মেলে। বাকি পাঁচটি স্তরের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতাই প্রাধান্য পায় বলিয়া বিশেষত্ব কিছু নাই। সাহিত্যিক মূল্যের দিক দিয়া পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানই মেছেনীর বিভিন্ন স্তরের গানের মধ্যে উত্তম।

১ জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, পৃঃ ১২৫৭

CENTRAL LIBRARY

পাথারিয়া ও নাচানিয়া গান বৎসর-বৎসর পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ইহাতে গায়িকা ও রচয়িতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মেলিয়া ধরিবার সুযোগ পাওয়া যায়। মারেয়ানী ও অন্যান্য ব্রতচারিণীদের সংগীত-প্রতিভার বলে বৎসর-বৎসর ইহাতে অভিনবত্ব আসিতে পারে।

অন্য দিকে, নামানি, চুমানি, বসানি, বাড়ী-ঢোকা, ভুরাভাসানি প্রভৃতির গান আবহমান কাল ধরিয়া এক এবং যে সকল অঞ্চলে মেছেনী ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, সেইসকল স্থানে এই পাঁচটি পর্যায়ের গানের কথা প্রায় অভিন্ন। এইগুলির প্রধান মূল্য হইল—এইগুলির মধ্য দিয়া পূজার উদ্দিষ্টা দেবীর পরিচয় এবং পূজার ফল কি, তাহা জানা যায়। বহুকাল ধরিয়া এই গানগুলি চলিত আছে এবং সর্বত্র প্রায় একই কথাই পাওয়া যায় বলিয়া এইগুলিই মেছেনীর আদি গান বলিয়া অনুমিত হয়। পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানের সাহিত্যিক উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা চলে, এইগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানের রচনার ভাব-উৎস ও অন্তঃপ্রেরণার মধ্যে ধর্মীয়ভাব আদৌ নাই, আমোদ-রঙ্গ-তামাশাই ইহাতে প্রধান। মেছেনীর ব্রতের মধ্যে যাহা কিছু ধর্মীয় আবরণ আছে তাহা উল্লিখিত ওই পাঁচটি পর্যায়ের স্বল্প-সংখ্যক কয়েকটি আনুষ্ঠানিক গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নতুবা নাচানিয়া বা পাথারিয়া গানের মধ্যে কোন ধর্মকথা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানের বিষয় হইল, লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ব্যথা ইত্যাদি। অপরদিকে নামানি, চুমানি, বসানি, বাড়ীঢুকা ও ভুরা-ভাসানি হইল মন্ত্র-গান। সুতরাং বলা চলে, সামগ্রিক ভাবে মেছেনীর গান ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এই দুই বিষয় অনুযায়ী বিভক্ত।

পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানের অপর একটি বিশেষত্ব হইল—এই গানগুলি মিলিত কণ্ঠে গাওয়া হইলেও এগুলির মধ্যে গীতি-কবিতার স্পর্শ পাওয়া যায়। মিলিত কণ্ঠের গানের মধ্যে ব্যক্তিগত আশা-নৈরাশ্য, প্রেম-ব্যথা কেমন করিয়া আসিল, তাহা সত্যই ভাবিবার মতো।

আনুষ্ঠানিক গানগুলি পর্যালোচনা করিলে, মেছেনীর উদ্দিষ্টা দেবীর পরিচয় এবং সেই ব্রত করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা জানা যায়।

৬ক-সংখ্যক গান পাঠে জানা যাইতেছে, তিস্তাবুড়ী-রা পাঁচবোন, এবং

CENTRAL LIBRARY

এই পাঁচ বোনের নাম তিস্তাবুড়ীসহ গুছি-লক্ষ্মী, ডাক-লক্ষ্মী অঘণ-লক্ষ্মী ও পৌষ-লক্ষ্মী। ৬৪-সংখ্যক গান হইতে জানা যায়, তিস্তাবুড়ীর আশীর্বাদের উপরই কৃষিকার্য ও সুখশান্তি নির্ভরশীল।

তিস্তার স্বামীর নাম ধরলা, ইহা একটি গান হইতে জানা যাইতেছে। (সং ৩৫)।

'বাড়ীঢুকা' গানগুলির মধ্যে দেবীর পরিচয় অনেকটা স্পষ্টরূপে পাই। ৩১ক-সংখ্যক গানে তিস্তাবুড়ীকেই 'লক্ষ্মী' বলা হইয়াছে এবং তাঁহারই কৃপাতে গৃহে সন্তানাদি জন্মিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, 'শাশুড়ীর অলন-ঝলন' এবং ননদের 'বোল' হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় তিস্তার আশীর্বাদে।

দেবী তিস্তা গৃহস্থের 'বিঘিনি' খণ্ডান (সং ৩১গ) এবং তাঁহার পূজায় তেল-সিঁদুর-ধান-চাল দিলে পরিবার 'ধনে জনে বাড়ে', যে রমণী তাঁহার পূজা করে, চিরদিন তাহার 'হাতের শাংকা নড়ে' অর্থাৎ সধবা হইয়া বাঁচিয়া থাকে (সং ৩৩)। এই দেবীর তুষ্টির জন্ম সকাল বেলায় গৃহাঙ্গনে গোবর ছড়া ও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিতে হয় (সং ৩৪)॥

॥ ৫ ॥

আনুষ্ঠানিক গানগুলির সম্পর্কে বক্তব্য বলিলাম। এইবার 'পাথারিয়া' গানের কথা বলি।

পথে চলিতে চলিতে গ্রাম্যমেয়ের চোখের সম্মুখে যে সকল খণ্ডচিত্র ও দৃশ্য ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহারই বর্ণনা পাথারিয়া গান। চলিতে চলিতে একটি দৃশ্যের সম্পূর্ণ টুকু দেখা হয় না, সেই দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতেই হয়তো আর একটি দৃশ্য শোভাযাত্রাকারিণীদের দৃষ্টি কাড়িয়া লইল ; যে দৃশ্যটির বর্ণনা দেওয়া হইতেছিল, হয়তো সম্পূর্ণ নূতন ও প্রসঙ্গ-সূত্র বিহীন অপর একটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়া ফেলা হইল : এবং তারপর ছন্দ, মিল ও ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অকস্মাৎ গানখানিকে শেষ করিয়া দেওয়া হইল।

এই জন্যই পাথারিয়া গানগুলিতে টুকরা-টুকরা পথের দৃশ্য, মিল-হীনতা, কোনো কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা বা প্রমাণিত না করা, প্রসঙ্গ-সূত্র বিহীন একাধিক দৃশ্য বা ঘটনার সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক একটি বা একাধিক ঘটনা বা দৃশ্যের অসংলগ্ন বিবৃতি প্রদানই ইহার লক্ষ্য বলিয়া,

CENTRAL LIBRARY

পাথারিয়া গানগুলি আকারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। অনেক সময় গার্হস্থ্য জীবনের কোনো কথা মনে উদয় হইলে নৈসর্গিক কোনো দৃশ্য বা পথের কোনো ঘটনার সহিত তাহার আকস্মিক সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া পথ চলিতে চলিতেই গান বাঁধিয়া ফেলা হয়।

প্রেম ও কলঙ্ককাহিনী পাথারিয়া গানের অপর দুই উল্লেখযোগ্য বিষয়। আঙিনায় দাঁড়াইয়া নারী প্রেমের কথা গাহিতে পারে না, কুণ্ঠা তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরে। পথে সে বালাই নাই। এখানে একদল মেয়ে প্রেমের কথা গলা ছাড়িয়া গাহিলেও কোনো পুরুষ তাহা শুনিতে আসিবে না এবং একই কারণে কলঙ্ককাহিনীকে ভিত্তি করিয়া রচিত গান পথেই সর্বাধিক গীত হইয়া থাকে।

পাথারিয়া গানের ভাব-উৎস ও অন্তঃপ্রেরণা দ্বারা ইহার বিষয় যেমন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তেমনি সেই একই কারণে ইহার সুরের মধ্যেও বিশেষত্ব আসিয়া গিয়াছে। গলা ছাড়িয়া উদ্দাম কণ্ঠে গান গাহিবার সুযোগ গৃহাঙ্গনে তেমন নাই, যতটা রহিয়াছে পথে। এইজন্যই দেখি, পাথারিয়া গানের সুর বিলম্বিত লয়ের, ইহার মধ্যে আকাশ ও মাঠের বৃহৎ বিস্তৃতি যেন গায়িকার অজ্ঞাতে কেমন করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। টানিয়া টানিয়া পাথারিয়া গান গাওয়া হয় বলিয়া কোনো-কোনো অঞ্চলে এই সুরকে 'টুলানি' বলা হয়।

এই বার কয়েকটি পাথারিয়া গানের উল্লেখ করিয়া উপরের মন্তব্যগুলি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ ও ২২-সংখ্যক গানগুলি এই প্রসঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।

১৩-সংখ্যক গানখানিতে পথ-চারী একদল মেয়ের রঙ্গস্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়ীর বাহিরের দুই অবিবাহিত যুবককে দেখিয়া বলা হইতেছে, বাটিতে 'খইল' ভিজাইয়াছি, আইস, আমার পিঠটা ঘষিয়া দাও। প্রেম ও রঙ্গ এই গানে প্রকাশিত হইয়াছে।

১০-সংখ্যক গানে দেখি, তোতা ও ময়না বনে কাঁদিতেছে, এদিকে রাজার সিপাই হাতের কলম ফেলিয়া দিয়াছে। এই বর্ণনা হইতে কোনো সত্যে উপনীত হইবার উপায় নাই। কেন বনে পাখীরা এবং ঘরে সিপাই কাঁদিতেছে, কেন সিপাই হাতের কলম ফেলিয়া দিল, সিপাইয়ের সহিত

CENTRAL LIBRARY

তাহাদের কি সম্পর্ক, কেন এই কান্না,—ইত্যাদি প্রশ্নের কোনো জবাবই ইহাতে দেওয়া নাই, দিবার চেষ্টাও নাই। ইহা কেবলই একটি ঘটনা, একটি দৃশ্য, একটি চিত্র,—এবং তাহারই বর্ণনা। হঠাৎ অসংলগ্ন দুইটি কথার অবতারণা করিয়া হঠাৎই ইহা শেষ হইয়া গিয়াছে।

১৫ ও ১৬-সংখ্যক গান দুইটির মধ্যে পথের কথা ও দৃশ্য চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। পথ বাহিয়া সারি-সারি গাড়ী লইয়া চলিয়াছে একদল গাড়োয়ান। তাহাদের একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, ওগো গাড়োয়ান, ওই সরু পথে গাড়ী চালাইয়ো না, পড়িয়া গেলে মারা পড়িবে এবং তুমি মরিলে তোমার বউ বিধবা হইবে। এইটুকু বর্ণনা দিয়াই গানখানি শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৬-সংখ্যক গানে দেখি, পাহাড়ের গা বাহিয়া যে গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, ওগো গাড়োয়ান, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তামাক লইয়া যাও।

১৮-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, কৃষাণ হিসাবে আমার স্বামী ভালোই, পতিত জমিতে সে ধান ফলাইয়াছে। কিন্তু সেই ধান টিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, আমার স্বামী সেই দুঃখে গৃহত্যাগ করিতেছে। আমার হাতে ও কোঁচড়ে যাহা ছিল সবই দিতেছি, ওগো পতিধন, এইবার ঘরে ফিরিয়া আইস। এই গানেও দেখিতেছি, পথে ধাবমান স্বামী, পিছনে মিনতি-কাতর বধূর উপস্থিতি—পথের এই দৃশ্যটুকুই গানের বিষয়।

২২-সংখ্যক গানটির মধ্যে পাথারিয়া গানের সকল লক্ষণ অল্প-বিস্তর উদাহৃত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইতেছে, কানাই, তুমি হাল জুড়িয়াছ কিন্তু চাষ করিতেছ না। কেন করিতেছ না, তাহা জানি,—রাজা রাজ্যভার লইয়াছে এবং রাণী কাশী গিয়াছে,—রাজ্যে রাণীর শোকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, তুমিও অভিভূত হইয়া চাষ করিতে ভুলিয়াছ। ঐ দেখ, হাল ছাড়িয়া গোরু তোমার পলাইল!

গান ছাড়া বাহিরের কথাও কিছু জুড়িয়া দিলাম বলিয়া গানটির মোটামুটি একটা অর্থ পাওয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ গানখানি পড়িয়া ইহার অন্তঃস্থিত কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই কঠিন। কানাইয়ের চাষের সহিত রাজার রাজ্যভার নেওয়া এবং রাণীর কাশীবাস কোন সম্পর্ক-সূত্র দ্বারা গ্রথিত, রচয়িতা তাহা বলেন নাই। পথ চলিতে চলিতে তিনি যাহা মনে করিয়াছেন

CENTRAL LIBRARY

ও চোখে দেখিয়াছেন, তাহাই গাহিয়াছেন, কোনো বিশেষ যুক্তিধারা অনুসরণ করিয়া বিশেষ কোনো বক্তব্য উপস্থিত করিতে চাহেন নাই।

উপরে পাথারিয়া গানগুলির সম্পর্কে যাহা বলিলাম, তাহা সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মাত্র। বস্তুত গান রচনার ক্ষেত্রে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। অবশ্য কম-বেশি উপরের মন্তব্যগুলির কোনো না কোনো একটি প্রায় সব গানেই মিলিবে। তবে, ব্যতিক্রমও আছে॥

॥ ৬ ॥

পাথারিয়া যেমন পথের গান, নাচানিয়া তেমনি ঘরের গান। পাথারিয়া গানে যেমন পথের কথা, পথের দৃশ্য, প্রেম ইত্যাদি পাই, নাচানিয়া গানে তেমনি পাই গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের আশা-বেদনা, সুখ-দুঃখের কথা-কাহিনী। পাথারিয়ার সুর যেখানে দীর্ঘ ও বিলম্বিত লয়ের, নাচানিয়া গানের সুর সেখানে দ্রুত লয়ের। পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানের মধ্যে বিষয় ও সুর উভয় দিক দিয়াই পার্থক্য আছে।

৩৭, ৩৯, ৪৫-সংখ্যক গানগুলিতে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। প্রবাসী স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় স্ত্রীর জন্ম শাঁখা কিনিয়া আনিতেছে, পরিবারের অন্য সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া কেমন করিয়া সেই শাঁখা তাহার স্ত্রীকে পরাইবে,—তাহাই হইল গানখানির বক্তব্য বিষয় (সং ৩৭)। আর একটি গানের বক্তব্য হইল, বধূ নিজের হাতে বারি সেচন করিয়া 'করলা' ফলাইয়াছিল, সেই করলা জাঙলা হইতে তুলিয়া যেদিন সে রাঁধিল, সেদিন শ্বশুর-ভাশুর সবাই খাইয়া প্রশংসা করিল, স্বামীর মুখে তাহা রুচিল না,—স্ত্রী সেই দুঃখে করলা রাঁধিবার হাঁড়িটাই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিতেছে (সং ৪৫)।

৩৯-সংখ্যক গানে দেখিতেছি, গলার হার ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্ম স্বামী-কর্তৃক স্ত্রী প্রহৃত হইতেছে। ৩৫-সংখ্যক গানের বক্তব্য বিষয় হইল, নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে বলিয়া দেবী তিস্তাকে তাঁহার স্বামী ধরলা গালি পাড়িতেছেন।

নারীমনের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় পাই ৪০ ও ৪৪-সংখ্যক গানে। স্ত্রী নিজেকে মৃত বলিয়া কল্পনা করিয়া বিপত্নীক স্বামীর বিধবা-বিবাহের কথা

CENTRAL LIBRARY

একটি গানে বলিয়াছে। অপর একটি গানে বিপত্নীক 'শিবের' প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ৪২-সংখ্যক গানে অল্প বয়সে স্বামী-মরিয়া-যাওয়া এক বিধবার দুঃখ-কাহিনী গীত হইয়াছে।

রাজবংশী সমাজে নারী দ্বিতীয় বার পতি গ্রহণ করিতে পারে। সুখে থাকিবার আশায় এক বিধবা জনৈক পুরুষকে 'ভাতার' হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে ভালো-মন্দ খাইতে দেয় নাই, শাড়ী-গয়না পরিতে দেয় নাই। নারীর এই খেদ্ একটি গানে ব্যক্ত হইয়াছে (সং ৩৮)।

পারিবারিক জীবনে দেবর-ননদ ও শাশুড়ীর সহিত বধূর সম্পর্ক লইয়াও নাচানিয়া গান মিলে। একটি গানে বলা হইতেছে, 'হুনের ছিটা' দিয়া 'কালাকচুর' তরকারি রাঁধিয়া রাখিয়াছি, ওই দেখ, আমার অবিবাহিত ও অকর্মণ্য দেবরটি খড়মের শব্দ করিয়া খাইতে আসিতেছে (সং ৪৭ক)। আর একটি গানে পাই, ঘাটে স্নান করিতে গিয়া বধূ 'নাকের নতোয়া' হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং 'ঝালাপড়ি শাশুড়ী' ও 'কুটুনী ননদের' ভয়ে ভীতা হইয়া উঠিয়াছে (সং ৪৮)।

ইহাই নাচানিয়া গানের মূল বিষয়। গার্হস্থ্য, দাম্পত্য জীবনের নারীর সরল ও স্থূল কামনা-বাসনাগুলিই নাচানিয়া গানে রূপায়িত হইয়াছে অবশ্য বৈধ ও অবৈধ প্রণয়-কাহিনী যে নাচানিয়া গানে নাই, এমন নহে। বর্তমান সংকলনেই তাহা দেখা যাইবে।

CENTRAL LIBRARY

॥ শিব খেলা ॥

বৈশাখ ও কার্তিক মাস ভরিয়া যুগীশ্রেণীর লোকেরা বাড়ী-বাড়ী শিবের ছড়া গাহিয়া বেড়ায়। জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার পূর্বপারে, বিশেষ করিয়া ধূপগুড়ি অঞ্চলে শিব-খেলার আধিক্য দেখা যায়।

যিনি শিবের ছড়া গাহিয়া বেড়াইবেন, তাঁহাকে কতকগুলি রীতি-নীতির বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। একটি মাটির মালসায় শিবের নামে উৎসৃষ্ট ফুল-বেলপাতা-সিঁদুর ইত্যাদি দিয়া তাহাতে প্রদীপ ধরাইয়া দিতে হয়,—ডান হাতে কাঁধের কাছে গায়ক তাহা বহিয়া বেড়ান, বাম হাতে থাকে শিব-নামের লাঠি অথবা ত্রিশূল। গায়ক সমস্ত বৈশাখ ও কার্তিক মাস নিরামিষ খান এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন একবেলা নিজে রাঁধিয়া খান। গৃহস্থের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ইনি গান করেন এবং গান শুনিয়া স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া গৃহস্থ যদি ভিক্ষা না দেন, তবে মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা চাহিতে পারেন না। গৃহস্থ যখন ভিক্ষা দিবেন, তখন গায়ক সেইদিকে তাকাইতে পারিবেন না, অন্যদিকে চাহিয়া থাকিবেন। প্রতি বৎসর সমস্ত বৈশাখ ও কার্তিক মাসের ভোর হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত গায়ক এই ভাবে শিবের ছড়া গাহিয়া থাকেন। সাধারণত চুন ব্যবসায়ী যুগী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই ইহা গাহিয়া থাকেন।

গানের বিষয় শিবের গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা। বর্তমান সংকলনের ৫৩-সংখ্যক গানখানি এই ধরণের। অন্ন-অভাবে শিবের পারিবারিক জীবনে কী দুর্দশা দেখা দিয়াছে, গানটির বর্ণনীয় বিষয় তাহাই। পারিবারিক জীবনের এই দারিদ্র্য চণ্ডীকে একেবারে বাঙালী গৃহিণী করিয়া তুলিয়াছে; ভাঙ খাইয়া শিব আপন পুত্রের সহিত কোঁদল করিতেছেন এবং সেই "কোন্দলো ঘুচাইতে চণ্ডীর দিনো যায়।"

CENTRAL LIBRARY

॥ হুদুমা ॥

॥ ১ ॥

দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে, শস্যহানির আশঙ্কায় বর্ষাকে আবাহন জানাইবার প্রথা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপকভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের জনসমাজের বারি-দেবতা হইলেন 'হুদুমা' বা 'হুদ্‌মা' এবং ইহার উদ্দেশে গীত গানের নাম হইল 'হুদুমা' গান।

'হুদুমা' শব্দটির উৎপত্তি কি, তাহা আলোচনার যোগ্য। দেবতার নাম হইতে অনুষ্ঠানের নাম না হইয়া, অনুষ্ঠান হইতে দেবতার নাম হইয়াছে—হুদুমা। 'হুদুম' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে পারিলেই দেবতার নামের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

হুদুম শব্দটি উলঙ্গ অর্থে 'উদুম' হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি অঞ্চল 'উধুম' 'লিঙ্গ' বা 'বেহায়া' অর্থে চলিত আছে। এই গান গাহিবার সময় মেয়েরা একেবারে উলঙ্গ হইয়া থাকে। উলঙ্গ হইয়া যে গান গাওয়া হইয়া থাকে, তাহাই হুদুমার গান এবং সেই দেবতার নাম 'হুদুমা' বা 'হুদ্‌মা' বা 'হুদুম-চুকা'।

উলঙ্গ অর্থে 'উদুম' শব্দটি গ্রাম-বাঙলায় চলিত আছে। তারপর 'হ'-এর আগমে 'উদুম' 'হুদুমা' হইয়াছে। 'ভাষা-পরিচয়' অধ্যায়ের ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগে ইহার অন্যান্য দৃষ্টান্ত দিয়াছি।

অবশ্য কেহ কেহ 'হুদুম' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত নীহার বড়ুয়া তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন,

"এই মেঘ-দেবতা 'হুদুম-দ্যাও' নামে পরিচিত। নামের অর্থ সম্বন্ধে সঠিক অভিমত এ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ঐ অঞ্চলে হুতুম পেঁচাকে 'হুদুম' বলে এবং অপদেবতাকে 'দ্যাও' বলে অভিহিত করা হয়। হয়তো হুতুম পেঁচার গুরু গম্ভীর ডাকের সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ডাকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই এই নামের সৃষ্টি হয়ে থাকবে[১]।"

১ দেশ: ৮ আশ্বিন, ১৩৬১

CENTRAL LIBRARY

এই হুদুম দেবতার গান জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, রঙপুর প্রভৃতি জেলাতে তো হয়ই, উপরন্তু আসামের বাঙলা সীমান্তেও (বিশেষত গোয়ালপাড়া জেলাতে) ইহার পূজা হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত স্থানে বারিদেবতা 'হুদুম' নামেই পরিচিত।

এইচ. এইচ রিজলী লিখিতেছেন,

"When a drought has lasted long, the Rajbanshi Women make two images of Hudum deo from mud or cowdung, and carrey them away into the fields. There they strip themselves, naked and dance round the images, singing obscene songs, in the belief that this will cause rain to fall."[১]

হুদুমার অনুষ্ঠান দার্জিলিঙ জেলার কোচদের মধ্যেও দেখা যায়:

"অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অথবা অন্যকোন বিপৎপাতের সময় নিরবচ্ছিন্ন স্ত্রীলোকেরা হুদুম দেবের অর্চনা করে। স্ত্রীগণ এতদুপলক্ষ্যে নৃত্যগীত করিয়া থাকে[২]।"

কোচবিহারেও এই হুদুম দেবতার অর্চনা অপরিচিত নয়। ডব্‌লু. ডব্‌লু. হান্টার জানাইতেছেন,

"A singular relic of old superstition is the worship of the God called Hudm-deo. The women of a village assemble together in some distant and solitary place, no male being allowed to be present at the rite, which is always performed at night; a plantain or a young bamboo is stuck in the ground, and the women, throwing off their garments, dance round the mystic tree, singing old songs and charms. This rite is more especially performed when there is no rain, and the crops are suffering from drought."[৩]

১ H. H. Risley: The Tribes and castes of Bengal (1891). Vol. 1.

২ হরিমোহন সান্যাল: দারজিলিঙের ইতিহাস (১২৮৭), পৃঃ ১৩২

৩ W. W. Hunter: Statistical Account of Bengal (1875), Vol X. P. 378.

CENTRAL LIBRARY

ডাক্তার শ্রীকালিপ্রসাদ বিশ্বাস তাঁহার গবেষণা-গ্রন্থ 'Folklife and Culture of Rongpur'-এ[১] রঙপুর জেলার হুদুমা অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি আরো জানাইয়াছেন, রঙপুরের মুসলমানগণও হুদুমার পূজা করিয়া থাকেন।

"These rites are also observed by a class of Muslim women. These are taken by some to be a worship of the rain God বরুণ দেবতা। The dolls are images of the rain God and his consort."[২]

হুদুমার গান সাধারণত মেয়েরাই করে বটে, তবে পুরুষেরাও কোথাও কোথাও স্বতন্ত্রভাবে ইহা করিয়া থাকে। রঙপুর জেলার কৃষকগণ প্রতি রাত্রিতে কোনো চাষী গৃহস্থের গৃহে সমবেত হয় এবং উলঙ্গ হইয়া বারি-দেবতার উদ্দেশে গান গাহিয়া থাকে। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করিয়া গোরু খেদাইবার লাঠি, স্থানীয় ভাষায় যাহাকে বলা হয় 'পেনাটি'। তাহার পর ভূমির একটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দিক ঘিরিয়া সকলে নাচিতে ও গাহিতে থাকে। গানের প্রতিটি কলি যেই শমের মুখে আসিয়া পড়ে অমনি সমবেতভাবে গায়কগণ বৃত্তের কেন্দ্রে হাতের লাঠি দিয়া খোঁচা মারে। এই ভাবে কেন্দ্রটি অনেক সময় চার-ছয় ফুট গর্ত হইয়া যায়। কোনো কোনো স্থানে আবার গোরু খেদাইবার লাঠির পরিবর্তে থাকে উদুখলের দীর্ঘ মুষল, স্থানীয় ভাষায় যাহার নাম 'গাইন'। রঙপুরের পুরুষদের এই অনুষ্ঠানকে 'পেনাটি খেলা' বলে। স্পষ্টই ইহা যৌন-লীলার অভিনয়।

কোচবিহার-আসাম সীমান্তের হুদুমার পূজা কেমন করিয়া করা হইয়া থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত নীহার বড়ুয়া দিয়াছেন।[৩] এই অঞ্চলে হুদুমার পূজায় যে সমস্ত উপকরণ লাগে, তাহার মধ্যে ফিঙে পাখীর বাসা, এক সন্তানের জননীর স্নান করা জল, গণিকার কেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নৃত্যগীত ইত্যাদির ভাষা ও ভঙ্গি উপরের উল্লিখিত অন্যান্য অঞ্চলের মতোই।

১ এই গ্রন্থ এখনো অপ্রকাশিত। আমি পাণ্ডুলিপি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি।

২ Dr. K. P. Biswas: Folklife and culture of Rangpur, pp. 145-146.

৩ দেশ, ৮ আশ্বিন, ১৩৬১।

CENTRAL LIBRARY

পরবর্তী পরিচ্ছেদে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে মেয়ে ও পুরুষেরা কি ভাবে হুদুমার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রঙপুর এবং আসামের প্রান্তভাগ কিয়দংশে একই বিশিষ্ট সংস্কৃতির ক্ষেত্র বলিয়া এই সকল অঞ্চলের হুদুমার অনুষ্ঠানের কথা খানিকটা বলিয়া লইলাম।

। ২ ।

হুদুমার অনুষ্ঠানের কোনো ধরা-বাঁধা তিথি-তারিখ নাই। বৃষ্টি যখন নামিল না, তখন পাড়ার মেয়েরা একদিন ঠিক করিল, রাত্রে তাহারা হুদুমার অনুষ্ঠান করিবে। সাধারণত বর্ষিয়সী মেয়েরাই অগ্রণী হইয়া এই কাজটি করে। রাত্রি বাড়িলে, কথামতো পাড়ার অন্যান্য বাড়ী হইতে মেয়েরা আসিয়া কাহারও বাড়ীতে জড় হয়। সেখান হইতেই অনুষ্ঠান সুরু করা হইয়া থাকে।

প্রথমেই মেয়েরা দেহের সকল বস্ত্র খুলিয়া ফেলে। হুদুমার অনুষ্ঠানে সকলকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হইতে হইবে। তারপর সকলে নিজের নিজের চুল এলো করিয়া নেয়। এই ভাবে দল বাঁধিয়া সকলে ধানের জমি ও গৃহস্থের অঙ্গনে হুদুমার উদ্দেশে নাচিয়া-গাহিয়া বেড়ায়।

যখন এই হুদুমার দল এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যায়, তখন কখনোই তাহারা প্রকাশ্য সড়কের উপর দিয়া চলে না। এই সময়ে তাহারা ধানের জমির উপর দিয়া চলাফেরা করে এবং ধানের ক্ষেত দিয়া চলিবার কালে যৌন-সংগম কালীন ভাব-ভঙ্গিগুলি তাহাদের দেহে ফোটাইয়া তোলে। জমির উপর দিয়া চলিবার সময় গান গাহিবার রীতি নাই। এই সময় 'ও-ও-ও' করিয়া সমবেত কণ্ঠে একটি দীর্ঘ লীলায়িত স্বর তারা গ্রামে তুলিয়া ভাজিতে থাকে। মনে হয়, কতোদূর হইতে কাহারা যেন ব্যাকুল কণ্ঠে কাহাকে ডাকিতেছে।

দূর হইতে ওই স্বর শুনিলেই বোঝা যায়, হুদুমার গায়িকাগণ আসিতেছে। বাড়ী-বাড়ী হইতে এই স্বর শুনিয়া মেয়েরা আসিয়া দলে যোগদান করে। যে বাড়ীর অভিমুখে গায়িকাগণ আসিতেছে, ওই স্বর শুনিবামাত্র সেই বাড়ীর সমস্ত আলো নিভাইয়া দেওয়া হয়। বাড়ীর বয়স্ক পুরুষেরা হয় একটি ঘরে

CENTRAL LIBRARY

গিয়া আশ্রয় লইবে, নতুবা বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবে। শোভাযাত্রা-কারিণীগণ বাড়ী ঢুকিবার পূর্বেই এইজন্য গাহিয়া থাকে, "বেটা ছাওয়া নোকলা তমরা পালাও রে পালাও"—সং ৫৪।

শয়তানি করিয়া কেহ ইহার অন্যথা করিলে তাহাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া এবং আর্থিক জরিমানা করা হইয়া থাকে। নৈতিকতার দিক ছাড়িয়া দিলেও, ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, বয়স্ক কোনো পুরুষ এই অনুষ্ঠান দেখিলে যে উদ্দেশে এই অনুষ্ঠান করা হইতেছে, তাহার সবটাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বাড়ীতে ঢুকিয়া গায়িকাগণ গান গাহিতে ও নাচিতে থাকে। এই সময়ে সময়ে গীত গান স্থানে-স্থানে এতো অশ্লীল যে তাহা অকথ্য, অশ্রাব্য, অলেখ্য। কিন্তু, বিশ্বাস করা হয়, এই অশ্লীল গানই পবিত্র। এই সকল গানের মধ্য দিয়া কখনো হুদুম দেবতার করুণা ভিক্ষা করা হয়, কখনো তাঁহাকে দয়িত কল্পনা করিয়া দেহকে উপচার রূপে নিবেদিত করা হয়, কখনো বা জল না দিবার জন্য হুদুমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়, ধিক্কার দেওয়া হয়, আবার কখনো বা ঠাট্টা-রঙ্গও করা হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা, হুদুমার গান সবই অশ্লীল। ইহার অধিকাংশ গানই অশ্লীল বটে, কিন্তু অশ্লীলতাই ইহার সবটা নহে।

গৃহাঙ্গনে আসিয়া হুদুমার গায়িকাগণ কতকগুলি আচার পালন করিয়া থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সময় বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। নীচে তাহার কিছু পরিচয় দিলাম।

জলপাইগুড়ি জেলার পঁচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানার (বর্তমানে এই থানা দুইটি বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) পঁচাগড় হইতে আরম্ভ করিয়া রাজগঞ্জ থানার মেয়েরা উদূখলে জল ভরিয়া দীর্ঘ মুষল দিয়া ধান ভানার অভিনয় করিয়া থাকে। একজন মেয়ে এইভাবে ধান ভানার ছলে জল ভানে, বাকি সবাই তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া নাচে ও গায়। জলপাইগুড়ির উপভাষায় ধান ভানাকে বলে 'ধান-ভুকা'। জল ভানিবার ছলে এই গান গাওয়া হয় বলিয়া এই গানকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে 'জল-ভুকার গান' বলা হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অনুমান, এই উদূখল স্ত্রী-অঙ্গের ও মুষল পুংলিঙ্গের প্রতীক।

বোদা, তেঁতুলিয়া (এই দুইটি থানাও বর্তমানে বাঙলাদেশে) থানায়

CENTRAL LIBRARY

দেখা যায়, একটি সাপকে হত্যা করিয়া মাটিতে পোঁতা হয় এবং সেই স্থানটুকু ঘিরিয়া নাচা-গাওয়া হয়।

কোনো কোনো অঞ্চলে আবার একটি ছোটো ছেলেকে অঙ্গনের মাঝখানে রাখিয়া (যেন সেইই হুদুম দেবতা) অন্য সবাই উলঙ্গাবস্থায় তাহাকে ঘিরিয়া-ঘিরিয়া নাচে ও গায়। কোথাও আবার এই পুরুষ-শিশুর বদলে একটি কলা গাছ পোঁতা হয়।

তিস্তার তীরবর্তী পাহাড়পুর ও বালাপাড়া অঞ্চলের হুদুমার অনুষ্ঠান বেশ মনোরম। এই সকল স্থানে হুদুমার বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। এইজন্য সহজে বহনযোগ্য ছোটো-ছোটো লাঙ্গল ও জোয়াল গড়াইয়া লওয়া হয়। লাঙ্গলকে হুদুমা এবং জোয়ালকে তাঁহার পত্নী—হুদুমানী রূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। এই লাঙ্গল-জোয়ালরূপী হুদুমা-হুদুমানীর বিবাহে লৌকিক নর-নারীর বিবাহের মতোই অনুষ্ঠানের অভিনয় করা হয়। হুদুমা-হুদুমানীর প্রাক্-বিবাহ এবং বিবাহোত্তর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন, কৃষকের জীবনের আশা-আনন্দ প্রভৃতি লৌকিক মানুষের সংসারের মতো করিয়া গানে চিত্রিত হইয়া থাকে। হুদুমার এই গানগুলি বেশ সুন্দর।

তিস্তার পূর্বদিকে বিশেষত ধূপগুড়ি অঞ্চলে দেখা যায়, দুইজন মেয়ে উলঙ্গাবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া হলকর্ষণরত বলদের অনুকরণ করে, তারপর উহাদের কাঁধে অনুষ্ঠানের জন্য ছোটো করিয়া গড়ানো লাঙ্গল-জোয়াল চাপাইয়া দিয়া অপর একজন হলকর্ষণের অভিনয় করিয়া চলে। অভিনয়টিকে পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য বৃষ্টির অনুকরণে সঘন জল ছিটানো হয়। নাচ ও গান চলিতে থাকে।

ধূপগুড়ি থানাতেই অন্যরূপে হুদুমার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। পরপর কয়েকরাত্রি উলঙ্গ হইয়া মেয়েরা বাড়ী-বাড়ী গান গাহিয়া বেড়ায়। শেষ দিন পূজা করা হয়। এই পূজা নির্জনে দিনের বেলায় অথবা রাত্রি বেলায় হইয়া থাকে। কোনো কুমারী মেয়ের যোনীর উপর কাদা লেপিয়া তাহাতে কয়েকটি ধান রোপণ করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই যোনীকে বিবিধ উপচারে পূজা নিবেদন করা হয়। বৃষ্টি নামাইবার উদ্দেশে কুমারী মেয়ের যোনী-পূজার প্রথা বাঁকুড়া জেলার ডাম্মা গ্রামেও লক্ষ করা যায়।

বেরুবাড়ী অঞ্চলে একটি কুলার উপর দুইটি ব্যাঙ স্থাপন করিয়া তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়; কল্পনা করা হয়, উহার একটি হুদুমা, অপরটি হুদুমানী।

খাপগঞ্জ, বেকবাড়ী অঞ্চলে রীতিমতো অভিনয় করা হয়। অনাবৃষ্টিতে দেশে কিরূপ মৎস্যাভাব হইয়াছে, তাহার এক বিবরণ মেলে একটি হুদুমা গান হইতে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সংকলনের ৫৯-সংখ্যক গানটি দ্রষ্টব্য।

এই ভাবে হুদুমার গায়িকাগণ শোভাযাত্রার আকারে বাড়ী-বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়, অনেক রাত্রি পর্যন্ত। পরিশেষে, নিকটস্থ কোনো জলাশয়ে স্নান করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া আইসে। এই স্নান বৃষ্টির প্রতীক। কল্পনা করা হয়, হুদুমার গানেই বৃষ্টি নামিয়াছে এবং তাহারই ফলে দেহ ভিজিয়াছে।

হুদুমার এই অনুষ্ঠান মেয়েরাই বেশি করিলেও পুরুষেরাও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী হুদুমার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারাও রাত্রিবেলায় উলঙ্গ হইয়া ধানের জমিতে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার পুরুষেরা অবশ্য হুদুম দেবের নিকট বারি প্রার্থনা না করিয়া শিবের নিকট বারি প্রার্থনা করিয়া থাকে। কি ভাবে উহা করা হয়, নীচের উদ্ধৃতিটুকু হইতে তাহা জানা যাইবে।

"জল চাই—চাই জল। দল বেঁধে পাড়ার ছেলে বুড়ো স্নান করে পবিত্র মনে 'গাইন' (উদূখলের মুষল) হাতে নিয়ে বিভিন্ন বাড়ীর অঙ্গনে নিয়ে···গান গেয়ে শিবের কাছে মাগন জানাতে থাকে এবং গানের তালে তালে হাতের গাইন দিয়ে সারা অঙ্গন গর্ত করে ফেলে। সমস্ত অঙ্গন এতে নষ্ট হয়ে গেলেও গেরস্থের মনে অসন্তোষ নেওয়া চলবে না। এতে রুদ্র শিব রুষ্ট হবেন—তাদের বিশ্বাস। তিনদিন ধরে চলবে সে পাড়া পরিক্রমা। শেষের দিন চাঁদা লব্ধ অর্থে পুজোয় বসবে পুরোহিত। চলবে উদার শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ, করজোড়ে ভক্তিপূত নর-নারী আকুলিত আবেগে মিনতি জানাবে 'বৃষ্টি চাই, বৃষ্টি চাই'। শত বন্দনা, স্তব, স্তুতি পেয়ে এবারে শিব হবেন তুষ্ট—সার্থক, সুন্দর সৃষ্টির সহায়। তারপর আকাশ ভেঙ্গে আসবে বৃষ্টি, আসবে ঝড়। মাতা ধরণী হবেন শান্ত, সুশীতল, শস্য শ্যামলা।"[১]

এই অনুষ্ঠানের সহিত রঙপুরের 'পেনাটি খেলা' (ইহার বর্ণনা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দিয়াছি) বিশেষভাবে মনে পড়ে। বর্তমান সংগ্রহের ৬৪-সংখ্যক

১ উত্তর পথ (জলপাইগুড়ি): পৌষ, ১৩৬৪

গানখানিতে শিবের নিকট বারি প্রার্থনা করা হইতেছে। ৬৩-সংখ্যক গান খানিতে দেখা যায়, 'হুদুম-চুকা-'র অনুষ্ঠানে যাইবার জন্ম সকলকে আহ্বান করা হইতেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ী-কালাকাটা অঞ্চলে বালক ও কিশোরেরা গোল হইয়া বসিয়া পরস্পরের পিঠ চাপড়াইয়া বৃষ্টি নামাইবার জন্ম ছড়া কাটে। বালাপাড়া অঞ্চলে বৃষ্টি নামাইবার জন্ম বয়স্ক পুরুষেরা বাঘ-বন্দী খেলিয়া থাকে॥

॥ ৩ ॥

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়ে ও পুরুষেরা বারি-দেবতার সন্তুষ্টির জন্মে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে, সেই সকল আচার-অনুষ্ঠান বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পালন তো করাই হয়, উপরন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের আদিম কৃষক-সমাজের মধ্যেও ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি নামাইবার জন্ম কি-কি আচার-অনুষ্ঠান কেমন করিয়া পালন করা হয়, অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিকবোধে আমরা তাহার বিবরণ দিব না। জলপাইগুড়ির অনুষ্ঠানের সহিত যে সমস্ত দেশের অনুষ্ঠানের মিল আছে, বর্তমানে সেইগুলিই লক্ষ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ষা-আবাহন করিবার সকল আচারের মধ্যে তিনটি আচার প্রায় সর্বত্র পালন করা হইয়া থাকে। প্রথমটি, উলঙ্গ হওয়া। দ্বিতীয়টি, বৃষ্টির অনুকরণে বারিবর্ষণ ও স্নান করা; তৃতীয়টি, হলকর্ষণের অভিনয় করা।

বর্ষাকে আবাহন করিবার কালে উলঙ্গ হইবার সার্থকতা সহজেই বোঝা যায়। কল্পনা করা হয়, বারি-দেবতা পুরুষ এবং শস্যক্ষেত্র নারী। নরনারী নির্বিশেষে সকল মানুষ এই সময় নারীর ভূমিকা লইয়া থাকে। কোনো কারণে বারি-দেবতা রুষ্ট হইয়া বারি বর্ষণ স্থগিত রাখিয়াছেন, অতএব সময় হইলেও বৃষ্টি পড়িল না; সুতরাং রুষ্ট পুরুষকে দেহের উপচারে তুষ্ট করিলে বৃষ্টি পড়িবে, এই আশাতে অনুষ্ঠানকারীরা উলঙ্গ হইয়া নৃত্য-গীত করিয়া থাকে এবং এই একই কারণে বর্ষা-আবাহনের গানের মধ্যে অশ্লীলতা আসিয়া যায়।[১]

১ এ সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যের জন্ম J. G. Frazer : Golden Bough : PP 135-139. দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

জেমস্ জর্জ ফ্রেজার তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'গোল্ডেন্ বাউ-'তে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ষা-আবহানের বিচিত্র অনুষ্ঠানের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণ হইতেও দেখা যায়, বারি প্রার্থনাকালে পৃথিবীর বহুদেশে উলঙ্গ হইবার এবং বর্ষার অনুকরণে বারি ঢালিবার প্রথা চলিত আছে।

ফ্রেজারের বর্ণনা হইতে জানা যায়, উত্তর আমেরিকার ওমাহা-ইণ্ডিয়ানগণ অনাবৃষ্টির সময় একটি বিরাট পাত্রে জল ভরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নাচ গান করিয়া থাকে। ইহা যেন অনেকটা জলপাইগুড়ির 'জল-ভুকা' অনুষ্ঠানের মতো। 'বিরাট পাত্র' এখানে উদূখল হইয়াছে। অবশ্য 'জল-ভুকার-'র ব্যাখ্যায় বলা হয়, উদূখল স্ত্রী-অঙ্গের এবং মুষল পুংলিঙ্গের প্রতীক। জলভানার এই বিশেষত্ব লক্ষ করিবার মতো।

দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকার ডেলাগোয়া উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলবাসী এক শ্রেণীর নিগ্রো মেয়েরা অনাবৃষ্টির সময় রাত্রিবেলায় প্রায় উলঙ্গ হইয়া গ্রামের প্রতিটি কূপ হইতে জল-কাদা প্রভৃতি সংগ্রহ করে। পথে চলিবার সময় তাহারা এক বিচিত্র রব (Peculiar cries) করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির হুদুমা গায়িকাদের 'ও-ও-ও' ধ্বনি বিশেষভাবে মনে পড়ে।

হলকর্ষণের অভিনয়ও বর্ষা-আবাহনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। পৃথিবীর বহু স্থানে হলকর্ষণের অভিনয় করা হয় বারি প্রার্থনার কালে। ফ্রেজার লিখিয়াছেন, ককেশাস্ অঞ্চলে এই অভিনয়কে বলা হয় 'ploughing the rain'. আর্মেনিয়াতেও এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়। গ্রামের কোনো প্রাচীনা অথবা পুরোহিতের স্ত্রী পুরোহিতের পোষাক পরেন ; অন্যান্য মেয়েরা পুরুষের পোষাক পরিয়া একটি লাঙ্গল লইয়া নদীর উজানের দিকে হলকর্ষণের অভিনয় করিয়া থাকে। জর্জিয়ায় ককেশীয় প্রদেশে অনাবৃষ্টির সময় বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া মেয়েরা জোয়াল কাঁধে লয় এবং কোনো পুরোহিত চাষীর ভূমিকা গ্রহণ করে। অনন্তর তাহারা নদী, জলাশয় প্রভৃতি স্থানে যাইয়া হলকর্ষণের অভিনয় করিয়া থাকে। ট্রানসিলভানিয়ার একটি জেলাতে দেখা যায়, সেখানকার মেয়েরা উলঙ্গ হইয়া কাহারও জমি হইতে মই চুরি করিয়া তাহাতে প্রদীপ জ্বালাইয়া ভাসাইয়া দেয়।

প্রায় এই একই অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে করা হইয়া থাকে।

১৮৯১ খ্রীঃ ২৪শে জুলাই উত্তর ভারতের চুনারের কৃষক সম্প্রদায়ের মেয়েরা এইরূপ এক অনুষ্ঠান করিয়াছিল :

"Three women from a cultivator's family stripped off all their clothes : two were Yoked to a plough like oxen and a third held the handle. They then began to imitate the operation of plughing ..."[১]

ঠিক এই একই রীতি জলপাইগুড়ি জেলাতেও লক্ষিত হইয়া থাকে।

উলঙ্গ হওয়া, বারি সেচন করা, এবং হলকর্ষণের অভিনয় করা—বর্ষা-আবাহনের এই তিনটি মুখ্য আচার ছাড়াও আরো দুই একটি আচার আছে, যাহা অনেক দেশে পালিত হইয়া থাকে।

লক্ষ করা যায়, বারি প্রার্থনার অনুষ্ঠানে সাপ ও ব্যাঙ এক বিশিষ্ট ভূমিকা লইতেছে।

বৃষ্টি নামাইবার জন্য উত্তর ভারতের কুমায়ন অঞ্চলে একটি বাঁশে অথবা গাছে একটি ব্যাঙকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।[২] কোথাওবা মাটি বা গোবরের তলায় একটি ব্যাঙকে পুঁতিয়া রাখা হয়[৩]। ফ্রেজার এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ হত্যা করিবার কথা লিখিয়াছেন। মাদ্রাজের কৃষক সম্প্রদায়ের (কাপু ও রেড্ডিগণ) মেয়েরা একটি জীবন্ত ব্যাঙকে কুলার উপর স্থাপন করিয়া বাড়ী-বাড়ী ঘুরে এবং ব্যাঙকে বৃষ্টি-দেবতা আখ্যা দিয়া গান গায়। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী অঞ্চলে ব্যাঙের বিবাহ দিবার প্রথা স্মর্তব্য।

সাপও বারি প্রার্থনা অনুষ্ঠানে কোনো কোনো দেশে সক্রিয় ভূমিকা নিয়া থাকে। দক্ষিণ মির্জাপুরের কোরওয়া (the Korwas) আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, 'when a snake hisses, rain is near'।[৪] এ বিষয়ে ফ্রেজার উত্তর অস্ট্রেলিয়ার এক উপজাতির অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

১ North Indian Notes and queries : March, 1892, Vol. 1. P. 210.

২ North Indian Notes and queries, 1893, Vol; 111.

৩ North Indian Notes and queries, 1895, Vol. IV. P. 178

৪ North Indian Notes and queries, 1892, Vol. 1. P. 139.

CENTRAL LIBRARY

"He catches a snake, puts it alive into the pool, and after holding it under water for a time takes it out, kills it, and lays it down by the side of the creek. Then he makes an arched bundle of grass stalks in imitation of a rain bow, and sets it up over the snake. After that all he does is to sing over the snake and the mimic rainbow.[১]"

জলপাইগুড়ির পঁচাগড়, বোদা, তেঁতুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সর্প হত্যার অনুষ্ঠান এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করা ছাড়াও বারি প্রার্থনা কালে গীত গানের মধ্যে বারি-দেবতাকে তিরস্কার, গঞ্জনা এবং উপহাস করিবার প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে এমন দুই একটি গান পাওয়া যায়, যাহাতে হুদুম দেবতাকে ঠাট্টা-রঙ্গ করা ছাড়াও তিরস্কার-গঞ্জনাও করা হইতেছে।

জাপানে দেখা যায়, বৃষ্টি না দিলে গ্রাম-দেবতার উদ্দেশে গালাগালি করা হয়, দেবতার বিগ্রহকে রৌদ্রের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয় শাস্তি দিবার জন্য। চীন দেশে বারি দেবতার ড্রাগনের মূর্তিকেও এইরূপ লাঞ্ছনা দেওয়া হয়। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলেও এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়। বর্ধমান জেলার ক্ষুদকুড়ি গ্রামের আগুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা বৃষ্টি না হইলে ধর্মঠাকুরের প্রস্তরখণ্ড রৌদ্রে ফেলিয়া রাখে এবং তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া থাকে।[২]

জলপাইগুড়ির হুদুমা গানে বারি দেবতাকে তিরস্কার করিবার প্রবণতা এই বিষয়ে তুলনীয়।

॥ ৪ ॥

এইবার সঙ্কলিত হুদুমা গানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে।

৫৪ ও ৫৪ক-সংখ্যক গান দুইখানি গায়িকাগণের গৃহ প্রবেশ-কালীন গান। ইহার একটিতে বলা হইতেছে, শোভাযাত্রাকারিণীরা আসিয়াছে, দুয়ার খুলিয়া দাও। অপরটির বক্তব্য, পুরুষেরা বাড়ী হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও।

১। Golden Bough, P. 72.

২ Census—1951, P.-352.

CENTRAL LIBRARY

দুই-একটি গানে মেঘকে বলা হইতেছে, পর্বত ভাঙ্গিয়া জল আনিবার জন্যে। ৫৪খ, ৫৫ক, ৫৫খ ও ৭০-সংখ্যক গানগুলি এই শ্রেণীর। ৫৪খ-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, ছেলে দুইটি ক্ষুধায় এলাইয়া পড়িয়াছে, ঘরে তেমন খাদ্য নাই, ওগো মেঘ, যাও জল লইয়া আইস। ৫৫ক-সংখ্যক গানে 'হরিয়া' নামক জনৈক ব্যক্তিকে জল আনিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

এই 'হরিয়া' অজ্ঞাত-পরিচয়। তবে, গান হইতে জানিতেছি, ইহারা দুই ভাই। কোনো কোনো গানে আবার ইহারা সাত ভাই বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঠিক একই কথা হুদুমদের সম্পর্কেও বলা হইয়াছে—"হুদুমের ঘর সাত ভাই"—সং ৫৫। বহু অনুরোধের পরও যখন উল্লিখিত হরিয়া বৃষ্টি আনিল না, তখন তাহাকে ধিক্কার দিয়া গানে বলা হইয়াছে "কারোয় দেহায় পানি নাই"[১]—সং ৫৫ক। একই কথা হুদুমের সম্পর্কেও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, হুদুম ও হরিয়া অভিন্ন। বায়ু কোণকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'হাঁড়িয়া কোণ'। অসংখ্য গানে এই 'হাঁড়িয়া' কোণ উল্লিখিত হইয়াছে। বায়ুকোণে মেঘ জমিলে নাকি বৃষ্টি হইবেই। মনে হয়, 'হরিয়া' 'হাঁড়িয়া' কোণের সহিত জড়িত। ইহা স্থানীয় Rain-lore-এর একটি বিশিষ্ট দিক।

একটি গানে পাওয়া যাইতেছে, মেঘ বৃষ্টি লইয়া পৃথিবীতে আসিবে, তাই তাহার কন্যা 'ঝলমলী' (ইহা বিদ্যুৎ মনে হয়)-কে শীঘ্র ভাত রাঁধিয়া দিবার জন্য বলা হইতেছে (সং ৫৫খ)।

কয়েকটি গানে মেঘ-রাজের প্রতি প্রেম নিবেদন করা হইয়াছে। ৬৭-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, ওগো মেঘ, তুমি বিনা আমার বুক ফাটিয়া গেল, আমাকে ফেলিয়া তুমি কোন দেশে গিয়া রহিয়াছ। ৫৫গ-সংখ্যক গানে মেঘকে মাথার কেশ ও গলার মালা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার কথা পাওয়া যাইতেছে।

৫৬-সংখ্যক গানে সম্পূর্ণ নতুন প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই গান হইতে জানা যাইতেছে, 'হাঁড়িয়া' (হরিয়া)-র একজন ভগ্নী আছে। সে উলঙ্গ হইয়া নাচিতেছে, তাহার নাচে মেঘ-দেবতা তুষ্ট হইবেন। একই কথা ৫৮খ-সংখ্যক গানে মিলিতেছে। প্রধান পূজারিণী নাচিতেছে, তাহার

১ এই 'পানি'-র অর্থ 'রেতঃ'।

CENTRAL LIBRARY

দেহে কোনো আবরণ নাই, মাথায় একটু ঘোমটা আছে। ওগো হুদুমা, টান দিয়া তাহা সরাইয়া দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া তুমি ভোগ কর। অপর একখানি গানেও হুদুমার তুষ্টির জন্য দেহকে নিবেদিত করা হইয়াছে (সং ৬০)।

ইহার পর হুদুমা-হুদুমানীর বিবাহ প্রসঙ্গ ও দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। বিবাহ করিয়া হুদুমা জমি পাইল, গোরু পাইল (সং ৫৭)। তাহার শ্যালক দিল অঙ্গুরী, শ্যালিকা দিল নৌকা। সেই নৌকায় চড়িয়া হুদুমা নদীতে পারাপার করিয়া থাকে (সং ৫৬ক)। তাহার পর সোনার লাঙ্গল ও রূপার ফাল লইয়া হুদুমা মাঠে গিয়া হলকর্ষণ করিতে থাকিল (সং ৫৮)। কিন্তু, বর্ষণ হয় নাই, সেই দুঃখে হুদুমা ধানের ক্ষেতেই গড়াগড়ি যাইতে থাকে। হুদুমানী তাহার জন্য চাউল ভাজা ও জল আনিয়া দেখে, জলাভাবে কৃষক হুদুমার সকল ধান মরিয়া গিয়াছে (সং ৫৮ক)। হুদুমা তাই কাঁদিতে বসিল (সং ৫৮খ)।

ইহার পর কৃষক হুদুমাকে জেলেরূপে দেখা যায়। একটি গানে পাই, হুদুমা-হুদুমানী মাছ ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে।

৬১-সংখ্যক গানটি জল ভানিবার সময় গীত হয়। ধান ভানার ক্রিয়ার মধ্যে নর-নারীর যৌনসঙ্গমের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

জল না দিবার জন্য মেঘকে 'নিঠুর ম্যাঘ', 'কটুর ম্যাঘ', 'বাউদিয়া ম্যাঘ' (সং ৫৪গ), 'বইল-পেটি ম্যাঘ' (সং ৫৫), 'কালিয়া ম্যাঘ' (সং ৫৫গ) ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। একটি গানে মেঘকে ধিক্কার দিয়া ও ব্যঙ্গ করিয়া বলা হইতেছে, আমাদের গা ধুইবার জন্যে তুমি তো জল দিলে না। ওগো মেঘ, আইস, আমাদের 'দেহ' (স্ত্রী-অঙ্গ) -ধোয়া জল দিয়া তুমি তৃষ্ণা নিবারণ কর (সং ৫৫)।

৬২, ৬২ক, ও ৬২খ-সংখ্যক গানগুলি অনুষ্ঠান শেষ করিয়া কোনো জলাশয়ে স্নান করিবার সময় গীত হয়। এইগুলির একটিতে বলা হইতেছে, আজ কয় দিন ধরিয়া ঋতুমতী হইয়াছি, কিন্তু জলাভাবে স্নান করিতে পারিতেছি না, সেই ভাবেই ধান ভানিতে বসিয়াছি। ওগো মেঘ, এক পশলা বৃষ্টি দাও, স্নান করি (সং ৬২)। দেহের এই 'দুর্গতি'-র কথা ৬২খ সংখ্যক গানেও বলা হইয়াছে॥

॥ জিতুয়া ॥

॥ ১ ॥

মুখ্য-চান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী অথবা গৌণ-চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীকে জিতাষ্টমী বলা হইয়া থাকে। এই জিতাষ্টমীকেই জলপাইগুড়ি জেলায় বলা হয় 'জিতুয়া'।

অপুত্রক মাতা এই জিতুয়া পূজা করিলে পুত্রবতী হন,—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। প্রবাদ আছে, জলপাইগুড়ির প্রাক্তন রাজা স্বর্গীয় প্রসন্নদেব রায়কতের মাতা এই ব্রত করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে রাজা প্রসন্নদেবের জন্ম হয়।

জলপাইগুড়ির জিতুয়ার সহিত বাঁকুড়া জেলার 'জিতা-পরব'-এর অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করিতে পারা যায়। নীচে বাঁকুড়া জেলার জিতা-পরবের একটি বর্ণনা সঙ্কলিত হইল।

"জিতাষ্টমীর দিন প্রাঙ্গণে একটি চতুষ্কোণ কুণ্ড কাটা হইয়াছে। কুণ্ডের মধ্যে কয়েকটা ধান্য, কচু, হরিদ্রা এবং ঠিক মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ বটশাখা প্রোথিত হইয়াছে। শাখা হইতে অগণিত শালুক ফুল ঝুলিতেছে। কুণ্ডখনিত মৃত্তিকায় চতুর্দিকে বেদী নির্মিত হইয়াছে। প্রদোষকালে গ্রামের বধূ ও বর্ষীয়সীগণ দলে দলে পিতলঘট কক্ষে লইয়া আসিয়া সেই বেদীর চতুর্দিকে সাজাইয়া রাখিতেছেন। ইহারা সকলেই ব্রতধারিণী, সমস্ত দিন উপবাসী আছেন। ঘটের মধ্যে সজল মটর অথবা ছোলা-কলাই আছে। প্রত্যেক পরিবারে যতজন, ততো সের বা ততো পোয়া কলাই। ঘটের মুখ আবৃত, মুখে একটি করিয়া শশা। কুণ্ডের পশ্চিম দিকে পশ্চিম মুখে স্থাপিত একটি কাঁচা মাটির প্রতিমা। এই দেব প্রতিমার নাম জীমূতবাহন।···ইহার বাহন হস্তী, হস্তে বজ্র, শিরে ছত্র। বেদীর চতুর্দিকে ব্রতিনীগণ মৃণ্ময় শৃগাল-শকুনি সাজাইয়া রাখিয়াছেন।"···

"রাত্রি এক প্রহর হইতে চলিয়াছে। পুরোহিত আসিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন।···চারি প্রহরে চারিবার জীমূতবাহনের পূজা। ব্রতিনীগণ সেখা-

CENTRAL LIBRARY

নেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিবেন। কাহারও বা ঘৃতদীপ 'মানসিক' আছে। চারি প্রহরের মধ্যে নিভিবার জো নাই, স্বামী-পুত্রের অকল্যাণ হইবে।"...

"প্রাতঃকালে শৃগাল-শকুন বিসর্জন এবং ব্রতান্ত স্নান। ব্রতধারিণীগণ জলাশয়ের তীরে সমবেত হইয়া মৃণ্ময় শৃগাল-শকুনিগুলি জলে ফেলিয়া দেন এবং পূজার প্রসাদী শশাটি লইয়া জলে ডুব দেন, সেই নিমজ্জিত অবস্থায় শশাটি কামড়াইয়া জল হইতে উঠিয়া চিঁড়া দই ফলার করেন।"[১]

জলপাইগুড়ি জেলার জিতুয়া-ব্রতের পরিচয় এইরূপ :

পূজারিণী (ইহাকে মারেয়ানী বলা হয়) ভূমিতে গর্ত করিয়া তাহার চারিদিকে খুঁটি পুতিয়া পূজার ডালা স্থাপন করেন, তারপর সেই ডালার উপর চন্দ্রাতপের মতো করিয়া একটি ছাতা মেলিয়া দেন। ডালাতে থাকে কলা, চ্যাপের খই ও মাগুর মাছ। নীচের গর্তেও অনেক সময় মাগুর মাছ ও শালুক ফুল দেওয়া হয়। পূজাবেদীর এই পরিচয় ৬৫-সংখ্যক গানে সুন্দর করিয়া বলা হইয়াছে।

বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ির জেলার মতো মেদিনীপুর জেলাতেও 'জিতারগোট' হয় (প্রবাসী, কার্তিক : ১৩৬২, পৃঃ ১২৮)। মেদিনীপুরে মাগুর মাছের বদলে ঘুসো মাছ ও পুঁই শাকের তরকারি দেওয়া হয়।

পূজার পর জলপাইগুড়ি জেলায় জিতুয়া ব্রতের 'কথা' বলা হয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে জিতুয়ার ব্রতকথাটি সঙ্কলিত হইল।

॥ ২ ॥

জিতুয়ার ব্রত কথা এই :

একদিন এক শকুন ও এক শৃগাল স্থির করিল, মানুষের মতো তাহারাও তপস্যা করিবে। স্থির করিল, তাহারা একুশ দিন ধরিয়া উপবাস করিবে। একটি নদীর তীরে একটি গাছের উপর শকুন এবং গাছের নীচে শৃগাল উপবাস আরম্ভ করিল। উনিশ দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল। বিশ দিনের দিন এক ব্যাপার ঘটিল। নদী দিয়া মিঠু তেলির মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া শৃগাল আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

১ শ্রীসুখময় সরকার : জিতাষ্টমী : প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৬১।

CENTRAL LIBRARY

সে গিয়া সেই মৃত দেহ খাইল। গাছের উপর হইতে শকুনি সবই দেখিতে পাইল, কিন্তু সে কিছু বলিল না। এই ভাবে একুশ দিন কাটিয়া গেল, ভগবান তাহাদের তপস্যার তুষ্ট হইয়া উভয়কেই মানুষ করিয়া দিলেন। তাহারা দুই রূপসী নারী হইয়া একজন গাছের উপরে এবং অপরজন গাছের নীচে অবস্থান করিতে থাকিল।

এমন সময় সেই দেশের রাজা ও মন্ত্রী মৃগয়া করিতে আসিয়া এই দুই নারীকে দেখিতে পাইল। রাজা মন্ত্রীকে বলিল, আমাদের মৃগয়ায় কাজ নাই। এই নারী দুই জনকে আমরা বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই। আইস, গাছের তলের নারীকে আমি বিবাহ করি, তুমি গাছের উপরে অবস্থিতা নারীকে বিবাহ কর।

এইরূপে দুই জনে দুই নারীকে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিল। দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল। ক্রমে মন্ত্রীর ঔরসে শকুন-কন্যার গর্ভে সাতটি ছেলে হইল। কিন্তু, রাজ-রাণী শৃগাল-কন্যার কোনো সন্তান হইল না। এই জন্য শৃগাল-কন্যার মনোকষ্টের শেষ নাই। সে দিন-রাত ভগবানকে ডাকিয়া চলিল। অবশেষে ভগবান তুষ্ট হইয়া তাহাকে জিতাষ্টমীর পূজা করিতে বলিলেন। কি কি উপচারে পূজা করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। পূজা করিতে হইবে—ঢ্যাপের ফুল, মাগুর মাছ ও কলা দিয়া। পূজার পর সেই কলাটি খাইলেই সে পুত্রবতী হইবে।

কথামতো শৃগাল-কন্যা জিতাষ্টমীর পূজা করে, কিন্তু পূজার কলা সে খাইতে পারে না। শকুন-কন্যার সাত ছেলেরা আসিয়া তাহা খাইয়া যায়। ইহাতে শৃগাল-কন্যা ভীষণ রাগিয়া গেল। একদিন সে রাজাকে ডাকিয়া কহিল, আমি আমার বোনের সাত ছেলের মাথা কাটিয়া সেই রক্তে স্নান করিয়া পূজা করিব।

রাজা রাণীর এই বাসনার কথা মন্ত্রীকে জানাইল। শুনিয়া মনের খেদে মন্ত্রী বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া রহিল। দেখিয়া শকুন-কন্যা শুধাইল, তাহার কী হইয়াছে। মন্ত্রীর মুখে রাণীর অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া শকুন-কন্যা কহিল, তুমি ভয় করিয়ো না, ছেলেদের কাটিতে দাও, আমি জিতাষ্টমীর পূজা করিয়া তাহাদের বাঁচাইব।

তারপর শকুন-কন্যা পূজায় বসিল। সাত ছেলেকে লইয়া যাইবার জন্য

CENTRAL LIBRARY

রাজ-বাড়ীতে খবর দেওয়া হইল। শৃগাল-কন্যা সাতপুত্রের গলা কাটিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে শকুন-কন্যা পূজা করিয়া বলিল,

ধনবর, পুত্রবর
কাটা-মাথা উধার কর॥

অমনি সাত পুত্রের কাঁধে সাতটি মাথা গজাইয়া উঠিল এবং তাহারা গিয়া শৃগাল-কন্যার পূজার কলা খাইয়া ফেলিল। শৃগাল-কন্যা তো দেখিয়া অবাক। নিজের হাতে যাহাদের কাটিলাম, তাহারা বাঁচিয়া উঠিল কেমন করিয়া।

তারপর শৃগাল-কন্যা শকুন-কন্যাকে বনের ভিতর ডাকিয়া লইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শকুন-কন্যা বলিতে চাহে না, শৃগাল-কন্যাও ছাড়ে না। অবশেষে শকুন-কন্যা বলিল, ইহা বলিলে তুমিও এখানে থাকিতে পারিবে না, আমিও এখানে থাকিতে পারিব না। তাহাতেও শৃগাল-কন্যা ছাড়ে না। তখন শকুন-কন্যা বলিল, বেশ, তাহা হইলে আমি আমার সাত ছেলেকে শেষ দেখা দেখিয়া আসি, তুমিও তোমার স্বামীকে শেষ দেখা দেখিয়া আইস।

তাহারা উভয়েই বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে, শকুন-কন্যা শৃগাল-কন্যাকে মিঠু তেলির মৃত দেহ খাইবার কথা বলিল। উপবাস ভঙ্গ করিবার ফলেই সে পুত্রবতী হইতেছে না। সত্যই শৃগাল-কন্যা মৃতদেহ খাইয়াছে কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শৃগাল-কন্যা "হয় গে বাই গে, হক্কে হক্কে" বলিতে বলিতে শৃগাল হইয়া পুনরায় বনে ঢুকিল এবং শকুন-কন্যা শকুন হইয়া আবার গাছে চড়িল॥[১]

॥ ৩ ॥

ব্রতকথা বলিবার পর আরম্ভ হয় গান। জিতুয়ার গানকে বলা হয় 'কেউটিয়া আবন'। গানের সহিত একটি বিশিষ্ট বাদ্য বাজানো হইয়া থাকে। বাঁশের কাঠি চিরিয়া চিরিয়া শলাকার মতো করিয়া নেওয়া হয়। গানের তালের সহিত তাহাই হাতের উপর আঘাত করিয়া বাজানো হয়।

১ বারোপেটিয়া ইউনিয়ন, কামারপাড়া, জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীনিখিল চন্দ্র ঘটক (রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি)-কর্তৃক সংগৃহীত। এই ব্রতকথার সহিত উড়িষ্যার 'ছুতিয়া ওসা'র ব্রতকথা, যাহা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কথিত হয়, তাহার বিশেষ মিল আছে। দ্রঃ **A few fasts, festivities and observances in Orissa : Narayan Tripathy : Man in India : Vol. XVI, April-Sept., 1936, Nos 2+3.**

CENTRAL LIBRARY

'কেউটিয়া-আবন' পদটির অর্থ কি, জানিতে পারি নাই। 'কৈবর্ত' হইতে 'কেওট'+ইয়া, এইভাবে 'কেউটিয়া' হইতে পারে। 'কেউটিয়া-আবন' গানের কোনো বিষয় বলিয়া মনে হয় না, ইহা নির্দিষ্ট একটি সুর বলিয়া মনে হয়। জিতুয়া ছাড়াও, অন্যান্য সময়েও' কেউটিয়া আবন' গাওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয়, 'কেউটিয়া আবন' একান্ত ভাবেই জিতুয়ার আনুষ্ঠানিক গান নয়।

'কেউটিয়া-আবন' ছাড়াও জিতুয়াতে বিভিন্ন ধরণের রঙ্গ-তামাশার গান গাওয়া হইয়া থাকে। এই সকল গানকে 'তাম্‌শা-করা গান' বলে।

রঙ্গ-তামাশার গানগুলি কেবলমাত্র পূজা-স্থানেই গাওয়া হয় না। ঢোল-শানাই শহরৎ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়াও এই গান গাওয়া হইয়া থাকে। এই সমস্ত গানকে বলে 'ঢাডি' গান। 'ঢাডি' শব্দটি গানের কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে না, ইহা সুর বিশেষ। হিন্দী 'ঢুঁড়্' শব্দটির অর্থ 'খুঁজিয়া বেড়ানো'। 'ঢাডি'র সহিত হিন্দী 'ঢুঁড'-এর গভীর সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

'ঢাডি' শব্দটি বর্তমান সঙ্কলনের ৩২৯ ও অপর একটি গানে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গান দুইটির প্রসঙ্গ-সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, 'ঘুরিয়া বেড়ানো' এই অর্থেই 'ঢাডি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঢাডি-গানও জিতুয়ার অপরিহার্য আনুষ্ঠানিক গান নয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই ঢাডি-গান গাহিবার প্রথা ব্যাপকভাবে দেখা যায়। বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া গাওয়া হয় যে গানগুলি, তাহার নির্দিষ্ট একটি রচনাভঙ্গি আছে। তাহার শ্বাসাঘাতগুলি ঢোলের তালের সহিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং যে কোনো গানই ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাওয়া হয়, তাহাকেই বলে 'ঢাডি' গান। ইহাতে ঢুঁড়্-এর সহিত ঢাডি-শব্দের সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়।

॥ ৪ ॥

বাঁকুড়ার 'জিতা-পরব' এবং জলপাইগুড়ির জিতুয়ার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করিতে পারা যায়। জিতুয়ার ব্রতকথা শৃগাল ও শকুনিকে লইয়া। বাঁকুড়া জেলার, পূজাস্থানে যে চতুষ্কোণ কুণ্ড খনন করা হইয়া থাকে, তাহার চারিপার্শ্বে

CENTRAL LIBRARY

মৃণ্ময় শৃগাল ও শকুনি স্থাপন করা হয়। এই দিক দিয়া ব্রতকথার শৃগাল-শকুনির সহিত মৃণ্ময় শৃগাল-শকুনির সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই ঢ্যাপের ফুল (শালুক ফুল) দিবার প্রথা দেখা যায়। তৃতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই কুণ্ড খনন করা হইয়া থাকে।

জিতা-পরবের দিনেই বাঁকুড়ায় 'নষ্টচন্দ্র' (চোখচাঁদা) উদ্‌যাপিত হয়। জলপাইগুড়ির রাজবংশী মেয়েরাও এই দিন পড়শীর গৃহে যাইয়া কলা-মূলা চুরি করিয়া খাইয়া থাকে। চুরির পর আমোদ করিয়া গান গাওয়া হয়।

তফাতের মধ্যে এই, জলপাইগুড়িতে ব্রতকথা বলিবার এবং গান গাহিবার প্রথা আছে; বাঁকুড়াতে ব্রত শেষ করিয়া শশা খাইতে হয়, জলপাইগুড়িতে খাইতে হয় কলা। এই শশা ও কলা পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। অবশ্য, আচারের দিক দিয়া দেখিলে ইহাকে এক প্রকার সাদৃশ্যও বলা চলিতে পারে।

জলপাইগুড়িতে জিতুয়াতে পুরুষেরাও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইয়া থাকে, বাঁকুড়ার জিতা-পরব একান্তভাবেই মহিলাদের।

॥ ৫ ॥

এইবার সঙ্কলিত জিতুয়া গানগুলির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

৬৫-সংখ্যক গানটি একান্ত ভাবেই আনুষ্ঠানিক। গানটির মধ্যে পূজা-বেদীর পরিচয় রহিয়াছে।

৬৬, ৬৭, ৬৮-সংখ্যক গানগুলি 'কেউটিয়া-আবন'। ইহার প্রথম গানখানির বক্তব্য এই: নববধূ গর্ভবতী হইয়াছে, গোহাল ঘর নিকাইতে যাইয়া সে হাঁস-ফাঁস করিতেছে। ওগো কাকা, দেখ আসিয়া, শীঘ্রই আমার বউ ছেলের মা হইবে। জিতুয়াব্রত পুত্র কামনার জন্যে করা হইয়া থাকে এই দিক দিয়া গানটির সার্থকতা বুঝিতে পারি। কিন্তু, ঠাহর করিয়া দেখিলেই বোঝা যায়, ইহা কোনো মেয়ের উক্তি নয়, পুরুষের উক্তি। স্ত্রীলোকের ব্রতে পুরুষের জবানীতে এই গান গাহিবার কথা আশ্চর্য ঠেকে।

৬৭ ও ৬৮-সংখ্যক দুইটিও পুরুষের জবানীতে। উহাদের বিষয়বস্তুর সহিত জিতুয়ার ব্রতের কোনো সম্পর্ক নাই। ইহার একটি বলা হইতেছে, ঘটকের পছন্দ আছে, সে সুন্দর বউ আনিয়া দিয়াছে। অপর টিতে দাম্পত্য জীবনের একটি কাহিনী উক্ত হইয়াছে: কলিকালের

CENTRAL LIBRARY

লক্ষীছাড়া বউয়েরা কেবল চেনে বিড়ি আর দিয়াশলাই। একদিন হাট হইতে বিড়ি আনি নাই, ওই দেখ, রাত্রি বেলায় সে আমার সহিত কথা কহিল না, আমি সেজন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলাম। গানটির মধ্যে একদিকে কলিকালের 'কুলক্ষণ' স্ত্রী-কে যেমন একটু খোঁচা দিবার চেষ্টা আছে, তেমনি স্ত্রীর অভিমান স্বামীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচনের মধ্যে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্কলিত তিনটি কেউটিয়া-শাবনেই গার্হস্থ্য জীবন প্রাধান্য পাইয়াছে। ব্রত-পূজার মধ্যেও সম্পূর্ণ ভাবে ইহলৌকিক জীবনকে চিত্রিত করিবার এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করিবার মতো। দেবতার স্তুতি নাই, তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া গান রচনা করিতে ব্রতধারিণীগণ উৎসাহ পান নাই,—বদলে লৌকিক জীবনকে পারলৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অনায়াসে ঢুকাইয়া দিয়াছেন।

ঠিক এই একই মানসভূমি হইতে 'তাম্‌শা-করা' গানগুলি উৎসারিত হইয়াছে। দেবতার বেদী সাজাইয়া, বিবিধ উপচার তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া, গাওয়া হইতেছে হাসি-রঙ্গ-তামাশার গান,—ধর্মের সহিত যাহার কিছু মাত্র যোগ নাই।

তাম্‌শা করা গানগুলির মধ্যে ৬৯ক ও ৬৯গ সংখ্যক গান দুইটি উল্লেখ করিবার মতো। প্রথমটিতে বিধবাদের আচার-ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া রসিকতা জমাইবার চেষ্টা আছে। বিধবারা "তেরিয়া খঁপা" করে, রঙীন 'ফোতা' পরে, এবং সব সময়েই হাসি-রঙ্গ করে। তাহার মধ্যে ওই যে মোটা ও ফরসা বিধবাটি, সেই উহাদের নেত্রী, এবং সে সুন্দরী বলিয়া পাড়ার ছোকরারাও তাহাকে খাতির করে। ৬৯গ-সংখ্যক গানটিও স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন। স্বামী কহিতেছে, ঘরে ভাত নাই, অথচ ভাতের অভাবে সুন্দরী বউকেও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। কষ্ট করিয়া আমরা অখাদ্য-কুখাদ্য খাই, লোকে তবু বলে, আমরা নাকি ভাত খাই। স্ত্রী তখন কহিতেছে, ওগো স্বামী, শীঘ্র যাও, কণ্ট্রোল দরে চাউল দিতেছে, লইয়া আইস। গানটির প্রথমাংশে যদিও বা তামাশার একটু কারণ মেলে, শেষাংশে স্ত্রী-র উক্তিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে উবিয়া যায়। তবু ইহাকে 'তাম্‌শা-করা' গান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে!

CENTRAL LIBRARY

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্ষপরিক্রমা : কার্তিক-চৈত্র

॥ গোরু-চুমানি ॥

শ্যামাপূজার পরদিন সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীর গৃহিণী গোরু ও রাখালকে বরণ করিয়া থাকে। বরণ করাকে এই উপভাষায় বলে 'চুমানো'। 'গোরু-চুমানি' অর্থ গোরুকে বরণ করা। ইহার সহিত রাঢ়বঙ্গের 'বান্দনা' বা 'বাঁধ্না' পরব সর্বাংশে তুলনীয়।

এই দিন সকাল বেলা গোরুকে স্নান করাইয়া তাহার মাথায় তেল-সিঁদুর ধান-দূর্বা ইত্যাদি দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলাতেও গোয়াল ঘরের সম্মুখে গোরুকে তেল-সিঁদুর দেওয়া হয়। এই দিন যে রাখাল গোরুকে চরায়, তাহাকে নতুন জামা-কাপড় ও মিষ্টান্ন দিবার রীতি আছে। গরুর সহিত রাখালকেও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া বরণ করা হইয়া থাকে।

মুসলমানেরা সন্ধ্যাবেলায় গোরুকে প্রতিপদের চাঁদ দেখাইয়া থাকে।

গোরু-চুমানির যে তিনটি গান সঙ্কলন করা হইয়াছে, সে তিনটিই আনুষ্ঠানিক। ইহা একান্তভাবেই অনুষ্ঠান মাত্র। কাজেই, উৎসবের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে গান ইহার নাই, গাওয়াও হয় না।

১০-সংখ্যক গানটিই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গোরু-চুমানির সর্বাধিক জনপ্রিয় গান। গোরুকে বরণ করিবার জন্য কি কি প্রয়োজন,—গানটিতে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। গানটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে একই সঙ্গে গোরু ও রাখালের বরণের কথা পাওয়া যায়। অর্থাভাবের দরুণ বাড়ীর গোরু চরাইবার জন্য রাখাল রাখা হয় নাই, বাড়ীর কর্তাই গোরু চরাইয়া থাকে। গৃহিণী তাই গায়,

> ওই নোখলিয়া নাই মোর নসিবে ;
> আইসেক রে সোয়ামী,
> চুমাওঁ রে তোক "—সং ১০

নিজের স্বামী গোরুর রাখাল, গৃহিণীর এই ব্যথা গানটির মধ্যে একটি মনোরম আবেদনের স্পর্শ দিয়াছে।

বরণ করিবার সময় উলু দেওয়া হয়। ১০ক-সংখ্যক গানে তাহার উল্লেখ আছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ চোর-চুন্নী ॥

॥ ১ ॥

চোর-চুন্নীর গান দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার লোকসমাজের এক প্রিয় গান। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময় প্রচুর উৎসাহের সহিত উক্ত দুই জেলায় ব্যাপকভাবে এই গান গাওয়া হয়। দিনাজপুর, রঙপুর ও কোচবিহারেও এই গান আংশিকভাবে প্রচলিত আছে।

এই গান মূলত পুরুষের গান। পাড়ার কিশোর ও নবযুবকগণই এই গানের প্রধান উৎসাহী গায়ক ও নর্তক। কালীপূজা ঘনাইয়া আসিতেই পাড়ায় পাড়ায় গায়ক-নর্তকদের লইয়া দল গড়া হইতে থাকে। যে দলের নিজস্ব গীতি রচয়িতা আছে, সে দল নতুন গান বাঁধিতে সুরু করিয়া দেয়। প্রতি বৎসর নতুন-রচা গান ছাড়াও অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া-আসা গানও উপযুক্ত উদ্দীপনার সহিত গীত ও শ্রুত হইয়া থাকে।

দলের কোনো সুদর্শন কিশোর শাড়ী-গয়না পরিয়া চোরনী সাজে, অপর একজন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই চোর ও চোরনী দলের সর্বাগ্রে থাকে। অপর কয়েকজন সং সাজিয়া ইহাদের সহিত চলে। ঢোল-শানাই বা খোল-জুড়ি (মন্দিরা) বাজাইতে থাকে বাজনদারেরা। এই ভাবে দল গড়িয়া, শোভাযাত্রার আকারে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চোর-চোরনীর গান গাওয়া ও গানের সহিত নাচা হইয়া থাকে। নাচিয়া-গাহিয়া প্রতি বাড়ী হইতে পুরস্কার স্বরূপ চাউল-পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার রেওয়াজ আছে।

চোর-চুন্নীর গান কালীপূজার দিন বা তাহার পর হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত গাওয়া হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিনে এই গান আনুষ্ঠানিক ভাবে সুরু করিয়া বিভিন্ন দিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ করিয়া দেওয়া হয়। তিস্তার পশ্চিমপার্শ্বে, বিশেষত পাহাড়পুর, রং-ধামালী হইতে সুরু করিয়া মণ্ডলঘাট পর্যন্ত অঞ্চলে সাধারণত দীপান্বিতা অমাবস্যার পরবর্তী অষ্টমী তিথি হইতে এই গান আনুষ্ঠানিক ভাবে গীত হইতে থাকে এবং পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত ইহার জের টানা হয়। তিস্তার পূর্বদিকে, বিশেষত

CENTRAL LIBRARY

ধূপগুড়িতে দীপান্বিতা অমাবস্যার পরবর্তী একাদশী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হইয়া থাকে। কোথাও বা অষ্টমী তিথিতে সুরু করিয়া একাদশীর দিন শেষ করিয়া দেওয়া হয়। কোথাও আবার প্রতিপদ হইতে অষ্টমী বা একাদশী বা চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হয়। উপরের বর্ণনা হইতে সহজেই বোঝা যাইবে, প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হইয়া থাকে।

চোর-চুন্নীর সমস্ত গান চোর ও চোরনীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি। হয় চোর চোরনীকে কহিতেছে, নতুবা চোরনী চোরকে কহিতেছে। এই প্রসঙ্গে, গায়নকালীন একটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ করিবার মতো। চোর যখন চোরনীকে বা চোরনী যখন চোরকে কোনো কথা বলিতেছে তখন যাহার উদ্দেশে গানটি গীত হইতেছে, সেও বক্তার সহিত গান গাহিয়া থাকে। গায়ন-কালীন এই রীতি নাটকাদিতেও পালিত হইয়া থাকে॥

॥ ২ ॥

চোর-চুন্নীর গানের প্রেরণা কিন্তু আনুষ্ঠানিক। তিস্তার পূর্বদিকে, ধূপগুড়ি থানায় কালীপূজার পর দিন ভোর বেলা হইতে একটি আচার পালন করা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে সেটি স্মরণ করিবার মতো।

ধূপগুড়িতে দেখা যায়, কালীপূজার পর দিন ভোর বেলা হইতে বালক ও কিশোরেরা হয় দলগত ভাবে, নতুবা ব্যক্তিগত ভাবে মুখোস পরিয়া বা সং সাজিয়া, গৃহস্থের দুয়ারে "চোর রে, চোর, চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। তারপর, গৃহস্থের নিকট হইতে পয়সা বা মিষ্টদ্রব্যাদি লইয়া পরবর্তী দুয়ারে গিয়া হানা দেয়। এই 'চোর-চোর' বলিয়া চীৎকার করিবার সময় গৃহস্থের সহিত নানান রঙ্গ-তামাশা করা হইয়া থাকে। কেহ বলে, ওই দেখ, তোমার বেগুন ক্ষেতে চোর ঢুকিয়াছে; কেহ বা বলে, ওই দেখ, চোর যাইয়া গোলার ধান চুরি করিতেছে।

কেন এই আচারটি পালিত হইয়া থাকে, তাহা আলোচনার যোগ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশাদার চোর ও লোকসমাজের মধ্যে একটি বিশ্বাস আছে—কালীপূজার দিন চুরি করিতে পারিলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া নির্ভাবনায় চুরি করিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারা যায়। উত্তর

CENTRAL LIBRARY

ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলেও এই বিশ্বাস আছে। সেখানেও পেশাদার চোরেরা শ্যামাপূজার দিন রাত্রিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'চুরি' করিয়া থাকে।[১] এই 'চোরখেলা' মেছ উপজাতিদের মধ্যেও দেখা যায়।[২]

জলপাইগুড়ি জেলার কোনো কোনো অঞ্চলের চোরেরা দুর্গা-পূজার পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন অর্থাৎ মহালয়ার দিন কোনো গৃহস্থের বাড়ী হইতে কিছু চুরি করিয়া আনিয়া দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন তাহা গৃহস্থের অগোচরে রাখিয়া আসে। এ বিষয়ে ৭৫-সংখ্যক গানটি দ্রষ্টব্য।

দীপান্বিতা-অমাবস্যার দিন পেশাদার চোরের এই আনুষ্ঠানিক চুরির কথা স্মরণ করিয়াই একটি চোর-চুন্নীর গানে গাওয়া হইয়াছে: "আমাসী পরবে রে, চোরের উধোপত্তি (উৎপত্তি) রে"– সং৭১ক। বলা আবশ্যক, এই গানটি চোর-চুন্নীর একটি আনুষ্ঠানিক গান এবং এই গানটি চোর-চুন্নী গানের উদ্বোধন সঙ্গীত।

এই পটভূমিকায়, ধূপগুড়ির উক্ত আচারটিকে ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। কল্পনা করা হয়, চোর যেন গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়াছে, গৃহস্থের শুভাকাঙ্ক্ষী বালকবৃন্দ চীৎকার করিয়া তাই তাহাকে সজাগ করিয়া দিতেছে এবং সেই কাজটুকুর বদলে তাহার গৃহদ্বারে পুরস্কার স্বরূপ চাউল-পয়সা-মিষ্টান্ন চাহিতে আসিয়াছে।

কালীপূজার দিন চুরি করিতে পারিলে সম্বৎসর চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থাগম হয়—এই লোকবিশ্বাসটুকুকেই ভিত্তি করিয়া চোর-চুন্নীর গানের জন্ম হইয়াছে। আজিকার দিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনো পেশাদার চোর কালীপূজার দিন চুরি করুক, বা নাই করুক, তাহাতে কিছুই যায় আসে না,—কিন্তু সেই চোরের দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী চোর চুন্নীর অসংখ্য গানে অব্যাহত ধারায় খ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। এই ভাবে, একটি লোকবিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া, আনুষ্ঠানিকতার আবরণে, একটি অশ্লাঘনীয় বৃত্তির নায়ক-নায়িকা দ্বারা একটি ভূভাগের একটি বিশেষ সাহিত্য-ধারার সৃষ্টি হইয়াছে॥

১ নর্থ ইণ্ডিয়ান্ নোটস্ এণ্ড কয়ারিস্, জুন, ১৮৯৫, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৪।

২ ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকস্ (১৯৫১): জলপাইগুড়ি, পরিশিষ্ট: ডি. এইচ. ই. সাণ্ডারের রিপোর্ট, ১৮৯৫ খ্রীঃ।

প্র—৮

CENTRAL LIBRARY

॥ ৩ ॥

স্থূলভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, চোর-চুন্নীর গানের বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একভাগে রহিয়াছে, চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা রাখিয়া চোর ও চোরনীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী। অপর ভাগে রহিয়াছে, চোর ও চোরনীর নিরপেক্ষ দর্শকরূপে সমাজ-পর্যালোচনা। গ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক অবস্থার তৎকালীন পরিস্থিতি, নিকট অতীতে ঘটিয়া-যাওয়া প্রেম-ঘটিত কলঙ্ক-কাহিনী, নৈসর্গিক ও রাজনৈতিক ঘটনা ও দুর্ঘটনা (যেমন, ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভোট, কণ্ট্রোল প্রথা, নয়াপয়সা-প্রবর্তন ইত্যাদি) প্রভৃতির নির্ভীক বিবরণী ও সমালোচনা এই শ্রেণীর গানের বিষয়। বস্তুত, এই শ্রেণীর চোর-চুন্নীর গান পড়িয়া মনে হয়, চোর ও চোরনী যেন কোনো আদিম গণতান্ত্রিক সমাজের নর-নারীর প্রতিনিধি; এবং একটি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ রাখিয়া, নিজেদের মধ্যে আলাপ করিয়া, এক বছরের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈসর্গিক ঘটনাবলীর 'সালতামামী' করিতেছে। এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে কোথাও চৌর্যবৃত্তিকে রাখা হয় নাই। চৌর্য বৃত্তির সহিত এই শ্রেণীর গানের কোনো প্রকার যোগ নাই বলিয়া এই শ্রেণীর গানগুলিকে বর্তমান সঙ্কলনে চোর-চুন্নীর গানের দ্বিতীয় পর্যায়রূপে বিশেষিত করা হইয়াছে।

চৌর্যবৃত্তির সহিত কোনো প্রকার যোগ নাই অথচ কালী পূজার সময় চোর-চুন্নীর সংলাপের মধ্যে বিবিধ সাময়িক ঘটনার প্রক্ষেপ কেন, স্বভাবতই সে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

কেহ কেহ জ্যোতির্গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কার্তিকী অমাবস্যার দিন একদা রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত।

কার্তিকী অমাবস্যার দিন সন্ধ্যাবেলায় 'ছায়াপথ' দেখা যায়। এই ছায়াপথেই পিতৃপুরুষগণ যমলোক হইতে বিষ্ণুলোকে যাইয়া থাকেন, এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীনেরা করিতেন। দেবযানের জন্য যেরূপ উত্তরায়ণের প্রয়োজন, পিতৃযানের জন্য তাহা হইলে দক্ষিণায়নের প্রয়োজন। যদি, কার্তিক-অমাবস্যার ছায়াপথকে পিতৃপুরুষের বিষ্ণুলোকে যাইবার 'পথ' বলিয়া কল্পনা করা হয়, তবে কার্তিকী অমাবস্যার ছায়াপথই দক্ষিণায়নের

CENTRAL LIBRARY

নির্দেশক, এইরূপ কল্পনা করা চলে। কার্তিকী অমাবস্যার দিনই যে নববর্ষ হইত, তাহার প্রমাণ এখনও মিলে। এখন পর্যন্ত গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে দীপালীর দিন নববর্ষ ধরা হয়। বোম্বাইতে এই দিনই 'হালখাতা' হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এইদিন নববস্ত্র পরিধান করেন এবং নতুন ধানের অন্ন পিতৃপুরুষকে নিবেদন করেন। ইহাও নববর্ষের অনুষ্ঠান।

"ঋগ্‌বেদে ও মহাভারতে সুপর্ণ উপাখ্যান অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। একদা গান্ধর্বগণ সোমকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। দেবগণের অনুরোধে গায়ত্রী শ্যেন পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গান্ধর্বদের নিকট হইতে সোম আনায়ন করিতে গিয়াছিলেন।...সোম চন্দ্র। গন্ধর্বেরা সোমকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, অর্থাৎ সেদিন চন্দ্র অদৃশ্য হইয়াছিলেন, অমাবস্যা হইয়াছিল। শ্যেন পক্ষীর সোম আনায়ন প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টি আনায়ন। উপাখ্যানটির ফলিতার্থ এই যে, এক অমাবস্যায় শ্রবণা নক্ষত্র ও ধনুরাশিকে সন্ধ্যাকালে মধ্য গগনে দেখিয়া বর্ষাঋতুর আগমন অনুমিত হইত এবং সেদিন নববর্ষ ধরা হইত। কার্তিকী অমাবস্যাতেই এইরূপ যোগ সম্ভবপর।"[১]

এই প্রসঙ্গে মালদহের গম্ভীরা গান এবং চড়ক পূজায় শিবের গাজনের কথাও মনে আসে। ৩১শে চৈত্র চড়ক পূজা হইয়া থাকে। এই 'চড়ক' কালচক্রের প্রতীক। একটি বৎসর শেষ হইয়া গেল, অপর একটি বৎসর আসিতেছে। বৎসরের এই শেষ দিনের উৎসবে তাই দেখা যায়, বৎসরের উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ঘটনাবলী এই সময়ে গীত গানের বিষয়। এই কারণে গম্ভীরা গানের মধ্যে শিবকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে বৎসরের নানান ঘটনা শোনানো হইয়া থাকে।

এখন, যদি কার্তিকী অমাবস্যার দিনকে বহু প্রাচীন এক অয়ন-দিন বলিয়া কল্পনা করিয়া নেওয়া যায়, তবে চোর-চুন্নীর গানের মধ্যে কেন বৎসরের বিবিধ ঘটনাবলী স্থান পাইল, তাহার একটি কারণ বোঝা যায়। বৎসরের একটি বিশিষ্ট দিনে আদিম গণতান্ত্রিক সমাজের দুই প্রতিনিধি নিজেদের সংলাপের মধ্য দিয়া গত বৎসরের ঘটনা-বিবরণী জনগণের সম্মুখে যেন উপস্থাপিত করিতেছে।

১শ্রীসুখময় সরকার : প্রবাসী : মাঘ, ১৩৬২।

CENTRAL LIBRARY

॥ ৪ ॥

চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা রাখিয়া রচিত চোর-চুন্নীর গানগুলি সুন্দর। জীবনের আনন্দ-বেদনা, সরস উষরতা, নির্নিরীক্ষ্য কোমলতা, স্নিগ্ধ কারুণ্য, চিরদুর্লভ প্রেম, অপ্রাপণীয় সুখ, মর্মান্তিক বিরহ,—সবই এই গানগুলির সুরে ও শব্দে চিত্রিত হইয়াছে।

চোরনী কহিতেছে, ওগো চোর, দুর্গা পূজা আসিয়া পড়িল, এইবার আমাকে চন্দ্রহার গড়াইয়া দিতে হইবে। আমাকে শাড়ী দাও নাই, গহনা দাও নাই, এই দেখ, সধবা হইয়াও আমাকে বিধবার মতো দেখাইতেছে (সং ৭৩)। চোর বলে, এবার যেরূপ আকাল পড়িয়াছে, তাহাতে চন্দ্রহার গড়াইয়া দিতে পারিব না। তোমার জন্য কি চুরি করিতে বাহির হইব (সং ৭৪)?

কিন্তু, চোর আজ চুরি করিতে যাইতেছে। চোরনী বলে, আজ চুরি করিতে যাইয়ো না, আজ চারিদিকে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তোমাকে সবাই দেখিয়া ফেলিবে। অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া দিয়া যাও শুইয়া থাকো (সং ৭৫)। তারপর বলে, আমি নববধূ, কেমন করিয়া রাত্রে একা থাকিব (সং ৭৬)। তুমি চুরি করো, আমাকে সকলে তাই 'চোরনী' বলে। তোমাকে আর চুরি করিতে হইবে না, আমি ধান ভানিব, তুমি ব্যবসা কর (সং ৭৬ক)। তেমন সুযোগ না পাইলে আজ চুরি করিয়ো না, ফিরিয়া আসিয়ো, ধরা পড়িলে তোমাকে সবাই প্রহার করিবে (সং ৭৬খ)।

আবার কখনো চোরনীকে অন্যরূপে দেখি। চোরের দারিদ্র্য দেখিয়া তাহার কোনো মমতা জাগে নাই। সে বড় ঘরের মেয়ে, বাপের বাড়ীতে অনেক শাড়ী, অনেক গহনা পরিয়াছে; কিন্তু, ঘটক-'মড়া'-র জন্য তাহাকে চোরের বাড়ীতে আসিয়া এক কাপড়ে দিন কাটাইতে হইতেছে (সং ৭৭)। চোরের হাতে বিবাহ দিবার জন্য সে পিতামাতাকে দোষারোপ করে (সং ৭৭ক)। চোরকে চুরি করিবার জন্য সক্রোধ প্ররোচনা দিয়া বলে, ওগো চোর, চুরি করিতে যাও। ওই দেখ, যাহারা চুরি করে, তাহাদের বউ কতো ভালো শাড়ী-গয়না পরিয়াছে। আমার স্নান করিয়া কাপড় ভিজাইলে অন্য কাপড় নাই যে পরি (সং ৭৭খ)। তালির উপর তালি দিয়া এমন হইয়াছে যে শেলাই করিবারও জায়গা নাই (সং ৭৭ঘ)।

CENTRAL LIBRARY

চোরনীর কথায় চোর সেদিন যাইয়া কতকগুলি তুচ্ছ জিনিষ চুরি করিয়া আনিল। দেখিয়া চোরনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এসব কেন চুরি করিয়াছ। ধান চুরি করিয়া আন নাই কেন। এই দেখ, কাল হইতে আমি কিছুই খাই নাই, ঘরে যাহা ছিল তাহা ছেলেদের খাওয়াইয়াছি (সং ৭৮)। মাঝে মাঝে চোরনীর মধ্য হইতে স্নেহময়ী জননী বাহির হইয়া আসে। অর্থাভাবে চোর তাহার ছেলেদের শীত কাটাইবার জন্য কিছু কিনিয়া দিতে পারে নাই। চোরনী তাই কহে, ওগো চোর, আজ একটি কম্বল চুরি করিয়া আনিয়ো (৭৮ক)।

চোরনীর নিষেধ সত্ত্বেও চোর গিয়াছে চুরি করিতে। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। ভাঙ্গা ঘরে ছেলে কোলে লইয়া পতিপ্রাণা চোরনী তাহাই চিন্তা করিতেছে (সং ৮০)। সারারাত্রি জাগিয়া ভোর হইয়া আসিল, তবু চোর আসিল না। চোরনী তখন শাশুড়ীকে কহিতেছে, মা, চোর বুঝি আজ ধরা পড়িয়াছে (সং ৮১)। চোরের জন্য ভাত-তরকারি রাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, চোর তাহা আসিয়া খাইল না। বুঝি চোর সত্যই আজ ধরা পড়িয়াছে (সং ৮১ক)।

চোর সত্যই আজ ধরা পড়িয়াছে। করুণকণ্ঠে চোর তখন গায়, সকলেই আমাকে আজ প্রহার করিতেছে (সং ৮২)। চোরনীকে উদ্দেশ করিয়া বলে, চোরনী, কিছু টাকা জোগাড় করিয়া বড়ো উকিল দিয়া মোকদ্দমা করিয়ো (সং ৮২ক)। থানায় যাইবার সময় বলে, চোরনী, বিধির ঘটনায় আমি আজ ধরা পড়িলাম। আমার জন্য কিছু চিন্তা করিয়ো না, ছেলে দুইটিকে মানুষ করিয়ো (সং ৮৩ক)। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ রহিল—খাইয়ো (সং ৮৩খ)।

কিন্তু, চোরনী কিছুতেই চোরকে ছাড়িয়া দিতে চায় না। সিপাইয়ের নিকট অনেক মিনতি করিয়া বলে, ওগো সিপাই, চোরের বদলে আমাকেই জেলে লইয়া যাও। তারপর বলে, তুমি আমার দেহ ভোগ করিয়া তাহার বদলে চোরকে ছাড়িয়া দাও। শেষে বলে, আমি পথের উপর শুইয়া থাকিব, দেখি তুমি কেমন করিয়া ডিঙাইয়া যাও (সং ৮৫)।

শেষ পর্যন্ত চোরকে জেলেই যাইতে হয়। জেলে গিয়া জেলের রীতিনীতি ও অত্যাচারের কাহিনী চোর গাহিয়া যায় (সং ৮৬)। স্বল্প মেয়াদী জেল

হইলে, জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া চোরনীর নিকট তাহার সরস বর্ণনা করিয়া থাকে।

চোরের দীর্ঘ মেয়াদী জেল হইল। সেখানে সে অত্যাচার সহিতে না পারিয়া মরিল। চোরনী সে সংবাদ পাইয়া গায়, ওগো, জানি না, কি অসুখে তুমি মরিলে, শেষ সময়ে তুমি জল চাহিয়াছিলে কি না, গায়ের উপর কম্বল ছিল কি না (সং ৮৭)। আমার সব সাধ-আহ্লাদ আজ শেষ হইয়া গেল (সং ৮৭ ক)।

উল্টা দিকও আছে। চোর জেলে গিয়াছে, এদিকে দুইটা সন্তান ও বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লইয়া চোরনী মহাবিপদে পড়িল। অখাদ্য খাইয়া শাশুড়ী তাহার মরিল। দৈহিক ও মানসিক কষ্টে চোরনীর দেহও ভাঙিয়া পড়িতেছে। চোরের উপর আর তাহার আস্থা নাই। অবশেষে, একদিন পেটের দায়ে একটি সন্তান কোলে লইয়া চোরনী নতুন স্বামীর ঘর করিতে গেল (সং ৮৯)।

ততোদিনে চোর খালাস পাইয়াছে। জায়া, জননী ও সন্তানদের মুখ কল্পনা করিয়া পথে সে গান গাহিতেছে। মাঝ পথেই সে নানান অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিয়া বাড়ীতে আসিয়া দেখে, কেহ নাই। তাহার ভিটায়' ছাগল চরিতেছে, ভাঙ্গাচালের উপর বসিয়া ঘুঘু ডাকিতেছে (সং ৮৬ ক)।

দাম্পত্য প্রেমের করুণ সুখের চিত্রও আছে। বিধির বিধানে চোরনী আজ মরিয়াছে। আজ একা ঘরে বিপত্নীক চোর ভাবে: ওগো চোরনী, আমি যখন চুরি করিতে যাইতাম, তুমি তখন রাত্রি জাগিতে, জাগিয়া জাগিয়া আপনহাতে চাঁদোয়া তৈরি করিয়াছিলে। আজ তুমি নাই, সেই চাঁদোয়া ঘরের সিলিঙে টাঙানো রহিয়াছে, বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। আজ এখন যদি চুরি করিতে বাহির হই, কেহ আমাকে পিছু ডাকিয়া চুরি করিতে নিষেধ করিবে না (সং ৯১)।

সারা জীবন চুরি করিবার পর চোরের মনে অনুতাপ জাগে। সে চৌর্যবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া ভালো মানুষ হইতে চেষ্টা করে (সং ৯২ক, ৯২খ)।

সমগ্রভাবে চোর-চুন্নীর গানকে যিনিই লক্ষ করিবেন, তিনিই উহার মধ্যে জীবনকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেন। চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা রাখিয়া দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনে যতো প্রকার পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোককবিরা তাহার কোনোটাকেই বাদ দেন নাই।

CENTRAL LIBRARY

জীবনের এই পূর্ণতাই চোর-চুন্নীর গানের এক বিশিষ্ট সম্পদ। এই দাম্পত্য জীবনের আলো এবং অন্ধকারের দিক এমন সহৃদয়তা, সরলতা ও নিষ্ঠা লইয়া রচিত ও গীত হয় যে, চৌর্যবৃত্তি যে একটি অশ্লাঘনীয় বৃত্তি তাহা সাময়িক ভাবে ভুলিয়া যাইতে হয়। বস্তুত গানগুলির মধ্য দিয়া দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে, এক চোর-দম্পতির জীবন অপেক্ষা অন্ন-সংস্থানহীন এক চাষী-দম্পতির চিত্রই যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। চোরনী যখন একা ঘরে থাকিয়া রাত্রি জাগে অথবা চোর যখন পত্নীবিরহে কাতর হইয়া শ্রাবণ রাত্রিতে মৃত স্ত্রীর নিষেধের কথা স্মরণ করে, তখন চৌর্যবৃত্তির অযশস্কর আবরণ খুলিয়া তাহাদের মধ্য হইতে পুরাতন ও চিরন্তন মানুষ বাহির হইয়া আসে।

॥ ৫ ॥

সাহিত্য-সম্পদের দিক হইতে বিচার করিলে, চোর-চুন্নীর দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলিকে সেই তুলনায় অনেক হীন বলিয়া মনে হইবে।

অবশ্য, এই সকল গানের বিষয়টিই এমনতরো যে, তাহাতে চিরন্তন মানুষকে স্পর্শ করিবার উপাদানই তেমন নাই। এই ধরণের গানগুলি একান্তভাবে 'মরশুমী',—'ওষধি' বলিলেও চলে। সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই এগুলি রচিত হইয়া থাকে, আয়ুও ইহাদের বেশি নয়। কেননা, প্রতি বৎসরই নূতন নূতন সামাজিক, নৈসর্গিক, রাজনৈতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটিয়াই থাকে এবং নূতন ঘটনা দৃষ্টিকে সবখানি কাড়িয়া লইবার জন্য পুরাতন ঘটনা লইয়া রচা গান মানুষকে তেমন করিয়া দোলা দিতে পারে না।

এই ধরণের গানগুলি অধিকাংশই কলঙ্কময় সামাজিক কাহিনী, ধ্বংস-ধর্মী নৈসর্গিক ঘটনা কিংবা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া রচিত হয়। সামাজিক দুর্নীতি-ঘটিত গানে গায়ক ও রচয়িতা সমালোচনার নামে রূঢ় তিরস্কার, অশোভন উক্তি, স্থূল অঙ্গ-ভঙ্গি এবং শস্তা রচনা দিয়া কৃতিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, সামাজিক কলঙ্ক-কাহিনীর পর্যাপ্ত উপাদান নিজ গ্রাম হইতে সন্তোষজনক পরিমাণে না পাইয়া হয় এক বছরের বাসি গানই গাওয়া হইতেছে কিংবা গ্রামান্তরের কোনো ঘটনাকেই ফলাও করিয়া গাওয়া হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

দূরবর্তী কোনো গ্রামের সামাজিক কলঙ্ক-কাহিনীর কাঠামো আমদানী করিয়া যে গান রচা হয়, তাহার ঝাঁজ যেমন তীব্র, অপরিচয়ের দূরত্ববশতঃ উদ্ভট আদিম কল্পনার দৌরাত্ম্যও তেমনি মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

নৈসর্গিক ঘটনা ও দুর্ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া রচিত গানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খতিয়ানের তালিকা হইয়া দাঁড়ায় এবং স্বল্প-সংখ্যক করুণ ও হাস্য-রসাত্মক ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে যুগধর্ম ও নিয়তির দোহাই পাড়া হয়।

রাজনৈতিক ঘটনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধির অভাবেই হোক বা স্থূল গ্রাম্য-দৃষ্টির জন্যই হোক, কিংবা নির্বোধ সরলতার জন্যই হোক, বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে অতি নিন্দন বা অতি কীর্তন করিয়া উহার স্বরূপটিকে পাল্টাইয়া দেওয়া হয়।

বর্তমান সংগ্রহের ৯৩ হইতে ৯৬ক-সংখ্যক গানগুলি ঝড় ও বন্যাকে ভিত্তি করিয়া রচিত। তিস্তার বন্যা জনগণের জীবনকে কোন্ কোন্ দিক দিয়া কেমন ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহার নিদর্শন এই সকল গান হইতে মিলিবে। ইউনিয়ন বোর্ডের এক অভিনব আইন প্রবর্তিত হওয়ায় জনৈক নির্দোষ ব্যক্তি কেমন করিয়া জেলে গিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে একটি গানে (সং ৯৭)। ঘোর কলিকালে উপযুক্ত পুত্র পিতাকে প্রতিপালন করে না—এই পুত্রকে নিন্দা করিয়া একটি গান রচা হইয়াছে (সং ৯৮)।

ইহা ছাড়া, নতুন পয়সার প্রবর্তন, কণ্ট্রোল প্রথার তিরোধান, দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানান ব্যাপার লইয়া গান রচিত হইয়া থাকে। বিশেষত্বহীন বলিয়া এই সকল গান বেশি সঙ্কলিত হয় নাই।

॥ ৬ ॥

চোর-চুন্নীর গানের মধ্যে ক্রম বিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ করিতে পারা যায়। ইহারই ফলে, চোর-চুন্নীর গানের মধ্যে তৃতীয় একটি পর্যায় সৃষ্ট হইয়াছে।

এই তৃতীয় পর্যায়ের চোর-চুন্নীর গানে 'চোর' ও 'চুন্নী' আর লৌকিক জগতের সাধারণ গৃহস্থ নাই। 'চোর' তখন লীলারসিক শ্রীকৃষ্ণ, এবং 'চুন্নী' তখন লীলাময়ী শ্রীরাধা। দৃষ্টান্ত স্থলে বর্তমান সঙ্কলনের ৭১ ও ৯৯-সংখ্যক গান দুইটির নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়।

CENTRAL LIBRARY

৭১-সংখ্যক গানের চোর 'চক্রধারী'। এই চোর 'চোরের শিরোমণি' এবং তাঁহার 'চুন্নী' 'রাধা বিনোদিনী'। এই চোরের চৌর্যবৃত্তিও অলৌকিক ভাবজগতের। এই চোর 'দিনে দুপুরে ডাকাতি' করেন অর্থাৎ ভক্তজনের অগোচরে তাহার মন হরণ করিয়া লন। ইনি যে গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করেন, সে-ই 'কাঙ্গা' হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির দ্বারা লৌকিক জগতের সকল তুচ্ছতা ঘুচিয়া যায়।

৯৯-সংখ্যক গানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের কথা বলা হইয়াছে। ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দের মানসলোকে চোর ও চুন্নীরূপী রাধাকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য যুগলসত্তা অনুক্ষণ লীলা করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সেই অলৌকিক যুগল লীলার ভাবোন্মাদনায় নিত্যানন্দ পাগল হইয়া গিয়াছেন,—এই কথাই লৌকিক কয়েকটি উপমার সাহায্যে গানটিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

বলাই বাহুল্য, চোর-চুন্নীর এই পর্যায়ের গান সংখ্যাতে স্বল্প। ইহা ভাবুক ও ভক্তগণ কর্তৃক সচেতন মনে রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম নিখিল বঙ্গকে কিভাবে মাতাইয়াছে, এই গানগুলি তাহার সুন্দর নিদর্শন বটে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, লৌকিক চোর-চুন্নী গানের উদ্দাম প্রাণধারা বৈষ্ণবতার আবরণে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তবুও রচনার দিক দিয়া দেখিলে এই পর্যায়ের গানের একটি বিশেষত্ব অবশ্যই আছে। লৌকিক অনুষ্ঠান ও লৌকিক চোর এবং চোরনী অলৌকিক চোর এবং চোরনী হইয়া উঠিয়াছে যেখানে, সেখানেই এই পর্যায়ের গানের একটি বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে।

॥ ৭ ॥

চোর-চুন্নীর গানের প্রেরণা আনুষ্ঠানিক কিন্তু ইহার আবেদন মানবিকতায় পূর্ণ। আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের মারাত্মক পরিণতি উহার ক্লান্তিদায়ক এক-ঘেয়েমিতে এবং বৈচিত্র্যহীন শুষ্ক রচনা-ভঙ্গিমায়। চোর-চুন্নীর গান তাহার সন্তোষজনক ব্যতিক্রম এবং ইহাই ইহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

চোর-চুন্নীর গান দলগত গান। কিন্তু, তবুও যে তাহার মধ্যে ব্যক্তি-ধর্মিতা লক্ষ করি তাহার কারণ চোর ও চুন্নীর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তাবৎ গান ইহাদের উক্তি ও প্রত্যুক্তি বলিয়া।

এই গানের নির্বোধ সারল্যও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চোরনী যখন চোরকে চুরি করিয়া শাড়ী-গয়না কিনিয়া দিতে বলে, তখন তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ নাই, কৌতুক নাই, বরং চোরের অর্থাভাবের প্রতি এক গভীর মমতা প্রকাশ করা হয়। চোর ও চোরনীর ঘৃণ্য বৃত্তির প্রতি জন-মানসের অন্তরালে গভীর সমবেদনা গোপনরূপে সঞ্চিত না থাকিত, তবে এতোখানি নিষ্ঠা, সরলতা ও বিপুল উৎসাহ লইয়া চোর-চুন্নীর জীবন-পাঁচালী রচা হইত কি না, সন্দেহ আছে ॥

CENTRAL LIBRARY

॥ নয়া-খোয়া ॥

॥ ১ ॥

মাঠে ধান পাকিয়া উঠিলে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাহা কাটিয়া আনিয়া শুভদিনে সেই ধানের অন্ন সবাই মুখে দেয়। এই নবান্ন-উৎসবকেই জলপাই-গুড়িতে 'নয়া-খোয়া' অর্থাৎ নতুন অন্ন খাওয়া বলা হয়।

তাবৎ কৃষক-সমাজে নবান্ন উৎসব একটি বিশিষ্ট উৎসবরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ধান গাছের প্রথম রোপণটুকুও বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়, তাহারই অন্তিম স্তর—অর্থাৎ ফসল কাটা ও সেই ফসলের অন্ন গ্রহণ করাও যে অনুষ্ঠান দ্বারা বিশেষিত করিয়া লওয়া হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক।

প্রথম ধান কাটিয়া কেমন করিয়া ঘরে আনা হয়, তাহা বলি।

সাধারণত, পয়লা অগ্রহায়ণ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম ধান কাটা হয়। প্রথম ধান কাটিবেন বাড়ীর গৃহিণী। সকাল বেলায় কুলায় বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া গৃহিণী ও অন্যান্য মেয়েরা উলু দিতে দিতে ক্ষেতে যান। তারপর যেখানে প্রথম ধান পাকিয়াছে, সেখানে যাইয়া ধানের গোড়া বেশ করিয়া লেপিয়া-মুছিয়া ধূপ-দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর ধান গাছের গোড়া কলাপাতার অগ্রভাগ দিয়া মুড়িয়া ডান হাতে ধরিয়া বাম হাতে কাস্তে (কাঁচি দা) দিয়া গৃহিণী সেই ধান কাটিয়া কুলায় স্থাপন করেন এবং উলু দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ধানের গোছা কাটিবার সময় একটি ছড়া বলা হয়। 'মেছেনী'-র আলোচনা প্রসঙ্গে ছড়াটি সঙ্কলিত করিয়াছি।

তারপর আরম্ভ হয় ধান কাটা। প্রথম কিস্তি ধান মাড়া হইয়া গেলে নবান্নের দিন ধার্য হইয়া থাকে। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের ৮ তারিখে নবান্নের প্রথম তিথি পড়ে। কেহ কেহ এই মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিনও নবান্ন খাইয়া থাকে।

নবান্নের জন্য যে ধান দিয়া চাউল প্রস্তুত করা হইবে, তাহা লইয়াও একটি পারিবারিক আচার পালিত হইয়া থাকে। কিছু পরিমাণ ধান, যাহা দিয়া নবান্ন হইবে, তাহা অঙ্গনের মাঝখানের একটি লেপা জায়গায় স্থাপন করা হয়। ধান্যস্তূপের দুই পাশে ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া গৃহিণী প্রণাম করেন। কিছু

CENTRAL LIBRARY

আ-মাড়া ধান লইয়া দুইটি ছোটো ছোটো ভার বাঁধা হয়, তারপর একটি লাঠির দুই প্রান্তে সেই দুইটিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এইটি সেই ধান্যস্তূপের উপর রাখা হয়। শুদ্ধ মনে গৃহিণী সেই ধান্য-স্তূপকে প্রণাম করিবার পর বাড়ীর একটি ছেলে ও মেয়ে (সাধারণত শিশু ও বালক-বালিকা)কে সেই কল্পিত বাঁকটি কাঁধে লইয়া ধান্য-স্তূপকে পাঁচ বা সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে বলা হয়। এই 'ভার'-টিকে বলে 'বুড়া-বুড়ীর ভার'। প্রদক্ষিণ করা সাঙ্গ হইলে গৃহিণী সকলের গায়ে জল ছিটাইয়া দেন। এই ধানের ভার দুইটিকে তারপর ঘরের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা হয়।

ইহার পর সেই ধান গোলায় তোলা হয়। গোলায় ধান রাখিবার প্রথা এই : গৃহিণী কুলায় ভরিয়া মাথায় করিয়া সেই ধান লইয়া আসিয়া গোলা ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইবেন। তিনি গোলা ঘরের দিকে পেছন ফিরিয়া থাকিবেন। কেহ একজন এই সময়ে ঘরের চালে জল ঢালিয়া দিবে। এই জলে ভিজিয়া, গোলা ঘরের দিকে পিছন ফিরিয়া, গৃহিণী সেই কুলার ধান গোলায় ঢালিয়া দিবেন। তারপর গোলা হইতে ধান লইয়া নবান্নের জন্য ধান ভানা হইবে।

নবান্নের দিন সম্পন্ন গৃহস্থেরা পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। পুরোহিত ডাকিয়া অন্ন রাঁধিয়া অঙ্গনের তুলসীতলায় মৃতদের প্রতি তাহা নিবেদন করা হয়। যিনি অন্ন উৎসর্গ করেন, তিনি উপবাসী থাকেন। কলার বাকলে বা পাতায় পিণ্ডাকারে অন্ন ও অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী নিবেদিত হইয়া থাকে। পরে সেই উৎসর্গীকৃত অন্ন নদী বা জলাশয়ে ভাসাইয়া দিয়া আসা হয়।

এই দিন গৃহ-দেবতা, গ্রাম-দেবতা, অপদেবতা ও উপদেবতারাও পূজা পাইয়া থাকেন। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুত মানত-পূজাগুলিও এই প্রসঙ্গে সারিয়া ফেলা হয়।

নবান্নের দিন পাড়া-পড়শীদের খাওয়াইলে পিতৃপুরুষ তুষ্ট হন, এইরূপ বিশ্বাস থাকায়, এই দিন পাড়া-পড়শীরাও গৃহস্থের ঘরে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে।

॥ ২ ॥

নবান্নের সময় গান গাহিবার প্রথা আজিকার দিনে তেমন আর নাই।

সম্পন্ন গৃহস্থেরা কীর্তনীয়া আনিয়া 'তুক্কা', 'মনঃশিক্ষা', 'দেহতত্ত্ব' ইত্যাদি গান শুনিয়া থাকেন। মেয়েলী গান গাহিবার রেওয়াজ কেন যে কমিয়া আসিতেছে, তাহা সহজে ঠাহর করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এতো বড়ো একটা স্মরণীয় উৎসবে গান গাহিবার সুযোগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মেয়েরা আধুনিক যুগে প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে বলা চলে।

সঙ্কলিত নবান্ন-গীতিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে রহিয়াছে নবান্নের অনুষ্ঠান-পরিচয়। অপর ভাগে আছে, নবান্ন উৎসবকে ভিত্তি করিয়া নর-নারীর মনের আনন্দ-বেদনার কথা।

১০০-সংখ্যক গানখানি হইতে জানিতেছি, 'আগোণ মাসের' 'আট তারিখে' 'নয়া-খোয়া' হইবে, জনৈক কৃষক তাই সহযোগী লইয়া ধান কাটিতে শুরু করিয়াছে। নবান্নের সময় পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করা হইবে, তাই তাহার বউদিকে দুয়ার লেপা-মোছা করিতে কহিতেছে। ১০২ক-সংখ্যক গান হইতে জানা যায়, পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধের জন্য (ইহাকে 'কইনাগত্', কন্যাগোত্র—বলা হয়), অনেক কলা এবং বিবিধ উপচার ক্রয় করা হইয়াছে। ১০৩-সংখ্যক গানে পাই, নবান্নের পিণ্ড উৎসর্গ করিবার জন্য পুরোহিত আসিয়া কলার বাকল কাটিতেছে, এদিকে নবান্নের জন্য 'আলোয়া ধান' (অর্থাৎ আতপ চাল) ভানা হইতেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই আনুষ্ঠানিক গানগুলির মধ্যেও নর-নারীর চিরন্তন দুঃখ-ব্যথার কথা প্রকাশ্যভাবে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ১০২-সংখ্যক গানে দেখি, নবান্ন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইতে-আসা জনৈকা নারীর প্রতি অবিবাহিতা যুবকের আকর্ষণ; কিংবা, ১০২ক-সংখ্যক গানে পাই, কলার বাকল কাটিতেছে যে পুরোহিত, সে-ও চোখ বাঁকাইয়া, ধান ভানিতেছে যে নারী, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। গানখানির মধ্যে অধিকারীর এই দৌর্বল্য সেই নারী বেশ গর্বের সহিত প্রকাশ করিয়া আপনার সচেতন যৌবনের প্রতি আপনিই যেন অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। আনুষ্ঠানিক গানকে এইভাবে লৌকিক আনন্দ-ব্যথা প্রকাশের আধাররূপে ব্যবহার করিবার মধ্যে একটি বিশেষ সমাজ-মানসের পরিচয় মিলে। এই বিশেষত্ব অবশ্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক গানেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ধারার নবান্ন-গীতিগুলি একান্তভাবেই নবান্ন-উৎসবকে ভিত্তি করিয়া আনন্দ-বেদনার কথা লইয়া রচা। ১০১-সংখ্যক গানখানি এই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গানটিতে এক অবিবাহিত যুবক তাহার বউদিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে, ওগো বউদি, যাহাদের স্ত্রী-পুত্র আছে, তাহারা কতো আনন্দ করিয়া নবান্ন করিতেছে। আমার বিবাহ হয় নাই, স্ত্রী-পুত্র নাই, 'সুখ্খো নাই গে, সুখ্খো নাই'। অথচ, নতুন ধান বিক্রয়-করা টাকা দিয়া দাদা অনায়াসেই আমার বিবাহ দিতে পারিত!

নবান্ন যে কেবল উদর-পূর্তির নিশ্চিত আশ্বাস লইয়াই কৃষকের জীবনে আবির্ভূত হয় না, অধিকন্তু তাহার দেহ-মনকেও যে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে, ইহা হইতে তাহাও বুঝি। তাহার পর একটি সামাজিক রীতিরও পরিচয় আছে। এই সমাজে পুরুষই কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিয়া থাকে। কন্যাপণের টাকা জোগাইতে না পারিয়া অনেকেই বৎসরের যে কোনো সময়েই বিবাহ করিতে পারে না। নতুন ধান উঠিতেই, ধান বিক্রয়-করা টাকা দিয়া বিবাহ করিবার কথাটা তাই নবান্নের দিনই বিশেষভাবে মনে পড়িয়া গিয়াছে।

এই বেদনারই অপর একটি দিকের প্রকাশ হইয়াছে ১০৩-সংখ্যক গানে। উপরোক্ত গানে যেমন অবিবাহিত যুবকের মনের ব্যথা প্রকাশিত হইয়াছে, এই গানে তেমনি বিধবার মনের দুঃখ ব্যক্ত হইয়াছে। নবান্ন চাষীর জীবনে বৎসরের একটি বিশেষ দিন। অথচ, বিধবার নিকট এই বিশেষ দিন উহার সকল বিশেষত্ব হারাইয়াছে। 'সোয়ামী আবিনে' তাহার জীবন নিরানন্দময় হইয়া গিয়াছে এবং আজ নবান্নের দিন মনে হইতেছে, স্বামী বাঁচিয়া থাকিলে এই অনুষ্ঠান আরো কতো সুখের হইত।

নবান্ন উপলক্ষে মেয়েলি রঙ্গ-তামাশার নিদর্শন রহিয়াছে ১০৪-সংখ্যক গানে।

CENTRAL LIBRARY

॥ পুষুণা ॥

পৌষমাস—লক্ষী মাস। নতুন ধান, নতুন গুড়ের প্রাচুর্য থাকে বলিয়া এই মাস ভরিয়া, বিশেষত সংক্রান্তির দিন, পিঠা খাইবার প্রথা আছে।

রাজবংশী সমাজে পৌষ সংক্রান্তির দিন একটি আচার পালিত হইয়া থাকে। ধান কাটিয়া আনিয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাহা স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়। পৌষ 'দোমাসি' অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন সেই ধানের পুঁজিকে বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া বরণ করা হয়। হলুদ রঙ দিয়া সুতা রঙ করিয়া সেই পুঁজিকে ঘেরা হয়। এই অনুষ্ঠানের দেবীকে বলা হয় 'পৌষলক্ষী'। 'পুষুণা' তাঁহারই অপর এবং অধিকতর চলিত নাম।

পুঁজিকে বরণ করিবার সময় একটি ছড়া বলা হয়। ছড়াটি 'মেছেনী'-র আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ওই ছড়াটিরই দ্বিতীয় স্তবকে আছে: 'পিঠা দিমো, মিঠা দিমো, দিমো দুধের ক্ষীর।' ধানের পুঁজিকে পূজা করিবার সময় এই দিন দুধ, পিঠা ইত্যাদি দেওয়া হয়। জড় ধান্য-স্তূপকে তখন সচেতন ও সপ্রাণ পদার্থ বলিয়া মনে করা হয়।

পুষুণা-র গানের একটি অংশ হইল এই পিঠা ভাজিবার গান। পিঠার জন্য ধান ভানা হইতেছে, চাউল গুঁড়া করা হইতেছে, খোলায় করিয়া তাহা ভাজা হইতেছে, ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া গান গাওয়া হয়। সঙ্কলিত পুষুণা গানটিতে চাউল গুঁড়া করিয়া তাহা দিয়া পিঠা ভাজিবার কথা বলা হইয়াছে (সং ১০৫)।

তিস্তার পূর্ব দিকে, বিশেষত ধূপগুড়ি থানায়, পুষুণার জন্য ধান সংগ্রহ করিবার অপর একটি আনন্দজনক প্রথা আছে। মাঠ হইতে পাকা ধান কাটিয়া লইয়া ইঁদুরেরা তাহা মাটির তলে লুকাইয়া রাখে। এই দিন কিশোর ও নব যুবকেরা তাই ক্ষেতে যাইয়া সকল গর্ত খুঁড়িয়া সেই ধান বাহির করিয়া লইয়া আসে এবং তাহা দিয়াই পিঠা তৈরি করিয়া থাকে। দল বাঁধিয়া ধান সংগ্রহ ও ইঁদুর মারার মধ্যে বেশ একটা আনন্দানুষ্ঠানের এবং আদিমতার ইঙ্গিত মিলে। এই অনুষ্ঠানের মূল কথা বোধ হয় এই: পুষুণা হইল পৌষলক্ষীর অনুষ্ঠান। লক্ষী অপচয় সহিতে পারেন না। তাই অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করিয়া হারানো ধান ফিরাইয়া আনা হয়।

॥ হোলি ॥

॥ ১ ॥

'হোলি' (সং হোলিকা ; হিন্দী হোলী) উপলক্ষে গান গাহিবার এবং 'বুড়ি'-র ঘর' পোড়াইবার প্রথা বহুস্থানেই আছে। কিন্তু জলপাইগুড়ির হোলির গানের বিষয়ের ও উহার আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব অন্যত্র লক্ষ করা যায় না।

জলপাইগুড়ির হোলির গান দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একদিক আনুষ্ঠানিক, অপর দিক নিছক আনন্দের। আনুষ্ঠানিক হোলি গানকে 'ভেড়াছোবার গান', 'ঠারোয়া হোলি' বা 'ধুলিয়া রাজার গান' বলা হয়। স্বতো মূর্দ্ধন্যীভবনের ফলে 'ধুলিয়া' 'ঢুলিয়া'রূপেও উচ্চারিত হয়।

'ভেড়াছোবার' অনুষ্ঠানের পরিচয় এই :

ফাল্গুন পূর্ণিমার অর্থাৎ দোলের পূর্ব দিন সন্ধ্যারাত্রে 'ধুলিয়া রাজার' আসন পাতা হয়। কোনো ফাঁকাস্থানে গ্রামের সবাই মিলিয়া এই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। একটি ডাল-পাতা সহ সদ্য কাটিয়া-আনা বাঁশ গাছ মাটিতে স্থাপন করা হয়। অনন্তর উহার ডাল-পাতার সহিত খড়-বিচালি ইত্যাদি সহজদাহ্য পদার্থ বাঁধিয়া দিয়া পরিশেষে প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত উহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকেই বলে 'ভেড়াছোবা'। জলপাইগুড়ির উপভাষায় 'ছোবা' অর্থ 'পোড়ানো'। 'ভেড়া' শব্দের অর্থ মেষ।

'ভেড়াছোবা'-র পর ধুলিয়ার আসন পাতা হয়। পুরোহিত (স্থানীয় উপভাষায়, অধিকারী) আসিয়া এই বহ্ন্যুৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং ঠাকুর 'পাটে' বসাইয়া যথাবিহিত পূজা করিয়া থাকেন।

পরদিন দোল। সেদিন নিজস্ব কোনো বিশিষ্ট অনুষ্ঠান নাই। তার পর দিন—'ধুলিয়া'। ইহা এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। যে স্থানে 'ভেড়াছোবা' হইয়াছিল, সেইস্থানে সেদিন বসে 'ধুলিয়া রাজার' আসর। একটি সিন্দূর-লিপ্ত মৃত্তিকা পিণ্ডকে 'ধুলিয়া রাজা' হিসাবে কল্পনা করিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবেও একজন ধুলিয়া রাজা সাজিয়া থাকে। তারপর, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোটাল, কেহ সেনাপতি ইত্যাদি সাজিয়া একটি রাজসভা গঠন করে। রাজা ও তাহার পার্ষদগণ সবাই বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া সং সাজিয়া লয়। রাজার সিংহাসন হইল ভাঙা 'উদুখল' (স্থানীয় ভাষায় ইহাকে বলে 'ছাম')। পার্ষদগণ লাল পতাকা হাতে লইয়া রাজাকে ঘিরিয়া বসে।

CENTRAL LIBRARY

অনন্তর আরম্ভ হয় সভার কার্য। মন্ত্রী উঠিয়া হয়তো বলে, রাজা, অমুকে অমুক দিন এই অপরাধ করিয়াছে। আজ তাহার বিচার করুন। রাজা আজ্ঞা দিলেন, যাও, তাহাকে উলঙ্গ করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস। কিংবা বলিলেন, যাও, তাহার গায়ে কাদা-জল ঢালিয়া দাও; অথবা নদীতে লইয়া খানিক ডুবাইয়া রাখিবার কথা বলিলেন।

আজ্ঞা পাইবা মাত্রই যাহারা সৈন্য সাজিয়াছে তাহারা সেনাপতিকে সম্মুখে রাখিয়া সেই ব্যক্তিকে রাজার আজ্ঞানুযায়ী শাস্তি দিতে চলিল। অপরাধী ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত থাকে, ভালোই। কিন্তু সে যদি সেই স্থানে উপস্থিত না-ও থাকে, তবে যেখান হইতে হউক, তাহাকে ধরিয়া লইয়া আজ্ঞানুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য, সমস্ত ব্যাপারটা নিছক রঙ্গ-কৌতুকের। যে সকল অপরাধের কথা মন্ত্রী উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহা কাল্পনিক,—হাস্যোদ্রেক করিবার জন্য উদ্ভট ও তুচ্ছ অপরাধের নাম উল্লেখ করা হয়। রঙ্গ করিয়া তাই সেদিন কয়েকজন মিলিয়া কাহাকেও উলঙ্গ করিয়া দিলে কিংবা এক বালতি কাদা-জল ঢালিয়া দিলেও সে কিছু মনে করে না, বরং এই কৌতুকে সে-ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

কিন্তু, ধুলিয়া রাজ-দরবারের এই বিচারের অভিনয় সবটাই কাল্পনিক ব্যাপার নয়। যথার্থই কেহ কোনো নৈতিক ও সামাজিক অন্যায় করিয়া থাকিলে, সেইদিন তাহার অপরাধের কথা রাজ-দরবারে উত্থাপিত হইয়া থাকে এবং রাজা তাহার সম্যক বিচার করিয়া যে রায় দিবেন, মাথা পাতিয়া তাহা ধারণ করিতে হয় নতুবা তাহাকে সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে, সাধারণত সামাজিক জরিমানারূপে অর্থের কথাই বলা হয়।

বিচারের পাট চুকিয়া গেলে, সমবেত জনতা ধুলিয়া রাজার নামে জয়ধ্বনি করিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া দেয়। রঙ্গ দেখিয়া মজা পাইবার জন্য এই দিন অনেকেই সেখানে উপস্থিত থাকে।

ধুলিয়া রাজার এই বিচারের অভিনয় নিঃসন্দেহে আদিম গণতান্ত্রিক সমাজের কথা মনে করাইয়া দেয়। বৎসর শেষ হইয়া আসিতেছে, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কৃত নানান অপরাধের সামাজিক খতিয়ান করিয়া অপরাধীর প্রাপ্য সাজা এই দিন দিয়া দেওয়া হয়। ধুলিয়া রাজা হইলেন, সমাজের

জনগণের মানস-প্রতিনিধি। জনগণের হইয়া, জনগণের কথা শুনিয়া, ধুলিয়া রাজা দুষ্টের দমন করেন এবং সামাজিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখেন। ইহাই এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য। শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হইবার ফলে, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কৃত অপরাধগুলির বিচার আজিকার সভ্যসমাজে আদালতে হইয়া থাকে। কিন্তু আদিম সমাজের নিজস্ব রীতিতে সেই অপরাধেরই আর এক দফা বিচার করা হয়।

ধুলিয়া রাজার আসর বসিবার পূর্বে ধুলিয়া রাজার 'কথা' বলা হয়। ধুলিয়া রাজার গল্প এই :

এক কাঠুরিয়া ছিল। একদিন রাজার বাড়ীতে সে কাঠ বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল, রাজা মহাশয় সোনার থালা পাতিয়া নানান ভালো জিনিস খাইতেছেন। রাজার সোনার বাটি, সোনার ঘটি, সোনার পিঁড়ি দেখিয়া কাঠুরিয়ার ভারি লোভ হইল। রাজার মত করিয়া সোনার পিঁড়ি পাতিয়া সোনার থালায়, সোনার বাটিতে, সোনার ঘটিতে ভালো ভালো জিনিস খাইতে তাহারও সাধ জাগিল। এইজন্য সে খুব পরিশ্রম করিয়া চলিল। অবশেষে, একদিন সে মাটির থালার বদলে টিনের থালায় ভাত খাইবার সুযোগ পাইল। কিন্তু একটি মাছি আসিয়া সেই ভাতের উপর বসিয়া পড়ায় সে তাহা খাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও সেই মাছি উড়িল না এবং কাঠুরিয়াও ভাত খাইতে পারিল না।

মাছি আর কেহ নয়, স্বয়ং ভগবান। তিনি মাছির রূপ ধরিয়া কাঠুরিয়ার ধৈর্য পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ভগবান তখন নিজ-মূর্তি ধরিয়া কাঠুরিয়াকে বর দিতে চাহিলেন। কাঠুরিয়া তখন রাজার মতো সোনার পিঁড়ি, সোনার থালা, সোনার বাটি, সোনার ঘটির বর মাগিল। কাঠু-রিয়ার বাসনা পূর্ণ হইবে—এই বলিয়া ভগবান অন্তর্ধান করিলেন। কাঠুরিয়াই শেষে ধুলিয়া রাজা হইল।[১]

পুরুষদের মতো মেয়েরাও পৃথকরূপে ধুলিয়া রাজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তবে এখানে 'ধুলিয়া রাজা'র বদলে থাকে ধুলিয়া রাণী।

১ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত বোদাকোবার অন্তঃপাতী জোড়াবাঁধা গ্রামে গল্পটি চলিত আছে।

CENTRAL LIBRARY

'ভেড়াছোবা' এবং ধুলিয়া রাজার পূজার সময় বিবিধ আনুষ্ঠানিক গান আছে। এই সকল গান এতো অশ্লীল যে তাহা অশ্রাব্য, অলেখ্য, অকথ্য। কিন্তু, এই অশ্লীলতম গানই সেইদিন পবিত্র মন্ত্র-জ্ঞানে গীত হইয়া থাকে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য মন্ত্র-গানগুলিও বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে মন্ত্র-সঙ্গীত যতো পবিত্র, অশ্লীলতাও তাহাতে সেই পরিমাণে বেশি। ধুলিয়ার এই অশ্লীল গানগুলি অবশ্য কেবল একদিনের জন্যই লঘু-গুরু নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে গাওয়া চলে। এই অশ্লীলতাই মন্ত্রের বিশুদ্ধতা যেখানে লাভ করে, সেখানে এই গান যাদুক্রিয়ার সমধর্মী হইয়া পড়ে।

ধুলিয়া রাজা হওয়া সম্পর্কেও নানান সংস্কার আছে। যে ব্যক্তি ধুলিয়া রাজা সাজিয়া থাকে, সে বেশিদিন বাঁচে না, এইরূপ বিশ্বাস চলিত আছে। এই জন্য কেহই সহজে ধুলিয়া রাজা হইতে চায় না। একই কারণে সাধারণত বৃদ্ধদেরই ধুলিয়া রাজারূপে মনোনীত করা হয়॥

॥ ২ ॥

দোল বা হোলির সহিত মেষ বা ভেড়ার সম্পর্ক কী, তাহা এক উপাদেয় আলোচনার বিষয়। হোলি উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অনুষ্ঠানগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে একটি মিশ্র উৎসব বলিয়া অনেকেরই মনে হইয়াছে, —একাধিক উৎসব ইহার মধ্যে আসিয়া মিশিয়াছে। এইসব উৎসবগুলির একদিকে রহিয়াছে শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক দিক; অপর দিকটি একান্তভাবেই লৌকিক। এই লৌকিক দিকটিই যে এই হোলি উৎসবের আদিম ও প্রাথমিক দিক ছিল, তাহা সামান্য বিচারেই বুঝা যায়। রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বা অন্য পৌরাণিক প্রসঙ্গ (যেমন, বিষ্ণু শঙ্খচূড় বা হোলিকাকে নিধন করিয়া হোলী উৎসব করিয়াছিলেন বা রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমে এই দোলোৎসব করেন) পরবর্তীকালীন যোজনা। হোলির প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য প্রথমে ইহার অনুষ্ঠানগুলি লক্ষ করিতে হইবে।

প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষে' (নবম ভাগ, পৃ. ৩৯-৪২) লিখিত হইয়াছে: "চতুর্দশী রাত্রির নিশামুখে দোল-মণ্ডপের পূর্বভাগে বহ্ন্যুৎসব করিতে হয়। এই বহ্ন্যুৎসব 'নেড়ার ঘর পোড়ান' বলিয়া চলিত কথায় প্রসিদ্ধ আছে। এই বহ্ন্যুৎসব দোলযাত্রার অঙ্গকার্য। আচার্যকে বরণ ও ভূমিসংস্কার করিয়া বিধিবৎ তৃণরাশি সজ্জিত করিবে, এবং যথাবিধানে পূজাদি করাইয়া সপ্তবার ঐ তৃণরাশি গোবিন্দকে ভ্রমণ করাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে। যাহারা এই সময়ে হরিকে অবলোকন করে, তাহারা সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। যে পর্যন্ত দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়, সেই সময় পর্যন্ত এই অগ্নি অতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করিবে।…গোবিন্দকে দোলমণ্ডপে আরোপিত করিয়া সাতবার দোল দিবে। অধোদেশে ও উর্দ্ধদেশে ঐ দোল-

CENTRAL LIBRARY

মণ্ডপ সাতবার করিয়া ভ্রমণ করাইবে, অর্থাৎ দোল দিবে এবং দোল যাত্রা-বসান হইলে একবিংশতিবার ভ্রমণ করাইবে।...

"চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রমাপতি বিষ্ণুকে দোলারূঢ় করিয়া যথাবিধি পূজাপূর্বক একমাস ধরিয়া আন্দোলিত করিবে,..."

"ফাল্গুন মাসের রাকাদিতে যদি উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেইদিন দোলোৎসব কার্য হইবে।"

"চৈত্র মাসের শুক্ল নবমীর দিন যে দোল হয়, তাহাকে রামনবমীর দোল কহে।"...

"...কাহারও মতে, ইহাই প্রধান বসন্তোৎসব।...এক সময়ে য়ুরোপীয় অনেক সভ্য জাতিও এইরূপ বাসন্তিক আমোদে যোগদান করিতেন।..."সমস্ত জার্মানী পান-ভোজন ও রঙ্গরসে আত্মহারা হইত, ভাবিত যেন এমন দিন আর আসিবে না। অধিবাসিগণ মুখে মুখোস দিয়া, ছদ্মবেশ করিয়া সর্বাঙ্গে লাল ও কাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উলঙ্গবৎ ছুটাছুটি করিত।"...

"...বৃন্দাবনে এখনও হোলী-উৎসবে ঐরূপ বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। তথায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মানসম্ভ্রম লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়া এই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না। আবীর মাখিয়া নানা রঙ্গে ভূষিত হইয়া অকথ্য ভাষায় গান গাহিয়া বাজনা বাজাইয়া স্ত্রী-পুরুষ পথে পথে বেড়াইয়া থাকে।..."

এই বর্ণনা হইতে কয়েকটি বিশিষ্ট দিক তুলিয়া নেওয়া যায়: ১. এই আলোচনায় মূলত ভারতীয় পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; শেষাংশে ইউরোপীয় লৌকিক অনুষ্ঠান বসন্তোৎসবের সহিত ইহার সাদৃশ্য সঠিক ও চমৎকাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; ২. দোলোৎসব কেবল একবার নয়, একাধিকবার (ফাল্গুন ও চৈত্রমাসের বিভিন্ন তিথিতে, এবং গোটা চৈত্রমাস ভরিয়া) ইহা হইয়া থাকে [এই প্রসঙ্গে তুলনীয় 'ঝুলনযাত্রা']; ৩. অগ্নিসংযোগ, 'বুড়ীর ঘর পোড়ান' এবং দোলমণ্ডপের 'পূর্বভাগে' তা করা; কিন্তু "চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে হরিকে দক্ষিণাভিমুখ করিয়া দোলারূঢ়" করিবার কথা বলা হইয়াছে ৪. বৃন্দাবনের দোললীলায় অশ্লীল গান গাহিয়া নর-নারীর পথে-পথে বেড়ানো এবং লঘু-গুরুত্বের ভেদ ঘুচিয়া যাওয়া।

প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর আলোচনায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ একেবারেই নাই.— তিনি লৌকিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে হোলি

CENTRAL LIBRARY

উৎসবের বিবরণ দিয়াছেন। 'ভারতকোষে' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ: চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৭-৯৮) তাঁহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর: "ফাল্গুন মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে 'বুড়ির ঘর' বা মেড়া পোড়ানো হয়।···বাঙলা দেশের কোনও কোনও জেলায়, যথা মুর্শিদাবাদ বা রংপুরে, দোলের ৩-৪ দিন পরে এক ব্যক্তিকে সং 'হোলির রাজা' সাজাইয়া গ্রামে ঘোরানো হয়। 'রাজা' যাহাকে পান তাহার নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন, সেই পয়সায় আমোদ আহ্লাদ হয়।"

"ওড়িশায় মেড়া পোড়ানোর নাম 'মেনটা পোড়েই'। কিছুদিন পূর্বেও কোথাও কোথাও একটি জীবন্ত ভেড়াকে আগুনে দগ্ধ করা হইত। আজও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাশে দোলমঞ্চের নিকটে একটি ভেড়ার গায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আগুন ছোঁওয়াই দেওয়া হয়। বিহারে কোথাও কোথাও সং সাজানো হয়, রং-এর খেলার সহিত কাদা মাখানো, অশ্লীল গান গাওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে; বাংলাদেশেও নাকি এক সময়ে তাহার চলন ছিল। গুজরাতে একটি মানুষের প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়, হোলির সং-ও আছে। উত্তর প্রদেশের মথুরাতে আগুন জালার পর একজন মানুষকে তাহার মধ্য দিয়া ছুটিয়া পার হইতে হয়। দক্ষিণ ভারতে দোলের উৎসব চৈত্র মাসে সাধিত হয়; কিন্তু ফাল্গুন মাসে আগুনের উৎসব উত্তর ভারতের মত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম 'কামদহনম্'।···"

"মেড়া পোড়ানো বা খড় অথবা পিটালি নির্মিত মানুষের আকৃতি পোড়ানোর সহিত ওড়িশার কন্ধ জাতির কৃষি-সম্পর্কিত নরবলি প্রথার অনেকাংশে মিল আছে। ···প্রাচীন ভারতে, এমন কি প্রাচীন ইরানেও বসন্তকালে নববর্ষের প্রারম্ভে রং লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া বা উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইরানে এক ব্যক্তিকে সং সাজাইয়া তামাসা করা হইত, বিদায়ী পুরাতন বৎসরের প্রতীক হিসাবে তাহাকে গণ্য করা হইত।"

"অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বসন্তকালীন কয়েকটি স্বতন্ত্র উৎসব একত্র সংযুক্ত হইয়া দোল বা হোলি উৎসবের বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।"

বস্তুতই তাই। যে কয়েকটি উৎসব দোল বা হোলির সহিত যুক্ত হইয়াছে, বর্ষশেষ বা নববর্ষের আবাহন উৎসব তাহার মধ্যে প্রধান একটি উৎসব। এই

CENTRAL LIBRARY

নববর্ষ বা বর্ষশেষ উৎসবের সহিত আগুন ও ভেড়া কিভাবে যুক্ত হইয়াছে, তাহাই এখন আলোচ্য।

পৌরাণিক যে আচার-অনুষ্ঠানের কথা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বহ্ন্যুৎসবের স্থান দোল-মণ্ডপের 'পূর্বদিক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এই 'পূর্বদিক' সূর্য উঠিবার দিককে এবং আগুন সেই সূর্যের তাপকে চিহ্নিত করে। পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার ফলেই বর্ষের আগমন সূচিত হয়; আগমন-নিক্রমণ একটি নিরন্তর ছন্দ ও বৃত্তমূলক গতিকে নির্দেশ করে, যে বৃত্ত ও গতি কালচক্ররূপী চড়কের গাছ,—তাহাই দোলা দেওয়া রূপ লইয়াছে 'দোল' উৎসবে। দোলায় চাপাইয়া গোবিন্দকে সাতবার, বা একুশবার দোলানো কিংবা গোটা চৈত্র মাস ভরিয়া তাঁহাকে দোলানো (এইখানে চৌদল ও চড়ক অভিন্ন) কিংবা পাড়ায়-পাড়ায় ঘোরানো, পুরাতন ও জীর্ণ সূর্যকে নবরূপে জাগ্রত হইবার যাতু-অনুষ্ঠান। কল্পনা করা হইত, বুঝি এই বর্ষশেষের সহিতই সূর্যেরও মৃত্যু ঘটিবে (তাই মনুষ্যমূর্তি বা ভেড়া পোড়ানো হয়) আর তাহার পুনরুজ্জীবন হইবে না; সুতরাং মৃত্যুর অনুষ্ঠান করিয়া একদিকে সেই বিশ্বাসকে বাস্তব করা, অপরদিকে মৃত-আত্মার পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস থাকায় সূর্যের (এবং বৎসরেরও) পুনরুজ্জীবনকেই লক্ষ করা মাত্র। একমাস ধরিয়া দোলা দেওয়া তাঁহার গতিশক্তিকেই ত্বরান্বিত এবং সঞ্জীবিত করা।

বারো মাসের বারোটি রাশি এবং প্রতিটি রাশির একটি করিয়া প্রতীক কল্পিত হইয়াছে। এই হিসাবে বৈশাখ মাস, বৎসরের যাহা প্রথম মাস, তাহার প্রতীক চিহ্ন হইল মেষ। এই জন্যেই দোলোৎসবের বহ্ন্যুৎসবে ভেড়া পোড়ানো হয়। ভেড়ার সহিত আগুনের একটি বিশেষ যোগ আছে। এখন পর্যন্ত কোনো বিশৃঙ্খলা ও বিপদকে নির্দেশ করিতে বাঙলা ইডিয়ম "ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা" বলা হয়।

ভেড়ার বদলে বৃক্ষ-তৃণলতাও পোড়ানো হয়। মেদিনীপুরে এইদিন বিভিন্ন আনাজ-তরকারী পোড়াইয়া খাইবার প্রথা আছে। 'নেড়া'র ঘর কি 'মেড়া'র ঘরের বিকৃত উচ্চারণ? 'বুড়ীর ঘর' (পূর্ববঙ্গে যথার্থই খড়-বিচালি দিয়া একটি ধনুকের মতো বাঁকানো ঘর তৈরি করিয়া আগুন দেওয়া হয়) নাম হইতেই বুঝা যায় ইহার পিছনে কোনো 'মিথ্' আছে, যাহার সন্ধান আমি পাই নাই। তবে অনুমান করিতে বাধা নাই। বলিয়াছি, এই আগুন

CENTRAL LIBRARY

সূর্যের তাপের প্রতীক ; অথবা আগুন আবিষ্কৃত হইবার পর আগুনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া আত্মা-বোধের আরোপের ফলে ইহাকে পুনরুজ্জীবনের প্রতীক (আগুন নিভিয়া গেলে আবার জ্বলিয়া উঠে) বলিয়া মনে করা ; সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের ফলে নববর্ষের আগমন ও উজ্জীবন হোলির উৎসবের একটি দিক। সূর্যের সহিত কালক্রমে চন্দ্রের যোগ সংঘটিত হইতে পারে, কারণ পৃথিবীর বহুদেশেই চন্দ্র-সূর্য, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, দুই ভাই বা অমনি কোনো সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ভারতীয় পূজা-উৎসব সৌরমাস ধরিয়া করা হইলেও প্রেত-কৃত্যাদি চান্দ্রমাস অনুযায়ী হইয়া থাকে, ফলে চন্দ্র-সূর্যের একীভবন সহজতর হয়। চাঁদের পাহাড়কে লইয়া পৃথিবীর বহুদেশে নানা 'মিথ্' আছে, বাঙলা দেশে বলে,—এক বুড়ী চাঁদে বসিয়া সুতা কাটিতেছে। চন্দ্র-সূর্যের একীভবনের ফলে, চাঁদের বুড়ির কল্পনাটাই 'বুড়ির ঘর' হইয়া যায় নাই তো ?

বাকী রহিল আর দুইটি প্রসঙ্গ : মুখোস পরিয়া নাচা, এবং লঘু-গুরুর ভেদ ঘুচাইয়া অশ্লীলতম গান গাওয়া। মালদহের গম্ভীরা গান বৎসর শেষের আনুষ্ঠানিক গান, সকলেই তাহা জানেন। এই গম্ভীরা গানেও মুখোস ব্যবহার করা হয়। কিংবা প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের যে 'চোর চুন্নীর' গানকে আমি ইহার পূর্বেই বৎসর শেষের গান বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহাতেও মুখোস পরিয়া একটি আচার পালন করিবার কথা বলিয়াছি। দেখা যায় বৎসর শেষ বা শুরুর সহিত মুখোস নৃত্য পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই জড়িত আছে।

অশ্লীল গান গাওয়া কিসের জন্য ? ইহা নববর্ষের আগমনজনিত আনন্দের, লোক-মানসের আদিম উল্লাসের প্রতীক। বৎসর শেষ ও শুরুতে যেমন ভেদ নাই, লঘু-গুরুতেও তেমনি। অথবা, বৎসরের অন্তিম দিন,—তাহার মৃত্যুর দিন ; সে পুনরুজ্জীবিত হইবে কিনা সন্দেহ, সুতরাং সে অন্তিম দিনে সকল বাধা ঘুচাইয়া আমোদ কর। হয়তো বা এই অশ্লীল গানকেই এক পবিত্র ও পরমশক্তিধর যাদুগুণসমন্বিত 'Mana' বলিয়া গণ্য করা হইত, যাহা পালনের ফলে বৎসর পুনরুজ্জীবিত হইবে বলিয়া নিষ্ঠা লইয়া বিশ্বাস করা হইত।

হোলির বহ্ন্যুৎসবের সহিত ইউরোপ এবং অন্যান্য অঞ্চলের 'Bon-fire' উৎসব তুলনীয়। আনন্দোৎসব এবং ঘটনার-স্মরণিকারূপে সমবেতভাবে অগ্নি-প্রজ্জ্বালন মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট রীতি ছিল বটে, কিন্তু ইহার অন্তরালস্থিত আসল ঘটনা অগ্নি-আবিষ্কারজনিত আদিম উল্লাস বলিয়া মনে হয়। অগ্নিকে

CENTRAL LIBRARY

'শুভ' বলিয়া মনে করা হইত বলিয়াই পূজায় দীপ জ্বালা হয় অদ্যাবধি, যাত্রাকালে বৈদিক যুগে অগ্নি-প্রদক্ষিণ ও অগ্নি-বহন ('সাগ্নিক') করা হইত, যজ্ঞাগ্নির কথাও স্মরণীয়। অষ্টাদশ শতকে ডঃ জনসন 'Bon' শব্দটিকে (ইহার মূল 'Bone' ভুলিয়া) ফরাসী শব্দ মনে করিয়া এই জন্যেই ইহার অর্থ করিয়াছিলেন 'শুভ-অগ্নি'। 'The Oxford English Dictionary' (Oxford : 1933 : P. 985) তাই মন্তব্য করিয়াছেন : 'In Scotland with the form '*bone-fire*', the memory of the original sense was retained longer ; for the annual mid-summer 'bone-fire' or 'bon-fire' in the burgh of Hawick, old bones were regularly collected and stored up, down to *C.,* 1800."

মৃতের হাড় সংরক্ষণ ও অগ্নি—এই দুইটি বিষয়ের সহিত মৃত পুরাতন বৎসর ও অগ্নি প্রজ্বালনকে সুন্দরভাবে মিলাইয়া দেওয়া যায়॥

॥ ৩ ॥

হোলির দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলি নিছকই আনন্দগীতি। হোলির সময়ে গীত এই সকল আনন্দ গীতিগুলির একটি নির্দিষ্ট রচনাভঙ্গি আছে। সেই রচনাভঙ্গি অনুযায়ী এই সকল গানের বিভিন্ন নাম আছে; যেমন, 'মরিহুরিয়া হোলি', 'সরু হোলি', 'মোটা হোলি', 'ঢাডি হোলি', 'উত্‌রা হোলি', 'ভাঁড়া হোলি', 'বৈঠক হোলি', ইত্যাদি।

'মরিহুরিয়া' শব্দটির মধ্যে 'সুরের' উল্লেখ থাকিলেও আসলে এই গানের স্বতন্ত্র কোনো সুর নাই। গানের মধ্যে 'ওকি ও মরি রে' এই বলিয়া একটি টান থাকে এবং উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন নামীয় হোলি গানের মধ্যেও 'মরি'-র উল্লেখ থাকে। 'মরিহুরিয়া' যতো না সুরের বিশেষত্বকে নির্দেশ করে, তাহার চেয়ে বেশি করিয়া একটি বিশিষ্ট রচনাভঙ্গিকে নির্দেশ করে, অন্তত গানগুলির রচনাভঙ্গি দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

'মরিহুরিয়া' গানের রচনাভঙ্গিটি লক্ষ করিবার মতো। সাধারণত গানের চারিটি কলি বা 'তুক' বা পদ থাকে। এই চারিটি অংশের নাম, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের মধ্যেও এইরূপ কিছু লক্ষ করা যায়। সেখানে গানের আস্থায়ীকে বলা হয়

CENTRAL LIBRARY

'ঘোষা'। ইহা 'ঘষা' রূপে উচ্চারিত হয়; শব্দটি বঙ্গদেশের অন্যত্র বেশ চালু আছে। কেহ কেহ 'ঘোষা'কে 'গড়ন' বা 'ধরণ'ও বলিয়া থাকে। গড়ন অর্থ 'গোড়া', ধরণ অর্থ যেখান হইতে গান 'ধরা' হয়।

ঘোষা-র পরবর্তী কলিকে 'চিতান' বলা হয়,—ইহাও বাঙলা গানে কিছু নতুন কথা নয়। যাহারা ঘোষাকে 'গড়ন' বলে, তাহারা চিতানকে 'ভাঙন' বলিয়া থাকে। যে সকল স্থানে ঘোষাকে 'ধরণ' বলা হয়, সেই সকল স্থানে শেষ অংশের নাম 'পড়ন'। সাধারণ গানগুলিতে একটি করিয়া ঘোষা ও চিতান বা গড়ন ও ভাঙন কিংবা ধরণ ও পড়ন থাকে। গান দীর্ঘ করিতে হইলে খুশি মতো চিতান, ভাঙন বা পড়নের সংখ্যা বাড়াইয়া নেওয়া যায়। এইগুলিকে প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ, এইরূপে বিশেষিত করা চলে।

মরিসুরিয়া গানের রচনা উপরে কথিত রীতি অনুযায়ীই হইয়া থাকে বটে, তবে ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে ঘোষা ও চিতান অন্যান্য গানের মতোই। কিন্তু চিতানের পর ইহাতে একটি পয়ার-পদ বসাইতেই হয়। এই পয়ার চৌদ্দ অক্ষরের না-ও হইতে পারে এবং চলিত পয়ারের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। গান দীর্ঘ করিবার বাসনা থাকিলে প্রথম পয়ার, দ্বিতীয় পয়ার, এইরূপে পয়ার যোজনা করা চলে। এই পয়ার-অংশের গায়ন পদ্ধতিও আলাদা। ঘোষা ও চিতান যে তান-লয়ে গীত হইতে থাকে, পয়ারে আসিয়া হঠাৎ তাহা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং ইহা অনেকটা ছন্দোময় গল্প বলিবার ভঙ্গিতে (অনেকটা ছড়াকাটার ভঙ্গিতে) গীত হইতে থাকে। এই পয়ার অংশের শ্বাসাঘাতগুলিও ঢোল বা খোলের বোল অনুযায়ী পড়িয়া থাকে এবং সেই রকম করিয়াই ইহা রচিত হয়।

পয়ার-অংশ গীত হইলে, 'ও মরি রে', 'ওকি ও মরি রে', 'ওকি আহা মরি রে', ইত্যাদি বলিয়া আরেকটি কলি জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাই গানের অন্তিম অংশ এবং এই 'মরি'-র উল্লেখ করা হয় বলিয়াই এই গানের নাম 'মরিসুরিয়া'। মরি-র পদও খুশি মতো বাড়ানো যায় এবং এইভাবে প্রথম মরি, দ্বিতীয় মরি, এইরূপ নাম দিয়া পদ যোজনা করিতে পারা যায়।

অনেকে এই মরি-অংশ গীত হইবার পর আস্থায়ীতে আর ফিরিয়া না যাইয়া, চিতানে ফিরিয়া যান। এই জন্য এই সকল গানে মরি-র কলির সহিত চিতানের কলির অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

ইহাই 'মরিহুরিয়া' গানের সাধারণ কাঠামো। কিন্তু, সর্বত্রই যে এই কাঠামো অনুযায়ী গান রচনা করা হয়, তাহা নয়। অনেক সময় দেখা যায়, পয়ার-অংশ একেবারেই নাই। অনেক সময় দেখা যায়, ঘোষা-র পরই 'মরি' বসিতেছে। আবার কখনো বা ঘোষার পর চিতান বা ভাঙন না দিয়াই পয়ার দেওয়া হইতেছে। মোট কথা, উপরোক্ত রীতির শৈথিল্য প্রায়ই লক্ষ করা যায়।

'মরিহুরিয়া' গানের এই বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে গানের বিষয়বস্তুও বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এইবারে গানের বিষয়বস্তু ও গানের কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলিতেছি।

ঘোষাতে গানের বিষয়ের সূচনা করা হইয়া থাকে। গান বর্ণনা-মূলক হইলে এইখান হইতেই বর্ণনা দেওয়া হয়। চিতান বা ভাঙনে সেই ব্যাপারটিকেই ভাঙিয়া বলা হয়, অর্থাৎ উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যান করা হয় পয়ার অংশে বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, ঘটনা ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়। বর্ণনামূলক গানে এই পয়ারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে,—বিভিন্ন ঘটনা, নজির ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া বক্তব্য বস্তুকে ইহারই মাধ্যমে স্পষ্টতর করিবার সুযোগ মিলে। 'মরি' হইল গানের উপসংহার—এতোক্ষণ ধরিয়া যে বক্তব্য বলা হইল, 'মরি'-র কলিতে তাহারই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় বা রচয়িতার 'ইন্টারপ্রিটেশন' ইহাতে উপস্থাপিত করা হয়। 'মরি'-র কলি যেন রচয়িতার আত্ম-প্রক্ষেপের অংশ। এই কলির দ্বারা রচয়িতা হাস্য-কৌতুক করেন, বিষয়ের উপর নিজের মত প্রকাশ করেন বা বক্তব্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিংবা, সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ হইতে বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করেন, সমালোচনা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 'মরি'-র কলির এইরূপ ভূমিকা দেখিয়া ইহাকে চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীর 'ভণিতা'র সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়।

প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীর ভণিতার পার্থক্য রসিকেরা লক্ষ করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের ভণিতাগুলির মধ্যে রচয়িতার আত্ম-প্রক্ষেপ, শ্রীরাধিকাকে সমবেদনা, সমালোচনা জ্ঞাপন, বক্তব্য বিষয়কে অভিনব আলোকে বিচারের প্রবণতা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। একই ব্যাপার 'মরি'-র কলিতেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মরিহুরিয়া গানের কাঠামোর মতো, বিষয়বস্তুর বণ্টনের মধ্যে কিছু কিছু

CENTRAL LIBRARY

শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। বর্তমান সঙ্কলনের দুই-একটি গান হইতেই তাহা বোঝা যাইবে। সর্বদাই যে দোষাতে বিষয়ের সূচনা করিয়া, চিতানে তাহার ব্যাখ্যা করা হয় বা পয়ারে তাহার বিভিন্ন নজির দেখাইয়া তাহাকে স্পষ্ট করিয়া 'মরি'তে উপসংহার করা হয়,—এমন নয়। কাঠামো ও বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ রীতি মাত্র এবং সেই রীতির শৈথিল্যও যে ঘটে না, এমন নয়।

'মরিহুরিয়া' গান হোলিতেই কেন বেশি করিয়া গাওয়া হয় এবং গানের শেষে কেন এই 'মরি'র কলি জুড়িয়া দেওয়া হয়, অথবা এই 'মরি'-র কলি যোজনা করিবার মধ্যে গানের শ্রোতা ও গানের রচয়িতার কি মানস-পরিচয় মিলে, ইত্যাদি প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

বাঙলা ভাষায় 'মরি' শব্দটির ব্যবহার এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ইহা অব্যয় পদ এবং বিভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য ইহার ব্যবহার আছে। অনুমোদন ও করুণা জ্ঞাপন করিবার জন্য এই অব্যয় পদটির যেমন ব্যবহার মিলে, তেমনি ব্যঙ্গ করিবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আলোচ্য 'মরিহুরিয়া' গানগুলির মধ্যে উপরোক্ত তিন প্রকার মনোভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য 'মরি'-র উল্লেখ মিলে।

এখন লক্ষ করা যাক্, এই তিন প্রকার মনোভাবের মধ্যে কোন্ মনোভাবটি মরিহুরিয়া গানের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে এবং কোন্ মনোভাবটি 'মরিহুরিয়া' গানের উৎপত্তির কালে প্রাধান্য পাইত।

গানের মধ্যে 'মরি'র প্রয়োগ লক্ষ করিলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ব্যঙ্গ করিবার মনোবৃত্তি মরিহুরিয়া গানে প্রাধান্য পাইয়া থাকে এবং ব্যঙ্গের মনোভাব হইতেই 'মরি'র প্রয়োগ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই ব্যঙ্গের মনোবৃত্তি কেন আসিয়াছে, তাহা বোঝা যায়, মরিহুরিয়া গানের গায়ন ও রচনাকালীন অনুষ্ঠানকে স্মরণ করিলে। 'ধুলিয়া রাজার' বিচারের অভিনয় মনে করিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হইয়া যায়। বৎসরের শেষে, বৎসরের বিভিন্ন ঘটনাবলী গানের মধ্যে পর্যালোচিত হইতেছে। লোকমানসের স্বাভাবিক বৃত্তি অনুযায়ী কলঙ্ককাহিনী বা নৈতিক ও সামাজিক অপরাধগুলির দিকেই তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। হোলির গানে সেই সকল কাহিনীর উল্লেখ করিয়া পরিশেষে 'মরি' বলিয়া ব্যঙ্গ করা

CENTRAL LIBRARY

হইতেছে। আবার যেখানে দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, সেখানে গানের শেষে 'মরি' করুণাদ্যোতক অব্যয়রূপে; যেখানে প্রশংসনীয় কোনো ঘটনার বিবৃতি দেওয়া হয়, সেখানে 'মরি' 'শাবাশ' অর্থে অনুমোদনজ্ঞাপক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে 'মরি' আজিকার দিনে অনেক গানের একটি বহিরঙ্গ বিলাস হইয়া উঠিয়াছে। মরিস্থরিয়ার রচনা-রীতির একটিও সেই সকল গানে অনুসৃত হয় না, কেবল 'ও মরি রে' বলিয়া টানটুকু ছাড়া। 'মরি'-র কলি যেন এই সকল গানের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। 'মরি' যোগ করিতেই হইবে, এই বাসনার ফলেই এইরূপ হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, 'মরি' এতোই জনপ্রিয় যে, বৎসরের অন্যান্য অনুষ্ঠান অথবা অন্য যে কোনো গানেও আজকাল 'মরি' ব্যবহৃত হইতেছে। 'পালাটিয়া' গানের বন্দনাগীতিতে তো 'মরি' থাকিবেই। অথচ, মরি-র মূল বিচার করিলে, সর্বত্র 'মরি' ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। এই 'মরি' মেয়েদের গানেও প্রভাব ফেলিয়াছে এবং মেয়েদের গানেও 'মরি' উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

'মরি'-র প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলিতেছি। ভাষার বিচারে 'মরি'-কে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বলিয়া মনে হয় না। এই উপভাষায় বর্তমান কালের, উত্তম-পুরুষের রূপ একবচনে হওয়া উচিত 'মরোঁ'। 'মরি'রূপ' এই উপভাষার নিজস্ব নয়,—চলিত বাঙলার এই রূপটিকে লইয়া কেন যে নিজস্ব রূপ 'মরোঁ'-কে বাদ দেওয়া হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়॥

॥ ৪ ॥

সরু, মোটা, ঢাড়ি, উত্রা, বৈঠক ও ভাঁড়া—প্রভৃতি হোলি গানের মধ্যেও 'মরি' ব্যবহৃত হয়। মরিস্থরিয়া হোলির সহিত এই সকল হোলির বিষয় বা সুরগত কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে কিনা, অথবা অন্যান্য হোলি-গুলি বিচিত্র নাম ধরিয়া ভিন্ন হইয়াছে কিনা, এইবার সেই কথাই আলোচিত হইবে।

তিস্তার পূর্বপারে, বিশেষত ধুপগুড়ি থানায়, হোলির গানকে সরু ও মোটা দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। বিশেষণ দুইটি লক্ষ করিলে

CENTRAL LIBRARY

বোঝা যায়, ইহার দ্বারা গানের কোনো নির্দিষ্ট সুর বা কোনো রচনারীতি নির্দিষ্ট হইতেছে না। ইহা বিষয়কে নির্দেশ করিতেছে। যে গানে স্থূল রঙ্গ-রসিকতা বা সাদা-মাটা কথা থাকে তাহাই 'মোটা' হোলি। 'সরু' হোলিতে থাকে পুরাণ-উপপুরাণ হইতে কাহিনী লইয়া তাহা অবলম্বনে গান অথবা কোনো বিশেষ বিষয়ের আলোচনা। সরু ও মোটা উভয় হোলিতেই অবশ্য রচয়িতার খুশিমতো 'মরি' যুক্ত হইতে পারে। মোটা হোলিতে প্রেম ও কলঙ্ক-কাহিনী অথবা নিকট অতীতে ঘটিয়া-যাওয়া যে কোনো ঘটনা স্থান পাইতে পারে।

'ঢাডি' হোলি সম্পর্কে নতুন কিছু বলিবার নাই। 'জিতুয়া'-র আলোচনা প্রসঙ্গে 'ঢাডি' শব্দের অর্থ বলিয়াছি। ইহার অর্থ—ঘুরিয়া বেড়ানো। যে গান পাড়ার বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া গাওয়া হয়, তাহাই 'ঢাডি' গান। জিতুয়া, চোর-চুন্নী এবং হোলি উপলক্ষে ঢাডি গান খুবই চলে। ঢাডি-র একমাত্র বিশেষত্ব হইল, ইহার খাসাঘাতগুলি ঢোল অথবা খোলের বোলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ঢাডি কোনো অনুষ্ঠানের অপরিহার্য গান নয়। 'ঢাডি হোলি' বলিলে সেই গানই বোঝাইবে, যে গান হোলির সময় বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া গাওয়া হয়। ঢাডি-তেও 'মরি' যুক্ত হয়।

উত্‌রা, বৈঠক, ডাঁড়া প্রভৃতি হোলি সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াও কিছু জানিতে পারা যায় নাই। এই সম্পর্কে গায়ক-রচয়িতাগণেরও নিজস্ব কোনো স্পষ্ট ধারণা নাই। একই অঞ্চলে একই গান বিভিন্ন হোলি গানরূপে কথিত হইয়া থাকে। এই সকল হোলি গান সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিম্নরূপ।

'উত্‌রা' শব্দের অর্থ হইল—যে গানের মাধ্যমে 'উত্তর' দেওয়া হইয়া থাকে। 'ডাঁড়া হোলির' 'ডাঁড়া' শব্দের অর্থ কি হইতে পারে? দাঁড়াইয়া যে গান—এই অর্থে 'দাঁড়া' হইতে মূর্দ্ধন্যীভবনের ফলে 'ডাঁড়া' আসিতে পারে; আবার, পশ্চিমবঙ্গের 'দাঁড়া কবির' গানের 'দাঁড়া'-র সহিত ইহার সম্পর্ক থাকিতে পারে; কিংবা তৃতীয় অপর একটি অর্থ বাহির করা যায়: কোনো এক প্রাচীন রাজবংশী গায়ক 'ডাঁড়া'-র ব্যাখ্যা আমার নিকট এই করিয়া-ছিলেন: হোলির কোনো কোনো গানে দুই পক্ষ গান দিয়াই তর্ক করিয়া থাকে। দুই পক্ষ কোনো বিশেষ পৌরাণিক দুই চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং দুইজনে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তর করিয়া ও দিয়া থাকে। কোনো

CENTRAL LIBRARY

চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে এই উপভাষায় বলা হয় 'দণ্ড' নেওয়া। 'দণ্ড' হইতে 'ডাঁড়া' অনায়াসেই আসিতে পারে।

'ডাঁড়া হোলি'কে যদি প্রশ্ন ও উত্তরের হোলির গান বলিয়া ধরা হয়, তবে 'উত্‌রা'র সহিত ইহার একটি সম্পর্ক পাওয়া যায়। উত্তর দেওয়া—এই অর্থে যদি 'উত্‌রা'কে গ্রহণ করি, তবে 'উত্‌রা' হোলি ও 'ডাঁড়া' হোলিকে অভিন্ন বলিতে হয়।

আসলে, বিষয় অনুযায়ী হোলিগানের দুইটি মাত্র ভাগ—সরু ও মোটা। এই দুই বিষয়ের হোলিই গায়কদের খুশি মতো আসরে বসিয়া বা পাড়া বেড়াইয়া গাওয়া চলিতে পারে। সরু ও মোটা উভয় প্রকার হোলিই ঢাড়ি, উত্‌রা, বৈঠক ও ডাঁড়া হইতে পারে। তবে বৈঠক হোলির বিষয় 'সরু' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বলিয়া স্বতই অনুমিত হয়। হোলিগানের মধ্যে অপর দুইটি ব্যাপার লক্ষ করিবার মতো। প্রথম, মরি; ইহা একটি 'ফর্ম' মোটে। অধিকাংশ হোলি গানেই ইহা ব্যবহৃত হয় বটে, তবে না-ও করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়,—ঢাড়ি, বৈঠক, উত্‌রা ও ডাঁড়া প্রভৃতি গানের কোনো সুর বা বিষয়কে নির্দেশ করে না,—কেবল কিভাবে গান গাওয়া হইবে, তাহাই নির্দেশ করে মাত্র।

'মরিহুরিয়া' হোলি এই নাম দিয়া হোলি গানের কোনো ভাগ না করাই সঙ্গত। কেননা, হোলি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও 'মরি' ব্যবহৃত হয় এবং হোলিরই অন্যান্য গানে, যেমন, ঢাড়ি, উত্‌রা, বৈঠক, ডাঁড়া ইত্যাদিতেও 'মরি' ব্যবহৃত হয়॥

॥ ৫ ॥

পরিশেষে সংগৃহীত হোলি গানগুলির পরিচয় দিব। 'ভেড়াছোবা', 'ধুলিয়া'-র গানগুলি এমনতরো যে, সেগুলির পরিচয় সহজে দিবার উপায় নাই। এই যৎ-পরোনাস্তি অশ্লীল গানগুলি এমনিতেই স্থানে স্থানে বর্জিত হইয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাদের পাদটীকায় যতোদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। সুতরাং, এবিষয়ে ১০৬ হইতে ১০৬ঘ-সংখ্যক গানের পাদটীকাগুলি দ্রষ্টব্য। সেগুলি পড়িলেই গানগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাইবে।

১০৭, ১০৮, ১২৭ক-সংখ্যক গানগুলি সরু হোলি পর্যায়ের। ১০৭-সংখ্যক গানের মধ্যে জলকে বন্দনা করা হইয়াছে। জল না হইলে কি কি অসুবিধা ও

CENTRAL LIBRARY

সুবিধা হয়, ভগীরথ কর্তৃক মর্তে গঙ্গা অর্থাৎ জল আনায়ন, জল হইতে নদী, নদী হইতে সাগর, সাগর হইতে স্থলের উৎপত্তি ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে। পরিশেষে সীতাকুণ্ড ও ফল্গু নদীর উল্লেখ করা হইয়াছে। জল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই গানের বিষয়। পরবর্তী ১০৮-সংখ্যক গানে তেমনি 'বান' সম্পর্কে আলোচনা। 'বাণ' ও 'বান'—যমকের সুযোগ লইয়া উহাদের বিভিন্ন কার্যাবলীও এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। 'বান' অর্থে বন্যা, ঘর বাঁধিবার দড়ি (বান্ধান হইতে 'বান'), কোমরের দড়ি ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর ইন্দ্রের 'বাণ', বাণরাজার কথাও উত্থাপিত হইয়াছে। ১২৭ ক-সংখ্যক গানটিতে অবশ্য এই ধরণের কথা নাই। ইহাতে মৃত্যু-চিন্তার কথা বলা হইয়াছে। অন্তিম দিনে যমের দুয়ারে ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র কেহই সঙ্গে যাইবে না, সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মোটা হোলির গানগুলির প্রধান বিষয় হইল প্রেম। এই প্রেম কেবল অবিবাহিত যুবক-যুবতীর নয়,—বিবাহিতদের অবৈধ প্রণয়ও এইখানে স্থান পাইয়াছে। ইহাছাড়া কলঙ্ক-কাহিনী ও বৎসরের বিভিন্ন ঘটনা লইয়া অথবা কাহাকেও ব্যঙ্গ করিয়া গানও আছে অনেক।

প্রথমে মোটা হোলির প্রেমের গানের কথা বলি। ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৫খ ও ১২৬-সংখ্যক গানগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত গানের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষের সুন্দরী কন্যা বিবাহের আকাঙ্ক্ষা (সং-১২২), অধিক বয়স্কা কন্যার বিবাহের উদগ্র আশা এবং সময়মতো বিবাহ না দিবার জন্য পিতাকে 'মড়া' বলিয়া গালি দেওয়া, শেষে বাড়ীর আশ্রিত পুরুষের নিকটই আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেহ-জ্বালা জুড়াইবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে (সং-১১৩)। আরেকটি গানে কন্যা খেদ করিতেছে, বুড়া স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সেজন্য তাহার মনে সুখ নাই (সং-১১৪)। কখনো বা কন্যা সহজে পরপুরুষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে চায় নাই, পুরুষকে দিয়া বিবাহের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইতেছে (সং ১১৫),—পরের গানটিতেই দেখি প্রেমিক-প্রেমিকা বোঁচ্‌কা-পুঁটুলি লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিতেছে (সং ১১৬)। বিবাহিত জীবনের প্রেমের কথাও মিলে। স্ত্রী বাপের বাড়ী যাইতেছে, যাইবার পূর্বে স্বামীর কষ্টের কথা চিন্তা করিতেছে; কোথায় চুণ, কোথায় সুপারি রহিল, তাহা বলিয়া দিয়া যাইতেছে

CENTRAL LIBRARY

(সং-১১৭)। বিপত্নীকের মনে স্ত্রীর জন্য ব্যথা এবং পুনরায় অরেকটি বিধবাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা (সং-১১৯), অল্প বয়সে স্বামী মরিয়া যাইবার দরুন বিধবার শূন্য শয্যায় শুইয়া দৈহিক অতৃপ্তি ও খেদ (সং-১২০) কোনো কোনো গানে ব্যক্ত হইয়াছে। কিছুদিন বিধবার সহিত ঘর করিয়া শেষে তাহাকে বিবাহ না করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে বলিয়া পুরুষকে উক্ত বিধবা তিরস্কার করিয়া কহিতেছে, 'কিতায় তুই ছাড়িলো মোর ময়হা', কারণ, 'তোক না দেখিয়া মন কান্দে মোর মনত্' (সং-১২১)। পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক লইয়া গান আছে। নব বিবাহিত স্ত্রী তাহার স্বামীর ঠাকুরমাকে কহিতেছে, সে স্বামীর উপর যথেষ্ট দাপট দেখাইয়া থাকে, নিজে আগে খাইয়া পরে স্বামীকে খাইতে দেয় এবং জরের ভাণ করিয়া স্বামীকে দিয়া পা টিপাইয়া লয় (সং-১২২)। এই সমস্ত গানে প্রেমের বিভিন্ন দিক উদাহৃত হইয়াছে। অবৈধ প্রণয়ের নিদর্শনরূপে ১২৪-সংখ্যক গানটির নাম করা চলে।

রঙ্গ-কৌতুকের হোলি গান হইল ১১১ ও ১১৮ সংখ্যক গান দুইখানি। ইহা হইতে সংশ্লিষ্ট সমাজের রঙ্গ-কৌতুকের নিদর্শন মিলিবে। নদীতে অনেক গুলি মেয়ে স্নান করিতে নামিয়াছিল, পাড়ে তাহাদের কাপড় খুলিয়া রাখিয়া, —এমন সময় হঠাৎ বাতাস উঠিয়া তাহাদের প্রায় সকলের কাপড় উড়াইয়া লইয়া গেল। তারপর, চারিটি কাপড় দিয়া ঘেরাটোপ বানাইয়া, তাহার মধ্যে সকলে প্রবেশ করিয়া অতিকষ্টে কেমন করিয়া তাহারা বাড়ী আসিল, তাহারই বিবৃতি ১১১-সংখ্যক গানটি। স্বামীর দেখাদেখি স্ত্রীও হাল বহিতে যাইয়া বিরূপে উলঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহা ১১৮-সংখ্যক গানে ব্যক্ত হইয়াছে।

১০৯ ও ১১০-সংখ্যক গানদুইটি ব্যঙ্গের। আকাশ হইতে এরোপ্লেন মাটিতে নামায় সকলের সহিত জন কতক বিধবাও তাহা দেখিতে গিয়াছিল এবং যেহেতু তাহাদের জীবনে আর কোন সাধ-আহ্লাদ নাই, সেই হেতু প্লেনে চড়িয়া বিলাত যাইতে তাহাদের সাধ জাগিয়াছে। ব্যঙ্গ করিতে চাহিলেও তাহা সফল হয় নাই বরং বিধবার জীবনের একটি করুণ দিক ব্যঙ্গে-মোড়া সমবেদনার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে (সং-১০৯)। ঠাকুর পূজা করিবার জন্য

CENTRAL LIBRARY

অথবা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ না দিয়া বাড়ীর সমস্ত দুধ পয়সার লোভে যাহারা হাটে বিক্রয় করিয়া আসে, তাহাদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে একটি গানে। এখানেও ব্যঙ্গ সফল হয় নাই। দুগ্ধ বিক্রেতাদের ব্যঙ্গ করা অপেক্ষা, দুধে জল মিশাইলে তাহা পরীক্ষা করার 'কল' চালু হওয়ায়, দুধ-বিক্রেতাদের কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহাই শেষে প্রাধান্য পাইয়া গিয়াছে (সং-১১০)।

CENTRAL LIBRARY

॥ মদন কাম ॥

॥ ১ ॥

"চৈত্র মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে কামদেবের পূজা করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের মূলে কামদেবের পূজা করিতে ও তাঁহাকে চামর ব্যজনদ্বারা ব্যজন করিতে হয়; শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। রঙ্গপুরে বহির্বাটিতে ভদ্রলোকেরা দুই তিনটি বংশ খণ্ড প্রোথিত করেন ও দুইটি বা তিনটি দীর্ঘ বস্ত্র-জড়িত বংশখণ্ডের অগ্রভাগ চামর দিয়া, সেই প্রোথিত বংশ খণ্ডে আবদ্ধ করেন; তাহাতেই কামদেবের পূজা হয়। রাজবংশী জাতিয়েরা পল্লী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, কোনো প্রান্তরে এইভাবে কামদেবের পূজা করেন; সেই পূজোৎসবে গায়কগণ কর্তৃক জাগগান উদ্গীত হইয়া থাকে। রামায়ণ, কবিকঙ্কণ, পদ্মা-পুরাণ গানে যেমন মূল গায়ক হস্তে চামর গ্রহণ করিয়া গান গায় ও দোয়ারেরা মন্দিরা বাজাইয়া ধুয়া ধরে; জাগগানেও মূল গায়ক ও উপ-গায়কেরা সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই গায়কদিগের মধ্যে এক-জন উপস্থিত কবি থাকে। তাহাকে 'মতিহারী' বা 'ডাকালিকোবা' বলে। মতিহারীর এক হস্তে একটি কাঠের হাতুড়ী থাকে অন্য হস্তে একটি স্থূল কাষ্ঠখণ্ড বা ডাকালি থাকে। গান গাহিবার সময় মধ্যে মধ্যে সেই মতিহারী অগ্রসর হইয়া হস্তস্থিত ডাকালিতে বা কাষ্ঠখণ্ডে হাতুড়ীদ্বারা আঘাত করিয়া সময়োপযোগী (তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিয়া) দুই চরণের একটি কবিতা বলে। কোন কোন দলে মতিহারীর সঙ্গে ঠকর দিবার জন্য স্ত্রী বেশধারী একজন পুরুষ থাকে, তাহারা মতিহারীর সহিত উপস্থিত কবিতার লড়াই করে। এই গানদ্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় বলিয়া বোধহয় এ গানের নাম 'জাগগান' হইয়াছে। জাগগান দ্বিধাবিভক্ত—কানাইধামালী ও মোটাজাগ। মোটাজাগ অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া, প্রান্তরে ভিন্ন কাহারও বাটিতে কখন হয় না। কানাই ধামালী অনেক সময় অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাবে, যেমন অনুষ্ঠেয় দেবদেবীর পূজা অন্তর্হিত হইতেছে, সেইরূপ রাজবংশী জাতির মধ্যে আর কামদেবের পূজার প্রাদুর্ভাব নাই। কামপূজার সঙ্গে সঙ্গে জাগগানেরও অন্তর্ধান দেখিতেছি।"[১]

১ শ্রী যাদবেশ্বর তর্করত্ন: রঙ্গপুরের জাগের গান: রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫, ২য় সংখ্যা।

CENTRAL LIBRARY

উক্ত পত্রিকার এই সংখ্যাতেই সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন সরকার পাদটীকার মন্তব্য করিয়াছেন :

"জাগগান শুধু রঙ্গপুরের নহে। রঙ্গপুর, ধুবড়ী, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতিতে শুনা যায়। মদন চতুর্দশী উৎসব উপলক্ষ্যে জাগগান রচিত···"

মদন চতুর্দশী উপলক্ষে গীত ও রচিত গানকেই জলপাইগুড়িতে বলে 'মদনকামের' গান। কোচবিহারেও এই নাম চালু আছে। এইরূপ নাম হইবার কারণ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন নির্দেশ করিয়াছেন। যথার্থই ইহা 'কাম' জাগাইবার গান। কামদেবতা মদনদেবের পূজা করিয়া এই সময় কামের গানই গাওয়া হইয়া থাকে। ইহা 'Phallic God'.

আধুনিককালে জলপাইগুড়িতে কামদেবের পূজা অপেক্ষা গানই প্রাধান্য পাইয়া গিয়াছে। আনুষ্ঠানিক পূজা অপেক্ষা আনন্দ করিয়া গান গাওয়া ও রচার উল্লেখযোগ্য হিড়িক পড়িয়া যায়। পূজা-বিধি ও রীতি উপরে উদ্ধৃত বর্ণনার মতোই।

রঙ্গপুর হইতে জলপাইগুড়ির মদনকামের গানের কিছু পার্থক্য আছে। রঙ্গপুরের জাগের গান জলপাইগুড়িতে চলিত নাই। এখানে মদনকাম উপলক্ষে আসর করিয়া শাস্ত্রীয় গান অথবা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান কোনো কোনো সময় গীত হইলেও, 'মতিহারীর' প্রচলন নাই। দীর্ঘ বাঁশকে শাড়ী ও পরচুল পুরাইয়া, তাহাই হাতে করিয়া লইয়া বাড়ী-বাড়ী বা মাঠে-প্রান্তরে যাইয়া কামদেবের গান করা হয় এবং এই ধরণের গানই জলপাই-গুড়িতে জনপ্রিয়। বৃক্ষ এখানে নারীর প্রতীকে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু সেই নারীর পরিধেয় বস্ত্র রাজবংশিগণের 'পাটানী' নহে,—শাড়ী, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহাতেই অনুষ্ঠানটিকে খাঁটি রাজবংশি বলা চলে কি না সন্দেহ। হয়তো ভাটি অঞ্চলের অন্য কোনো জাতি হইতে রাজবংশিগণ ইহা গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন রঙ্গপুরের জাগগানের দুইটি ভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি 'মোটাজাগ'। এই 'মোটাজাগই' জলপাইগুড়িতে অধিক পরিমাণে গীত হয়, তবে 'মোটাজাগ' নাম জলপাই-গুড়িতে চলিত নাই। তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, রঙ্গপুরের মোটাজাগ অত্যন্ত অশ্লীল এবং বাড়ীতে তাহা গীত হয় না। জলপাইগুড়ির মদনকামের গানে অশ্লীলতা থাকিলেও তেমন নাই, এবং অনেক সময় তাহা বাড়ী বাড়ী এবং হাটে-মাঠে ঘুরিয়াও গাওয়া হয়॥

CENTRAL LIBRARY

॥ ২ ॥

সংগৃহীত মদনকামের গানগুলির প্রধান এবং একমাত্র বক্তব্য—প্রেম। অবিবাহিত নর-নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও বিবাহেচ্ছা, দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক সম্পর্ক প্রভৃতি গানগুলির মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করিবার। প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই গীত গানের বিষয় হইল প্রেম; এবং এই প্রেমের বিষয় ও প্রকাশরীতি সর্বত্রই প্রায় এক। 'হোলি'র প্রেমের গানের সহিত মদনকামের প্রেমের গানের অথবা মদনকামের প্রেমের গানের সহিত 'গমীরা' (গম্ভীরা)-র প্রেমের বিষয় ও প্রকাশ রীতিতে কোনোই পার্থক্য নাই। এইজন্য গমীরার কোনো গান এই সংকলনে গ্রথিত হয় নাই। এইজন্য দেখা যায়, একই গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীত হইতেছে।

অবশ্য, 'মদনকাম' উপলক্ষে গীত ও রচিত গানে প্রেমই যে মুখ্যস্থান লইবে, তাহা খুবই প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক। এখানেও দেখিতেছি, সময় মতো মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয় নাই বলিয়া দিদিমার নিকট খেদ করিয়া সে বলে, আমি বুড়ী হইয়া গিয়াছি। কোনদিন হয়ত বা বাড়ীর কাজকর্ম করে যাহারা তাহাদেরই কেহ একজন আমাকে বিবাহ করিয়া বসে (সং ১২৮)। বিবাহ করিবার জন্য মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিয়াছিল, দুর্বল কারণ দেখাইয়া পাত্রকে নাকচ করিয়া দিবার জন্য কন্যা দিদিমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছে (সং ১২৮ক)। তেমনি অবিবাহিত পুরুষের বিবাহেচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে একটি গানে (সং ১২৮খ)। সে তাহার দাদাকে কহিতেছে, হয় আমার বিবাহ দাও, নয়তো আমি বউদির সহিতই ঘর করিতেছি (সং ১৩০)। কখনো 'নালখাড়ী'-পরা 'পাছিলা ভারী' কন্যা তাহার মন কাড়িয়া নিয়াছে (সং ১৩১), কিন্তু সেই কন্যার বিবাহ হইয়া যাইতেছে বলিয়া তাহার দুঃখের শেষ নাই (সং ১৩১খ)। বিবাহিতা নারীর প্রতিও পুরুষ প্রেম নিবেদন করিতেছে, 'ও তুই মোক ভাতার ধরেক গে' (সং ১৩১ক)। দাম্পত্য জীবনের কথাও মিলে। পর-পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় গোরু খেদাইবার লাঠি দিয়া স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছে, স্ত্রী কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহে, 'গোরা পিঠিখান মোর মাইরন সহে না' (সং ১৩৩)। আবার, প্রোষিতভর্তৃকা নারী প্রেমিক পুরুষকে কহে, ছয় মাসের মধ্যে বিদেশ হইতে স্বামী ফিরিয়া না আসিলে, 'তোরে নগদ ভাসিম গুণের বন্ধুয়া' (সং ১৩৪)।

॥ পাগলা-পীর ॥

"পাগলা-পীরের" প্রকৃত নাম এবং পরিচয় জনসমাজে অজ্ঞাত রহিয়াছে। তাঁহার আচরণ উন্মত্তের মত ছিল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'পাগলাপীর' বলিত। পাগলা পীরের নামের প্রভাব এতদ্অঞ্চলে (অর্থাৎ কোচবিহার জেলাতে) এখনও শ্রুত হইয়া থাকে ;···কথিত আছে যে, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর ইঁহার দর্শন মাত্র শান্ত ভাব ধারণ করিত ; এজন্ম কোথাও কুকুর শৃগাল ক্ষিপ্ত হইলে পাগলা পীরের নামে 'বাঁশখাড়া' করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে একজন 'ভঁওরিয়া' (যাঁহার প্রতি পীরের 'ভর' হইয়া থাকে) পাগলের ন্যায় আচরণ এবং ভবিষ্যদ্বাক্তি করেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত চিলমারীর নিকটে (তিস্তার নিম্নভাগ) পাগলা নদীর তীরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে পাগলা-পীর বা পাগলা দেওর নামে একটি মেলা বসিত।"[১]

পাগলাপীর সম্পর্কে উপরের উদ্ধৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত বক্তব্য নাই।

'পীর' এই নাম হইতেই বোঝা যায়, ইঁহারা মুসলমান। বেশ কয়েক জন 'পীর' তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা ভক্তের মনে এমন একটি ধারণা গড়াইয়া দিয়াছেন যে, একদা তাঁহারা যে লৌকিক জগতের মানুষ ছিলেন তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামীয় 'পীর' গণ জনসাধারণের প্রবল ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পাগলাপীর ছাড়াও পীর কানী, মাদার পীর প্রভৃতির নাম করা যায়। ইঁহাদের প্রভাব উত্তরবঙ্গ ছাড়াও অন্যত্র লক্ষ করা যাইতে পারে।[২]

দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিলে, কিংবা শৃগাল কুকুর ক্ষেপিলে, বিভিন্ন পীরের নামে বাঁশ খাড়া করা হয়। মদনকামের বাঁশ খাড়া করার সহিত পীরের নামে বাঁশ খাড়া করার সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাঁশের মাথায় পরচুল লাগাইয়া, উহার সর্বাঙ্গ শাড়ী বা ধুতি দিয়া জড়াইয়া লওয়া হয়। তারপর সেই বাঁশ হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গান গাহিয়া চাঁদা সংগ্রহ করা হয় এবং পরে সেই সংগৃহীত অর্থে পীরের নামে পূজা দেওয়া হয়।

১ খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ : কোচবিহারের ইতিহাস (১৯৩৬), পৃঃ ৬৮।

২ 'মাদারপীর' সম্পর্কে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁহার 'হারামণি' (১৯৪২) গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

১৩৫-সংখ্যক গানটি এই শ্রেণীর। গানটিতে কানী পীরের নামে বাঁশ খাড়া করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যে অঞ্চলে পাগলাপীরের প্রভাব বেশি সেখানে কানী পীরের বদলে পাগলা পীরের নাম উল্লিখিত হয়। অনুরূপভাবে মাদার পীরের নামও উল্লিখিত হইতে পারে।

গানটিতে কিন্তু কানী পীরের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয় না। ইহার উদ্বোধনী পঙ্‌ক্তিতে শুধু কানী পীরের নামে বাঁশ উত্তোলন করিবার কথা মিলে। অন্তিম স্তবকে গৃহস্থকে বেশি করিয়া চাঁদা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রথম স্তবকে 'ছ'কা করে টোরত্-টারাত্, ছিলিমের কটিত্ ছাই'—এই পঙ্‌ক্তির কোনো অর্থ নাই, ইহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং কেবলমাত্র গানের পঙ্‌ক্তি বাড়াইবার জন্যই ইহা গীত হইয়া থাকে। তেমনি তৃতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি অর্থহীন। অর্থহীন পঙ্‌ক্তি-যোজনার মধ্যে দিয়া গানটি ছড়া-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মাদার পীরের কথাও উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে নীচের উদ্ধৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য :

"পূর্বে এতদঞ্চলের অর্থাৎ কোচবিহারের লোকে মাদারপীরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিত, মাদারের নামে বাঁশ খাড়া করিত এবং বন্ধ্যা নারীরা মাদার পীরের নামে হস্তে মাদুলী ধারণ করিত ;..."[১]

অনুরূপভাবে জলপাইগুড়িতেও মাদার পীরকে ভক্তি প্রদর্শন করা হয়।

১ কোচবিহারের ইতিহাস (১৯৩৬) : পৃঃ ৭২।

CENTRAL LIBRARY

॥ ঘাটো পূজা ॥

ঘাটো পূজা হইল নদী পূজা। চৈত্র মাসের একেবারে শেষে এই পূজা করা হইয়া থাকে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম—ঘাটোশোরী। জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র এই পূজার প্রচলন নাই। রাজগঞ্জ থানাতেই ইহার চলন বেশি,—বর্তমান সংগ্রহের গানগুলি ওই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

ঘাটোর সহিত মেছেনীর ক্ষীণ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। মেছেনী শুরু হয় বৈশাখ হইতে, ঘাটো পূজা হয় চৈত্রের একেবারে শেষে। উভয় ক্ষেত্রে নদীই উদ্দিষ্টা দেবী। মেছেনী ও ঘাটো উভয়েই গৃহস্থের কল্যাণকারী লক্ষ্মী-রূপে কল্পিতা। 'ঘাটো' নামের সহিত নদীর 'ঘাটের' সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

মেছেনীর মতো এই গানের 'নামানি', 'বসানি', 'চুমানি' ইত্যাদি গান আছে এবং মেছেনীর মতো ইহাও শেষ পর্যন্ত পুকুরে বা নদীতে যাইয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই 'ভাসানি'রও আনুষ্ঠানিক গান আছে। তবে, মেছেনী যেমন অনেক বাড়ী ঘুরিয়া অনেক দিন ধরিয়া গাওয়া চলে, ঘাটো-তে তেমন রীতি নাই।

মেছেনীর গানগুলির মধ্য দিয়া দেবী মেছেনীর পরিচয় মিলে। কিন্তু, সংগৃহীত ঘাটো পূজার গানগুলি এমনতরো যে, উহার মধ্যে ঘাটোর পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, ইহাতে 'চুমানি' (অর্থাৎ বরণ করিবার গান) রূপে গীত গানটি একটি লৌকিক উপাখ্যান, দেবীর সহিত যাহার কোনো সম্পর্ক নাই।[১] হয়তো ইহার উদ্বোধনী পঙ্‌ক্তিতে 'নদীয়ার কিনারে' (অর্থাৎ নদীর কিনারে) এই অংশটি থাকায়, ঘাটো উপলক্ষে ইহা গাহিতে গায়িকাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। নতুবা আনুষ্ঠানিক গান-রূপে ইহা গাহিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। অবশ্য পূজার গানের মধ্যেও লৌকিক জগতের সুখ-দুঃখ লইয়া রচা গানও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অনেক সময়েই গীত হইয়া থাকে।

১৩৬-সংখ্যক গানটি ঘাটোর 'নামানি' গান। ঘাটো পূজা সন্ধ্যাবেলায় করা হয়, গানে তাই বলা হইয়াছে,—'আজিকারে আতি শিয়ালো ভুকে, কুকুরো কান্দে'। গৃহস্থের 'বহু' অর্থাৎ পুত্রবধূ সন্ধ্যাবেলায় ঘাটোর নামে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেয়। চৈত্র মাসের শেষে এই পূজা করা হয়, গানে তাই গাওয়া হইয়াছে,—'পাঞ্জি-পুথি দেখো হে সই চৈতের কয় দিনা আছে।'

১ এই গানটিরই রূপান্তরিত রূপ ফরিদপুর জেলায় চলিত আছে। মনসুর উদ্দীন তাঁহার 'হারামণি' (১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩৭)-তে গানটি সঙ্কলিত করিয়াছেন। দ্রঃ পৃঃ ১৪-১৫।

CENTRAL LIBRARY

'বসানি' গানটিতে (সং-১৩৬ক) নারী-জীবনের একটি মনোরম আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। মাটির বেদী গড়িয়া দেবীর আসন প্রস্তুত হইল, তারপর দীপ জ্বালা হইল। শেষে জনৈক পুরুষ 'লালের বাজার' হইতে দেবীকে বরণ করিবার জন্ত 'সিন্দুরা' কিনিয়া আনিয়া—

সেইকিনা সিন্দুরা হাজির কইরে বাবাজীর চরণে।
বাবাজী উঠিয়া বলে—কি নাগে তমার ;
বাবাকে জামাই নাগে, সেই সোয়ামী হামার ॥—সং-১৩৬ক

শেষ পঙ্‌ক্তি পিতার হইয়া কন্সার জবাব। দেবীর জন্য কিনিয়া-আনা সিঁদুর শেষে ব্রতধারিণীর এয়োতি-চিহ্নের হইয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মেছেনীর মতো ঘাটো-ও কুমারী, সধবা ও বিধবা সকলেই করিতে পারে। বর্তমান গানে কুমারীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে।

এই গানটির মধ্যে অসংলগ্নভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গ ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেবীর জন্ম মাটির বেদীর পিড়ি গড়া হইল, কিন্তু তাহাতে আসিয়া বসিল 'ধনীকাকার খুড়া'। তারপর গায়িকার বেগুন ক্ষেতে প্রবেশ এবং 'ভাইয়া অকোয়ারী' অর্থাৎ অবিবাহিত এই তথ্যের উল্লেখ। ইহার পরই হঠাৎ 'গেইল্ দেওরা লালবাজার' এবং সেখান হইতে সিঁদুর কিনিয়া আনিয়া পিতার চরণে হাজির করা এবং শেষে কন্সা-কর্তৃক পিতার জামাই প্রার্থনা। প্রসঙ্গসূত্র-বিধৃত কোনো একটি বিশিষ্ট ভাব গানটির মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। খুড়া, ভাই, দেওরা, পিতা এবং শেষে স্বামীর উল্লেখের মধ্যে একটি পরিবারকে খুঁজিয়া পাই। কিন্তু, এই পারিবারিক ব্যাপার একটি দৃঢ় ভাবকে নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে নাই।

পরবর্তী 'চুমানি' গানটিতে (সং-১৩৬ গ) দাম্পত্য জীবনের অপর এক দিকের করুণ ও সুন্দর দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ময়না' নামীয় এক নারীর স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া তাহার সতীনকে বরণ করিল। কিন্তু 'সাধের সতীন চুমাইতে গে আই, আই মোর চোখে পড়ে জল রে কেশ।' অভিমানে ময়না আত্মহত্যা করিল। দুঃখে ময়নার স্বামী সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী সাজিল এবং দ্বারে-দ্বারে ময়নার নামে ভিক্ষা করিতে লাগিল। দাম্পত্য-প্রেমের কাহিনীরূপে গানটি বেশ সুন্দর। এই গানটির কথান্তর ও

CENTRAL LIBRARY

অতিরিক্ত কথা-সহ একটি রূপ রঙপুর জেলা হইতে 'ব্যালাড'রূপে পাওয়া গিয়াছে।

শেষ গান—'ভাসানি' গান (সং২০০)। ইহাতে সোনা দিয়া বাঁধানো পুকুর ঘাটে সকলকে যাইতে আহ্বান জানানো হইয়াছে। কিন্তু, এই গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 'ঝুমারী' নামটি। গায়িকাদের জিজ্ঞাসা করিয়া 'ঝুমারী' নামের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলে নাই।

আমাদের মনে হয়, এই 'ঝুমারী' একটি নদীর নাম। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানায় 'ঝুমুর' নামে একটি নদী আছে। এই 'ঝুমুর' নদী 'ওঝালি' গানে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে (এ সম্পর্কে ৩১৭-সংখ্যক দীর্ঘ গানটি দ্রষ্টব্য)। 'ওঝালি' গানের মধ্যে স্বামীরূপে কল্পিত 'ঝিমিলা' (ঝুমুর) নদীর সহিত, স্ত্রীরূপে কল্পিতা 'বামুনতি' (ইহাও ধূপগুড়ির একটি নদী) নদীর বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের কাহিনী সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। 'ঝুমারী', 'ঝুমুর' ও 'ঝিমিলা' একই নদীর নাম বলিয়া অনুমিত হয়। মেছেনীতেও দেখিয়াছি, তিস্তা ও ধরলা নদী স্বামী-স্ত্রী। ঘাটো-কে নদীপূজা বলিয়া মানিলে 'ঝুমারী'কে 'বামুনতি'-র অনুরূপ স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিতে কোনোই অসুবিধা নাই,—বিশেষত যেখানে ঝিমিলা-বামুনতির দাম্পত্য সম্পর্ক লইয়া গান (সং-৩১৭) মিলিতেছেই। 'নদীচারণা' (River-lore) প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের জনজীবনকে যে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে, এইসব অনুষ্ঠান তাহার অকাট্য প্রমাণ॥

CENTRAL LIBRARY

॥ বিষুয়া বা বিষুমা ॥

চৈত্র-সংক্রান্তিকে 'বিষুব সংক্রান্তি' বলা হইয়া থাকে। বিষুব-সংক্রান্তির অনুষ্ঠানকেই 'বিষুমা' বা 'বিষুয়া' বলা হয়।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাঙলা দেশের অন্যত্র, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানাদি পালিত হইয়া থাকে। রাজবংশী সমাজেও এইদিন কতকগুলি আচার পালন করা হয়। নীচে তাহার বিবরণ দিলাম।

বিষুয়ার দিন সকাল বেলায় অঙ্গনের তুলসী তলায় পূজা করা হয়। তারপর, পাঁচ, সাত বা নয়টি রসুন একত্র বাঁধিয়া বাড়ীর প্রত্যেক ঘরের দরজার উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সম্পন্ন গৃহস্থেরা উহা ওঝা ডাকাইয়াও করাইয়া থাকেন। ওঝা আসিয়া গত বৎসরের অপদেবতারা যাহাতে চলিয়া যায় এবং নতুন বছরে তাহারা যাহাতে ঘুরিয়া না আসে, সেই মর্মে মন্ত্র গাহিয়া দরজার মাথায় রসুন ঝুলাইয়া দেয়। ১৩৭-সংখ্যক মন্ত্র-গানটি এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শেষে বলিতেছেন, 'আজি হাতে ফেল্না-র (এই স্থানে গৃহস্থের নাম বলা হয়) বাড়ীঘর হইল্ কম্পমান'।

রসুন ঝুলাইবার পর খাইতে হয় বিবিধ রকমের তিক্ত, কাঁটা ও ভাজা, (নিমপাতা, ভাঙের কুসি ইত্যাদি তিক্ত পাতা, কাঁটাওয়ালা নটে শাক, চাল-চিঁড়া-সরিষা ইত্যাদি ভাজা, কাঁচা হলুদ, রসুন ইত্যাদি)। ১৩৭ ক-সংখ্যক গানটিতে ইহার সুন্দর পরিচয় আছে। 'কুট্-কুট্, কাট্-কাট্, খিড়্-খিড়্, খাড়্-খাড়্' শব্দ করিয়া কাঁটা-তিক্ত-ভাজা খাওয়া হইতেছে; এবং পরিবারের 'মাও-বহিন-বাপ-ভাই' ছাড়াও 'টাড়ীর (পাড়ার) তামান বন্ধু-ভাই' তাহাতে যোগ দিয়াছে।

রাজবংশী সমাজে এই দিন কিছু-না-কিছু শিকার করিবার প্রথা আছে পাড়ার সকলে মিলিয়া ঢাল-তরোয়াল-লাঠি-সড়কি লইয়া শূয়োর-খরগোস-হরিণ-গোসাপ ইত্যাদি শিকার করিয়া আনা হয় এবং পরে তাহা রাঁধিয়া খাওয়া হয়। ১৩৭ খ-সংখ্যক গানে ইহার বর্ণনা মিলে। পাড়ার 'চেড়েঙ্গা-গাবুরা-জোয়ান-ভাই' সকলে 'ঢাল-তরোয়াল-নাঠি-ঠেঙ্গা' লইয়া বনে চলিয়াছে, তাই 'হরিণ-শূয়োর-বাঘের আজি অইক্য নাই।' জনৈক পুরুষও এই শিকারী

দলের সহিত শিকার করিতে যাইবে। সে তাহার স্ত্রীকে তাই কহিতেছে, 'খাবার চাইটা করি'দে ; হরিণ আনিয়া দেছু মুই।'

শিকার করিবার প্রথা হইতে রাজবংশী সমাজের একটি পরিচয় মিলে। বৎসরের শেষে বা একেবারে প্রথমে শিকার করিবার অর্থ হইল—সেই জাতির নিশ্চয় একটা আরণ্য-জীবন ছিল, অথবা অরণ্য-বাসী কোনো জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে ইহা তাহারা লইয়াছে। মনে হয়, জলপাই-গুড়ির রাজবংশীরা ইহা মেছগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা সেই জাতিরই নিজস্ব অনুষ্ঠান, অরণ্যের সহিত জীবনের যোগ যাহাদের নিবিড় ; অথবা, শিকার যাহাদের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইয়া থাকে। কেহ কেহ অবশ্য জলপাইগুড়ির রাজবংশিগণের ক্ষত্রিয়ত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানটির কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং সেই আলোকে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া, রাজবংশিগণ যে একদা বীরের জাত ছিল, সেই প্রাচীন প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন। সমবেতভাবে শিকারের পিছনে একটি প্রাচীন গোষ্ঠি-জীবনকে খুঁজিয়া পাই। এই প্রসঙ্গে সমবেতভাবে ইহাদের মাছ-মারা এবং পৌষ-সংক্রান্তির দিন সমবেতভাবে ক্ষেতের গর্ত খুঁড়িয়া ইঁদুরে-লইয়া-যাওয়া ধান পুনরুদ্ধারের সংস্কার, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

CENTRAL LIBRARY

॥ বারোমাসিয়া ॥

বিরহিণী কর্তৃক বারোমাসের নাম ধরিয়া গান গাহিবার প্রথা নিখিল ভারতে ব্যাপকভাবে চালু ছিল এবং আছে। তাবৎ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বারোমাসিয়া একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

বারামাস্যা বা বারোমাসিয়া সাধারণত বিরহকাতরা নারীর বিরহ-গীতি। কিন্তু উদ্ভব-কালে ইহা প্রেমের সহিত জড়িত ছিল না। ইহা মূলত কৃষি-জীবনের সহিত সম্পৃক্ত ছিল, এবং ফল-ফসল-বৃষ্টির প্রাচুর্যের জন্য বা প্রার্থনার জন্য গীত একধরণের যাদু-মন্ত্রাত্মক গান ছিল। নারীই কৃষি-কর্মের আবিষ্কারক বলিয়া নারীই ইহার প্রধান ধারক ছিল বটে, তবে পুরুষেও উহা গাহিত ; কালক্রমে উহা কেবল প্রেমের এবং নারীর দুঃখগীতিতে পরিণত হইয়াছে।

ইহার রচনা-ভঙ্গির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ; যেমন, বারোমাসের নৈসর্গিক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের বর্ণনা এবং প্রেমিক ব্যতীত প্রেমিকার জীবনে এই নৈসর্গিক পরিবর্তন বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান কি দুঃখের সূচনা করিয়া থাকে তাহার বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হয়। মধ্যযুগীয় বারামাস্যার অপর বিশেষত্ব হইল, ইহা বিরহকাতরা রমণীর স্বগতোক্তি ছিল।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে বর্তমান সংগ্রহের ১৩৮ক-সংখ্যক গানটির কোনই বিশেষত্ব খুঁজিয়া মিলিবে না। ইহাতে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শুরু করিয়া প্রোষিতভর্তৃকার এক বছরের মানসিক বেদনা বিবিধ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় গতানুগতিক ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, এবং অন্তিম স্তবকে বলা হইয়াছে, 'বারোমাসো পূর্ণ হইল, প্রাণের প্রতি ঘরে আইল'।

১৩৮-সংখ্যক গানটিতে অবশ্য কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথমত, ইহা বিরহের গান নয় ; দ্বিতীয়ত, ইহা স্বগতোক্তি নয়, কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা।

বিষয়ের দিক দিয়াও ইহার বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রবাসী স্বামী অপর পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীকে নানাভাবে প্রলোভিত

CENTRAL LIBRARY

করিতেছে। সমগ্র গানটি এই ছদ্মবেশী প্রবাসী স্বামী এবং প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর আলাপন। পর-পুরুষ এক-একটি করিয়া প্রলোভন দেখাইতেছে, স্ত্রী যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দর্শাইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। পরিশেষে, স্ত্রীর সতীত্বে তুষ্ট হইয়া ছদ্মবেশী স্বামী তাহার পরিচয় দিল।

প্রায় এই ভাবেরই একটি বারোমাসি গান বহুদিন পূর্বে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন্ রঙপুর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[১]

গানটির নাম 'নীলার বারোমাসি'। ইহাতেও দেখা যায়, পর-পুরুষ আসিয়া প্রোষিতভর্তৃকা নারীকে নানান প্রলোভন দেখাইতেছে এবং উত্তরে নীলা বলিতেছে, 'তবু না হইব আমি পর-পুরুষের দাসী'। কিন্তু, এই পর-পুরুষই নীলার ছদ্মবেশী স্বামী কিনা, গানে তাহার উল্লেখ নাই এবং এই পর-পুরুষ শেষ পর্যন্ত তাহার প্রকৃত পরিচয় জানায় নাই। রঙপুর হইতে প্রাপ্ত গানে নায়িকার নাম 'নীলা' বলিয়া অসকৃৎ উল্লিখিত হইয়াছে, জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত গানে নায়িকাকে শুধু 'কন্যা' বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে। অবশ্য উভয় স্থান হইতে প্রাপ্ত বারোমাসি গান দুইটির পঙ্‌ক্তিতে মাঝে মাঝে আক্ষরিক মিল পাওয়া গিয়াছে, বিশেষত অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাসের বর্ণনায়।

১৩৮খ-সংখ্যক গানটি বিশেষত্বপূর্ণ। এই গানে প্রাকৃতিক জগতের একটি বিশেষ দিকের ক্রমবিকাশকে নারীর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। ধান রোপণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাটে উহার বিক্রয়কাল পর্যন্ত ঘটনাগুলিকে বারোমাসের ক্রম অনুসরণ করিয়া গানটিতে বলা হইয়াছে। 'আষাঢ়ে বরিষা কাল'—অর্থাৎ ধান রোপণ করা হইল। 'শ'ণ মাস যাবে নারীটার ভাবিতে-চিন্তিতে'—অর্থাৎ ভাবনা-চিন্তা করিবার সময় মানুষ যেমন আপনার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তেমনি চারার মধ্যে ধানের শীষ্ তখনও সুপ্ত থাকে। 'ভাদরে আউলিবে কেশ'—অর্থাৎ তখন ধানের শীষ উঠিবে। তারপর, 'অগণে কাটিবে ধান'। 'মাঘ মাসে যাবে নারীটা শহরে-বন্দরে'—অর্থাৎ সেই ধান বিভিন্ন স্থানে বিক্রীত হইবে। অবশ্য, কাতিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের বর্ণনার মধ্যে ধানের কথা নাই, সেখানে অন্যান্য বারোমাসি গানের মতো

১ জার্নাল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ৪৬ খণ্ড, প্রথম ভাগ, ১৮৭৭।

CENTRAL LIBRARY

নিছক বিরহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বারোমাসী গান যে এক সময়ে কৃষি-কর্ম ও ফল-ফসলের সহিত যুক্ত ছিল, এই গানটি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। পাট গাছ (যেমন 'নালিতার বারমাস্তা') নারিকেল গাছ প্রভৃতি সম্পর্কেও বারমাস্তা গান পাওয়া গিয়াছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে। নৈসর্গিক জগতের সহিত বারোমাসিয়া গানের যে যোগ ছিলই, তাহার অপর প্রমাণ, 'কোকিলার বারোমাস্তা' কিংবা একটি শালিখ পাখির বারো-মাসের জীবন কথা (যাহা যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত করিয়াছেন এবং ত্রিপুরায় তিপ্‌রা ভাষাতেও যাহা মেলে)। বারোমাসিয়া গানের মতো বারোমাসিয়া ছড়াও পাওয়া যায়॥

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম অধ্যায়

। জীবন-ছন্দ ।

॥ ছোয়া-নিন্দানি ও ছোয়া-ভুল্‌কানি ॥

॥ ১ ॥

যে গান গাহিয়া শিশুকে ঘুম পাড়ানো হয়, তাহাকে বলা হয় 'ছোয়া-নিন্দানি'। আর যাহা দিয়া ছেলেকে 'ভুলানো' হয় তাহাকে বলে 'ছোয়া ভুল্‌কানি'। ইহা 'ছোয়া-ভুর্‌কানি' রূপেও উচ্চারিত হয়। 'ছোয়া-ভুল্‌কানি'র অধিকাংশই ছড়া, গান নহে।

ঘুম-পাড়ানি গানে শিশুর একটি নিজস্ব জগৎ আছে। সেই জগতে শিশুর সহিত উহার বাসিন্দাদের পারিবারিক সম্পর্কও কল্পিত হয়। চাঁদ এখানে শিশুর মামা; আর যিনি গায়িকার আহ্বানে শিশুর গৃহে আসিয়া খাট-পালঙ্কের অভাবে শিশুর চোখেই উপবেশন করিয়া থাকেন, তিনি শিশুর মাসি বা পিসি। ঘুম-পাড়ানি গানের মধ্য দিয়া গায়িকার বাস্তব জীবন ও শিশুর অলৌকিক জগতের মধ্যে সংযোগ-সেতু সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

ঘুম-পাড়ানি গানের দুইটি দিক আছে। উহার একদিক ভীতির, অপর দিক গীতির। মা কখনো শিশুকে ভয়ের কাব্যিক জগতে লইয়া যান, শিশু ভয় পাইয়া ঘুমায়। কখনো বা গান গাহিয়া গানের জগতে লইয়া যান, আকাশের চাঁদ তখন কালো গোরুর দুধ ও মাছের মুড়ার লোভে মাটিতে নামিয়া শিশুর চোখে 'টিপ্‌' দিয়া যান।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোই ঘুম-পাড়ানি গানের লক্ষ্য বটে, কিন্তু সেই জগতেও মা-ঠাকুরমার কঠিন জগৎটা আসিয়া মাঝে-মাঝে ঢুকিয়া পড়িতে চায়। অনেক ঘুম-পাড়ানি গানের মধ্যে কর্ম-ক্লান্ত মা-ঠাকুরমার ক্লান্তির সুর বাজিয়া উঠে। ইহা যেন অবোধ শিশুর অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া পারিবারিক জীবনের কঠিন দুঃখ বা দুর্লভ সুখের কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া দেওয়া। এই সকল ঘুম-পাড়ানি গানগুলি যেন নিরক্ষরা মা-দিদিমাদের আত্ম-বিলাপ বা স্থূল স্বগতোক্তি, শিশু তাহার অবোধ শ্রোতা।

শিশুর সহিত রঙ্গ-কৌতুক মায়ের চেয়ে দিদিমা বা ঠাকুরমারাই করিয়া

CENTRAL LIBRARY

থাকেন বেশি। এই রঙ্গ-কৌতুকগুলি অধিকাংশই ছড়া,—তবে গানও মিলে। রঙ্গ-কৌতুক করিবার সময় হয় শিশুকে উঠাইয়া বড়োর জগতে আনা হয়, অথবা বড়োরাই নামিয়া ছোটোর জগতে মিশিয়া যান। মা-দিদিমার শৈশব-স্মৃতি এবং শিশুর কল্পিত ভবিষ্যৎ এইখানে একখানে ধরা পড়িয়া যায়।

শিশুকে ভুলাইবার দুইটি রীতি আছে। একটি গান, অপরটি ছড়া। শিশুর মনকে বুঝিয়া, তাহার একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহারই উপযোগী করিয়া বড়োরা গান রচনা করেন। কাজেই বড়োদের বাস্তব জগৎ ও শৈশব স্মৃতির ছাপ ঘুম-পাড়ানি গানে পড়িবেই পড়িবে। 'ছড়া' অনেক সময় মা-দিদিমা শিখাইয়া দেন, তারপর শিশুই তাহা বলিতে আরম্ভ করে। 'ছড়া' শিশু ও মা-ঠাকুরমা উভয়েই বলে, কিন্তু গান শিশু কখনো গায় না। এই জন্য ঘুম-পাড়ানি গান অপেক্ষা ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে শিশুর জগৎ ও শিশুর মন বেশি করিয়া ধরা পড়ে। ছড়া ও গানের মধ্যে রচনাগত পার্থক্য তো স্পষ্ট, কিন্তু এই বিষয়গত পার্থক্যটাও লক্ষ করিবার॥

॥ ২ ॥

বর্তমান সংগ্রহের ঘুম-পাড়ানি গান ও ছেলে ভুলানো ছড়াগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া আলোচনা করিতে পারা যায়। প্রথমে ঘুম-পাড়ানি গানে শিশু ও ঘুমের জগৎ সম্পর্কে বলা হইবে।

ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি এখানে 'নিন্দোয়ালী' হইয়াছে। এই 'নিন্দোয়ালী'রা তিন বোন। বড় বোনের নাম—'হামিকাটী' (ঘুমের পূর্বে 'হাই' উঠে), মেজ বোনের নাম—'ঝুম্-পইরী' ('হাই'য়ের পর 'ঝিমুনি' আসে) এবং ছোটো বোনের নাম—'নিন্-পইরী'—ইহাকেই 'নিন্দোয়ালী' বলা হয়। গানে দেখি, এই তিন বোন ঝোলায় করিয়া ঘুম ভরিয়া পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং গৃহের আনাচে-কানাচে আসিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ পাইতেছে। শুধু তাই নয়। ঘুমের কাব্যিক জগতেও বাস্তব জগৎটা আসিয়া পড়িয়াছে। তাই দেখি, নিন্দোয়ালীরা তিন বোনে চিঁড়া কুটিয়া হাটে তাহা বিক্রয় করিতে চলিয়াছে (সং ১৩১ক)।

পরবর্তী গানখানি (১৩১ খ) হইতে জানা যায়—'নিন্দোয়ালী' যেমন ঘুম পাড়ায়, তেমনি অপর এক 'নিন-পরী'র শয়তানিতে শিশুর চোখে ঘুম

CENTRAL LIBRARY

আসে না। তাবৎ ঘুম-পাড়ানি গানই এক ধরণের সম্মোহন বা যাদু; ঘুমের সহিত মৃত্যুর, মৃত্যুর সহিত রহস্যের ও আত্মার নিষ্ক্রিয়তার যোগ থাকায় ইহাতে যাদুর যোগ লক্ষিত হয়। আর যাহার জন্যে ঘুম আসে না, তাহার মধ্যে অপকীর্তির সুস্পষ্ট অস্তিত্ব অনুভব করিয়া লোকমানস ইহাতে যাদুর স্পর্শ অধিকতররূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই নিন-পরীকে গালি দিয়া তাই গানে বলা হইয়াছে, 'হাবাতিয়া নিন' (অর্থাৎ ভাতের মতো ইহার ঘুমেরও অভাব)। 'নিন্দোয়ালী'কে তাই বলা হইতেছে, 'হাটের নিন্, পথের নিন্' 'নিন্দোয়ালী' আসিয়া যেন শিশুর 'চখুত্ ভাসা (বাসা) বান্ধে'। 'নিন্দালী'র নিবাসভূমি 'স্বর্গ'। গায়িকার আহ্বানে 'স্বরগে ছাড়িয়া নিন্দালী মর্ত্ত্যে (মর্ত্তে) দিলে পাও' (সং ১৩৯ গ)। এই 'নিন্দালী নিন্দের থইলা ধরিয়া' মর্ত্তে অবতরণ করিলেন এবং যে বাড়ীর শিশু ঘুমাইতেছে না সেই 'বাড়ীত্ আসিয়া নিন্ দে তুই ছাড়িয়া, খ্যাড়ে খড়িত্, জাবুড়া-ঝস্তরে, বিছিনা-খোকোড়াত্ যাউক পড়িয়া' (সং ১৩৯ ঘ)।

শিশুর জগতে সম্ভব-অসম্ভবের রেখা-চিহ্ন ঘুচিয়া-মুছিয়া যায়। এখানে হাট হইতে কিনিয়া-আনা খাটে চড়িয়াই বৃন্দাবনে যাওয়া যায় (সং ১৪৫); এখানে 'কাউয়ায় আনলেক খ্যাড়-খড়ি, বগুলায় আন্দিল্ ভাত' (সং ১৪৯ ক) বলিলে কিছুই বেমানান লাগে না।

পশু, পাখি ও নিসর্গ-জগৎ ঘুম-পাড়ানি গানে ও ছেলে ভুলানো ছড়ায় একটি মনোরম ভূমিকা নিয়া থাকে। আলোচ্য গান ও ছড়াগুলিতে বাঁশের পাতার নাম অসকৃৎ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া 'কানশিসার ফুল', 'বাবুরির পাত'-এর নামও পাওয়া যায়। চাঁদ মামার বদলে পাই 'চান্-ঘুঘু'। চাঁদের ঘুঘু হইয়া যাওয়া 'Bird lore'-এর নিদর্শন। বিশ্বের বহু ঘুম পাড়ানি গানে পাখির কথা বলা হইয়াছে। এখানে চাঁদ ও পাখি একাত্ম হইয়া একটি চমৎকার 'composite symbol' রচনা করিয়াছে। পশু-পাখীর মধ্যে শিয়াল, কুকুর, হরিণ, কাউয়া, কাঠ-কাউয়া, হাড়গোরল, বগুলা, জোনাকি, শুয়োর ইত্যাদির নাম মিলিতেছে।

শিশুকে ভোলাইবার উপকরণও সামান্য। দুধ-দই-নাড়ু-মোয়ার উল্লেখেই সে ক্ষান্ত হয়। ১৩৯-সংখ্যক গানে ইহার সুন্দর পরিচয় আছে। এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪৮, ১৫৪ ও ১৫৫-সংখ্যক গানগুলি পঠিতব্য।

CENTRAL LIBRARY

শিশুকে খাওয়াইবার সময়ও ভোলানো হইয়া থাকে। 'এক শিয়ালী আন্দে বাড়ে, দুই শিয়ালী খায়' (সং ১৬২), এই বলিয়া গল্প জুড়িয়া শিশুকে ভুলাইয়া খাওয়ানো হয়; শিশু ও 'শিয়ালী' তখন এক হইয়া যায়। বাঙলার অন্যত্র এই ছড়াতেই শালিখ পাখির উল্লেখ দেখা যায়। অথবা 'কাউয়ায় আনলেক খ্যাড়-খড়ি, বগুলায় আন্দিল্ ভাত', এই বলিয়া মা-ঠাকুরমা বলেন, 'হামার বাউটা যে ভাত আছে, ওই এ্যাখেকিনা দাঁত' (সং ১৪৯ ক)। কখনো বলা হয়, আমাদের ছেলে ভালো নাচিতে পারে এবং 'যতো বুড়া ভাত খাছে নাচন দেখিয়া' (সং .৫২)। মুহূর্তে আদরের শিশু 'বুড়া' হইয়া গেল। ১৫৩-সংখ্যক গানটিও প্রসঙ্গত পড়িবার মতো। ১৫৪-সংখ্যক গানখানিও এই দিক দিয়া বেশ সুন্দর। 'বুড়া' বেগুন ক্ষেতে গেল, 'কাঠ-কাউয়া' তাহার দাড়ি ঠোকরাইয়া দিল, কিন্তু সে না কান্দিয়া নাচিতে লাগিল এবং 'নাচতে নাচতে গান ধরে—পান্তার হাঁড়ী বাইর করি' খাবার ধরে' (সং ১৫৪)।

॥ ৩ ॥

ভীতি ও গীতি—ঘুম-পাড়ানি গানের এই দুইটি দিক আছে। সমস্ত বাঙলা দেশে 'বর্গী'র ভয়ে এখনো শিশুরা ঘুমাইয়া থাকে। আলোচ্য অঞ্চলের ঘুম-পাড়ানি গানে 'বর্গী'র ভয়ের কথা উল্লিখিত হয় নাই। তাহা বাঙলার অন্য অঞ্চলে দেখা যায়। বাঘ, শৃগাল, কুকুর, ডাকাতি ইত্যাদির ভয় দেখানো হইয়াছে।

'চোপ্ রে চোপ্, শিয়াল কান্দেছে; কালা কুকুরটা দুয়ারে ভুকেছে' (সং ১৩৪ ক)। 'কান-কাটাটা আইসেছে, ঝিত্ মারিয়া (চুপ করিয়া) থাক্' (সং ১৪৩ গ, কথান্তর)। এই সমস্ত গানে শিশুকে স্পষ্টই ভয় দেখানো হইতেছে। 'আগাত্তি (পূর্বদিকে) হরিণ কান্দেছে' (সং ১৪৪)—অর্থাৎ হরিণের পিছনে বাঘও আসিতেছে। হরিণের কান্না ও ভয় শিশুর কান্নার স্থান নিয়াছে।

১৬১-সংখ্যক গানে ভয়ের অপর দিকের প্রকাশ হইয়াছে। ভিতরগড়ের (ইহা বর্তমানে বাঙলাদেশে) অন্তঃপাতী জগদলের হাট নামক স্থান ডাকাতির জন্য পূর্বে কুখ্যাত ছিল। জনসাধারণের এই ভয় শিশুর ভয়ের মধ্যে আত্ম-

CENTRAL LIBRARY

গোপন করিয়াছে; যেমন, বর্গীর অত্যাচারের ভয় শিশুকে ভয় পাওয়াইবার মধ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শৃগাল-কুকুর ইত্যাদির ভয় দেখানোর মধ্যে শিশুকে লইয়া স্নিগ্ধ কৌতুকের পরিচয় মিলে। কিন্তু, বাঘ বা 'স্কন্ধকাটা' (কানকাটা) বা ডাকাতের ভয় দেখানোর মধ্যে তুচ্ছতার কৌতুক নাই, বড়োদের ভয় ছোটোদের মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে,—বড়োদের জগৎ ও ছোটোদের জগৎ এইখানে এক হইয়া গিয়াছে। শিশুকে ভয় দেখাইয়া কৌতুক সেই বিষয়ে লইয়াই করা যাইতে পারে বড়োদের জীবনে যাহা তুচ্ছ; কিন্তু, বড়োদের জীবনেও যাহা 'সমস্যা'—তাহা লইয়া কৌতুক জমে না। অনুরূপভাবে মা-ঠাকুমার প্রাত্যহিক জীবনের কর্মের ক্লান্তি এবং বাস্তব সমস্যাও ছড়া ও গানে ঢুকিয়া পড়ে, আগেই তাহা বলিয়াছি। বস্তুত ছেলেভুলানো গান ও ছড়া জীবন হইতে প্রস্থান করিয়াও জীবনের স্মৃতি বহন, বড়ো মানুষের ছোটো সাজিয়া শৈশবের ফেলিয়া আসা গর্ভে পুনরায় সাধ করিয়া প্রত্যাবর্তন। সকলেই আবার জন্মাইতে চাহে!

ঘুম-পাড়ানি গানে ভয়ের গান সংখ্যাতেও কম মিলে। ভয়ের গান রচনা করিবার একটা কারণ আছে। শিশুকে যখন কিছুতেই শান্ত করা যায় না, তখন তাহাকে গানের মধ্য দিয়া ভয় দেখানো হয়। এরূপ ব্যাপার সচরাচর ঘটে না, কোলের শিশুকে কেহ সহজে ভয়ও পাওয়াইতে চায় না। তাহা ছাড়া, ভয় দেখাইবার কতকগুলি পরিবেশ চাই। বাঘ-হরিণ বাঙলাদেশের সর্বত্র মিলে না, বর্গীর অত্যাচার অতীতে হইয়া যাইবার পর তাহার অনুরূপ ঘটনা ঘটিলেও গান রচিত হয় নাই॥

॥ ৪ ॥

গানে ও ছড়ায় কখনো-সখনো শিশুকে বড়োদের স্তরে উন্নীত করিয়া লওয়া হয়। শিশুকে 'বুড়া' বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতির কারণও ইহা। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন, তাহার বিবাহ, প্রেম, গার্হস্থ্য-জীবনের ছবি এই সকল গানে কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু মজা এই যে, এই সকল স্থলে বাস্তব জীবনটা শিশুর দৃষ্টিকোণ হইতেই অঙ্কিত হয়,—বাস্তব জীবনের ছবি যেন শিশুর মন দিয়া গড়া এক স্নিগ্ধ আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

CENTRAL LIBRARY

১৪৫-সংখ্যক গানে দেখি, শিশু মাঠে গোরু চরাইতেছে। কিন্তু, তাহার গোরু অনেক দূর চলিয়া যাওয়ায় সে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং গোরু খুঁজিতে সে-ও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্ম অনুরোধ জানাইতেছে। বাস্তব জীবনের এই উদ্বেগের কথা কিন্তু গানে আর বলা হয় নাই ; তাহার পরই হঠাৎ বাস্তব জগৎ হইতে শিশুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে,—তোমার মা নাড়ু-মোয়া আনিয়াছে, বাবা হাট হইতে খাট কিনিয়া আনিয়াছে।

একই ব্যাপার ১৫০-সংখ্যক গানেও উদাহৃত হইয়াছে। এইখানে দেখিতেছি, শিশু বড়ো হইয়া ক্ষেতে হলকর্ষণ করিতেছে, সঙ্গে সহযোগিরূপে আছে তাহার স্ত্রী। এই পর্যন্ত ব্যাপারটি বাস্তব জীবনের অনুগামী। কিন্তু, ইহা শিশু-সাহিত্য হইয়া উঠিল তখন, যখন হলকর্ষণ করিতে-করিতে 'বুড়াক্ দেখিয়া বুড়ীটা খ্যাট কেস্না পইল'—এই ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

শিশুর মাছ মারিবার কথাও এই সঙ্গে উল্লেখ্য। শিশু মাছ মারিতে গিয়াছে, কিন্তু তাহার মা-দিদিমা প্রার্থনা করিতেছে, তাহার-মাছ যেন চিলে লইয়া যায় (সং ১৫০ ক)। বাস্তব জীবনে শিশু যখন বড়ো হইয়া সত্য সত্যই মাছ ধরিতে যাইবে, তখন নিশ্চয়ই তাহার মা-ঠাকুরমা ঠিক বিপরীত প্রার্থনা জানাইবে। ১৫০-খ সংখ্যক গানে আছে, মাছ মারিতে যাইয়া মাছই শিশুকে জব্দ করিয়া দিল এবং তাহা লইয়া শিশুর সঙ্গে বেশ রঙ্গ করা হইতেছে। বাস্তব জীবনে তাহার হাত হইতে মাছ পলাইয়া গেলে কিংবা মাছ ধরিতে না পারিলে এই স্নেহময় রঙ্গ কটু মন্তব্যে রূপ লইত।

এই সমস্ত গান ও ছড়া হইতে বুঝিতেছি,—একদিকে শিশুকে যেমন বড়োদের স্তরে উন্নীত করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের বাস্তব কল্পনা করা হইতেছে, তেমনি বাস্তব জগৎ ও জীবনটা পুরাপুরি বাস্তব নয়,—উহার অনেকখানি শিশুর দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা।

প্রেম এবং বিবাহও এই সকল গান ও ছড়া হইতে বাদ পড়ে নাই। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বাজনা বাজিতেছে, বুঝি শিশুর বর বা কনে আসিতেছে (সং ১৫৮)। রঙ্গ করিয়া কখনো বা বলা হয়, 'এক বেটী বিহায় (বিবাহ দিলাম) ষোলো জামাই' এবং এদিকে 'ছোটোমামার বিয়াও হছে'

CENTRAL LIBRARY

তাই 'ফুল-টুং-টুং বাইজ' বাজিতেছে (সং ১৫৭)। শিশু-কন্যার কান্নাকে প্রিয়-বিচ্ছেদ কাতরা বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত উপমিত করা হইয়াছে এবং গমনোদ্যত দয়িতকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সেই শিশু-কন্যাকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে (সং ১৫৬ ক)॥

॥ ৫ ॥

পারিবারিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধার কথা ঘুম-পাড়ানি গানের ও ছেলে ভুলানো ছড়ার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ছেলে কাঁদিয়া উঠিলে গৃহকর্মে জননীর নানান অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। তাই জননীর কণ্ঠে শুনি: 'নিন্দের ছোয়াক তুই মোর কান্দালো রে' (সং ১৪০)। অনেক সময় মা একা শিশুকে সামলাইতে পারে না, কারণ, তাহাকে গৃহকর্মে যাইতে হইবে। তখন ডাক পড়ে শিশুর পিতার: 'তুই-হে কণেক ভুল্‌কা দেখি রে ছোয়াটাক্ করিয়া কলা' (সং ১৪১)। 'চ্যাপের মোয়া' চাহিয়া ছেলে কাঁদে। মা বলে—

হোকোর ছোয়া
কোলা হাতে নাম্, নাম্;
ভাত আন্ধিবার বেলা হ'ছে—
শাক তুলিম্ কত্‌ক্ষণ।
এলানে আসিবে তোর বাপ—
করিবে 'ভাত আন্, ভাত আন্' ॥—সং ১৪২

কিন্তু শিশুর এই কান্না অকারণে নয়। দরিদ্র জননী শিশুকে ভাত দিতে পারে নাই, যবের ছাতু খাইতে দিয়াছিল। 'প্যাটের ভোকে না খায় ছোওয়া পয়রার গুণ্ডা' (সং ১৪৩)। একেবারে নির্জলা বাস্তবের কথা, কোথায় হারাইল শিশুর সেই সুন্দর জগৎ! দামাল ছেলে ঘুমায় নাই, ইচ্ছা থাকিলেও মা তাই দুর্গা প্রতিমা দেখিতে যাইতে পারিল না,—মায়ের এ ক্ষোভ একটি গানে (সং ১৪৩ খ) স্থান পাইয়াছে।

শিশুর কান্নার নানান কারণও খোঁজা হইয়াছে। শিশু কাঁদিতেছে, মা তাহাকে শান্ত করিতে গায়,—ওরে ছেলে, চুপ কর, তোর বাবা শূয়োর চরাইয়া যে টাকা রোজগার করিবে, তাহা দিয়া তোর মার জন্যে 'পাটানী' (রাজবংশী

CENTRAL LIBRARY

মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র) কিনিয়া আনিবে (সং-১৪৩ খ)। এইখানে বস্ত্রহীনা মার আকাঙ্ক্ষা ছেলেকে চুপ করাইবার ছলে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মার করুণ আকাঙ্ক্ষাই যেন শিশুর কান্নার মধ্যে রূপ ধরিয়াছে।

ঠাকুরমা-দিদিমারা অনেক সময় শিশুর অনুপস্থিত মাকে উদ্দেশ করিয়া ঘুম-পাড়ানি গান গায়। 'পাড়া-বেড়ানী' মা ছেলেকে শাশুড়ীর কোলে দিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া শাশুড়ী গায়, 'ওগে বাহামারী (পাড়া বেড়ানী), তোর ছোয়া কান্দেছে' (সং ১৪৪)।

শিশুর মা অনেক সময় ঠাকুরমার কণ্ঠে বিচিত্র রূপকে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঠাকুরমা ছড়া কাটে—

হাড়-গোরল গে, হাড়-গোরল,
তোর মাও কোঠে গেইছে;
—ছয় কুড়ি ছোয়া নিয়া
গান শুনিবা' গেইছে।—সং ১৪৮

শিশুর মা এইখানে পাখি, শিশু পক্ষি-সন্তান। পাখিকে পূর্বপুরুষ কিংবা totem বলিয়া কল্পনা করিবার প্রভাব এখানে থাকিতে পারে।

পুত্রবধূর এই অনুপস্থিতিকে ভিত্তি করিয়া ঠাকুরমা-দিদিমা অনেক সময় হাস্যরসাত্মক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে। ১৪৬-সংখ্যক গানটিতে এমনি একটা ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। ছেলের মা বাড়ীতে নাই, এদিকে ছেলে কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। ছেলের বাবাই আসিয়া শেষে ছেলেকে শান্ত করিবার জন্য কহিল, ওরে ছেলে, চুপ কর্, তোর্ মাকে এখনি গিয়া প্রহার করিতেছি। সেদিন ছেলের মা ও তাহার ছোটো জা একই ধরণের 'পাটানী' পরিয়াছিল। ছেলের বাবা পিছন হইতে যাইয়া, আপনার স্ত্রী মনে করিয়া ভাত্র-বধূকেই প্রহার করিল! বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করিয়া এমন হাস্য-রসাত্মক ছড়া বাঙলায় খুব কমই আছে।

১৪৭-সংখ্যক রচনাটির একটি স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে। ইহাতে মায়ের চরিত্রের একটা দিক ব্যক্ত হইয়াছে। বেরুবাড়ীর হাটে যাইবার পথে একদিন ঝড়-বৃষ্টি হইয়াছিল, পথের একটি ইস্কুল ঘরে মা আশ্রয় লইয়াছিল; ঝড়ে আটকা পড়িয়া জনৈক 'সিপাই'ও সেইখানে আসে। তাহারই ফলে শিশুর জন্ম হইল। এই জঘন্য ব্যাপার প্রকাশ্যভাবে ছেলে ভুলাইবার জন্য বলা হইয়া

CENTRAL LIBRARY

থাকে। ছেলে ভুলাইবার প্রসঙ্গে মায়ের এই প্রক্ষেপ বিশেষভাবে লক্ষ করিবার। শিশুর রাজ্যে বাস্তব জগৎ ও বড়োদের এই প্রক্ষেপ আলোচ্য অঞ্চলের ছেলে ভুলানো ছড়া ও গানের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য॥

॥ ৬ ॥

ছেলে ভুলানো ছড়ার নিজস্ব একটি রচনাভঙ্গি আছে। উহার ছন্দ, বিষয়-কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গি সবই লক্ষিতব্য। রবীন্দ্রনাথের অসীম রসবোধের অনুগ্রহে ছেলে-ভুলানো ছড়ার বিশেষ দিকগুলি আজ আর কাহারও অজানা নাই।

ছেলে-ভুলানো ছড়ার রচনাভঙ্গির লক্ষিত দিকগুলি ছাড়া অপর একটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। ইহার রচনাভঙ্গির মধ্যে প্রশ্নোত্তরের প্রবণতা প্রায়শঃই দেখা যায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ছড়াগুলি একক কণ্ঠে বলিবার জন্ম রচিত হয় নাই। একজন ইহার প্রশ্নকর্তা, অপরজন ইহার উত্তরদাতা। অথবা, শিশুর ভাষাজ্ঞান হীনতার জন্ম মা-দিদিমা-ঠাকুরমারাই একাধারে ইহার প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা।

১৫৯, ১৬০ ও ১৬৩-সংখ্যক ছড়াগুলি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এইগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই বটে, কিন্তু ইহাদের রচনাভঙ্গির বিশেষত্বটি অবশ্যই লক্ষ করিবার। ইহা যেন শিশুর সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা অথবা শিশুকে কথা কহিবার সুযোগ দেওয়া।

পুনরাবৃত্তি, একই বিষয়ের শৃঙ্খলামূলক বর্ণনা, অথবা একই বর্ণনার জের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে একটি বিশেষ ধারার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত টানিয়া যাওয়া তাবৎ লোক-সাহিত্যের এক বৈশিষ্ট্য। ১৫১-সংখ্যক ছড়াটির নাম উদাহরণ হিসাবে করা যায়। ইহার প্রাসঙ্গিক অংশ এই :

- উয়ার বাপ ঘোড়া-চড়া
উয়ার মাও শাঁখা-মুঠি ;
উয়ার বহিনি গালার কাঠি,
উয়ার পিসাই পচা কাঠি॥ —সং ১৫১

এইখানে দেখা যাইতেছে, একই বর্ণনা ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া একটি বিশেষ শৃঙ্খলা (অর্থাৎ প্রথমে বাপ, তারপর মা, তারপর বইনি, তারপর পিসাই,

এইভাবে পরিবারের সকলের নাম) বজায় রাখিয়া শেষ পর্যন্ত উহার জের টানা হইয়াছে।

ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা রসময় অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতার ভাব রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করিয়াছেন। সর্বত্রই এই রীতি লক্ষিত হয় না। বিষয়বস্তুর ক্রম দেখাইয়া একটি পুরা কাহিনীও মাঝে-মাঝে মিলে। তবে, উহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে অসঙ্গতির ভাব কোনোক্রমেই অস্বীকার করিবার জো নাই। ১৬২-সংখ্যক ছড়ায় দেখিতেছি, ঘোড়া হইতে পড়িয়া 'রাজার বেটা নখিন্দর'-এর মৃত্যু হইয়াছে, এজন্যে তাহার কইনামতী নাম্নীয়া মা 'নাটুহুটু' করিয়া কাঁদিতেছে এবং সেই কান্না মশারি টাঙাইয়া! ভাইয়ের মৃত্যুতে নখিন্দরের বোন সুপারি খাইতেছে!—ছড়ার মধ্যে এই যে বিষয়ের অসঙ্গতি ও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গির বিশেষত্ব তাহা রবীন্দ্রনাথের সার্থক কবিদৃষ্টিই সর্বপ্রথমে লক্ষ করিয়াছিল॥

॥ ভাত-ছোঁয়ানি ॥

সন্তানের মুখে প্রথম অন্নদানের অনুষ্ঠানকে 'ভাত-ছোঁয়ানি' কহে।

বর্তমান সংগ্রহের 'ভাত-ছোঁয়ানি'র গানগুলির একটি বিশেষত্ব এই দেখিতেছি যে, গুগুলি ধর্ম-নিরপেক্ষ নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গানে যেখানে ধর্ম-ভাব উদ্দীপিত হয় নাই, অ-ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেই-খানে ধর্মের আবরণ দেওয়া হইয়াছে!

১৬৪ হইতে ১৬৪ গ-সংখ্যক ভাত-ছোঁয়ানির গানগুলিতে দেখা যায় – সন্তান গোপালের ভূমিকা নিয়াছে এবং মা যশোদা সাজিয়াছে। ক্ষুধার্ত গোপালকে আজ ক্ষীরননী খাওয়ানো হইতেছে।

গানগুলির অপর এক বিশেষত্ব হইল,—এইগুলির একটি প্রশ্নের ভঙ্গিতে, অপরটি উহার উত্তরের ভঙ্গিতে রচিত। ক্ষুধার্ত সন্তান খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে একটি গানে, পরবর্তী গানে মা উহার জবাব দিতেছেন।

১৬৫-সংখ্যক গানখানিই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গণ-মানসের সার্থক প্রতিনিধি। ইহাতে ধর্মের আবরণ দেওয়া হয় নাই। তাহার উপর, ইহাতে সন্তানের উল্লেখ নাই, আছে মায়ের ব্যক্তিগত কাহিনী। এই দিক দিয়া ১৫৭-সংখ্যক রচনাটির সহিত ইহা তুলনা করিবার যোগ্য। দুইটি রচনাতেই দেখা যায়, সন্তানকে উপলক্ষ রাখিয়া মায়ের অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে। এই অবৈধ প্রণয়ের কথা যেখানে নির্বোধ সারল্য লইয়া নির্দোষ আমোদের জন্য গীত হয়, তাহার মধ্যে নৃতাত্ত্বিকগণ নৃতত্ত্বের চমকপ্রদ উপাদান পাইবেন।

অবশ্য, ১৫৭-সংখ্যক রচনাটিতে যেরূপ ঘৃণ্য ব্যাপারের উল্লেখ করা হইয়াছে, বর্তমান গানখানি তাহা হইতে মুক্ত। পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন মা তাহার প্রাক্তন-প্রণয়ীর নিকট হইতে 'তিরিশ-টাকিয়া গাই-বাছুর' দ্বারা লৌকিকতার পরিবর্তে ধানদূর্বাদ্বারা আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অনুষ্ঠানের দিন সকাল-সকাল আসিয়া কলার পাতা কাটিতে বলিতেছেন এবং নিমন্ত্রিতদের তদারকের ভার অর্পণ করিয়াছেন। গানটিতে সন্তানের অন্নপ্রাশনের উপলক্ষে মায়ের প্রণয় লক্ষিতব্য।

অন্নপ্রাশনের গানগুলিতে সন্তানের পিতার নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহাকে একটি বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। অবশ্য, ইহারই ফলে ইহার মধ্যে হুট করিয়া আমি মাতৃতান্ত্রিকতার জড় আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে চাহি না। কাহারও কাহারও সেই অভ্যাস আছে বটে।

CENTRAL LIBRARY

॥ ফুল-ফুটানি ॥

॥ ১ ॥

নারীর জীবনে প্রথম রজোদর্শন তাহার যৌবনের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। রজস্বলা নারীকে 'পুষ্পবতী' বা 'পুষ্পিতা' এবং প্রথম রজোদর্শনের জন্য যে উৎসব হয় তাহাকে 'পুষ্পোৎসব' বলা হয়। 'ফুল-ফুটানি' এই 'পুষ্পোৎসব'-এরই নামান্তর।

আজিকার সভ্যজগতে নারীর জীবনের এই জৈবিক দিকটিকে গোপন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। লোক-সমাজে কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্যে কোনো গোপনতা নাই, বরং উৎসব-অনুষ্ঠান করিয়া ব্যাপারটিকে জানাইয়া দেওয়া হয়। শুধু তাহাই নয়। এই অনুষ্ঠানে যুবক-পুরুষেরাও একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা আদিম এক কৃষকসমাজের ইঙ্গিত প্রদান করে। নারী এখানে উর্বরতার প্রতীকরূপে স্বীকৃত; দ্বিতীয়ত, পারিবারিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একই পরিবার বেশী করিয়া শস্য অর্জন এবং শিকার করিতে পারিবে, তাহারই জন্যে এই আনন্দ।

অনার্তবা কুমারী যেদিন প্রথমে ঋতুমতী হয়, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে সেদিন কতকগুলি আচার পালন করা হয়। বৃদ্ধারাই এই আচারগুলি পালন করিয়া থাকে। প্রথমত আর্তবা নারীকে কোনো নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। নদী যেখানে অল্পস্থানের ব্যবধানে দুইবার বাঁক লয়, জল সেখানে 'উত্তরস্রোতা' হইয়া থাকে। দন্ত্যবর্ণ কণ্ঠ্যবর্ণ হইবার ফলে 'উত্তরাসোক'রূপে উচ্চারিত হয়। উত্তর-স্রোতা জলকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে পবিত্র বলিয়া মনে করা হয় এবং পূজাদি বিবিধ শুভকাজে এই জল ব্যবহার করা হয়। নদীর এই বাঁককে বলে 'যেকেনাই'। যাহা কিছুই বিপরীত, তাহার মধ্যে লোকমানস রহস্য ও যাদু অনুভব করিয়া থাকে। জল সাধারণত নিম্ন বা দক্ষিণগামী, কিন্তু তাহা উত্তরগামী হইলে বৈপরীত্যের জন্যে যাদুধর্ম লাভ করে।

ঋতুমতী নারীকে নদীর এই 'যেকেনাই'-তে, যেখানে জল উত্তরস্রোতা, সেইখানে লইয়া যাওয়া হয়। তারপর, দুব বা পিঠুলি গোলা ও সেই নদীর জলে তাহাকে স্নান করানো হয়। এই সময় কলা গাছের গোড়া পোড়াইয়া ঘরে প্রস্তুত ক্ষার দিয়া ওই নারীর মাথা-গা ঘষিয়া দেওয়া হয়। ১৭০-সংখ্যক

গানে ইহার পরিচয় আছে। 'উত্‌রাসোকের জল, আরো নাগে দুধ মিশল, তাক দিয়া সিনান করামো।'

কোচবিহারের রাজবংশিগণ নারীর প্রথম রজোদর্শনকালে 'দোকাপড়িয়া' নামে এক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। 'দো-কাপড়িয়া'র অর্থ 'দুইটি কাপড়'। পরনের কাপড় ছাড়া, এইদিন হইতে দ্বিতীয় একখণ্ড বস্ত্র বক্ষাবরণরূপে নারী ব্যবহার করিতে থাকে। এই দ্বিতীয় বস্ত্রকে বলে 'আগ্রন'। বক্ষাবরণ বলিয়া অনেক সময় ইহাকে 'বুকানী'ও বলা হইয়া থাকে। এ সম্পর্কে নীচের উদ্ধৃতিটি লক্ষিতব্য।

"বালিকাগণ যখন যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন দো-কাপড়া নামে এক ক্রিয়া হইয়া থাকে। অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকসকল একত্র হইয়া বালিকার বুকের উপর একখানা আগ্রান জড়াইয়া দেয়, এই হইতে তাহাকে স্ত্রীলোক সংখ্যায় গণ্য করা যায়। তাহার বালিকা নাম থাকে না "[1]

"কোচ ও রাজবংশী শব্দ সংগ্রহ" নামক এক প্রবন্ধে অনৈক সত্যসুন্দর বহুও 'দো-কাপড়িয়া' সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ॥[2]

॥ ২ ॥

সঙ্কলিত ফুল-ফুটানির গানগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিতে পারা যায়। কতকগুলি গানে পুষ্পিতা নারীর যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে; কয়েকটি গান পাই, যাহাতে পুষ্পোৎসব উপলক্ষে যে আচার পালন করা হইতেছে, তাহার বর্ণনা। তৃতীয় আর এক ধরণের গান পাই, যেখানে পুরুষের জবানীতে কাম ও প্রেম উদ্দীপ্ত হইয়াছে।

প্রথম ধারার গানে ঋতুমতীর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে, স্বাভাবিক কারণেই তাহা প্রেম ও বিবাহ-ঘটিত। উপযুক্ত বয়স হইয়া উঠিল, আজ হইতে যৌবনের জৈবিক দিকের দৈহিক প্রকাশ ঘটিল, অথচ পিতা-মাতা বিবাহ দিন না, ইহাই এই ধারার গানের মূল বক্তব্য। ১৬৮ ও ১৬৯-সংখ্যক গানে নারীর এই ব্যথা বেশ ফুটিয়াছে।

১ ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কোচবিহারের ইতিহাস (১২৮৯), পৃঃ ২৫।

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫, চতুর্থ সংখ্যা।

দ্বিতীয় ধারার গানে ঋতুমতীকে স্নান করানোর বর্ণনা। বাড়ী হইতে নদীর পথে যাত্রার সময়, পথে এবং শেষে ঘাটে গান গাওয়া হয়। ১৭০ সংখ্যক গানখানি বাড়ী হইতে যাত্রার সময় গীত হয়। হাতে ক্ষার-'খইল' এবং কচুর পাতায় 'ছেকা' লইয়া কন্যা চলিয়াছে নদীর পথে। আজ কুমার জলে তাহার স্নান করিয়া তৃপ্তি হইবে না; গায়িকারা কন্যার জবানীতে গায়: 'নদীত্ সিনিবার মোর উঠিসে তিষিণা' (সং ১৭০)। যাইবার সময় পথে কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়, তুই আজ ঋতুমতী হইলি, কিন্তু তোর বাপ এখনো তোর বিবাহের আয়োজন করিতেছে না (সং ১৬৬)। তারপর নদীর বাঁকে যাইয়া কন্যাকে স্নান করানো হয়। ১৭০ক, ১৭০খ, ১৭০গ ও ১৭১-সংখ্যক গানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ফুল ফুটানির তৃতীয় ধারার গানগুলি রজঃস্বলা নারীর প্রতি পুরুষের উক্তি। আজিকার দিনে সত্যসত্যই পুরুষেরা যাইয়া এইরূপ গান গাহিয়া থাকে না। কোথাও কোথাও নদীতে যাইবার পূর্বে বা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর উঠানে কন্যাকে রাখিয়া পরিচিত পুরুষেরা তাহার সহিত ঠাট্টা রঙ্গ করিয়া গান গাহিত। আজিকার দিনে এই প্রথা একেবারেই কমিয়া আসিয়াছে। বুঝা যায়, মানুষ সভ্য হইতেছে।

পুরুষের জবানীতে বলা এইসকল গান মেয়েরাই আজকাল গাহিয়া থাকে। ১৭২ ও ১৭৩-সংখ্যক গানগুলি এই ধরণের। এই দুইখানি গানে পুরুষের পক্ষ হইতে কন্যার দেহ-যৌবন প্রার্থনা এবং কন্যার তরফ হইতে তাহার জবাব দেওয়া হইয়াছে। কন্যা বলে, আজ ঋতুমতী হইয়াছি, আজিকার মতো তুমি ফিরিয়া যাও (সং ১৭৩)।

১৭৪-সংখ্যক গানখানি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর, মায়ের জবানীতে কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া গীত হয়। মা বলে, এখন হইতে তুই ভালো করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া থাকিস্, হাটে-হাটে তোর জন্য ভালো 'পাটানী' কিনিয়া দিব, ময়ূরের মতো পেখম তুলিয়া তুই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিস্ (সং ১৭৪)। ইহা যেন বিবাহযোগ্যা কন্যার যৌবনকে মাতা-কর্তৃক পারিবারিক স্বীকৃতি দান এবং যে সমাজে কন্যার পিতাই বিবাহকালে কন্যাপণ পাইয়া থাকে, সেই সমাজেই কন্যা যুবতী হইয়া উঠিলে মাতার এমন আনন্দ হইতে পারে॥

CENTRAL LIBRARY

॥ রঙ, হাউসালি, চেঙ্গ্‌ড়ী-ভুলা, বন্ধু-নাচানি ॥

॥ ১ ॥

প্রেমের গানকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমের গানকে 'রঙ-পিরিতি', 'রঙের গান' বা শুধুই 'রঙ' বলা হয়। এই অঞ্চলে পদাদিস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ 'র'-এর কেবল স্বরটুকুই উচ্চারিত হয় বলিয়া প্রেমের গান 'অঙ', 'অঙ-পিরিত্তি' ইত্যাদি রূপেও উচ্চারিত হয়। প্রেমের সহিত জীবনও 'রঙীন' হইয়া উঠে বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে।

'হাউসালি গান' বলিয়াও প্রেমের গানকে নির্দেশ করা হয়। 'হাউস' শব্দের অর্থ হইল—শখ, শৌখিনতা, সাধ, আহ্লাদ ইত্যাদি। শখ, শৌখিনতা, সাধ প্রকাশ করা হয় যে গান দিয়া,—এই অর্থে 'আলি' প্রত্যয় যোগ করিয়া এই পদ গঠিত হইয়াছে।

প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে 'বন্ধু' রূপে সম্বোধন করিয়া থাকে। যে গানে প্রেমিক-প্রেমিকার মন 'নাচিয়া' উঠে, তাহাই 'বন্ধু-নাচানি' গান,—ইহা প্রেমের গানের অপর এক নাম।

কোনো কোনো অঞ্চলে প্রেমের গানকে 'চেঙ্গ্‌ড়ী-ভুলা'রূপেও নির্দেশ করা হয়। চেঙ্গ্‌ড়ী অর্থাৎ মেয়েকে ভুলানো হয় অথবা যে গানদ্বারা মেয়ে ভুলে, তাহাকেই বলে চেঙ্গ্‌ড়ী-ভুলা গান।

পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, লোক-সাহিত্যে প্রেমের গানই বেশি। বিচিত্ররূপে, বিভিন্ন সামাজিক এবং মানসিক অবস্থার পট-ভূমিকায় লোক-সাহিত্যে প্রেম-গীতি রচিত হইয়া থাকে। সেই সকল গানকে যদি সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি অনুযায়ী সাজাইয়া লওয়া যায়, তবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সঙ্গীত-সমষ্টিদ্বারা ওই লোক-সমাজের এক অলিখিত ইতিহাস স্বতই সকলিত হইয়া যায়।

এইখানেই মার্জিত সাহিত্যের প্রেমের গান ও লোক-সাহিত্যের প্রেমের গানের মূল পার্থক্য। মার্জিত সাহিত্যের প্রেম-গীতি দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ। ইহা সবিশেষ প্রেমিকের মানসিক উত্তাপের মধ্যে জন্ম লইয়া নির্বিশেষ প্রেমের

পথে যাত্রা করে। প্রেমের বিশ্বাতিশায়ী ভাবই ইহাতে যেন বেশি করিয়া পাই,—কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার সামাজিক পরিচয় ইহাতে যেন তেমন করিয়া পাই না। মার্জিত সাহিত্যের প্রেমিক-প্রেমিকা নির্বিশেষ নর-নারীরূপে চিত্রিত হইয়া থাকে।

কিন্তু, লোক-সাহিত্যের প্রেম-গীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট সমাজ-মানসের ভিত্তিভূমি হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে। নির্বিশেষ 'প্রেম' অপেক্ষা একটি বিশেষ সমাজের সভ্য, বিশেষ 'প্রেমিক'ই এখানে যেন প্রাধান্য পাইয়া থাকে। এইজন্য লোক-সাহিত্যের প্রেমের গানে দেশ-কাল-পাত্রের খুঁটি-নাটির তথ্য-চিত্র পাওয়া যায়।

ইহা দ্বারা অবশ্য একথা বলা হইতেছে না যে, লোক-সাহিত্যের প্রেম-গীতিতে বিশ্বমুখিনতা নাই। বস্তুত, লোক-সাহিত্যের বিশেষত্বই হইল,—একটি বিশিষ্ট জন-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সকল আচার-সংস্কৃতিকে অঙ্গে ধারণ করিয়াও, একটি বিশেষ মানবমুখিনতার অনির্দেশ্য পথ বাহিয়া, ইহা বিশ্বব্যাপী মানব-প্রবাহের প্রধান ধারাটিকে অলক্ষ্যরূপে স্পর্শ করিতে পারে॥

। ২ ।

সঙ্কলিত প্রেমের গানগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

বিষয়ের দিক দিয়া বিচার করিলে, ইহার প্রধান বিশেষত্ব হইল,—গানের মধ্যে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত করিবার সরল ও অকপট প্রয়াস। জীবনের রঙীন মুহূর্তগুলি ইহাতে যেমন ধরা পড়িয়াছে, তেমনি ইহার অন্তর্নিহিত দুঃখ-কারুণ্যও ইহাতে স্থান পাইয়াছে ; জীবনের আলোকময় দিকটি ইহাতে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনি উহার অন্ধকারের দিকটিকেও অবহেলা করা হয় নাই। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব হইয়াছে, তেমনি যৌন-ক্ষমতাহীন স্বামীর জন্য নারীর ক্ষোভ ও খেদ অকপট সারল্যে ব্যক্ত হইয়াছে,—জীবনের এই গোপন দিকটিকে ঢাকিবার চেষ্টা করা হয় নাই। এখানে বিপত্নীক তাহার পূর্ব স্ত্রীর প্রতি প্রেমনিবেদনও যেমন করুণ ভঙ্গিতে করিতে পারিয়াছে, তেমনি পত্নীর অভাবে তাহার দৈহিক অসুবিধার কথাও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

একই ব্যাপার বিধবা নারীর প্রেমের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। এখানে তাই প্রেমের মহানদিকের উল্লেখের পাশে বিবাহের জন্ম আকাঙ্ক্ষাও প্রবলরূপে ধ্বনিত হইয়াছে। নর ও নারীর জীবনে যতো প্রকার পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে,—তাহার সব কয়টি এই প্রেমের গানের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। অবৈধ-প্রণয়ের ঘৃণ্য কথাও এইখানে সরল ও অকপট ভঙ্গিতে জানানো হইয়াছে। এই স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা, স্থূলতা, সরলতা ও পূর্ণতাই এই প্রেমের গানের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, প্রেমের অন্তর্নিহিত উচ্চ ভাবাদর্শ, ইহার বিচিত্রস্বরূপ ও সূক্ষ্ম গতি-প্রকৃতি যেমন গানের মধ্যে ব্যক্ত করিবার প্রবণতা লক্ষিত হয়, তেমনি প্রেমের প্রয়োজনগত দিকটিকেও বাস্তব ও সরল দৃষ্টি দিয়া বিচার করিবার চেষ্টা দেখা যায়। অনেক সময়, প্রেমের গানে প্রেমের চেয়ে বিবাহ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্ম এমন কতকগুলি গান মিলে, যেগুলি কোনো বিশেষ নর বা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রেম নিবেদন করা হয় নাই—নির্বিশেষভাবে যে কোনো নর বা নারীর সহিত বিবাহের জন্ম আকাঙ্ক্ষাই কেবল প্রকাশিত হইয়াছে।

সঙ্কলিত প্রেমের গানগুলির মধ্যে পূর্ণ মিলনের উদ্দামতা যেমন নাই, বিরহের তীক্ষ্ণ হাহাকারও তেমনি বিশেষ নাই, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া। মিলনের জন্ম আকাঙ্ক্ষাই শুধু প্রতিফলিত হইয়াছে।

গানের মধ্যে নায়ক ও নায়িকার সম-প্রাধান্ম ইহার অপর এক বৈশিষ্ট্য।

প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে দেখা যায়,—প্রায় সব গানই হয় নায়কের প্রতি নায়িকার কিংবা নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি। প্রেমিক-প্রেমিকার স্বগতোক্তি বিশেষ নাই। ইহাতে প্রেমের প্রত্যক্ষতা অধিকতররূপে বজায় রহিয়াছে। অনেক সময়, প্রেমিক-প্রেমিকা কর্তৃক তাহাদের নামও গানের মধ্যে বলা হইয়াছে। এই যে নাম ধরিয়া বা সম্বোধন করিয়া প্রেম নিবেদন করিবার প্রবণতা, ইহার মধ্যে এক প্রকার বিশেষিকতার (Particularisation) ইঙ্গিত মিলে॥

CENTRAL LIBRARY

॥ ৩ ॥

আলোচ্য প্রেমের গানগুলির মর্মরস পুরাপুরি পাইবার জন্ম রাজবংশী সমাজের প্রেম, বিবাহ ও কন্যাপণ-প্রথা সম্পর্কে দুই-চারি কথা জানা আবশ্যক। অবিবাহিত পুরুষ বা নারী কেন বিবাহের জন্ম আকুতি প্রকাশ করিয়াছে, কেন প্রেমের চেয়ে বিবাহেচ্ছাই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, বিধবার পুনরায় স্বামী গ্রহণ ও প্রেম কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার্য অথবা দেবর-বউদির প্রেম আদৌ অবৈধ কি না, এই সকল প্রশ্নের উত্তর রাজবংশী সমাজের প্রথার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

রাজবংশী-সমাজে কন্যার পিতাই কন্যাপণের টাকা পাইয়া থাকে। এই পণের পরিমাণ চল্লিশ হইতে চারিশত বা তাহার বেশি টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। সাধারণত 'কুড়ি' হিসাবে এই টাকা গণনা করা হয়। কন্যার পিতাই পণের টাকা পাইয়া থাকে বলিয়া পিতা-কর্তৃক কন্যার বিবাহ দিবার নামান্তর হইয়াছে 'বেচিয়া খাওয়া'।

পণের টাকা জোগাইতে না পারিয়া বিবাহেচ্ছু অনেক পুরুষেরই বিবাহ করা হইয়া উঠে না। বিবাহের পথ যেখানে অর্থ-সঙ্গতির রূঢ় বন্ধনে বাঁধা, প্রেম সেখানে বিবাহেরই নামান্তর হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কী আছে। এই জন্ম প্রেমের চেয়ে বিবাহ বড়ো হইয়া উঠিবার কারণ যতো না মানসিক, তদপেক্ষা অধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

কন্যাপণের টাকা নগদ না দিতে পারিলে প্রকারান্তরে তাহা শোধ করিবার প্রথা আছে। ধরা গেল, কন্যার পিতা একজন পুরুষকে তাহার জামাতারূপে মনোনীত করিলেন। কিন্তু, উক্ত পুরুষটির অর্থ-সঙ্গতি নাই। তখন দু পাঁচ জন ব্যক্তির মতামত লইয়া স্থির হয়—অর্থসঙ্গতিহীন ওই পুরুষ নির্দিষ্ট কিছু-দিনের জন্ম কন্যার গৃহে অবস্থান করিয়া উহাদের কৃষি ও গৃহকর্মে সাহায্য করিবে। অর্থাৎ আর্থিক দিকটি দৈহিক শ্রম দিয়া পূরণ করিয়া দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে ওই পুরুষ চুক্তি অনুযায়ী, কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। ইহার মধ্যে আদিম অর্থনীতি ও 'বিনিময়' প্রথার ইঙ্গিত পাই।

যুবকটি যখন কন্যার গৃহে থাকে, তখন স্বাভাবিক কারণেই কন্যার প্রতি তাহার একটি অলিখিত দাবী ও হবু-স্বামীর অধিকার জাগিয়া উঠিতে পারে।

CENTRAL LIBRARY

অথচ, আইনত সে তখন কন্যার-স্বামীও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সময় কন্যা ও যুবকের সহিত মেলা-মেশার অবাধ সুযোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু, প্রেমের পথ বিচিত্র। এই বিচিত্র অবস্থার পাকে পড়িয়া, কন্যা ও যুবকের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহার ছাপ প্রেমের গানেও পড়িয়াছে। অনেক সময়, কন্যা ও পুরুষের অবৈধ দৈহিক মিলন ঘটে। কখনো বা দেখা যায়, ওই পুরুষ কিছুদিন থাকিবার পর চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় কিংবা কন্যাপক্ষই হয়তো চুক্তি ভঙ্গ করে। কখনো একাধিক পুরুষকে কন্যার পিতা এইভাবে নিয়োগ করিয়া থাকে। তখন ওই সকল পুরুষের মধ্যে নিজের নিজের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করিবার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এইসব দিক-গুলিই প্রেমের গানে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

সাধারণত পুত্রহীন কন্যার পিতাই এইভাবে জামাতা গ্রহণ করে। যে যুবকের পিতা-মাতা বাঁচিয়া আছে, কিন্তু পণ জোগাইবার সামর্থ্য নাই, তাহারা এইভাবে কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুনরায় নিজগৃহে ফিরিয়াও আসিতে পারে। যুবকের পিতা-মাতা বাঁচিয়া না থাকিলে, ঘর-জামাইরূপে সে কন্যার গৃহেই অবস্থান করে।

নিজেদের বাড়ীতেই ভৃত্যবৎ যে বা যাহারা কাজ-কর্ম করিতেছে, দূর বা নিকট ভবিষ্যতে তাহাদেরই বাড়ীর জামাই হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা কন্যার মনেও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। এই প্রকার সামাজিক প্রথা প্রচলিত থাকায় বহু প্রেমের গানে দেখি, বাড়ীর ভৃত্যই গৃহস্বামীর কন্যার পাণি প্রার্থনা করিতেছে কিংবা কন্যাই বাড়ীর ভৃত্যের নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছে। এই সকল প্রেমের গানগুলির রসোপলব্ধির জন্য সামাজিক প্রথাগুলিকে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

পুরুষ যেমন কন্যাপণের টাকা জোগাড় করিতে না পারিয়া বিবাহেচ্ছ সম্বরণ করিয়া থাকে, অনুরূপ ব্যাপার নারীর জীবনেও ঘটিয়া থাকে। অধিক-তর অর্থের আশায় কন্যার পিতা সহজে কন্যার বিবাহ দিতে চায় না, এবং সেই কারণেই কন্যার বিবাহ বিলম্বিত হইতে থাকে। বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া তখন পিতামাতাকে তিরস্কার করিয়া ও গঞ্জনা দিয়া গান গায়। বহু গানে এই ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থলোভে পিতা অনেক সময় বৃদ্ধ, নাবালক,

CENTRAL LIBRARY

রুগ্ন স্বামীর সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছে, কন্যার এই খেদ ও অভিমান প্রেমের গানের একটি বিষয়।

অনেক সময়, অবস্থাপন্ন কন্যার পিতা বরপক্ষের নিকট হইতে কোনো প্রকার পণ না লইয়াই আপনার কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। এইরূপ বিবাহকে বলে কন্যা 'দান দেওয়া'। যে পুরুষ বিনাপণে বিবাহ করিবে, উত্তরকালে তাহার কন্যার বিবাহকালে সে-ও পণ লইতে পারিবে না; তাহাকেও কন্যা 'দান' করিতে হইবে,—এইরূপ নিয়ম আছে।

রাজবংশী-সমাজে নারী একাধিকবার স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। ইহা বিচিত্ররূপে করা যায়। এক, স্বামী জীবিত থাকিতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা যায়,—বর্তমানে ইহা একেবারেই কমিয়া আসিয়াছে। দুই, বিধবা পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে বিচিত্র-রূপে। যে সমাজে নারীর একাধিকবার স্বামী গ্রহণ করিবার প্রথা চলিত আছে, সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত সধবা ও বিধবা নারীর পর-পুরুষের সহিত প্রেমকে কতোখানি 'অবৈধ' বলা চলিবে,—তাহা এক বিচার্য বিষয়।

রাজবংশী-সমাজে কচিৎ বড়ো ভাইয়ের মৃত্যু হইলে দেবরই বউদিকে বিবাহ করিয়া থাকে। অর্থাৎ 'Levirate'-প্রথা আংশিক চলিত আছে। এই সামাজিক প্রথা চলিতে থাকিবার জন্যই দেবর কর্তৃক বউদিকে অথবা বউদি কর্তৃক দেবরকে প্রেম নিবেদন করিয়া গান মিলে। দেবর-বউদির এই প্রণয়কেও কতখানি 'অবৈধ' বলা চলিবে, তাহাও এক তর্কের বিষয়।

এই সকল সামাজিক প্রথা স্মরণে রাখিয়া সঙ্কলিত প্রেমের গানগুলির এক-একটি গুচ্ছ লইয়া এইবার আলোচনা করা হইবে।

॥ ৪ ॥

অবিবাহিত পুরুষের প্রেমের গান প্রেম ও বিবাহেচ্ছা—এই দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক কারণে পুরুষের বিলম্বিত-বিবাহ এবং সেই বিলম্বিত-বিবাহের দরুন frustration-এর সুর বহু গানে ধ্বনিত হইয়াছে। ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮ ও ১৭৯-সংখ্যক গানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পুরুষের বিবাহ দেখিয়া এখানে অবিবাহিত পুরুষের মন কাঁদে। তাহার মনে হয়, পিতা জীবিত থাকিলে টাকা খরচ করিয়া সে-ই বিবাহযোগ্য পুত্রের বিবাহ

CENTRAL LIBRARY

দিত (সং-১৭৫)। নিজেই উৎসাহ লইয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিবাহিত পুরুষ কন্যা খুঁজিয়া চলিল, কিন্তু 'হতভাগা চেনা (অবিবাহিত পুরুষ)-টার মোর কইনায় মিলে না।' কারণ,—'কায় বোলে শয়তানি করেছে, তাতে যাছে আউলিয়া' (সং ১৭৬)। পরবর্তী গানটির বিষয় আরো করুণ। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া অবিবাহিত পুরুষ পাট বুনিয়াছিল, বাজারে তাহা চড়া দামে বিক্রয়ও হইল। তাহার বড়ো আশা ছিল, দাদা বুঝি সেই টাকা দিয়া তাহার বিবাহ দিবে। কিন্তু, অত্যন্তই দুঃখের কথা—দাদা সেই টাকায় কিনিয়া আনিল এক-জোড়া বলদ! পুরুষ তাই খেদ করে, 'বাপ নাই যে জুড়িবে কইনা'; তিরস্কার করিয়া বলে, 'দাদা-শালাটা বড় পাজী' (সং-১৭৭)। বিবাহ হইতেছে না, এদিকে বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, তাই পুরুষ গায়—'আর কতদিনে হবে রে বিয়া উলু-লু দিয়া' (সং ১৭৮)।

অবিবাহিত পুরুষ পরিশেষে গ্রাম-দেবতার আশীর্বাদের উপর নির্ভর করা শুরু করে। সকলেই যাইতেছে গ্রাম-দেবতার নিকট পূজা দিতে। পুরুষ বলে, 'মোহো যাছো, দিম্ দেহর (পূজা দিব) বিহো হলে' (সং-১৭৯)। এই সকল গানের মধ্যে কোথাও পুরুষের প্রেম প্রকাশিত হয় নাই। যে কোনো নারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবার বাসনাটাই প্রবলরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ধারার প্রেমের গানগুলিতে প্রেমের তীব্রতা, উহার প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠ সরলতা, স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা, প্রেমের বিচিত্র রূপ ও স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস, প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকার রূপ বর্ণনার স্বাতন্ত্র্য—প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রেমের মধ্যে যে একটা আদিম উদ্দামতা আছে, মার্জিত সাহিত্যের প্রেম-গীতিতে তাহা যেন ঠিক সেই আদিম ভঙ্গিতেই প্রকাশিত হইতে পারে না। লোক-সাহিত্যের প্রেমের গানে এই উদ্দাম সারল্য ব্যক্ত হইবার একটা যেন বিশেষ সুযোগ পায়। তন্নুতট উছলাইয়া-পড়া রূপসী কন্যার রূপ প্রেমিকের মন ভুলাইয়াছে, প্রেমিক তাহার সেই উদ্দাম প্রেমকে আদিম ভঙ্গিতেই সরল ও অকপট ভাষায় ব্যক্ত করে,—

যদি কইন্যার নাগাল পাও
দুই গালের মুই চুমা খাও,
মনের আগুন জল দিয়া নিভাও।—সং-১৮০

CENTRAL LIBRARY

প্রেমের মধ্যে দৈহিক কামনার যে অরূপ আগ্নেয় উত্তাপ আছে, উহার সকল নিষ্ঠার মধ্যেও কামনার অপ্রতিরোধ্য যে এক দহনময় আকর্ষণ আছে, তাহা যেন এইখানে তীব্র অনুভূতির স্থূল-নিবিড়রূপে ধরা পড়িয়াছে। এই প্রাণ-প্রচুর লোকসমাজের প্রেমের প্রকাশভঙ্গিও অনুরূপ,—

পান্তাভাতত্ শিদল-শানা
যেমন সোয়াদ নাগে ;
বিয়াও যদি চাইস্ করিবা'
চেঙ্ড়ী ওইনং নাগে ॥—সং ১৮১

এক 'মন-মুহনী' কন্যার রূপ প্রেমিককে দোলা দিয়াছে,—কিন্তু নায়িকার পক্ষ হইতে কোনো সাড়া নাই। কন্যা পুরুষকে দেখিয়া 'ঝকলায় গাও'। তাই পুরুষ বলে, 'ওই ধিক্কারে মুই ভাত না খাওঁ' (সং ১৮৪)।

তারপর একদিন কন্যার নাগাল পাইয়া প্রেমিক-পুরুষ বলে, 'ও মোর মন সোদায় ঝুরেছে গে তোক দেখিয়া'। শুধু তাই নয়,—

দেখিয়া সুন্দরী তোক
প্যাটোত্ মোক না নাগে ভোক ;
চোপরাতি নিন্ না ধরে মোক।— সং ১৮৫ ক

এবং পরিশেষে ইহাও স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে,—তাহার সহিত বিবাহ না হইলে 'তোর শোগে মরিয়া যাইম্ নুই জলে ঝাম্পো দিয়া'। এই চেঙ্ড়ীর প্রেমের জন্যই তাহার 'পাপের চক্ষে নাইগে নিন্' এবং সেই জন্যই এই 'চেঙ্গড়ীর গালাত্ অহিবা' মনাছে চন্দ্রহার হয়া' (সং ১৮৫ গ)।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত মিলনের মধ্যে এই প্রেম পূর্ণতা পাইল না। এই কন্যার জন্যই প্রেমিক পিতামাতা ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল, আজ কন্যাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কন্যার 'পিরিতি'-ও বিচিত্র—

তোর পিরিতির এমনি রে ময়হা
ছাড়িতে না যায় রে ছাড়া।—১৮৭ খ

এই পিরিতি বাহিরে সরল, ভিতরে গরল ; প্রারম্ভ সুখময়, কিন্তু প্রান্ত জ্বালাময়—

সরল জানিয়া গরল খাইনু
শরীল হইল্ মোর কালা ;
গে সুন্দরী,
তোর পিরতির এতয় জ্বালা ॥—সং ১৮৩

এই প্রেমিকার জন্যই প্রেমিকের 'মনটা পাগেলা হইছে' এবং 'মনটাত্ সুখ-শান্তিয়ে নাই' (সং ১৮৭ গ)। প্রেমিকের মনের বেদনা প্রেমিকা বুঝিতে পারে নাই, সেই অভিমানে আপন মনে 'ও মুই বসিয়া বাজাওঁ মনের বেনা' (সং ১৮৭ ঘ)। প্রেমিকার বিরহে—

আজি শূন্য হইল্ মোর
এ ঘর-বাড়ী ;
তোর বাদে হনু মুই দেশান্তরী ॥ –সং ১৮৭ ঙ

প্রেমের গানের মধ্যে রূপ-বর্ণনা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। কেশবতী কন্যার বর্ণনা : 'চুলি দিয়া ঢাকা গেইসে কইন্যার পাছিলা' (সং ১৭৮)। 'চেঙ্গড়ী মাইয়ার হাসি যেমন কাকাতুয়ার আও' (সং ১৮১)। কিংবা,

চেঙ্ড়ীর হাসি রে ওরে জীবন
ভাত-আন্ধা গুণের নাথা
দেয় দেওয়ার চিল্‌কন ॥—সং ১৮৫ গ।

এই 'চেঙ্গড়ীর' 'আতুল-তুল নরমের গাও' (সং ১৮৫গ)। ইহার 'উঁচল খপা', 'যৌবন মোটা', 'কমর সরু' এবং 'ভোগধান-ভোগধান মাই গে বাসায় গা' (সং ১৮৫খ)।

অবিবাহিত পুরুষের প্রেমের গানের মধ্যে যেমন কতকগুলি গান পাই যাহাতে বিরহ-বেদনাই কেবল ফুটিয়াছে,—তেমনি, প্রেম নিবেদন করিয়া গীত অনেক গানের মধ্যেও দেখি, প্রেমিকাকে সরাসরি বিবাহ-প্রস্তাব করা হইতেছে। বিবাহ-প্রস্তাব করিবার ভঙ্গিটি বড়ো সরল, বড়ো স্পষ্ট,—কোনো প্রকার আবরণ দিয়া বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, ইহাই বিশেষত্ব।

১৮৫ঘ এবং ১৮৬-সংখ্যক গান দুইটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এখানে স্পষ্ট করিয়া

বলা হইতেছে, 'তোরো নাইরো শিরের সোয়ামী, মোরো নাইরো দোসর'। অতএব আমাকে বিবাহ কর, কেননা 'সোয়ামী বিনা তোর মিছা বর্তনা (বাঁচিয়া থাকা)' (সং ১৮৫ঘ)। পরবর্তী গানটিতে এই নিবেদন আরও স্পষ্ট। 'রঙ্গো-রূপ তোর কাঁয় দেখিবে, তোর কলাত্ সোয়ামী নাই'। কাজেই, পোড়াকাঠের মতোই তুই শয্যার উপর পড়িয়া থাকিবি,—'এখেলায় থাকিয়া নবো ছোবা খুটাটা' (সং ১৮৬)।

১৮৮ ও ১৮৮ক সংখ্যক গানে রাজবংশী সমাজের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ইহাতে বউদির প্রতি অবিবাহিত দেবরের প্রেম নিবেদিত হইয়াছে। 'মন মোর ছতকার হছে ভোজী (বউদি) তোক দেখিয়া।' অর্থসঙ্গতিহীন অধিক বয়স্ক পুরুষকে কেহ মেয়ে দিতে চায় নাই, পণের টাকা জোগাড় করিবার মতো সঙ্গতিও তাহার নাই: 'কাঁহোয় না দে গে বেটী গরীব দেখিয়া' (সং ১৮৮)। সে তখন বউদির প্রতি আসক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'মদনকাম' গুচ্ছের ১৩০-সংখ্যক গানটি দ্রষ্টব্য।

॥ ৫ ॥

অবিবাহিত পুরুষের মতো অবিবাহিতা নারীও বিলম্বিত-বিবাহের জন্য খেদ ও আক্ষেপ করিয়াছে। অর্থনৈতিক কারণে পুরুষের বিবাহ না হইলে, পুরুষ যেখানে নৈরাশ্যে নীরব ও হতাশায় ম্লান হইয়াছে, একই কারণে নারী সেখানে উষ্মায় অধীর এবং গঞ্জনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য অবিবাহিতা নারীর প্রেম-গীতির মধ্যে বিবাহেচ্ছা স্পষ্টতর ও তীব্রতর স্বরে ধ্বনিত হইয়াছে।

কিন্তু বিবাহের জন্য এই খেদ-আক্ষেপ, উষ্মা ও গঞ্জনা প্রকাশের ফলে অনূঢ়া নারীর প্রেমের গানে একটি বৈশিষ্ট্যও আসিয়া গিয়াছে। তাহা হইল,—অবিবাহিত পুরুষের প্রেমের গানের মধ্যে বিবাহেচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রেমের' স্বরূপ ও উহার অন্তর্নিহিত জ্বালাময় বিচিত্র সত্তা আলোচনা করিবার যে একটি ক্ষীণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়, অবিবাহিতা নারীর প্রেমের গানে তাহা একরূপ অনুপস্থিত।

তারপর, পুরুষ-কর্তৃক নারীর রূপ বর্ণনা পাওয়া গেলেও, নারী-কর্তৃক পুরুষের রূপ বর্ণনা মিলে নাই।

CENTRAL LIBRARY

নারীর প্রেমের গানের অপর এক বিশেষত্ব হইল—প্রেমিককে বিচিত্র বিশেষণে সম্বোধন করিবার প্রবণতা। পুরুষ যখন নারীকে সম্বোধন করিয়াছে, তখন 'কইন্যা', 'চেঙ্গড়ী' ও 'মাই' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে সম্বোধন করে নাই। কিন্তু নারীর সম্বোধন বিচিত্র। যেমন—বন্ধুয়া, বান্ধব, সনার বন্ধুয়া, গুণের বন্ধুয়া, বন্ধুধন, চেঙ্গেড়া, গাবুরা, বাউ, বাপোই, দাদা, ভাই, বাউদিয়া, কালা, চিকণকালা, নাথো, পোরাণের নাথো, প্রাণের সুয়া, অসিয়া (রসিক), বানিয়া, তেওয়ারী, কবিরাজ, পাইকার, পছিমা, সিপাই, ইত্যাদি। নারী পুরুষকে 'কালা', 'চিকণ কালা' বলিয়া সম্বোধন করিলেও, কুত্রাপি পুরুষ কর্তৃক নারী 'রাধা' রূপে সম্বোধিতা হয় নাই।

এইবার অবিবাহিতা নারীর প্রেমের গানগুলির পরিচয় দিতেছি।

১৮৯, ১৯০, ১৯০ক, ১৯০খ, ১৯০গ, ১৯১, ১৯১ক, ও ১৯২-সংখ্যক গানগুলিতে অনূঢ়া নারীর যৌবন-বেদনা এবং বিবাহ না হইবার করুণ খেদ ও আক্ষেপ প্রকাশিত হইয়াছে। কন্যার যৌবন আসিয়া গিয়াছে, আয়নায় প্রতিফলিত নিজের যৌবন দেখিয়া তাহার মনে হয়,—তাহার এইবার জননী হইবার সময় হইয়াছে, তাহার চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ অনেকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিবাহ হইল না (সং ১৮৯)। শাঁখাওয়ালাকে রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতে দেখিলে তাহার শাঁখা পরিবার সাধ জাগে (সং ১৯০ক)। কলাগাছের মতো তাহার যৌবন প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু পিতা বিবাহ দিতেছে না, এদিকে 'যৌবন ঢুলে মোর পুবাল বাতাসে' (সং ১৯০খ)। তাই 'ঘর-যুবতী নারী কান্দে খাট-পালঙ্কে শুইয়া' (সং ১৯০গ)। কন্যা নিজে বুঝিতেছে, সে পূর্ণ যৌবনা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু 'মাও কয় ছোটো, ছোটো!' (সং ১৯১)। এদিকে 'গাবুর কাল মোর যাছে রে গড়েয়া, জলেছে মনেরে গুণ্ডন, কাঁয় আর বুঝিবে' (সং ১৯১ক)। কন্যার এই ব্যথা তাহার পিতা বুঝে না : 'নিরাশীর বাপ বুঝে না, ওরে বিভাও তো হামাক দেয়-কে না' (সং ১৯২)। এই সমস্ত গানগুলিতে বিবাহ না হইবার জন্য কন্যার অধীরতা, আক্ষেপ, অভিযোগ লক্ষ করা যায়।

কতকগুলি গানে প্রেমিকার গৃহে প্রেমিকের আগমন প্রসঙ্গ এবং প্রেমিকের আগমন হেতু প্রেমিকার মনে প্রত্যাশা ও প্রেমিককে অভ্যর্থনা ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। এই ধরণের গানগুলিতে খাঁটি মেয়েলিপনার সুন্দর ছাপ

আছে। পুরুষের ও নারীর প্রেম প্রকাশের রীতির পার্থক্যও এই সকল গান হইতে বোঝা যাইবে।

১৯৩ক, ১৯৩খ, ১৯৭ ও ১৯৭ক-সংখ্যক গানগুলি দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে। প্রেমিকের আগমন-প্রত্যাশায় প্রেমিকা অপেক্ষা করিতেছে: 'আসিবা' চাইছে সনার বন্ধু ওই না কদমতলে', কিন্তু 'মোর বন্ধু এলাও নাইসে'। তাই 'আজি মনের হাউসে বান্ধিনু খঁপা, আউলাইল্ বাতাসে' (সং ১৯৩ক)। প্রেমিকার মনের চাঞ্চল্য ও প্রত্যাশা-কম্পিত হৃদয়ের বস্তুগত প্রতীক যেন তাহার ওই আলুলায়িত কুন্তলরাশি।

পরবর্তী গানটিতে প্রেমিকার এই ব্যর্থ প্রতীক্ষার মৃদু-অভিযোগ প্রেমিকের প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। 'বারি ধানের' খই, নতুন হাঁড়ীর দই এবং 'মাল-ভোগ' কলা প্রেমিককে খাওয়াইতে না পারিবার মেয়েলি দুঃখ মনোরম ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে (সং ১৯৩খ)। ১৯৭ ও ১৯৭ক-সংখ্যক গানে দেখি,—প্রেমিক প্রেমিকার গৃহে উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রেমিকা তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। 'মোর বন্ধুয়া নাই খায় ভাত, কোন্‌ঠে পাইম্ মুই মাগুর মাছ' (সং ১৯৭ক)।—এই উক্তির মধ্যে প্রেমিকার আন্তরিকতার প্রকাশ আছে। খাদ্যদ্রব্য দিয়া প্রেমিককে অভ্যর্থনা করা ও প্রেম প্রকাশের মধ্যে লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় আছে।

১৯৪ ও ১৯৬-সংখ্যক গানে প্রেমিকা তাহার প্রেম নিবেদন করিতেছে। প্রেমিক গোরু চরাইতে যাইতেছে, প্রেমিকা তাহাকে ইশারা করে নিকটে আসিবার জন্য, কিন্তু প্রেমিক আসে না। প্রেমিকা বলে,—'মোর নারীর দুঃখের কাথা ও মুই কাক্ কহিম্ খুলিয়া' (সং ১৯৪)। দূরের প্রেমিকের প্রতি বার্তা প্রেরণ করিবার কেহ নাই, প্রেমিকা গায়,—

কাকাতুয়া, বলোঁ তোক
ঠোঁটে করি' গুয়া তুই
নিয়া যা প্রাণ-বন্ধুয়ার দ্যাশে॥—সং ১৯৬।

প্রেমিকার বিরহ প্রকাশিত হইয়াছে, ১৯৩গ, ২০১, ২০৩ ও ২০৪-সংখ্যক গানে। ১৯৩গ-সংখ্যক গানটি ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু ইহার মতো সুন্দর গান বেশি মিলে নাই। তিস্তার বন্যায় পলি পড়িয়া উহার তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কাশফুল ফোটায়,—তেমনি প্রেমিকার তপ্তমনে প্রেমিক জোয়ার

আনিয়া প্রেম ফোটাইয়াছিল, আজ সেই প্রেমিক নাই। ২০২-সংখ্যক গানে আসন্ন-বিচ্ছেদ-কাতরা প্রেমিকার প্রেমের প্রকাশ হইয়াছে। বিচ্ছেদের দিনেও প্রেমিকা প্রেমিকের সান্নিধ্য পাইতে চায় : 'কমো কাথা নিরলে হে বসিয়া'।

বন্ধু, তুই যেই দিনা থাকিবো বনে
মহো কান্দিম্ ঘরের রে কোণে ;—সং ২০২

পরের গানটির বক্তব্য হইল, 'আজি তিন দিন হাতে বন্ধুয়ার নাই হয় দেখা'। এই জন্য প্রেমিকা উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ২০৪-সংখ্যক গানে প্রেমিকার বিরহজ্বালা প্রকাশিত হইয়াছে। দুয়ারের সম্মুখস্থ নতুন দীঘিটার বালি চকচক করিতেছে, কিন্তু তাহার মনে আনন্দ নাই, কারণ তাহার 'বন্ধু' আজ নিকটে নাই। এই চক-চকে বালুকারাশি যেন প্রেমিকার মিলন-মধুর মনের খুশির বস্তুগত প্রতীক।

১৯৮ ও ১৯৮ক-সংখ্যক গানে প্রেমের প্রকাশ নাই,—কন্যা এখানে একান্ত ভাবেই বাস্তব জগতের কথা তুলিয়াছে। প্রেমিকা তাহার প্রেমিককে বলে, তুমি আর আমার সহিত দেখা করিয়ো না, কেননা তাহাতে আমার নিন্দা হয়। আমাকে বিবাহ করিয়া তবে আমার সহিত প্রেম করিয়ো (সং ১৯৮)। পরবর্তী গানটিতে এই ভাবটি কঠোরতর ভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে,

তিনশও টাকা পণ দিয়া
বিয়াও করেক দাদা আসিয়া।
সেলা কহিমো দাদা দুঃখের কাথা ॥—সং ১৯৮ক

এইখানে প্রেমিকার যে পরিচয় পাই, তাহার ঠিক বিপরীত পরিচয় মিলে ২০০ ও ২০০ক-সংখ্যক গান দুইটি হইতে। কামাতুরা নারী এইখানে নির্লজ্জার মতো আপনার দেহ-যৌবন প্রেমিকের নিকট নিবেদন করিতেছে,—

যদি যৌবন খাইতে চাও
দুয়ারের আগত্, বন্ধু পাটা বও ;
পাটাশাক তুলিতে তুলিতে
যৌবন করিমো দান ॥— সং ২০০ক

॥ ৬ ॥

গার্হস্থ্য-জীবনের প্রেমের গানগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইল, দৈনন্দিন জীবনে একটি চাষী-দম্পতি যেরূপভাবে দিন কাটায়, ঠিক তাহারই কঠিন পরিচয় গানগুলির মধ্যে পাই ; গান বলিয়া তাহাদের ঝগড়া-ঝাঁটি, প্রহার-কলহের মধ্যে কোনোরূপ কাব্যিক সূক্ষ্মতা আরোপ করা হয় নাই। স্ত্রীকে প্রহার অথবা তাহাকে শ্যালিকারূপে সম্বোধন (ইহা 'sorrovate'-প্রথার ফল হইতে পারে) কিংবা হলকর্ষণরত স্বামীর জন্য স্ত্রী-কর্তৃক তাহার খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া—ইহাই এইসকল গানের মধ্যে পাই। এখানে 'প্রেম' বা 'মিলন' বলিতে সাধারণভাবে যাহা বুঝি, তাহার প্রকাশ নাই।

২০৫-সংখ্যক গানে রূপসী অথচ কানে কম-শোনা এক বধূর কাহিনী পাই। তাহার স্বামী খাইতে চাহিয়াছিল ভাজা চাউলের গুঁড়া (চাউল ভাজিয়া তাহা গুঁড়া করিয়া জলপান হিসাবে খাওয়া রাজবংশী সমাজের বিশেষত্ব), কিন্তু সে 'আনিয়া দিলেক ধান'! তাই রূপসী বধূর স্বামী খেদ করিতেছে : 'কেইনং বিয়াও দিলে দাদা রে'!

ছোটো শোল মাছের সহিত আলু দিয়া তরকারি রাঁধিবার জন্য স্বামী বলিয়াছিল, স্ত্রী বলে,—ইহাতে তাহার দেরি হইবে। ক্রুদ্ধ স্বামীর উত্তর : 'দেরী হলে ওগে শালী চরু (উরু) কাটাইম্ তোর' (সং ২০৬)।

কৃষিকর্মরত স্বামীর জন্য স্ত্রী তাঁহার দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য লইয়া আসিতে দেরি করিয়াছিল, স্বামীর নিকট তাহার কারণ হিসাবে বলে, সকালে উঠিয়া উঠোন ঝাঁট দিলাম, ধান ভানিলাম, তারপরও একা আসি নাই, পিঠে ছেলেটাকেও আনিতে হইয়াছে, দেরি তো হইবেই, 'তুই কি না বুঝিস্ হালুয়া রে একলা বাড়ীর কাম' (সং ২০৭)। পরের গানটিতে এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আছে। স্ত্রী বলে তোমার জন্য যে চিঁড়া কুটিয়াছিলাম, ছেলেরাই তাহা সবটা খাইয়া ফেলিয়াছে। তুমি তাই চাউল ভাজা দিয়াই জল খাও (সং ২০৭ ক)।

আশ্বিন ও কার্তিক মাস দুইটি কৃষকের নিকট বড়োই দুঃখের। এই সময় আউশ ধান শেষ হইয়া যায় এবং আমন ধান উঠে না। এই দুঃখের কথা বর্ণিত হইয়াছে ২০৮-সংখ্যক গানে। স্ত্রী বলে, ওগো স্বামী, তুমি ব্যবসা কর, আমি ধান ভানি : 'আশ্বিন-কাত্তিক দুইখান মাস, রে স্বামী, কাটিমো আকাল'

CENTRAL LIBRARY

(সং ২০৮)। ২১০-সংখ্যক গানে গার্হস্থ্য-জীবনের নিতান্ত স্থূল দিক—তেল-হুন-লকড়ির কথা বলা হইয়াছে।

২০৯-সংখ্যক গানটির মধ্যে সধবা নারীর জীবনের একটি স্নিগ্ধ ব্যথার মনোরম প্রকাশ ঘটিয়াছে। স্বামী রাত-দিন পাটের ব্যবসা করিয়া দাম্পত্য জীবনেও ব্যবসাদার হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীর সহিত দুদণ্ড কথা-বার্তা বলিবার সময়ও সে পায় না। স্ত্রী তখন মৃদু ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে কহিতেছে, অমন ব্যবসা মেয়ে মানুষ হইয়া আমিও করিতে পারি, কি করিয়া পাট ওজন করিতে হয় আমাকে তাহা শিখাইয়া দাও (সং ২০৯)।

শ্বশুর-শাশুড়ী ও ননদিনীর সহিত বধূর সম্পর্ক লইয়া ২১১-সংখ্যক গানটি রচিত হইয়াছে। বধূর নিকট শ্বশুরের বচন 'মৈষেরো হাঁকনের' মতো, শাশুড়ীর বচন 'ইচিলা মাছের চট্‌কা'-র মতো, সতিনীর ও ননদিনীর বচন শিঙ্গি ও ট্যাংরা মাছের কামড়ের মতো মনে হয়। কিন্তু, 'সোয়ামীর বচন' 'লাগজুড়ি পারোর (পারাবতের) ব্যামন' (সং ২১১)॥

॥ ৭ ॥

জায়া-পতির জীবনের সুখ-দুঃখের ও ঘরকন্নার সাধারণ কাহিনী মৃতদার পুরুষের দুঃখ-করুণ স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়া উজ্জ্বলতর হইয়াছে। বস্তুত, 'বিপত্নীকের ব্যথা' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের এক সুন্দর নিদর্শন মিলে।

বিপত্নীকের এই ব্যথা স্পষ্ট দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার এক ধারায় রহিয়াছে,—মৃত পত্নীর প্রেম ও কর্মনৈপুণ্যকে স্মরণ করিয়া স্মৃতি-চারণ। অপর ধারায় রহিয়াছে,—পত্নীর মৃত্যুতে পুরুষের দৈহিক অসুবিধার উল্লেখ এবং আর একটি বিবাহ করিবার ইচ্ছা। সমগ্র ভাবে দুই ধারার গান মিলাইয়া লইলে বুঝিতে পারি,—এখানে দাম্পত্য-প্রেমকে যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তেমনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহণের ইচ্ছাটিকে লুকাইয়া রাখিয়া দেহ-মনকে ফাঁকি দিবারও চেষ্টা করা হয় নাই।

এইখানেই লোক-সঙ্গীতরূপে ইহাদের বিশেষত্ব। জীবনকে স্থূল ও স্পষ্টরূপে দেখিবার, পাইবার ও ভোগ করিবার প্রবণতা ইহাতে প্রবল বলিয়া, কোনো প্রকার বাসনাকেই এখানে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

CENTRAL LIBRARY

শিক্ষিত ভদ্র-সমাজে মৃত পত্নীর বিরহে হয়তো প্রথম ধারার গানগুলি রচিত হইত, কিন্তু দ্বিতীয় ধারার গানগুলি নিশ্চয়ই সেখানে রচিত হইত না।

২১২ক এবং ২১২খ-সংখ্যক গানে মৃত পত্নীর প্রতি প্রেম নিবেদিত হইয়াছে। দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতিও এই সঙ্গে পাই। কর্মিষ্ঠা বধূ নিজের হাতে টাকু ঘুরাইয়া ঝালর দেওয়া কম্বল ('ঝালকের চটি') প্রস্তুত করিয়াছিল, কিন্তু 'ওই চটি উরিবার এলা মানষি রে নাই' (সং ২১২ক)। স্বামী মৃত পত্নীর জন্য তাই খেদ করিতেছে। পত্নীর মৃত্যুতে স্বামীর পড়ে 'চখুর পানি', 'নদীরো ধাদিনার (পাড়ের) মতো ভাঙিয়া পড়ে বুক'। তাহার মনে হয়, আজ মাছ মারিয়া আনিলে, রাঁধিবার কেহ নাই, লাল শাড়ীখানা পরিয়া কেহ আর বাপের বাড়ী যাইতে চায় না (সং ২১২)। মৃত পত্নীর প্রতি স্বামীর প্রেম নিবেদনের অপর নিদর্শনের জন্ম চোর-চূনী পর্যায়ের ৯১-সংখ্যক গানটি দ্রষ্টব্য।

২১২ ও ২১২গ-সংখ্যক গানেও মৃতদার পুরুষের ব্যথা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতিরোমন্থন নাই,—এখানে স্ত্রীর অভাবে স্বামীর দৈহিক অসুবিধার কথাটি উল্লিখিত হইয়াছে এবং আরেকটি স্ত্রী আসিলেই সেই অভাব দূরীভূত হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, তাই বিপত্নীক তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিতেছে পুনরায় বিবাহের সম্বন্ধ করিতে, 'একেলা থাকিয়া (শুইয়া) অভা' না মনায় মোকে'। কারণ, 'জান যাছে মোর মাঘমাসের জাড়ে' (সং ২১২)। ২১২গ-সংখ্যক গানটি উপরিউক্ত দুই ধারার বিচিত্র সমন্বয়। ইহার প্রথমাংশে মৃত স্ত্রীর স্মৃতি সন্তোষজনক আন্তরিকতায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্নীর মৃত্যুতে বিপত্নীক 'পাগেলা' হইয়াছে, ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া উদাসী হইয়াছে। কিন্তু, যেহেতু গরমের দিনে পাশে শুইয়া বাতাস করিবার এবং শীতের দিনে 'শেযা গরম' করিবার কেহ নাই, সেই হেতু কোনো কুমারী না পাইলেও, বিধবা বিবাহ করিতেও তাহার অনিচ্ছা নাই। মার্জিত মানুষের মন লইয়া গানটির রস বিচার করিতে বসিলে স্বতই মনে হইবে, ইহাতে বুঝি রস-ভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু লোক-মানসের স্বরূপ যিনি বুঝিয়াছেন, তাহার নিকট একই গানের মধ্যে দুই প্রকার মনোভাবের প্রকাশ মোটেই রসভঙ্গের কারণ বলিয়া মনে হইবে না॥

॥ ৮ ॥

'সধবা ও বিধবা' পর্যায়ের গানগুলিতে সধবা ও বিধবা নারীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। সধবার জীবন স্বামীর দৈহিক, মানসিক, আর্থিক এবং পারিবারিক অবস্থা ও সংস্কারের সহিত বিজড়িত,—কয়েকটি গানে তাহার পরিচয় পাই।

২১৩, ২১৩ক, ২১৩খ এবং ২১৪-সংখ্যক গানগুলিতে স্বামীর দৈহিক বিশেষত্ব স্ত্রীর মনে কিরূপ ক্রিয়া করিয়াছে, তাহার আলোচনা আছে। অর্থগৃধ্নু পিতা নাবালক পুরুষের সহিত যুবতী কন্যার বিবাহ দিয়াছে, যৌবন-জ্বালায় পীড়িতা সধবা তাই ব্যঙ্গ করিয়া বলে,—

বাপে-মাওক কয়া পেঠাও
কিনিয়া দিবে গাই।
দুধো খায়া মানুষি হউক
নাবালক জামাই ॥—সং ২১৩

অর্থলোভে কখনো পিতা বৃদ্ধ পুরুষের হাতে কন্যার বিবাহ দিলে সে তখন অভিযোগ ও উষ্মা প্রকাশ করিয়া থাকে। পিতা যে মুখ দিয়া কন্যাপণের টাকা খাইয়াছে, তাহার সেই মুখে কন্যা ঝাঁটা মারিতে চায়। বৃদ্ধ স্বামীর স্ত্রী বলিয়া বয়সে যুবতী সধবা নারীও সম্পর্কের জোরে রাতারাতি পরিবারের সকলের জ্যেঠিমা-খুড়িমা-ঠাকুরমা হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার ব্যথা 'নদারী (নববধূ) কবার গে মানুষি নাই'। এই বুড়া স্বামীর দাঁত নাই, সর্বদা তাহার জন্য হামান-দিস্তায় পান ছেঁচিতে হয়। পিতার নিকট কন্যার অভিযোগ,—'গুয়া ভুকাইতে (ছেঁচিতে) কি যাবে জান'? (সং ২১৩ক)। সধবা নারী তাই বলে,—'মোর নারীটার মন ঝুরেছে বুড়া ভাতার পায়া' (সং ২১৩খ)। পরবর্তী গানটি আরো মর্মান্তিক। কন্যার স্বামী যৌন-ক্ষমতাহীন (impotent), খেদ করিয়া তাই সধবা নারী গায়, 'জোহিলা-পড়া (রুগ্ন অর্থে) সোয়ামীটা মোর মনতে খায় না।'

এই সমস্ত গানগুলির মধ্য দিয়া লোক-মানসের যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা হইল, জীবনের অন্ধকার দিকগুলিকেও লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা এখানে একেবারেই নাই। অত্যন্ত সরল বিশ্বাসে স্পষ্ট-ভঙ্গিতে সধবা নারী বৃদ্ধ স্বামীর জন্য খেদ করিয়াছে, স্বামী যে যৌন-ক্ষমতাহীন

CENTRAL LIBRARY

তাহা ঘোষণা করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। এই বিশিষ্ট মানসের প্রকাশের মধ্যেই গানগুলি খাঁটি লোক-সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছে।

পরবর্তী গান দুইটিতে স্বামীর চারিত্রিক ও মানসিক বিশেষত্ব সধবার দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। স্বামী তাহার জনৈকা বিধবা রমণীর প্রণয়াসক্ত বলিয়া সধবা নারী একদিকে যেমন স্বাভাবিক কারণে ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি স্বামীকে 'মাইয়ার কাঙাল' বলিয়া ধিক্কার দিতেও পশ্চাদপদ হয় নাই। অপর নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া স্বামী দুর্বল যুক্তির বলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য সধবা তখন যুক্তি দেখায়—

গুয়া খায়া সোয়ামী
ফেলাইসেন খোসা ;
অগাতুর কালে (বৃদ্ধ বয়সে) তোমার
কিসের গসা॥

স্বামীর পারিবারিক অবস্থা ও সংস্কার সধবা নারীর জীবনকে কিভাবে বিপর্যস্ত ও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে,—তাহার পরিচয়ও পাই। 'সাত-সতো-নীর' জ্বালায় সধবা নারীর জীবন জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে,

সোতোনীরো আছে কাঁটা
দিলেক আজি মোক দারুণ খোঁটা ;
বিষে মোর ডংশিয়া নিলে দেহা॥

এমন ঘরে বিবাহ দিবার জন্য নারী তাই পিতা-মাতার উপর অভিমান করিয়া পিত্রালয়েও যাইতে চাহে না। পরবর্তী গানটিতে দেখি, গর্ভবতী সধবা পিত্রালয়ে যাইতে চাহিতেছে। কিন্তু, স্বামীর পরিবারের সংস্কার এই, পিত্রালয়ে গিয়া সন্তান প্রসব করিলে সেই সন্তান বাঁচে না। শেষ পর্যন্ত কন্যা কিন্তু একরকম জোর করিয়াই পিত্রালয়ে চলিল। যাইবার সময় স্বামীকে বলিতেছে,—চাউল ঝাড়িয়া লাউয়ের খোলে রাখিয়া গেলাম, কলসী রাখিয়া গেলাম, জল খাইয়ো। বাক্সে গুয়া-পান এবং শিকার উপর 'জলপান' রহিল। চৌকাঠের মাথায় চাবির গোছা রাখিয়া গেলাম॥

CENTRAL LIBRARY

॥ ৯ ॥

বিপত্নীক পুরুষ যেমন মৃত পত্নীর প্রতি প্রেম নিবেদন এবং পুনরায় বিবাহের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে,—বিধবা রমণীও তেমনি একদিকে স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছে যেমন, অপরদিকে তেমনি পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিবার বাসনাও পোষণ করিয়াছে। বিপত্নীক ও বিধবার প্রেম সমান আন্তরিকতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

২১৭ক ও ২১৭খ সংখ্যক গানে স্বামীর জন্য বিধবার প্রেম ও আকুলতা ব্যক্ত হইয়াছে। বিবাহের অত্যন্ত অল্প দিন পরেই স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, শূন্য শয্যায় 'চোখুর জলে বিছানাখান যাছে ভিজিয়া' (সং ২১৭ক)। বিধবার মনে হয়, 'যদি সোয়ামীর নাগাল পাও, এলায় ওইঠে মুই চলিয়া যাও' (সং ২১৭খ)। নিজের ও পিতৃহীন পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব বিধবাকে কিরূপ বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, ২১৯-সংখ্যক গানে তাহার পরিচয় আছে। রূপসী বিধবার জীবন পর-পুরুষের নজরে পড়িয়াও অনেক সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। 'চিঠুর ব'সে (অল্প বয়সে) আড়ী হয়, পাড়ার চেঙ্গেড়ার চখুত্ পয়' (সং ২১৭)— এই উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

২১৮, ২২০ ও ২২১-সংখ্যক গানে পর-পুরুষের সহিত বিধবার প্রণয়ের কাহিনী মিলে। ইহার একটিতে নদীতে স্নান করিতে যাইয়া জনৈক পুরুষের সহিত বিধবার প্রেম ; অপরটিতে একটি 'বানিয়া'-র সহিত বিধবার প্রণয়ের কথা চিত্রিত হইয়াছে।

২২২-সংখ্যক গানে দেখা যায়, বিধবা 'উপপতি' গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই উপপতিকে উপযুক্ত সেবাযত্ন করিতেছে না বলিয়া তিরস্কৃত হইতেছে॥

॥ ১০ ॥

এইবার 'পরকীয়া' গুচ্ছের গানগুলির কথা আলোচিত হইবে। 'পরকীয়া' শব্দটির সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের মনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে। আলোচ্য 'পরকীয়া' প্রেম-গীতিগুলি নিতান্তই লৌকিক প্রেমের গান, বৈষ্ণব পদাবলীর উচ্চ দার্শনিকতা বা তত্ত্বাদর্শ এই গানগুলির উৎসমুখে থাকিয়া ক্রিয়াশীল হয় নাই। অন্য কোনো অভিধা না পাইয়াই 'পরকীয়া' নামটি বর্তমান ক্ষেত্রে গৃহীত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীতে পরকীয়া-প্রেমের এই প্রতিফলন কতটা প্রেমের নিজস্ব অপ্রতিরোধ্য গতির দরুণ এবং কতটা সংশ্লিষ্ট সমাজে নারীর একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা চালু থাকিবার জন্য,—তাহা একটা বিচার্য বিষয় বটে। ভালো করিয়া গানগুলি লক্ষ করিলে বুঝি, আলোচ্য পরকীয়া প্রেম-গীতিগুলির ভাব-উৎস ও আন্তর প্রেরণারূপে সামাজিক রীতিই কার্যকরী হইয়াছে।

পরকীয়া প্রেম-গীতিগুলির মধ্যে সধবা ও বিধবা নারীর অবৈধ প্রণয়-কথা চিত্রিত হইয়াছে। এই অবৈধ প্রণয়লীলা একদিকে স্বামী ব্যতিরেকে পরিবারস্থ অন্যান্য পুরুষের (যেমন, দেবর, ভাশুর) সহিত এবং অপর দিকে পরিবার-বহির্ভূত পুরুষের সহিত সংঘটিত হইয়াছে।

২২৪ ও ২২৫-সংখ্যক গান দুইটিতে দেবরের সহিত সধবার প্রণয়-কথা পাই। ইহার মধ্যে ২২৫-সংখ্যক গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কি ইহার রচনারীতির দিক হইতে, কি ইহার বিষয়বস্তুর দিক হইতে। এই গানে সধবা নারী নিজের মুখেই বলিতেছে, যৌবনকালে সে বহু 'পাইকারের' ও সাহেবের শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছে। এখন অবশ্য দেবরকে তাহার খোঁপা, কণ্ঠহার, বক্ষ ইত্যাদিতে হাত দিতে বারণ করিতেছে, কারণ, 'তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে, তোক দেওয়াক দিবে বনবাসে'। গানটিতে দেবরকে নিজদেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইতেছে বটে, কিন্তু উহার অন্তর্নিহিত অর্থ হইল,—দেবর সেই সকল স্থান স্পর্শ করিতেছে। ২২৬-সংখ্যক গানে জামাই-শাশুড়ীর প্রণয় কাহিনী এমন সারল্য লইয়া বলা হইয়াছে যে, মার্জিত মানুষের নিকট যে প্রেম জঘন্য বলিয়া বিবেচিত হইত, লোক-মানসের বিচিত্র দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে অন্তত সাময়িকভাবে তাহা মনে হইবে না।

পরিবার-বহির্ভূত অন্য পুরুষের সহিত সধবা নারীর প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে কয়েকটি গানে। সংখ্যাতে এইগুলিই অধিক। সাহিত্যিক মূল্য, প্রেমের আকর্ষণ এবং প্রকাশভঙ্গির আন্তরিকতাও এইগুলির মধ্যে খানিকটা আছে।

২২৩-সংখ্যক গানে পর-পুরুষের প্রেমের আকর্ষণকে স্মরণ করিয়া সধবা নারী গাহে, 'ঘরতে না অহিতে দিলো কুলবধূ নারী'। অবৈধ প্রণয়ীকে গৃহে আমন্ত্রণ জানাইবার সময় বলে, সে যেন খুবই সন্তর্পণে তাহার গৃহে আসে,

CENTRAL LIBRARY

বাড়ীর কুকুরটি যেন টের না পায় (সং ২২৮)। পরবর্তী গানে স্বামী-সন্তানবতী নারীর গৃহে অবৈধ প্রেমিকের আগমন ঘটিয়াছে। প্রেমিকা তাহার সন্তানকে উদ্দেশ করিয়া বলে, 'ও তোর বাপো নিন্দাইসে (ঘুমাইয়াছে) রে ছাওয়া, তুইও নিন্ যা রে'। এদিকে প্রেমিক আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছে, বাহিরে তখন বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রেমিকার উক্তি,—'ঘরের পাছত্ মানার (মানকচুর) থোপ, মাথাত্ কাটিয়া দাও'। তারপর ছেলে ঘুমাইল, প্রেমিক ঘরে আসিল। প্রেমিকা বলে, 'আজি ডাইন বগলে (দিকে) ছাওয়া তুইটা, বন্ধুধন, বাঁও বগলে বইসো'।

পর-পুরুষের সহিত রাত্রি যাপন করিবার পর নারীর মনে কলঙ্ক-ভয় জাগিয়া উঠিল, ভোর হইবার পূর্বেই তাহাকে চলিয়া যাইবার জন্য সভয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে,—

আজি গাও তুলো, গাও তুলো, রে প্রাণোনাথ,
উঠিয়া যাও বাড়ী ;
আইত্ পোহালে বলিবে হামাক
কোলঙ্কিনী নারী।

বিরহিণী প্রেমিকার বিরহ-জ্বালার কথাও বলা হইয়াছে। একটি গানে পাই প্রেমিকার ব্যর্থ-প্রতীক্ষার ব্যথা। অঙ্গন ঝাড়ু দিবার সময় প্রেমিকার মনে পড়ে, এই ঝাড়ু প্রেমিক পুরুষই তৈরি করিয়া দিয়াছিল। প্রেমিক আসিবে বলিয়া 'ও মুই দুয়ারে নাই দেওঁ কাঠি', তাহার জন্য নতুন হাঁড়ীতে দই পাতা হইল, কিন্তু 'আজি ঘটির দই ঘটিত্ অহিল্, বন্ধুধন মোর কই' (সং ২৩২)। প্রেমিক পুরুষ 'দিনা চারিক পিরিত করিয়া' কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রেমিকা গায়,

তোমার বাড়ী হামার বাড়ী
মইধ্যে হিরাল নদী।
পাংখা নাইতে উড়িয়া যামো বন্ধু রে,
ও পাংখা নাই দেয় বিধি ॥—সং ২৩৩

ব্যভিচারিণী সধবার পর-পুরুষাসক্তি যখন তাহার স্বামীর চোখে ধরা পড়িয়াছে, তখন অভিমানে স্বামী আত্মহত্যা করে নাই, দাম্পত্য-বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা পোষণ করে নাই, কিংবা স্বামী-

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রীর মধ্যে 'শীতল-সমর' শুরু হইয়া যায় নাই ; স্বামী তাহাকে প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিয়া এই আচরণের প্রতিশোধ লইয়াছে। এইখানেই লোক-সমাজ হইতে স্বতোৎসারিত সাহিত্যের বিশেষত্ব লুকানো আছে। গান বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে যাহা ঘটে, তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা নাই ॥

॥ ১১ ॥

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে প্রেমিককে সাধারণত 'বাউদিয়া' নামে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ—উদাসী, আত্মভোলা প্রেমিক। অর্থাবনতি ঘটিয়া 'বাউদিয়া' বিশেষণটি অকর্মণ্য, শৌখীন পুরুষ অর্থে গালি দিবার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হইয়া 'বাউদিয়া' 'বাউধিয়া' রূপেও উচ্চারিত হয়।

এই উদাসী প্রেমিকের উদ্দেশে যে গান গীত হয়, তাহাকেই বলে 'বাউদিয়া গান'। উদাসী প্রেমিকের ঔদাসীন্য যেন এই গানে প্রাণখোলা টানা সুরের মধ্যে রূপ ধরিয়াছে। সুরের দিক দিয়া বিচার করিলে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের প্রেমের গানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইল 'ভাবিয়া গান'। 'ভাবিয়া' 'ভাওয়াইয়া' রূপেও উচ্চারিত হয়।

'ভাওয়াইয়া' শব্দের ব্যাখ্যা শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন এইভাবে করিয়াছেন,

"কৃষকেরা হাল বহনের, ধান্যক্ষেত্র হইতে ঘাস উন্মোচনের ও ধান্য কর্তনের সময়ে দলবদ্ধ হইয়া উচ্চ কণ্ঠে 'ভাওয়াইয়া' গান করিয়া থাকে। 'অবি-কারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া' এই 'ভাব' শব্দ হইতেই বোধ হয় 'ভাওয়াইয়া' শব্দের উৎপত্তি।···ভাওয়াইয়া গানের অধিকাংশই পূর্বরাগ লইয়া রচিত। বোধ করি পূর্বরাগ লইয়াই প্রথমে ভাওয়াইয়া গানের সৃষ্টি হইয়াছে ; সেইজন্য 'ভাব' শব্দের প্রাকৃত 'ভাও'-ও রাজবংশী ভাষায় 'ভাওয়াইয়া' নামে গানের নামকরণ হইয়াছে। পরে যাত্রাগানের মত এই গানে বিরহ প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে"।[১]

'ভাওয়াইয়া' গান সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য এই—

"'ভাওয়াইয়া' উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের নিজস্ব সম্পদ। উদাস হাওয়ার মতো এর সুরের গতি, তাই এর নাম ভাওয়াইয়া।···

১ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫, ২য় সংখ্যা।

CENTRAL LIBRARY

"…উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের বিচার করতে গেলে সকলের আগে উত্তরবঙ্গের মানচিত্রের দিকে আমাদের চাইতে হয়। মাথার উপরে উন্নত বিরাট পাহাড় মেঘের জটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেই ধূসর পাহাড়ের পাদ-দেশে শাল-সেগুনের অরণ্যানী।…উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান এদের নিজস্ব হৃদয়ের সত্যিকারের বাহন।"[২]

উপরে উল্লিখিত দুইটি মতই উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, ভাওয়াইয়া গানের বিষয়ের মধ্যে প্রেম ও বিরহ এবং সুরের মধ্যে সেই প্রেম ও বিরহের উদার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

এই 'ভাওয়াইয়া' ও 'বাউদিয়া' আসলে একই বস্তু। জলপাইগুড়িতে 'ভাওয়াইয়া' শব্দটির প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে 'বাউদিয়া' বিশেষণটিই অধিকতর প্রচলিত। লক্ষ করা দরকার, 'বাউদিয়া' শব্দটির অর্থ ও 'ভাওয়াইয়া' শব্দটির অর্থ উৎপত্তির দিক দিয়া ধরিলে এক। দুইটির মধ্যেই প্রেমের অন্তর্নিহিত 'উদাসী' ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে।

সুরের নক্‌শার দিক হইতে বিচার করিলে তাবৎ লোক-সঙ্গীতের দুইটি মাত্র সুর আছে। একটি দ্রুত লয়ের, অপরটি দীর্ঘ লয়ের। সাধারণত লঘু ব্যাপারগুলিকে দ্রুত লয়ের গানের মধ্যে রূপ দেওয়া হয় (ব্যতিক্রমও আছে), গভীরভাবের ব্যাপারগুলি দীর্ঘ লয়ের মধ্যে ভালোরূপে ফোটে। এই জন্য 'ভাওয়াইয়া' ও 'বাউদিয়া' গানে প্রেমের গভীর দিক, বিশেষত, বিরহ সুন্দররূপে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায়।

সঙ্কলিত 'বাউদিয়া' নামীয় গানগুলিই কেবল 'বাউদিয়া গান' নয়। এই সঙ্কলনের অন্যান্য গুচ্ছের অনেক গানও বাউদিয়া গানরূপে গীত হইয়া থাকে। আমরা সুরের দিক দিয়া বিচার না করিয়া, 'বিষয়ের' দিক দিয়া গানগুলি সাজাইয়াছি। 'বাউদিয়া' বিশেষণটির পরিচয় দিবার জন্যই গুটি তিনেক গান 'বাউদিয়া' নামে সঙ্কলিত হইয়াছে।

আলোচ্য তিনটি বাউদিয়া গানই বিরহাত্মক। ২৩৪-সংখ্যক গানে প্রেমিকা বলিতেছে, ওগো বাউদিয়া, তুমি আমার নব-যৌবনকে কেমন করিয়া আঘাত করিয়াছ, আমি তোমার মায়া-জালে বন্দী হইয়াছি। দিন-যামিনী

২ আব্দুল করিম। কোচবিহার দর্পণ: মাঘ, ১৩৫২।

CENTRAL LIBRARY

প্রেমিকা বাউদিয়ার 'কান্দন' শুনিতে পায়। উভয়ের গৃহের মধ্যে 'হীরা নদী'-র ব্যবধান,—প্রেমিকা তাহাকে হাত ধরিয়া এপারে আনিতে চায়। এই প্রেমিক 'দিনা চারিক পিরিত করিয়া' 'ময়হা ছাড়া' হইয়াছে। শেষাংশে প্রেমিক প্রেমিকাকে শাড়ী-গয়না দেয় নাই বলিয়া খেদ করিতেছে। প্রথম অংশে প্রেমের আন্তরিকতা ও বিরহজ্বালা শেষাংশে শাড়ী-গয়না না পাইবার খেদের উল্লেখে অনেকটা ফিকা হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য ইহা লোক-সঙ্গীতের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে।

পরবর্তী গানটিতে এই ত্রুটি নাই। এখানে প্রেমিকার বিরহজ্বালা একটি সরল রেখার মতো স্পষ্টরূপে সমস্ত গানটি জুড়িয়া ছড়াইয়া আছে। দিনের সকল গৃহকাজে প্রেমিকার উদাসী প্রেমিককে মনে পড়ে এবং সেই প্রেমকে স্মরণ করিয়া তাহার খোঁপা বারবার খুলিয়া যায় (সং ২৩৫)। গানটিকে একটি শ্রেষ্ঠ 'বাউদিয়া গান' রূপে গণ্য করা যায়।

২৩৬-সংখ্যক গানে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের নিকট হইতে বিদায়-বাণী ঘোষিত হইয়াছে। প্রেমিকার বিবাহ স্থির হইয়াছে, কালই তাহার বিবাহ। সে বলে, জামবাটিতে 'খইল' ভিজাইয়াছি, 'আপেনকার সোয়ামীর নাখা' তুমি আমার পিঠটা ঘষিয়া দাও। শ্বশুর বাড়ী যাইয়াও তোমার কথা ভুলিতে পারিব না। মাটি দিয়া নিজের হাতে তোমার মূর্তি গড়াইয়া তাহাকেই ভালোবাসিব। প্রেমিক তাহার উত্তরে বলে, পাথর যেমন জলের তলে রহিয়াও পচে না, প্রেমও কোনোদিন বিনষ্ট হয় না। প্রেমের আন্তরিকতার প্রকাশের জন্য ইহাকেও একটি সুন্দর বাউদিয়া গানরূপে চিহ্নিত করিতে পারা যায়॥

॥ ১২ ॥

বৈষ্ণব প্রেম-গীতির প্রভাব বাঙলা ও বাঙালীর মনের মধ্যে এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে নিছক লৌকিক প্রেমের গানেও বৈষ্ণব নায়ক-নায়িকার ছাপ পড়ে। 'কালার উদ্দেশে' গুচ্ছের গানগুলি এই ধরণের। এখানে নিছক লৌকিক প্রেম 'কালা'-র আবরণ দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক, নায়ক যেমন 'কালা' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, নায়িকা তেমনি কোথাও 'রাধা' নামে উল্লিখিত হয় নাই।

CENTRAL LIBRARY

২৩৭ ও ২৩৭ক-সংখ্যক গান দুইটি এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গান। বৈষ্ণব পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের সহিত ইহাদের যেন কোথায় মিল আছে। বাহিরে কালার বাঁশি বাজে, নায়িকা তাহা শুনিয়া 'বাহির হইয়া মুছো চোখুর পানি'। কালা আসিবার জন্ত 'দুয়ারত্ মুই নাই দেও রে নড়ি', কিন্তু 'দেখায় না হয় রে কোন্ বা করমের দোষে', তাই 'মুই কান্দো মনের দুস্কে, বুক বয়হা পড়ে চোখুর পানি'। নায়িকা তাই বলে, 'হায় হায় রে প্রাণোকালা, তোর পিরতির এতয় রে জালা' (সং ২৩৭)। প্রেমের তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও উহার অন্তর্নিহিত অভিমান পরের গানটিতে মিলে। নায়িকা বলে,

মোর কালার কটুর (কঠোর) রে হিয়া
মন বান্ধিছে কালা পোষাণ (পাষাণ) রে দিয়া॥—সং ২৩৭ক

২৩৮, ২৪০, ২৪১ ও ২৪২-সংখ্যক গানগুলিতে লৌকিক জগতের কথা প্রত্যক্ষরূপে বলা হইয়াছে। চেঙ্গ্ড়া বন্ধুর 'জালাত্ মন মোর ঘরে আর বাইরে'। স্বামীর জন্ত মন একদিকে ঘরে, কালার জন্ত অপরদিকে বাহিরে ধায়। স্বামী পাছে কালাকে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে প্রেমিকা গায়,—

মোর ঘরের পাগলা সোয়ামী
দেখিলে মারিবে তোরে ;
দূরে দূরে যা রে বন্ধু
নদীর ঘাটোতে।—সং ২৩৮

কালা প্রেমিকাকে গলার মালা, নাকের ফুল দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা তো দেয়ই নাই, উপরন্তু কন্থার অভিযোগ 'মোক করিলো কালা তুই মান্‌ষি-হাসা' (সং ২৪০)। 'দুধো দইয়ো খাবার আশে' কালার সহিত প্রেমিকা পিরিতি করিয়াছিল, সেই কালা তাহাকে ব্যথা দিয়া গেল (সং ২৪২)। 'বাউদিয়া' পর্যায়ের ২৩৪-সংখ্যক গানটির সহিত ২৪০ ও ২৪২-সংখ্যক গান দুইটি তুলনীয়।

২৩৯-সংখ্যক গানটির বিশেষত্ব হইল, ইহাতে প্রেমিকাই 'কানাইয়া'-কে প্রেমের অন্তহীন জালার কথা স্মরণ করাইয়া প্রেম হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছে। কাব্যের দিক দিয়াও গানটি সুন্দর। বিরহ-ম্লান প্রেমিককে দেখিয়া নায়িকা বলে, 'তোর ঘরে কেন আন্ধারাতি'। এই 'আন্ধার' যেন বিরহের প্রতীক। 'আষাঢ়ো-শাবণো মাসে দেওয়া বয়্যে কানাই মধুর রসে',—

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু প্রেমিকার মনে মিলনের বারিধারা নাই। প্রেমিকা বলিয়াছে, প্রেম-দরিয়ায় কুমীরের ভয়, কাজেই 'পহর (সাঁতার) দিয়ো না ওইনা নদীর জলে'।

২৪৩-সংখ্যক গানে দেখা যায়, 'শাম-অসিয়া-'কে কন্যা বিদায় দিলেও সে বিদায় নিতে চায় নাই। কন্যাকে মাথার 'সিঁতাপাটী' এবং কোমরের 'গট' গড়াইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পেশ করিতেছে। তাহাতেও যখন কন্যা রাজী হয় নাই, তখন 'শাম-অসিয়া-'র যুক্তি—

কইন্যা রে, যে মাচাতে নাইরো ধান
না ধরে ইন্দুর।
যে নারীরো নাই সোয়ামী
না শোভায় সেন্দুর॥—সং ২৪৩

॥ ১৩ ॥

বিভিন্ন ধরণের পেশা-র সহিত অনেকগুলি গানের ভাব-উৎস ও বিষয়বস্তু জড়িত থাকে। 'মাঝির গান' ও 'তেলেঙ্গার গান' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাঝির একটি গার্হস্থ্য-জীবন আছে বটে, কিন্তু তাহার বৃত্তিগত আর একটি জীবন আছে, যেখানে সে সদাগরী নৌকা লইয়া দেশে-বিদেশে ঘাটে-ঘাটে ঘুরিয়া থাকে। বিদেশে ভ্রমণরত পুরুষের পক্ষে পর-নারীর সংসর্গে আসা খুবই সহজ, অন্তত লোকসঙ্গীতে ইহার পরিচয় প্রায়ই মিলে। তাই প্রবাসী মাঝির প্রেম লইয়া অনেক গান রচিত হইয়াছে,—নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মাঝি এই গান আপন মনে গাহিয়া থাকে।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের নদীনালা ও নৈসর্গিক পরিবেশ বিচার করিলে 'মাঝির গান'কে ইহার নিজস্ব গান বলিয়া মনে হয় না। এই অঞ্চলের নদীসমূহ অগভীর ও খরস্রোতা বলিয়া উহাদের নাব্যতা কম; দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক দিক হইতে বহুদিন ধরিয়া ঘাটে-ঘাটে ঘুরিবার প্রসঙ্গও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অনুমান করি, হয় পূর্ববঙ্গের নদী ও মাঝির জীবনযাত্রা এবং তাহাদের গান এখানে প্রভাব ফেলিয়াছে; কিংবা মাঝিকে দূরাগত এক রোমান্টিক নায়করূপে দেখিবার সাহিত্য-সংস্কার এখানে কার্যকরী হইয়াছে; নয়ত, একদা

যে কয়টি নদীর নাব্যতার সুযোগ লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত, সেই অতীত স্মৃতিই এখানে প্রভাব ফেলিয়াছে।

বণিক-সাধু বাণিজ্য করিতে চলিয়াছে, স্ত্রী তাহাকে উপদেশ দিতেছে, দাঁড়ী-মাঝিদের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়ো না, ঢেউয়ের মধ্য দিয়া নৌকা লইয়ো না, এবং পর-নারীর সংসর্গে যাইয়ো না (সং ২৪৪)। গানটি আসলে দেহতত্ত্বের গান, কিন্তু প্রেমের গান রূপেই ইহা গীত হইয়া থাকে। গানেও বলা হইয়াছে, 'আজি ডাঁড়ী-মাঝি সাধু যোলো রে জন'। দুই তীর ঘেঁষিয়া নৌকা না লইয়া মাঝ নদী দিয়া নৌকা বহিবার কথা আছে, —অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা যেন দুই তীর, সুষুম্না যেন মাঝ-নদী। মাঝির গানের মধ্যে দেহতত্ত্বের উল্লেখ অবশ্য কেবল এই গানটিতেই আছে।

নৌকা বাহিয়া মাঝি যাইতেছে, ঘাটে দাঁড়াইয়া কন্যা বলে,

নাও চাপাও (বাঁধো), নাও চাপাও, রে নাইয়া,
নাও চাপাও মোর ঘাটে ;
মুই নারীটা দেখা করিম্
সকালে-বিকালে।—সং ২৪৫

তারপর কন্যার প্রশ্ন, 'কোন্ বা দেশে ঘরো মাঝি, কিসেরো বেপারী' ; তারপর অনুরোধ,—'খাসি মারিয়া আন্ধন আন্ধিমু ভাত খাইয়া যাও'। মাঝি তাহার উত্তরে জানায়,

ভাটি দেশে বাড়ী কন্যা ও
উজান বেপার করি।
দোহাই নাগে তোমার বাপোর
বিয়াও নাহি করি, কন্যা ও॥—সং ২৪৫ ক

কন্যাকে দেখিয়া মাঝির মন মজিল, 'আজি পরার নারী দেখি' হিয়া ফাটি' মরি' (সং ২৪৫ খ)।

মাঝির গানগুলির মধ্যে মাঝির বৃত্তি ও প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়াছে। বৃত্তির জন্য বিদেশে যাইয়া পুরুষের এই প্রেম করিবার প্রবণতার সহিত মৈষাল ও মাহুতের প্রেম বিশেষভাবে তুলনীয়। এ সম্পর্কে 'মৈষালী' ও 'বিরুয়া' গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

বৃত্তি-ঘটিত অপর প্রেমের গানের নিদর্শন হইল 'তেলেঙ্গার গান'। এই গান 'তেলেঙ্গা' সম্প্রদায় অর্থাৎ যাযাবর শ্রেণীর 'বাদিয়া'গণ গাহিয়া থাকে, তাই ইহার নাম 'তেলেঙ্গা-গান' হইয়াছে। তেলেঙ্গা পুরুষেরা সাধারণত ছাগল-বাঁদর ইত্যাদি নাচায়, নানাপ্রকার দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। পুরুষদের খেলা দেখাইবার সময় তেলেঙ্গা মেয়েরা পাশে বসিয়া ঢোল বাজাইয়া গান গায়। গানের বিষয় প্রায় সবই প্রেম-ঘটিত, অবৈধ প্রণয়ের গানও প্রচুর পরিমাণে গীত হয়।

'মাঝির গান' ও 'তেলেঙ্গার গান' উভয় গানই বৃত্তি ঘটিত হইলেও আসলে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। মাঝির গানে মাঝির জীবন ও বৃত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে, তেলেঙ্গার গানে তাহা নাই। যখন ছাগল বা বাঁদর নাচানো হইতেছে কিংবা দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করা হইতেছে, তখন হয়তো গাওয়া হইতেছে একটি প্রেমের গান, যাহার সহিত নাচ বা খেলার কোন সম্পর্ক নাই।

তেলেঙ্গার গানের ভাষা ও বিষয় কিন্তু উল্লিখিত সাধারণ প্রেমের গানের মতোই। তবে, ইহার রচনার বিশেষত্ব হইল, ঢোল সঙ্গতের সহিত নাচ দেখাইবার জন্য গীত হয় বলিয়া ইহার তাল সাধারণত দ্রুত এবং ঢোলের তালের দ্বারা উহার শ্বাসাঘাতগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদের গানের সুরে খানিকটা বৈচিত্র্য আসিয়া যায়।

নানাস্থানে ঘুরিয়া তেলেঙ্গাগণ খেলা দেখাইয়া গান গায় বলিয়া ইহাদের গানের প্রচার ও জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক কারণেই বেশি। এইজন্য পেশাদার তেলেঙ্গা ছাড়াও সাধারণ গায়ক-গায়িকাগণও তেলেঙ্গার গান গাহিয়া থাকে।

তেলেঙ্গার গানের মধ্যে উহাদের বৃত্তির ছাপ বড়ো নাই। অবশ্য সংগৃহীত তেলেঙ্গার গানগুলির মধ্যে অন্তত একটি গান পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে তেলেঙ্গার জীবন ও বৃত্তির কিছু পরোক্ষ ছাপ আছে। ২৪৬-সংখ্যক গানটি এ বিষয়ে উল্লেখ্য। 'ছাগল-আউলী' 'ধাউলী' মেয়ের ছাগল আসিয়া জনৈক পুরুষের 'কালাইয়ের বিছন' খাইয়া গেল, কিন্তু 'মধুভাষী' মেয়ের প্রতি দুর্বলতা থাকিবার দরুন সে কিছুই করে না। এই পুরুষ হাটে তেল বিক্রয় করে, মেয়েকে সে বিনা পয়সাতেই 'খইল' এবং তেল দিতে চায়। এবং বলে 'তোক

পালে ওগে মাই, মুই ছাড়োঁ বাপো-মাও' (সং ২৪৬)। এই গানে ছাগল নাচাইয়া বেড়ায় যে তেলেঙ্গাগণ তাহাদের কথা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়।

২৪৭ ও ২৪৮ সংখ্যক গানদুইটির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই, না বলিয়া দিলে তেলেঙ্গার গান বলিয়া চিনিবার উপায়ও নাই। ইহার একটিতে দেখা যায়, সন্তানবতী রমণীর অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিতেছে (সং ২৪৭), এবং অপরটিতে দেখি, জনৈকা 'হাইড়ানী' (হাড়িয়ানী) মেয়ের দেহ ভোগ করিবার জন্য একজন পুরুষ তাহার আশে-পাশে ঘুরিতেছে (সং ২৪৮)।

নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করিবার জন্য তেলেঙ্গা মেয়ে-পুরুষের জীবনে সংযম বোধের বালাই নাই। তাহাদের জীবন ও বৃত্তির বিশেষত্বের জন্যই তাহাদের গানে অবৈধ প্রণয় এমনভাবে স্থান পাইয়াছে।

॥ ১৪ ॥

'প্রেম'কে ভিত্তি করিয়া রচিত এমন কতকগুলি গান পাইয়াছি, যেগুলিকে কোনো বিশেষ একটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এইগুলিকে আমরা 'বিচিত্র' গুচ্ছের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছি।

এই সকল গানের মধ্যে ২৪৯-সংখ্যক গানের মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। গানটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া গায়কগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বাংরু নামীয় এক বিখ্যাত চোর ছিল, কিন্তু সে ছিল প্রেমিক। কোনো এক বিশেষ অপরাধে তাহার ফাঁসি হয়। এই ঘটনাকে মনে রাখিয়া, বাংরুর ফাঁসিকে আলঙ্কারিক অর্থে পিরিতের ফাঁসিরূপে কল্পনা করিয়া গানটি রচিত হইয়াছে। একটি কিংবদন্তীমূলক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া একটি প্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহাকে চোর বলিয়া ঘৃণা করা হয় নাই,—ইহাই গানটির লক্ষণীয় বিশেষত্ব। গানে অবশ্য বাংরুর নামের বদলে 'পদ্ম' এই নামটি উল্লিখিত হইয়াছে।

২৫০-সংখ্যক গানে 'মোতি' নামীয়া একজন বিধবার জন্য জনৈক প্রেমিক বিবাগী হইয়াছে, 'মোতি, মোতি' করিয়া রাজ্য ঢুঁড়িনু, তাঁহো না পানু মোতি-আড়ীর বাড়ী'। মোতির জন্য বৈরাগী সাজিয়া দ্বারে-দ্বারে সে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে।

২৫১ ও ২৫২-সংখ্যক গান দুইটি আসলে প্রেমের গানই নয়, কিন্তু ইহার উৎস প্রেম ও বিবাহ-ঘটিত। গান দুইটির মধ্য দিয়া রাজবংশী সমাজের একটি বিচিত্র প্রথা প্রতিফলিত হইয়াছে।

রাজবংশী সমাজের পিতাই কন্যাপণের টাকা পায়। অনেক সময় পুরুষ এই পণের টাকা নগদ না দিয়া প্রকারান্তরে দৈহিক পরিশ্রমদ্বারা পূরণ করিয়া দেয়। আলোচ্য গান দুইটির মধ্যে দেখিতেছি, দুইজন যুবক কন্যার গৃহে চাকররূপে খাটিতেছে। হবু-শাশুড়ী বলিতেছে, তোমাদের দুইজনের কর্ম-দক্ষতা দেখি, তোমাদের কাহাকে আমার মেয়ের পছন্দ হয় তাহা দেখি, তাহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। সুতরাং খুব করিয়া পরিশ্রম করো,—'যাকয় দেখিমো বেশি পারুক, বেটীর সঙ্গে বিহো দিমো তার (সং ২৫১)।

পরবর্তী গানটিও হবু-ঘরজামাইয়ের প্রতি হবু-শাশুড়ীর উক্তি। এখানে জামাই নির্দিষ্ট হইয়াছে, পুত্রহীন শাশুড়ী হবু-জামাইকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে গৃহকর্ম শিখাইতেছে: জমি পতিত রাখিয়ো না, বেগুন ক্ষেতে সার দাও, যে আলি ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহাতে মাটি দাও, আর কৃষি-কাজ তো কেবল চার মাস, 'আট মাস বসিয়া খাও'। পরিশেষে শাশুড়ীর আশ্বাস—

পোহাক দিন, গড়াই গাহনা,
বেটী তো হইছে সেয়ানা;
বিহো দিবার পাল্লে রে
ভাবনা যায় হামার॥—সং ২৫২

॥ বিহোর গান ॥

॥ ১ ॥

রাজবংশীদের বিবাহের 'কন্যাপণ' প্রথা এবং উহার অন্যান্য আনুষঙ্গিক দিক সম্পর্কে প্রেমের গানগুলির প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে, বিবাহ-গীতিগুলির আলোচনার পূর্বে, রাজবংশী সমাজে চলিত বিবিধ বিবাহ-প্রথা ও বিবাহের রীতি-নীতি সম্পর্কে দুই-এক কথা প্রথমে বলা হইবে।

"রাজবংশী দিগের মধ্যে তিন প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে। যথা গন্ধর্ব বিবাহ, ব্রাহ্ম বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ।"[১]

গন্ধর্ব বিবাহের পরিচয় এই : "এই বিবাহে পতি কি তাহার পিতা-মাতা চার বৎসর হইতে উর্ধ্ব সংখ্যা বারো বৎসর বয়স্কা এক পাত্রী সাব্যস্ত করে। ইহা দ্বারাই বোঝা যাইতে পারে, পাত্রী নিজে বর মনোনীত করিয়া লয় না এবং বর মনোনীত করার বয়সও তাহার হয় না। এই বিবাহে একমাত্র কার্য এই যে, বর ও পাত্রীর সম্মুখে এক চালনবাতি রাখে এবং পাত্রীকে নূতন কাপড় ও শঙ্খ পরায় এবং বর-পাত্রী দুই জনে পুষ্পমালা বদল করে। কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবশ্যক করে না। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এই বিবাহ বড় প্রচলিত নাই, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই এই নিয়মে বিবাহ করিয়া থাকে।"[২]

ব্রাহ্ম বিবাহই লোকচার সম্মত বিবাহ। আত্মীয়-স্বজন বা ঘটক-ঘটকিনী দ্বারা এই বিবাহ স্থির করা হয়। প্রথমে ঘটক বা ঘটকিনী কন্যার পিতার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করে, সে তাহার কন্যাকে অমুক বাড়ীতে বিবাহ দিবে কিনা? প্রস্তাব পেশ করিবার তিন (বা আড়াই) দিনের মধ্যে বর বা কন্যার গৃহে যদি কোনো প্রকার অমঙ্গল বা অঘটন না ঘটে তখন ঘটক বিবাহের প্রস্তাব চালাইতে থাকে। ঘটককে বলা হয় 'কাড়োয়া'। ঘটকিনীকে বলে 'দানীবুড়ী'।

১ কোচবিহারের ইতিহাস (১২৮৯), ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫।

২ প্রাগুক্ত গ্রন্থ।

CENTRAL LIBRARY

বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হইবার পর শুভদিনে বরের অভিভাবকগণ পান-সুপারি ও মিষ্টান্ন পাত্রীর বাড়ীতে প্রেরণ করে। যাইবার সময় পথে মৃতদেহ, শ্মশান, নতুন কাটা নালা, জোঁক কিংবা সাপ দেখিলে তাহা অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয় এবং ওই বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। অপরদিকে, দুধ, মাছ ও ফুল দেখিলে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবচিত হয়।

পান সুপারি লইয়া কন্যার বাড়ীতে আসিয়া পৌছাইলে বিবাহের দেনা-পাওনার কথা পাকাপাকি করা হয়। দিন-ক্ষণ ও পণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া এইদিন উভয় পক্ষ পান-সুপারি আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'দর-গুয়া' বা 'গুয়া-কাটা'। অনেক ক্ষেত্রে এই 'গুয়া-কাটা'-র দিনই পাত্র পক্ষকে কন্যা পণের টাকা ও অলঙ্কারাদি দিতে হয়। বাড়ীর আঙিনায় সকলে একত্র হয়। কন্যার পিতা তাহার কন্যার বিবাহের কথা সমবেত পড়শীদের নিকট ব্যক্ত করে এবং তাহারা সমর্থন জানায়। ইহার পর একটি কাঁসার থালায় আধসের মতো চাল রাখিয়া তাহাতে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। বরের পিতা সেই থালায় কন্যাপণের টাকা ও অলঙ্কারাদি রাখিয়া থাকেন। ইহাকে বলে 'নিরকিনি ছোড়া'। এই অনুষ্ঠান হইবার পর কন্যাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া চলিবে না। সাধারণত 'দর-গুয়া' হইবার পাঁচ-দশ দিনের মধ্যেই বিবাহের দিন ধার্য করা হইয়া থাকে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'দর-গুয়ার' দিনই পণের টাকা ও অলঙ্কারাদি দিতে হয় না। 'দর-গুয়া'র দিন কেবল কথা-বার্তা পাকা করা হয়। 'গুয়া-কাটা'র পর তিনদিনের মধ্যে পাত্রীর বাড়ীতে যদি কোনো অশুভ ঘটনা ঘটে, তবে ওই বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া হয়। সাধারণত বাড়ীতে কাহারো মৃত্যু হইলে বা অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে কিংবা পাকশালায় কোনো মাটির পাত্র ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। অন্যদিকে কোনো প্রকার অশুভ ঘটনা না ঘটিলে শুভদিনে পাত্রের বাড়ী হইতে মাছ, ফুল, নতুন কাপড় ও শাঁখা তত্ত্ব হিসাবে কন্যার বাড়ীতে প্রেরণ করা হয়।

বিবাহের পূর্বদিন বর ও কন্যা উভয়ের গৃহেই 'অধিবাস' হইবে। নাপিত আসিয়া ক্ষৌর কার্য করিয়া দেয়। তাহার পর বরণ ডালা সাজাইয়া গ্রাম-দেবতার 'স্থানে' গিয়া আশিস প্রার্থনা করা হয়। বাড়ী-বাড়ী হইতে 'জল

CENTRAL LIBRARY

বরণ' করিয়া আনিয়া তেল-হলুদ দিয়া বর-কন্যাকে স্নান করানো হয়। বিবাহের সময় বর-কন্যা উভয়েরই গৃহে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে।

পূর্বে রাজবংশীদের মধ্যে নিয়ম ছিল, পাত্রপক্ষ শাড়ী-গয়না দ্বারা কন্যাকে সাজাইয়া লইয়া যাইবে এবং সেখানেই বিবাহ হইবে। পরদিন বর-কন্যা একসঙ্গে মেয়ের বাড়ীতে আসিত। এইদিন এক ভোজ দেওয়া হইত, যাহার নাম 'দান-পারা'। তারপর দিন বর-কন্যা বরের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইত। এই রীতি এখনও চলিতেছে।

কন্যাকে সাজাইয়া বরের বাড়ীতে বিবাহের জন্য লইয়া যাইবার সময় বাদ্য-ভাণ্ড বাজানো হয়। সঙ্গে তাহার স্বজনেরাও যায়। মেয়েরা যাহারা বরণডালা ধরিয়া থাকে, তাহাদের বলে 'ঘৈবাতী'। বিবাহের সময় ইহারা বরণডালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

বিবাহ-মণ্ডপকে বলা হয় 'মাড়োয়া'। চারিদিকে চারিটি এবং মাঝখানে একটি কলাগাছ পুঁতিয়া ইহা তৈরী করা হয়। প্রতি গাছের গোড়ায় ধানের উপর জল-পূর্ণ ঘট এবং তাহার উপর আম্রপল্লব দেওয়া হয়। এই চৌকোণের বাহিরে, পশ্চিমদিকে একটি শতরঞ্চ পাতা হয়। তাহার উপর পূর্বাস্য হইয়া বর দাঁড়ায়, কন্যাকে তাহার চতুর্দিকে সাত পাক ঘোরানো হয়। পাত্রীর সখীরা পাত্রীকে তখন ধরিয়া থাকে এবং মাথার উপর নাপিত ছাতা মেলিয়া ধরে। ইহার পর 'গোতিমারা' বা 'ফুল-মারামারি' অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ বর ডান হাত দিয়া শোলার ফুল ও আতপ চাল কন্যার প্রতি নিক্ষেপ করে; কন্যাও বাম হাতে শোলার ফুল ও আতপ চাল বরের প্রতি নিক্ষেপ করে। অতঃপর বর-কন্যাকে পাশাপাশি বসাইয়া একখণ্ড কাপড়দ্বারা উভয়ের মাথা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। সম্মুখে একটি জল-পূর্ণ তাম্র কলস থাকে। বর ও কন্যার ডান ও বাম হাত এই ঘটের উপর স্থাপন করা হয়। বরের পিতা আম্রপল্লব চুবাইয়া সেই ঘটের জল বর-কন্যার গায়ে ছিটাইয়া দেয়। বরের পিতা যদি জীবিত না থাকে, তবে একজনকে 'পিতা' বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া হয় এবং তাহাকে দিয়াই এই কাজ করানো হয়। এই ব্যক্তিকে 'পানি-ছিটাবাপ' বা 'ফুল-বান্দা বাপ' কহে।

অনন্তর মিতবর বা 'মিত্তর' অর্থাৎ বরের নিকটতম বন্ধু 'মাড়োয়া'-র মধ্যস্থিত কলাগাছের সম্মুখে পূর্বদিক হইতে আসিয়া দাঁড়ায় এবং দুই হাতে

CENTRAL LIBRARY

কলা গাছের গোড়ায় স্থাপিত আম্রপল্লব দেওয়া জলপূর্ণ ঘট তুলিয়া ধরে। বর জিজ্ঞাসা করে, 'ওই ঘটে তুমি কি লইয়া আসিলে'? মিতবর বলে, 'তোমার বিবাহের জন্য গঙ্গাজল লইয়া আসিলাম।'

কন্যা সম্প্রদান সাধারণত কন্যার পিতাই করিয়া থাকে। গলায় গামছা দিয়া এবং হাতে সুতা ও হরিতকি লইয়া পিতা কন্যা সম্প্রদান করে।

ইহার পর পুরোহিত বরের ডান হাত এবং কনের বাম হাতের চতুর্থ আঙুল কাশ দিয়া বাঁধিয়া দেয়। তখন বরের পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই কাশের বন্ধন ছিঁড়িয়া দেয়। ইহার অর্থ, সেদিন হইতে কন্যা তাহার স্বামীর পরিবারের একজন হইল। কাশ দিয়া বর-কনের হাত বাঁধিয়া দিবার পূর্বে পুরোহিত উভয়ের চাদরের প্রান্ত লইয়া গ্রন্থি বাঁধিয়া দেন। গ্রন্থির মধ্যে থাকে একটি পান, এক টুকরা করিয়া সোনা ও রূপা।

দম্পতি ইহার পর তুলসীতলায় যাইয়া প্রণাম করে এবং সমবেত গুরুজনদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। বাড়ীর উত্তর ভিটার ঘরে 'বাসর' হয়। পরদিন নববধূকে রন্ধন করিতে হয় এবং নিমন্ত্রিতগণ সেই অন্ন গ্রহণ করে। ইহাকে বলে 'ঢাকন'।

তার পরদিন 'পাথপিরান'। 'বৈরাতী'গণসহ কন্যা একটি পাল্‌কিতে এবং বর একটি টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া কন্যার পিত্রালয়ে আসে। এইখানে বরের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত কর্মগুলি পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। পরদিনই বর-কনে বরের গৃহে ফেরে। আটদিন গত হইলে 'আঠোরা' বা 'আঠোরিভাঙ্গা' অর্থাৎ 'অষ্টমঙ্গলা' হয়। বর ও কনে একটি পিঁড়িতে দাঁড়ায়, 'বৈরাতী'গণ তাহাদের স্নান করায়। অতঃপর তাহারা বিবাহের বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করে। এইখানে বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রাজবংশীদের মধ্যে অপর আর এক ধরণের বিবাহ প্রচলিত আছে—ইহাকে 'বিধবা বিবাহ' বলা হয়। বিধবা-বিবাহ তিন প্রকারের হইতে পারে।

(ক) 'ডাঙ্গুয়া' স্ত্রী: "যখন কোনো বিধবা নিজেই নিজের ভরণ-পোষণ চালাইয়া বাস করে এমতাবস্থায় কোনো পুরুষ 'ডাঙ্গ' অর্থাৎ যষ্টি লইয়া তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং চালের উপর বাড়ী দেয় এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রীলোককে অধিকার করে। এমতাবস্থায় স্ত্রীলোককে ডেঙ্গাস্ত্রী বলে। এরূপ কার্যে পূর্বেই উভয়ের বন্দোবস্ত থাকে।"

সাধারণত বিপত্নীকগণই এইরূপ বিবাহ করে। ইহাদের রাজবংশী সমাজে ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

(খ) 'ঢোকা-স্ত্রী': "ঢোকা অর্থাৎ প্রবেশ করা; যখন কোনো বিধবা স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামতো অন্য পুরুষের ঘরে প্রবেশ করে, সেই স্ত্রীকে ঢোকা-স্ত্রী বলে।"

(গ) 'পাস্থয়াস্ত্রী': "এই বিবাহই বাস্তবিক বিধবা বিবাহ। একবার বিবাহ হইলে পর পশ্চাৎ স্বামী গ্রহণ করাকে পাস্থয়া বলে।"

'পাস্থয়া' শব্দটি 'পাছুয়া' হইতে সকারীভবনের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে।

বিধবা বিবাহে সাধারণত কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করা হয় না। এই বিবাহের সন্তানগণ পিতার সম্পত্তির আংশিক ভাগ পাইয়া থাকে। যে বিধবা বিবাহ করে তাহাকে 'পোর খেতর' বলা হয়। যে বিধবা অপর পুরুষের সহিত অবস্থান করে তাহাকে 'শাঙনী' এবং ওই পুরুষকে 'শাঙনা' বলা হয়। উপপতিকে বলা হয় 'নাঙ'।

ইহা ছাড়া রাজবংশী সমাজে আরো দুই প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে।

অবিবাহিতা নারী পুরুষের সহিত স্ত্রীরূপে থাকিলে তাহাকে 'কইন্যাপাত্র' বা 'ঢেমনাল' বলে। এই বিবাহে কন্যা কোনো পুরুষের গৃহে যাইয়া তাহার গৃহিণী হইয়া থাকে।

'পায়ে-জল-ঢালা' বিবাহ নামে অপর এক ধরণের বিবাহ আছে। কোনো রাজবংশী রমণী তাহার কেশ দুই ভাগে ভাগ করিয়া কাঁধের দুই দিকে ঝুলাইয়া দিয়া কোনো পুরুষের পায়ে জল ঢালিয়া দিলেই এইরূপ বিবাহ হয়। বর্তমান সংগ্রহের 'মুকচাটু গঁসাইয়ের পালা'তে এই রূপ বিবাহের উল্লেখ আছে।

॥ ২ ॥

জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের মতো বিবাহেও লোক-সমাজে গান চাই। লোক সমাজের কথা ছাড়িয়া দিই। শিক্ষিত ভদ্র সমাজে পৌরাণিক প্রথায় বিবাহ হইলেও লৌকিক গান গীত হইয়া থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই

CENTRAL LIBRARY

ইহা লক্ষ করা যায়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে বিবাহের মধ্যে গান একটি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-গীতিগুলির সহিত প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিবাহ-গীতির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-গীতির মধ্যে বর-কনে হয় রাম-সীতা, নয় রাধা-কৃষ্ণ রূপে উল্লিখিত হয়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিবাহ-গীতি সম্পূর্ণরূপে 'সেকিউলার'। ইহাই ইহার প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-গীতিতে বর-কনে যখন রাম-সীতা বা রাধা কৃষ্ণ নামে উল্লিখিত হয়, তখন সেই রাম-সীতা বা রাধা কৃষ্ণের নামটুকুই বলা হয়, রামায়ণ বা বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু, ইহাও সত্য, রাম-সীতা বা রাধাকৃষ্ণের উল্লেখটুকু মাত্র থাকিবার দরুন, যতো বাস্তবতাই তাহাকে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, সেই সকল গানে কঠিনতর জগৎ, স্থূল দৈনন্দিন জীবন, হাসি-রঙ্গ-তামাশার সজীব স্পর্শ লাগিতেই পারে না। আলোচ্য বিবাহগীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলিয়া ঠাট্টা-তামাশা-রঙ্গ-কলহ এবং দৈনন্দিন জীবনের রূঢ়তা ও স্থূলতা ইহাতে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

সংগৃহীত বিবাহ-গীতিগুলির মধ্যে এই কয়েকটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়,—

(১) বিবাহের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে বর্ণনা করিয়া গান ;

(২) বর ও কনের বিবাহকালীন মনোভাব ; কনের পিতামাতার তৎকালীন মনোভাব লইয়া রচা গান ;

(৩) হাসি-রঙ্গ-ঠাট্টা-তামাশার গান। এই ধারার গানগুলিকে আবার কয়েকটি উপধারায় বিন্যস্ত করিতে পারা যায় :

(ক) কনের বাড়ীতে বর ও তাহার আত্মীয়-স্বজনাদিকে লক্ষ করিয়া নিন্দা, রঙ্গ ; কনের বাড়ীতেই তাহাকে লইয়া ঠাট্টামস্করা ;

(খ) বরের বাড়ীতে কনে ও তাহার আত্মীয়-স্বজনাদিকে লক্ষ করিয়া নিন্দা, রঙ্গ ;

(গ) বর ও কনের গৃহে বরযাত্রী, নাপিত, পুরোহিত ইত্যাদিকে লক্ষ

CENTRAL LIBRARY

করিয়া অথবা বরযাত্রীদের তরফ হইতে বর ও কনের গৃহের এয়োদের লক্ষ করিয়া নিন্দা রঙ্গ ;

(৪) নব-বিবাহিত বর-বধূকে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে নির্দেশ দিয়া গান।

এক-একটি গুচ্ছ লইয়া এইবার গানগুলির আলোচনা করা হইবে॥

॥ ৩ ॥

বিবাহের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ অনুষ্ঠানগুলির পরিচয় দিয়া গান বাঁধিবার প্রবণতা বাংলাদেশের সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। এই ধরণের গানগুলির মধ্যে কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া মনে হয়। এই পর্যায়ের গান-গুলি অনুষ্ঠানের নিছক তালিকা বা তথ্যমূলক নীরস বিবৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠান বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু রঙ্গ-রসিকতা বা অন্য প্রসঙ্গ সুযোগ বুঝিয়া গুঁজিয়া দেওয়া হয়।

কন্যার বিবাহ হইবে, তাই 'কাড়োয়া' (ঘটক) যাওয়া-আসা করিতেছে ; ঘটক বিবাহ স্থির করিল, আজ বিবাহের 'পাকা দেখা'। রাজবংশী সমাজে বিবাহের পাকা দেখা অনুষ্ঠানকে বলে 'দর-গুয়া'। এইদিন দুই পক্ষ পান-সুপারি আদান-প্রদান করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিয়া থাকে। এই কথা উল্লেখ মাত্র করিয়াই এয়োগণ গায়, ওরে মেয়ে, এই পান-সুপারি ছুঁড়িয়া ফেল, তোর যে অন্য প্রেমিক বন্ধু আছে (সং ২৫৩)।

কন্যার তাই 'গালাতে কাটারি দিয়া মরিবা মনাছে' (সং ২৫৪)।

প্রথম যেদিন ঘটক আসিয়া বিবাহের কথা উল্লেখ করে, সে দিনটিকেও এয়োগণ গানদ্বারা স্মরণীয় করিয়া রাখে। প্রেমের গানগুলি আলোচনাকালে একাধিকবার বলিয়াছি, রাজবংশী সমাজের অবিবাহিতা যুবতীগণ বিবাহ হইল না বলিয়া খেদ ও আক্ষেপ করিয়া থাকে। এই ব্যাপার বিবাহের গানেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘটক আসিয়াছে পাত্রের সন্ধান লইয়া, বিবাহযোগ্যা দুই বোনই ভাবিতেছে,—আমারই বিবাহ আগে হউক এবং 'দনো বইনি ঝগড়া নাগাইসে' (সং ২৫৩)। বড়ো বোনের বিবাহকালে বিবাহযোগ্যা ছোটো বোনের মনে যে একপ্রকার বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ঈর্ষা দেখা দেয়, মার্জিত সমাজে তাহা কেহ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবে না ; অথচ, দুই বোনের মানসিক

CENTRAL LIBRARY

অবস্থার এই যে স্পষ্ট প্রকাশ ইহাই লোকমানসের বৈশিষ্ট্য। এই গানেও দেখিতেছি, অনুষ্ঠানের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে কন্যার মানসিক অবস্থা লইয়া রঙ্গ করা হইতেছে।

বরের বাড়ীতেও এদিকে ঘটকের যাওয়া-আসা চলিতেছে। পাত্রপক্ষের লোকেরা আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া গেল। বরের মা যখন তাহাদের প্রশ্ন করে, তোমরা তো কন্যাকে দেখিয়া আসিলে, বলো তো কন্যা দেখিতে কেমন, আমার ছেলের সঙ্গে মানাইবে তো? কন্যার কি মা বাঁচিয়া আছে? বাবাটি কেমন? (সং ২৫৫)।

এমনি করিয়া বিবাহ স্থির হইল। আজ অধিবাস। 'কুলা', ঘট, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া বরণডালা সাজানো হইল। কুলা, ঘট, প্রদীপ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া গান গাওয়া হয় (সং ২৫৬)। এই বর্ণনা নিতান্ত নীরস। কিন্তু ইহাই খাঁটি লোক-সঙ্গীতের রীতি। একটি বিশেষ শৃঙ্খলা রাখিয়া, একই ধুয়া ধরিয়া, একটি ব্যাপারের পর-পর উল্লেখ করিবার মধ্যে লোক-সঙ্গীতের রচনা-পদ্ধতির নিদর্শন মিলে।

বিবাহের পূর্বে গ্রামদেবতার আশিস প্রার্থনা করা হয়। কাঁখে 'চাইলন বাতি' লইয়া বর বা কনের মা গ্রামদেবতার স্থানে গেল পূজা দিতে। এই অনুষ্ঠানকে বর্ণনা করিয়া ২৫৬-ক সংখ্যক গানখানি রচিত হইয়াছে।

কান্ধের চাইলন বাতি
মাটিতে থুইয়া;
ত্রিশালী দেবগণ পূজে বরের মাও
উলু-লু করিয়া॥—সং ২৫৬-ক।

তাহার পর ঝারিতে করিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে 'জলবরণ' করিবার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে।

অধিবাসের সময় কি কি করা হয়, তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ২৫৭ ও ২৫৭-ক সংখ্যক গান হইতে মিলে। বাড়ীর অঙ্গনে, তুলসী তলায় একটি গর্ত খুঁড়িয়া, তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। তারপর, সেই গর্তের চতুর্দিকে বাঁশপাতা ও কড়ি সাজাইয়া একটি পিঁড়ি পাতিয়া বর বা কনেকে সেই পিঁড়িতে বসাইয়া বরণ করা হয়। বরের মাথায় মুকুট দিবার প্রথা নাই, বদলে পাগড়ির মতো করিয়া লাল কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অভাবে সাদা কাপড়ের উপর

সিঁদুরের কৌটা দেওয়া যায়। ইহার পূর্বে নাপিত আসিয়া ক্ষৌরকার্য করে, চোখে পরানো হয় কাজল। তাহার পর 'বৈরাতী'গণ (এয়োরা) 'শিলা' 'হলুদ' ইত্যাদি বর বা কনের গায়ে ছোঁয়ায়।

২৫৭খ হইতে ২৬০-সংখ্যক গানগুলি বর ও কনের গায়ে হলুদ দিবার গান। গায়ে হলুদ দিবার অনুষ্ঠানটি বর্ণনা করিবার ফাঁকে ফাঁকে বর ও কনের বিবাহ কালীন মনোভাবের পরিচয়ও দেওয়া হইয়া থাকে। এই সময় বৈরাতীগণ বর ও কনের সহিত রঙ্গ-রসিকতাও করিয়া থাকে। যেমন হলুদ মাখাইবার সময় কনের উদ্দেশে বলা হইতেছে, হলুদ মাখাইলাম তবুও তোমাকে সুন্দর দেখাইতেছে না। দেখাইবে কেমন করিয়া, তুমি যে বুড়ী (সং ২৫৭খ, কথান্তর); অথবা, কল্পনা করিয়া নেওয়া হয়,—যে পাত্রের সহিত কনের বিবাহ হইতেছে, তাহাকে কনের মনে ধরে নাই। তাই এয়োগণ কনের জবানীতে গায়, কনের পিঁড়িতে চড়িতেও সাধ নাই, হলুদ মাখিতেও সাধ নাই (সং ২৫৯)।

বিবাহ ব্যাপারে বরের কর্তব্য ও দায়িত্ব অন্য প্রকার বলিয়া তাহার সহিত করা রঙ্গ-রসিকতার প্রকৃতিও অন্য রূপ। যেমন, সোনার মোহর দিয়া হলুদ কিনিয়া আনিয়া বরের গায়ে মাখাইয়া বরকে সুন্দর করিয়া তুলিলাম, কিন্তু অমুকের মেয়ে আসিয়া এই রূপের সবখানি কাড়িয়া লইবে (সং ২৫৮)। কিংবা বলা হয়, এই যে হলুদ আনিয়াছি, তাহা কিনিয়া আনি নাই, "তোর যে শাশুড়ী হল্‌দা-ভাতারী (যাহার স্বামী হলুদের ব্যবসা করে) রে বাপোই, তাঁহে দিয়া গেইল্ হল্‌দি, রে বাপোই" (সং ২৬০)।

২৬০ক হইতে ২৬১ক-সংখ্যক গানগুলি বর ও কনেকে স্নান করাইবার গান। বরের উদ্দেশে বলা হইতেছে, আজিকার স্নান তোমার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা, কেননা, 'আজিকার সিনানে রে বাবা, পাইলেন শেযার দোসর (শয্যাসঙ্গী) রে বাবা' (সং ২৬০খ)। বিবাহের মাধ্যমে বরের শয্যাসঙ্গী পাইবার প্রসঙ্গ যেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, কন্যার ব্যাপারে তেমনি খানিকটা ইঙ্গিত ও সাংকেতিকতার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে। কনের উদ্দেশে বলা হইতেছে, টাকা খরচ করিয়া তোমার বাবা যে দীঘি খনন করাইয়াছে, তাহাতে তুমি স্নান করিতেছ। সেই দীঘির ধারে যে আম গাছটি, ওই দেখ, তাহা মুকুলিত হইয়াছে, তাহাতে ফল ধরিয়াছে (সং ২৬১)। এই মুকুল

CENTRAL LIBRARY

ও ফল কন্যার ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন এবং তাহার সন্তানবতী হইবার প্রতীক। পরবর্তী গানখানিতে এই ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট। এয়োরা বলে, ওগো মেয়ে, তোমার 'নদী'তে কি 'কাপড় কাচিতে' দিবে, তোমার 'কুয়া'টিতে কি মাছ মারিবার জন্য 'ছিপ' ফেলিতে দিবে? (সং ২৬১ক)। এই 'নদী' ও 'কুয়া' স্ত্রী-অঙ্গকে এবং 'ছিপ' পুরুষ-অঙ্গকে নির্দেশ করিতেছে।

কন্যাসাজানি গান হইল ২৬২ক সংখ্যক গানটি। কন্যাকে শাড়ী-গয়না পরাইবার সময়ও এয়োরা তাহার সহিত কৌতুক করিয়া থাকে। বহুগানে দেখা যায়, কল্পনা করা হইতেছে, যাহার সহিত কন্যার বিবাহ হইবে, তাহাকে কন্যার পছন্দ হয় নাই। বিপরীত রূপে,—বরেরও কন্যাকে পছন্দ হয় নাই বলিয়া গান আছে। সেই কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয়, বিবাহের সব স্থির হইয়া গিয়াছে, এমনকি গায়ে হলুদ পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে, এখন কি বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙা যায়? কন্যাকে তখন নতুন শাড়ী-গয়নার ঔজ্জ্বল্য দেখাইয়া মনের খেদ দূর করিতে বলা হইয়াছে (সং ২৬২ক)।

২৬৩ হইতে ২৬৫-সংখ্যক গানগুলি কন্যার গৃহে বরের আগমন এবং বরকে বরণ করিবার গান। কন্যার মায়ের জবানীতে এয়োরা গায়, মাথায় টগরের ফুল দিয়া জামাই আসিতেছে, ওই শোনো তাহার বাজনা (সং ২৬৩)। পাল্‌কি চড়িয়া বর আসিয়াছে, সেই পাল্‌কি বাড়ীর দুয়ারে নামানো হইয়াছে (সং ২৬৪)। এয়োরা বরণডালা হাতে লইয়া তাহাকে বরণ করিতে গেল (সং ২৬৪ক)। পরবর্তী গানটি (সং ২৬৫) বরণডালা দিয়া বরকে বরণ করিবার গান।

তারপর কন্যার বিবাহ-সভায় যাওয়া। পিতা-মাতা এবং অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করিয়া কন্যা বিবাহ-সভায় যাইতেছে। পিতা, মাতার নিকট হইতে কন্যা বিদায় চাহিবার কালে অভিযোগের সুরে বলে, ওগো বাবা, ওগো মা, এখন কেন কাঁদিতেছ; বর পক্ষ হইতে কন্যাপণের টাকা লইবার সময় মনে ছিল না? (সং ২৭১) বিবাহ সভায় কন্যাকে আনিবার পর 'ফুল মারামারি' হইবার সময় গীত গানে এয়োরা বলে, যে তোমার শাঁখা, সিঁদুর গহনার 'মান্‌ষি', কাল বাড়ী খালি করিয়া সে তোমাকে লইয়া যাইবে (সং ২৬৮)।

ইহার পর কন্যার পিতা সম্প্রদান করিতেছে। 'সুতা-হরতকী হাতে নিয়া', 'ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়া' কন্যা-সম্প্রদানকালে পিতার জবানীতে এয়োরা কন্যাকে বলে, আজ হইতে তুই কুল ও গোত্রের বহির্ভূত হইয়া গেলি (সং ২৮০)। ২৮১-সংখ্যক গানটি বিবাহের পর বরের বিদায় লইবার গান। এয়োরা বলে, আদরের জামাই বিদায় মাগিতেছে, কি কি দান-যৌতুক দিয়াছ, এইবার তাহা বাহির করিয়া দাও।

২৮৫ হইতে ২৮৭-সংখ্যক গানগুলি বরের বাড়ীতে বর-কনেকে বরণ করিবার গান। এই সময় বর ও কনে উভয়কেই উদ্দেশ করিয়া নানা কথা গানে বলা হয়, কন্যার উদ্দেশেই বেশি। কন্যার দেহসৌষ্ঠব, তাহার পিত্রালয়ের অবস্থা প্রভৃতি এই সকল গানের বিষয়।

বর-কনে আসিয়া বরের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়াছে। এয়োরা গাহিতেছে, ওগো বর, তুমি গেলে একলা, আসিলে দুইজন হইয়া। তুমি কার ঘরের 'কবুতর' (কন্যা) চুরি করিয়া আনিয়াছ (সং ২৮৫)। পরবর্তী গানগুলিও কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া। তোমার সঙ্গে তোমার ভাই-বোন কেহ আসিল না কেন, আসিতে এতো দেরি হইল কেন, তোমার শাড়ীটি অমন কেন, তুমি দেখিতে প্যাঁচার মতো, ইত্যাদি কথা গানের মধ্যে বলা হয়।

২৮৮-সংখ্যক গানটি বর-কনের কড়ি খেলিবার গান। কন্যা কড়ি খেলিতে হারিয়া গেল, সেই কথাই গানে বলা হইয়াছে।

শ্বশুরালয়ে আসিয়া কন্যা প্রথম দিন আনুষ্ঠানিকভাবে পাকস্পর্শ করিতেছে। গানে বলা হইতেছে, নতুন কলসী ভরিয়া কন্যা জল আনিল, তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধিল, থালা ভরিয়া তাহা পরিবেশন করিতেছে। ওগো বর, ঘরের সিঁড়ির কাছে বসিয়া তাহা খাও (সং ২৯৪)।

২৯৫-সংখ্যক গানটি 'অষ্টমঙ্গলা'-র গান। জলের নিকট বসাইয়া বর-কনের চাদরের বাঁধন খোলা হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ ৪ ॥

বিবাহের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ অনুষ্ঠানকে বর্ণনা করিবার ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। উপরে আলোচিত আনুষ্ঠানিক গানগুলি হইতে ইহা বোঝা যাইবে, শুধুই অনুষ্ঠানকে বর্ণনা করিবার প্রবণতা অপেক্ষা উহার মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া অন্য কথা ভরিয়া দিবার প্রবণতাই যেন বেশি।

এই আনুষ্ঠানিক গানগুলির মধ্যে বর ও কনের বিবাহকালীন এবং কনের পিতামাতার বিবাহকালীন মনোভাব মাঝে মাঝে সুন্দর ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক গান ছাড়াও এমন অনেক গান আছে, যেগুলি কেবল তাহাদের তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্যই রচিত। এইবার বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মানসিক পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে যে সকল গানে (আংশিক এবং সম্পূর্ণরূপে) তাহার আলোচনা করা হইবে।

বিবাহ ব্যাপারটি কনের মনে অধিকতর প্রভাব ফেলিয়া থাকে। বিবাহ-কালে কনের এই মানসিক পরিচয় গানের মধ্যে স্পষ্ট দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। একটি কাল্পনিক, অপরটি স্বাভাবিক।

কল্পনা করিয়া নেওয়া হয়, যাহার সহিত কন্যার বিবাহ হইতেছে, তাহাকে কন্যার পছন্দ হয় নাই। তাহার কারণ, কনের অন্য প্রেমিক-পুরুষ আছে; তাহার কারণ, বর দেখিতে সুন্দর নয়,—বয়সে সে বুড়া। এই জন্য যে দিন পাকা দেখা হইতেছে, সেদিন তাহার প্রেমিকের কথা মনে পড়ে (সং ২৫৩)। ঘটককে বলে, 'আজিকার মনে (মতো) ঘুরিয়া যা রে কাড়োয়া (ঘটক) মনত্ নাই মোর খুশি' (সং ২৫৩ক)। কন্যার মনে পড়ে, একদিন সে সরিষার ক্ষেতে শাক তুলিতে গিয়াছিল, এক যুবক হঠাৎ নিকটে আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়াছিল। তাহাকেই কন্যা বিবাহ করিতে চায়। পিতা-কর্তৃক নির্দিষ্ট বরকে তাহার মনে ধরে নাই (সং ২৫৪)। তাই হলুদ মাখিবার জন্যে পিঁড়িতে বসিতে কিংবা শাড়ী পরিতেও তাহার সাধ নাই (সং ২৫৭)। কন্যা তাহার পিতামাতাকে কাঁদিয়া বলে, বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য। তাহারা বলে, গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে, এখন সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায় না (সং ২৬২, ২৬২ক)। পরিবারের সকলের নিকট কন্যা কাঁদিয়া বলে, ওই বুড়া বরটিকে আমি বিবাহ করিব না। তাহারা বলে,

CENTRAL LIBRARY

ইহা তো তামা-কাঁসা নয়, যে পছন্দ হইল না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিব (সং ২৭২)।

শ্বশুরালয়ে কন্যার মনের দুঃখের কথা ব্যক্ত হইয়াছে একটি গানে (সং ২৭৯)। পিত্রালয়ের মতো এখানে অবাধে চলাফেরা করা চলে না। অবশ্য, গানটিতে বলা হইয়াছে, কন্যা পূর্ব-প্রেমিকে আসক্ত, তাই সে চলিলেই যাহাতে শব্দ হয়, সেই জন্য পায়ে নূপুর পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কাল্পনিক ব্যাপারটিকে বাদ দিলে নব-পরিণীতা বধূর ব্যথা ইহাতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবাহ কালে কন্যার মানসিক অবস্থার কাল্পনিক পরিচয় দিয়া গান গীত হইয়া থাকে। বিবাহ-গীতির মধ্যে এই ধারাটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা। লক্ষ করা প্রয়োজন, এই ধারাটি সমাজের বিশেষ একটি দিককে আলোকিত করিতেছে। ইহা কাল্পনিক বটে, কিন্তু কি জন্যে এইরূপ কাল্পনিক ধারা উৎসারিত হইল, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। সত্যই তো, অনেক সময় কন্যার বরকে পছন্দ হয় না, বর বৃদ্ধ বলিয়া তাহার খেদ হইয়া থাকে; ইহা যেন সেই সকল দুর্ভাগ্যবতী কন্যার পক্ষ হইতে তাহাদের অভিযোগ। এই দিক দিয়া দেখিলে, কন্যার এই কাল্পনিক খেদ ও অভিযোগের মূল কারণ বোঝা যাইবে।

বিবাহকালে কন্যার মনের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। পিতা-মাতা-ভাইবোনকে পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত এক ব্যক্তির গৃহে চির জীবনের মতো চলিয়া যাইবার স্বাভাবিক বেদনা কয়েকটি বিবাহ-গীতিতে আলোচিত হইয়াছে। এই বেদনা কাল্পনিক নহে, ইহা স্বাভাবিক এবং বাস্তবিকই ইহা হইয়া থাকে। ২৮৪-সংখ্যক গানখানি এই দিক দিয়া সুন্দর। এই গানের প্রথম স্তবকে আছে, পিত্রালয়ের 'কবুতর'গুলি উড়িয়া আসিয়া কন্যার শ্বশুরালয়ে বসে, কন্যা তাহাদের সরিষা খাইতে দেয়। অর্থাৎ কন্যার মন যেন পারাবত হইয়া পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ে যাওয়া-আসা করিতেছে। দ্বিতীয় স্তবকটি আরো সুন্দর। বরের সহিত কনে শ্বশুরালয়ে যাইতেছে, এমন সময় বৃষ্টি আসিল, বর ও কনের ধুতি-শাড়ী ভিজিয়া গেল। এই বৃষ্টি কন্যার কান্নার প্রতীক।

২৭১, ২৮০, ২৮২ ও ২৮৩-সংখ্যক গানগুলিতে কন্যার পিতা ও মাতার

মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। কন্যা বিবাহসভায় যাইতেছে, পিতা-মাতার নিকট হইতে সে বিদায় লইতে আসিয়াছে।—

হাত-পা ধুইয়া ময়না
গেলো বাপোর কাছে ;—
বাবায় তুলিয়া নিলে কোলে :
পরায় নিগাবে (লইয়া যাইবে)—
ঘর মোর করিয়া যাবে খালি রে।—সং ২৭১

একই বেদনা মায়ের কণ্ঠ হইতেও শুনিতে পাই।

কন্যাকে সম্প্রদানকালে পিতা তাহার অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না : যে ছিল আত্মজা, আজ হইতে সে কুল-গোত্রের বহির্ভূত হইয়া গেল,—

ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়া
দয়ার বাবা মুছে চোখুর পানি রে,
কি ওরে দয়ার বাবা রে।
আজি হাতে হলো বেটী
গোতের (গোত্রের) বাহিরো রে—
কি ওরে দয়ার বাবা রে॥—সং ২৮০

কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনা মায়ের বুকেও করুণ সুরে বাজিয়াছে। কন্যার বিদায় কালে মা বিলাপ করে, 'বাচ্চা হাতে পুষিনু মা-জননী কোলা-পিঠি করি'—সেই মা আমার আজ পরের ঘরে চলিয়া যাইতেছে। আগে যদি জানিতাম, মা আমার পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, তবে এতো দিন যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার জন্য টাকা লইতাম (সং ২৮২)। কন্যার মায়ের করুণ কান্নায় এয়োগণ সান্ত্বনা দিয়া গায়, 'কেনে কান্দিস্ কইনার মাও উনিয়া-গুনিয়া'। তুমি বিবাহ দিয়াছ বলিয়াই তোমার কন্যা চলিয়া যাইতেছে। কন্যার বিচ্ছেদ যদি তোমার কাছে এতো বড়ো বলিয়াই মনে হয়, তবে তাহাকে বিবাহ না দিলেই তো হইত (সং ২৮৩)॥

। ৫ ।

বর, কনে, তাহাদের শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য স্বজন এবং বরযাত্রীদের লইয়া রঙ্গ-তামাশা করা বিবাহ-গীতির অপর এক প্রধান ধারা। এই রঙ্গ-তামাশা স্থানে স্থানে অশোভন ও স্থূল ভঙ্গিতে, জঘন্য ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই স্থূলতা লোক-মানসের দৃষ্টি হইতে বিচার করিলে মোটেই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

বর ও কনের উভয়পক্ষ পরস্পরকে নিন্দা ও ঠাট্টা করিয়া যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে বলে 'হেরোয়া গান'। 'পরাস্ত করা' এই অর্থে 'হারাইয়া' দেওয়া হয় যে গান দিয়া, তাহাই 'হেরোয়া গান'। এই গানের অন্তর্নিহিত জঘন্য ইঙ্গিতগুলি নিতান্তই কল্পিত, তাই কেহ ইহার জন্য কিছু মনে করে না।

নিন্দা, রঙ্গ ও কৌতুক করিবার গানগুলিকে অপর উপধারায় ভাগ করা যায়। প্রথমে, কনের বাড়ীতে কনেকে লইয়া রঙ্গ এবং কনের বাড়ীতে বরকে লইয়া রঙ্গ, নিন্দার গানগুলি আলোচনা করা হইবে। কনের গৃহে সাধারণত বরকে লইয়াই বেশি রঙ্গ করা হয়; এই রঙ্গ সময়-সময় রূঢ় ও স্থূল হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই কনের গৃহে কনেকে লইয়া রঙ্গ-তামাশাগুলি স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। আবার, যখন শ্বশুরালয়ে কনেকে লইয়া রঙ্গ-তামাশা করা হয়, তখন কনের গৃহে বরকে যে সকল কথা বলিয়া নিন্দা ও অপমান করা হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ কনের উপর বরের গৃহের এয়োগণ লইয়া থাকে।

কনের গৃহেই কনেকে ঠাট্টা-তামাশা করিবার উপাদানের মধ্যে একটি হইল, কনের বর পছন্দ হয় নাই, কিংবা তাহার অন্য প্রেমিক পুরুষ আছে ইত্যাদি। এই ব্যাপারের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। কখনো বা অল্পবয়সী কনেকে 'বুড়ী' বলিয়া ঠাট্টা করা হয় (সং ২৫৭খ, কথান্তর)। কনেকে ঠাট্টা করিবার অপর এক নিদর্শন পাই ২৬১ক সংখ্যক গান হইতে। কনের গৃহেরই এয়োগণ কনেকে বলে, তোমার 'নদীতে', ওগো কনে, কাপড় কাচিতে দিবে, তোমার 'কুয়া'-টিতে কি মাছ মারিবার জন্য 'ছিপ' ফেলিতে দিবে: অর্থাৎ তোমার দেহ কি ভোগ করিতে দিবে?

বরের পাল্‌কি আসিয়া কনের দুয়ারে থামিয়াছে। এয়োগণ বলিতেছে, কে কে গেল বরকে বরণ করিতে? ওই দেখ, কনে নিজেই যাচিয়া গিয়াছে

CENTRAL LIBRARY

বরকে বরণ করিতে। 'দাচীয়ামারীটা আপনে আসিছে গে' (সং ২৬৪ক ; দাচিয়ামারী—যে যাচিয়া আসে)।

বিবাহ-বাসরে হয়তো কন্যা কাঁদিতেছে না। এয়োগণ গায়, ওগো কনের চোখে 'ভটরা মরিচ' লাগাইয়া দাও, তবেই কনের চোখে জল আসিবে (সং ২৭০)।

কনের শাড়ী-গয়না লইয়াও এয়োগণ তাহাকে ঠাট্টা করিয়া থাকে। যেমন, ২৭৪-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, ওগো কনে, তোমার ওই শাড়ী-গহনা অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া তোমার বাবা-মা তোমাকে পরাইয়াছে। কনেকে লইয়া এই সকল ঠাট্টা বেশ স্নিগ্ধ।

কিন্তু কনের গৃহে বরকে যথেষ্ট অপমান করা হইয়া থাকে। 'জরম-ঠেঙ্গুয়ার বেটা' (ইহা এক কায়িক গালি বিশেষ : অর্থাৎ যে জন্ম ধরিয়া খোঁড়া) বলিয়া বরকে একাধিক গানে তিরস্কার করা হইয়াছে। বরের পাল্‌কি যখন কনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহাকে বরণ করিবার ভাষা এই,

কোন্‌ঠেকেনা (কোথায়) গেলো মাইর
বড়ো ভাইয় রে ;
নিকাল (বাহির) করিয়া দে তো
জরম ঠেঙ্গুয়ার বেটাক রে ॥—সং ২৬৪

বরণ-কুলা দিয়া বরকে বরণ করিবার সময় এয়োগণ বলিতেছে, ওগো বর কী দেখিতেছ এই বরণডালার দিকে। আমরা জানি তোমার মা, বোন, খুড়ী, পিসি সকলেই চরিত্রহীনা (সং ২৬৫)।

কন্যাপণ ও কন্যাপক্ষের দাবী-দাওয়া ঠিকমতো জোগাইতে না পারিলে বরকেই এয়োরা দু-কথা শুনাইয়া দেয়। তাহারা গায় 'শাঁখা মুঠি', 'মালা' 'শাড়ী', নোলোক, কাটাবাজু, ঠ্যাংখাড়ু প্রভৃতি অনেক কিছুই তো, ওগো বর, তোমরা দিতে চাহিয়াছিলে। তোমার বাবার লজ্জা-শরম নাই, তাই প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা রক্ষা করে নাই (সং ২৬৭)।

বরের রূপ ও দেহ-সৌষ্ঠব লইয়া এয়োরা রীতি-মতো ব্যঙ্গ করিয়াছে। যেমন, আমাদের কনের রূপের ছটা চাঁদের মতো, রূপার মতো। আর বরটি যেন কালো কাঠ একটা, চোখ দুইটা ড্যাব্‌ডেবে। পিঠটা ধোপার পাটের মতো, তাহাতে কাপড় কাচা চলে (সং ২৬৮)। আবার : আমাদের মেয়ে

CENTRAL LIBRARY

ছোটো একটা শাড়ী পরিয়াছে, তাহাতেই তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছে। আর ওই আধ-বুড়া বরটা অতো বড় একটা ধুতিতেও সর্বাঙ্গ ঢাকিতে পারে নাই, উরুটা দেখা যাইতেছে। আমাদের মেয়ে প্রণাম করিল, তাহাতে অঙ্গনটিই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আর ওই আধ-বুড়া বরটা তাহার উঁচু কপাল লইয়া প্রণাম করিতে যাইয়া মাটিতে ঠোক্কর খাইল (সং ২৭৮)।

বরের বাড়ীঘর এবং পারিবারিক অবস্থা, নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াও তামাশা করা হয় : তোমাদের বাড়ীতে নাকি বড়ো বড়ো ঘর। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, সেগুলি শূয়োরের খোপের মতো ছোটো। ঘরের মেঝে খালি। অঙ্গনটি অপ্রশস্ত এবং তাহাতে প্রচুর কাদা। খাইতে দিবার সময় যে চিঁড়া খাইতে দিয়াছ, তাহাতে অনেক ধান ছিল, দইয়ের মধ্যে ছিল জল (সং ২৯৯, ঐ কথান্তর)। ইহা ছাড়া ৩০১ক, ৩০১খ, ৩০১গ ও ৩০১ঘ-সংখ্যক গানে বরকে লইয়া নানা প্রকার কৌতুক করা হইয়াছে।

কনের বাড়ীতে বরকে যে সকল তিরস্কার সহ করিতে হয়, বরের বাড়ীতে আসিয়া কনেকেও সেই ধরণেরই তিরস্কার ও গঞ্জনার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা যেন এক স্থান হইয়া অপমানিত হইয়া প্রতিপক্ষকে তাহার উত্তর প্রদান।

বিবাহ করিয়া বর কনেকে লইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। বরের বাড়ীর এয়োগণ গান ধরিল, ওগো সঙ্গে করিয়া ও কোন্ 'হাড়ীর'-র মেয়েকে লইয়া আসিয়াছে (সং ২৮৫)। শুধু কনেকেই 'হাড়ী' বলিয়া রেহাই দেওয়া হয় না, তাহার পিতাকে 'কাহার', 'হাড়ী' ইত্যাদি নীচু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হয়। ২৮৬ক-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, ওগো কনে, তোমাদের আসিতে এতো রাত হইল কেন, জানি। তোমার বাবা তো শূয়োর চরায়, সেই শূয়োরের পরিচর্যা করিতে তোমার দেরি হইয়াছে।

রাজবংশী সমাজের রীতি এই যে, বিবাহের পর কনের সহিত তাহার ভাই বা বোন কেহ সঙ্গে যাইয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া থাকে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া এয়োরা বলে, লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, ওগো কনে, তোমার অনেক ভাই, অনেক বোন। কিন্তু সঙ্গে আসিবার বেলা কেহই তো আসিল না (সং ২৮৬)।

CENTRAL LIBRARY

বরকে যেমন তাহার বেশ-বাস ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব লইয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল, কনেকেও সেইরূপ করা হয়। বলা হইতেছে, ওগে কনে, তোমাদের বাড়ীতে ঘরগুলির চাল নাই, কাক আসিয়া হাঁড়ী হইতে ভাত খাইয়া যায়। এদিকে তো ঘরের চাল নাই, অথচ দেমাক দেখাইবার জন্য তোমার 'মাড়োয়ারী বাবার' ('কাইয়া বাপোর') দেওয়া ভালো একটি শাড়ী পরিয়া আসিয়াছ তো (সং ২৮৬খ)। আমাদের ছেলে 'কাঞ্চাসোনা'; আর ঘটক যে কন্যাটির সহিত বিবাহ স্থির করাইল, সে 'কালুয়া পেঁচী'। ওগো ঘটক, তোমার পাত্রী তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও (সং ২৮৭)। বরণডালায় যে প্রদীপ জলিতেছে, তাহার চেয়েও উজ্জল হইল আমাদের ছেলের রূপ। ওই 'কম্বক্তার বেটী' (ফারসী কম্বখৎ, অর্থাৎ—হতভাগা)-টার ভাগ্য ভালো, তাই এমন সুন্দর বরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে (সং ২৮৭ক)। আমাদের ছেলে ধুতি পরিয়াছে, তাহাকে কী সুন্দর দেখাইতেছে। সেই ধুতির আঁচলে সে নাড়ু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর এই কনেটা কী 'নিলাজী'—চহিয়া-চাহিয়া কয়েকটা নাড়ু খাইয়া ফেলিল (সং ২৮৯)। আমাদের ছেলে আঙিনায় বসিয়াছে, তাহাতে অঙ্গনটিই উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। আর কনে যেখানে বসিয়াছে, সে জায়গাটি অন্ধকার (সং ২৯০)। ঘটক-বেটা মিথ্যাই টাকা লইয়াছে। একটা রোগা মেয়েকে ('ভিমা-মাউরিয়া') আনিয়া দিল। ওরে আমাদের অল্পবয়সী ছেলে, এই আধা-বুড়ী মেয়েটি কি তোর বউ হিসাবে শোভা পায় (সং ২৯১)। কড়ি খেলিতে যাইয়া কনে হারিয়া গেল। সে জন্যও তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনার সম্মুখীন হইতে হয় (সং ২৮৮)।

রঙ্গ-তামাশার তৃতীয় উপধারা হইল—বরযাত্রী, নাপিত, পুরোহিত, ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া গীত রঙ্গ-ব্যঙ্গের গান।

রাজবংশী সমাজের নিয়ম এই যে, বর যখন বিবাহ করিতে যায়, তখন তাহার সহিত কয়েকজন মহিলা-বরযাত্রীও এয়োরূপে যাইয়া থাকে। এই বরপক্ষের মহিলা-বরযাত্রী ও কনেপক্ষের এয়োদের মধ্যে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া গানের লড়াই চলে।

২৯৬-সংখ্যক গানে বর-পক্ষীয় এয়োগণ কন্যার পিতাকে লইয়া রঙ্গ করিয়া কহিতেছে, কন্যার বাপটি খোঁড়া, সে পায়ের জুতা হাতে লইয়া ঘরের

CENTRAL LIBRARY

কোথায় দাঁড়াইয়া আছে। ওগো কনের বাপ, এদিকে আইস, আমরা তোমার জুতা কাড়িয়া লইব না।

তেমনি কন্যাপক্ষীয় এয়োগণ গাহিতেছে, বরপক্ষীয় এয়োদের নিতম্ব গুরু। ওগো, শীঘ্র একটা খুরপি লইয়া আইস, খানিকটা করিয়া মাংস কাটিয়া লই (সং ৩০০)। রসুনের তরকারি রাঁধিয়া বরপক্ষীয় এয়োদের গায়ে ঢালিয়া দিলাম। ওই দেখ, উহারা ছুটিয়া পলাইতেছে (সং ৩০১)।

ক্ষৌরকার ও পুরোহিত লইয়াও কৌতুক করা হয়। পুরোহিতকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, ওগো ব্রাহ্মণ-ঠাকুর, তুমি তো শূয়োর চরাও, একটা ডোমনীকে বিবাহ করিয়া জাত খোয়াইয়াছ। তাই দেশে তোমার পিতা-মাতা কাঁদিতেছে (সং ২৯৭)। নাপিতকে বলা হইতেছে, ওগো আধা-বুড়া নাপিত, ঘুমাইয়া পড়িয়াছ কেন, ওঠ। উঠিয়া আমাদের কনের (বা বরের) ক্ষৌরকাজ করিয়া দাও। সাবধানে ক্ষৌরকাজ করিয়ো, কনের (বা বরের) ব্যথা লাগিলে তোমার ক্ষুর কাড়িয়া লইব (সং ২৯৮)।

॥ ৬ ॥

দাম্পত্য জীবনের চিত্র আঁকিয়া বর-কনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার প্রবণতা দুই-একটি বিবাহ-গীতিতে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল গানে ঠাট্টা-রসিকতা থাকিলেও আসলে তাহার সুর ঠাট্টার নয়। ইহা যেন ভাবী দম্পতিকে এক প্রকার উপদেশ দান।

কনের বাড়ীর এয়োগণ বরকে উদ্দেশ করিয়া গাহিতেছে, ওগো বর, বাঁশবনের তলায়-তলায় তুমি গোরু চরাইলে। অনেক বাছিয়া শেষে বাঁশ গাছ হইতে একটি কঞ্চি নিলে। কঞ্চি দিয়া গোরু খেদাইয়া তুমি বাড়ী আসিলে। বাড়ী আসিয়া সেই কঞ্চি দিয়া তোমার স্ত্রীকে প্রহার করিলে। সেই প্রহারের ফলে তোমার স্ত্রীর ছয় মাসের গর্ভ নষ্ট হইল (সং ২৭৭ক)।

গানখানি গাহিবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই—গর্ভবতী স্ত্রীকে ভাবী স্বামী যেন প্রহার না করে অথবা অন্য কোন রূপ অত্যাচার না চালায়।

আর একটি গানেও এই একই ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে গাওয়া হইতেছে, বুঁজিয়া আসা মাটির কুয়ার পরিষ্কার জলে, ওগো বর, এতোক্ষণ মাছ মারিলে। মাছ মারিয়া এতো রাত্রি হইয়া। এতো রাত্রিতে

CENTRAL LIBRARY

সেই মাছ রাঁধিতে বলিতেছ স্ত্রীকে। স্ত্রী অপারগ হওয়ায় সরু বেত দিয়া তাহাকে তুমি প্রহার করিলে (সং ২৭৭)।

২৯২-সংখ্যক গানে দাম্পত্য-জীবনের একটি স্নিগ্ধ দিকের উপর আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে। গানটিতে এয়োরা বরকে বলিতেছে, ওগো বর, উত্তর দিকে ওই যে এক জোড়া শূয়োর আছে,—উহাদের দেখিয়া তোমার বউ ভয় পায়। যাও না, কোমরে ছুরি লইয়া উহাদের মারিয়া ফেল,—তোমার বউ রাগ করিয়াছে, উহাদের মাংস পাইলে সে সন্তুষ্ট হইবে (সং ২৯২)।

দাম্পত্য-জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে বরকে যেমন উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া হয়, তেমনি বরের বাড়ীর এয়োগণও কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ-নির্দেশ দিয়া থাকে। এয়োরা কন্যার জবানীতে গাহিতেছে, ক্ষেতে আমার প্রিয়তম পাট নিড়াইতেছে, পাট নিড়াইয়া তাহার পিপাসা পাইয়াছে। কিন্তু, কাহার হাতে তাহার জন্য জল পাঠাইব (সং ২৯৩)। গানখানির দ্বিতীয় স্তবকে কন্যার প্রতি যে মন্তব্য বর্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, গায়িকারা বলিতে চাহিতেছে, ওগো বউ, তোমার রূপের দেমাক রাখো,—স্বামীর তৃষ্ণা দূর করিতে গড়িমসি করিয়ো না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কৃষি-কার্যের মরশুমে স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়েরাই কৃষকের ভাত-জল ক্ষেতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে দ্বিপ্রহর বেলায়॥

॥ ৭ ॥

উপরে আলোচিত বিভিন্ন ধারার বিবাহ-গীতিগুলির বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গির একটা বিশেষত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিষয়বস্তু যেমন সাধারণ, উহার প্রকাশভঙ্গিও তেমনি সরল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা তুচ্ছ,—শিক্ষিত মানুষের চোখে সেগুলি লইয়া আদৌ গান রচিত হইতে পারে না। কিন্তু, সেই সকল বিষয়ই এখানে গানের উপাদান রূপে বিবেচিত হইয়াছে। গানগুলি বিচার করিবার সময় আরো একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। ইহা লোক-সঙ্গীত তো বটেই, উপরন্তু স্ত্রীলোকেরাই ইহার রচয়িতা, তাহারাই ইহা গাহিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের মনের কথা স্ত্রী-লোকেরই নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গিতে এখানে পাই।

বিবাহ-ব্যাপার নারী-জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করিয়া থাকে। নারী নারীত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপারটি জীবনের একটি অতি-পরিচিত

CENTRAL LIBRARY

স্থূল দিক। অথচ দেখি, এই ঘটনাকে কখনোই স্পষ্ট রূপে না বলিয়া ইঙ্গিতের মাধ্যমে বলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাকেও একটা বিশেষত্ব বলা চলিতে পারে।

২৬১ক ও ২৭৩-সংখ্যক গান দুইটি এ বিষয়ে উল্লেখ্য। ২৬১ক-সংখ্যক গানটিতে বর ও কনের স্বামী-স্ত্রীরূপে পরিগণিত হইবার জন্য দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত মিলে। এই দিক দিয়া ২৭৩-সংখ্যক গানখানি সুন্দর। এই গানে কন্যাকে বসুন্ধরার সহিত উপমিত করা হইয়াছে। কন্যা বলিতেছে, বাড়ীর আঙিনায় সারি-সারি কলাগাছ 'গাড়া' হইল, সেই কলাগাছের পাতায় বাড়ী ছাইয়া গেল। শামিয়ানা টাঙানো হইল, বাবার বাড়ীর কী শোভা ধরিল!

কলার পাতা ও শামিয়ানা যেমন বাড়ীর অঙ্গনকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তেমনি বিবাহ-কালীন স্বাভাবিক লজ্জাও কন্যাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই লজ্জা কি ও কেন, দ্বিতীয় স্তবকে তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে। নারীত্বে প্রতিষ্ঠা এবং ভাবী সন্তানবতীর আনন্দ-জড়িত লজ্জাই সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে। কন্যা নিজ-মুখে তাহার মাকে বলিতেছে, ওগো মা, দেহে আমার কতো 'খেসেরি কালাই', কতো 'মুসুরি কালাই' ফলিয়াছে। আমার দেহের বৃক্ষে কতো 'মরুচ' ফলিয়া 'ঝুম্-ঝুম্' করিয়া বাজিতেছে (সং ২৭৩)!

অত্যন্ত দুঃখের কথা, গানটির শেষ দুই পঙ্ক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পাইলে একখানি সুন্দর গান সঙ্কলিত হইতে পারিত।

॥ ৮ ॥

নর-নারীর বিবাহ ছাড়াও বৃক্ষলতা ও ইতর প্রাণীর বিবাহের গান বর্তমান সঙ্কলনে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে মাছের বিবাহের গানের আলোচনা 'মানুষ ও ইতর-প্রাণী' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষের বিবাহের গানের জন্য পৃথক করিয়া কোনো পরিচ্ছেদ রচনা করা হয় নাই। সংখ্যায় একটি মাত্র বলিয়া নর-নারীর বিবাহের শেষে এইটি সঙ্কলিত হইয়াছে।

বট গাছের সহিত পাকুড় গাছের বিবাহ দিবার প্রথা বহু জায়গাতেই লক্ষ করা যায়। বর্তমান সঙ্কলনের ৩০২-সংখ্যক গানটি এইরূপ বট ও পাকুড়ের একটি বিবাহ গীতি।

CENTRAL LIBRARY

বটের সহিত পাকুড় গাছের বিবাহ সাধারণত নিঃসন্তানা বিধবাগণই দিয়া থাকে। তবে, পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে অন্যেরাও যে না দিয়া থাকে এমন নয়। এই বিবাহে বট গাছকে কন্যা এবং পাকুড় গাছকে বর বলিয়া কল্পনা করা হয়। বিবাহের সময় বট গাছের গুঁড়িতে একটি ধুতি জড়াইয়া দেওয়া হয়। নর-নারীর বিবাহের অনুকরণে বট ও পাকুড় গাছের পক্ষ লইয়া এয়োগণ বিভক্ত হইয়া যায় এবং গানের লড়াই করে। এই সময়ে নর-নারীর বিবাহ কালীন অনেক গানও গীত হইয়া থাকে।

আলোচ্য বিবাহ-গীতিটির প্রথম স্তবকে বলা হইতেছে, পাকুড় গাছ রোপণ করিয়াছিলাম, আজ তাহা বড়ো হইয়াছে, বড়ো আশা করিয়া বট গাছের সহিত আজ উহার বিবাহ দিতেছি। এই আশা কী, তাহা অনুমান করা যায়। বৃক্ষ এখানে উর্বরতা ও মানুষের প্রতীকরূপে পরিগণিত। যে নারী নিঃসন্তান, সে ভাবে, বট-পাকুড়ের মিলনের ফলে যেমন চারা গজায়, তেমনি তাহারও সন্তান হইবে, ইহা অনুকরণাত্মক যাদু-অনুষ্ঠান। আর যে বিধবা নিঃসন্তান, ইহার অনুষ্ঠান করে, সে ভাবে, তাহার কোন সন্তানাদি নাই, ওই বৃক্ষচারাই তাহার বংশ রক্ষা করিবে। গাছই এখানে সন্তান।

॥ গর্ভবতীর প্রতি ॥

জন্মের সূচনা পারিবারিক জীবনে আনন্দের বার্তা বহিয়া আনে। এই এই আনন্দকেই গানে রূপ দেওয়া হইয়া থাকে।

গর্ভবন্দনা করিয়া গান মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজেও গর্ভকালীন গান চলিত আছে। পূর্ববঙ্গেও এই ধরণের গান চলিত আছে, কিন্তু তাহাতে প্রত্যক্ষতা নাই, রাম-সীতার নামের বকলমে তাহা উপস্থিত করা হয়।

বর্তমান সঙ্কলনের এই জাতীয় দুইখানি গানই বিশেষত্ব পূর্ণ। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত এই ধরণের গানে নীরস বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র, নতুন শিশুর আগমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিবার উদ্দেশে গর্ভবতীকে লইয়া রঙ্গ-কৌতুক করিবার প্রবণতা প্রকাশ পায় না।

কিন্তু বর্তমান সংকলনে ৩০৩-সংখ্যক গানের মধ্যে দেখিতেছি, এখানে গর্ভবতীর সমবয়সীরা আসিয়া তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-কৌতুক করিতেছে। পড়শীরা কহিতেছে, তুমি পিতা-মাতার এতো আদরের কন্যা। এদিকে তোমার প্রসব কালীন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইহার জন্য তো তাহাদের চিন্তা করিতে দেখি না। পিতা-মাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহারা আদৌ চিন্তিত হয় নাই বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গানটির অপর বিশেষত্ব হইল, নায়িকাকে এখানে 'সীতা' না বলিয়া 'নন্দরাণী' বলা হইয়াছে। এই 'নন্দরাণী'-র সহিত বৈষ্ণবতার কোনো সম্পর্ক যদিও নাই, তবু এই উল্লেখ টুকুও লক্ষ করিবার মতো। ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহার রচনাভঙ্গির মধ্যে। একই বক্তব্য একই ভাষায় একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করিয়া (যেমন, মাতা, পিতা, ভাই, বোন, খুড়া, খুড়ী, জ্যেঠী প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া) গান করিবার মধ্যে লোক-সঙ্গীতের নিজস্ব রীতিটি অনুসৃত হইয়াছে।

পরবর্তী গানটি (সং ৩০৩ক) গর্ভবতীর পক্ষ হইতে উক্ত ঠাট্টার উত্তর। ইহাও এক বিশেষত্ব। গর্ভবতী রমণী এখানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা লয় নাই। বরং তাহার তরফ হইতে পড়শীদের কৌতুকের উত্তর দিবার মধ্যে সমস্ত কৌতুকটি পারস্পরিক হইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়াছে। গর্ভবতী রমণী কহিতেছে, ওই 'উন্নত-নাসা' ('ডগুড়া-নাকী') মেয়েটি এই সকল কথা বলিবার

CENTRAL LIBRARY

জন্ত বসিয়া আছে। আমি সেই সকল কথা শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। গর্ভবতী নারীর লজ্জা-জড়ানো সুখানুভূতিটি ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গানটির রচনা-রীতি লক্ষণীয়। ইহাতেও দেখিতেছি একই কথা বিভিন্ন পড়শীর দৈহিক বিশেষত্বের (যেমন 'ট্যারা', 'ল্যাংড়া', বাঁকামুখী, লম্বামুখী) উল্লেখ করিয়া গীত হইয়াছে, যাহা লোক-সঙ্গীতের এক রচনাগত বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে, এই সকল গান গাহিবার পদ্ধতিটিও উল্লেখযোগ্য। পড়শীরা আসিয়া যখন গর্ভবতীকে উদ্দেশ করিয়া গান গাহিতেছে, তখন যাহার উদ্দেশে ইহা গীত হইতেছে, অর্থাৎ গর্ভবতী রমণী, সে-ও তখন চুপ করিয়া থাকে না। পড়শীদের সঙ্গে সঙ্গে সেও নিজের উদ্দেশেই নিজেও গান গাহিয়া থাকে। আবার, গর্ভবতীর পক্ষ হইতে যখন উহার জবাব দেওয়া হয়, তখন যাহাদের উদ্দেশে তাহা বলা হয়, অর্থাৎ পড়শীরা, তাহারাও গর্ভবতীর সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিয়া থাকে। এই রীতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নাটকের মধ্যেও লক্ষ করা যায়।

॥ কর্মজীবন ॥

॥ ১ ॥

কর্মজীবনের পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্যই কর্ম-সঙ্গীতের উদ্ভব। কিন্তু তথাপি দৈহিক শ্রম লাঘবই কিংবা মানসিক আনন্দ-প্রাপ্তিই এই ধরণের গানের প্রাথমিক স্তরের প্রেরণা ছিল না। এই ধরণের গানের মধ্যে একটি মন্ত্র-শক্তি আদিম মানুষ অনুভব করিয়াছিল, কর্ম-কালে তাহা গাহিলে কর্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইবে, এমন বিশ্বাস তাহারা করিত। একক অপেক্ষা সমবেত ভাবে তাহা করিলে মন্ত্রের জোর দ্বিগুণ হইবে, এই বিশ্বাসে ইহা সমবেত সঙ্গীতে পরিণত হয়। অবশ্য, আদিম মানুষের সকল কর্মই সমবেত।

কর্ম-সঙ্গীতগুলির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইল,—উহাদের সুর ও স্বরাঘাত কর্মের প্রকৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এইজন্যে ছাদ-পিটানোর গান বা নৌকা-বাওয়ার গানের সুর ও শ্বাসাঘাতের সহিত ধান কাটিবার গানের সুর ও শ্বাসাঘাতের পার্থক্য সহজেই ঘটিয়া থাকে।

কর্ম দুই প্রকার, একক ও দ্বৈত বা সমবেত। যে সকল কর্ম একক সাধারণত তাহাতে গান থাকে না। কিন্তু যখন একক কর্মের কালে গান গীত হয়, তখন সেই গান বিষয়ের দিক দিয়া যেমন ব্যক্তিধর্মী হয়, সুরের দিক দিয়াও তেমনি তান-প্রধান হয়। যে সকল কর্ম দুইজনে মিলিয়া করা হয়, তাহার একটা বিশেষত্ব হইল,—প্রশ্নোত্তর। একজন গান বা ছড়ার মধ্য দিয়া প্রশ্ন করে, অপর জন তাহারই উত্তর দিয়া থাকে। প্রশ্নোত্তর-মূলক গানগুলির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব থাকে।

এই প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে কর্ম-সঙ্গীত গাহিবার প্রবণতা সমবেত কর্মীদের মধ্যেও লক্ষ করিতে পারা যায়।

কর্ম-গীতি নারী ও পুরুষ সকলেই গাহিতে পারে। নারী ও পুরুষের জীবন ও মনের পার্থক্য কর্ম-গীতির মধ্যেও ধরা পড়ে।

কর্ম-গীতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—গৃহকর্ম ও বাহিরের কর্ম। পরিবেশের ভিন্নতার জন্য এই দুই প্রকারের গানের বিষয়বস্তুতেও অনেক সময় পার্থক্য আসিয়া যায়॥

CENTRAL LIBRARY

॥ ২ ॥

'ধান-কাটা'-র গানগুলির ভিতর প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইল, উহাদের মধ্য দিয়া চাষীর বহু পরিশ্রমের পর সুখানুভূতি ও আনন্দের প্রাণ-ঢালা প্রকাশ।

শুধু ধান কাটাই নয়, পাট রোপণ, পাট ক্ষেত নিড়ানো, পাট ধোয়া ইত্যাদি কর্মের সময়ও গান গাওয়া হয়।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কৃষি-ক্ষেত্রে গীত গানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তথাকার চাষীরা কৃষিক্ষেত্রেও প্রেমের গান গাহিয়া থাকে। এই সকল প্রেমের গান সবই টানা সুরে গাওয়া হয়,—যেন মাঠের উদ্দামতা আসিয়া তাহাতে ধরা পড়ে।

কৃষিকর্ম করিবার কালে মাঠেও প্রেমের গান গীত হয় বলিয়া ৩০৪খ সংখ্যক গানেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। এখানে একজন মাত্র কৃষক ধান কাটিতেছে। তাই এখানে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রকাশ হইয়াছে। প্রেমিকা বলে, ওগো, তোমার কাঁধ হইতে কেন ধানের বোঝা পড়িয়া গেল। প্রেমিক উত্তর দেয়, আমি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়াছি, তাই কাঁধের ধান মাটিতে পড়িয়া গেল।

৩০৪-সংখ্যক গানখানি মূলত ধান কাটারই গান নয়, ইহা তুক্কা-মনঃশিক্ষা পর্যায়ের গান। ধান কাটিবার প্রসঙ্গ থাকিবার জন্যই ইহা ধান কাটার সময় গীত হইয়া থাকে। কিন্তু, ইহা যখন ধান কাটিবার সময় গীত হয়, তখন ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করা হয়: ধান কাটিয়া লইবার পর ক্ষেতে ধানের গোড়ার অংশটুকু পড়িয়া থাক, তাহা জলে ভাসিয়া যাক, ক্ষতি নাই। ধান প্রাপ্তির আনন্দে কৃষক ধানের গোড়ার অংশটুকুকেও অবহেলা করিতেছে, ইহাই বিশেষত্ব।

৩০৪ক-সংখ্যক গানটি ধান কাটার গান হিসাবে সুন্দর। এক বৃদ্ধ চাষীর ব্যথা ইহাতে পরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃদ্ধ চাষী বলিতেছে, ওগো, তোমাদের কাহার কাহার অবসর আছে। আমার দেহে শক্তি নাই, বৃদ্ধ হইয়াছি,—তোমরা আসিয়া আমার ক্ষেতের ধানগুলি কাটিয়া দাও।

CENTRAL LIBRARY

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কৃষক সমাজে অপরের গৃহে বা ক্ষেতে যাইয়া কাজ করিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাকে বলে "হাউলি খাটা"॥

। ৩ ।

ধান ভানাকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বলা হয় 'ধানভুকানো' বা 'বারাকুটা' বা 'বারা ভুকানো'। ইহা সম্পূর্ণরূপে মেয়েলি গান।

ধান ভানিবার গান বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ধান ভানা হয় সাধারণত ঢেঁকিতে। এক বা একাধিক মেয়ে ধান ভানিয়া থাকে। পা দিয়া ঢেঁকিতে পাড় দিবার সময় একটি ক্লান্ত মন্থরতার, একটি ধীর গতির ভাব প্রকাশ পায়। এইজন্যে ধান ভানিবার গানগুলির মধ্যেও একটি দীর্ঘ ও বিলম্বিত লয়ের সুরের আবর্তন লক্ষ করা যায়।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ঢেঁকির প্রচলন নাই। সেখানে ধান ভানা হয় হাতে, উদূখলে। যাহার মধ্যে ধান রাখা হয় তাহাকে বলে 'ছাম'; এবং ইহার দীর্ঘ মুষলটিকে বলে 'গাইন'।

পা দিয়া ধান ভানিবার মধ্যে অনায়াসের একটি দীর্ঘ মন্থরতা আছে,—হাত দিয়া ধান ভানিবার মধ্যে তাহা নাই। ইহাতে পরিশ্রম অনেক বেশি। দুইহাতে দ্রুত ভঙ্গিতে 'ছামের' মধ্যে 'গাইন' ফেলা হয়। এইজন্যই বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধান ভানিবার গান পাওয়া যায়। কিন্তু, প্রান্ত-উত্তর বঙ্গে পাইতেছি ধান ভানিবার ছড়া। ইহার তালও দ্রুত। এই ছড়াগুলি পড়িলেই স্পষ্ট বোঝা যায়,—ইহার অন্তর্নিহিত শ্বাসাঘাতগুলি 'ছামের' মধ্যে 'গাইন' পড়িবার তালের সহিত নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

সঙ্কলিত ধানভানার ছড়াগুলির মধ্যে মেয়েলি ব্যাপার স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ সময়ই দুইজনে দুইটি মুষল ('গাইন') হাতে লইয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া ধান ভানিয়া থাকে। যেখানে দুইজন মিলিয়া ধান ভানে, সেখানে একজন প্রশ্ন করিয়া যায়, অপর জন তাহার উত্তর দিতে থাকে। নারী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম প্রভৃতিও অনেক সময় এই সকল ছড়ার বিষয় হইয়া থাকে।

ধানভানার ছড়াগুলির মধ্যে কয়েকটি ছড়া পাওয়া যায়, যে গুলির কোনো সুস্পষ্ট অর্থ নাই। কয়েকটি ছড়ার মধ্যে পারিবারিক জীবন ও নারীর

CENTRAL LIBRARY

জীবনের কথা আছে। কয়েকটির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরণ দিয়া এই সকল কথা স্পষ্ট করিতেছি।

৩০৫-সংখ্যক রচনাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহার মধ্যে ছড়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে।—

হেইসো হেইসো হেইসো।
তিলের নাড়ু খাইসো॥
তিল হইল্ গটা।
মোর হইল্ বেটা॥
তোর হইল্ নাতী॥
ধান ভুখা হাতী॥—সং ৩০৫

ইহার প্রথম পঙ্ক্তিটি কতকগুলি অর্থহীন অব্যয়ের সমষ্টি, পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য হাতের মুষল ফেলিবার তালে তালে বলা হয়। কিন্তু ইহার ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাস লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে, ওই অর্থহীন প্রথম পঙ্ক্তিটিই অন্যান্য পঙ্ক্তির উৎস। 'হেইসো-'র সহিত মিলের জন্যই 'খাইসো' আসিয়াছে। তাহার মধ্যে অকারণে 'তিলের নাড়ু-'র কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিল 'গটা' হইবার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু 'বেটা'-র সহিত মিলের জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। একজনের যখন 'বেটা' হইল, অপরজনের তাহাতে 'নাতী' হইতে অপরাধ নাই। কিন্তু এই 'নাতীর' প্রয়োজনীয়তা যে 'হাতী-'র সহিত মিলের জন্যে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্রভাবে ছড়াটির কোনোই সুস্পষ্ট অর্থ নাই। কিন্তু অর্থ না থাক, ছন্দ তো আছে। শ্রম লাঘব করিবার জন্য সেই ছন্দটুকুরই তো দরকার।

হাত দিয়া ধান ভানিবার মধ্যে যে একটি তাল আছে, সেই তালে আকৃষ্ট হইয়া অর্থহীন ছড়ার অপর নিদর্শন ৩১১ক-সংখ্যক রচনাটি।—

চিকা করে চিক্
কইল্লা ভাতোত্ দিস্।
কইল্লা করে ঘাচাউ-ঘাচাউ
মুনের ছিটা দিস্॥—সং ৩১১ক

গন্ধমূষিক 'চিক্' করিয়া শব্দ করিল, এবং তাহার জন্য ভাতে 'কয়লা' দিতে হইবে, তাহার কোনো কারণ নাই। কিন্তু ওই 'চিক্' শব্দটির এমন একটা

CENTRAL LIBRARY

ধ্বনি আছে, যে ধ্বনি হাতের মুষল ধানের উপর পড়িবার সহিত মিলিয়া যায়। সেইজন্যই ইহার ব্যবহার।

দুই-একটা ছড়া পাওয়া যায়, যেগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন নয়, কিন্তু ধান ভানিবার প্রসঙ্গের সহিত মিলহীন। এ গুলির মধ্যেও অর্থের চেয়ে ছন্দ ও ধ্বনি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

ওই চিকা কইয়ে চিকিং।
মাঝিয়া কইয়ে ঢিকিং॥
আন্ বেহানী বেঙ।
চিকাটা মারিয়া দেও॥—সং ৩১১

ছড়াটি যাহারা বলিয়া থাকে, তাহাদের অর্থের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু ওই 'চিকিং' ও 'ঢিকিং' শব্দ দুইটির। শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ধানের উপর হাতের মুষল ফেলিলে পরিশ্রমের মধ্যেও যেন খানিকটা স্বস্তি মেলে। ইহার পর, বৈবাহিকাকে জোলার মাকু (বেঙ) আনিয়া সেই গন্ধমুষিককে হত্যা করিবার কথা বলা হইয়াছে এবং সেই গন্ধমুষিকের ঝোল রাঁধিয়া খাইয়া বৈবাহিকাকে বাড়ী যাইতে বলা হইতেছে। এই অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গতিমূলক উক্তির মধ্যে ছড়ার লক্ষণ পাওয়া যায়।

ভাবের মধ্যে অসঙ্গতির অপর নিদর্শন এই,

চাউল কাঁড়াঙ মুই চিকিত্-চাকাত্
গকোলাতি ছাম।
বইনার নাঙ্গে আনিয়া দিছে
টেঙ্গা গাছের আম॥—সং ৩০৯

'চিকিত্-চাকাত' শব্দ করিয়া চাউল কাঁড়ানো হইতেছে। তাহার সহিত ভগ্নীর উপপতির আসিয়া টক আম দিবার মধ্যে কোনো সঙ্গতি নাই। কিন্তু 'ছাম-'য়ের সহিত অনুপ্রাসের জন্য 'আম'-এর উল্লেখ মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে, কেননা, 'ছাম' শব্দটির জন্যই উহার উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। তারপরেই সধবা নারীর পিত্রালয়ে যাইবার প্রসঙ্গ আসিয়া গিয়াছে, টক আমের সহিত যাহার কোনো সম্পর্ক নাই।

CENTRAL LIBRARY

মুখামুখি দাঁড়াইয়া হাত দিয়া ধান ভানিবার কালে যে সকল ছড়া কাটা হয়, অনেক সময় তাহার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ করা যায়। একই ধান দুইজনে বা ততোধিক জনে ভানিতেছে। তবুও একজন বা একদল বলিতেছে,

ওই দিয়া যা রে হুটি
তোর চাউল হউক কুদি।—সং ৩০৬ক

অপর জন বা অপর দল তাহার উত্তর দিতেছে, তোর ধান ভানিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাক—

ওই দিয়া যারে হাতী।
তোর বারা হউক আতি।—সং ৩০৬ক

এইরূপে একই ধান ভানা লইয়া একজনের অপর জনের ধানকে মন্দ বলা বা নিন্দা করিবার মধ্যে একটি কৌতুক আছে এবং সেই কৌতুক করিয়া শ্রমকে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করা হয়। ৩০৬-সংখ্যক রচনাটিও এই শ্রেণীর।

দুই-একটি ছড়ার মধ্যে গৃহ-জীবনের কথা আছে। ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবটিও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ৩০৭, ৩০৮ ও ৩১০-সংখ্যক রচনাগুলি এই পর্যায়ের।

৩০৭-সংখ্যক ছড়াটির মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের একটি চিত্র পাই। হাত দিয়া ধান ভানিতে যথেষ্ট শ্রম করিতে হয়। বাড়ীর কর্তা যেই নিকটে আসিতেছে, অমনি ধান ভানা হইতেছে, নয়তো চুপ করে দাঁড়াইয়া থাকা হইতেছে। এমনি করিয়া ধান ভানিতে দেরি হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ধান ভানা শেষ করিয়া ভাত চড়ানো হইল। কর্তা এদিকে গরম ভাত খাইতে পারে না। সেইজন্য সে গৃহিনীকে প্রহারের ভয় দেখাইতেছে। অপর একটি ছড়ায় দেখি, দেবর আসিয়া বৌদিকে বিরক্ত করিতেছে। বউদি তাহার উত্তরে বলে, আমাকে এখনি ধান ভানিয়া ভাত রাঁধিতে হইবে, আমাকে এখন বিরক্ত করিয়ো না (সং ৩১০)। এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ভাবের বিকাশ লক্ষ করা যায়।

CENTRAL LIBRARY

॥ ৪ ॥

সকলে মিলিয়া মাছ মারা গ্রাম্য জীবনের এক আনন্দ বিশেষ। ইহার পিছনে আদিম গোষ্ঠীজীবনকেও পাওয়া যায়। বর্ষার শেষে প্রায়ই দেখা যায় এক-একটি দল গড়িয়া রাজবংশীরা মাছ মারিতেছে। সাধারণত খাল, নালা, নয়ানজুলিতেই মাছ মারা হইয়া থাকে। এই ভাবে মাছ মারা একার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমে কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া আলি বাঁধিয়া নিতে হয়। পরে বালতি করিয়া জল সেঁচিয়া 'পলো' বা হাত দিয়া মাছ মারা হয়।

মাছ মারিবার আনন্দকে আরো চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্য অনেক সময় সমবেত কণ্ঠে গানও গাওয়া থাকে। অথবা, এই সকল গান যাদু-মন্ত্রাত্মকও হইতে পারে। ৩১২-সংখ্যক গানখানি এইরূপ একটি মাছ ধরিবার গান।

গানটির মধ্যে অবশ্য আলোচনা করিবার তেমন কিছু নাই। ইহার বক্তব্য বিষয় বিষয় এই: আকাশে মেঘ করিয়াছে। কই-মাগুর-রুই-কাতলা-বোয়াল মাছ তাহা দেখিয়া লাফাইতেছে, জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিয়াছে। ছেলে-বুড়া সকলেই আজ মাছ ধরিতে চলিয়াছে, ওই দেখ, কেমন করিয়া একটা বোয়াল মাছ ধরা পড়িল (সং ৩১২)।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, পুরুষদের মত মেয়েরাও দল বাঁধিয়া মাছ ধরিয়া থাকে॥

॥ ৫ ॥

রাজবংশী মেয়েদের গৃহকর্মের মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল কাঠ-কুড়ানো ও চরকা কাটা।

সাধারণত দুপুর বেলায় দল বাঁধিয়া সকলে যায় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতে। পথ ঘাট ও নিকটস্থ জঙ্গল হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনা ইহাদের এক বিশেষত্ব। কিছুদিন পূর্বেও, তিস্তা নদী দিয়া ভাসিয়া-আসা অরণ্যের কাঠ সংগ্রহ করিতে রাজবংশী মেয়েদের দেখা গিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

সাধারণত বাড়ীর মায়েরা বা বোনেরা মিলিয়া কাঠ সংগ্রহ করিতে যাইয়া থাকে। একটি গানে বলা হইতেছে, তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধিয়া দাও, বেলা হইয়া গেল, আমি কাঠ কুড়াইতে যাইব (সং ৩১৩)। পরবর্তী গানটিতে দুই মায়ে চলিয়াছে পাঙ্গা নামীয় এক নদীর তীরবর্তী জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে। এক মা বলিতেছে, সব গাছেরই কাঠ লইব, বাদ দিব বট-পাকুড় গাছের কাঠ। কেননা বট-পাকুড়ের কাঠ দিয়া ভাত রাঁধিতে নাই (সং ৩১৩-ক)। এই tabooটি লক্ষণীয়।

এই সকল গানের মধ্যে কোনো প্রকার কবিত্ব নাই, তত্ত্ব নাই, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা নাই। নিতান্তই একটি ব্যাপারের সাদা-মাটা বর্ণনা।

কাঠ যেমন দিনের বেলায় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সংগ্রহ করা হয়, চরকা তেমনি রাত্রি বেলায় ঘরে বসিয়া কাটা হয়। এইজন্য চরকা কাটার গানগুলির মধ্যে ঘুম ও রাত্রির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সারাদিন গৃহের অন্যান্য কর্ম সারিয়া রাত্রিকালে অবসর যাপনের ছলেও খানিকটা কাজ করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য দিনের বেলাতেও যে চরকা কাটা না হয়, এমন নয়।

চরকার চাকা ঘুরিবার মধ্যে গানের একটি প্রবাহ আছে। চরকা কাটার গানগুলির ভাষা ও ছন্দ এবং সুর লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, উহার মধ্যেও যেন চরকার চাকা ঘুরিতেছে। চরকা কাটার গানের বিষয়বস্তুর কোনো স্থিরতা নাই। প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া হাল্‌কা ব্যাপার পর্যন্ত সবই ইহাতে স্থান পাইতে পারে।

একখানি গানে পাই : চরকা কাটিতেছি, ঘুমে ঢুলিতেছি, এমন সময় কোন্ পুরুষ বাড়ীর পিছনে 'বেনা' বাজাইল ; আমি উন্মনা হইয়া উঠিলাম,—আমার চরকার সুতার খেই হারাইয়া গেল (সং ৩১৪)। প্রেমাকুল মনের নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলার প্রতিচ্ছবি যেন চরকার এলোমেলো হইয়া যাওয়া সুতা। গানখানির মধ্যেও চরকার আবর্তন ধরা পড়িয়াছে।

৩১৪ক-সংখ্যক গানটি একটি হাল্‌কা ব্যাপার লইয়া রচিত। স্ত্রী-ই এখানে স্বামীকে ভাত রাঁধিয়া দিবার জন্য বলিতেছে। কিন্তু ইহাই গানটির মূল কথা নয়। ইহার প্রাণ হইল ইহার শেষ পঙ্‌ক্তিটি : 'ঝা-কুম্-কুম্ করেছে

CENTRAL LIBRARY

চরখা, গান শুনিয়া যান'। এই অর্থহীন সারিটির মধ্যে চরকার চাকা যেন সত্যসত্যই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

৩১৪খ-সংখ্যক গানের সম্পর্কেও এই মন্তব্য খাটিবে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় স্তবকের বক্তব্য এই : কে বলে আমার চরকা ভালো নয়। এই চরকার জোরেই আমি হালের গোরু ও দুয়ারের ঘোড়া কিনিয়াছি। দ্বিতীয় স্তবকটির কোনো অর্থ নাই। কিন্তু ইহাই গানটির মূল অংশ। ইহার অর্থহীন শব্দ-সমষ্টির মধ্যে যে দ্রুত একটা ছন্দ আছে, তাহাই চরকার ছন্দ।

॥ ওঝালি ॥

॥ ১ ॥

লোক-সমাজে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চিকিৎসা করিবার প্রথা চলিত নাই। এখানে মানুষের অসুখ-বিসুখ হইলে সর্বদাই মনে করা হয় বুঝি কোনো উপদেবতা বা অপদেবতা রোগীর দেহে ভর করিয়াছেন। ইঁহাদের 'জীবন্ত', 'রূপান্তরশীল', এবং রোগীর দেহে 'সঞ্চরণশীল' বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং রোগীর চিকিৎসা না করিয়া গান ও পূজার মাধ্যমে উঁহাদের তুষ্ট করাই এখানকার বিধি।

যাঁহারা এই কাজ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে বলা হয় ওঝা। যে সকল গান ও ছড়ার মাধ্যমে ওঝা এই কাজ করেন, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে তাহাকেই বলে 'ওঝালি' গান বা মন্ত্র। 'ওঝা'-র সহিত 'আলি' প্রত্যয় যোগ করিয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে ওঝাকে 'ধাওধা'ও বলা হইয়া থাকে।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ওঝালি গান দুই রকমভাবে গীত ও রচিত হইতে পারে। উভয় প্রকার গানই বর্তমান ক্ষেত্রে সংকলিত হইয়াছে।

এক ধরণের ওঝালি গান আছে, যে গুলির একটি স্তবক ছড়া (মন্ত্র), অপর স্তবক গান। বিভিন্ন স্থানীয় দেব-দেবী, উপদেবতা ও অপদেবতাকে পূজা-স্থানে আহ্বান করা হয় এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে একটি করিয়া মন্ত্র (ছড়ার আকারে) বলিয়া তারপর গান (বা ধ্রুবপদ) গাওয়া হয়। পরিশেষে সকল দেব-দেবীকে অনুরোধ করা হয় রোগীকে মুক্তি দিবার জন্য। ৩১৫ ও ৩১৬-সংখ্যক গান দুইটি এই ধরণের।

দ্বিতীয় আর এক ধরণের ওঝালি গান আছে, যে গুলিতে দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তনমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়। আকারেও এইগুলি দীর্ঘ। এই সকল গানের মধ্যে একটি সুগ্রথিত কাহিনী, নির্দিষ্ট কতকগুলি চরিত্র থাকে। মানবিক রস-সৃষ্টিই ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। সাহিত্যিক মূল্যের দিক হইতেও এইগুলি শ্রেষ্ঠ। ৩১৭-সংখ্যক দীর্ঘ ওঝালি পালাটি এই পর্যায়ের।

উপরে উল্লিখিত ওঝালি গানের দুইটি 'টাইপ' ছাড়াও উহার আর একটি দিক আছে। তাহা হইল ওঝালি মন্ত্র বা ছড়া। এইগুলি গান নহে।

সঙ্কলিত সমস্ত ওঝালি গানগুলির রচনারীতি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ইহার মধ্যে স্থানীয় সকল দেব-দেবীকে আহ্বান করা হয়, তাঁহাদের উদ্দেশে মন্ত্র-গান গীত হয় এবং পরিশেষে রোগীকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল গানের মধ্যেও কখনো কখনো ক্ষুদ্রাকারে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং দেবতার জীবন কাহিনী বলিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। তৃতীয়ত, ইহার মধ্যে অশ্লীলতা অনেক সময়েই লক্ষিত হইয়া থাকে। উপদেবতা বা অপদেবতার উদ্দেশে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়া হয়। আবার কখনো বা মন্ত্রের মধ্যেই অশ্লীলতম শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা দোষের বলিয়া গণ্য করা হয় না। যে মন্ত্র যতো পবিত্র ও অব্যর্থ, অশ্লীলতাও তাহাতে সেই পরিমাণে বেশি। চতুর্থত, গানগুলির মধ্যে ওঝার মনের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্বত্র আত্মসমর্পণের নয়। অনেক সময় অপদেবতাকে প্রহার করিবার এবং তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার (আক্ষরিক অর্থে বা মন্ত্রদ্বারা) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। রোগীকে যখন মুক্তি দিবার জন্ত বলা হইয়াছে, তখন সেই প্রার্থনার মধ্যেও আশানুরূপ বিনয় ফোটে নাই। প্রার্থনার এই ভঙ্গির মধ্যে অসংস্কৃত আদিম মনটিকে উপলব্ধি করিতে পারি। এই 'coercion'-এর মধ্যে যাদুতত্ত্বের প্রাথমিক দিকটাও ধরা পড়ে।

॥ ২ ॥

বিশেষত্ব ও গায়নরীতির দিক হইতে বিচার করিলে ৩১৫ ও ৩১৬-সংখ্যক গান দুইটিকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

৩১৫-সংখ্যক গানের বিষয় এই : প্রথমে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের যতো 'ভাও' (অপদেবতা) ছিলেন, প্রত্যেককে ওঝা মন্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া পূজাস্থলে আনিলেন। একই ভাষা, ভঙ্গি ও সুর দিয়া বিভিন্ন দিকের অপদেবতাকে আহ্বান করিবার মধ্যে লোক-সাহিত্যের নিজস্ব রীতির অনুসরণ লক্ষ করা যায়।

অপদেবতাগণকে আহ্বান করিবার পর, ধ্রুবপদে বিভিন্ন স্থানীয় উপদেবতাগণের প্রসঙ্গ উল্লেখমাত্র করিয়াই তাঁহাদের নিমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। যে সকল স্থানীয় দেব-দেবীকে নিমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে, তাঁহারা

CENTRAL LIBRARY

হইলেন—কালী, মাশান, তিস্তাবুড়ী, গৃহদেবীরূপী বিষহরি এবং গ্রামদেবতা বা 'গারাম'।

তারপর দেবতা ও অপদেবতাগণকে 'শান্ত' হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়,

শান্ত, তুই শান্তি নে রে,
শান্তি নে—
এই গুণীয়ার হাতে।
এই বান্দাক্ ছাড়িয়া দিয়া
যা তুই কবিলাসক্ নাগিয়া রে —সং ৩২৫

অনন্তর বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশে একটি করিয়া মন্ত্র বলিয়া ধ্রুবপদখানির একটি করিয়া কলি গাওয়া হইয়াছে। কালীর উদ্দেশে কথিত মন্ত্রের শেষ সারিতে আছে 'ফেন্না-'র (ফল্নার, এইখানে রোগীর নাম বলিতে হয়) অষ্টং দেহা ছাড়িয়া দক্ষিণে যাও'। মাশানকে বলা হইতেছে, শঙ্করের দোহাই, তিনি যেন আর রোগীর দেহে বাস না করেন। ইহাতে অপদেবতার "সঞ্চরণশীলতা" স্পষ্টীকৃত হয়। তিস্তাবুড়ীকে বলা হইয়াছে, তিনি যেন রোগীকে অব্যাহতি দেন, ভালো হইয়া সে দেবীকে পূজা করিবে। বিষহরিকে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য এবং 'গারাম' ঠাকুরকে (গ্রামদেবতাকে) দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। "দক্ষিণ" দিক সম্পর্কে একটি যাদুবোধ এখানে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সমস্ত গানখানির মধ্য হইতে দুইটি জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমত, অপদেবতার সহিত অন্যান্য স্থানীয় দেব-দেবীগণও অনিষ্টকারীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, রোগীকে অব্যাহতি দিবার জন্য ইহাদিগকে যখন অনুরোধ করা হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে কাতরতা বা বিনয়-ভাব আশানুরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই॥

॥ ৩ ॥

৩১৬-সংখ্যক গানখানির প্রথমেই বলা হইয়াছে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা। প্রথমে জল-স্থল-চরাচর কিছুই ছিল না। তারপর ধর্মঠাকুর কূর্মপৃষ্ঠে এই বিশ্বের পত্তন করিলেন।

CENTRAL LIBRARY

'নামানি' (অর্থাৎ দেব-দেবীকে স্বর্গ হইতে গানের মাধ্যমে ভূতলে নামানো) গানখানিতে কালী, ডাকিনী ও মেছেনী (তিস্তাবুড়ী) দেবীদের আহ্বান জানানো হইয়াছে। বিশ্বাস করা হয়, ওঝাগণের উপর সাময়িকভাবে দেব-দেবীর 'ভর' হয় এবং কি জন্যে রোগীর রোগ হইয়াছে বা কি করিলে সেই রোগমুক্ত হইবে দেব-দেবীগণ ওঝার মুখ দিয়াই তাহা ব্যক্ত করেন। ওঝা তাই 'নামানি' গানে কালীকে বলিতেছেন, ওগো কালী, তুমি আমার উপর 'ভর' করিয়া আমার মুখ দিয়া সত্য কথা বলাও, মিথ্যা কথা কহিও না, তাহা হইলে শিবের মাথা খাইবে। লক্ষ করা দরকার, দেবতাও মিথ্যা কথা কহিতে পারেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। দেবতার উপর সাধারণ মানুষের দোষ-গুণ সবই আরোপ করা হইয়াছে। তেমনি, দেবী ডাকিনী ও মেছেনীকেও ওঝার দেহে ভর করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া সত্য কথা বলাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ইহার পর, বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশে এক-এক স্তবক গান এবং এক-এক স্তবক মন্ত্র গাওয়া ও উচ্চারণ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন দেব-দেবীকে যে ভাষায় রোগীকে অব্যাহতি দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি পূর্ববর্তী ৩১৫-সংখ্যক গানেরই মতো। এখানেও কালীকে পূজা গ্রহণ করিয়া, রোগীকে 'নিস্তার' দিয়া শিবের কাছে চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু এই গানখানির বিশেষত্ব হইল, এখানে উপদেবতা অপেক্ষা অপদেবতার নাম বেশি পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে। অপদেবতার উদ্দেশে বলা হইয়াছে,—'দান' (পূজা-দক্ষিণাদি) পাইলে ইহারা চলিয়া যাইবেন। যে সকল অপদেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা হইলেন,—বিকৃত অঙ্গের দেবী 'গাঙ্গো' (ইহারই অভিশাপে মানুষ বিকৃতাঙ্গ হইয়া থাকে), 'খিয়ালী পইরী', 'জৈরীপইরী' (খিয়ালীপইরী মানুষকে উন্মনা ও পাগল করেন; জৈরীপইরী স্বপ্নদোষ ঘটান) প্রভৃতির। ইহা ছাড়া 'কাঁদনা পইরী' (ইনি ছোটো ছেলেদের কাঁদান), 'হিঁয়ালী পইরী', 'শালেশ্বরী' (বন-দেবতা), ও বিভিন্ন 'গারামে'র নামও বলা হয়।

রোগীকে মুক্তি দিবার জন্য 'গাঙ্গো-'কে যখন অনুরোধ করা হইয়াছে, তখন বিনয়ভাব তো নাইই বরং দেবী গাঙ্গোকে রীতিমতো অপমান করা

CENTRAL LIBRARY

হইয়াছে। দেবাদিদেব শিবের হুঙ্কারে দেবী গাঙ্গো রোগী-দেহ হইতে সরিয়া পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং ওঝার মন্ত্রবলে দেবী গাঙ্গো 'রসাতলে' যান,—এমন কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই গানখানির অপর বিশেষত্ব হইল, ইহার অশ্লীলতা। কিন্তু এই চরম অশ্লীলতা পবিত্র মন্ত্রেরই মতো একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ওঝালি গানের শেষ অংশ হইল 'শান্তির গান' অর্থাৎ উপদেবতা ও অপদেবতাগণ পূজা ও গানে তুষ্ট হইয়া রোগীদেহে তাঁহাদের দৌরাত্ম্য থামাইয়া শান্ত হইলেন। এই গানে রোগীকে উদ্দেশ করিয়া ওঝা বলিতেছেন, ওগো রোগী, এইবার তুমি 'বোধ' নাও, দেবাদিদেব শিব তোমার সহায় হউন॥

॥ ৪ ॥

নানাকারণে ৩১৭-সংখ্যক দীর্ঘ ওঝালি পালা গানটি বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য,—ইহা আখ্যানমূলক। কালীর মাহাত্ম্য খ্যাপন করাই এই কাহিনীর উদ্দেশ্য। কালী রুষ্ট হইলে সাধারণ মানুষের অনিষ্ট করিতে পারেন; আবার তিনিই তুষ্ট হইলে সেই মানুষকে সোনার লাঙল, সোনার ফাল গড়াইয়া দেন, ঘর-সংসার ধনে-জনে পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন। পালা-গানটি মোট দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একভাগকে 'দেবখণ্ড' বলা চলে। কালী এবং তাঁহার পুত্র মাশান, কালীর পিতা প্রভৃতির কাহিনী এক অংশে বিবৃত হইয়াছে। ইহা মূল কাহিনীর ভূমিকা মাত্র। ইহার দ্বিতীয় বা প্রধান অংশকে 'মানবখণ্ড' নাম দেওয়া যায়। একটি চাষী-দম্পত্তির জন্ম, বিবাহ এবং গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়া এই কাহিনীর ধারা অগ্রসর হইয়াছে। যে চাষী দম্পতি সাধারণ মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে, তাহাদের নাম—জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের দুইটি নদীর নামানুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের নদী দুইটির নাম হইল,—ঝুমুর ও বামনাই। এই 'ঝুমুর', 'ঝিমিলা' রূপে এবং 'বামনাই' 'বামুনতি' রূপে কাহিনীর মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঝিমিলা পুরুষ এবং বামুনতি নারী। **River-lore**-এর ইহা এক চমৎকার নিদর্শন।

CENTRAL LIBRARY

এইবার ৩১৭-সংখ্যক গানটির বক্তব্য বিষয় কি, তাহা বলা যাইবে।

অন্যান্য গানের মতো এখানেও প্রথমে 'নামানি' গান (স্বর্গ হইতে দেবতাদের ভূতলে নামানোর গান) গাওয়া হইয়াছে। এই 'নামানি' গানে যে সকল দেব-দেবী আহূত হইয়াছেন, ধর্মঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইহা ছাড়া, প্রথা মতো অন্যান্য উপদেবতা ও উপদেবীদের মধ্যে বনদেবতা শালেশ্বরী, গ্রামদেবতা, তিস্তাবুড়ী, থানেশ্বরী, গইয়াত, মহাকাল, এবং বিভিন্ন নামীয় পীরও আছেন। রোগীর মঙ্গল কামনায় ইহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

স্বর্গ হইতে দেব-দেবীদের অবতরণ করাইবার পর পূজাস্থানে তাঁহাদের বসিতে অনুরোধ করা হয়। যে গানের মাধ্যমে তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়, তাহাকে বলা হয় 'বসানি' গান। ইহাতেও দেখা যায়, আমন্ত্রিত দেবতাগণের মধ্যে যিনি প্রধান অতিথি অর্থাৎ ধর্ম ঠাকুর, কেবল-তাঁহাকেই উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ অন্যান্য দেব-দেবীদেরও আসন গ্রহণের সূচনা করিয়া থাকে।

গানে বলা হইতেছে, ধর্ম ঠাকুরের নামে পূজা-স্থানে শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিয়াছি, বেদী প্রস্তুত করিয়া ধূপ-দীপ জ্বালিয়াছি, নৈবেদ্যরূপে মিষ্টান্ন রাখিয়াছি। ওগো ধর্মঠাকুর, ভক্তের এই পূজায় তুষ্ট হও, তাহাকে ধন-জনের বর দাও।

'বসানি'-র পর 'সৃষ্টিপত্তনের' কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এখানেও বিশ্ব-সৃষ্টি কর্তারূপে ধর্মঠাকুরের নামই বলা হইয়াছে। সৃষ্টিপত্তনের কাহিনী নিম্নরূপ।

আদিতে জল ছিল না, স্থল ছিল না, আকাশও ছিল না, এমন সময় ভগীরথের আহ্বানে পর্বতকন্যা গঙ্গা মর্তে অবতরণ করিলেন। ভূতলে নদীর সৃষ্টি হইল।

সেই জলে চিংড়িমাছ (নিছিলা) বাস করিতেছে। এমন সময় একদিন ধর্মঠাকুরের মনে স্থল সৃষ্টি করিবার বাসনা জাগিল। তিনি চিংড়িমাছকে বলিলেন, পাতাল হইতে মাটি লইয়া আসিতে। ঘাড়ে কোদাল লইয়া চিংড়ি চলিল পাতাল হইতে মাটি আনিতে। পাতালে গিয়া দেবী বাসুকির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বাসুকিকে 'মাসি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া চিংড়ি

CENTRAL LIBRARY

তাহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। তারপর দেবী বাসুকির অনুমতি লইয়া,

তিন চোট মাটি নিলে
পৌটলা করিয়া।
বাসুকিক্ ভক্তি দিয়া নিচা
উঠিল্ ভাসিয়া॥

তখন চৈত্র কি বৈশাখ মাস চলিতেছে। প্রখর রৌদ্রে চিংড়ি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উঠিল। একটি বৃক্ষের ছায়ায় সে ঘুমাইয়া রহিল।

এদিকে চিংড়ির ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ধর্ম ঠাকুর কচ্ছপকে প্রেরণ করিলেন চিংড়ির খোঁজে। কচ্ছপ আসিয়া দেখে, পৌটলা করিয়া মাটি লইয়া চিংড়ি বৃক্ষ-ছায়ায় ঘুমাইতেছে। কচ্ছপ চিংড়ির কোমরে লাথি মারিয়া সেই মাটি কাড়িয়া লইল এবং ধর্ম ঠাকুরের সম্মুখে আনিয়া তাহা হাজির করিল।

মাটি হারাইয়া চিংড়ি কাঁদিতে বসিল। তারপর ধর্ম ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া কহিল, অন্যের কাজে গেলে পুরস্কার পাই। কিন্তু, 'তোমার কাজে গেলে প্রভু জীবনো হারাই'।

তখন ধর্ম ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, চিংড়ি, তুমি কাঁদিয়ো না। আর সব মাছ মরিলে ভাসিয়া উঠিবে, কিন্তু আমার আশীর্বাদে চিংড়ি মাছের বংশধর মরিলে ডুবিয়া পাতালে যাইবে।

তারপর পাতাল হইতে আনা সেই মাটি ধর্ম ঠাকুর নয়টি গুটি করিয়া নয় দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন—বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইল।

কচ্ছপ চিংড়ির কোমরে পদাঘাত করিয়াছিল, তাই আজো চিংড়ির কোমর বাঁকা। ধর্ম ঠাকুরের আশীর্বাদেই আজো চিংড়ি মরিলে জলের উপর না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। এইরূপে 'সৃষ্টিপত্তনে'র কাহিনীর সহিত Fish-lore যুক্ত হইয়াছে।

এইরূপে বিশ্বসৃষ্টি করিবার পর ধর্মঠাকুর মানুষ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। ধরায় প্রথমে আসিলেন কালী। ইনি ধর্মঠাকুরের কন্যা।

ধর্মঠাকুরের গৃহে জন্ম লইয়া এক-দুই বৎসর করিয়া কালী বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি যুবতী হইলেন। এইবার ধর্মঠাকুর তাঁহার কন্যা

CENTRAL LIBRARY

কালীকে বিবিধ মন্ত্র ও গুণের দীক্ষা দিলেন। ক্রমে কালী পিতার নিকট হইতে সকল প্রকার মন্ত্র ও গুণে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তারপর সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁহার গুণ-মন্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে চলিলেন।

পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে রথে চড়িয়া কালী খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য কাহাকেও পাইলেন না। অবশেষে দক্ষিণ-দিকের এক রাখাল-পুত্রের উপর তিনি 'ভর' করিলেন। পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া রাখাল হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ধর্ম-কন্যা কালী তখন বৃদ্ধার বেশ ধরিয়া রাখালকে শুধাইলেন, তাহার কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। পরে রাখালের নিকট সব শুনিয়া তিনি বলিলেন কালীকে পূজা দিতে।

আর এক দিনের কথা। এক শিকারির গৃহে কালী আতিথ্য লইলেন। সেই শিকারি জাতিতে হাড়ী। সে কালীর জন্য ময়ূর মারিতে বনে গেল। একটি ময়ূরের প্রতি পর-পর তিনবার 'নল' নিক্ষেপ করিয়াও উহাকে সেই শিকারি হত্যা করিতে পারিল না। অবশেষে গৃহে আসিয়া শিকারি আপনার দুই পুত্রকে লইয়া গেল এবং গাছের উপর চড়াইয়া আপনার পুত্রদেরই শিকার করিল। অতিথির সেবার জন্য শিকারির স্ত্রী নিজ-পুত্রের মাংসই রাঁধিল। তারপর কালীকে যখন তাহা খাইতে দেওয়া হইল, তখন সেই শিকারি সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার পুত্রগণ হাসিয়া-খেলিয়া বাড়ীর দিকেই আসিতেছে। শিকারি তখন বুঝিল, এ সবই কালীর ছলনা। এইরূপে কালীর মাহাত্ম্য আর এক প্রস্থ প্রমাণিত হইল।

ইহার পর কালীর গার্হস্থ্য জীবনের কথা বলা হইয়াছে। দিনে দিনে কালী গর্ভবতী হইলেন, অবশেষে একদিন তাঁহার প্রসব বেদনা উঠিল। এই-বার জন্ম হইল কালীর পুত্র মাশানের। ধাই আসিয়া মাশানের নাড়ী ছেদন করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মাশানের নাড়ী কলমী শাক হইয়া আজো বিরাজ করিতেছে। ভাদ্র মাসে মাশানের জন্ম হইয়াছিল, তাই রাজবংশী সমাজে ভাদ্রমাসে কলমী শাক খাইতে নাই। গানে তাই বলা হইয়াছে,

ভাদর মাসে কলমু শাক যেবা জন খায়।
মাশানের নাড়ী সে অবশ্য চবায়।

এইখানে দেবখণ্ড শেষ হইয়াছে।

ঝিমিলা ও বামুনতির জন্ম, বৃদ্ধি, বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন লইয়া এই পালাগানের দ্বিতীয় অংশ।

ঝিমিলা কানীন-পুত্র। লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য তাহার মাতা হাঁড়ীতে ভরিয়া তাহাকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। এদিকে সেই দেশে ছিলেন এক মুনি। মুনির পত্নী ছিলেন বন্ধ্যা। একদিন মুনি স্নান করিতে নদীর ঘাটে যাইয়া দেখেন, একটি হাঁড়ী ভাসিয়া যাইতেছে। ঋষি যাইয়া হাঁড়ী খুলিয়া ঝিমিলাকে পাইলেন।

বাড়ীতে আসিয়া ঋষি তাঁহার পত্নীকে গর্ভবতী সাজিতে বলিলেন। 'নেত-খেত কাপড় দিয়া বান্ধেক দুই থন'। এইভাবে 'নগরেতে বেড়ায় রাণী গর্ভবতী হইয়া'। অবশেষে একদিন পারাবত মারিয়া রাণীর কাপড়-চোপড় রক্তে রাঙ্গাইয়া নেওয়া হইল, যেন সত্যই তাহার সন্তান হইয়াছে। এইভাবে ঝিমিলার জন্ম হইল। ঋষির ঘরে ঝিমিলা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল,

বারো বৎসর হইল ঝিমিলার, লেখা পড়া করে।
ষোলো বৎসরের বেলায় বিভার আয়োজোন করে॥

দেশ-দেশান্তরে ঋষি তাঁহার পুত্রবধূ খুঁজিতে বাহির হইলেন। কিন্তু,

পূব-পছিম-উত্তর-দক্ষিণ আসিল, ঘুরিয়া।
কোনো পাখে কইনার খোঁজ না পাইল, খুঁজিয়া॥
কইনা না পায়া ইষি ফিরিয়া যায় ঘর।
মাঝ পথে বামুনতির নগত, হইল, দরশন॥

তারপর বামুনতির সহিত তাহার পিতার গৃহে আসিয়া ঋষি ঝিমিলার সহিত বামুনতির বিবাহ স্থির করিলেন।

বিবাহ স্থির হইবার পর ঝিমিলা 'শ্রীকইলার হাটে' চলিল বিবাহের জন্য সওদা করিতে। এ জন্যে 'দশোবিশো টাকা নিলে আঞ্চলে বান্ধিয়া'। 'চালুন বাতি', শোলার ফুল, সাদা কাপড়, ধুপ-ধুনা এবং সিঁদুর প্রভৃতি কিনিয়া ঝিমিলা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তারপর স্বজনাদিকে নিমন্ত্রণ জানাইল।

অনন্তর তেলী-মালী-ধোপা-নাপিত ও পুরোহিত লইয়া ঝিমিলা চলিল বিবাহ করিতে। যথানিয়মে বামুনতিকে বিবাহ করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

CENTRAL LIBRARY

ঋষির ঘরে প্রতিপালিত হইলেও পেশার দিক দিয়া ঝিমিলা জেলে। বিবাহের পর তাহার গার্হস্থ্য-জীবন শুরু হইল। ঘাড়ে জাল লইয়া সে মাছ মারিতে চলিল। ধর্মের নাম ধরিয়া সেদিন সে জাল ফেলিল, কিন্তু কিছুই উঠিল না। তারপর শিবের নাম করিয়া জাল ফেলিয়াও সে মাছ পাইল না। এমনি করিয়া প্রহরখানিক বেলা হইয়া গেল। ঝিমিলার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বামুনতিও নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনো ঝিমিলা একটি মাছও পায় নাই। এইবার বামুনতি আসিয়া জাল ফেলিল, কিন্তু সে-ও মাছ পাইল না। দেখিয়া ঝিমিলার প্রচণ্ড ক্রোধ হইল। বাঁশবন হইতে কঞ্চি কাটিয়া আনিয়া ঝিমিলাকে বামুনতি এলোপাতাড়ি প্রহার করা শুরু করিল।

এদিকে বামুনতির কান্নায় পাড়া-পড়শীরা ছুটিয়া আসিল এবং বামুনতিকে সান্ত্বনা দিল। শান্ত হইয়া বামুনতি স্বামীর হাত হইতে জাল লইয়া ধর্মের নাম স্মরণ করিয়া পুনরায় জাল ফেলিল। এইবার—

নদীরে ডিলিঙ্গি মাছ নাগিল, সারি সারি।
চন্দন-কুকসা মাছ ফেলায় পাক দি'॥
উই, কাতেলা অঠায় বামুনতি নেথায়-জোখায় নাই॥

এইভাবে অনেক মাছ মারিয়া 'স্বামীর ঘাড়ে মাছ দিয়া বামুনতি চলিল, বাড়ী'। মাছ লইয়া ঝিমিলা হাটে আসিল বেচিতে। কিন্তু তখন হাট শেষ হইয়া গিয়াছে, মানুষ-জন নাই, কাজেই তাহার মাছ পড়িয়াই রহিল। এদিকে ঝিমিলার জন্য বামুনতির উদ্বেগ বাড়িয়া চলিল। দিন গেল, রাত্রি হইল, ঝিমিলার জন্য বামুনতির উদ্বেগ বাড়িয়া চলিল। দিন গেল, রাত্রি হইল, কিন্তু তবু ঝিমিলা ফিরিল না। বামুনতি তখন কাঁদিতে বসিল।

গৃহজ্বালা বড়য় জ্বালা,
না সহে নারীর এতয় জ্বালা।
দুঃখের সংসারে দেহা কালা,
মরণ হয় রে সেও ভালা॥

চিন্তায় থাকিতে না পারিয়া অবশেষে বামুনতি নিজেই হাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, ঝিমিলা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। বামুনতিকে দেখিয়া ঝিমিলা কাঁদিয়া উঠিল। বামুনতি তখন ঝিমিলাকে

প্রবোধ দিয়া কহিল, কাঁদিয়ো না, আমিই মাছ বিক্রয় করিতেছি। পান কিনিয়া আনিয়া বামুনতি তাহার ঠোঁট রাঙ্গাইয়া লইল,

গুয়া পান খায়া বামুনতি ফিকিয়া ফেলায় পিক্।
ভালো ভালো অসিয়াগিলার কাড়িয়া নিলে চিত্॥

এইভাবে ভাঙ্গা হাটেও বামুনতি পসার জমাইয়া তুলিল এবং সকল মাছ বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তারপর খরচপত্র সারা করিয়া মাথায় বহিয়া স্বামী-স্ত্রী বাড়ী আসিল।

ঝিমিলা কেবল জেলেই নয়। কৃষিকর্মও সে করিয়া থাকে। একদিন সে বলদ দিয়া হলকর্ষণ করিতেছে, এমন সময় সেই পথ দিয়া ছদ্মবেশী কালী যাইতেছেন। কোনো স্থানে যাত্রার কালে হলকর্ষণ-রত কৃষকের মুখ দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। ছদ্মবেশী কালী তাই ঝিমিলাকে বলিলেন খানিক ক্ষণের জন্য হলকর্ষণ কার্য স্থগিত রাখিতে। ঝিমিলা তাহা না শুনিয়া রাগিয়া উঠিল। কালী তখন নিজমূর্তি ধারণ করিলেন এবং ঘাড় মটকাইয়া ঝিমিলাকে মারিয়া ফেলিলেন।

বেলা অনেক হইয়া গেল তবুও যখন ঝিমিলা ফিরিল না, তখন বামুনতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে তাহার ননদিনীকে শুধাইল ঝিমিলার বিলম্বের কারণ কী। তারপর নিজেই সে ঘর ছাড়িয়া ক্ষেতে আসিয়া হাজির হইল।

ক্ষেতে আসিয়া বামুনতি দেখিল, ঝিমিলা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে তখন করুণ স্বরে বিলাপ করিতে থাকিল। তাহার কান্নায় বৃক্ষের পাতা খসিয়া পড়িল, কালীর রথের চাকা ভূমিতলে আটকাইয়া গেল।

কালী তখন নিজমূর্তি ধরিয়া বামুনতির সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। ঝিমিলার ঔদ্ধত্যই তাহার মৃত্যুর কারণ ইহাও জানাইলেন। অনন্তর ধন্বন্তরি সাজিয়া কালী নিজেই ঝিমিলাকে ঝাড়িতে বসিলেন। সাঁতালির সাত-দিকের সাতটি গাছের সাতটি ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া কালী ঝিমিলাকে একবার দুইবার করিয়া তিনবার ঝাড়িলেন, শ্বেত মাছি হইয়া ঝিমিলার চক্ষুদান করিলেন,—চোখ মুছিয়া ঝিমিলা উঠিয়া বসিল।

এইবার ঝিমিলা কালীর স্বরূপ বুঝিয়া ক্ষমা চাহিল। কালী তুষ্ট হইয়া তাহাকে সোনার লাঙল, সোনার ফালের বর দিতে চাহিলেন। কিন্তু ঝিমিলার বাস্তববুদ্ধি প্রখর। সে কহিল, দেশের রাজা ডাকাত, সোনার

CENTRAL LIBRARY

লাঙল-ফাল দেখিলেই সে তাহা লুটিয়া লইবে। কাজ নাই তাহার সোনার লাঙল, সোনার ফালে। কালী যেন তাহাকে কাঠের লাঙল, কাঠের ফালের বর দিয়াই অনুগৃহীত করেন। শুধু লাঙল-ফালই নয়, ঝিমিলা-বামুনতিকে গোয়াল ভরা গোরু, গোলাভরা ধান এবং কোল আলো-করা সন্তানের বর দিয়া কালী অন্তর্ধান করিলেন।

এমনি করিয়া ঝিমিলা-বামুনতির দিন যায়। কালক্রমে বামুনতি গর্ভবতী হইল। অবশেষে তাহার প্রসবকাল উপস্থিত হইল। প্রসব বেদনায় কাতর হইয়া বামুনতি 'দাইয়ানী'-কে কহিতেছে, ওগো দাইয়ানী, আসিতে কেন দেরি করিলে। আমি যে আর যন্ত্রণা সহিতে পারিতেছি না। যদি নির্বিঘ্নে আমার সন্তান হয়, তবে তোমাকে রঙ-চঙে একখানি 'পাটানী' (রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র) উপহার দিব।

তারপর বামুনতি সন্তান প্রসব করিল, 'দাইয়ানী' বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া নাড়ী কাটিয়া পাটের সুতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া দিল।

কাহিনী সমাপ্ত হইলে ওঝা শান্তি-সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন। প্রতিটি ওঝালি গানেরই এই নিয়ম। বর্তমান পালা গানটির শান্তি-সঙ্গীতে বিভিন্ন উপদেবতা ও অপদেবতাকে অনুরোধ করা হইয়াছে রোগীকে অব্যাহতি দিবার জন্য। তারপর উপদেবতা ও অপদেবতার নাম করিয়া (যেমন, নরসিংহ, বিষুয়া-মাশান, ছুঁচিয়া মাশান, ঘোড়াভূতা, জিনভূতা, পিতৃহরা, নরভূতা প্রভৃতি) রোগী-দেহ ঝাড়া হয়।

উপরে ঝিমিলা-বামুনতির যে কাহিনী বলা হইল, তাহার মধ্য দিয়া একটি কথা সহজেই বুঝা যায় যে দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের পটভূমিকায় কালীর মাহাত্ম্য খ্যাপন করাই এই কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মাহাত্ম্য খ্যাপন করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও কাহিনীর রস কোথাও ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ঝিমিলা ও বামুনতির দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র গানখানির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। উভয় চরিত্রই গানের মধ্যে সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। ঝিমিলা প্রেমে ও ঔদ্ধত্যে পূর্ণ সাধারণ মানুষ। সে স্ত্রীকে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করে, হলকর্ষণ কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে বলিলে উদ্ধত ব্যবহার করে।

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু এই ঝিমিলাই মাছ বিক্রয় করিতে না পারিলে কাঁদিয়া উঠে। ঝিমিলার এই কাঁদিয়া উঠার মধ্যেই দাম্পত্য প্রেমের একটি পরিচিত নিদর্শন মিলে।

বামুনতির চরিত্র একটি খাঁটি রাজবংশী মেয়ের চরিত্র। তাহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, সে পতিপ্রাণা। স্বামী হাট কিংবা মাঠ হইতে ফিরিতে বিলম্ব করিলে সে চিন্তান্বিত হইয়া উঠে এবং চিন্তা দমন করিতে না পারিয়া নিজেই সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। স্বামীর সহিত মাছ ধরিতে ও হাটে মাছ বিক্রয় করিতেও সে পারদর্শী। স্বামীর নিকট অকারণে প্রহৃত হইয়াও সে কিছু বলে নাই। বরং তাহার পর পুনরায় জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে অগ্রসর হইয়াছে।

বামুনতির মধ্যে নারী জীবনের প্রায় সব কয়টি স্তরই উদাহৃত হইয়াছে। তাহাকে প্রথমে দেখি শরম-সঙ্কুচিত কুমারী রূপে। তারপর তাহাকে পাই পত্নীরূপে। নারীর মোহিনী দিকের বিকাশ হইয়াছে পান খাইয়া মাছ বিক্রয় করিবার মধ্যে। পান খাইয়া নিজের দেহকে আকর্ষণময় করিয়া মাছ বিক্রয় করিবার মধ্যে যে হীনতা আছে, সে হীনতাটুকু বামুনতির চরিত্রের সকল দিকের পটভূমিতে বিচার করিলে খুব বড়ো বলিয়া মনে হয় না। সাময়িক ভাবে বামুনতিকে বিধবারূপেও দেখা গিয়াছে। পরিশেষে পাই তাহার মাতৃ-রূপ। এই সকল দিক ধরিয়া বামুনতিকে বিচার করিলে তাহাকে রক্তমাংসের গড়া একটি চাষী রমণী বলিয়া চিনিয়া লইতে ভুল হয় না।

এই পালাগানের অপর প্রধান চরিত্র কালী। কালীর অসীম ক্ষমতা। রাখালের পুত্রকে ইনি নিহত করিতে পারেন, শিকারির মৃত পুত্রকে ইনি জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন, মৃত ঝিমিলাকে বাঁচাইয়া ধন-জনের বর দিতে পারেন। কিন্তু, মঙ্গল-কাব্যের দেবী মনসার মতোই ইনি ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্যই দেবী মনসার মতো তাঁহাকে ধ্বংসাত্মক কার্যসাধন করিয়া আপনার মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে।

কিন্তু কালী যতোই ক্ষমতা-সম্পন্না হোন না কেন, সাধারণ মানুষের স্পর্শটি যেন মাঝে মাঝে তাঁহার দেহেও লাগিয়া আছে। সাধারণ রমণীর মতো তিনিও প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছেন, সাধারণ মানুষের মতোই যাত্রাকালে হলকর্ষণরত কৃষকের মুখ দেখিবার জন্য অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। কালীর অসীম ক্ষমতার কিছুই তাঁহার জন্ম-লব্ধ নয়, পিতার

CENTRAL LIBRARY

নিকট হইতে দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহা আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যেও কালী চরিত্রের বাস্তবতাটুকু পাই।

এই পালাগানটির কাঠামো ও চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে কোথায় যেন মঙ্গল-কাব্যের ছোঁয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, কালী যেন এখানে দেবী মনসার ভূমিকা নিয়াছেন। ঝিমিলা-বামুনতির দাম্পত্য-কাহিনী চণ্ডী মঙ্গলের ব্যাধ দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্যাধ কালকেতু একদিন কিছু শিকার না পাইয়া ঝিমিলার মতোই কাঁদিয়াছে। ফুল্লরার মতো বামুনতিও স্বামীর হাতে প্রহৃত হইয়াছে। কাহিনীর কাঠামোতেও মঙ্গলকাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রভাব সর্বাধিক স্পষ্ট হইয়াছে ঝিমিলার বিবাহের উদ্যোগ, তাহার সওদা করা, 'বৈরাতী' হইবার জন্য জনৈকা পড়শীর বায়না ধরা, ঝিমিলার বিবাহ-যাত্রা, ঝিমিলা-বামুনতির দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান এবং কালী ও বামুনতির সন্তান প্রসবের বর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে। আলোচ্য পালা গানটির পুরা অংশ মিলে নাই। শুনিয়াছি, মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে এখানেও বিবাহ-সভায় পতিনিন্দা, সাধভক্ষণ, রন্ধনের তালিকা প্রভৃতিও গ্রথিত করা হয়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিকরূপ এই গানটি প্রকাশের ফলে ধরা পড়িল। মঙ্গলকাব্যধর্মী রচনাও যে যাদু-মন্ত্রাত্মক হইতে পারে, তাহাও ইহাতে প্রমাণিত হইল। রূপকথার অনেক পরিচিত Motif-ও ইহাতে পাওয়া যায়।

গানখানির মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল ইহার অন্তর্ভুক্ত চরিত্র-দের পেশা। ইহারা কেহ হাঁড়ী, কেহ জেলে, কেহ ব্যাধ, কেহ চাষী। মহা-শক্তি সম্পন্না কালী ব্যাধের গৃহে আতিথ্য লইয়াছেন। ঝিমিলা ও বামুনতি জলপাইগুড়ি জেলার দুইটি নদীর নাম। সে হিসাবে ঝিমিলার জেলে হওয়া সঙ্গত। নদী বলিয়া নদীতেই ঝিমিলাকে পাওয়া গিয়াছে। কানীন-পুত্রকে কাহিনীর নায়ক করিতে কোনোই দ্বিধা দেখা যায় নাই॥

॥ ৬ ॥

৩১৮ হইতে ৩২১-সংখ্যক গানগুলি আসলে স্বতন্ত্র কোনো গান নয়। এইগুলি দীর্ঘ পালাগানের অন্তর্ভুক্ত খুচরা গান। সাধারণত শান্তি-সঙ্গীত গাহিবার কালে এই গানগুলি গাওয়া হয়।

CENTRAL LIBRARY

ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনখানি গান স্পষ্টতই 'ঝাড়ানি' গান। বিভিন্ন উপদেবতার নাম করিয়া ওঝা এই সকল গান গাহিয়া থাকেন এবং রোগীকে ঝাড়িতে থাকেন।

৩১৮-সংখ্যক গানে দেবাসুর কর্তৃক সাগর মন্থনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সমুদ্র মন্থনের ফলে যে বিষ উঠিয়াছিল, তাহা সকল সর্পের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল, শিঙ্গি ও ট্যাংরা মাছও এই বিষের ভাগ খানিকটা পাইল। অবশিষ্ট বিষ মহাদেব খাইলেন। কিন্তু এই মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' নহেন, তাই—

গালাতে ধরিল্ বিষো চখু হইল্ ঘুল্।
মাথাত্ উঠিল্ বিষো মুখে নাইরো বুল্॥—সং ৩১৮

মহাদেবের এই অবস্থা দেখিয়া আকাশের দেবতাগণ জয়ধ্বনি করিয়া বলিলেন, মহাদেব মরিবেন না, বাঁচিয়াই থাকিবেন।

গানখানি গাহিবার উদ্দেশ্য হইল, মহাদেব যেমন বিষপান করিয়া সাময়িক ভাবে অসুস্থ হইয়া পরে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, রোগীও তেমনি দেবতার রোষ-বিষে সাময়িকভাবে অসুস্থ হইলেও পরিশেষে ভালো হইয়া উঠিবে। বুঝিতে কষ্ট নাই, ইহা "অনুকরণাত্মক যাদু"।

৩১৮ক-সংখ্যক গানে ওঝা গাহিতেছেন, 'ওই ঝাড়োঁ বিষো নাই গে, ফুঁকো বিষো নাই'। ইহাই গানটির মূল কথা। কালীর রোষেই রোগী অসুস্থ হইয়াছেন। তাই দ্বিতীয় স্তবকে কালীকে তাঁহার ক্রোধ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পরবর্তী গানটিতে ওঝার পেশার প্রতিফলন হইয়াছে। পেশাদার ওঝা রোগীকে ভালো করিতে পারিলে পুরস্কার পাইবেন, এইকথা বলিয়া রোগীকে ঝাড়া হইতেছে—

অঝা না হই, বোঝা না হই, মাই,
অঝার ছোটো গে ভাই।
ওগে, তোর বন্ধুয়াক ভাল্ করিলে
হামরা কিছু পাই॥—সং ৩১৯

মন্ত্রের চেয়ে পুরস্কার-প্রাপ্তির কথাই এখানে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

৩২০-সংখ্যক গানে কোনো দেব-দেবীকে অনুরোধ করা হয় নাই। এখানে ওঝার ব্যক্তিগত দুঃখ-কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। ওঝা তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছেন, ছয় মাসের মড়াকেও মন্ত্র-বলে আমি বাঁচাইতে পারি। কিন্তু এতোবড়ো গুণী হইয়াও আমার ঘরে ভাত নাই। খুব সম্ভব, প্রত্যক্ষ ভাবে পুরস্কার না চাহিয়া, নিজের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া পরোক্ষভাবে ওঝা পাওনার অতিরিক্ত পুরস্কার মাগিতেছেন॥

॥ ৭ ॥

ওঝালি গান ছাড়া ওঝাদের ছড়াও আছে। এই ছড়াগুলি খুব দ্রুত তালের। এক নিঃশ্বাসে তিনবার বিড়্-বিড়্ করিয়া উচ্চারণ করিলেই, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেগুলি কার্যকরী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। পেশাদার ওঝাগণ সহজে ইহা অপর কাহারো নিকট বলিতে চাহেন না। এইজন্য এই শ্রেণীর ছড়া বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

এই সকল মন্ত্র-ছড়াগুলির ব্যবহারিক মূল্যই বেশি। 'মন্ত্র-ধর্মী ছড়া' হইলেও ছড়াগুলি অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি নয়,—বরং প্রতিটি ছড়ার একটি সুস্পষ্ট অর্থ আছে। ইহাকে এক বিশেষত্ব বলিতে হইবে। ওঝালি গানের মতো ছড়ার মধ্যেও কোনো কোনো স্থানে মহাদেব ও ধর্ম ঠাকুরকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

৩২১ ও ৩২১ক-সংখ্যক ছড়া দুইটি যথাক্রমে বাড়ী ও ঘর 'বন্ধের' মন্ত্র। চোর-ডাকাত যাহাতে বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে বাড়ী-ঘরের চতুর্দিক ঘুরিয়া ওঝা এই মন্ত্র পড়িয়া দেন। মন্ত্রের বক্তব্য বিষয় এই : এই বাড়ীর চারিদিকে লৌহবর্মের মতো শক্তিশালী মন্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। এই বাড়ী ইট ও পাথর দিয়া প্রস্তুত। চোর-ডাকাত দূরের কথা, স্বর্গ-মর্তের সর্বস্থানে যিনি সহজেই বিচরণ করিতে পারেন সেই যমরাজ আসিলেও সহজে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আজ দ্বিপ্রহর হইতে আগামীকাল সারারাত্রি এই মন্ত্র বলবৎ থাকিবে। কেহ যদি এই বাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে মহাদেবের মাথায় পা দিলে যে পাপ হয়, সেই পাপে সে পতিত হইবে। পরবর্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে, শিবের 'হুঙ্কারে' এই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হইল, কেহ যেন ইহা খুলিতে চেষ্টা না করে।

CENTRAL LIBRARY

অন্ধকার, নির্জন ও বিপদসঙ্কুল পথে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ৩২২-সংখ্যক মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা নিজের দেহকে বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে 'দেহার বান মন্ত্র' বলা হয়। মন্ত্রে বলা হইতেছে, সমস্ত অঙ্গকে মন্ত্র-দ্বারা বাঁধিয়া লইলাম। কেহ যদি এই মন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া আমার দেহ স্পর্শ করে, তবে সে মহাদেবের মাথা খাইবে।

রোগীর জ্বর হইলে ওঝারা মন্ত্র-দ্বারা জ্বর সারাইয়া থাকেন। যে মন্ত্রদ্বারা জ্বর সারানো (কাটানো) হয়, তাহাকে বলে 'জ্বর-কাটানির মন্ত্র'। বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—এই পূজায় তুষ্ট হইয়া ওগো মাশান ঠাকুর, রোগীকে পরিত্রাণ দিয়া তুমি দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাও (সং ৩২৩)।

গ্রাম্য জনসাধারণের নিকট প্লীহা এক বিভীষিকা। এই প্লীহা দূর করিবার মন্ত্রকে বলা হয় 'পিলাই কাটার মন্ত্র'। মন্ত্রে বলা হইতেছে, প্লীহা ভাত হইতে হয়, ইহা পেটের বাম দিকে থাকে। মন্ত্র-দ্বারা 'অমুকের' প্লীহা কাটিয়া খান্-খান্ করিলাম (সং ৩২৩ক)।

রাত-কানাকে বলা হয় 'আন্ধাশূলা'। রাত্রির দেবী 'গহিলী'-র রোষেই মানুষ 'আন্ধাশূলা' হইয়া থাকে। মন্ত্রে বলা হইতেছে, আজ হইতে 'অমুকের' 'আন্ধাশূলা' কাড়িয়া লইলাম। ওগো আন্ধাশূলা, তুমি রোগীকে ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাও। শান্তিময় গরুড়ের হুঙ্কারে 'অমুকের' আন্ধাশূলা চক্ষু হইতে মাটিতে পড়িল। পাখির সহিত চোখের সংস্পর্শ লক্ষণীয়। 'আন্ধাশূলা' রোগ এইখানে একটি বস্তু বা 'বিচ্ছেদ্য পদার্থ' রূপে কল্পিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকে, 'মাশ্‌নাভূত' আর পরীর রোষেই মানুষ রাত-কানা হইয়া থাকে। দুধ, কলা, পান, সুপারি ও ফুল দিয়া ইঁহাদের তখন তুষ্ট করা হয়। পূজার পর ওঝা কোনো জন্তুর নাড়ী-ভুঁড়ির রস শুকাইয়া তাহার খানিকটা রোগীর চোখের ভিতরে দেয়। তারপর রোগী সহ সকলকে 'আন্ধাশূলা'-র ব্রতকথা শোনানো হয়। আন্ধাশূলার ব্রতকথা এই :

"একটা আজার (রাজার) তিনটা গাঁও। তিনটা গাঁও যেমন তেমন, একটা গাঁওতে বসতে নাই। যেইটা গাঁওতে বসতে নাই, ওইটা গাঁওতে

CENTRAL LIBRARY

বসিল, তিনটা কুম্‌হার (কুমার)। তিনটা কুম্‌হার যেমন তেমন, একটা কুম্‌হারের হাতে নাই (হাতই নাই)। যেইটা কুম্‌হারের হাতে নাই, ওইটা কুম্‌হার বেনালে (বানাইল) তিনটা তাই (তাওয়া, চাটু)। তিনটা তাই ফাটাফুটা, একটা তাই তাই-ই না হয়। ওইটা তাই-তে আন্ধিয়া (রাঁধিয়া) খালে তিনটা বাভন (ব্রাহ্মণ)। একটা বাভন পালে (পাইল) না। যেই বাভনটা পালে নাই, ওইটা বাভন পালে তিনটা বল (বলদ)। দুইটা বল বহে (বহিয়া) পিটে খায় (কাজ করে), একটা বল বহে না। ওইটা বল ব্যাচে (বিক্রয় করিয়া) করিল্ তিন টাকা।

দুইটা টাকা ফাটাফুটা, একটা টাকা টাকায় (টাকাই) না হয়। সেই টাকাতে নিলে (নিল) তিনখান কোদাল। তিনখান কোদাল যেমন তেমন, একখান কোদালের ঘরে (ফুটাই) নাই। ওইখান কোদাল দি' (দিয়া) বসালে (খুঁড়িল) তিনটা চৌকা (পুকুর)। তিনটা চৌকা যেমন তেমন, একটা চৌকাত্ পানিয়ে (জলই) নাই। যেইটা চৌকাত্ পানি নাই, ওইটা চৌকাত্ বসালে তিনখানি ঝাটি (জাল)। তিনখান ঝাটি যেমন তেমন, একখান ঝাটির পটে (বুননই) নাই। যেইখান ঝাটির পটে নাই, ওইখান ঝাটিত্ মারিল্ তিনটা উহি (রুই) মাছ। পুড়ি করলে ছাই। লাফা তোর সুন্দরা, হাটত্ ভাঙ্গিলে বেল। আন্ধাশূলা, যমশূলা, সাত সমুদ্দর লঙ্কা আজি হাতে (হইতে) পার হওয়া গেইল্।"[১] 'কথা'টি 'Chain folk-tale'-এর একটি দুর্লভ নিদর্শন।

প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে তুক্-তাক্ বশীকরণ ইত্যাদি করিবার প্রথা মোটেই বিরল ব্যাপার নয়। লোক-সমাজে ইহার প্রভাবও ব্যাপক। সঙ্কলিত নাটক-গুলির মধ্যেও দেখি, প্রেমিক যখন প্রেমের জোরে নায়িকাকে জয় করিতে পারে নাই, তখন সে তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয় লইয়াছে। ইহাতে প্রেমের জয় ধ্বনিত হয় না বটে, কিন্তু সে সূক্ষ্ম বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে না করাই ভালো।

১ এই শৃঙ্খলাময় ও হেঁয়ালি-মূলক 'কথা'-টি গানের আকারে রঙ্গপুর জেলা হইতে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন সংগ্রহ করিয়াছিলেন (দ্রঃ জার্নাল অব্ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ৪৬ খণ্ড, প্রথম ভাগ, ১৮৭৭)। উক্ত গান হইতে বর্তমান কাহিনীর অতিরিক্ত তথ্য মিলে। এখানে কুমারের উল্লেখ আছে। গানে পাই কামারের উল্লেখ। দ্বিতীয়টি সত্য বলিয়া মনে হয়। গ্রীয়ারসন্ গানখানিকে 'গোরক্ষনাথের গান' এই নামে প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ শ্রীচারুচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় ইহার একটি পাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

সাধারণত পুরুষেরাই এই সকল মন্ত্রদ্বারা নারীকে বশ করিতে চায়। পেশাদার ওঝা হাতের তেলোয় তেল বা ঘি লইয়া এই মন্ত্র পড়ে এবং তাহা পূত করিয়া দেয়। সে পূত তেল বা ঘি উদ্দিষ্টা নারীদেহে ছোঁয়াইতে পারিলেই সে বশীভূতা হইয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

মন্ত্রের মধ্যে ধর্মঠাকুর, নিরঞ্জন, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় একেবারে স্পষ্ট। মন্ত্র বলিয়া তাহাতে অর্থহীন শব্দ বা কোনো রূপ অস্পষ্টতা নাই। 'অমুক' মেয়েটির সহিত যেন 'অমুক' পুরুষের সাক্ষাৎ হয়, মেয়েটি যেন তাহার পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষটির অনুগত হয় (সং ৩২৪)। 'অমুক' পুরুষকে না দেখিলে 'অমুক' মেয়েটি যেন মাথা কুটিয়া মরে (সং ৩২৪ক)। 'অমুক' মেয়েটি যেন 'সর্বদাই' 'অমুক' পুরুষের কথা চিন্তা করে (সং ৩২৪খ)। প্রতিটি মন্ত্রের সহিত এই জন্য দেবতার দোহাই দেওয়া হইয়াছে॥

॥ ৮ ॥

উপসংহারে সঙ্কলিত ওঝালি গান ও ছড়াগুলির সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

কোনো নির্দিষ্ট অসুখের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ওঝালি গান নাই। যে কোনো রোগই দেবতার রোষ-হেতু হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অতএব পূজার মাধ্যমে দেব-দেবীকে তুষ্ট করাই এই সকল গানের লক্ষ্য। সকল গানের মধ্যেই দেব-দেবীকে তুষ্ট করা হইয়াছে। রচনারীতির দিক হইতে বিচার করিলে একটি ওঝালি গানের সহিত অপর আর একটির তফাৎ বড়ো নাই। তাই যে কোনো অসুখই হউক না কেন, গান কিন্তু একই।

তবে, রোগ বিশেষে কাহিনীর এক-একটি অংশ অনেক সময় প্রাধান্য পাইয়া থাকে। যেমন, কাহারো প্রসবকালীন সঙ্কট উপস্থিত হইলে বামুনতির সন্তান প্রসব অংশটি প্রাধান্য পাইয়া থাকে। অবশ্য ইহারও কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই।

CENTRAL LIBRARY

গানগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপদেবতা ও অপদেবতাদের নাম পাওয়া যায়। সমাজতাত্ত্বিকের নিকট ইহা এক মূল্যবান তথ্য। এই সকল দেব-দেবীর কে কোন্ রোগের কারণ, ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কী সম্পর্ক ইত্যাদি কথাও গানগুলি হইতে জানা যায়। যেমন, ধর্মঠাকুরের কন্যা কালী। কালীর আঠারোটি পুত্র (সং ৩২৩)। 'মাশান' তাঁহাদের মধ্যে বড়ো। ইঁহার জন্ম ভাদ্র মাসের শনিবার। ইনি শ্মশান-ঘাটে থাকেন, ইঁহার লম্বা লম্বা দাড়ি আছে এবং দেখিতে বেঁটে-খাটো। রাত্রির দেবতা 'গহিলী'। ইনিই মানুষকে রাতকানা করিয়া রাখেন। অন্যান্য উপদেবতা ও অপদেবতার নাম বিভিন্ন গানের আলোচনা কালে উল্লেখ করিয়াছি।

গানে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পাইয়াছেন ধর্ম-নিরঞ্জন। অন্যান্য গানের বন্দনাকালেও ধর্মঠাকুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পূজা-স্থানে ইহারই নামে শ্বেতপতাকা উড়ানো হয়। ইনি যে সূর্যদেবতা, তাহার পরিচয় পাই এইখানে : 'উঠ উঠ ধর্মঠাকুর লোহিত বরণ' (সং ৩২৪)। যেখানে ধর্মঠাকুরকেই বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, সে অঞ্চলে 'ধর্ম-মঙ্গল' কাব্যের প্রচলন নাই কেন, তাহা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ধর্মঠাকুরের পর যিনি প্রাধান্য পাইয়াছেন, তিনি মহাদেব। মনে হয়, ধর্ম-ঠাকুর ও মহাদেব ইহাদের কল্পনায় এক হইয়া গিয়াছেন।

অধিকাংশ স্থলেই ওঝা রোগীকে মুক্তি দিয়া উপদেবতা ও অপদেবতাগণকে 'দক্ষিণ' দিকে চলিয়া যাইবার কথা বলিয়াছেন। 'দক্ষিণ' দিকের প্রতি এই গুরুত্ব আরোপের হেতু সহজে বুঝিতে পারা যায় না, তবে ইহা যে এক বিশেষত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। যমের দুয়ারও দক্ষিণদিকে কল্পিত হইয়াছে। বাঙলার লোককথায় দক্ষিণদিক সম্পর্কে নানা 'taboo' চলিত আছে।

ঝিমিলা ও বামুনতির নাম দুইটি নদীর নামের অনুকরণে দেওয়া হইয়াছে। এই রীতি বোডো ও ধীমাল উপজাতিগণের নিকট হইতে লওয়া, মনে হয়। মেচগণের মধ্যে নদী-উপাসনা অত্যন্ত প্রবল। জলপাইগুড়ি-দার্জিলিঙ-আসামের এমন কোনো নদী নাই যেগুলি ইহাদের উপাস্য দেবতা নয়। এই সকল নদীকেই ইহারা পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছে এবং সমস্ত নদীগুলির মধ্যে একটি পারিবারিক সম্পর্ক কল্পনা করিয়া লইয়াছে। যেমন তিস্তা ও ধরলা

স্বামী-স্ত্রী। ইহাদের সাত পুত্র, সেই সাত পুত্রের সাতটি স্ত্রী, এই সমস্ত পুত্র ও পুত্রবধূদের নাম নদীর নাম দিয়া।[১]

ঝিমিলা-বামুনতিকে স্বামী-স্ত্রী রূপে কল্পনা করিবার প্রবণতা কোচ-বোড়ো-ধীমাল উপজাতিগণের নিকট হইতে পাওয়া। বোড়ো ভাষাতেই 'তি' শব্দের অর্থ—জল।

ওঝালি গানগুলির ভাষা স্থানে-স্থানে বেশ মার্জিত। ইহা এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য॥

১ দ্রষ্টব্য : জার্নাল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, জুলাই ১৮৭৯, পৃঃ ৭২৫॥

CENTRAL LIBRARY

॥ মড়া-খোয়া ॥

আনন্দের মতো শোককেও মানুষ গান দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। জীবনের কোনো অনুষ্ঠানই গান ব্যতীত পূর্ণ হয় না। মৃত্যু মানুষের জীবনে এক বিশেষ ঘটনা। মৃতদেহ সংকার করিবার কালেও মানুষ তাই গান গাহিয়া থাকে। মানুষের 'আত্মা' বস্তুবৎ বিচ্ছেদ-যোগ্য, তাহা দেহ ছাড়াইয়া গেলেও পুনরুজ্জীবিত হয়, নানা রূপ ধরিতে পারে, এবং বিদেহী হইয়াও সপ্রাণ থাকে,—'আত্মা' সম্পর্কে আদিম মানুষের এই সকল ধারণা থাকিবার জন্যই মৃত্যু-সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে।

সাধারণত শোক-সঙ্গীতরূপেই এই সকল গানকে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে এই সকল গান গীত হয় বলিয়া প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে এই সকল গানকে 'মড়া-খোয়া' গান বলা হয়

রাজবংশীদের গৃহে কেহ মরিলে কতকগুলি আচার পালন করা হইয়া থাকে। ইহাদের অশৌচকাল সাধারণত তিনদিন। অধুনা নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ইহাদের কেহ কেহ এগারো বা তেরো দিন অশৌচ পালন করিতেছে।

অনেক রাজবংশী মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধি দিয়া থাকে। সমাধিস্থলে দেওয়া হয় সওয়া সের লবণ। মৃতদেহ বাড়ীর পিছনদিকের বেড়া ভাঙ্গিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনদিন পর ওই ভাঙ্গা বেড়া জুড়িয়া দেওয়া হয়, যাহাতে মৃত আত্মা পুনরায় ফিরিয়া আসিতে না পারে। শোনা যায়, শহর জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠস্থিত রঙ-ধামালির হাটটিই নাকি পূর্বে রাজবংশীদের সমাধি-প্রাঙ্গণ ছিল।

আধুনিককালে মৃতদেহ অধিকাংশ স্থলেই দাহ করা হয়। শবদাহ কালে কাষ্ঠ অপেক্ষা বাঁশের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে বলিয়াই হয়তো এইরূপ প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে।

শবদেহ দাহ কালে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন গীতি ও কীর্তন গান গাহিবার প্রথা আছে। মৃতদেহকে প্রথমে তুলসী তলায় নামানো হয়, এবং গান গাওয়া হয়। দাহ করিয়া চিতা ধুইয়া ঘরে ফিরিবার কালে 'রামচন্দ্রের' দোহাই দিয়া বলা

হয়, মৃত আত্মা যেন সংকারকারীদের সহিত ফিরিয়া না আসে। বাড়ীর ভাঙা বেড়া জুড়িয়া দিবার কথাও এখানে মনে রাখিতে হইবে। আত্মার পুনরাগমন সম্পর্কে ইহারা খুব সচেতন, বুঝা যাইতেছে। বিদেহী আত্মাকে নিশ্চয়ই অশুভ শক্তিরূপে বিবেচনা করা হয়।

প্রথম পিণ্ডদান শ্মশানেই করা হয়।

তিনবছরের অনূর্দ্ধ শিশুর মৃত্যু হইলে সমাধি দেওয়া হয়। গর্ভবতী সধবার মৃত্যু হইলে তাহার স্বামী পেট কাটিয়া সন্তানটিকে বাহির করিয়া উহাকে সমাধি দেয় এবং মাতাকে দাহ করে। কোনো কোনো অঞ্চলে গর্ভবতীর শব সমাধিস্থ করিয়া সেইখানে, একটি কলা গাছ রোপণ করিয়া দেওয়া হয়। ওই গাছ মৃত নারীর **'Life token'** হইয়া দাঁড়ায়। বাঙলার এবং বিশ্বের বহু লোককথায় সমাধিস্থলে বৃক্ষরোপণ করিতে বা বৃক্ষ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। এই আচার দেখিয়া উহাকে আর কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না।

ডি. এইচ. ই. সাণ্ডার লিখিয়াছেন, ত্রিশদিন পর শ্রাদ্ধ করা হয়। ত্রিশদিন অশৌচের কথা আমি শুনি নাই।

মৃত্যু-সঙ্গীতগুলির বিষয়গত বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার মধ্য দিয়া জগৎ ও জীবনের অনিত্যতা প্রকাশ করা হয়। দারা-পুত্র-পরিবার কেহ নয়, মৃত্যুর মধ্যে সকলেই নিঃসঙ্গ, ধন-জন-মান সেখানে তুচ্ছ, ইত্যাদি ইহার মূল বক্তব্য। কখনো বা ইহার মধ্যে তত্ত্বকথা আসিয়া পড়ে। দেহ ও আত্মা এই দুইটি পৃথক সত্তা। আত্মার আধার হইল দেহ। দেহ ছাড়া আত্মার রূপ নাই,—গানে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু আচারাদি বিশ্লেষণে স্বতই প্রমাণিত হয়, বিদেহী আত্মার জীবসত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

মৃতদেহকে তুলসী তলায় নামাইয়া যে গানটি গীত হইতেছে (সং ৩২৫) তাহাতে গৌরাঙ্গের নিকট প্রশ্ন করিয়া বলা হইতেছে, ওগো গৌরাঙ্গ, দুদিনের জন্য এই প্রেমের ঘর বাঁধিয়াছিলেই বা কেন, তাহাতে আজ আগুনই বা দিলে কেন। মানুষের মরিয়া পরলোকে চলিয়া যাওয়া যেন নিমাই-কর্তৃক বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া। তারপরেই কিন্তু জীবনে সাধুসঙ্গ পাওয়া গেল না বলিয়া ক্ষোভ ও খেদ করা হইয়াছে। পরিশেষে বলা হইয়াছে, এ জীবনে ভাই-বান্ধব সবাই স্বার্থপর। তুমি মরিয়াছ, আগে তোমার ধন-

সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া তবে তোমার স্বজনেরা তোমাকে দাহ করিতে লইয়া যাইতেছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই এই সময় তোমার সাথী হইবেন।

মৃতদেহ লইয়া শ্মশান-পথে যাওয়া হইতেছে। মৃতদেহের এই যাত্রা যেন শচীনন্দন গোরার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া (সং ৩২৫ক)। গোরার 'দুই নয়নে বহে ধারা'। গোরার এই চোখের জল আসলে শোকযাত্রাকারী-দেরই অশ্রুধারা।

তারপর মৃতদেহকে চিতায় তুলিয়া আগুন দেওয়া হইল। এই সময়ে গীত গানে বলা হয় 'এ দেহা ভাই মাটির ভাণ্ড, পুড়িয়া করিবে ছাই'। মানুষ মরিলে যতোই তাহার স্বজনেরা কাঁদুক না কেন, কেহই চায় না মৃতের আত্মা সংকারকারীদের সহিত গৃহে ফিরিয়া আসুক। তাই চিতা ধুইয়া বাড়ী আসিবার কালে 'রামচন্দ্রের' দোহাই দিয়া মৃত আত্মাকে বলা হয়, সে যেন আর গৃহে ফিরিয়া না আসে (সং ৩২৫খ)।

রাজবংশী সমাজের নিয়ম অনুযায়ী মৃতের প্রতি প্রথম পিণ্ডদান শ্মশানেই করিতে হয়। গানে বলা হইতেছে, এই পিণ্ড পাইয়া রাজা দশরথের (?) স্বর্গবাস হইল (সং ৩২৫গ)। মুহূর্তে মৃত ব্যক্তি শচীনন্দন গোরা হইতে রাজা দশরথে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

মৃতদেহের সংকার করিয়া গৃহে ফিরিবার কালেও গান করিতে করিতেই ফিরিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে গীত গানের মধ্যে বৈরাগ্য ও আত্ম-সমর্পণের ভাবটি প্রবল হইয়া উঠে। গানে তাই বলা হয়, গৃহ-জালায় দিন ফুরাইল। ওদিকে মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। 'হরি হরি বলো বদনে' (সং ৩২৫ঘ)।

শ্রাদ্ধের দিন এই সকল গানই গীত হইয়া থাকে। তবে, সেইদিন কীর্তন, তুক্ষা ও মনঃশিক্ষাও প্রচুর পরিমাণে গাওয়া হয়।

সমাধি দিবার সময় সোয়া সের নুন দেওয়া হয়। এইজন্য সমাধি দিবার সময় গীত গানকে বলা হয় 'নুন-মাটির'-র গান।

৩২৬-সংখ্যক গানখানি এই ধরণের। ইহার প্রথম স্তবকটি বিশেষভাবে আলোচ্য। ইহার মধ্যে গায়কদের জবানীতে সমাজের একটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে, আজ ওই বুড়ীর স্বামী মরিল,—মৃত ব্যক্তির যুবক পুত্র আর কি উহার মাতাকে

ভাত-কাপড় দিয়া প্রতিপালন করিবে? পিতা মরিলে পুত্রগণ মাকে অনেক সময় হেলা করিয়া থাকে, গানে তাহাই বলা হইতেছে। ইহা গাহিয়া বোধ হয় পুত্রকে তাহার পারিবারিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেওয়া হয়। লক্ষ করা দরকার, কোনো ভক্তি, বৈরাগ্য বা আত্মসমর্পণের কথা না বলিয়া একটি রূঢ় সত্যকে এখানে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

পিতা না মরিয়া মাতা মরিলে এই গানখানিই অন্যরূপে গাওয়া হইত। সাধারণত এই সকল গান উপস্থিত ক্ষেত্রেই রচনা করিয়া গীত হয়। পরবর্তী স্তবকগুলিতে সমাধি দিবার রীতি বর্ণিত হইয়াছে। নদীর ভাটির দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে মাথা রাখিয়া, সরু করিয়া গর্ত খুঁড়িতে হয়; তারপর সোয়া সের নুন দিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয়।

পরবর্তী গানখানির (সং ৩২৬ক) প্রথম স্তবকে পাই: এই মাটির গর্তে প্রবেশ করিয়াই দেহ বিনষ্ট হউক, ইহা ছাড়া মৃতদেহের অপর কোনো গতি নাই। পরের স্তবকগুলিতে বৈরাগ্যের কথাই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

অষ্টম অধ্যায়

। আনন্দ-গীতি ।

॥ ফাকসালি ও খ্যাচেরা ॥

॥ ১ ॥

হাসি-রঙ্গ-ব্যঙ্গ-ঠাট্টা-তামাশা জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক। জীবনের এই দিকটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের গানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

জলপাইগুড়ির রাজবংশী সমাজে হাসির ও অবসর বিনোদনের জন্য লঘু সঙ্গীতকে 'ফাউকচালি' এই নামে অভিহিত করা হয়। সকারীভবনের (Assibilization) ফলে ইহা 'ফাকসালি' বা 'ফাউকসোয়ালি' রূপেও উচ্চারিত হইয়া থাকে। গুরুত্বহীন, লঘু ও তরল ব্যাপার-ঘটিত কথাকে বলা হয় 'ফাঁস কথা' বা 'ফাঁক কথা'। 'ফাঁস' ও 'ফাঁক' একত্র মিশিয়া তাহার সহিত 'আলি' প্রত্যয় যোগ করিবার ফলে 'ফাকচালি' শব্দটি গঠিত হইয়াছে, মনে হয়। এই প্রসঙ্গে, 'ফচ্‌কে' (তু 'ফচ্‌কে ছোঁড়া') শব্দের সহিত 'ফাকচালির' সম্পর্ক থাকিতেও পারে।

জলপাইগুড়ি জেলারই কোনো অংশে 'ফাকসালি' গানকে 'খ্যাচেরা' নামে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। 'খিচর' শব্দটিরও অর্থ ঠাট্টা-রঙ্গ ইত্যাদি। 'খিচর' করা হয় যে গানের মাধ্যমে তাহাই 'খ্যাচেরা' গান।

ফাকসালি বা খ্যাচেরা গান সাধারণত দোতারা বাজাইয়া গীত হইয়া থাকে। তরল রসের গান বলিয়া ইহার ছন্দ দ্রুত। আজকাল অনেক স্থানেই এই গানকে 'দোতারা-বাজা' গান বলা হইতেছে। কিন্তু, অন্যান্য প্রায় সকল প্রকার গানেই বাদ্যযন্ত্র রূপে দোতরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, 'দোতরা-বাজা' গান বলিলে কেবল ফাকসালি বা খ্যাচেরা গানকেই বোঝায় না।

কোচবিহার জেলায় এই 'ফাকসালি' ও 'খ্যাচেরা' গান একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক নাম পাইয়াছে। সেখানে এই গানকে 'চট্‌কা' নামে অভিহিত করা হয়। 'চট্‌কা'-কে অনেকেই গানের 'বিষয়' বলিয়া ভুল করেন। কিন্তু, আসলে 'চট্‌কা' একটি বিশেষ 'তাল' (স্থূলার্থে 'সুর')। প্রকৃতপক্ষে, এমন অনেক গান দেখা যায়, যাহার বিষয়বস্তু তরল বা লঘু নয়, কিন্তু সুর 'চট্‌কা'।

CENTRAL LIBRARY

তবে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে,—চট্‌কার সুরে বর্তমানে কেবল তরল রসের গানই চলিতেছে। স্বর্গীয় আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মেদ প্রমুখ উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পিগণ রেকর্ড-গীতির ফলে চট্‌কা গানের প্রতি বর্তমানে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

সঙ্কলিত ফাকসালি ও খ্যাচেরা গানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে,—ইহাদের রঙ্গ-রসিকতা একদিকে যেমন দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ, তেমনি সেই রঙ্গ-তামাশা একান্তভাবে তাহাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি ও রসবোধ দিয়া গড়িয়া লওয়া। যাঁহারা ইহাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম মমত্ববোধ দ্বারা একাত্ম হইয়া না যাইবেন, তাঁহারা ইহাতে কোনো প্রকার রস খুঁজিয়া পাইবেন না।

ফাকসালি-খ্যাচেরা গানগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো নতুন কথা বলিবার নাই। লোক-সমাজের হাস্যরসের ভঙ্গি, রীতি, উপাদান ও বিষয় প্রায় সকল দেশেই অল্প-বিস্তর এক। সঙ্কলিত গানগুলিও তাহার ব্যতিক্রম নহে। গানগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম ও মার্জিত হাস্যরস কেহই আশা করিবেন না, পাইবেনও না। কিন্তু, স্থূলতাই উহাদের সম্পর্কে শেষ কথা নহে। অন্তরে প্রবেশ করিয়া গানগুলি অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, সমগ্র সমাজের স্থূল নিগড় হইতে একটি গানও কেন্দ্রচ্যুত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। ইহাই গানগুলির একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কাজেই গানগুলি বিচার করিবার সময় একটি বিশিষ্ট লোক-সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, সেই গণমানসের দৃষ্টি দিয়াই বিচার করা উচিত বিবেচনা করি।

ফাকসালি-খ্যাচেরা গানগুলির মধ্য দিয়া কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবণতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। যেমন, কতকগুলি গানের মধ্য দিয়া নিছক রঙ্গ-কৌতুকের প্রবণতা প্রকাশিত হইয়াছে। তেমনি কয়েকটি গানের মধ্যে ব্যঙ্গই মুখ্য স্থান লইয়াছে। কতকগুলি গানের মধ্যে রঙ্গও নাই, ব্যঙ্গও নাই; কোনো দৃশ্য বা ঘটনার তথ্যমূলক বিবৃতি, এবং সেই বিবৃতির প্রসঙ্গে রচয়িতার মন্তব্য ও অন্তরের উল্লাস প্রদর্শিত হইয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিবিধ সম্পর্ক ধরিয়া উপরিউল্লিখিত ত্রিধারায় ফাকসালি-খ্যাচেরা গানগুলি প্রবাহিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া এক-একটি ধারার আলোচনা করা যাইতে পারে।

CENTRAL LIBRARY

॥ ২ ॥

৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯ ও ৩৪১-সংখ্যক গানগুলির মধ্যে রঙ্গ-কৌতুকের দৃষ্টান্ত মিলে। এই সকল গানগুলি দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে।

একটি গানে কৃষক স্বামী কহিতেছে: হলকর্ষণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখি,—বউ ভাত রাঁধে নাই। রান্না ঘরেই তাহাকে প্রহার করিলাম। তাই গোসা করিয়া বউ এখনই বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। ওগো বউ, তোমার হাত ধরি, পা ধরি, তুমি রাগ করিয়ো না। আর কোনো দিন তোমাকে মারিলে তুমিও আমাকে মুড়ো ঝাঁটা দিয়া মারিয়ো (সং ৩৩০)। পরবর্তী গানে কৃষক-স্বামী কহিতেছে, সে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই চাষবাস আর করিবে না। উত্তরে তাহার স্ত্রী বলিতেছে, কৃষিকার্য না করিলে 'ওগে মড়া, তোক কেবা আদর করে' (সং ৩৩১)।

৩৩৩-সংখ্যক গানে রঙ্গের মাধ্যমে দাম্পত্য প্রেমের এক মনোরম বিকাশ লক্ষ করা যায়। স্বামী পাটের দালাল। সে কষ্ট করিয়া পয়সা রোজগার করিয়া আনে। কিন্তু স্ত্রী তাহার না বুঝিয়া কহিল, হালের গোরু বিক্রয় করিয়াই না হয় তাহার জন্য নাকের নোলক গড়াইয়া দেওয়া হউক। এই অবাস্তব প্রস্তাবে স্বামী তাহার ক্রুদ্ধ না হইয়া ধার করিয়া সত্যই স্ত্রীর জন্য শাড়ী কিনিয়া আনিল এবং স্ত্রীকে তাহা পরিতে বলিল। গানখানির অন্তর্নিহিত লঘু-কৌতুকটি পাইবার জন্য সমস্ত গানটিই পড়া দরকার।

৩৩৪ ও ৩৩৫-সংখ্যক গান দুইটি রন্ধন বিষয়কে ভিত্তি করিয়া লিখিত। প্রথম গানটির মধ্যে বধূর ব্যঙ্গ-ভাবই ছিল, কিন্তু উহার প্রকাশের মধ্যে কৌতুকের দিকটিই শেষে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। গৃহ-বধূ কহিতেছে, দিদি, এই দেখ আমি কি রকম রাঁধিতে পারি,—ডান পা দিয়া তেল আনিয়া বাঁ পা দিয়া রাঁধিয়াছি। হরিতকী ও তুঁতে দিয়া তরকারি রাঁধিয়া তাহাতে গাঁধীপোকা টিপিয়া দিয়াছি। অথচ, আমার ননদ ও সতীনেরা বলে, আমি নাকি রাঁধিতেই জানি না। বধূর রান্না লইয়া সকলে খোঁটা দিত,—বধূ এই গানে সেই খোঁটার জবাব দিয়াছে। এই ধরণের হাসি ও ব্যঙ্গের গান বাঙলাদেশের অন্যত্রও চলিত আছে।

CENTRAL LIBRARY

পরের গানখানিতে স্বামী-কর্তৃক স্ত্রীর রান্নার রীতি লইয়া কৌতুক করা। স্ত্রী ভালো করিয়া তরকারি রাঁধিতে পারে নাই বলিয়া স্বামী এখানে তাহাকে প্রহারের ভয় দেখাইয়া রঙ্গ করিতেছে।

৩৩৮-সংখ্যক গানে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের উপর একটি বিশেষ দৃষ্টি কোণ হইতে আলোক সম্পাত করা হইয়াছে। গণিকালয়ে রাত্রি যাপন করিবার উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যক্তি ঘটা করিয়া সাজ-পোশাক করিতেছিল। দেখিয়া তাহার স্ত্রী রাগিয়া গেল এবং পতিতালয়-গামী স্বামীর কোলে ছেলেকে চাপাইয়া দিল। ছেলে কোলে উঠিয়া থাকিবার ফলে ওই ব্যক্তির বাটীর বাহিরে রাত্রি যাপন করা হইল না। দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য বন্ধনের এই চমৎকার বিকাশের জন্য গানটিকে একটি সুন্দর গানের মর্যাদা দেওয়া চলে। এই গুরু ব্যাপার কিন্তু অত্যন্ত লঘুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার ফলে ফাকসালি গানরূপেও ইহার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আসিয়া পড়িয়াছে।

৩৩৯ ও ৩৪১-সংখ্যক গানে তারল্য ও চাপল্যের ভাব অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। কন্যার সম্মতি লইয়া জনৈক প্রেমিক রাত্রিবেলায় যাইয়া তাহাদের রান্নাঘরের পিছনে লুকাইয়া ছিল। এদিকে কন্যা তখন রাঁধিতেছিল ভাত। অন্ধকারে না দেখিতে পাইয়া কন্যা ভাতের তপ্ত ফেণ সেই প্রেমিকের গায়ে ঢালিয়া দেওয়াতে তাহার পিঠ পুড়িয়া সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া গেল। গানটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে। ফোস্কা পড়িয়া সর্বাঙ্গে ঘা হইবার কাহিনী শুনিয়া কিন্তু গানের শ্রোতাদের মনে মোটেই দুঃখ হয় না। গানটির প্রকাশভঙ্গিই এইরূপ যে, এই ব্যাপার শেষ পর্যন্ত একটি লঘু রঙ্গের পর্যায়ে পড়িয়াছে। বস্তুত, ইহাই হওয়া উচিত। ইহার প্রকাশভঙ্গিতে যদি উপযুক্ত পরিমাণে লঘু-চাপল্য না থাকিত, তবে ইহার কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

মশার কামড়ে অস্থির হইয়া এক ব্যক্তি মশাকে উদ্দেশ করিয়া প্রেম নিবেদন করিয়াছে। মশকের গুঞ্জনধ্বনি যেন উহার প্রেম-বাক্য, কামড় যেন চুম্বন। বিষয়টিই এমন যে, পড়িলে সহজেই বোঝা যায়, রঙ্গ ও কৌতুকে উচ্ছল হইয়া উঠিয়া রচয়িতা ইহা রচনা করিয়াছেন। ফাকসালি গান হিসাবে ইহার একটি মূল্য আছে॥

CENTRAL LIBRARY

॥ ৩ ॥

নিছক রঙ্গ-কৌতুক অপেক্ষা ব্যঙ্গ-প্রধান ফাকসালি গান সংখ্যায় কিছু বেশি পাইয়াছি। ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪২ক, ৩৪৩ ও ৩৪৪ সংখ্যক গানগুলি এই দলে পড়ে।

৩২৭ ও ৩২৮-সংখ্যক গান দুইটি এক তরুণকে উদ্দেশ করিয়া এক তরুণীর ব্যঙ্গ। প্রথম গানটিতে বলা হইতেছে, তরুণ যুবকটি উপরে 'ফুটানি' দেখাইয়া বেড়ায়, ওদিকে ঘরে তাহার ভাত নাই। অপর গানটি তরুণ যুবকের দৈহিক বিশেষত্ব লইয়া ব্যঙ্গ। তরুণী বলিতেছে, তরুণ যুবকটির 'টুটি সরু, প্যাটটা মোটা', ঠিক যেন তামাকের ক্ষেতে মন্দ লোকের নজর কাটাইবার জন্য 'নজর-কাটা' (Scare crow)।

৩২৯-সংখ্যক গানটি স্ত্রীর রূপ লইয়া স্বামীর ব্যঙ্গ। স্ত্রী দেখিতে খাটো, এইজন্য স্বামী তাহাকে বলিয়াছে, সে যেন দেখিতে চৌকির পায়ার মতো। সে পাড়া বেড়াইয়া দিন কাটায় এবং সারা গায়ে দাদ। স্ত্রীর সেই দাদের খুস্‌কি স্বামীর ভাতে আসিয়া উড়িয়া পড়ে, গানে এই কথা বলা হইয়াছে।

৩৩২-সংখ্যক গানটিতে ইহারই উল্টা ব্যাপার। এখানে স্বামীর কর্ম দক্ষতার অভাবকে স্ত্রী ব্যঙ্গ করিতেছে। স্বামী মাছ মারিতে যাইয়া মারিয়া আনিল কতকগুলি ছোটো পুঁটি মাছ। এই দেখিয়া অন্যান্য সবাইয়ের সহিত স্ত্রীও হাসিয়া উঠিল। পরে এইজন্যে স্বামী আসিয়া স্ত্রীকে প্রহার করাতে গানে সেই কথা উল্লেখ করিয়া স্ত্রী স্বামীকে ব্যঙ্গ করিতেছে। একই ব্যাপার ৩৩৬-সংখ্যক গানেও উদাহৃত হইয়াছে। পরিবারের অন্যান্য সকলের ধরিয়া আনা বড়ো বড়ো মাছ গৃহ-বধূ যত্নসহকারে রাঁধিয়া সযত্নেই পরিবেশন করিল। কিন্তু অকর্মণ্য স্বামীর ধরিয়া আনা ছোটো ছোটো মাছ অবহেলা সহকারে রাঁধিয়া হেলাভরেই স্বামীকে পরিবেশন করিল। অকর্মণ্য ভাশুরকে গৃহ-বধূ-কর্তৃক খাওয়া-পরার খোঁটা দিয়া ৩৩৭-সংখ্যক গানটি রচিত হইয়াছে।

৩৪০-সংখ্যক গানে দেখা যায়, এক কন্যার গলগণ্ড লইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করা হইতেছে। কন্যার স্বামীরও গলগণ্ড আছে। বর ও কনে উভয়েই গল-গণ্ডের উপর অলঙ্কার পরিয়া সিঁথি কাটিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের এই মিলিত দৃশ্যই গানটির রচয়িতাকে ব্যঙ্গের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

৩৪২ ও ৩৪২ক-সংখ্যক গান দুইখানি দূর হইতে দেখা সভ্য সমাজের

CENTRAL LIBRARY

রীতিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম গানটির ব্যঙ্গের মধ্যে অশালীন মন্তব্য লক্ষ করা যায়।

একই বিধবাকে পিতা এবং পুত্রের বিবাহেচ্ছা লইয়া রচিত হইয়াছে ৩৪৪-সংখ্যক ব্যঙ্গ-গীতিখানি। এক বুড়া বাহিরে ধর্ম-কর্ম করিয়া বেড়াইত, কিন্তু একদা সে এক বিধবাকে করিতে চাহিল। কিন্তু বাদ সাধিল তাহারই বয়স্ক পুত্র,—সে-ও ওই বিধবাকে বিবাহ করিতে চাহিল। 'হুঁকা-ছিলিম' হাতে লইয়া বুড়া এই সকল কথাই বলিতেছে।

গানখানির মধ্যে ব্যঙ্গের ভাব বড়োই প্রকট। কিন্তু এই ব্যঙ্গ প্রখর হইয়া উঠিতে পারে নাই। শেষ স্তবকে বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধের হুঁকা হাতে লইয়া যে চিন্তামগ্ন দৃশ্যের কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে ওই বৃদ্ধের প্রতি ঠিক ব্যঙ্গ করিবার মনোভাবটি থাকে না। কাজেই, ব্যঙ্গ এখানে তেমন জমে নাই।

॥ ৪ ॥

ফাকসালি বা খ্যাচেরা গানগুলির মধ্যেই এমন কতকগুলি গান পাওয়া যায়, যেগুলির উদ্দেশ্য রঙ্গ বা ব্যঙ্গসৃষ্টি করা নয়; সে চেষ্টাও গানের মধ্যে নাই। এইগুলিকে 'অবসর-গীতি' বলিতে পারা যায়। অবশ্য, ব্যাপকার্থে সকল ফাকসালি গানই অবসর-গীতি। অবসর যাপন করিবার জন্যই এই ধরণের গানগুলি রচিত, গীত ও শ্রুত হইয়া থাকে।

এই শ্রেণীর অবসর-গীতিগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল, কোনো দৃশ্য বা ঘটনার তথ্য-মূলক বর্ণনা দেওয়া এবং সেই বিবৃতির প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য ও অন্তরের উল্লাস প্রদর্শন। ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮ ও ৩৪৯-সংখ্যক গানগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

একটি গানে দেখা যায়, মাটির নীচে একটি পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, গ্রামের সকলেই তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছে ও বর মাগিতেছে। জনৈকা অনূঢ়া কন্যা তাহার ঠাকুরমাকে বলিতেছে, ওগো ঠাকুরমা, চল আমরাও গিয়া পূজা দিই এবং আমার জন্য স্বামী প্রার্থনা করি (সং ৩৪৫)। বিবাহের জন্য অনূঢ়া কন্যার আকাঙ্ক্ষার একটি সুন্দর ও সরল প্রকাশের জন্য গানটি অনেকেরই ভালো লাগিবে।

CENTRAL LIBRARY

৩৪৬, ৩৪৭ ও ৩৪৮-সংখ্যক গানগুলি হাট-বাজার-মেলা-গামী নর-নারীর পথ-চল্‌তি দৃশ্যের তথ্যমূলক বিবরণ। সৈয়বালী নামীয়া জনৈকা পানওয়ালী মাথায় পানের বোঝা লইয়া, হাত দোলায়িত করিয়া হাটে চলিয়াছে। সৈয়বালী যাইয়া দোকান সাজাইল, তারপর পান সাজিয়া নিজেই তাহা খাইয়া ঠোঁট রাঙাইয়া খরিদ্দার আকর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দর নব-পরিণীতা বধূ, কালশোরী, কাল্‌টি প্রভৃতি মেয়েরা হাটে চলিয়াছে সারি বাঁধিয়া। ইহাদের কেহ যাইতেছে বেসাতি করিতে, কেহ বা সওদা করিতে। ইহাদের বেশবাস ও অঙ্গভঙ্গির বর্ণনা দেওয়াই গানটির লক্ষ্য (সং ৩৪৭)।

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে শহর জলপাইগুড়ি হইতে আট মাইল পূর্বে জল্পেশ নামক স্থানে একমাস ব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে। ইহাই জলপাইগুড়ির শ্রেষ্ঠ মেলা। জল্পেশে সতীদেহের বামঅঙ্গ পড়িয়াছিল। প্রতি বৎসর এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকেরা এই মেলায় যাইয়া থাকে। সেই মেলা এবং মেলা-গামী মানুষের পথ-যাত্রার দৃশ্য ও বিবৃতি প্রদানই ৩৪৮-সংখ্যক গানের লক্ষ্য। এই সমস্ত গানের মধ্যে হাসি, রঙ্গ, ব্যঙ্গ নাই। নিছক বিবৃতি প্রদানই গানগুলির বিষয়। কাজেই রাজবংশী সমাজের লোকমানসের সহিত গভীরভাবে জড়িত নহেন এমন ব্যক্তির পক্ষে ইহাদের মধ্য হইতে রস টানিয়া বাহির করা সহজ নহে।

এই ধারার অন্তিম গীতি হইল ৩৪৯-সংখ্যক গানটি। ইহার রচনাভঙ্গির মধ্যে 'হোলি' গানের ছাপ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, রচয়িতার অনভিপ্রেত রূপেই যেন ইহাতে ব্যঙ্গের ঈষৎ ছোঁয়া লাগিয়াছে। পথের ধারে বসিয়া কয়েকজন রমণী নিজের নিজের কন্যার রূপগুণের বর্ণনা করিতেছে। গানটির মধ্যে রাজবংশী সমাজের একটি রীতির ছাপও পড়িয়াছে। এই সমাজে রূপ ও গুণানুযায়ী কন্যার পিতাই কন্যাপণের টাকা পাইয়া থাকে। কাজেই, কন্যার মাতারা যে কন্যার রূপের প্রশংসা করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। অবশ্য, কন্যাপণ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও মাতা-কর্তৃক আত্মজার রূপগুণের প্রশংসা করা কিছুই বিচিত্র নয়।

CENTRAL LIBRARY

॥ মুখা-খেলা ॥

॥ ১ ॥

'মুখোশকে' প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বলা হয় 'মুখা'। 'মুখা' পরিধান করিয়া যে আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি করা হয়, তাহাকেই বলে 'মুখা-খেলা'।

মুখা খেলার প্রচলন জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায় না। তিস্তার পূর্বাকূলে মুখা-খেলার প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া অনুভূত হয়। তিস্তার পশ্চিমাকূলে এবং শহর জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে মুখা খেলা একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। পাহাড়পুর, রঙধামালি, বেলাকোবা, আমবাড়ী-ফালাকাটা এবং থানা রাজগঞ্জে মুখার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়।

মুখা-খেলা হয় সাধারণত শীতকালে। শীত পড়িয়া আসিতেই গ্রামের যুবক ও উৎসাহী ব্যক্তিগণ মিলিয়া মুখার দল গড়িয়া ফেলে। তারপর প্রতিদিন রাত্রিবেলায় নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী মুখা-পালার অভিনয় ও মুখা-নৃত্য করিয়া থাকে।

এই মুখা-পালা ও মুখা-নৃত্য দুই রকমের হইতে পারে। এক, পৌরাণিক ও ধর্মীয় কোনো কাহিনীকে মুখা পরিয়া রূপদান করা যাইতে পারে; দুই, সামাজিক, ও গার্হস্থ্য জীবনকে ভিত্তি করিয়া রচিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাহিনীকে মুখা পরিয়া রূপ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মুখা অভিনয়ের মধ্যে কোনোই বিশেষত্ব নাই। রাম-রাবণ, মনসা-মঙ্গল, শিব-দুর্গা ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে কোনো নতুনত্ব নাই,—কেবল পরিবেশন করিবার পদ্ধতিটি ছাড়া। মনে হয়, একদা এই শ্রেণীর মুখা খেলা Ritualistic ছিল; পৌরাণিকতার প্রসঙ্গ থাকিলেও অধুনা তাহা লৌকিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখা অভিনয়ের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে। এই ধরণের মুখা-খেলার কাহিনীগুলি নিজেদেরই রচিত। কাহিনীগুলি আকারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। এক-একটি মুখাপালা অভিনয় করিতে পাঁচ হইতে দশ মিনিট

CENTRAL LIBRARY

মাত্র সময় লাগে। দুই মিনিটে শেষ হইয়া যাইতে পারে, এমন ক্ষুদ্র মুখা-পালাও আছে। স্নেহ ও প্রেমকে ভিত্তি করিয়া দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কাহিনীকে রূপদান করাই এই সকল মুখাপালার লক্ষ্য। এই সকল বিশেষত্বের জন্য কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখাপালাগুলিই বর্তমান সংগ্রহে গ্রথিত হইয়াছে,—প্রথম ধারারগুলি গ্রথিত হয় নাই।

দ্বিতীয় ধারার মুখাগুলির আর একটি রূপ লক্ষ করিতে পারা যায়। তাহা হইল, সেগুলির মধ্যে কোনো কাহিনী নাই। খুচরা একটি গান গাওয়াই এই সকল মুখা-নৃত্যের লক্ষ্য। যে গানটি গীত হইতেছে, তাহার ভাবের সহিত মুখার উপর আঁকা চিত্রের প্রায়ই কোনো যোগ থাকে না। অনেক সময় ইহাও দেখা যায় যে, কাহিনীমূলক অভিনয়ের ভগ্ন ও ছিন্ন একটি অংশ বা উহাদের অন্তর্গত শুধু মাত্র একটি গান গাহিয়া নাচাই এই ধরণের মুখা-নাচের উদ্দেশ্য।

মুখাঅভিনয়ের কাহিনীর বিশেষত্ব লক্ষ করিবার মতো। এই কাহিনী গুলির মধ্যে কোনো বিশিষ্ট একটি সংহত 'নাটক' লক্ষ করা যাইবে না। ইহা যেন নিছক একটি কাহিনী, যাহা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া, কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র-সম্বলিত একটি বস্তুকে নাট্যরসে সিক্তিত না করিয়া হঠাৎই শেষ হইয়া যাওয়া। অনেক সময় অবশ্য নাটকের আভাস খানিকটা যে না পাওয়া যায়, এমনও নয়। কিন্তু, একটি সুস্পষ্ট পরিণতি-সম্বলিত কাহিনীর নাট্যরূপ এখানে না থাকাই স্বাভাবিক। ইহাতে Folk-drama হিসাবে ইহাদের মূল্য বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই।

মুখাপালাগুলির কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, কেহ কখনো সচেতন মন লইয়া এগুলি যেন রচনা করে নাই। এগুলি যেন পাত্র-পাত্রীর খেয়াল খুশি মতো আসরে অভিনয় করিতে উঠিয়া আপনিই রচিত হইয়া গিয়াছে। ইহা যথার্থই Extemporary এবং Impromptu রচনা। ইহা লিখিতও থাকে না।

মুখাপালার মধ্যে পুরা নাটক নাই, অথচ নাটকের ভ্রূণ তাহাতে আছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মুখাকে নাটকের আদিম সংস্করণ বলা যাইতে পারে এবং মুখাপালাই কালের আবর্তনে বিবিধ প্রভাবে প্রভাবিত ও বিবর্তিত হইয়া আধুনিক নাটকের রূপ লইয়াছে, এমন অনুমান হয়তো অসঙ্গত নয়।

CENTRAL LIBRARY

মুখাপালার কাঠামোর বিশেষত্ব হইল, ইহাতে গীত ও সংলাপের যুগপৎ উপস্থিতি। অনেক সময় মনে হয়, ইহার সংলাপাংশের মূল্য তেমন নাই। গানগুলিকে একটি আধারের মধ্যে ধরিয়া লইবার জন্য একটি বাঁধনের প্রয়োজন,—সংলাপ যেন গীতগুলিকে বাঁধিবার একটি উপায় মাত্র। 'পাঁচালি' গানের মতো মুখাপালার গানগুলিও সংলাপের ভূমিকা লইয়া থাকে। শুধু তাই নয়। এই গানের মধ্য দিয়াই কাহিনীর আংশিক বর্ণনাও অনেক সময় করা হইয়া থাকে। সুতরাং, এ কথা বোধ হয় বলা চলে,—মুখাপালাগুলির মধ্যে সংলাপের চেয়ে গীতগুলিই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মৌখিক এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত বলিয়াই হয়তো গদ্যের প্রাধান্য নাই।

মুখা-নৃত্যের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। মুখা সাধারণত পুরুষেরাই খেলিয়া থাকে। কাজেই, মুখা পরিয়া যখন পুরুষেরা মেয়ের ভূমিকায় অবতরণ করে, তখন স্বাভাবিক কারণেই তাহাদের নাচ মেয়েদের নাচের রীতি হইতে খানিকটা পৃথক হইবেই,—হইয়াও থাকে।

মুখাপালার অভিনয়-কালে একমাত্র মুখা পরিধান করা ছাড়া অন্য কোনো রূপ 'মেক-আপ' নেওয়া হয় না। সাধারণ পোষাকের সহিত মুখা পরিয়া অভিনয় করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে আসর করিয়া যেমন মুখাপালার অভিনয় করা চলিতে পারে, তেমনি অনানুষ্ঠানিকভাবেও উন্মুক্ত অম্বরতলে ইহার অভিনয় করা যাইতে পারে।

মুখার নির্মাণ-পদ্ধতি, মুখার উপর চিত্র ও উহার রঙ ইত্যাদি সম্পর্কে দুই-চারি কথা বলা আবশ্যক। মুখা বিবিধ বস্তু দিয়া তৈয়ারি করা চলিতে পারে। কাঠ খোদাই করিয়া, লাউয়ের শক্ত খোল কাটিয়া, মাটি পোড়াইয়া, পুরু কাগজ দিয়া বা পাতলা শোলা দিয়া,—বিবিধ উপায়েই মুখা নির্মাণ করা যাইতে পারে। বৎসর-বৎসর একই মুখা দিয়া অভিনয় করা হইয়া থাকে। কাজেই কাঠ, মাটি ও লাউয়ের খোলের মুখাই অধিক ব্যবহৃত হয়। শোলা বা কাগজের তৈরি মুখা সাধারণত সাময়িক প্রয়োজন (যেমন, 'চোর-চুন্নী' খেলিবার সময়) মিটাইতেই ব্যবহার করা হয়। কাঠের বা লাউয়ের খোলের উপর কাদা দিয়া ন্যাকড়া আঁটিয়া দিয়া সেই ন্যাকড়ার উপর চিত্রকর চিত্র করিয়া দেয়। মুখা তৈরি সম্পর্কেও taboo আছে। যে কেহ মুখা নির্মাণ

CENTRAL LIBRARY

করিতে পারে না। অতীতে যে ইহা Ritualistic ছিল, এই taboo তাহারই প্রমাণ।

মুখা বিবিধ রকমের হইতে পারে। সামাজিক কাহিনীর মুখা ও পৌরাণিক কাহিনীর মুখা স্বভাবতই পৃথক। পৌরাণিক কাহিনীর মুখাগুলির চিত্র ও রূপের মধ্যে অতিকায়, ভয়ঙ্কর মানবের ছাপ থাকে। এই মুখাগুলির চোখ-মুখ আঁকিবার মধ্যেও পৌরাণিক যুগ ও উহার জাঁক-জমক, বিভীষিকা ইত্যাদি পল্লী চিত্রকরের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া অঙ্কিত হয়। এই সকল মুখার চিত্রগুলির মধ্যে সারল্য, স্পষ্টতা এবং প্রকাশ গভীরতা বিশেষরূপে দেখা যায়। কিন্তু মুখাবয়বের মধ্যে রাজবংশী physiognomy ব্যবহৃত হয় নাই। তবে কি এই মুখচিত্ররীতি অন্য কোন সংস্কৃতি হইতে ধার করা ?

সামাজিক কাহিনীর মুখাগুলির আকৃতি সাধারণ মানুষের মুখের মতোই। কিন্তু ইহার চিত্ররীতি ও বর্ণরীতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ মানুষের আকৃতিতে গড়া মুখাগুলির চোখ-মুখ অঙ্কনের মধ্যে পল্লী চিত্রকরের নিজস্ব 'ষ্টাইল' পাওয়া যাইবে কিন্তু আগেই বলিয়াছি, তাহা রাজবংশীদের নিজস্ব মুখাকৃতিকে নির্দেশ করে না। এই সকল মুখার রঙের বৈচিত্র্য তেমন নাই। সামাজিক কাহিনীতে লাল, হলুদ প্রভৃতি এক-রঙা মুখা বেশ ব্যবহৃত হয়।

মনুষ্যাকৃতির মুখা ছাড়াও দৈত্য-দানব ও পশুর মুখাও ব্যবহৃত হয় উপযুক্ত ক্ষেত্রে। এই ধরণের মুখাগুলির নির্মাণ-পদ্ধতি ও চিত্ররীতি বিশেষত্ব পূর্ণ।

গ্রামের এক-একটি দলের নিজস্ব কতকগুলি মুখা থাকে। মরশুম শেষ হইয়া গেলে কাহারও বাড়ীতে এই সকল মুখা ঘরের সিলিংয়ে ঝুলাইয়া রাখা হয়। দরকার মতো পাড়িয়া লইয়া কাজে লাগানো হয়।

এইবার সংগৃহীত মুখা পালাগুলির পরিচয় দিতেছি ॥

॥ ২ ॥

"হালুয়া-হালুয়ানী" (সং ৩৫০) শীর্ষক মুখা-পালাটির কাহিনী এইরূপ : এক কৃষক লাঙল কাঁধে লইয়া তাহার গার্হস্থ্য জীবনের অশান্তির কথা শোনাইতেছে। তাহার টাকা-কড়ি নাই অথচ স্ত্রী তাহার শাড়ী-গয়নার বায়না ধরিয়াছে। জনৈক পথিকের সহিত আলাপে জানা যাইতেছে, বিবাহ করিয়া তাহার মনে আর শান্তি নাই। বরং অবিবাহিত কালেই সে সুখী

CENTRAL LIBRARY

ছিল। পথিক চলিয়া যাইবার পর কৃষক হাল বহিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু, দূরে তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া সে ক্ষেতের উপরই শুইয়া পড়িল। পথিক আবার প্রবেশ করিয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিল। এইভাবে তিনবার কৃষক হাল ছাড়িয়া দিল, তিনবারই সেই পথিক প্রবেশ করিল। পরিশেষে কৃষক কহিল, সে হলকর্ষণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ স্ত্রী তাহার প্রতি এতোই উদাসীন যে তাহার জন্য এখনো অন্ন-জল লইয়া আসিল না। সেই পথিক কহিল, তোমার স্ত্রী যখন তোমার প্রতি যত্ন লয় না, তখন তুমি যাইয়া ওই জঙ্গলে লুকাইয়া থাক। কৃষক তাহাই করিল। এমন সময় হাতে স্বামীর জন্য অন্ন-জল ও পিঠে সন্তানকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল সেই কৃষকের স্ত্রী। সেই পথিকের নিকটই কৃষক-পত্নী জানিতে পারিল ক্ষুধায় কাতর হইয়া অভিমান করিয়া কৃষক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কৃষক-পত্নী তখন তাহার স্বামীকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল,—শেষে জঙ্গলের মধ্যে স্বামীকে লুকাইয়া থাকিতে দেখিল। সেইখানেই দুই জনের মিলন হইল।

ইহাই হইল আলোচ্য মুখা-পালাটির কাহিনী। কাহিনী হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, একটি ঘটনার প্রারম্ভ হইতে প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমপরিণতি যদিও ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে, তবুও ইহাতে ঠিক 'কাহিনী' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নাই, কোনো নাট্যরসও ইহাতে মিলিবে না। একটি চাষী দম্পতির সামান্য মান-অভিমান এবং মিলনই এ পালার বিষয়। কৃষকের অভিমান যেমন সামান্য কারণেই হইয়াছে, তেমনি স্ত্রীর অনুনয়ে সহজেই তাহা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। একটি চাষী দম্পতির জীবনের একটা তুচ্ছ দিনের খণ্ড ঘটনার রূপদানই পালাটির লক্ষ্য।

কৃষক ও কৃষক-পত্নীর চরিত্রের যদি কোনো বৈশিষ্ট্য এই পালার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের জীবনের সারল্য ও প্রেমের স্নিগ্ধ বিকাশ। বস্তুত কৃষক ও তাহার পত্নী একটি সামান্য ঘটনার মাধ্যমে দাম্পত্য প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

পালাটির মধ্যে গুটি কয়েক গান আছে। লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, এই গানগুলিই সংলাপের কাজ করিয়াছে এবং গানের মাধ্যমেই কাহিনীও খানিকটা বিবৃত হইয়াছে।

সামাজিক কাহিনীকে লইয়া রচিত মুখা-পালাগুলির মধ্যে তারল্য ও

CENTRAL LIBRARY

পরিহাস-রসিকতা প্রায়শই দেখা যায়। বর্তমান পালাটিতে নববধূর অদর্শন-জনিত, ক্ষুৎ-পিপাসাতুর, হলকর্ষণরত কৃষকের ক্ষেত্রের উপরই অসকৃৎ শয়ন ও উপবেশন এবং পথিকের বারংবার প্রবেশ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। পথিকের 'তিনবার' আসা-যাওয়া এবং অবিকৃত ভঙ্গিতে একই প্রশ্ন করা লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

'জনৈক পথিক' এই পালার কাঠামোকে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই পথিকের কোনো নাম-পরিচয় নাই। অথচ এই 'জনৈক পথিকই' কাহিনীকে পরিবেশন করিতে সহায়তা করিয়াছে। 'জনৈক পথিক' নাট্যকারের কাজ অনেক সহজ করিয়া দিয়াছে। তাহার এই নাম-পরিচয়ের নির্বিশেষিকতা ও অপরিস্ফুটতাও লোকনাট্যেরই বিশেষত্ব॥

॥ ৩ ॥

'কালুয়া-ভেলুয়া' (সং ৩৫০ক) ও 'অসিক-বোলানদার' (সং ৩৫০খ) শীর্ষক মুখা-পালা দুইটি আকৃতিতে একেবারেই ক্ষুদ্র। প্রকৃতিতেও উভয়ের মধ্যে মিল আছে। দুইটি পালাতেই দেখা যায়, লঘু-চপল বিষয় গভীর দুঃখের মধ্যে আকস্মিক পরিণতি পাইয়াছে।

কালুয়া-ভেলুয়া দুই ভাই। এই জোড়া-বাঁধা, সাদৃশ্যমূলক, একত্রীভূত, বন্ধু ও ভ্রাতৃস্থানীয় চরিত্র লোকনাট্যেরই বিশেষত্ব, পরবর্তীকালে মার্জিত নাট্য সাহিত্যেও এই ধরণের চরিত্র বিবর্তিত হইয়াছে। লাল ও হলুদ রঙের মুখোশ পরিয়া হাতে দোতরা ও 'সারিন্দা' লইয়া দুইজনে উদ্দাম ভঙ্গিতে গান গাহিতেছে। জনৈক পথিক আসিয়া জানিতে চাহিল, দুই ভাইয়ের মধ্যে কে বড়ো। উভয়েই নিজেকে বড়ো বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই এই লইয়া উভয়ের মধ্যে কলহ বাঁধিয়া গেল। দেখিয়া পথিক খুব খুশি হইয়া উভয়ের নিকট একখানি গান শুনিতে চাহিল। ঝগড়া ভুলিয়া দুই ভাই দ্বৈতকণ্ঠে গাহিল একখানি দুঃখের গান। দুই জনেরই জীবনে কেহ নাই,—গানে এই কথা বলা হইল। তারপর গান গাহিতে গাহিতে দুই ভাই হঠাৎ কাঁদিতে লাগিল। পথিক ইহার কারণ শুধাইলে দুই ভাই বলিল, পথিকের সহিত কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহাদের মৃত পিতা-মাতার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে, তাই তাহারা কাঁদিতেছে। অতঃপর সকলের প্রস্থান।

আসলে ইহা কাহিনীই নয়, পথের একটি ধাবমান দৃশ্যের নাট্যাভিনয় মাত্র।

CENTRAL LIBRARY

অবশ্য, প্রথমে কালুয়া-ভেলুয়ার উদ্দাম সঙ্গীত এবং প্রান্তে মৃত পিতা-মাতার জন্য তাহাদের ক্রন্দনের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিতের চমক আছে বটে। কিন্তু ইহা কোনো ঘটনা বিবর্তনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। আসল কথা, ইহা একটি দৃশ্যের বা ঘটনার বর্ণনা এবং সেই বর্ণনার প্রসঙ্গে গানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের একটি স্নিগ্ধ দিককে তুলিয়া ধরা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে প্রতিটি মুখা-পালাই সুন্দর। প্রতিটির মধ্যেই জীবনের এমন এক-একটি দিকের কথা আছে, যাহা সহজেই মনকে নাড়া দিয়া যায়। দুই ভাইয়ের একই সঙ্গে হাসা-কাঁদা ও গান গাওয়া লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যকে তুলিয়া ধরিয়াছে।

পূর্ববর্তী মুখা-পালাটির মতো এ পালাতেও পথিকের ভূমিকা আছে এবং উভয় পালার পথিক সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য। অন্যান্য পালার মতো এ পালাটিতেও বিবৃতি-মূলক গান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গানখানি ভাব-প্রধান।

'রসিক, বোলানদার' পালাটির কাহিনী হইল, এক 'রসিক' বিবাহ হয় নাই বলিয়া বউদির সহিত ঝগড়া করিয়া পথে বাহির হইয়াছে। এমন সময় তাহাকে 'বোলানদার' জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কষ্টের কারণ কি। রসিক গান গাহিয়া উত্তর দিল, তাহার কপাল পোড়া, পিতা নাই, মাতা নাই, কাজেই বিবাহ দিবারও কেহ নাই। অনন্তর উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

এই মুখা-পালাটির মধ্যেও পথের একটি দৃশ্যই রূপায়িত হইয়াছে। ইহাও হঠাৎ আরম্ভ হইয়া, হঠাৎই শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি অবিবাহিত যুবকের মানসিক বেদনাকে তুলিয়া ধরাই ইহার লক্ষ্য।

পালাটিতে একটি মাত্র গান আছে। গানটির মাধ্যমেই যুবকের মনের বেদনা ও পারিবারিক অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে। গানটিকে সংলাপের পরিবর্ত রূপে গ্রহণ করা চলে।

'জনৈক পথিক'-এর বদলে এ পালায় পাওয়া যায় 'বোলানদার'। নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অন্যান্য পালাগুলিতে 'জনৈক পথিক' যে ভূমিকা লইয়াছে, 'বোলানদার' এ পালায় ঠিক সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পাত্র-পাত্রীর সহিত কথা 'বলে' যে এই অর্থে 'দার' প্রত্যয় যুক্ত করিয়া 'বোলানদার' পদটি গঠিত হইয়াছে। বেশ বুঝা যায়, ব্যক্তি পরিচয় এই

CENTRAL LIBRARY

চরিত্রে একেবারেই নাই,—কাহিনীকে পরিবেশন করিবার জন্ম পাত্রের সহিত সংলাপ চালাইবার উদ্দেশ্বেই ইহার আগমন। এই ধরণের চরিত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুখাপালার এক বিশেষত্ব॥

॥ ৪ ॥

'নলুয়া-নলুয়ানী' (৩৫০-গ) নামক মুখা-পালাটির মধ্যেও দাম্পত্য প্রেমের স্নিগ্ধ বিকাশ লক্ষিত হইবে। ইহার কাহিনী এই :

একদিন এক শিকারি (নলুয়া) শিকার করিবার 'নল' বিক্রয় করিবার জন্ম পথ হাঁটিতেছিল। এই সময়ে পথে সে এক নব-যুবকের সাক্ষাৎ পাইল। যুবকের পয়সা নাই, অথচ একটি 'নল' কিনিতে তাহার বড়ো ইচ্ছা হইল। শেষে স্থির হইল, ওই যুবক তাহার সন্ধ্যামণি নাম্নীয়া ভগ্নীর সহিত এই শিকারির বিবাহ দিবে, বদলে ওই শিকারি তাহাকে শিকার করিবার 'নল' দিবে। বাড়ীতে আসিয়া যুবক সন্ধ্যামণিকে তাহার বিবাহের কথা জানাইল। শুনিয়া সন্ধ্যামণি রাগিয়া গেল, কারণ শিকারিদের সে আদৌ দেখিতে পারে না। যাই হোক, বলিয়া-কহিয়া যুবক ওই শিকারির সহিত সন্ধ্যামণির বিবাহ দিয়া দিল।

সন্ধ্যামণি আসিয়া শিকারির ঘর করিতেছে। শিকারির বড়ো ইচ্ছা, তাহার সহিত তাহার স্ত্রীও পথে পথে 'নল' বিক্রয় করিয়া বেড়াক। কিন্তু তাহাতে সন্ধ্যামণির ভারি শরম লাগে। শেষে স্বামীর অনেক অনুরোধে সন্ধ্যামণিও স্বামীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ 'নল' বিক্রয় করিতে বাহির হইল। কাহিনীর শেষে একটি সুখী দম্পতির পথ চলার যুগল-দৃশ্য মনকে আনন্দ-রসে ভিজাইয়া দেয়। এই নির্দ্বন্দ্ব চরিত্র লোকনাট্যের বিশেষত্ব।

এ কাহিনীর মূল চরিত্র সন্ধ্যামণি। ভ্রাতার মুখে শিকারির সহিত বিবাহ হইবার কথা শুনিয়া সে আপত্তি করিয়াছিল,—স্বামীর গৃহে আসিয়া তাহার অভাব দেখিয়া সে ক্ষুব্ধও হইয়াছিল ; কিন্তু স্বামীকে যে কটু কথা বলা যায় না, ইহাও সে বলিয়াছে এবং স্বামীর অনুরোধে শরম-সঙ্কুচিতা সন্ধ্যামণির স্বামীর পশ্চাৎ পথ চলার দৃশ্যে তাহার দাম্পত্য প্রেম স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীর আরম্ভে স্বামীর প্রতি বিরাগ এবং প্রান্তে অনুরাগের বিকাশ দেখা যায়।

CENTRAL LIBRARY

মুখা-পালার কাহিনী বয়নের মধ্যে এক প্রকার নির্বোধ সারল্য লক্ষ করা যায়। সন্ধ্যামণির যুবক ভ্রাতার মধ্য দিয়া তাহা উদাহৃত হইয়াছে। নতুবা, 'নলে'-র বদলে কেহ কি ভগ্নীর বিবাহ দিতে চায়? ইহাও লোকনাট্যের একটি দিক।

নলুয়ার মাধ্যমে পালাটিতে একটু হাস্যরস বিতরণের চেষ্টাও করা হইয়াছে। বড়ো লোকের মতো 'নলুয়া' ভালো জিনিস খাইতে পারে না। অখাদ্য-কুখাদ্যকেই সে ভালো জিনিস বলিয়া আখ্যা দিয়াছে।

পালাটির মধ্যে গান আছে দুইখানি। তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি ভাব-প্রধান।

॥ ৫ ॥

পরিশেষে, মুখোশ ও মুখা সম্পর্কে আর দুই-চারি কথা বলিতেছি।

প্রাচীনকাল হইতেই মুখোশ-নৃত্য ও অভিনয়ের প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ করা যায়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ ছাড়া, বাঙ্গালাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত পূর্ববঙ্গে মুখার প্রচলন দেখা যায়। মৈমনসিংহ, বিক্রমপুর প্রভৃতি জেলায় চৈত্র-সংক্রান্তির দিন মুখোশ নৃত্যের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে।[১] মুখোশের প্রাচীনতর রূপ সং বলিয়া আমার মনে হয়, যাহাতে নিজের দেহের চামড়ার উপরেই নানা রঙ্‌ দিয়া নিজেকে ভিন্ন এক সত্তার সহিত অভিন্ন করিবার প্রয়াস দেখা যায়। ইহাকে এইজন্য প্রাচীনতর বলি, ইহাতে অন্য এক অসংলগ্ন পদার্থকে নিজদেহে সংলগ্ন করা হয় না, মুখোশে যাহা করা হয়। মুখোশ সহজেই সরানো ও পরানো যায়। সেইদিক হইতে সঙের রঙ্‌ দেহের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়।

অবশ্য মুখোশ পরিবার ফলে ধারণকারীর Expression ধরা পড়ে না, সঙে যাহার কিছু সুযোগ আছে; কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, সঙে যে মূর্তি ধরা পড়ে তাহা বরাবর অক্ষুণ্ণই থাকে, কাজেই ইহাতেও প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য নাই।

মুখোশ হইল মুখের উপর আবরণ। কিন্তু এই আবরণ মনের উপরও গভীর ক্রিয়া করিয়া থাকে। পৌরাণিক যুগের কোনো মানুষ বা প্রাণীর মুখোশ

১ মাস্ক্‌ ড্যান্সেস্‌ অফ্‌ ময়মনসিংহ: গুরুসদয় দত্ত, মডার্ণ রিভিউ, আগষ্ট, ১৯৩৯।

CENTRAL LIBRARY

ধারণ করিলে সেই যুগের ও সময়ের ভাব দর্শক ও ধারয়িতার মনে সঞ্চারিত হয়। খুব সম্ভব এই উদ্দেশ্যেই মুখোশের চলন হয়। কোনো ব্যক্তি, ভাব বা ইতর প্রাণীর সহিত নিজেকে অভিন্ন করিবার জন্যই বিশেষ উদ্দেশ্যে ও বিশেষ দিনে ইহা পরা হয়। পৌরাণিক যুগ ও অতিকায় প্রাণীর মুখোশই আদিম মুখোশ বলিয়া মনে হয়। সামাজিক কাহিনী ও সামাজিক মানুষের মুখোশ ইহার তুলনায় আধুনিক। মুখোশ-নৃত্য প্রথমে ছিল আনুষ্ঠানিক (এখনও মূলত তাই), পরে তাহা নানা লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানের উপাদানে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের মুখোশ সম্পর্কে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের কয়েকটি মন্তব্য বেশ সুন্দর। তিনি ইহাদের মুখোশের নির্মাণ রীতি ও চিত্ররীতি বিশেষ দৃষ্টি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। মুখোশ-নৃত্যের মধ্যে 'মুদ্রা' ব্যবহৃত হয় না, উহার পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, উহা গ্রামের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনকে রূপায়িত করে এবং পৌরাণিক কাহিনী বা ঘটনাকে মুখোশ-নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করিবার কালে উপযুক্ত ধর্মভাব ও নিষ্ঠা লইয়াই তাহা করা হয়—ইত্যাদি গুরুসদয় দত্ত লক্ষ করিয়াছিলেন। মুখোশের চিত্ররীতির মধ্যেও তিনি সারল্য ও প্রকাশভঙ্গির গভীরতা দেখিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের মুখোশ সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, ইহার প্রায় সবই প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের মুখা-নাচ ও মুখা-পালা সম্পর্কে খাটে।

নরাকৃতির মুখোশের উদ্ভবের পিছনে মড়ার খুলির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর অনেক আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায়, মৃত আত্মীয়-স্বজনের মাথার খুলি সমাধি গহ্বর হইতে বাহির করিয়া, কিংবা অসমাহিত দেহ-বিচ্যুত খুলিকে নানা রঙে রঙীন করিয়া, বিশেষ বিশেষ দিনে অনুষ্ঠান করা হইতেছে। মৃত ব্যক্তি গোষ্ঠি-পতি হইলে, গোষ্ঠীর সকলেই সেই রঙীন খুলি লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকে। কেবল পরিবার বিশেষের হইলে বিশেষ দিনে (যেমন নববর্ষ, তাহার শ্রাদ্ধ বা পারলৌকিক অনুষ্ঠানের দিনে) তাহা গৃহের সম্মুখে বা দরজার সামনে ঝুলাইয়া রাখা হইত। এই রঙীন মড়ার খুলিই কালক্রমে মুখোশের উদ্ভবে প্রভাব ফেলিয়াছে।

মুখোশকে সরল এবং মিশ্র (composite) এই দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। যে মুখোশে কেবল একটি ভাব বা একটি প্রাণীর মুখাবয়ব থাকে, তাহা

CENTRAL LIBRARY

সরল মুখোশ। কিন্তু যাহাতে একাধিক মানুষের মুখাবয়ব ভরিয়া দেওয়া হয়, তাহা জটিল মুখোশ। তিব্বত হইতে শুরু করিয়া চীন পর্যন্ত মুখোশ এই ধরণের। একই মুখোশের উপর পাঁচ বা সাতটি ছোটো-ছোটো ভিন্ন প্রাণীর বা মানুষের মূর্তি তাহাতে থাকে। এই মিশ্র মুখোশকে সরল মুখোশের তুলনায় পরবর্তী-কালীন বলিয়া মনে হয়।

মুখোশের মধ্যে একটি বিবর্তন দেখা যায়। যে সব পশু-পাখী কোনো গোষ্ঠীর totem, সেই সব পশু-পাখীর Zoomorphic রূপটিকে অবিকৃত রাখিয়া যে মুখোশ, তাহাই আদি মুখোশ। অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে যতোদিন Theriomorphism আসে নাই, ততদিন সম্ভবত নরাকৃতি মুখোশেরও প্রচলন হয় নাই। কেননা, পশু-পাখীর মুখোশ কোনো মানুষ ধারণ করিলে তবেই তাহাকে Theriomorphic বলিয়া মনে হইবে। এমন হইতে পারে, মানুষ কর্তৃক Zoomorphic মুখোশ ধারণ করিবার ফলেই Theriomorphism-এর উদ্ভব হইয়াছে। Anthropomorphic মুখোশ যে ইহার পরবর্তী, তাহা সহজেই অনুমেয়। নরাকৃতি মুখোশের চোখে-মুখে প্রসন্নতার প্রতিচ্ছবি আরো পরবর্তীকালের। ইহার সহিত Ancestor worship জড়িত আছে, এবং মৃত পূর্বপুরুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Hostile বলিয়া মনে করিবার দরুণ তাহার মুখচ্ছবিকেও ভয়ঙ্কর বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

ধর্মীয় পুরাণ এবং লৌকিক পুরাণের নরাকৃতির মুখোশে ভয়ঙ্করতার প্রতিচ্ছবির বিভিন্নতা দেখা যায়। লৌকিক পুরাণের চরিত্র যখন culture hero তখন বিশেষ গোষ্ঠীর নানারূপ শত্রুকে দমন করিবার শক্তি-সাহসের উৎস বলিয়া স্বাভাবিক কারণেই ভীষণ-দর্শন হইয়া থাকে। ধর্মীয় পুরাণের মুখোশের মুখচ্ছবিতে ভয়ঙ্করতা আসে দেব-দেবী, মৃত পূর্বপুরুষ ও নৈসর্গিক জগতের ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির ফলে।

মুখোশের মুখচ্ছবির এই বীভৎসতার যেমন একাধিক কারণ রহিয়াছে, তেমনি উহার ফলাফলও বিচিত্র। বীভৎসাকৃতির মুখোশ পরিধান তাণ্ডব-নৃত্যের উৎস। কেননা, মুখাবয়বের প্রভাব দেহে-মনে পড়িবেই। তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে এক তীব্রতা আছে, যাহা স্বাভাবিক জীবন হইতে দূরবর্তী, যাহা যাদু ও রহস্যের দ্বারা আবৃত। মুখোশ মুখের ছদ্মবেশ, যে যাহা প্রকৃতই নয়, তাহাই সাজা। অতএব তাহা অভিনয়। তাণ্ডবনৃত্য, মুখের ছদ্মবেশ ইত্যাদি

CENTRAL LIBRARY

নাটকের অঙ্গীভূত বলিয়া, এবং মুখোশ ধারণ বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার সহিত জড়িত বলিয়া মুখোশের সঙ্গে লোকনাট্যের এক গভীর যোগ দেখা যায়। আনুষ্ঠানিকতাকে পরিত্যাগ করিয়া লোকনাট্য যেমন কালে-কালে নিছক আমোদের উপকরণ হইয়াছে, মুখোশ ব্যবহারের মধ্যেও সেই একই বিবর্তন দেখা যায়। যাহাই হোক, মুখোশের সহিত লোকনাট্য অবিচ্ছেদ্য।

যে সব অনুষ্ঠানে মুখোশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে মুখোশ পরিয়া একক বা সমবেতভাবে (সমবেতভাবেই প্রাচীন কালে পরা হইত) বাড়ী-বাড়ী ঘোরা বা শোভাযাত্রার আকারে পথাতিক্রমণ করা হয়। যেমন, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানাতে কালীপূজার সময়; কিংবা পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানায় বৈশাখ মাসে যে অষ্টাহব্যাপী (সোম হইতে সোম) পূজা-উৎসব হয়, তাহাতে মুখোশ পরিয়া নাচা, বাড়ী-বাড়ী ঘোরা কিংবা পাড়া বেড়ানো দেখা যায়। কালীপূজার সময় জলপাইগুড়িতে যে মুখোশ পরিয়া গৃহস্থের সহিত কৌতুকাদি করা হয়, তাহার সবটাই অভিনয়। শোভাযাত্রাও এক ধরণের চলমান অভিনয়, যাতুক্রিয়ামূলক অভিনয়। এই শোভাযাত্রার 'যাত্রা' শব্দটিও লক্ষনীয়, যাহা বাঙলার বিশিষ্ট এক 'নাটক'। প্রাচীন কালের যে কোনো অনুষ্ঠানেই শোভাযাত্রা হইত। অনুষ্ঠানই যদি সকল নাটকের উদ্ভবের মূলে থাকে, তবে শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে যে বৃহৎ জনতা থাকে, সেই জনতাই পরিশেষে নাটকের চরিত্র হইয়া উঠে। এই জন্যেই বহু দেশের নাটকে 'জনতা' চরিত্র ও পথের দৃশ্য আসিয়া পড়িয়াছে। লোকনাট্যে এই কারণেই জনতা, পথ এবং নাম-ধামের বিশেষ পরিচয়-ব্যতিরিক্ত চরিত্র দেখা যায়।

মুখোশ পরিয়া এই শোভাযাত্রা ও পথাতিক্রমণ যে পরিশেষে অভিনয় ও নাটকের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজয়া দশমীর সময় (কখনো বা দু-একদিন পরে) দশমুণ্ডধারী রাবণের প্রতিরূপ নির্মাণ করিয়া উহা খণ্ডিত করিবার অভিনয়। তখন কাঠের মুখোশ পরিয়া, রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নৃত্যাদি হইয়া থাকে। এই অভিনয়োৎসব অবশ্য উত্তর-ভারতের নানা স্থানেই হইয়া থাকে।

মুখোশের প্রসঙ্গে সঙের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। চৈত্রসংক্রান্তিতে

CENTRAL LIBRARY

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে যে চুন-কালি-রঙ-সিঁদুর মাখিয়া সঙ সাজিবার প্রথা আছে, তাহা মুখোশেরই কাছাকাছি। সঙ সাজিয়াও শোভাযাত্রা করা এবং বাড়ী-বাড়ী ঘোরা হয়। আসলে খাঁটি লোক-অনুষ্ঠানে এই শোভাযাত্রা ও বাড়ী-বাড়ী ঘোরা থাকিবেই। রাঢ়বঙ্গে এবং নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরে যে 'বোলান' গান চলিত আছে, অনেকেই সেই 'বোলান'কে 'প্রশ্নোত্তর' বলিয়া ভুল করেন। 'বোলান' অর্থ ভ্রমণ, অর্থাৎ পথে ও বাড়ীতে ভ্রমণ, সুতরাং তাহা শোভাযাত্রারই অঙ্গীভূত। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ইহাকেই বলে 'ঢাড়ি' করা, অর্থাৎ ঘুরিয়া বেড়ানো। রাঢ়-বঙ্গের ঝুমুর গানের মধ্যে যেগুলি 'টাঁড় ঝুমুর' সেগুলি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া গাওয়া হয়, কেননা, 'টাঁড়' শব্দের অর্থ হইল 'পাড়া'। সুতরাং সঙ ও মুখোশ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের আর এক দিক হইল—শোভাযাত্রা।

মুখোশের মধ্যে যেমন যাদু আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, সঙের মধ্যেও তাই। মানভূমের 'নাটুয়া-নাচে'র নাটুয়াগণ নৃত্যের পূর্বে ব্যাঘ্রবৎ পোশাক পরে এবং দেহের অনাবৃত অংশে মাটি (এঁটেল বা গেরিমাটি) বা চুন দিয়া দাগ কাটিয়া (ঠিক যেন বাঘের ডোরা দাগ অঙ্গে আঁকিয়া) লয়। দেহের এই বর্ণ ব্যাঘ্রের সহিত একাত্মতা সাধন করে এবং ইহাতে এই নৃত্য আর সাধারণ আমোদের বিষয় মাত্র থাকে না, একটি যাদু-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

নরাকৃতি মুখোশের সহিত নৃ-মুণ্ডের সম্পর্কের কথাও পূর্বে তুলিয়াছি। গাজন ও চৈত্র-সংক্রান্তির অনুষ্ঠানে মড়ার খুলি লইয়া নৃত্য-গীত ও অভিনয় হইয়া থাকে। আসলে ছিন্ন মুণ্ড একটি গোটা মানুষের অখণ্ড প্রাণের প্রতীক, যে 'প্রাণ' আসন্ন 'মৃত বৎসর'কে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবে; সেই জন্যই মড়ার খুলি লইয়া নৃত্য-গীত করা হয়। মালদহের বাঁশ্ড়া গ্রামের দেবী 'বাঁশুড়ানী-চামুণ্ডা'র সম্মুখে মুখোশ পরিয়া এবং নৃ-মুণ্ড লইয়া নৃত্য-গীতাদি হয়। এই অনুষ্ঠানে মুখোশ ও নৃ-মুণ্ড প্রায় কাছাকাছি চলিয়া আসিয়াছে।

মালদহের প্রখ্যাত 'গম্ভীরা' উৎসবে মুখোশ-নৃত্য একটি বড়ো ভূমিকা লইয়া থাকে। স্বর্গত হরিদাস পালিত তাঁহার 'আদ্যের গম্ভীরা' (১৩১৯) নামীয় পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করিয়াছেন। গম্ভীরার 'ছোটো তামাশা'র দিন রাতের বেলায় 'মুখা-নৃত্য' হয় (পৃ. ৩৯)। 'বড়ো তামাশা'র দিন বাহির হয় শোভাযাত্রা; ভক্তেরা ভূত, প্রেত, বাজিকর, ইত্যাদি খুশিমতো

CENTRAL LIBRARY

চরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে। ইহা হয় দিনে। সন্ধ্যার সময় হয় 'হনুমান-মুখা'র অনুষ্ঠান (দ্রঃ পৃ. ৩৯-৪১)। গম্ভীরায় কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, রাম-লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া-বুড়ী, শিব, কার্তিক, ভূত, প্রেত, ঘোড়া, ইত্যাদি নানা চরিত্রের মুখোশ ব্যবহৃত হয়। পৌরাণিক ও লৌকিক নরাকৃতির মুখোশই যেন বেশি, জীবজন্তু তেমন নাই। তিব্বতে কিন্তু উভয় প্রকার মুখোশেরই সম-প্রাধান্য দেখা যায়। মালদহের মুখোশ কাঠ বা পোড়ামাটির, নিম কাঠের মুখোশই শাস্ত্র-সম্মত। কাঠের মুখোশ সূত্রধরেরা তৈরি করে, সকলের তাহা তৈরি করিবার অধিকার নাই (taboo লক্ষণীয়), পটুয়ারা রঙ করিয়া দেয়। কুম্ভকারের মাটির (পোড়ানো) মুখোশ তৈরি করে, মালাকারেরা উহাতে শোলার কাজ করিয়া দেয়।

মুখোশকে Animism-এর ফলে এক 'জীবন্ত সত্তা' বলিয়া মনে করা হয়। ইহার মধ্যে নানা প্রকার বিশিষ্ট 'শক্তি' ও 'ক্ষমতা'র অস্তিত্বও লক্ষ করা হয়, যেন ইহাতে Mana আছে। এ বিষয়ে হরিদাস পালিত মহাশয়ের এই মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "নৃত্য করিবার পূর্বে ভক্ত গম্ভীরা-গৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখা আছে, তাহারা বিজয়া দশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে।··· অনেক প্রাচীন মুখা গম্ভীরাগৃহে লম্বিত থাকিতে দেখা যায়। এ দেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ ক্রোধপরায়ণ। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্বে যাহারা দেব-দেবী—বিশেষত কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত।"—পৃ. ৪৭-৪৮।

শুধু গম্ভীরাই নয়, অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানেই মুখোশ ব্যবহার সম্পর্কে নানা বিধি-নিষেধ আছে। এই সকল নিয়ম-বিধিই মুখোশের যাদুময়তা ও প্রাচীনতার দ্যোতক।

CENTRAL LIBRARY

॥ পাঁচালি ॥

॥ ১ ॥

বাঙলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই মনে 'পাঁচালি' শব্দটি সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে। 'পাঁচালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়াও যথেষ্ট মতভেদ আছে। 'পাঁচালি' কাহাকে বলে বা শব্দের ব্যুৎপত্তি কি, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা আমরা অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন মনে করি। বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে 'পাঁচালি' জিনিষটি কেমন ভাবে ও রূপে প্রচলিত আছে, তাহারই আলোচনা করিব মাত্র।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে 'পাঁচালি গান' বলিতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নাট্য-কাহিনীকে বুঝায়। কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র-সম্বলিত নাট্য-কাহিনীকে বাঙলায় 'পালাগান'-ও বলা হয়। 'পালা-'র সহিত 'টিয়া' এই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে উহাকে 'পালাটিয়া গান-'ও বলা হইয়া থাকে। 'পাঁচালি' গানেরই অপর নাম 'পালাটিয়া গান'। 'পাঁচালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যতোই মতভেদ থাকুক না কেন, 'পালা' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে কাহারো মনে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা নাই। এখন, 'পাঁচালি' যদি 'পালাটিয়া' গানেরই অপর নাম হয়, তবে 'পাঁচালি' গান বলিতে কি বোঝানো যাইতেছে, তাহা সহজেই স্পষ্ট হইয়া যায়।

'পাঁচালি' বা 'পালাটিয়া' গান বিবিধ রকমের হইতে পারে। সাধারণত তিন রকমের 'পাঁচালি-'র অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়: রঙ পাঁচালি, খাস পাঁচালি ও মান পাঁচালি।

'রঙ পাঁচালি' নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে,—প্রেমই ইহার প্রধান উপজীব্য। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের প্রেমের গানকে 'রঙ-'এর গান বলা হয়। যে নাট্য-কাহিনীতে প্রেমই মুখ্য, তাহাকেই বলে 'রঙ পাঁচালি'। পদাদিস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হইয়া ইহা 'অঙ পাঁচালি' রূপেও উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'রঙ পাঁচালিতে' যে প্রেম-কাহিনী থাকে, সেই কাহিনীর সবটাই কাল্পনিক। প্রেমের সহিত হাস্যরসের খোরাক জোগাইবার জন্য ইহার মধ্যে নিছক রঙ-কৌতুকও কিছু ভরিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে

CENTRAL LIBRARY

হইবে যে, মুর্শিদাবাদ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে গাজন-চড়ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কালে যে 'বোলান' গান হইয়া থাকে, তাহার একটি অংশকেও 'রঙ পাঁচালি' বলে ; আমাদের আলোচ্য 'রঙ পাঁচালি'র উহার কোনো সম্পর্ক নাই।

'খাস পাঁচালি' হইল নিকট বা দূর অতীতে নিজ বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘটিয়া-যাওয়া কলঙ্ক-কাহিনীর নাট্যরূপ। ইহাতেও হাস্যরস থাকে, কিন্তু তাহা নির্দোষ নয়। ইহার হাস্যরসকে শ্লেষ বা ব্যঙ্গ বলা যাইতে পারে। রঙ পাঁচালির সহিত খাস পাঁচালির পার্থক্যটি সূক্ষ্ম। রঙ পাঁচালির বিষয় হইল একমাত্র প্রেম, উহার কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক, হাস্যরস কাহাকেও ব্যঙ্গ করিবার জন্য নহে। খাস পাঁচালির কাহিনী কলঙ্ক-ঘটিত, শ্লেষ ও ব্যঙ্গই ইহার লক্ষ্য। সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া রচয়িতা ইহার কাহিনীর মধ্যে কল্পনার মিশাল দিয়া থাকেন।

'মান পাঁচালি' ভিন্ন বস্তু। ইহা মূলত পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। পুরাণ বা 'শাস্ত্র' গানও বলা হইয়া থাকে। মান পাঁচালি গানের মধ্যে কাহিনী ও আসরের বিশেষ গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলা হয়। যেন উহাকে 'সম্মান' প্রদর্শন করা হয়। 'মান' অর্থাৎ সম্ভ্রম করিয়া, গাম্ভীর্য-পূর্ণ পরিবেশে যে নাট্য-কাহিনীর অভিনয় করা হয়, তাহাকেই বলে 'মান পাঁচালি'। মান পাঁচালির মধ্যে কাহিনীর অংশ ক্ষীণ। শাস্ত্রীয় তর্ক ও আলোচনাই ইহাতে মুখ্য। এইজন্য ইহাকে কখনো-কখনো 'শাস্তরী' গানও বলা হয়। একটি সামাজিক বা পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া দুই পক্ষ বা কাহিনীর নায়ক-নায়িকা একটি বিশেষ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তর্কালোচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তর্কালোচনাই ইহার বিষয়, কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের মূল্য এখানে তেমন নাই।

এইবার পালাটিয়া গানের আসর বা মঞ্চের কথা বলিতেছি।

সাধারণত বিশেষ-বিশেষ উৎসবে অথবা কয়েকটি গ্রামের নাট্যদলের অভিনয় প্রতিভার উৎকর্ষ বিচারের উদ্দেশে এক বা একাধিক রাত্রিব্যাপী যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হইয়া থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় তাহাকে বলে 'ধাম'। 'ধাম' ছাড়া, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে পালাটিয়া গানের আসর বসিয়া থাকে। মোট কথা, বিশেষ কোনো উপলক্ষ ব্যতীত পালাটিয়া গান সাধারণত হয় না।

CENTRAL LIBRARY

পালাটিয়া গানের আসর ও যাত্রার আসর প্রায় এক। যাঁহারা যাত্রা-গানের আসর দেখিয়াছেন, অনায়াসেই তাঁহারা পালাটিয়া গানের আসর কল্পনা করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু, যাত্রাগানের আসরের সহিত পালাটিয়া গানের আসরের পার্থক্যও আছে।

বড়ো শামিয়ানা বা চট টাঙাইয়া আসরের চাঁদোয়া করা হয়। মধ্যস্থলে চারিটি বাঁশের খুঁটি—যাহার উপর শামিয়ানা বা চট টাঙানো থাকে, তাহাই আসরের চতুঃসীমা। দর্শক ও গায়ক-অভিনেতাগণ একই সমতলে উপবেশন করেন অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার নাই। ওই চতুঃসীমার মধ্যস্থলে বাজনদার, প্রম্পটার ও অভিনেতাগণ থাকে। অভিনেতাগণের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথ নাই। যাহার যখন পার্ট আসিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চতুর্দিক ঘুরিয়া পার্ট বলিল এবং বলা শেষ হইলে বসিয়া পড়িল। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, চারি খুঁটির চতুঃসীমায় এবং বাজনদার-প্রম্পটারদের কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া অভিনেতাগণ অভিনয় করিয়া থাকেন। নাট্যসংস্থার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী উপরে বাতি জলে। সাধারণ দর্শকদের খড় বা বিচালি পাতিয়া বসিতে দেওয়া হয়।

সুদর্শন কিশোরেরাই মেয়ে সাজিয়া স্ত্রী-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের পোশাকের মধ্যে শাড়ী-সায়া-ব্লাউজ লক্ষ করা যায় এবং শাড়ী 'ড্রেস' করিয়া পরা হয়। অর্থাৎ এইখানে রাজবংশী মেয়ের পোশাকের সহিত কোনো সম্পর্ক নাই। হয়তো রাজবংশী মেয়ের ভূমিকাতেই তাহারা অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রাজবংশী মেয়ের বিশিষ্ট পরিধেয় বস্ত্র 'পাটানী-'র বদলে পরিয়া থাকে 'ড্রেস' করিয়া শাড়ী। মাথায় পরচুল ও অঙ্গে পুঁতির বা কাঁচের অলঙ্কার থাকে। রঙের মধ্যে সিঁদুর, আলতা, খড়িমাটির গুঁড়া ও ভুষা-কালি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত এক-একটি নাট্যদলে এইরূপ দুই-তিনটি স্ত্রী-বেশী কিশোর থাকে। ইহাদের বলা হয়, 'ছুকরী'। ইহারাই প্রতি দৃশ্যের শেষে দর্শকদের 'ড্রামাটিক' রিলিফ-দিবার জন্য সমবেতভাবে নাচে, ইহারাই নায়িকা-প্রতিনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন দৃশ্যে অবতীর্ণ হইবার জন্য বেশ পরিবর্তনের বালাই নাই। 'ড্রামাটিক রিলিফ' দিবার জন্য যে বেশে ইহারা নাচে, সে একই বেশে নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করিয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

এই প্রসঙ্গে ইহাদের নৃত্য-রীতি সম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজবংশী মেয়ের যে একটি নিজস্ব নৃত্য-রীতি আছে, যাহা 'মেছেনী' গানে বা বিবাহ বাসরে লক্ষ করা যায়, পালাটিয়া গানের নাচের সহিত তাহার কোনো মিল নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। প্রথমত মেয়ের বদলে ছেলেরা এখানে নাচিতেছে। দ্বিতীয়ত, এই নৃত্য-রীতিতে যাত্রা ও খেমটা নাচের ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। ইহাদের নাচের মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য নাই। একই ধরণের দেহ-ভঙ্গি বিভিন্ন গানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

'ছুকরী' ছাড়া পুরুষ ভূমিকায় অন্যান্য যাহারা অভিনয় করে, তাহাদের সাজ-পোশাকের বালাই নাই। তাহারা কোনো প্রকার মেক্-আপ না লইয়াই অভিনয় করিতে নামিয়া যায়। ইহার মধ্যে খাঁটি লোক-নাট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের ইঙ্গিত মিলে।

অভিনয়-রীতির মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। তাহা গান গাহিবার সময়। পালাটিয়া গানে গানই অনেক সময় সংলাপের ভূমিকা নিয়া থাকে। যখন গানের মধ্য দিয়া নায়ক বা নায়িকা পরস্পরকে কিছু বলিতেছে, তখন কখনই সেই গান সে একা গাহিবে না যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে। অর্থাৎ একজনে গানের মধ্য দিয়া একটি কথা বলিল, অপর জন গানে তাহার উত্তর দিল,—এইরূপ নহে। বক্তা ও শ্রোতা একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তরাংশ গাহিয়া থাকে। অর্থাৎ পালাটিয়া গানে একক সঙ্গীতের স্থান নাই। ইহার কারণ দুইটি হইতে পারে। প্রথমত, সকল দর্শক যাহাতে শুনিতে পায়, এইজন্য গানকে শ্রুতিযোগ্য করিয়া তোলা। দ্বিতীয়ত, একক সঙ্গীত অনেকটা আধুনিক কালের জিনিস। আদিম মানুষ সমবেত কণ্ঠেই গান গাহিত। তাহারই প্রভাব এখানে থাকিতে পারে। লোকসমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্থান নাই বলিয়া এই রীতির উদ্ভব হইয়াছে।

হাস্যরস পরিবেশন করা পাঁচালি গানের অপর এক বিশেষত্ব। নাটকের কাহিনীতে হাস্যরস বিতরণের সুযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, হাস্যরস পরিবেশন করিতেই হইবে। এই হাস্যরস পরিবেশন করিবারও একটি বাঁধাধরা রীতি আছে। যে-কেহ এই হাস্যরস সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ফকির বা বৈরাগী-বৈষ্ণব শ্রেণীর কেহ একজন আসিয়া এই হাস্য-কৌতুক করিবে। সাধারণত নায়ক যখন পথ চলিতেছে অথবা নায়িকা বা প্রতি-

CENTRAL LIBRARY

নায়িকা যখন আনমনে বসিয়া আছে, তখন অকারণে অথবা কাহিনীর ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া হঠাৎ ইহারা অবতীর্ণ হয় এবং কথায়-বার্তায় ও অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে লোক হাসাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া, যে কোনো কারণে যেমন করিয়া হউক,—কাহিনীর সহিত সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক, বৈষ্ণব বা ফকির একজনকে আনিয়া ফেলা হইবেই হইবে। ইহাকে এক বিশেষত্ব বলিতে পারি।

উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় যাহারা অভিনয় করে, অর্থাৎ—নায়ক-প্রতিনায়ক, নায়িকা-প্রতিনায়িকা এবং অন্য দুই-একটি চরিত্র বাদে অন্যান্য কুশীলবগণকে 'বাজেলোক' বলা হয়। অর্থাৎ আধুনিক সিনেমা-থিয়েটারে যাহাদের বলা হয় 'এক্‌স্ট্রা', সেই। ফকির-বৈষ্ণব, পড়শী, পথচারী পথিক, বাড়ীর চাকর প্রভৃতি এই 'বাজেলোকের' পর্যায়ে পড়ে। বাজেলোকের কণ্ঠে গীত গানকে বলা হয় 'ফাঁস গান'। বাজেলোকের রঙ্গ-তামাশাকে বলা হয় 'খিচর'।

পালা আরম্ভ হইবার পূর্বে একটি নাচ এবং শেষে একটি নাচ অবশ্যই থাকিতে হইবে। ইহা যাত্রা গানের প্রভাবে। পালা আরম্ভ হইবার পূর্বে নাটকের পরিচালক বা পরিচালক-স্থানীয় কেহ একজন স্ত্রী-বেশী 'ছুকরী'দের সঙ্গে লইয়া আসরে প্রবেশ করিবে। তারপর পর্যায়ক্রমে আসরের চতুর্দিকে সমবেতভাবে সকলে গড় হইয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম করিয়া উঠিয়া গাহিবে 'বন্দনা গান'। বন্দনা গান কেমন হয়, তাহার আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। বন্দনা গান শেষ হইয়া গেলে একটি সমবেত নৃত্য হয়। নৃত্যের শেষে অন্যান্য অভিনেতাগণ আসিয়া আসরের মধ্যস্থলে উপবেশন করিবে।

নাট্য-কাহিনীর যিনি পরিচালক তাঁহাকে বলা হয় 'হাদি'। শব্দটি ফারসী শব্দ বলিয়া মনে হয়। নাট্য-কাহিনীর রচয়িতাকে বলা হয় 'অস্তাদ' বা 'রস্তাদ'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক হইয়া থাকেন।

যে নাট্যদলের নিজস্ব নাট্য-রচয়িতা নাই, তাহারা নিকট বা দূরবর্তী 'অস্তাদের' নিকট হইতে নাটক ক্রয় করিয়া আনে। নাটকের দাম পাঁচ টাকা হইতে কুড়ি টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। সাধারণত 'হাদি' অর্থাৎ নাট্যদলের পরিচালক একা গিয়া 'অস্তাদের' নিকট হইতে কাহিনীটি শিখিয়া আসে। ওস্তাদ একটি খাতায় কাহিনীর মূল অংশ ও উহার গানগুলি লিখিয়া দেন।

CENTRAL LIBRARY

বাজেলোকের সংলাপ কখনই খাতায় লেখা হয় না। উহা উপস্থিত ক্ষেত্রে অভিনেতাগণ নিজেরাই বানাইয়া বলিয়া দেয়। অনেক 'অস্তাদ' নাটক লিখিয়াই জীবিকার্জন করেন এবং এজন্যে জনসাধারণো তাঁহারা সাহিত্যিকের মর্যাদা পাইয়া থাকেন।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়ম, বেহালা ও খোল বাজানো হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে দোতারা, সারিন্দা প্রভৃতি বাজে।

'পাঁচালি' বা 'পালাটিয়া' গান সম্পর্কে এইরূপ ভূমিকার পর বর্তমান সঙ্কলনে গ্রথিত রঙ্ পাঁচালি, খাস পাঁচালি ও মান পাঁচালিগুলির আলোচনা করা যাইতে পারে॥

॥ ২ ॥

॥ রঙ পাঁচালি : গুলাপীশ্বরীর পালা ॥

গুলাপীশ্বরীর পালার কাহিনী এই :

ভোরলখাটি নামীয় এক বুড়ার দুইটি মেয়ে ছিল। একজনের নাম জুলাপী, অপর জনের নাম গুলাপী। জুলাপীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত বয়স হইলেও গুলাপীর বিবাহ হয় নাই,—কোনো স্থান হইতে ভালো সম্বন্ধও আসে নাই। যে দুই-একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে, তাহারা সকলেই বিপত্নীক। বিবাহ না হইবার দরুণ গুলাপী সর্বদা মন খারাপ করিয়া থাকে।

একদিন ছাগল চরাইবার জন্য গুলাপী নদীর ধারে গেল। নদীর তীরে, নির্জন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সে নিজ জীবনের ব্যথায় বড়োই ব্যথিত হইয়া উঠিল। গান গাহিয়া সে দুঃখের কথা বলিতে লাগিল : দিনে দিনে আমার রূপ-যৌবন চলিয়া যাইতেছে। এখনও যদি আমার বাপ বিবাহ না দেয়, তবে কোনো পুরুষই আমাকে আর পছন্দ করিবে না। আপনার রূপ-শোভা আমি নিজেই দেখিতেছি। আমাকে আর কুমারী সাজিয়া থাকা শোভা পায় না। দুঃখে গুলাপী নদীর তীরে হওয়া বুনো কুল খাইতে লাগিল। তারপর নদীর ঘাটে বসিয়া কাঁদিতে শুরু করিল।

কোঁচড়ে কুল লইয়া, স্নান করিয়া গুলাপী বাড়ীর দিকে আসিতেছে। এই সময় পথে দেখা হইল এক কোঁচা দিয়া ধুতি-পরা যুবকের সহিত। যুবকের নাম মনভুলা। মনভুলা গুলাপীদেরই আশ্রিত এবং তাহার দূর সম্পর্কের ভাই।

মনভুলা আসিয়া কহিল, 'দে একটা বগ্‌রি খাই'। এবং গুলাপীর কোঁচড় হইতে ফুল লইবার অছিলায় তাহার দেহের স্থান বিশেষ স্পর্শ করিল।

মনভুলার এই ব্যবহারে গুলাপী চটিয়া উঠিল। সে কহিল, 'তোক জানু মুই আপনার ভাইর লাখা। ওগে, তোর গে দাদা ধর্ম নাই'। তুই আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কুমতলবে আছিস্। পরিশেষে ভয় দেখাইয়া বলিল, সে এখনই বাড়ীতে যাইয়া সকলকে সব কথা বলিয়া দিবে।

স্বভাবতই মনভুলা ইহাতে একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে নরমে-গরমে ইহার উত্তর দিল। নরম হইয়া, গুলাপীকে 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল, যাইবার সময় সে তাহাকে ঝুড়িখাড়ু, 'ঝাঙ্গাপাটানী' এবং 'কামাই শাঁখো' কিনিয়া দিবে। গুলাপী যেন কাহাকেও কিছু বলিয়া না দেয়। গরম হইয়া কহিল, 'যদি কাথাটা কয়হা দিবো, বাড়ীটাত্ মাই তুই কলং থুবো। যেইঠে-সেইঠে মাই তুই তুঁহে খাবো লাজ'।

কিন্তু ইহাতে গুলাপী ভুলিল না। সে বলিল, সোনা-রূপার গহনা লইয়া আমি কি করিব, যদি আমার দেহই অপবিত্র হইয়া যায়। আরো বেশি কথা বলিলে তুই আমার বাঁ পায়ের লাথি খাইবি। তোর শিক্ষা হওয়া দরকার, এখনই আমি সকলকে ডাকিয়া এই কথা বলিয়া দিতেছি।

তখন মনভুলাও মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে কহিল, না হয় জেলেই যাইব, তবু তোকে বউ করিয়া আমার বাড়ী লইয়া যাইব। এই বলিয়া সে সত্যই গুলাপীর হাত ধরিয়া টানিল।

সঙ্গে সঙ্গে গুলাপীও চীৎকার করিয়া তাহার মাকে ডাকিল এবং মনভুলা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সে কথাও বলিয়া দিল।

মনভুলা চতুর যুবক। মুহূর্তের মধ্যে সে পরিস্থিতিটার গুরুত্ব বুঝিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কর্তব্য স্থির করিল। সেও গুলাপীর আর্ত-চীৎকারের সহিত স্বর মিলাইয়া কহিল, ওগো মামী, শীঘ্র আইস, গুলাপীকে এক ঝাঁক মৌমাছি ঘিরিয়া ধরিয়াছে। পরক্ষণেই নিম্নস্বরে গুলাপীকে কহিল, 'যেই হবার হইল্ গে মাই, সোনার মোর আঙ্গঠিটায় লে। মামীটার আগত্ হিলা কাথা তাঁহো কয়হা না দিস্ গে।' মামা-মামী চলিয়া আসিতেছে 'না করিস মাই টানাটানি'। চল্ আমরা দুইজনে লুকাইয়া রহি।

CENTRAL LIBRARY

নয়তো চল নদীতে যাইয়া 'ডুবাডুবি' খেলি। বলিয়া সত্যই গুলাপীর হাতে আঙটি গুঁজিয়া দিল এবং তাহাকে নদীর দিকে লইয়া চলিল।

ঠিক এই সময়ে ব্যস্তভাবে গুলাপীর বাবা ও মা প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবেশ করিতেই মনভুলা বলিয়া উঠিল, ভাগ্যে আমরা খানিক দূর উজাইয়া গিয়াছিলাম, তাই মৌমাছির ঝাঁকটি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেল। গুলাপী কোনো কথা কহিল না। তাহার বাবা-মা তাহাকে বাড়ীতে লইয়া চলিয়া গেল। এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কে গুলাপীর মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছে। 'আংটি হইল্ মোর বোল্লার টোপ, লিয়া পামু লাজ'। লোকে ব্যাপারটার কিছুই জানে না, কিন্তু গুলাপীর নিজের কাছে নিজেকে কলঙ্কিনী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য একদিকে এবং মনভুলার প্রতি প্রেম একদিকে। শেষে মনভুলাকে শাস্তি দেওয়াই ঠিক করিল। সে তাহার পিসিমাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পিসিমা এক বুদ্ধি দিল। সে গুলাপীকে কহিল মনভুলাকে ডাকিয়া আনিতে। গুলাপী যাইয়া মনভুলাকে কহিল, 'বাপটা যাবার কহিচে ভাই'। এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য মনভুলা আসিতেই সকলে মিলিয়া তাহাকে বেদম প্রহার করিল। দুঃখে মনভুলা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এইখানে দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমেই দেখা যায়, মনভুলা গুলাপীর মন তাহার দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ওঝার শরণাপন্ন হইয়াছে। মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের গুণে সত্যসত্যই গুলাপীর মন মনভুলার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এতদিন প্রেম ছিল একদিকের, এইবার তাহা উভয় দিকের হইল। তারপর একদিন 'রাস্তার ধারে দুইজনার হইল্ মোলাকাত'। তখন 'দুই দিলে ভাই একদিল্ হইছে— মনে লাগিছে ভাল্'। গুলাপী মনভুলাকে কহিল, গভীর রাত্রিতে সে যেন গুলাপীদের ঘরের পিছনে উপস্থিত থাকে,—গুলাপী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিবে, তারপর দুইজনে মিলিয়া পলায়ন করিবে।

কথামত গভীর রাত্রিতে মনভুলা আসিয়া গুলাপীর ঘরের পিছনে দাঁড়াইল। কিন্তু, এমনই গ্রহের ফের, গুলাপীর বাবা মনে মনে কিছু একটা

CENTRAL LIBRARY

সন্দেহ করিয়া বসিল, সে-ও সহজে ঘুমাইল না। এদিকে তখন গুলাপীর মনে প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে :

বাপের মায়া, বন্ধুর শোক,
মাইকেনা জালাত্ পইচে খুব।
হিটা করিম না হুটা করিম—
ও মাইকেনার বুঝিবার নাইরো লোক ॥

এমনি করিয়া রাত্রি ভোর হইয়া গেল। পরদিন দেখা হইতেই মনভুলা কহিল, বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া আমার পায়ে ঝিম্ ধরিয়া গেল, কতবার তোকে বাহির হইয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলাম, তবু তুই আসিলি না।

গুলাপী সেদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইল, তিনি যেন তাহাকে মধ্য রাত্রিতে জাগাইয়া দেন। কিন্তু, সেদিন রাত্রিতে গুলাপীর ঘুম ভাঙ্গিল না। মনভুলা সারারাত্রি তাহার ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভোরবেলায় ফিরিয়া আসিল। পরদিন পুকুর-ঘাটে দেখা করিয়া মনভুলা কহিল, 'মাই তোর এই কি গে বিচার, তোর মুখ নাই দেখিমু আর'। গুলাপী তাহার জবাবে বলিল, 'দাদা গে, গোসা না হইস্ দাদা মোর উপর। ওগে, সত্যে সত্যে যামু মুই তোরে ঘর'। মনভুলা বলিল, তোরই কথামতো তোকে আনিতে গেলাম, অথচ তুই আসিলি না। আজ রাত্রিতে আমি কোনো কিছুর বাধাই মানিব না। আঁধারকে ভয় করিব না, দেবতাকে ডর করিব না, বাঘ-সিংহকে পথের কুকুর বলিয়া মনে করিব, পথের সাপকে মনে করিব কেঁচো।

বাড়ী আসিয়া গুলাপী মা কালীর নিকট মানত করিল, যদি মনভুলার সহিত তাহার মিলন হয়, তবে সে দেবীর উদ্দেশে পারাবত বলি দিবে। মনভুলাও সেদিন গুলাপীকে মিনতি করিয়া কহিল, 'ওগে মাই গুলাপী, আজি না দিস গে ফাঁকি।'

কিন্তু সেদিন রাত্রিবেলাতেও গুলাপী ও মনভুলা পলায়ন করিতে পারে নাই। পরদিন গুলাপী মনভুলাকে আর দেখিতে পাইল না। গুলাপীর 'মন কান্দে মনভুলার বাদে—ওরে কথা বলে মইলান ভাবে। ওরে কটামুখে কহে কাথা বাপ আর মাওকে'। এমনি করিয়া দিন যায়। একদিন কাপড় কাচিবার জন্য নদীর ঘাটে যাইয়া গুলাপীর মনভুলার কথা মনে হইল। 'ও

CENTRAL LIBRARY

মনভুলার বাদে মন ছছকার'। 'অর্ধেক কান্দন, অর্ধেক গান, নাম নেছে মনভুলার'। কান্নায় ও গানে গুলাপী গাহিল,—'দাদা, এলায় যদি নাগাল গে পাও—সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গে যাও'। এমন সময় নাটকীয়ভাবে মনভুলার প্রবেশ। পরে সকলের সমবেত চেষ্টায় উভয়ের মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে॥

॥ ৩ ॥

গুলাপীশ্বরীর পালা-কাহিনী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গুলাপীই এই পালার প্রধান চরিত্র। এই চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে নাট্যকার বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। নাট্য-চরিত্রের প্রধান বস্তু হইল—অন্তর্দ্বন্দ্ব। নাটকের মধ্যে গুলাপীর অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি সক্রিয় ভূমিকা নিয়াছে এবং তাহা নাট্যরস সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে।

মনভুলাকে গুলাপী প্রথমে ভালোবাসিতে চাহে নাই। অথচ এই গুলাপীই শেষ দৃশ্যে মনভুলার জন্য কাঁদিয়াছে। একটি চরিত্রের এই ক্রমবিকাশই নাট্য-চরিত্রের লক্ষণ। নাট্যকার গুলাপী চরিত্রের এই ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন।

গুলাপীর দেহ যখন মনভুলা স্পর্শ করিয়াছে, তখন গুলাপী প্রবলভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। দৈহিক বিশুদ্ধতার হানি হইয়াছিল বলিয়াই সে মনভুলাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পিছপা হয় নাই। এ জন্যে সে ছলনার আশ্রয় পর্যন্ত লইয়াছে। প্রথম অঙ্কেই লক্ষ করিয়াছি, যৌবন-বেদনায় গুলাপী কাতর হইয়াছে। কিন্তু সেই যৌবন-বেদনা তাহাকে কামের পথে ঠেলিয়া দেয় নাই। এই কারণেই মনভুলার প্রস্তাবে প্রথমে সে রাজী হয় নাই। এই সকল ঘটনার মধ্যে গুলাপীর একটি ব্যক্তিত্বের পরিচয় মিলে।

গুলাপীর মনের দ্বন্দ্বের সূচনাটি অতি সূক্ষ্ম। দৈহিক বিশুদ্ধতার হানি হইল বলিয়া সে চীৎকার করিয়া তাহার মাতা-পিতাকে ডাকিয়াছিল। অথচ, এই গুলাপীই মাতা-পিতা আসিলে চুপ করিয়া ছিল এবং মনভুলার দেওয়া আঙটি পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিল। তখন পর্যন্ত মনভুলার প্রতি তাহার নিজের আকর্ষণ নিজেই গুলাপী বুঝিতে পারে নাই। তাই ইহার পরেই সে মনভুলাকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছে। মনভুলার সহিত পলায়ন করিবার

CENTRAL LIBRARY

মধ্যেও গুলাপীর মনের দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে তাহার পিতা-মাতা, অপর দিকে তাহার প্রেম —দুই দিকের টানা-পোড়েনে সে রক্তমাংসে গড়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। গুলাপী যে পর-পর কয়েক রাত্রি ধরিয়া বিবিধ কারণে প্রেমিকের সহিত পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহার আসল কারণ তাহারই মনের দ্বিধা। এই দ্বিধার বাধাই বিবিধ কারণ রূপে নাটকে রূপায়িত হইয়াছে। অথচ, প্রেম যে তাহার কিছু কম ছিল তাহাও নহে। কেন না, নদীর ঘাটে মনভুলার জন্য তাহার ক্রন্দন হইতেই তাহার প্রেমের গভীরতা বোঝা যাইবে। মোট কথা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া গুলাপী প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-কবির সার্থক সৃষ্টি।

গুলাপীর মনের এই দ্বিধা কাহিনীর মধ্যেও নাটকীয়তার সঞ্চার করিয়াছে। মনভুলার সহিত প্রতিদিন পলায়নের পরিকল্পনা, শেষ পর্যন্ত কী রূপ লইবে, দর্শক তাহা বিশেষ উৎসাহ লইয়া পর্যবেক্ষণ করিবে। গুলাপীর চীৎকারে যখন তাহার মাতা-পিতা দৌড়াইয়া আসিল, তখন মনভুলার মনের অবস্থায় ও কাহিনীর পরিবেশে রীতিমতো নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শক আশা করিয়াছিল, এইখানে কিছু-একটা ঘটিবে। অথচ, মনভুলা-কর্তৃক মৌমাছির ঝাঁকের উল্লেখ এবং গুলাপীর নীরবতা কাহিনীকে অপ্রত্যাশিত এক নতুন দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

সমস্ত নাটকটির মধ্যে একটি বিরাট ত্রুটি চোখে পড়ে। তাহা হইল, মনভুলার প্রতি গুলাপীর মনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ওঝার মন্ত্র-গুণের শরণাপন্ন হওয়া। এই একটি কারণেই নাটকখানিতে বাস্তবতার অভাব দেখা দিয়াছে। মনভুলার প্রতি গুলাপীর মন কাহিনী-ঘটনার মানসিক সংঘাতের মাধ্যমে পরিবর্তিত না হইয়া ওঝার মন্ত্র-গুণে রাতারাতি হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে গুলাপী ও মনভুলা উভয়েরই প্রেম খাটো হইয়া পড়িয়াছে।

অবশ্য, এই প্রকার আলৌকিকত্ব ও অবাস্তবতা লোক-নাটকেরই বিশেষত্ব। সেই দিক দিয়া বিচার করিয়া ইহাকে ত্রুটি না বলিয়া একটি বিশেষত্ব বলাই বাঞ্ছনীয়। এই অবাস্তব ঘটনাটি নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছে এবং ইহারই ফলে নাটকটি খাঁটি 'নাটক' না হইয়া 'লোক-নাটক' হইয়া উঠিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

নাটকটির গ্রন্থনার একটি বিশেষত্ব হইল ইহার অঙ্ক-বিভাগ। নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত। এই তিনটি অঙ্কের দৃঢ় বাঁধুনি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অঙ্ক তিনটির শক্ত ফ্রেমে কাহিনীটি সংহত আকারে চমৎকার রূপে রূপায়িত হইয়াছে। এই দিক দিয়া নাট্যকার অবশ্যই প্রশংসা পাইবেন।

হাস্যরসের অনুপস্থিতি নাটকখানির আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অকারণে ইহাতে হাস্যরস বিতরণের সুযোগ নেওয়া হয় নাই। কাজেই কাহিনীটি স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য, এই দৃঢ় সংহতির ফলেই নাটকটি 'লোক-নাটক' রূপে কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। 'লোক-নাটক' এতো দৃঢ়বন্ধ, এতো সংহত সহজে হয় না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতেই হয়, নাটকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের রচনা। 'অঙ্ক'-বিভাগ করিয়া ইহার কাহিনী উপস্থাপনা করিবার প্রবণতার মধ্যেও আধুনিকতার ছাপ আছে।

আলোচ্য পাঁচালিখানি 'রঙ পাঁচালির' অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্যে একটি কাল্পনিক প্রেম-কাহিনীই এই পালার বিষয়॥

॥ ৪ ॥

॥ খাস পাঁচালি : কাঙ্গ-ভাঙ্গা-ঢেওপাড়ীর পালা ॥

কাঙ্গ-ভাঙ্গা নামক এক যুবক একদা 'দেউনিয়াগিরি' শিখিবার জন্য জালু নামক এক দেউনিয়ার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। 'দেউনিয়া' হইল গ্রামের মধ্যে কর্তা-স্থানীয় ব্যক্তি (বাড়ীর কর্তাকেও 'দেউনিয়া' বলা হয়)। জালু দেউনিয়ার বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গা কহিল, সে জালুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে। বড়ো দুঃখে সে দেউনিয়াগিরি শিখিতে আসিয়াছে। উত্তরে জালু কহিল, সম্প্রতি সে একজন বড়ো দেউনিয়া হইয়া উঠিয়াছে, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হইয়াছে। কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই সে কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে দেউনিয়াগিরি শিখাইয়া দিবে। এই বলিয়া জালু ইউনিয়ন বোর্ডের কাজে প্রস্থান করিল।

জালুর স্ত্রীর নাম ঢেওপাড়ী। জালু প্রস্থান করিতেই ঢেওপাড়ী আসিয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে শুধাইল, 'আচ্ছা বাউ, তোর কাঁয় কাঁয় আছে?' কাঙ্গ-ভাঙ্গা

CENTRAL LIBRARY

জানাইল, তাহার কেহ নাই। সে অবিবাহিত। তারপর কহিল, আপনাদের বুঝি সন্তানাদি নাই? দুঃখে ও লজ্জায় ঢেঙপাড়ী জানাইল, তাহাদের সন্তানাদি নাই, তাহার কারণ জালু সন্তান জন্ম-দানে অপারগ (Impotent)। ঢেঙপাড়ী স্পষ্টই কাঙ্গ-ভাঙ্গার নিকট দেহ সমর্পণ করিয়া বলিল,

তোর লাথা সয়ামী যদি পাও
এলাও মুই হবা' পারু
সাত ছাওয়ালের মাও॥

গুরুর স্ত্রীর এই বাক্য শুনিয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গা প্রথমটায় হতভম্ব হইয়া গেল। তাহা ছাড়া, গুরুর পত্নীর অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইতে তাহার মন চাহিল না। সে কহিল, 'হলা কাম করিতে মোক নাগেছে ভয়। গুরুদাই দিয়া দেউ যদি মন্দ কামত্ পাও,—তমা তে হবেন মোর গুরুয়ানী মাও।'

কিন্তু, ঢেঙপাড়ীর শরম নাই। সে বুঝাইয়া কহিল, নদীতে যেমন সকলেই স্নান করে, নারীকেও তেমনি সকলেই ভোগ করিতে পারে। রাধা মহাসতী ছিল, কিন্তু সে-ও পর-পুরুষের সহিত প্রেমে লিপ্ত ছিল।

ঢেঙপাড়ীর উক্তিতে কাঙ্গ-ভাঙ্গার মন খানিক টলিল। ভগবানের নাম করিয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গা ঢেঙপাড়ীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু, ঢেঙপাড়ী যে গুরু-পত্নী এবং তাহার সহিত অসদাচরণে যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, ইহাও সে ভুলিল না।

এমন সময় ইউনিয়ন বোর্ড হইতে জালু দেউনিয়া ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই সে ভাত খাইতে চাহিল। ঢেঙপাড়ী তখন আসিয়া বলিল, তাহার আজ জ্বর হইয়াছে। সে আজ ধানও ভানে নাই, ভাতও রাঁধে নাই। জালু যেন আজিকার দিনটা চিঁড়া খাইয়া থাকে।

শুনিয়া জালু ভীষণ রাগিয়া গেল এবং ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঢেঙপাড়ীকে প্রহার করা শুরু করিল। মার খাইয়া ঢেঙপাড়ী অজ্ঞানের ভান করিল। দেখিয়া জালু ঘাবড়াইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ঢেঙপাড়ী উঠিয়া বসিয়া কহিল, ওরে মড়া, কাঁদিস্ না। তোর ভাত রাঁধিবার জন্যই ধান ভানিতেছিলাম, ধান ভানিতে ভানিতে আমার জ্বর আসিল। তুই বিশ্বাস না করিয়া আমাকে কেন মারিলি।

CENTRAL LIBRARY

জালু ঢেঙপাড়ীকে শুইয়া থাকিতে কহিল। বলিল, আমিই ধান ভানিয়া ভাত রাঁধিতেছি। তারপর সত্য-সত্যই সে ধান ভানিয়া ভাত রাঁধিল, স্ত্রীকে খাওয়াইয়া ও নিজে খাইয়া কার্যব্যপদেশে জলপাইগুড়ি শহরে গেল। যাইবার সময় কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে কহিয়া গেল, শিষ্যরূপে আর তাহাকে রাখা যাইবে না, কেননা, স্ত্রীর অসুখ, বাড়ীতে ভাত রাঁধিবার কেহ নাই। কাঙ্গ-ভাঙ্গা যেন কালই বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। এই বলিয়া জালু প্রস্থান করিল।

জালু প্রস্থান করিতেই ঢেঙপাড়ী হাসিয়া তাহার সকল চালাকির কথা বলিল। কহিল, কেমন জরের ভান করিয়া স্বামীকে দিয়া সে ধান ভানাইয়াছে, ভাত রাঁধাইয়াছে। রাঁধিয়াই যদি না খাইবে তবে ঢেঙপাড়ীর মতো মেয়েকে জালু বিবাহ করিয়াছে কেন! তারপর কাঙ্গ-ভাঙ্গার নিকট প্রেম নিবেদন করিবা কহিল, কাঙ্গ-ভাঙ্গা তাহার 'স্বর্গের তারা'। 'যদি বাপোই মোক ছেড়িবো, মোর নারীটার মাথা খাবো'।

কিন্তু কাঙ্গ-ভাঙ্গা এখনও মনস্থির করিতে পারে নাই। সে প্রথমে কহিল, 'ওগে, জান গেলে নাই ছেড়িম পাছ; তুই হোলো মোর শান্তির গাছ।' পরে কহিল, 'ওগে নারীজাতি অবিশ্বাস, তাতে মোর না হয় সাহাস।' অতঃপর কাঙ্গ-ভাঙ্গা প্রস্থান করিল।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহর হইতে জালু ফিরিয়া আসিয়া, ঢেঙপাড়ীর জর ছাড়িয়াছে কিনা এবং কাঙ্গ-ভাঙ্গা গিয়াছে কিনা শুধাইল। ঢেঙপাড়ী কহিল, তাহার জর ছাড়ে নাই এবং তাহার পরিচর্যা করিবার জন্যই সময়মতো কাঙ্গ-ভাঙ্গা না যাইয়া সকাল বেলায় জলপাইগুড়ি গিয়াছে। ঢেঙপাড়ী আরো জানাইল, আজো সে ভাত রাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। এমন সময় প্রবেশ করিল চেরকেটু। চেরকেটু জালু দেউনিয়ার দত্তক নেওয়া পুত্র। সে আসিয়া ভাত খাইতে চাহিল। জালু সেদিনও নিজেই ধান ভানিয়া ভাত রাঁধিল এবং স্ত্রীকে খাওয়াইল।

পর-পর কয়েক দিন ধরিয়া স্ত্রীর এইরূপ জর হইতেছে দেখিয়া জালু এইবার চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, আগামী কালই সে কোনো পুরোহিতের বাড়ী যাইবে এবং খড়ি পাতিয়া গুণিয়া দেখিবে কী কারণে এইরূপ জর হইতেছে। জালু আসিয়া যখন ভাত খাইতে বসিয়াছে, তখন

CENTRAL LIBRARY

ঢেঙপাড়ীর শয্যাপার্শ্বে কাঙ্গ-ভাঙ্গার আবির্ভাব হইল। ঢেঙপাড়ীর কথামতো কাঙ্গ-ভাঙ্গা আসিয়া তাহারই পার্শ্বে শয়ন করিল। এই সময় প্রবেশ করিল জালু। জালুর স্ত্রীর দৈহিক উত্তাপ পরীক্ষা করিবার জন্ম কাছে আসিয়া দেখিল, ঢেঙপাড়ীর বিছানায় চারিখানা পা। তাই দেখিয়া সে শুধাইল, 'দুইখান ঠ্যাং তো তোরে, দুইখান ঠ্যাং কার'? ঢেঙপাড়ী উত্তর দিল, 'দুইখান ঠেঙ্গা জরের, দুইখান ঠেঙ্গা মোর, হলা ঠ্যাং না নাড়িস্, জর হোবে তোর।' জালু অবাক হইয়া কহিল, 'ঠ্যাং-আওলা জর তো মুই দেখুঁ নাই; হিখান জরের এলা কি করুঁ উপাই। পাঞ্জি না দেখালে আর চলিবে নাই।' তারপর জালু কহিল, তুই আমার বড়ো আদরের বউ। অনেক টাকা খরচ করিয়া বিবাহ করিয়াছি। তুই মরিলে আমি বউ পাইব কোথায়। তোর 'জর দেখিয়া মুখত্ নাই মোর আও।'

পরদিন কথামতো জালু শামুক নামক এক 'পাঞ্জিয়াবের' (যে পঞ্জিকা দেখে) বাড়ীতে গেল। শামুক গুনিয়া-পাতিয়া কহিল, 'তোর মাইয়াক (বউকে) ধইচে পর-ছুঁতি দোষ।' 'এজন্যে ভালো অধিকারী (পুরোহিত) দিয়া একটা স্তাবা (পূজা) দিস্।'

পূজার জন্ম জালু উপচার ক্রয় করিল, নিজেই ঠাকুর ঘর লেপিয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিল। তারপর পুরোহিতের বাড়ী গেল খবর দিতে। এদিকে ঢেঙপাড়ী তাহাদের দত্তক পুত্র চেরকেটুকে যখন চিমটি কাটিতে লাগিল। ফলে সে কাঁদন জুড়িল। শুনিয়া জালু তাহাকে একটি কলা দিয়া চুপ করাইতে বলিল। এইরূপে চিমটি কাটিয়া চেরকেটুকে কাঁদাইয়া ঢেঙপাড়ী তাহাকে দিয়া পূজার সকল ফল-মিষ্টি খাওয়াইয়া ফেলিল। ফলে, পুরোহিত আসিয়া উপচারের অভাবে সেদিন পূজা করিতে পারিল না। এইখানে 'বৈষ্টম'কে দিয়া হাস্তরস পরিবেশনের সুযোগ নেওয়া হইয়াছে।

জালু তখন গেল আর এক ওঝার বাড়ী। এই ওঝা জালুরই ভাগ্নে, নাম শামকুড়া। শামকুড়া পরদিন সকালে আসিয়া ঝাড়ফুঁক করিয়া মামীর ঠ্যাং-ওয়ালা জর খেদাইবে, এইরূপ কথা দিল। শামকুড়ার মুখ দিয়া নাট্যকার ঢেঙপাড়ীর জরের আসল কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। শামকুড়া বলিয়াছে, 'তোক তো মামা আজেলা কহে, মামীর দুখী নাই।'

যাহাই হউক, পরদিন সকালে জালু যখন কার্যব্যপদেশে বাহিরে গিয়াছে, তখন প্রবেশ করিল শামকুড়া। সে আসিয়া দেখে, ঢেঙপাড়ী কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছে। সে আসল কারণ বুঝিয়া ফেলিল। এই সময় বাড়ী আসিল জালু। শামকুড়া কহিল, এক্ষুনি সে ঠ্যাং-ওয়ালা জরের আসল ভূতকে খেদাইতেছে। এইজন্য একটি বেত (ইহাকে বলে 'ঘাটি'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের পুরোহিতগণের হাতে একটি করিয়া বেত থাকে) ও লম্বা একটি ধানের বস্তা লাগিবে। শামকুড়া যখন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তখন ঢেঙপাড়ীর কথামতো কাঙ্গ-ভাঙ্গা যাইয়া একটি ধানের বস্তার মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছিল। এখন পূজার নিকটে সেই ধানের বস্তা (যাহার মধ্যে কাঙ্গ-ভাঙ্গা লুকাইয়া আছে) তাহা আনা হইল। মন্ত্র পড়িয়া সেই বস্তার উপর বেত্রাঘাত করিতেই কাঙ্গ-ভাঙ্গা বাহির হইয়া আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করিল এবং কহিল, ঢেঙপাড়ীর প্ররোচনাতেই সে এইরূপ করিয়াছিল। জালু কহিল, সে গুরু, ক্ষমাই তাহার ধর্ম। সে কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে ক্ষমা করিল। কাঙ্গ-ভাঙ্গা গুরু-বাড়ী হইতে বিদায় লইল। এইখানেই কাহিনী শেষ হইয়াছে।

॥ ৫ ॥

গুলাপীশ্বরীর পালার মতো কাঙ্গ-ভাঙ্গা-ঢেঙপাড়ীর পালাও স্ত্রী-প্রধান নাটক। এই নাটকের প্রধান চরিত্র ঢেঙপাড়ী। ঢেঙপাড়ীর যৌন-জীবনের ক্ষুধাই সমস্ত নাটকখানিকে পরিচালিত করিয়াছে।

সমগ্রভাবে বিচার করিলে, ঢেঙপাড়ীকে একখানি আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের নায়িকা বলিয়া মনে হয়। অথবা, সে একেবারেই আদিম মানুষের প্রতিভূ। দৈহিক তৃষ্ণাকে বিসর্জন দিয়া সতীধর্মকে সে মোটেই আমল দেয় নাই।

বাস্তবিক, যাহার স্বামী যৌন-ক্ষমতাহীন, যে স্বামী তাহার স্ত্রীকে কোনদিন মাতৃত্বে ভূষিত করিতে পারিবে না, সেই স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ভালোবাসা এবং যৌন-জীবনে পবিত্র হইয়া থাকা কতদূর সঙ্গত ও স্বাভাবিক, সে আলোচনা বাঙলা বা ভারতীয় সাহিত্যের কোনো ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার করেন নাই। এই জন্যেই বলিতেছিলাম, ঢেঙপাড়ী যেন কোনো বিদেশী ঔপন্যাসিকের নায়িকা।

CENTRAL LIBRARY

একটি লোক-নাট্যের নায়িকাকে সোজাসুজি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নায়িকা বলিলে অদ্ভুত ও বেরসিকের উক্তির মতো শুনাইতে পারে, কিন্তু তবু বলিব, ঢেঙপাড়ীর জীবনের এই সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে কোনো ভারতীয় সাহিত্যিককে দেখা যায় নাই।

অবৈধ প্রণয়ে ও যৌনাচারে লিপ্ত হইবার জন্ত ঢেঙপাড়ীর মনে কোনো প্রকার দ্বিধার বাধা কিংবা শরমের দ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে দেখিবা মাত্রই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাষায় সে তাহার দেহ-মন অর্পণ করিতে চাহিয়াছে। সে গুরু-পত্নী, তদুপরি পর-স্ত্রী। কিন্তু, স্বামীর সাহচর্য যাহার জীবনে ফলবতী হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহার নিকট সতী-ধর্মের মূল্য অনেক কমিয়া আসিয়া দেহধর্মই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। ঢেঙপাড়ীর এই দ্বিধা ও সঙ্কোচশূন্ত আত্ম-সমর্পণের মধ্যে একদিকে আদিম মানুষের গভীর সারল্য এবং অপর দিকে তাহার নারী-জীবনের কারুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাই সমস্ত নাটকখানি পাপাচারের কাহিনী হইলেও, উহার নায়িকা ঢেঙপাড়ী আমাদের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

ঢেঙপাড়ীর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক স্বতই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহা হইল, সে নিছক কাম-বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্ত পর-পুরুষের নিকট দেহ সমর্পণ করিতে বোধ হয় চায় নাই। সে চাহিয়াছিল মা হইতে। তাই দেখা যায়, কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে সে বলিয়াছে, উপযুক্ত পুরুষ পাইলে সে এখনও 'সাত ছাওয়ালের মাও' হইতে পারে। ঢেঙপাড়ীর চরিত্রের এই দিকটিকেই পরিস্ফুট করিবার জন্ত বোধহয় নাট্যকার নাটকের মধ্যে জালুর দত্তক নেওয়া পুত্র চেরকেটুর উল্লেখ করিয়াছেন। চেরকেটুকে দত্তক নেওয়ার অর্থ হইল, জালু Confirmed Impotent। সুতরাং জালু কর্তৃক ঢেঙপাড়ীর মা হওয়া অসম্ভব। যে সধবা রমণী নিজেকে সন্তান জন্মদানে সমর্থ বিবেচনা করে, তাহার পক্ষে দত্তক নেওয়া পুত্রকে অপত্যস্নেহে লালন করা কতোদূর সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্তেই দেখা যায়, সে কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে বলিয়াছে, 'পয়ার ছয়া দেখিয়া কি জুড়ায় দেহা'। এই জন্তেই চেরকেটুকে জালু অপত্যস্নেহে মানুষ করিতে চাহিলেও, ঢেঙপাড়ী চেরকেটুকে কখনই সুনজরে দেখিতে পারে নাই। জালু জানিত, সে কোনোদিনই পিতা হইতে পারিবে না;—ঢেঙপাড়ী বিশ্বাস করিত, উপযুক্ত পুরুষ পাইলে সে এখনও মা হইতে

CENTRAL LIBRARY

পারে। ঢেঙপাড়ীর চরিত্রকে এই দিক হইতে বিচার করিলে তাহার উপর সুবিচার করা হইবে।

নাটকের অপর দুই চরিত্র—জালু ও কাঙ্গ-ভাঙ্গার চরিত্রের মধ্যে জালুর চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকারের দৃষ্টিশক্তির পরিচয় মিলে। জালুর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, তাহার পত্নীপ্রেম। ঢেঙপাড়ীর জ্বরের জন্য তাহার উদ্বেগের মধ্যে তাহার পত্নীপ্রেমের পরিচয় পাই। ঢেঙপাড়ী যে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইতে পারে, এ সন্দেহ সে করে নাই। সে যে অধিকারী ডাকাইয়া ঝাড়-ফুঁকের বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহা স্ত্রীর অবৈধ প্রণয় রোধ করিবার জন্য নহে, স্ত্রীকে আরোগ্য করিবার জন্য। জালুর চরিত্রের অপর দিক হইল, অপত্যস্নেহ। চেরকেটুকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া সে-ই অপত্যস্নেহে লালন করিত। তাহার চরিত্রের উদারতার পরিচয় পাই স্ত্রীর অবৈধ প্রণয়ী কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে ক্ষমা করিবার মধ্যে। এই ক্ষমা ক্লীবত্বে পরিণত হইত, যদি তাহার চরিত্রে অপত্যস্নেহ, পত্নীপ্রেম ও সারল্য না থাকিত।

কাঙ্গ-ভাঙ্গার চরিত্রের মধ্যে বিশেষত্ব তেমন কিছু খুঁজিয়া পাই না। তবে, অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে তাহার ধৈর্য ও দ্বিধা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ঢেঙপাড়ীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে সে কখনই সক্রিয় ভূমিকা লয় নাই। সে যাহা করিয়াছে, তাহা বেশ দ্বিধা লইয়া, ঢেঙপাড়ীর কথা অনুযায়ীই করিয়াছে। ঢেঙপাড়ী যখন তাহার উদগ্র দৈহিক ক্ষুধা লইয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিয়াছে,—কাঙ্গ-ভাঙ্গা তখনও ভুলে নাই যে ঢেঙপাড়ী তাহার গুরু-পত্নী এবং তাহার সহিত অসদাচরণে বিপদ ঘটিতে পারে। শেষ দৃশ্যে যখন সকল ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন কাঙ্গ-ভাঙ্গা বলিয়াছে,—'এইলা পাকত, ফেলাইল্ মোক গুরুজীয়ানী মাও'। বস্তুত নাটকখানির প্রধান বিষয় অবৈধ প্রেম। কিন্তু এই অবৈধ প্রেমের জন্য কাহাকেও নিন্দা করিতে পারি না। ঢেঙপাড়ী কেন নিন্দার্হ নয়, উপরে তাহার কারণ বলিয়াছি। এখন কাঙ্গ-ভাঙ্গার দোষ-গুণের বিচার করিতে বসিয়াও দেখিতেছি, তাহারও খুব একটা দোষ নাই। কাহাকেও 'ভিলেন' রূপে অঙ্কিত না করিয়া, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নাটকের মধ্যে এইরূপে রূপায়িত করিবার মধ্যে কম কৃতিত্ব নাই।

কাহিনীর পরিণতিতে নাট্যকার একটি দুর্বলতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। তাহা হইল, কাহিনীর মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পরিণতি নাই, একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত

CENTRAL LIBRARY

করিয়া কাহিনী স্থির হয় নাই। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া একটি যুবক ধরা পড়িল এবং সে চলিয়া গেল—এইটুকুই কাহিনীতে পাই। কিন্তু, তাহাতে ঢেঙপাড়ী ও কাঙ্গ-ভাঙ্গার মানসিক দিকটি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে পরিবর্তিত হইল অথবা এই ঘটনা তাহাদের মনে কি প্রভাব ফেলিল, নাট্যকার সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফলে, কাহিনীর বিষয়বস্তু হইয়াছে এই : অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইলে এইরূপ ধরা পড়িতে হয় এবং এই বর্ণনা এমন ভাবে করা হইয়াছে যে, হাস্যরস উদ্রেক ও পাপীর শাস্তি বিধানই যেন নাটকের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে গুরুতর সমস্যাটি নাটকের মধ্যে সংহত আকারে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছিল, একটি খেলো ও সস্তা ঘটনার মাধ্যমে তাহার সমাধান করা হইয়াছে।

কিন্তু, এই নিন্দা বোধ হয় আমাদের করা উচিত নয়। লোক-নাট্যের মধ্যে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের পূর্ণতা ও সূক্ষ্মতা থাকিবে কেমন করিয়া। এই অপূর্ণতা ও স্থূলতাই তো লোক-নাট্যের বৈশিষ্ট্য। যৌন-ক্ষমতাহীন স্বামীর যুবতী স্ত্রীর পক্ষে পর-পুরুষের সহিত যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া কতোদূর স্বাভাবিক ও সঙ্গত,—সমস্যার এই রূপটি অনেকটা আমরাই কল্পনা করিয়া লইয়াছি মাত্র,—নাট্যকারের বোধ হয় বিষয়টিকে সমস্যা হিসাবে দেখিবার বাসনা ছিল না ; একটি কলঙ্ক-কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়াই হয়তো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই উহার পরিণতি আমাদের আশানুরূপ না হইয়া নাট্যকারের উদ্দেশ্যানুরূপ হইয়াছে। সুতরাং এই দিক হইতে বিচার করিলে নাট্যকারকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শেষ দৃশ্য ব্যতীত সমগ্র নাটকখানির কাহিনী-বয়ন, ঘটনা-সন্নিবেশ এবং চরিত্র সৃজনের মধ্যে একখানি সমস্যামূলক নাটকের আভাস পাওয়া যায়। শেষ দৃশ্যে নাট্যকার যদি শেষ রক্ষা করিতে পারিতেন এবং একটি সংহত রসময় সিদ্ধান্তে বা পরিণতিতে কাহিনীর চরিত্রগুলিকে আনিয়া ফেলিতেন, তবে একখানি মনোরম নাটক পাওয়া যাইত।

বর্তমান পালাখানি খাস পাঁচালির শ্রেণীভুক্ত। খাস পাঁচালির লক্ষণগুলি উহার মধ্য দিয়া উদাহৃত হইয়াছে। অবৈধ প্রণয়ের একটি কলঙ্কময় কাহিনী ইহার বিষয়। কাহিনীর চরিত্রগুলির নামও কাল্পনিক। যেমন 'কাঙ্গ-ভাঙ্গা', অর্থাৎ ভার বহিয়া কাঁধ ভাঙ্গিয়াছে যাহার ; 'ঢেঙপাড়ী'—ঢঙ দেখাইয়া

CENTRAL LIBRARY

বেড়ায় যে। এইরূপ, কাঙ্গ-ভাঙ্গার পিতার নাম 'না-ঢেঙ্গা'। এই সমস্ত নামগুলির মধ্য দিয়া বেশ বুঝা যায়,—কলঙ্ক-কাহিনীকে নাট্যরূপ দিবার জন্য কতকগুলি কাল্পনিক ও হাস্যকর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে লোকনাট্য রূপেও রচনাটির মূল্য বাড়িয়াছে।

বোষ্টম-অধিকারীর মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। উপচারের অভাবে যেদিন পূজা দেওয়া হইল না, সেদিন পেটুক 'বৈষ্টমের' উক্তি ও খাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ অনাবশ্যকরূপে বাড়ানো হইয়াছে। তাহাতে কাহিনীর গতি ব্যাহত হইলেও, হাস্যরস পরিবেশনের সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। পূজা হইল না, কাজেই 'বৈষ্টমের' প্রসাদ পাওয়া হইল না। ক্ষুধায় তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। দৈ-চিঁড়ার ফলার খাইবে বলিয়া সে না খাইয়া আসিয়াছে, অথচ সে কিছুই খাইতে পারিল না। পরিশেষে যখন দুধহীন চা নুন দিয়া খাইতে চাহিয়াও না পাইয়া শুধু মুখে ফিরিয়া গেল, তখন হাস্য ও করুণ উভয় রসেরই বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু ইহা নাটকের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। তবে, এই অনাবশ্যক হাস্যরসই ইহার বৈশিষ্ট্য।

'গুলাপীশ্বরীর পালা'-তে 'বাজে লোকে'র ভূমিকা ছিল না। এ পালাতে 'বাজে লোকে'র ভূমিকা আছে।

নাটকখানিতে একটি 'ফাঁস গান'-ও আছে। পালাটিয়া গানের মধ্যে 'ফাঁস গান' দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। এক ধরণের 'ফাঁস গান' আছে, যে গুলি নিছকই গান, নাট্য-কাহিনীর সহিত সেই সকল গানের কোনোই সম্পর্ক নাই; কাজেই উহার কোনো অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা নাই। এই ধরণের 'ফাঁস গান' দুই দৃশ্যের মধ্যে দেওয়া হয়। আর এক ধরণের 'ফাঁস গান' আছে, যে গুলিকে নাটকের কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের সহিত সম্পৃক্ত বলা যায় এবং নাটকের মধ্যে উহাদের একটি ভূমিকাও থাকে। সাধারণত নাটকের নায়ক বা নায়িকা যখন গভীর সমস্যায় পীড়িত হইয়া পথ চলিতেছে অথবা আনমনে বসিয়া আছে কিংবা আসর হইতে তাহাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিয়া বাজে-লোক এই 'ফাঁস গান' গাহিয়া থাকে। ফাঁস গানের গায়ককেও 'বাজে লোক' বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ধরণের ফাঁস গানের 'বাজে লোক' যেন যাত্রাগানের 'বিবেকের' ভূমিকা লইয়া থাকে।

CENTRAL LIBRARY

বর্তমান পালাটিতে যে ফাঁস গান আছে, তাহা উপরোক্ত দুই ধরণের ফাঁস গানের মিশ্রণ। অর্থাৎ উহার প্রথমার্ধ নিছকই গান, নাটকের সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয়ার্ধে—জালু দেউনিয়া যখন শামুক পাস্তিয়ারের বাড়ী চলিয়াছে, তখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, মিথ্যাই তুমি বিবাহ করিয়াছ। তোমার স্ত্রী-ই তোমার জীবনে তোমার অশান্তির কারণ হইবে।

নাট্য-রীতির দিক দিয়া বিচার করিলে, গুলাপীশ্বরীর পালার তুলনায় বর্তমান পালাটিকে অনেকটা অনাধুনিক বলিয়া মনে হয়। ইহাতে অঙ্ক বিভাগ বা দৃশ্য বিভাগ নাই। কাহিনীটি এক ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অনাধুনিক রীতি আশ্রয় করিবার দরুণই ইহার বাঁধুনিও 'গুলাপীশ্বরীর পালা'র তুলনায় আল্‌গা। নাটকের শুরুতেই 'বাজেলোকের' সহিত কাঙ্গ-ভাঙ্গার আলাপ ও বৈষ্ণব-ঠাকুরের লোলুপতার জন্য ইহাতে খানিকটা অসংলগ্নতা দেখা যায়। শেষ দৃশ্যে ধানের বস্তার মধ্য হইতে কাঙ্গ-ভাঙ্গার আবির্ভাব জালু দেউনিয়ার নিকট অপ্রত্যাশিত হইলেও, দর্শকের নিকট তাহা অপ্রত্যাশিত নয়। কেননা, দর্শক বরাবর দেখিতেছে,—কাঙ্গ-ভাঙ্গাই ঢেঙপাড়ীর প্রণয়ী, দর্শকদের সম্মুখেই কাঙ্গ-ভাঙ্গা যাইয়া ধানের বস্তার মধ্যে লুকাইয়াছে এবং ঢেঙপাড়ীর এই জর অভিনয় মাত্র। কাজেই 'গুলাপীশ্বরীর পালা'র মতো এই পালাতে নাট্য-চমৎকৃতি তেমন নাই। অবশ্য এই স্থূল নাটকীয়তার মধ্যেই লোক-নাট্যের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে।

পালাটির গানগুলি সুরচিত এবং সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবার ফলে নাটকীয় সার্থকতার মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানই নাট্য-সংলাপের ভূমিকা লইয়াছে॥

॥ ৬ ॥

॥ মান পাঁচালি : মুকচাটু গঁসাইয়ের পালা ॥

'মান পাঁচালি'-র মধ্যে কাহিনীর ভাগ অল্প, তর্কালোচনাই ইহাতে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। আলোচ্য পালাটির মধ্যে যেটুকু কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা এই :

হেদেলী ও মালতীশোরী মা ও মেয়ে। গ্রহের ফেরে উভয়েই বিধবা।

CENTRAL LIBRARY

যুবতী বয়সেই বিধবা হইবার ফলে মালতীর নিজের মনেও সুখ নাই। একদিন হেদেলী তাহার কন্যা মালতীকে ডাকিয়া কহিল, মেয়ের বৈধব্য সে আর সহ করিতে পারিতেছে না। বাড়ীতেও অপর কোনো পুরুষ নাই। কাজেই সে ঠিক করিয়াছে, বিধবা মেয়ের জন্য একটি 'ডাঙ্গুয়া' আনিবে অর্থাৎ তাহার পুনরায় বিবাহ দিবে। রাজবংশী সমাজে বিধবা বিবাহ চলিত আছে। যে পুরুষ বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য হাতে একটি যষ্টি বা 'ডাং' লইয়া বিধবার গৃহে বসবাস করিবার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে আগমন করে, তাহাকে বলে 'ডাঙ্গুয়া'।

বিবাহে মালতীর কোনই আপত্তি ছিল না। বরং বিবাহ না হইবার জন্য যৌবন-বেদনায় সে কাতর হইয়া থাকিত। মায়ের নিকট বিবাহের কথা শুনিয়া মালতী খুব খুশি হইয়া উঠিল।

মালতীর দূর সম্পর্কের এক ভগ্নীপতি ছিল। সম্প্রতি সেই ভগ্নীর মৃত্যু হওয়াতে ভগ্নীপতি বিপত্নীক হইয়াছে। তাহার নাম মুকচাটু। হেদেলী কহিল, এই মুকচাটুকেই সে তাহার কন্যার 'ডাঙ্গুয়া' রূপে মনোনীত করিয়াছে। শুনিয়া মালতী আর এক দফা খুশি হইল।

এই প্রকার স্থির করিয়া হেদেলী একদিন গ্রামান্তরে মুকচাটুর বাড়ীতে গেল। বিপত্নীক মুকচাটু সংসার-ধর্ম ছাড়িয়াছে। সে ভিক্ষা করিয়া খায়, ঝোলা-মালা সম্বল করিয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছে। গৃহী মুকঁচাটু গোঁসাই বনিয়া গিয়াছে।

হেদেলী যাইয়া দেখিল, জামাই তাহার ফোঁটা কাটিতেছে। মুকচাটুর মুখেই শুনিতে পাইল, স্ত্রী-পুত্র মরিবার ফলে সম্প্রতি সে বৈষ্ণব সাজিয়াছে, একবেলা আহার করে, মাছ-মাংস খায় না এবং নারী-সঙ্গ করা দূরে থাক, নারী-দেহ স্পর্শ করিলেও সে স্নান করে।

এইসব শুনিয়াও হেদেলী নিরাশ হইল না। সে স্পষ্টই বলিল, মালতী-শোরী মুকচাটুকে দেখিতে চায়,—একদিন সে যেন তাহাদের বাড়ীতে যায়। তাহা ছাড়া, তাহাদের বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহই নাই। ভারত-বাঙলাদেশের সীমান্তে তাহাদের বাড়ী। এইজন্য সর্বদাই তাহারা ভয়ে-ভয়ে দিন কাটায়। কিন্তু মুকচাটুর সেই এক কথা,—সে নারীর মুখ দেখিবে না, ধন-সম্পত্তিতে তাহার কাজ নাই।

CENTRAL LIBRARY

অগত্যা নিরাশ হইয়াই হেদলীকে বাড়ী ফিরিতে হইল। মায়ের মুখে সব শুনিয়া মালতী কহিল, জামাইবাবু মন্ত্র লইয়া বৈষ্ণব সাজিয়াছে, আমিও মন্ত্র লইয়া বৈষ্ণবী সাজিব, তাহা হইলেই সব গণ্ডগোল চুকিয়া যায়। এই বলিয়া তাহার মাকে শিখাইয়া দিল, ছলনা করিয়া না আনিলে মুকচাটু তাহাদের বাড়ীতে আসিবে না। হেদেলী যাইয়া বলুক, তাহাদের বাড়ীতে 'বৈষ্ণব-সেবা' করা হইবে, মুকচাটু যেন তাহাতে উপস্থিত থাকে।

কথামতো হেদেলী যাইয়া মুকচাটুকে 'বৈষ্ণব সেবা' গ্রহণ করিবার জন্ত সাদর নিমন্ত্রণ জানাইল। মুকচাটু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া মা ও মেয়ে এক যুক্তি করিল। হেদেলী তাহার কন্যা মালতীকে শিখাইয়া দিল, সে যেন সুযোগ বুঝিয়া মুকচাটুর পায়ে জল ঢালিয়া দেয়। কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের পায়ে জল ঢালিয়া দেয়, তবে তাহা বিবাহের শামিল হইয়া যায় বলিয়া রাজবংশী-সমাজে বিশ্বাস করা হয়।

ইতিমধ্যে মুকচাটু আসিয়া উপস্থিত হইল। হেদেলী আসিয়া জানাইল, বিশেষ একটি গণ্ডগোলে আজ 'বৈষ্ণব সেবা' করা হইবে না। মুকচাটু আজিকার রাত্রিটা এই বাড়ীতেই থাকুক, কাল সকালে 'বৈষ্ণব সেবা' করা হইবে। শুনিয়া মুকচাটু গোঁসাই গোসা করিল। তাহার অন্ত এক জায়গায় 'সেবা' গ্রহণ করিবার কথা ছিল।

এই সময় প্রবেশ করিল মালতী। সে আসিয়া কহিল, জামাইবাবু, অনেকদিন পর আজ আসিয়াছ, থাক, দুই জনে মিলিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলি। মুকচাটু জানাইল, সে ব্রহ্মচারী, তাহার 'মাতাজী'-র দরকার নাই।

ইহার পর মালতী মুকচাটুর আহারের জন্ত ঠাঁই করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু নারীর করিয়া দেওয়া ঠাঁইতে ব্রহ্মচারীকে খাইতে নাই। এই সময় মালতী যাইয়া মুকচাটুর ঝোলাটি কাঁধে লইল। দেখিয়া মুকচাটু হা হা করিয়া উঠিল। মালতী বলিল, ঝোলাটি স্পর্শ করিলেই কি উহার জাতি যাইবে। তাহা ছাড়া, মালতী ঝোলাটি ঘাড়ে করিয়া তালিম দিয়া দেখিতেছে,—তাহাকে 'মাতাজী' রূপে কেমন শোভা পাইবে। মুকচাটু তখন ক্রুদ্ধ হইয়া মালতীর নিকট হইতে ঝোলাটি কাড়িয়া লইতে গেল। সুযোগ বুঝিয়া এই বার মালতী মুকচাটুর পায়ে জল ঢালিয়া দিয়া কহিল, 'তোর ঠেঙত্ জল

CENTRAL LIBRARY

ঢালিহু। আজি হাতে তোক স্বামী বরণ করিহু'। এই বলিয়া মালতী একখানা প্রেমের গান গাহিয়া ফেলিল।

রাগে-দুঃখে মুকচাটু কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ব্রহ্মচর্য সাধনা মালতী আজ বিফল করিয়া দিল। দুঃখে সে গান গাহিয়া বলিল, 'আজি হাতে ঘুচি' গেল্ ব্রহ্মচারী'।

তখন মালতী আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, মুকচাটু যে ব্রহ্মচর্যের এতো বড়াই করিতেছে, সেই ব্রহ্মচর্যের অর্থ কি?

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক কাহিনীর শেষ এইখানেই। ইহার পরই মুকচাটু-মালতীশোরীর মধ্যে তর্কালোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং সেই তর্কই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। মালতীশোরীর প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, সাধনার ক্ষেত্রে নারীই প্রধান সহায়ক। মুকচাটুর প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

যাই হউক, মালতীর প্রশ্নের উত্তরে মুকচাটু জানাইল, 'ব্রহ্মাকে জানিবার বাদে ব্রহ্মচারী। বিষ্টুকে জানিবার বাদে বৈষ্টম।...ব্রহ্মাকে জানিলে তার উপর আর বস্তু নাই। নারীকে নিবা' থাক, মুখ দেখিতে নাই।'

মালতী উত্তর দিল, 'নারী হইল্ আসল গুরু, কহচে ভাগবত।' 'বৈষ্টম কি হয় খালি নাল কাপেড়া দিলে ঘাড়ত্? নারীর প্রেমে জগৎ বাঁধা; শ্রীগুরু হয় শ্রীমতী রাধা।' মন্ত্র নিলে মাইয়ার হাতে মহাজনে থায়'। 'মাইয়া হাতে হইচে এ দুনিয়াই'। 'নারী ছাড়া নাই হর-হরি। নারী নোকটা আইনমতো অনাদি ঈশ্বর; নারীটায় তো ব্রহ্মার ঘর।' 'কলিযুগে নিমাই চান...কিষ্টো নামে পাগল হয়া ধরিল্ রাধার ভাব।' 'স্ত্রী-পুরুষ এক দেহা... দুই দেহায় এক দেহা হলে ভগবান করে দয়য়া। দুই দেহায় এক দেহা হও, হরিনাম মন্ত্র কও...যুগল হবা' না পারিলে দেহার নাইরো মুক্তি... স্ত্রী-পুরস এক; দুই জনাতে প্রেম হয়—শাস্ত্র খুলি দেখ।'

মুকচাটু বলিল, 'শাস্ত্রে বলে মাইয়া নোকটা নরকের দ্বার; মাইয়া নোকটা খোভে বাতুল হরি সাধনার।...হরিকে লাভ করিবা' একায় সাধন কর;... নারীকে সঙ্গে রাখিয়া সাধন হোবে নাই।' 'ময়হা জালা বড়ো জালা, ময়হাতে হয় পাপ; ময়হাতে মজিলে হরি হোবা' না হয় লাভ।'

CENTRAL LIBRARY

মালতী তখন বুঝাইয়া বলিল, 'তুই বুঝিবা' পারিস্ নাই,—স্ত্রী-পুরুষ দুই ঝনে সমান হওয়া চাই। যেমন ছিল রাধা, দনো ঝনে হিষ্ট-পিষ্ট, কাম-বাসনা নাই।...মাইয়া হইল্ প্রেমের গুরু, অয়হে বাঞ্ছা কল্পতরু;...নারীকে কর বশ, সাধন কর পঞ্চরস। না করিয়ো কাম,—তবে সে যাইতে পার মহানিত্যধাম।'

মালতীর এই কথা শুনিয়া মুকচাটু তখন প্রশ্ন করিল, বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে নারীর যদি এতোই প্রয়োজনীয়তা থাকে, 'মাইয়া ছেড়িয়া সন্ন্যাস কিতায় হইল্ নিমাই?'

উত্তরে মালতী কহিল, 'ভগবানের অন্ত লীলা বুঝা বড়ো ভার।...তাঁয় হইল্ আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান; শচীর গর্ভে জন্ম নিয়া হইল্ নিমাই চান্। রাধা হইল্ বিষ্টপ্রিয়া, কিষ্টো হইল্ নিমাই; দনো ঝনে ছাড়া-ছাড়ি তিলমাত্র নাই।'

মালতীর এই যুক্তির নিকট মুকচাটু পরাভূত হইয়া তাহার 'ভাসুয়া' হইতে সম্মত হইল। এইখানেই কাহিনীর সমাপ্তি সূচিত হইয়াছে॥

॥ ৭ ॥

উপরের কাহিনী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের প্রতি নাট্যকার কোনোপ্রকার দৃষ্টি দেন নাই; তর্কালোচনার নাট্যরূপ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং করিয়াছেনও তাহাই।

নাটকটির মধ্যে সুস্পষ্ট দুইটি ভাগ আছে। ইহার প্রথম ভাগে একটি সামাজিক কাহিনীর নাট্যরূপ পাওয়া যায়। হেদেলী-কর্তৃক মুকচাটুকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন এবং মালতী-কর্তৃক মুকচাটুর পায়ে জল ঢালা পর্যন্ত এই নাটকের প্রথম ভাগ। এই পর্যন্ত একটি সামাজিক কাহিনী সুন্দর রূপে রূপায়িত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই সামাজিক কাহিনীর নাট্যরূপ দান নাট্যকারের অভিপ্রেত ছিল না। তাই সেই কাহিনীর চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করিয়া এবং সেই কাহিনীর পটভূমিকাতেই নাট্যকার সম্পূর্ণ নতুন এক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা নাটকের দ্বিতীয়াংশের সূচনা করিয়াছে। চরিত্রগুলির নাম ব্যতীত নাট্যকাহিনীর প্রথমাংশের সহিত দ্বিতীয়াংশের কোনোই সম্পর্ক নাই। কিন্তু এইজন্য নাট্যকারকে দোষ দিতে পারা যাইবে না। মনে রাখিতে

CENTRAL LIBRARY

হইবে, নাটকটি মূলত 'মান পাঁচালি', সুতরাং 'মান পাঁচালি'-র দৃষ্টিকোণ দিয়াই ইহার বিচার করিতে হইবে।

কাহিনীর প্রথমাংশের নায়ক-নায়িকার রক্ত-মাংসের গড়া মানব-ভাব দ্বিতীয়াংশের তত্ত্ব-ভাবের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানে-স্থানে প্রথমাংশের মালতীশোরী যেন দ্বিতীয়াংশের তর্কালোচনার মধ্যেও জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই দেখা যায়,—সাধনার ক্ষেত্রে নারীর প্রয়োজনীয়তার শাস্ত্রীয় নজির উল্লেখ করিতে করিতে হঠাৎ পুরুষের জীবনে নারীর অন্যান্য আধি-ভৌতিক প্রয়োজনীয়তার কথাও মালতীশোরী উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছে। মালতী বলিয়াছে, বিবাহ না করিলে সন্তান হইবে না, সন্তান না হইলে মুখে আগুন দিবার কেহ থাকিবে না,—অসুখ-বিসুখ হইলে পুরুষের পরিচর্যা করিবারও কেহ থাকিবে না। শাস্ত্রীয় নজির উল্লেখ করিতে করিতে এই বাস্তব প্রয়োজনীয়তার উল্লেখে রীতিমতো রসভঙ্গ হইয়াছে; মালতী যে আদর্শে বিশ্বাস করে, সেই আদর্শের দুর্বলতা সূচিত হইয়াছে। নাট্যকার যখন ইচ্ছা করিয়াই কাহিনীর দুইটি অংশকে পৃথক রাখিতে চাহিয়াছেন, তখন প্রথম অংশের মালতীর দ্বিতীয় অংশের মালতীর মধ্যে প্রক্ষেপ শোভন ও সঙ্গত হয় নাই। যদি নাট্যকার উভয়াংশের মধ্যে নিবিড় যোগ রাখিতে পারিতেন, তবে মালতীর এই উক্তি নাট্য-সুষমা মণ্ডিত হইতে পারিত।

মুকচাটুর চরিত্রের সম্পর্কে কিছু বলিবার নাই।

নাটকটির গানগুলি সুন্দর,—গান দিয়াই অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের কাজ করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

নবম অধ্যায়

। ইতর প্রাণী ও মানুষ ।

॥ ভাওীখেলী ও বাঘনাচানি ॥

॥ ১ ॥

বাঘ-ছাগল-সাপ-বাঁদরের মতো প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে ভালুকও নাচানো হইয়া থাকে। ভালুককে এই অঞ্চলের উপভাষায় বলা হয় 'ভাওী'। ভালুককে নাচানো বা খেলানো হয় যে গান দ্বারা তাহাকেই বলে 'ভাওীখেলীর গান'।

ভাওীখেলীর গান জলপাইগুড়ি জেলায় সর্বত্র চালু নাই। সাধারণত যে সকল অঞ্চল অরণ্যের সন্নিহিত, সেইসকল স্থানেই ইহার প্রচলন লক্ষ করা যায়। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা হইতে আরম্ভ করিয়া জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা পর্যন্ত এই গান সর্বাধিক গীত হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ী-ফালাকাটা, শিকারপুর-বেলাকোবা অঞ্চলে পেশাদার ও শৌখিন উভয়রূপেই এই গান গাওয়া হয়। তিস্তার পূর্ব পারে অর্থাৎ ডুয়ার্স অঞ্চলে ভাওীখেলীর গানের হদিশ পাই নাই।

ভাওী খেলা হয় দুইরূপে। এক সত্য-সত্যই ভালুককে গান গাহিয়া নাচানো হয়। সাধারণত পেশাদার ব্যক্তিরাই এই ভাবে হাটে-বাজারে বা বাড়ী-বাড়ী ভালুক নাচাইয়া জীবিকার্জন করিয়া থাকে ইহার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নাই।

দ্বিতীয় আর এক রূপে ভালুক নাচানো হইয়া থাকে। বর্তমানকালে শৌখিনতাই এই ধরণের ভালুক নাচানোর প্রেরণা জোগাইয়া থাকে। পাট ও তৃণাদি বিচিত্র রঙে রঙ করিয়া লইয়া তাহা দিয়া মানুষেরাই ভালুক সাজিয়া নাচিয়া থাকে। ভালুক-খেলার মাধ্যমে এইভাবে অঞ্চল বিশেষে আমোদ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু অতীতে ইহা যে এক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল, তাহা দুরনুমেয় নহে।

ভালুক-খেলারও বিভিন্ন দল থাকে। এইসকল দলের মধ্যে একজন রঙীন পাট ও তৃণাদি দ্বারা ভালুক সাজিয়া লয়। তারপর কয়েকজন গান গায়, ভালুক-সাজা মানুষ সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া থাকে।

মানুষ যখন পশুর বেশ ধরিয়া নাচে, তখন সেই পশু-রূপী মানুষকে নাচাইবার গানের মধ্যেও মানবিক ভাব আরোপিত হইয়া যায়। গানের সঙ্গে যে নাচিতেছে, অন্তরে সে মানুষ, কিন্তু বাহিরে পশু—এইজন্য ভাওীখেলীর গানের মধ্যে মানুষ ও পশুর কথা প্রায় সমান-সমান।

মানুষের কেন ভালুক সাজিয়া নাচিবার সাধ জাগিল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। অনেক আদিম সমাজে ভালুককে 'টোটেম' রূপে দেখিবার প্রথা আছে। মনে হয়, ভাওীখেলী মূলত সেই লোক-সমাজের গান, যে সমাজে ভালুককে 'টোটেম' রূপে বিবেচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আমবাড়ী-ফালাকাটা অঞ্চলের অনেক অধিবাসী অরণ্যে ভালুক মরিলে অশৌচ পালন করিয়া থাকে॥

॥ ২ ॥

ভাওীখেলীর গানগুলি ছোটো ও বড়ো দুই প্রকারই হইতে পারে। ইহার গানের বিষয়বস্তুও কিছু নির্দিষ্ট নহে। দুঃখের বিষয়, ভাওীখেলীর পালাগান-গুলি জোগাড় করা সম্ভব হয় নাই।

শুনিয়াছি, ভাওীখেলীর পালাগানগুলি বেশ সুন্দর। ভাওীখেলীর একটি পালাগানের কাহিনী এইরূপ :

এক স্থানে স্বামী-স্ত্রী গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতেছিল। একদিন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যাইবার সাধ জাগিল। স্ত্রীর বাসনার কথা শুনিয়া স্বামী তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিতে রাজী হইল না। শেষে স্ত্রীর অনেক অনুরোধে স্বামী রাজী হইল। কিন্তু, স্বামী শর্ত করাইয়া লইল, স্ত্রী একদিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইয়া সেইদিনই সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরিয়া আসিবে। স্ত্রী সেই শর্তে রাজী হইয়া পিত্রালয়ে চলিল। সেখানে যাইয়া দেখে, তাহার মা তাহার জন্য দৈ-ক্ষীর-সর-ননী তৈরী করিয়া রাখিয়াছে। মা মেয়েকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না, মেয়েরও মা-কে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। মেয়ে তখন সূর্যদেবকে অনুরোধ জানাইল, সেদিনের জন্য একটু দেরি করিয়া ডুবিতে। সূর্য রাজী হইলেন। মেয়ে তখন মায়ের দেওয়া দই-ক্ষীর খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে তাহার অনেক দেরি হইয়া গেল,—রাগিয়া সূর্যদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন—তুমি ভালুক হইয়া বনে বাস কর। সূর্যদেবের অভিশাপেই আজো ভালুকেরা

CENTRAL LIBRARY

উইপোকা খাইয়া থাকে, কেননা উইপোকা টিপিলে দুধের মতো একপ্রকার পদার্থ বাহির হয়।

কাহিনীটির মধ্যে ভালুকের জন্ম-কাহিনী বলা হইয়াছে। কাহিনীটি একটি myth হইয়া উঠিয়াছে এইজন্য। ইহার অন্তর্নিহিত মানবিক রসটি সত্যই মনোরম। সধবা নারীর পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষা এবং মায়ের অপত্যস্নেহের সুন্দর নিদর্শনরূপে কাহিনীটি মনে রাখিবার যোগ্য।

ভাওীখেলীর পালাগানগুলির মধ্যে অপর এক ধরণের কাহিনী হইল,—ভাওীখেলীর গানের প্রস্তুতি-পর্বের বর্ণনা। অর্থাৎ, পাট রঙ করা হইতেছে, রঙ করিয়া রৌদ্রে শুকানো হইতেছে,—এই উদ্যোগপর্বটিও কোনো কোনো সময় গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হয়॥

॥ ৩ ॥

ভাওীখেলীর খুচরা গানগুলি বিচিত্র ব্যাপার লইয়া রচিত হইতে পারে। এইসকল খুচরা ভাওীখেলীর গানগুলির ছন্দ অনেকটা ছড়ার মতো। বিষয়-বস্তুর মধ্যেও স্থানে স্থানে ছড়ার প্রভাব আছে।

৩৫৪-সংখ্যক গানে ভালুকের নাচার কথা বলা হইতেছে। ছোটো মাছ ও বেগুনের তরকারি খাইয়া ভালুক নাচিতেছে। সমগ্রভাবে বিচার ক'রলে গানটির কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থ নাই। ইহা যেন একটি বিশিষ্ট ছন্দ তৈরির খাতিরে কতকগুলি কথা পর-পর সাজাইয়া লইয়া গান গাহিয়া যাওয়া। কিন্তু এই অর্থহীন শব্দ-সমষ্টির মধ্যে এমন এক যাদু-রহস্যের অস্তিত্বের কল্পনা করা হইয়াছে, যাহাতে তাহা মন্ত্র-ধর্মী হইয়া পড়িয়াছে,—যে মন্ত্র ভালুক নাচাইবার জন্য আবশ্যক। ৩৫৪খ-সংখ্যক গানেও এই একই রীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। ধানের ক্ষেতে প্রচণ্ড কুয়াশা পড়িয়াছে, ভালুক ও ভালুকনী সেখানে লীলা করিতেছে। পরবর্তী গানে প্রসঙ্গসূত্রবিহীন অপর চারটি সারি পাই; নির্দিষ্ট একটি ভাব প্রকাশ অপেক্ষা একটি ছন্দ প্রকাশই সেখানে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

৩৫৪ক-সংখ্যক গানখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভালুককে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, জঙ্গলের চতুর্দিকে শিকারি আসিয়াছে, ওগো ভালুক, তখনই তোমাকে বলিয়াছিলাম

CENTRAL LIBRARY

এই জঙ্গল ছাড়িয়া যাইতে। তুমি যাও নাই, তাই শিকারির হাতে তুমি আজ বন্দী হইয়াছ। যে ব্যক্তি পশুকে বন্দী করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বন্দী-দশায় পশুকে সমবেদনা জানাইতেছে। বন্দী পশুকে এই সমবেদনা জ্ঞাপন মৈষালি ও বিরুয়া গানেও লক্ষ করা যায়।

৩৫৪গ-সংখ্যক গানটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। গানটির মধ্যে ভাওী-খেলীর পালাগানের ছাপ আছে। খুচরা ভাওীখেলীর গানের মতো ইহাতে ছড়ার প্রভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে। বিষয়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, পশুকে উদ্দেশ করিয়া গীত হইলেও, যে ব্যক্তি ভালুক নাচাইতেছে, তাহারই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে।

প্রথমে প্রসঙ্গ ও প্রায় অর্থহীন একটি স্তবক গাহিয়া ভূমিকা করা হইয়াছে। ইহার পর প্রবেশ করিল ভালুক। সে আসরে আসিয়া শুইয়া পড়িল, কেননা তাহার জ্বর হইয়াছে। তখন একটি ছড়ার ছন্দে অর্থহীন মন্ত্র উক্ত হইল। এই মন্ত্র ছড়া-ধর্মী। ইহা বলিবার সময় ভালুক জ্বরের অভিনয় করিয়া শুইয়া থাকে। ভালুকের এই প্রবেশ ও অভিনয়ের মধ্যে পালাগানের ছাপ আছে। ইহাতে বর্তমান রচনাটিকে Folk-drama রূপেও নির্দেশ করা যায়।

ভালুকের মনিব মন্ত্র বলা শেষ করিয়া ভালুকের কানে কানে বলে, তাহার জ্বর সারিয়াছে কিনা। মানুষের মতোই মাথা নাড়িয়া ভালুক বলে, তাহার জ্বর সারিয়াছে, সে এইবার নাচিবে।

নাচের গানে ভালুকের মনিব গায়, ওরে বুড়া ভালুক, চল্ হাটে যাইয়া নাচ-গান করি, তাহাতে অনেক পয়সা পাইব, আর আমাদের কোনো দুঃখ থাকিবে না। ভালুকের মনিবের দারিদ্র্য ভালুকের উপর আরোপিত হইবার ফলে করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

৩৫৪ ও ৩৫৪খ-সংখ্যক গান দুইটি মানুষকে ভালুক সাজাইয়া গাওয়া হয়। ৩৫৪ক ও ৩৫৪গ-সংখ্যক গান দুইটি পশু ভালুককে নাচাইবার গান। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে॥

CENTRAL LIBRARY

॥ ৪ ॥

ভালুকের মতো বাঘকেও নাচানো হয়। বাঘ নাচাইবার প্রথাও কেবল সেইসকল অঞ্চলে চলিত আছে, যে সকল অঞ্চল অরণ্যের সন্নিহিত। তাহা ছাড়া, বাঘ প্রভু-ভক্ত জীব নয়, সহজে পোষও মানিতে চাহে না। এই জন্য বাঘ নাচাইবার রীতি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

বর্তমান সংগ্রহের বাঘ-নাচানি গানটি (সংখ্যা ৩৫৫) আসলে বাঘ নাচাইবার গান হইলেও, যে ব্যক্তি বাঘ নাচাইতেছে, ইহা তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-কাহিনী। সে গাহে, বুড়া হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার বাঘের খেলা তুচ্ছ নহে। হায় রে, সবাই আমাকে বলিতেছে, হাটে-বাজারে যাইয়া বাঘের খেলা দেখাইতে।

গানটির ভাবের মধ্যে একটি বিরোধ দেখা যায়। একদিকে বলা হইতেছে, বুড়া হইলেও আমার বাঘের খেলা তুচ্ছ নয়। অপর দিকে, সেই বাঘের খেলা দেখাইতে হইবে বলিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। আসলে, যে বাঘের খেলা দেখাইতেছে, বার্ধক্য-জনিত তাহার অক্ষমতাই ইহাতে করুণ হইয়া ফুটিয়াছে। পশুকে নাচাইবার সময়, যে ব্যক্তি নাচায়, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-কারুণ্যের প্রকাশের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়॥

॥ ৫ ॥

বাঘ-নাচানোর প্রসঙ্গে আর দুই-একটি কথা বলি।

মানভূম জেলায় 'নাটুয়া নাচ' নামে এক প্রকার নাচ প্রচলিত আছে, বাঘের অনুকরণই ইহার মূল লক্ষ্য। "বাঘের মত দ্রুত সতর্ক ও সাবলীল লাফ-ঝাঁপ করতে পারাতেই নাটুয়ার কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। মূল বক্তব্য বাঘের অনুকরণ হলেও নাটুয়ারা ভল্লুক, কচ্ছপ ইত্যাদি অন্যান্য জীবজন্তুদের চালের অনুকরণও দেখায়। এই অঞ্চলের পাহাড়ী জঙ্গলে আগে খুব বাঘের উৎপাত ছিল। মনে হয় তার থেকেই এদের এই ধরনের নাচের চিন্তা মনে আসে।

CENTRAL LIBRARY

এ নাচে কেবলমাত্র লাফ ঝাঁপগুলোই বাঘের কথা মনে করায় তা নয়—কাঁধের ভঙ্গী এবং চোখের কাজও ঐ অনুকরণকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।”

“এঁরা পাঁচজন বীরকে এই নাচের ইষ্টদেবতা বলে মানে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ‘ব্যাঘ্রবীর’ বা ‘বাঘ দেবতা’। স্থানীয় লোকেরা সাধারণত বাঘ ও হাতীকে ঠাকুর বলে উল্লেখ করে। নাটুয়ারা বিশ্বাস করে যে যদি কেউ প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা ও অনুশীলন করে তবে রাত্রে ব্যাঘ্রবীর বাঘের ছদ্মবেশে এসে তার সঙ্গে নেচে তাকে বাঘের লাফ-ঝাঁপের গূঢ় কায়দাগুলো শিখিয়ে দিয়ে যায়। ব্যাঘ্রবীরকে পূজো দিতে হয় লাল পালকের মোরগ বলি দিয়ে।”…

“পুরণো দিনের দক্ষ নাটুয়াদের সম্পর্কে এই অঞ্চলে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী শোনা যায়।…সবাই নাটুয়া নাচের কথা উঠলে সবচেয়ে আগে ‘লগনসাঁই’-এর নাম করে।…

“নাটুয়ারা বলে যে যখন লগনসাঁই নাচতেন তখন সারা শরীরের সব পেশীর উপর তাঁর এত বেশি দখল ছিল যে যদি তাঁকে কোনো গভীর খানা-খন্দের সামনে নিয়ে গিয়ে আচমকা ধাক্কা মারা যেত তাহলেও তিনি পড়ে যেতেন না। ঠিক বাঘের সহাজাত সতর্কতা নিয়ে দ্রুত মস্ত ঝাঁপ দিয়ে সেটা পার হয়ে যেতেন। এই প্রসঙ্গে নাটুয়ারা বিশ্বাস করে যে যদি স্বয়ং বাঘও এসে লগনসাঁইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবুও লগনসাঁইকে হারাতে পারবে না।…”

নাটুয়া নাচের পোষাক এই রকম : “পোষাকটা একেবারেই সেলাইবিহীন। সরু সরু লম্বা কাপড়ের পাড় বা কাপড়ের ফালি দিয়ে গায়ের চারিদিক ঘিরে পাক দিয়ে শক্ত করে একটা গিঁট দেয়। এবং তারপর পাড়ের খানিকটা অংশ কিছুটা আগে ঝুলিয়ে রেখে কাপড়ের ফালিটার দু-প্রান্তের দুধারের হাতে গিঁট দিয়ে বেঁধে দেয়। তারপর প্রান্তগুলো হাতের থেকে ঝুলতে থাকে। এইভাবে একটির পর একটি পাড় দিয়ে প্রায় সারা শরীর এবং হাত ঢেকে দেয়। তা ছাড়া প্রসাধন হিসেবে মুখে আর গা-পিঠের খালি অংশে চুন বা মাটি দিয়ে নানা রকম দাগ কেটে নেয়। হাতে থাকে কাঠের ঢাল-তলোয়ার।”[১]

১ মানভূমির নাটুয়া নাচ : বিশাখা গুপ্ত রায় (লোক-সংস্কৃতি পত্রিকা : তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা)।

CENTRAL LIBRARY

এই চুন-মাটি দিয়া আপন অঙ্গে দাগ কাটিয়া লওয়া নিজেই বাঘের ডোরা দাগ আঁকিয়া বাঘ সাজিয়া লওয়া। বাঘ তখন এই বাঘকে আক্রমণ করিবে না অথবা বাঘের মতো এই মানুষ-বাঘও তখন শক্তি পাইবে। অনুকরণাত্মক যাদুরূপে ইহাকে গ্রহণ করা যায়। পাড়গুলিও বাঘের দাগকে নির্দেশ করে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ভালুক সাজিবার জন্যে যেখানে খড় ও পাট (রঙীন) ব্যবহৃত হয়, মানভূমে সেখানে বাঘ সাজিবার জন্ম পাড় ব্যবহৃত হয়।

'ব্যাঘ্র-বীরে'র প্রসঙ্গে রাঢ় সীমান্তের 'বাঘুত-বীরে'র কথা স্মরণ করা যায়। নৃতাত্বিক দিক হইতে বাঘ যে নানাভাবে বিচিত্র সংস্কার-বিশ্বাসের সহিত জড়িত, এই প্রসঙ্গে তাহাও মনে রাখিতে হইবে। কিশোরীলাল রায় তাঁহার 'দেবতত্ব' (নব্য ভারত : আশ্বিন, ১২৯৩। পৃ. ২৭৫) নামক প্রবন্ধে বঙ্গোপকূল পর্বতের 'খন্দ' নামক উপজাতিদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন : "বাঘের চামড়া ছুঁইয়া শপথ করিতে হয়। পরিবারের কাহাকেও বাঘে কামড়াইলে জাত যায়। ইহাদের পুরোহিতকে ডোমনা বলে। আহত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি ডোমনাকে দিলে জাতি যায় না।"

লোক-মানসে এক বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের সংমিশ্রণ খুব সহজেই হইয়া যায়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গেও দেখা যায়, বাঘের সহিত ভালুক মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভালুককে এই অঞ্চলের উপভাষায় বলে 'ভাওী'। তিস্তার পূর্বাঞ্চলে এবং কোচবিহারের অংশ বিশেষে বিজয়া দশমীর পরদিন 'ভাওানী' নামে এক দেবীর পূজা হইয়া থাকে। ইনি ব্যাঘ্র-বাহনা, কোনো অরণ্য দেবী। 'ভাওী' হইতেই ইনি 'ভাওানী' নাম পাইয়াছেন, যদিও বর্তমানে তাঁহাকে দেবী দুর্গার সহিত সংযুক্ত করিবার জন্ম নানা আধুনিক কিম্বদন্তীর সাহায্য লইতে দেখা যায়। সে যাহা হউক, 'বাঘ-নাচানী' ও 'ভাওী খেলী' যেমন সাদৃশ্যমূলক গান ও অনুষ্ঠান, তেমনি একই দেবীর মধ্যে বাঘ-ভালুক আসিয়া মিশিয়াছে। কিছু পরেই 'বিক্রয়া' গানের আলোচনায় দেখিতে পাইব, হাতীর সহিত কেমন করিয়া অন্যান্য পশু-পাখী মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহা বিশ্বের সকল দেশের লোক-মানসেরই বিশেষত্ব।

ব্যাঘ্র-দেবতা সম্পর্কে অন্যান্য বক্তব্য 'সোনারায়ের গান' লইয়া আলোচনা-কালে বলিয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

॥ ফান্দাইত্ ও তেলেঙ্গা ॥

॥ ১ ॥

যাহারা ফাঁদ পাতিয়া পশু-পাখী শিকার করিয়া থাকে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তাহাদের 'ফান্দাইত্' বলা হয়। 'ফান্দাইত্' ছাড়াও 'ফান্দাইস্' বা 'ফান্দী' শব্দ দুইটিও একই অর্থে চলিত আছে।

ফাঁদ পাতিয়া 'ফান্দাইত্' পাখী ধরিবার কালে নানান গান গাহিয়া থাকে। 'ইতর প্রাণী ও মানুষ' পর্যায়ের অন্যান্য গানের মতোই এই সমস্ত গানের মধ্যে একদিকে বন্দী পাখীর বন্দীত্বের-ব্যথার কারুণ্য এবং অপরদিকে ধৃত পাখীর উপর মানবিক প্রসঙ্গের আরোপ লক্ষ করা যায়। তাহা ছাড়া, এই গান সর্বত্রই নিছক গান-মাত্র নহে; হয়তো ইহার একটি মন্ত্রাত্মক দিকও আছে, যে মন্ত্র-গানে পাখীরা ফাঁদে ধরা পড়িয়া থাকে। এই দুইটি বিশেষত্ব 'ইতরপ্রাণী ও মানুষ' পর্যায়ের সকল গানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৩৫৬-সংখ্যক গানে দেখিতেছি, বন্দী পাখী করুণ কণ্ঠে কহিতেছে, ওগো 'ফান্দী', আমাকে যে ধরিলে, তাহার জন্য দুঃখ করি না; কিন্তু গৃহে আমার বাচ্চা দুইটি রহিয়াছে, এই আমার দুঃখ। 'বিরুয়া' গানের মধ্যেও দেখা যায়, অরণ্যের বন্দী হাতী গৃহে ফেলিয়া-আসা সন্তানের জন্য অপত্যস্নেহে কাতর হইয়াছে। হাতী যেমন মাহুতকে বলিয়াছে ছাড়িয়া দিবার জন্য, পাখীও তেমনি অনুরোধ জানায়,

> ফান্দাইত্ ভাই,
> তোর ধর্ম ছুইয়ো পাও :
> ছাড়িয়া দে মোর প্রাণের ফান্দাইত্ গে॥
> —সং ৩৫৬, কথান্তর

এই সকল গান পশু-পাখীর সম্পর্ক লইয়া রচিত হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত মানবিক প্রসঙ্গের সুরটিই প্রখর ও প্রধান। মানুষের মতোই বন্দী পাখী এখানে শিকারিকে অভিশাপ দেয়, আমাকে ধরিবার অপরাধে তোমার বউ

CENTRAL LIBRARY

বিধবা হউক, তোমার ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া পড়ুক। পাখীর এই অভিশাপ দিবার ক্ষমতাকে স্বীকার করিবার মধ্যে পাখীর প্রতি শ্রদ্ধা (যেমন, **Ancestor** বা **totem** বলা) জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বহু লোককথাতে পাখীকে আশীর্বাদ বা অভিশাপের সহিত জড়িত হইতে দেখা যায়। কিন্তু, এই অভিশাপের চেয়ে মা এবং সন্তানের বিচ্ছেদের কারুণ্যই গানে প্রাধান্য পাইয়াছে।

৩৫৬ক-সংখ্যক গানের মধ্যে বন্দী ময়ূর-ময়ূরী এবং পরিশেষে রচয়িতা —এই তিনজনের উক্তি পাই। প্রচণ্ড শব্দোল্লাস করিতে করিতে শিকারি আসিতেছে। ময়ূরী ময়ূরকে বন ছাড়িবার পরামর্শ দিল, কিন্তু ঘাস-তৃণের লোভে ময়ূর বন ত্যাগ করিল না, সে শিকারির হাতে ধরা পড়িল এবং ধরা পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। গানটি পাখী ধরিবার প্রসঙ্গে ভুল করিয়া গাওয়া হয়। আসলে ইহা দেহতত্ত্ব-মনঃশিক্ষা পর্যায়ের গান। লোভে পড়িয়া মানুষ সংসারের মায়া-জালে বন্দী হইয়া নানা দুঃখ-কষ্ট পায়, বন্দী ময়ূরের উক্তির মধ্য দিয়া সেই কথাই বলা হইয়াছে। ৩৫৬ঘ-সংখ্যক গানটিতেও এই একই ব্যাপার আছে। এই গান দুইটি ৬-সংখ্যক চর্যাপদকে নিশ্চিত ভাবে স্মরণ করায়। ময়ূরী যেমন ময়ূরকে লোভ-মোহ ত্যাগ করিতে বলিয়াছে, হরিণী তেমনি হরিণকে বলিয়াছে : হরিণী বোলঅ শুণ হরিণা তো/এ বন চ্‌ছাড়ি হোহু ভান্তো।

পাখীর প্রসঙ্গে গীত হইলেও আসলে ইহার মধ্যে একটা বড়ো রকমের রূপক আছে ; সে অনুমান দৃঢ়তর হয় ৩৫৬খ-সংখ্যক গানটি বিশ্লেষণ করিলে। এই গানে পাখীকে 'হরনাথ' এই নামে বিশেষিত করা হইয়াছে। বন্দী হইয়া হরনাথ কাঁদিতেছে, তাহাকে বন ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু শিকারির গানে ভুলিয়া সে ফাঁদে পা দিয়াছে এবং বন্দী হইয়াছে। পাখী ও মানুষ অভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই গানে 'জঙ্গল' হইল 'সংসার'। 'জঙ্গলের গোড়ে গোড়ে আইচ্চে ছয় ঝন ফান্দী'—এইখানে ষড়রিপু হইল শিকারি। সংসারের মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়া আত্মা এখানে ক্রন্দন করিতেছে।

৩৫৬গ-সংখ্যক গানটি এই সকল গান হইতে খানিকটা পৃথক। 'কুড়া' পাখী এখানে দূতের ভূমিকা নিয়াছে। প্রেমিকের নিকট হইতে বার্তা বহন করিবার

জন্য পাখীর দৌত্য লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব। মনে হয়, এই গানটি মূলত কোনো প্রেমের গান ছিল। 'কুড়া' পাখীর প্রসঙ্গ থাকিবার জন্য শিকারিরা ইহা ফাঁদ-পাতার গানরূপে গাহিয়া থাকে॥

॥ ২ ॥

কোচবিহার-রঙপুর-জলপাইগুড়ি জেলায় 'তেলেঙ্গা' নামে এক সম্প্রদায় দেখা যায়। ইহারা অনেকটা যাযাবরের মতো। স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া, নারী-পুরুষ মিলিয়া ইহারা ছাগল-বাঁদর নাচাইয়া থাকে। পুরুষেরা দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে। মেয়েরা তখন পাশে বসিয়া গান গায়। যে খেলা দেখানো হইতেছে তাহার সহিত সেই সময়ে গীত গানের ভাবগত কোনো ঐক্য থাকে না। এই সময়ে খেয়াল-খুশি মতো যে কোনো গানই গাওয়া যাইতে পারে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমের গানই গাওয়া হয়। এই ধরণের প্রেমের গানের জন্য 'রঙ-হাউসালি-চেঙ্গ্ড়ীভুলা' পর্যায়ের 'তেলেঙ্গার গান' দ্রষ্টব্য।

প্রেমের গান ছাড়াও ইতর প্রাণীর সম্পর্কের গানও ইহারা গাহিয়া থাকে। ৩৫৭ হইতে ৩৫৯-সংখ্যক গানগুলি এই শ্রেণীর। গানগুলির সব কয়টি মৎস্য বিষয়ক।

৩৫৭-সংখ্যক গানের বিশেষত্ব হইল, ইহা বালিয়া অর্থাৎ বেলে মাছের সহিত চিলি মাছের বিবাহের গান। সামাজিক জীবনে মাছের একটি গুরুতর ভূমিকা আছে। বিবাহের সময় মাছকে শুভসূচক বস্তুজ্ঞানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। জলপাইগুড়িতেই দেখা যায়, অনাবৃষ্টির সময়ে অনেকে মাছের সহিত মাছের বিবাহ দিয়া গৃহস্থের কূপে নিক্ষেপ করে এবং গৃহপালিত প্রাণীর মতোই তাহাদের পালন করে। এই সকল ব্যাপার হইতে মাছের বিবাহের গানের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। মাছ এখানে বৃষ্টি, বিবাহ ও উর্বরতার প্রতীক। **Fish-lore**-এর এর নিদর্শন রূপে ইহার মূল্য আছে।

আলোচ্য গানটিতে দেখা যায়, মানব-জগতের বিবাহ-রীতির সব কয়টিই মৎস্য-জগতে আরোপিত হইয়াছে। ইহাই গানটিকে বিশেষত্ব মণ্ডিত করিয়া

CENTRAL LIBRARY

তুলিয়াছে। বালিয়া ও চিলি মাছের বিবাহে পুঁটি মাছ এয়ো সাজিয়া বরণ ডালা সাজাইতেছে, চাঁদা মাছ বরণডালা হইয়াছে। পয়া মাছ হইয়াছে বরণ-ডালার প্রদীপ; মাগুর মাছ মালিনী সাজিয়াছে, মিতবর হইয়াছে 'শাটি' অর্থাৎ লেটা মাছ। বোয়াল মাছ হইল পুরোহিত। কচ্ছপ পাল্‌কি হইল এবং সে পাল্‌কির হাতল হইল 'কুঁচিয়া'। কাঁকড়া বেহারা সাজিয়া পাল্‌কি বহিয়া লইয়া চলিল। এ বিবাহে হাসি-ঠাট্টাও বাদ পড়ে নাই। 'চ্যাঙ' মাছ সঙ সাজিয়া সকলের আনন্দ বিধান করিতেছে। 'টেপা' মাছকে রাগাইয়া আর সব মাছ রঙ্গ দেখিতেছে।

গানটির কথান্তর হইতে কিছু কিছু নতুন তথ্য মিলিতেছে। এখানে বালিয়া মাছের বদলে বর হইয়াছে 'আহেলা' মাছ এবং সে বিবাহ হইতেছে শনিবার দিন। ট্যাংরা মাছ বাস্তকর হইয়া ঢোল বাজাইয়া বিবাহের একটি বিশেষ দিকের অভাব পূরণ করিয়াছে।

৩৫৭-সংখ্যক গানটির বর্ণনাভঙ্গি ও মাছের উপর মানব-জগতের রীতি-নীতি আরোপে যেমন সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, নীরস তথ্য-বিবৃতির জন্য পরবর্তী ৩৫৮-সংখ্যক গানটি ততোখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই গানটির মূল বক্তব্য বিবিধ মাছের নাম উল্লেখ করিয়া একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণয়ন। পরিচিত মাছগুলির নাম উল্লেখ করিয়া মাছের নামের তালিকা সংকলনের প্রবণতা ৩৫৭-সংখ্যক গানের মধ্যেও লক্ষ করা যায় বটে কিন্তু সেই তালিকা রসবিহীন হইয়া পড়ে নাই। তাহার কারণ, প্রথমত উহাতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মাছগুলির নাম বলা হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, উহাতে মানবিক রসের অবতারণা করা হইয়াছে। ৩৫৮-সংখ্যক গানে শীত ও গ্রীষ্মকালের বিভিন্ন ধরণের মাছের নামোল্লেখই মাত্র করা হইয়াছে, ফলে উহা নীরস হইয়া পড়িয়াছে। এইপ্রকার মৎস্য-নামের তালিকা সঙ্কলন মঙ্গলকাব্যের রীতিকে—বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'কে—নিশ্চিতভাবে স্মরণ করায়।

৩৫৯-সংখ্যক গানে মানুষের জগতের অনুকরণে মাছের জগতেও কোন্দল সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইলিশ ও খলিসা মাছ কোন্দল করিয়া এখানে আপন-আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। খলিসা বলে, ওরে ইলিশ,

CENTRAL LIBRARY

শহরের লোক তোকে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া খায়, তুই নীচবংশীয় প্রাণী। উত্তরে ইলিশ জানায়, সে গভীর জলের বাসিন্দা, কাজেই আভিজাত্য তাহার বেশি। শেষ স্তবকে কিন্তু ইলিশ বা খলিসা কেহই প্রাধান্য পায় নাই। তখন মাছের চেয়ে মেছুনীই প্রাধান্য পাইয়াছে। এই যে মাছের কথা বলিতে বলিতে মানুষের জগতে উঠিয়া আসা অথবা মানুষের জগতের অনুকরণে মাছের জগতে কোন্দলের কল্পনা করা—এই মানবিক রসই গানটিকে প্রাণ দিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মাছের কোন্দল আসলে মেছুনীর কোন্দল। সমধর্মী দুই পদার্থের কোন্দল বা প্রশ্ন-উত্তর (যেমন পান-তামাকের ঝগড়া কি টক-ঝালের যুদ্ধ) লোক-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ভঙ্গি।

প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক, মাছের কোন্দল করিবার গান পূর্ববঙ্গেও শ্রুত হইয়া থাকে॥

CENTRAL LIBRARY

॥ মৈষালি ॥

॥ ১ ॥

'মৈষালি' গান মহিষ-রাখালের গান। মহিষ চরায় যে, প্রান্ত-উত্তর-বঙ্গের উপভাষায় তাহাকে বলে 'মৈষাল'। যে গান মৈষালের তাহাই 'মৈষালি'। পূর্ববঙ্গের 'রাখালিয়া' গানের কথা প্রসঙ্গত অস্পষ্টভাবে মনে আসে। আদিম মানুষের জীবনে ও অর্থনীতিতে গোরু-মহিষ যখন মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উদ্ভব তখন হইতেই।

মৈষালি গান সাধারণত গোরু-মহিষ চরাইতে চরাইতে রাখালেরা গাহিয়া থাকে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উদার পরিবেশে এই গান গীত হয় বলিয়া ইহার সুরের মধ্যেও একটি উদার রূপ লক্ষ করা যায়। অর্থনীতির সহিত জড়িত পশু তখন কাব্যের বস্তু হইয়া যায়।

মৈষালি গানের মধ্যে মৈষালের জীবন ও জীবিকা দুইই প্রতিফলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু, পরিণামে তাহার বৃত্তির চেয়ে 'প্রবৃত্তি'-ই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

গানের মধ্যে মৈষালের জীবিকার যে পরিচয় পাই, তাহা এই : মৈষাল যেন মহিষের পাল লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া চলিতেছে। এক-একটি স্থানে স্বল্প কয়েকদিন অবস্থান করিয়াই সে অন্যস্থানে চলিয়া যাইতেছে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলার পথে তাহার প্রেম ও বিরহের গানই মৈষালি গান। এই সঙ্গে মহিষ চরাইবার কষ্ট ইত্যাদি লইয়াও কিছু গান মিলে।

এই যে বিভিন্ন স্থানে মহিষের পাল লইয়া মহিষের ব্যবসা করা, আজিকার দিনে আর তাহার রেওয়াজ নাই। কিন্তু গোরু-মহিষ চরাইতে চরাইতে এখনও রাখালগণ মৈষালের জীবন ও জীবিকার দুঃখ-সুখ, প্রেম-ব্যথার কাহিনীকে গানের মধ্যে রূপ দিয়া থাকে। এইভাবে একটি জীবিকার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব দিকের স্মৃতি-কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিবার ফলে সাহিত্যিক উপাদানরূপে ইহা সহজেই স্বীকৃত হইতে পারিয়াছে।

এই সকল গানের মধ্যে মৈষালের জীবন ও জীবিকার মিলন ও সুখ

CENTRAL LIBRARY

অপেক্ষা বিরহ ও দুঃখের কথাই বর্ণিত হইয়াছে বেশি। মৈষালের জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, সে রাখাল, কিন্তু গৃহী নয়। সে শ্যামল প্রান্তরের যাযাবর মানুষ, কিন্তু গৃহকোণে আসিয়া আশ্রয় লইতে পারে নাই। তাহার জীবিকার ক্ষেত্র দিবসের উদার প্রান্তর, কিন্তু জীবনের জন্য চাই সন্ধ্যার গৃহকোণ। প্রান্তর হইতে মৈষাল গৃহ-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দিবসের প্রান্তর ও সন্ধ্যার গৃহকোণ এক করিতে পারে নাই; প্রান্তরের প্রেম প্রাঙ্গণে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই দেখি, মৈষালের প্রেম বিবাহের মধ্যে পূর্ণতা পায় নাই; এই জন্যই দেখি, জীবনের প্রেরণায় মৈষাল যখন নীড় রচনা করিতে চাহিয়াছে,—জীবিকার তাড়নায় তখনই তাহাকে মহিষের পাল লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইয়াছে। মৈষালের জীবনের এই কারুণ্য মৈষালি গানের এক বিশিষ্ট অংশ॥

॥ ২ ॥

মৈষালের জীবিকার বিভীষিকা ও দুঃখ-কষ্ট বর্ণিত হইয়াছে ৩৬০-সংখ্যক গানে। মৈষাল গায়, আর কত দিন পিতা-মাতা ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে মহিষ চরাইব। 'কুন বা দিন জোঙ্গলের বাঘ মোক ধরিয়া খাবে'। পারিবারিক জীবন যাপন করিতে মৈষালের ইচ্ছা জাগে, কিন্তু তাহার বৃত্তি হইল যাযাবরের মতো স্থান হইতে স্থানান্তরে মহিষের ব্যবসা করিয়া বেড়ানো। তাহার জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্বের কথা গানে রূপ পাইয়াছে।

এই জীবিকার কঠোরতা কারুণ্যে রূপ লইয়াছে পরবর্তী গানটিতে। ৩৬১-সংখ্যক গানে মহিষকে উদ্দেশ করিয়া মহিষ-পালক গাহিতেছে, ওরে মহিষ, তোর হিয়াতেই বুঝি আমার হিয়া ভরিয়া রাখিয়াছিস্। তাই ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেও তোর নিকট হইতে ছাড়া পাই না। এইখানে দেখিতেছি, জীবিকার কঠোরতার সহিত উহার অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণটি মহিষ-পালককে কেমন পাকে-পাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। জীবিকার আকর্ষণ হইতে জীবনের প্রেরণায় তাহার মুক্তি নাই। ইহাই তাহার জীবনের করুণ ঘটনা।

নিজের জীবনের এই কারুণ্য মহিষ-পালক মহিষের উপরই আরোপ করিয়াছে। তাই পরবর্তী স্তবকে সে গাহে, ওরে মহিষ, তোর পিঠের উপর

CENTRAL LIBRARY

চড়িয়া, নাকে দড়ি বাঁধিয়া, মারিতে মারিতে তোকে খেদাইয়া লইয়া চলিতেছি। তোকে দেখিয়া আমার বড়ো কষ্ট হয়।

মহিষ যেমন মহিষ-পালকের হাতে দড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে,—তাহা হইতে মুক্তি চাহিলেও মহিষ যেমন আর মুক্তি পাইতে পারিবে না; মহিষ-পালকও তেমনি জীবিকার আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়াছে, গৃহজীবনের প্রেরণায় সে আর তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেছে না। মহিষের প্রতি মহিষ-পালকের এই সমবেদনা আসলে মহিষ-পালকের নিজেরই নিজের প্রতি সমবেদনা জানানো।

জীবিকার সহায়ক পশুর প্রতি এই প্রীতি ও সমবেদনা 'বিরুয়া' গানেও লক্ষ করা যায়। সেখানেও দেখা যায়, হস্তীর বন্ধন-দশায় মাহুত কাতর হইয়াছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করিতেছি, উভয় ক্ষেত্রেই পশু-প্রীতিটি যেন প্রত্যক্ষভাবে পশুকেই নয়। 'বিরুয়া' গানে হাতীকে যখন সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তখন তাহাকে অরণ্য-রাজের বন্দিনী দুহিতারূপে কল্পনা করিয়া হাতীর উপর একটি মানবিক ভাব আরোপ করিয়া লওয়া হইয়াছে। মৈষালি গানেও মহিষের উপর মহিষ-পালকের মনের একটি ভাবকে আরোপ করিয়া তারপর মহিষকে সমবেদনা জানানো হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে পশুর প্রতি মানবিকতা আরোপের প্রবৃত্তি হইতেই ইহা সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া, পশুকে পূর্বপুরুষ এবং গোত্রের প্রতীক রূপে দেখিবার প্রথা তো আছেই। অর্থনৈতিক দিকটিও কম প্রভাব ফেলে নাই। মোট কথা, নৃতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক এবং অর্থনৈতিক—এই তিন দিক হইতে প্রভাবিত হইয়া এই ধরণের গানের উদ্ভব হইয়াছে।

গোরু, ষাঁড়, মহিষকে লইয়া যে 'রাখালিয়া' বা 'মৈষালি' গান রচিত ও গীত হইয়া থাকে, একদা যে তাহা পূজার্চনা ও ধর্মের সহিত জড়িত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। মহিষকে অবলম্বন করিয়া একটি Myth রাজবংশী সমাজে চলিত আছে, 'বিরুয়া' গানের আলোচনাকালে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রায় এই ধরণেরই আর একটি Myth পাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের 'মুরং' উপজাতিদের মধ্যে ষাঁড় সম্পর্কে :

মুরং-দের সৃষ্টিকর্তার নাম 'তুরাই'। একবার তিনি সব মানুষ ও পশুদের এক সভা ডাকিলেন। সকলে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজ নিজ

CENTRAL LIBRARY

জাতির ধর্মগ্রন্থ লইয়া যাইবে। সব পশু ও মানবজাতির লোকেরাই আসিল, কিন্তু মুরং উপজাতিদের কেহ যাইয়া 'তুরাই'-এর নিকট হইতে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ লইয়া আসিল না। তুরাই তখন একটি কলার পাতায় মুরংদের শাস্ত্র লিখিয়া এক ষাঁড়কে দিয়া তাহা পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে ষাঁড় সেই কলাপাতা খাইয়া ফেলিল। কাজেই তাহাদের কোনো ধর্মশাস্ত্র নাই। মুরং-রা ঘরে ফসল তুলিবার সময় তাই নারী-পুরুষ মিলিয়া বাঁশের তীক্ষ্ণ শলাকার দ্বারা খোঁচাইয়া একটি শিশু ষাঁড়কে বধ করে, উহার রক্ত পান করে, মাংস রাঁধিয়া খায়। ষাঁড়ের জিহ্বাটিকে বিশেষ পবিত্র পদার্থ বলিয়া মনে করে, কারণ জিহ্বাদ্বারাই ষাঁড় তুরাইয়ের দেওয়া শাস্ত্র-গ্রন্থ খাইয়াছিল।

আসলে ষাঁড়কে শস্য দেবতা ও উর্বরতার প্রতীক কিংবা গোষ্ঠীর প্রতীকরূপে কল্পনা করিবার ফলেই এই কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 'মৈষালি' গানের উদ্ভব ও প্রচলনের পশ্চাতেও এইরূপ কোনো Myth কাজ করে নাই তো?

॥ ৩ ॥

জীবিকার পথেই জীবনের প্রেরণায় মৈষাল প্রেমে পড়িল। মৈষালি গানের এই পর্বে জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, জীবিকা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

মহিষ-পালকের জীবনের একটা বড়ো ঐশ্বর্য এই যে, সে পথ চলিতে চলিতে প্রেমিকার প্রেম পাইয়াছে। মহিষের পাল লইয়া সে গ্রামের প্রান্তে আসিয়া আস্তানা গাড়িল। এই খানেই কন্যার সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। প্রেমিকা বলে, ওগো মৈষাল, কেমন করিয়া তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব; বাপ-খুড়া সকলেই যে আমার বিপক্ষে (সং ৩৬২)। ওগো মৈষাল, তোমার জন্য আমার বুক বহিয়া জল পড়ে। তুমি আসিয়া আমাদের বাড়ীর পিছনে তোমার মহিষের 'বাথান' তৈরি কর (সং ৩৬৪)। ওগো মৈষাল, তুমি অন্য রাস্তা দিয়া যাইয়ো না, আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই যাওয়া-আসা করিয়ো। তাহা হইলে আমি নিত্য তোমাকে দেখিতে পাইব। মহিষ চরাইবার জন্য তুমি ঘাসের বনে ঢুকিয়ো না, ঘাসের ধারে তোমার গা কাটিয়া যাইবে। ওগো মৈষাল, তুমি নদীর ওপারে থাকো, আমি থাকি এপারে। আমি সাঁতার

জানি না, ভেলা বাহিতেও জানি না। আমার খোঁপাতে তোমাকে চড়াইয়া আমি তোমাকে এপারে লইয়া আসিব, তারপর আমার সব কিছু তোমাকে দিব (সং ৩৬৫)।

কন্যা মাঠে কাঠ কুড়াইতে গিয়াছে। মৈষালও মাঠে মহিষ চরাইতেছে। কন্যা বলে, ওগো মৈষাল, আমার কাঠগুলি কাটিয়া দাও, বোঝা বাঁধিয়া মাথায় তুলিয়া দাও, পথে আগাইয়া দাও (সং ৩৬৬)। ওগো মৈষাল, তুমি মহিষের পরিচর্যা করিতেছ, আমার মনে হইতেছে, আমি তোমার কাছে উড়িয়া যাই। তুমি গামছা মাথায় দিয়া মহিষ দোহন করিতেছ, আমার মনে হইতেছে, নিকটে যাইয়া মহিষের বাচ্চাটিকে ধরিয়া তোমার কাজে কিছু সাহায্য করি (সং ৩৬৭)।

রাত্রিবেলায় সকল কর্ম শেষ করিয়া মহিষ-পালক দোতরা বাজাইয়া গান গায়। সে গান ও বাজনা শুনিয়া প্রেমিকার মন আর ঘরে রহিতে চায় না। কন্যা বলে, ওগো মৈষাল, তোমার দোতরা আর বাজাইয়ো না। উহা শুনিয়া আমি ঘরে থাকিতে পারি না (সং ৩৬৮)। মহিষ-পালকের দোতরা এইখানে কৃষ্ণের বাঁশি হইয়া গিয়াছে।

মনে মনে কন্যা মৈষালকেই নিজের স্বামী বলিয়া মানিয়া লইল। সে তাহার বড়ো ভাইকে কহিতেছে, ওগো দাদা, আমাকে কৃষকের ঘরে বিবাহ দিয়ো না, তেলির ঘরে বিবাহ দিয়ো না, ব্যবসাদারের ঘরে বিবাহ দিয়ো না। বিবাহ যদি দিতেই হয় তবে ওই মহিষ-পালকের সহিতই দিয়ো (সং ৩৬৯)।

মৈষালের দুঃখ কন্যার সহে না। মহিষ চরাইতে যাইয়া কাশবনের শরধার ঘাসে মহিষ-পালকের গা কাটিয়া রক্ত ঝরে। কন্যা তাই বলে,

ওকি মৈষাল রে মৈষাল,
এথে মৈষাল তোর পরম রে দুখ
এলুয়া-কাশিয়া কাটিবে রে বুক।
না করিস্ তুই বাপের ভইষের চাথিরি রে ॥—সং ৩৭০

কিন্তু এই প্রেম মিলনের মধ্যে পূর্ণতা পাইবার পূর্বেই তাহাতে বিচ্ছেদের সুর বাজিয়া উঠিল। কর্মের আহ্বানে মৈষালকে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতে

CENTRAL LIBRARY

হইল। জীবিকার জন্য জীবনের দাবী মিটিল না। এইখানেই মৈষালের জীবনে কারুণ্য ঘনাইয়া আসিল।

কন্যার প্রাণে প্রেম জাগাইয়া মৈষাল আজ চলিয়া যাইতেছে গ্রামান্তরে। কন্যা তাই মৈষালকে বলে, ওগো মৈষাল, প্রাণে তোমার দয়া নাই, তাই প্রেম জাগাইয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ (সং ৩৭১)। ওগো মৈষাল, তোমার পায়ে পড়ি, এ অভাগিনীকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইয়ো না (সং ৩৭২)। তার পর কন্যা বলে; ওগো মৈষাল, তুমি যেখানে যাইবে, আমাকেও সেখানে লইয়া যাও। আমি পান-সুপারি বিক্রয় করিবার অছিলায় তোমার সঙ্গে-সঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিব (সং ৩৭৪)।

কন্যা তো জানে না, মৈষালকে জীবিকার তাড়নাতে প্রেমকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে। তাহার ধারণা, মৈষাল বুঝি তাহার উপর রাগ-অভিমান করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। তাই বলে, ডাকিলেও আমার মৈষাল-বন্ধু সাড়া দেয় না। বুঝি সে অভিমান করিয়াছে। অভাগিনীর মন সে বুঝিল না, তাই 'পিরিতি' করিয়া সে আমাকে ছাড়িয়া গেল (সং ৩৬৫)।

কিছুতেই যখন মৈষালকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কন্যা তখন নিজের গুরুজন এবং মৈষালকে ধিক্কার ও গঞ্জনা দিয়াছে। এই ধিক্কার ও তিরস্কারের মধ্যে কন্যার প্রেম ও প্রেমের জ্বালার সুন্দর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কন্যা তাহার বড়ো ভাইকে বলে, ওগো দাদা, তখনই না কহিয়াছিলাম, বিদেশের মৈষালের 'বাথান' তৈরি করিবার জন্য জায়গা দিয়ো না। এখন দেখিলে তো, দেশের মৈষাল দেশে চলিয়া গেল, মাঝখান হইতে আমার মনটা সে কাড়িয়া লইয়া গেল (সং ৩৬৩)। মৈষাল চলিয়া যাইতেছে বলিয়া কন্যা তাহাকেও ধিক্কার দিয়াছে (সং ৩৭১)।

৩৭৩-সংখ্যক গানের শেষ স্তবকটির মধ্যে একদিকে মৈষালের প্রেম এবং অপর দিকে কর্মের আহ্বানে প্রেমিকাকে ছাড়িয়া তাহার চলিয়া যাওয়ার কারুণ্য ফুটিয়াছে। পর্বতের কোল বাহিয়া মহিষের পাল চলিয়াছে। আর মহিষের কণ্ঠ-লগ্ন ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে মহিষ-পালক গ্রাম-ত্যাগ করিতেছে। মহিষের গলার ঘণ্টাধ্বনি যেন জীবিকার কঠিন আহ্বান। সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। অপর দিকে প্রেমের আকর্ষণ,

CENTRAL LIBRARY

তাহাকেও উপেক্ষা করা কঠিন। দুইয়ের টানাপোড়েনে মহিষ-পালকের চলার গতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে॥

॥ ৪ ॥

মৈষালি গানের মধ্যে মৈষাল-প্রেমিকা ও মৈষাল উভয়েই যেন স্থানে-স্থানে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বিরহের তীব্রতা ও অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করিতে মৈষাল-প্রেমিকা স্বল্প দুই-একটি ক্ষেত্রে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে 'আক্ষেপানুরাগে'র ক্ষীণ ছাপ পাওয়া যায়। প্রেমের সকল তৃপ্তির মধ্যেও যে এক অতৃপ্তির জালা আছে, বিরহের অপার তীব্রতার মধ্যেও যে এক অসহ্য সুখানুভূতি আছে,—আক্ষেপানুরাগের পদাবলীতে তাহাই বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রেম-জর্জরিত মৈষাল-প্রেমিকাও বলিয়াছে, বিচিওয়ালা কলা যেমন নামেই কলা, কলার প্রকৃত স্বাদ তাহাতে নাই, পর-পুরুষও তেমনি প্রেমের তৃষ্ণাই জাগায়, তৃপ্তি দেয় না। হিয়া তাহাতে জর্জরিত হইয়া উঠে।

আঁটিয়া কেলাক কেলায় না কও
বিচি ঘস্-ঘস্ করে।
পর-পুরুষক পুরুষে না কও
হিয়া জর-জর করে।—সং ৩৬৩

বিরহ-কাতরা মৈষাল-প্রেমিকা বলে, ওগো মৈষাল, আমি অভাগিনী, আমার সহিত প্রেম করিয়ো না। প্রেমের ফাঁস একবার গলায় পরিলে আমার মতো অতৃপ্তির অসহ্য জালায় তুমিও জলিয়া যাইবে।

ওকি ও মৈষাল রে,
মুই নারীটা অভাগিনী—
মোক ধরিয়া না করিস্ আর পিরিতি।
পিরিতির আছে রে ফাঁসি॥—সং ৩৬২

যে প্রেম তৃপ্তির বদলে তৃষ্ণাই শুধু জাগাইল, প্রেমিকা সে প্রেমের অসহ্য

CENTRAL LIBRARY

অনুভূতিকে সহ করিতে পারে নাই। তাই তাহার মনে হইয়াছে, সে প্রেম শেষ হোক, সে প্রেমের মাথায় লাথি মারি।

এলা স্বাদাও পিরিতির মাথা—
ছাড়োং-ছাড়োং করে রে ॥—সং ৩৭৫

কিন্তু, শ্রীরাধার মতোই মৈষাল-প্রেমিকাও প্রেমের স্বরূপ ও শেষ বুঝিতে পারে নাই। তাই প্রেমকে ছাড়িতে চাহিলেও সে প্রেমকে ছাড়িতে পারে নাই। প্রেমের এই বিচিত্র সত্তাকে লক্ষ করিয়াই সে বলিয়াছে, 'হায়, না বুঝিনু পিরতির কাথা' (সং ৩৭৫)।

শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসিবার জন্য শ্রীরাধাকে কলঙ্কিনী নাম লইতে হইয়াছিল। একই ব্যাপার মৈষাল-প্রেমিকার বেলাতেও ঘটিয়াছে। মৈষালকে ভালোবাসা পাড়া-পড়শীর চোখে ভালো লাগে নাই, তাই মৈষাল-প্রেমিকাকে কলঙ্কিনী নাম লইতে হইয়াছে। সে বলে,

তোর মৈষালের দুঃখ দেখিয়া
বাড়েয়া দিনু ছাতি।
আশ-পড়োশীর নোকে বলে
মৈষাল-ভাতারী ॥—সং ৩৬৭

স্বল্প দুই-একটি স্থলে মৈষালও যেন 'রসিক কানাই' হইয়া উঠিয়াছে। ৩৭৩-সংখ্যক গানে মৈষালকে 'গোয়ালের বেটা' বলা হইয়াছে। ৩৬৮-সংখ্যক গানে মৈষালের দোতরা আসলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যেমন শ্রীরাধাকে ঘরে থাকিতে দেয় নাই, মৈষালের দোতরাও তেমনি মৈষাল-প্রেমিকাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে।

মৈষাল ও মৈষাল-প্রেমিকার প্রেম প্রকাশের রীতির সহিত বৈষ্ণব-পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সাদৃশ্যের উপর তেমন কোনো গুরুত্ব আরোপ না করাই ভালো। প্রেমের এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে, গভীর অনুভূতির মধ্যে উহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্য রক্ষা করিয়া থাকে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে মৈষালি গানের প্রেমের কাব্যিক মূল্য বৃদ্ধি পায়।

CENTRAL LIBRARY

॥ বিরুয়া ॥

॥ ১ ॥

সংগৃহীত 'বিরুয়া' গানগুলিকে লক্ষ করিলে স্পষ্ট বোঝা যায়, 'বিরুয়া' শব্দটি একাধিক অর্থে গানগুলির মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'বিরুয়া' গান বলিতে সাধারণত হাতী ধরিবার এবং হাতীকে প্রবোধ দিবার গানই বোঝায়। স্বভাবতই মাহুতরাই ইহার গায়ক। 'বিরুয়া' যখন হাতীকে পোষ মানাইবার জন্ম গাওয়া হয় তখন ইহার মূল 'বারণ' (অর্থ—হাতী) হইতে পারে।

কিন্তু আর এক ধরণের গানও বিরুয়া নামে চলিয়া থাকে যাহা নিছক প্রেমের গান। হাতী ও মাহুতের প্রসঙ্গ এই গানগুলিতে একেবারেই অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছে। আমরা এই গানগুলিকে বিরুয়ার দ্বিতীয় পর্যায়রূপে নির্দেশ করিয়াছি।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বিরুয়া গানগুলিতে বিরহই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিরহের গান যাহা,—তাহা 'বিরহয়া' (তুলনীয়, জোলপইগুড়িয়া, বেরুবাড়ীয়া); ইহা হইতে 'বিরউয়া' এবং তাহার পর 'বিরুয়া' হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। এই পর্যায়ের গানগুলি সাধারণ গায়কেরাই বেশি গাহিয়া থাকেন। গায়কদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, বিরুয়া গানের সুরও করুণ এবং 'বিরুয়' কথাটিকে তাঁহারা বিষয়ের দিক দিয়া ব্যাখ্যা না করিয়া ইহাকে একটি বিশিষ্ট সুর রূপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, গায়কের এই ধারণার পশ্চাতে তেমন শক্তিশালী কোনো যুক্তি নাই। বিরুয়ার করুণ সুর অন্যান্য শ্রেণীর গানের মধ্যেও মিলে। 'বিরুয়া'-কে বিষয়ের দিক দিয়া ব্যাখ্যা করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

প্রথম পর্যায়ের বিরুয়া গান অর্থাৎ হাতী ও মাহুতের জীবন-প্রসঙ্গ যাহার উপজীব্য, তাহার সহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের বিরুয়া গান যাহা নিছক প্রেম-বিরহের গান, তাহার সম্পর্ক কী, তাহাও ভাবিবার বিষয়। একথা সত্য—প্রথম পর্যায়ের বিরুয়া গান যেমন মাহুতগণই বেশি গাহিয়া থাকে, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিরুয়া গানগুলিও তেমনি সাধারণ গায়কগণই বেশি গাহিয়া থাকেন।

CENTRAL LIBRARY

ইহা হইতে মনে হয়,—দুই পর্যায়ের বিরুয়া গানের মধ্যে সম্পর্ক বড়ো বেশি নাই। বিশেষ করিয়া উভয় বিরুয়ার বিষয়বস্তু ও নামের উৎপত্তির মধ্যেও কোনো সাদৃশ্য সহজে যেখানে খুঁজিয়া মিলে না।

তবুও দুই পর্যায়ের বিরুয়া গানের মধ্যে একটা ক্ষীণ সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্যায়ের দুই-একটি বিরুয়া গানে দেখা যায়,—সেখানে হাতীকে অরণ্য-রাজ্যের কন্যারূপে কল্পনা করা হইতেছে। মাহুত গানদ্বারা ভুলাইয়া হাতীকে খেদার মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে অরণ্য হইতে অন্যত্র লইয়া যায়। অরণ্য হইতে হাতীর অন্যত্র চলিয়া যাওয়া যেন পিত্রালয় হইতে কন্যার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাওয়ার মতো করুণ। হাতীর বন্দী-জীবনের ব্যথাও গানের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। পিত্রালয় হইতে হাতীর চলিয়া যাওয়ার 'বিরহ' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের গানে প্রতিফলিত নিছক 'বিরহের' মধ্যে একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু এই সাদৃশ্য যতখানি কাব্যিক ঠিক সেই পরিমাণে যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না।

হাতীকে কন্যা এবং অরণ্য-রাজের কন্যা রূপে কল্পনা করিবার নিদর্শন আফ্রিকার ঘানা হইতে প্রাপ্ত একটি রূপকথাতেও পাওয়া যায় (দ্র: **African fairy tales : Retold by : Kathleen Arnott : Somaiya Publications, Pvt. Ltd., Bombay : 1967 : PP. 12—20 : The Princess Elephant's tail**)। এই রূপকথাতে হাতীকে (ক) রাজকন্যা রূপে (খ) যাদুকরী রূপে (গ) নারীর রূপধারণকারী রূপে (ঘ) এবং মানুষকে বিবাহ করিতে দেখা যায়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-কল্পনার সহিত আফ্রিকার মানুষের এই কল্পনার আংশিক সাদৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম পর্যায়ের বিরুয়া গানের 'বিরুয়া' পদটিকে অন্য একদিক দিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পরে। কোল ভাষায় 'বীর' শব্দটির অর্থ 'জঙ্গল'[১]। কোল ও অষ্ট্রিক ভাষার প্রভাব আসামী ও কামরূপী উপভাষায় লক্ষিত হইয়া থাকে। ডাঃ শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীবাণীকান্ত কাকতি মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১ এ. ক্যাম্প্‌বেল্ : এ সান্তালি-ইংলিশ্‌ ডিক্‌শনারি (১৮৪৯), পৃঃ ৭০।

CENTRAL LIBRARY

এখন 'বির' বা 'বীর' শব্দের অর্থ যদি 'জঙ্গল' হয় এবং আলোচ্য অঞ্চলের উপভাষায় যদি কোল-অষ্ট্রীক ভাষার প্রভাব স্বীকার করা যায়, তবে নিম্নের সিদ্ধান্ত খুব অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

অরণ্যের পশুকে পোষ মানাইবার জন্য গীত গান, এই অর্থে তখন 'বির' বা 'বীর' হইতে 'বিরুয়া' (উয়া-প্রত্যয় করিয়া) পদটিকে গ্রহণ করা চলিতে পারে॥

॥ ২ ॥

এই পর্যায়ের বিরুয়া গানে হাতী ও মাহুতের জীবন-প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। হাতীকে প্রবোধ দিবার ও পোষ মানাইবার উদ্দেশ্যেই গানগুলি গাওয়া হইয়া থাকে। পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে—হাতী অপেক্ষা মাহুতই ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। হস্তীপকের বৃত্তি বিপদ-সঙ্কুল। গৃহে বিবাহিত স্ত্রী ও স্বজনাদিকে রাখিয়া তাহাকে অরণ্যে যাইতে হয় হাতী ধরিতে। বন্য হস্তীর হাতে অনেকেই তখন প্রাণ হারাইয়া থাকে। মাহুতের জীবনের এই সকল দুঃখ-ব্যথাই বিরুয়া গানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। বনের পশুকে শোনাইবার জন্য মানবজীবনের দুঃখকাহিনীকে বাছিয়া লইবার মধ্যে লোক-মানসের একটা বিশিষ্ট দিকের চমৎকার নিদর্শন মিলিতেছে।

মাহুতের জীবনের সহিত মাহুত-পত্নীর জীবন বাঁধা। অনেক গানে মাহুত-পত্নীর প্রোষিতভর্তৃকা হইবার বেদনা বাজিয়াছে। অরণ্যে হাতী ধরিবার জন্য মাহুতকে চলিয়া যাইতে হইবে। মাহুতপত্নীর মন তাই 'ঝুরিতেছে'। মাহুত-বিনা তাহার 'পিলখানা' অন্ধকার হইয়া যাইবে। বিপদের ডরে মাহুত-পত্নী বলে, ওগো মাহুত, মাহুতের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকার্য কর। মাহুত বলে, কৃষিকার্য শিখি নাই, সে কাজ করিব কী করিয়া। তুমি কাঁদিয়ো না, ছয়মাস পরে আমি ফিরিয়া আসিব, তখন তোমার গলা সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিব (সং ৩৭৬)।

বিবাহিতা স্ত্রী-কে ছাড়িয়া অরণ্যের নিঃসঙ্গতার মধ্যে যাইতে মাহুতেরও পরাণ ফাটে। হাতী-খেদায় কাজ করিবে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া মাহুত হাতীর ব্যবসাদারদের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার উপর মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে টাকা ধার করিয়া সে

CENTRAL LIBRARY

বিবাহ করিয়াছে। সেই স্ত্রীকে আজ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে। তাই সে বলে, 'বড়য় ছুখে যাছু' গে চাখিরি' (সং ৩৭৭)।

হাতীকে উদ্দেশ করিয়া মাহুত গায়, ওরে হাতী, তোর পায়ে পড়ি, তুই আমার প্রাণনাশ করিস না, তাহা হইলে আমার পিতা-মাতা কাঁদিয়া মরিবে। স্ত্রীর সহিত প্রেম করিয়া আমার আশ মিটে নাই,—সেই স্ত্রী-কে বড়ো দুঃখে আমি ছাড়িয়া যাইতেছি (সং-৩৭৮)।

মাহুত হাতী শিকার করিতে চলিয়াছে। তাহার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী তখন অভিযোগ করে,

ওরে তুই যদি চাখিরি যাবো
মোক কেনে তুই বিয়াও করলো—সং-৩৭৮ক

মাহুত-পত্নী বলে, ওগো তুমি যে চাকুরীর জন্য অগ্রিম টাকা লইয়াছ, আমার কানের দুল বন্ধক রাখিয়া সে টাকা ফেরত দিয়া দাও,—তবু তুমি যাইয়ো না।

মোক ছাড়িয়া না যাইত্ রে,—
চাখিরি বড়ো দুঃখের রে॥—সং ৩৭৮ক

কিন্তু মাহুতকে যাইতেই হইবে। তখন মাহুত-প্রেয়সী হাতীর নিকট গিয়া মিনতি করিয়া বলে, ওগো হাতী, আমার স্বামীকে তুমি মারিয়া ফেলিয়ো না, তাহা হইলে আমি বিধবা হইব। ওগো হাতী, আমার স্বামী তেমন ভালো মাহুত নয়, হয়তো তোমার পিঠে ভালো করিয়া চড়িতে জানে না। কিন্তু, সেজন্যে তুমি রাগিয়ো না, ছটফট করিয়া আমার স্বামীকে তোমার পিঠ হইতে ফেলিয়া দিয়ো না। 'মোর স্বামীটাক আখিস্ রে হাতী আদরে যতনে' (সং ৩৭৮খ)।

পতি-প্রাণা মাহুত-বধূ বলে, ওগো মাহুত, তুমি তো চলিয়া যাইতেছ। যাইবার আগে তোমার স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি গাছ পুঁতিয়া যাও (সং ৩৭৮গ)। এই গাছ যেন মাহুতের জীবনের প্রতীক বা Life-token. তারপর শুভদিনে মাহুত বনপথে যাত্রা করিতেছে। লোকের বিশ্বাস, চৈত্র-সংক্রান্তির বৃষ্টি হইলে তাহা মঙ্গলজনক হয়। সেই চৈত্র-সংক্রান্তির দিন মাহুত হাতী সাজাইয়া যাত্রা করিতেছে। কিন্তু, মাহুত-বধূর মনে সুখ-শান্তি নাই। যে

CENTRAL LIBRARY

চাকুরিতে পদে পদে বিপদ, ছাই পড়ুক সে চাকুরির মাথায় (সং ৩৭৮ঘ)। অঙ্কুশ হাতে লইয়া মাহুত হাতীর পিঠে উঠিয়া স্ত্রীর প্রতি বিদায়-বাণী উচ্চারণ করিল। তাহার সে কথা শুনিয়া মাথা নত করিয়া মাহুত-পত্নী কাঁদিতে লাগিল।

শুনিয়া মাহুতেরো কাথা
হাটো কইন্নে কইন্যা মাথা।
কান্দে কইন্যা আগর নয়ন রে ॥
—সং ৩৭৮ঘ, অতিরিক্ত কথা।

বনে গিয়া মাহুত অবস্থান করিতেছে। পিতা-মাতা ও জায়ার কথা তাহার অনুক্ষণ মনে পড়ে। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গায়, ঘর-বাড়ী ছাড়িলাম, পিতা-মাতা ছাড়িলাম এবং 'বিয়াও করিয়া ছাড়িয়া আইনু তোমার মত নারী'। তাহার দুঃখে বনের পশু-পাখীও কাঁদিয়া উঠে: 'জোলপাইগুড়ির মাহুত কান্দে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া' (সং ৩৭৯)।

এদিকে ঘরে বসিয়া প্রোষিতভর্তৃকা মাহুত-পত্নী চিন্তা করে: এই চৈত্র-বৈশাখ মাসের রৌদ্রে বুঝি মাহুতের পিঠ ফাটিয়া গেল, তাহার মাথাতেও বুঝি একটি পাগড়ি নাই, বুঝি সে হাতীর পিঠে চড়িয়া কাঁদিতেছে (সং ৩৮০)।

যাইবার সময় মাহুত বলিয়া গিয়াছিল, ছয়মাসের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু 'ছয়ো মাসো গেইল্ পুরি', মোর মাহুত না আইল ঘুরি রে'। অবশেষে মাহুতের বদলে হাতীই একদিন একা ফিরিয়া আসিল। মাহুতকে না দেখিয়া মাহুত-পত্নী হাতীকে শুধাইল,

ও মোর হস্তী রে,—
যাবার বেলায় গেলো সাথে
একা কেনে হস্তী দরজাতে রে।
কহো হস্তী, মোর মাহুতের খবর ॥—সং ৩৮১

এইখানে রূপকথার পুরা ছাপ পড়িয়াছে। মাহুত এখন অভিযানকারী রাজপুত্র, মাহুতপত্নী রাজকন্যা।

তারপর মাহুত-পত্নী মানত করে, ভালোয় ভালোয় পতি তাহার ঘরে

CENTRAL LIBRARY

ফিরিয়া আসিলে সে জোড়া পাঠা বলি দিবে, পতির মঙ্গল কামনায় পারাবত উড়াইয়া দিবে।

কোনো কোনো গানে হাতীর বদলে সংবাদ-দাতার উল্লেখ মিলে। আসামের অরণ্য হইতে সংবাদ দাতা আসিয়াছে মাহুত-পত্নীর নিকট মাহুতের সংবাদ দিতে। তাহাকে দেখিয়া মাহুত-পত্নী স্বামীর সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সংবাদ-দাতা বলে, 'তোমার পিয়া (প্রিয়) আছে ভালে' (সং ৩৮১ক)।

কখনো বা সংবার-দাতা আসিয়া মাহুত-পত্নীকে মর্মান্তিক সংবাদ শোনায় ঃ

তোমার পিয়া গেইসে মারা
ভাঙ্গো কইন্যা হাতের শাংকা।
মুছো কইন্যা এনা সীঁতার সেন্দুর ॥—অপ্রকাশিত।

॥ ৩ ॥

এই পর্যন্ত মাহুত ও মাহুত-পত্নীর প্রেম দাম্পত্য-জীবনকে ভিত্তি করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, দাম্পত্য-বন্ধন, মনে হয় খানিকটা পরিমাণে, কিছুদিন অদর্শনের জন্য শিথিল হইয়া আসিয়াছে। তাই দেখি, মাহুত বিদেশে অন্য নারীর সহিত প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে।

বনপথে মাহুত চলিয়াছে হাতী লইয়া। মাহুতকে দেখিয়া কন্যা তাহার প্রেমে পড়িয়া গেল। সে বলে, ওগো মাহুত, তোমার হাতী থামাও। আমার স্বামী নাই, এ 'যৌবন' কাহাকে দেখিয়া বাঁধিব। আইস, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাও (৩৮১খ)। ওগো মাহুত, আমার 'কদমতলায়' তোমার হাতী বাঁধো। আমাদের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া 'জোড়বাওলা' তৈরি করি, তুমি-আমি সেই ঘরে থাকিব (সং ৩৮২)।

কখনো বা দেখি, মাহুতই উৎসাহী হইয়া কন্যার সহিত পরিচিত হইতে চাহিতেছে। স্নানরতা যৌবনাকে নদীর ঘাটে দেখিয়া সে একটা অছিলা নিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বলিল, ওগো মেয়ে, ভাদ্র মাসের গরমে আমার হাতীটি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তুমি ঘাটটা একটু ছাড়িয়া দাও, আমার হাতীটিকে নদীতে নামাইব (সং ৩৮৩)।

CENTRAL LIBRARY

এইভাবে কন্যার সহিত মাহুতের পরিচয় হইল। কন্যা শুধায়, ওগো মাহুত, কোথায় তুমি আস্তানা গাড়িয়াছ। বাড়ীতে তোমার কয়জন বউ। মাহুত, উত্তর দেয়, নদীর পারে আমি আস্তানা গাড়িয়াছি এবং বাড়ীতে একটিও স্ত্রী নাই। কন্যা তখন বলে, আমার পিতা-মাতা 'দুরাচার', আমার যৌবন চলিয়া যাইবার মতো হইল, আজো আমার বিবাহ দেয় নাই (সং ৩৮৩ক)।

মাহুত ও মৈষালের বৃত্তি ও প্রেমের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে মাহুতের সহিত লোকালয়-শূন্য বনের এবং মৈষালের সহিত লোকালয়ের প্রান্তে প্রান্তরের সম্পর্ক জড়িত থাকায় কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য আসিয়া গিয়াছে। মাহুতের জীবন বনের বিপদের সহিত জড়িত এবং তাহাতে অনিশ্চিত আশঙ্কার সম্ভাবনা অনেক বেশি বলিয়া তাহার গানের ভাব ও সুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মৈষালের জীবন এই অনিশ্চিত আশঙ্কা হইতে মুক্ত। মাহুতের গানে বিজন বনের আশঙ্কা এবং মৈষালের গানে ঘর বাঁধিবার আশা ব্যক্ত হয়।

মাহুত ও মৈষাল উভয়েই পশু চরাইয়া জীবিকার্জন করিয়া থাকে, পশু চরাইবার জন্য উভয়কেই প্রবাসী হইতে হইয়াছে। কিন্তু, 'বিরুয়া' গানের মধ্যে মাহুত বিবাহিত গৃহীরূপে চিত্রিত হইয়াছে, মৈষালি গানে মৈষাল অবিবাহিত যুবকরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। এইজন্য বিরুয়া গানের মধ্যে বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রেমের গানরূপে বিচার করিলে বিরুয়া ও মৈষালি উভয় প্রকার গানই সমান সুন্দর॥

॥ ৪ ॥

'বিরুয়া' ও 'মৈষালি' গানের মধ্যে সাদৃশ্যকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট **Animal-lore**-এর পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, **Elephant-lore** আলোচ্য অঞ্চলে কতখানি ব্যাপকতা অর্জন করিয়াছে, তাহার বিচার; তাহার পর, হাতী সম্পর্কে নানা 'মিথ্' মহিষের সঙ্গে কি ভাবে যুক্ত, তাহার বিচার করা যাইবে।

হাতী অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রকলার এক উল্লেখযোগ্য Motif বা উপকরণরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে। অনেক পৌরাণিক বর্ণনাতেও হাতীর গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের অনেক আদিবাসীর নিকট হাতী পবিত্রতা ও সৌভাগ্যের প্রতীক

CENTRAL LIBRARY

বলিয়া গৃহীত হয়। Door-sign রূপে হাতীর চিত্র ঘরের দরজার সম্মুখে বা দেওয়ালে আঁকিয়া রাখা হয়। হাতীর সহিত Therimorphism-এর একটি যোগ গণেশ মূর্তির মাধ্যমে যেমন দেখা যায়, তেমনি পাখীকেও যুক্ত হইতে দেখা যায়। মধ্যভারতের বৈগা উপজাতির লোকেরা বাড়ীর দরজায় যে হাতীর চিত্র আঁকিয়া রাখে, তাহাতে হাতীকে পাখীর মতো পক্ষ-যুক্ত করিয়া আঁকা হয়। ভারত এবং পৃথিবীর বহু লোককথাতে হাতীকে পাখীর (বিশেষত চড়ুই প্রভৃতি ছোটো পাখীর) বিরুদ্ধতা করিতে দেখা যায়। গণেশের মূর্তি দেখিলে মনে হয়, হাতী প্রথমে Zoomorphic-রূপ লইয়াই পূজা পাইত, তারপর Theriomorphic-রূপে তাহার বিবর্তন ঘটিয়াছে। হাতীর সহিত পূজা ও দেবতার সংসর্গের ফলেই তৈত্তিরীয়-সংহিতায় হিমবান্‌কে হাতী উৎসর্গের কথা বলা হইয়াছে। হাতীর সহিত আকাশ, মেঘ ও জলের সংশ্রব অন্বেষণের ফলেই 'দিক্‌-হস্তী' বা 'দিক্‌-বারণে'র কল্পনা করা হইয়াছিল।

হস্তী-পূজা পৌরাণিক ও লৌকিক—এই দুই বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। পৌরাণিকতার পথ ধরিয়াই হাতীর সহিত রাজ-আসঙ্গ লক্ষ করা হইয়াছে। এইজন্যই দেখা যায়, রাজারাই হস্তীপূজার প্রচলনে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, যেমন প্রাচীন কামরূপের নরপতি ভাস্কর বর্মণ ওই অঞ্চলে হস্তী-পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন। কিংবা রাজ-মুদ্রায় হস্তীর মূর্তি গৃহীত হইয়াছে।

গণেশের মূর্তিতে হাতীর মুণ্ড কেমন করিয়া আসিল (আসলে পশুমূর্তির উপাসনার পর অর্ধনরাকৃতি দেবতার উপাসনা) সে বিষয়ে একটি পৌরাণিক গল্প সারা ভারতেই চলিত আছে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গেও আছে। গণেশকে তাহার মামা শনি প্রথমে দেখিতেই গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গেল। শিব তখন শনিকে বলিলেন, যে প্রাণী উত্তর দিকে মাথা দিয়া শুইয়া আছে, তাহার মুণ্ড আনিয়া গণেশের ধড়ে বসাইয়া দিতে। শিবের প্রমথগণ উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া হাতীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারই মাথা কাটিয়া আনিয়া গণেশের ধড়ে জুড়িয়া দিল। এই পুরা-কাহিনীর উল্লেখযোগ্য দিক দুইটি: Theriomorphism এবং উত্তর দিক সম্পর্কে taboo.

উত্তর বঙ্গের তরাই অঞ্চল ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানেও হাতী বিচরণ করিয়া থাকে। কাজেই ওই সকল অঞ্চলেও Elephant lore-এর

CENTRAL LIBRARY

প্রভৃত উপকরণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জেলার তিপ্‌রা ভাষাতে হাতী সম্পর্কে একটি 'মিথ্‌' পাইয়াছি, যাহাতে taboo রহিয়াছে দক্ষিণ দিক সম্পর্কে। কাহিনীটি এইরূপ : দুই ভাই-বোন, তাহাদের বিধবা মা। হাটে-মাঠে তাহারা শাক-তরকারি তুলিয়া বেড়ায়। বিধবা মা বলিয়া দিয়াছেন, কখনোই যেন তাহারা দক্ষিণ দিকে না যায়। একদিন দক্ষিণদিকের এক পুকুরে নামিয়া দুই-জনেই গা চুলকাইতে লাগিল, এবং চুলকাইতে চুলকাইতে গা ফুলিয়া তাহারা হাতী হইয়া গেল। দক্ষিণ দিক সম্পর্কে taboo ভঙ্গই এই 'মিথে'র মূল কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কি পৌরাণিক কি লৌকিক, উভয় প্রকার মিথেই হাতীর সঙ্গে taboo জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই taboo-র প্রসঙ্গই হাতীকে লোক-মানসে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

হাতীর সহিত কয়েকটি ইতর প্রাণীও যুক্ত। ইঁদুর গণেশের বাহন, অতএব হাতীর সহিত ইঁদুর যুক্ত। এ বিষয়ে সেই প্রখ্যাত কাহিনী স্মরণযোগ্য, যেখানে মূর্খ ব্রাহ্মণেরা জীবনে সর্বপ্রথম শূকর দেখিয়া বলিয়াছিল, উহা 'হস্তীক্ষয়' বা 'মুষিক-বৃদ্ধি'। কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার আলোকঝাড়ি গ্রামে 'মাশান' নামে এক উপদেবতার বাহন হাতী, কিন্তু মানতকারীরা তাঁহাকে মাটির তৈরি শূকর মূর্তি উপহার দেয়। এই জেলারই মাঘপাল গ্রামের 'মাশান' দেবতা শূকর-বাহন, যদিও উত্তরবঙ্গের 'মাশান' দেবতার সাধারণ বাহন ঘোড়া। হরিণ ও মহিষকেও হাতীর সহিত সম্পৃক্ত হইতে দেখা যায়। পাখীর সহিত হাতীর যোগের কথা আগেই বলিয়াছি। আর্যগণ হাতীকে বলিতেন—হস্ত-সমন্বিত হরিণ। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গেও তরাই অঞ্চলে এখনও তাই বিশ্বাস আছে, সন্ধ্যাবেলায় হরিণ কাঁদিলে রাত্রিতে নির্ঘাত হাতী বাহির হইবে। ওই অঞ্চলের নেপালীরা আবার মনে করে, গোহালে গোরু ভয়ার্ত চীৎকার করিলে রাত্রিবেলায় হাতী আসিবেই।

মহিষের সহিত হাতীর যোগ স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া গিয়াছে। উভয়ের গাত্রবর্ণ এবং খাদ্য-সাদৃশ্য এখানে প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়ে আলোচ্য অঞ্চলে যে 'মিথ' প্রচলিত তাহা এই : হাতী ও মহিষ দুজনে পরম বন্ধু ছিল। একবার আকাশের দেবতাগণ সকল পশু-পাখির এক সভা ডাকেন। প্রত্যেকেরই খাদ্য ও বিশেষত্ব তাহাতে স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। আলস্যবশত মহিষ বিলম্বে গেল। পথেই দেখিতে পাইল, কলাগাছের পাতা নড়িতেছে, অর্থাৎ

CENTRAL LIBRARY

'না' করিয়া যেন বলিতেছে, সভাভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। মহিষ ফিরিয়া আসিল। আসলে মহিষেরই বুঝিবার ভুল। মহিষ দেবতার বর গ্রহণ করে নাই, এইজন্ত আজও মহিষের দুধ ও দই-ঘি পূজার পক্ষে অপবিত্র বলিয়া মনে করা হয়। বন্ধুর কষ্টের কথা শুনিয়া হাতী কলাগাছ খাইতে লাগিল। সেই হইতে কলাগাছ হাতীর প্রিয় খাদ্যে পরিণত হইয়াছে। বন্ধুত্বের সূত্রদ্বারা হাতী ও মহিষকে এই 'মিথে' অচ্ছেদ্য করিয়া রাখা হইয়াছে।

যে লোকমানসে হাতি ও মহিষ এমন বাঁধনে বাঁধা, সেই মানস-জাত সাহিত্যে, অর্থাৎ 'বিরুয়া' ও 'মৈষালি' গানে যে কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের জন-জীবনে হাতী এক বিভীষিকা। গারো পাহাড় প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীতও সমতল ভূমিতেও (যেমন পূর্ণিয়া জেলার সন্নিহিত অঞ্চলে) ইহারা বর্ষার শেষে আবির্ভূত হইয়া শস্যাদি তছ্‌নছ্‌ করিয়া দেয়, রান্নাঘরের চালা উল্টাইয়া নুন খাইয়া যায়। যূথবদ্ধ হাতীর সহিত মানুষের লড়িতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, সাপের ভয়ে 'মনসামঙ্গল' বা বাঘের ভয়ে যেমন সোনারায় বা দক্ষিণরায়ের কল্পনা করা হইয়াছে, 'বিরুয়া' গান কি তাহারই অনুরূপ কিছু? 'বিরুয়া' গানের সহিত 'হস্তী-চারণা' (Elephant-lore) যে যুক্ত রহিয়াছে, তাহা নির্ভয়ে অনুমান করা যায়।

যূথবদ্ধ হাতী বর্ষার শেষে পাহাড় হইতে সমতলে নামিয়া আসিবার পূর্বেই তরাইভূমিতে বর্ষাকালে হাতী-পূজা আরম্ভ হইয়া যায়, গণেশমূর্তিতেই এই হস্তী-উপাসনা চলে। যে বছর বর্ষার শেষে অতিরিক্ত পরিমাণে কাশফুল হয়, কিংবা হয় কলাগাছ, সে বছর হাতীর উপদ্রব বাড়িবে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। গণেশ ছাড়া 'মহাকালে'র উদ্দেশেও হাতীর পূজা দেওয়া হয়।

হাতীর উদ্ভব সম্পর্কে প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটি 'মিথ্‌' চলিত আছে: এক গৃহস্থ। তাহার ছিল চার বউ। এই চার বউয়ের মধ্যে ছোটো বউকে সে দেখিতে পারিত না। তাহাকে দিয়া হাড়ভাঙা খাটুনী খাটাইত উপরন্তু করিত মারধোর। এজন্তে তাহার সতিনীরা তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিত। একদিন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ছোটো বউ স্বামীকে ভয় দেখাইবে, ঠিক করিল। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ঢেঁকির প্রচলন নাই।

CENTRAL LIBRARY

দীর্ঘ একখণ্ড গোল কাঠ (ইহাকে 'গাইন' বলে) হাত দিয়া নামাইয়া-উঠাইয়া ধান ভানা হয়। যাহাতে ধান থাকে তাহাকে বলে 'ছাম', ইহার তলার দিকটা ঠিক হাতীর পায়ের মতো। চার বউয়ের 'ছাম' লইয়া, সে হামাগুড়ি দিয়া দুই হাত ও দুই পা তাহাতে ঢুকাইয়া দিল। 'গাইন'-টি কপালে লাগাইয়া লইল শুঁড়ের মতো। ধান ঝাড়িবার কুলা দিয়া করিল দুইটা মস্ত কান। যাহা দিয়া ধান-চিঁড়া 'ছামে'র মধ্যে নাড়া হয়, সেই 'ঘাঁটিনী'টা পিছন দিকে লাগাইয়া লেজ বানাইল। এইভাবে একটি হাতী সাজিয়া স্বামীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্বামী বাড়িতে আসিতেই ছোট বউয়ের এই মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে দিন তাহাকে আর প্রহার করিল না। ছোটো বউ এইভাবে প্রহারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেবতার কাছে এই মূর্তিতেই চিরদিন থাকিতে চাহিল। দেবতারা ছোটো বউয়ের এই প্রার্থনা পূরণ করিলেন। সে হাতি হইয়া বনে চলিয়া গেল। সেই হইতে হাতীর উদ্ভব হইয়াছে।

ইহার মধ্যে নারীর একটি স্বস্তির দিক আছে। স্বামীর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। কিন্তু ইহার আসল দিক অন্যত্র : সধবা নারীর হাতী হওয়া ; ছোটো বউয়ের হাতী হওয়া ; সপত্নীগণের সহযোগিতা এবং সমবেদনা পাওয়া। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : এই অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, স্ত্রীলোকেরা প্রার্থনা করিলে হস্তীরূপ পায়, হাতী তাহাদের নিকট এতই প্রিয় ও পবিত্র প্রাণী।

এই পটভূমিকায়, কেন 'বিরুয়া' গানে হাতীকে 'কন্যা', 'রাজকন্যা' বা সধবা ও পুত্রবতী নারী বলিয়া (এমন কি ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া) কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার কিছু-কিছু বুঝা যায়।

হাতীর সহিত ধান-ভানারও একটি সম্পর্ক দেখা যায়। এই গ্রন্থে যে ধান-ভানার ছড়াগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার দুইটিতে (সং ৩০৫ এবং ৩০৬ক) হাতীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। একটিতে মহিষের উল্লেখ (সং ৩০৭) আছে। আশ্চর্যের কথা এই, চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া ধান ভানার ছড়াতেও হাতীর উল্লেখ আছে। সুতরাং সঙ্কলিত 'মিথ'-টির একটি ব্যাপকতা আছে।

'বিরুয়া' গানের প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য বিবেচনা করিতে হইবে। হাতীর মাহুতগণ 'বিরুয়া' গানের সহিত এক প্রকার গান গাহিয়া থাকে, যাহাকে

তাহারা 'বারোমাসিয়া' গান বলিয়া থাকে। নির্জন প্রান্তরে ও পথে হাতীকে এই গান শোনানো হয়। ইহার মধ্যে যাদু-ধর্ম আরোপ করা হয়। কাহাকেও এই গান জানাইতে নাই। এ সম্পর্কে taboo আছে, জানাইলেই উহার যাদুগুণ বিনষ্ট হইবে। যে মাহুত এই গান জানে, তাহাকে শুদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। গান হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বটের পাতায় সেই গান লিখিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। সুস্থ মানুষ এই বারোমাসিয়া গান শুনিলে মরিয়া যায়। কিন্তু যে লোক এই বারোমাসি গান জানে, মরণকালে তাহা তাহাকে না শুনাইলে কিছুতেই তাহার মরণ হয় না।

মাহুত ছাড়াও যাহারা ওঝা-যাদুকর, তাহারাও এই বিশেষ বারো-মাসিয়া গান জানে। বছর চল্লিশ পূর্বে, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানার অন্তঃপাতী ডাউকিমারী নামক স্থানে এক বৃদ্ধার কথা শুনা যাইত, সে নাকি এই গান জানিত। তাহার ছোটো একটি ল্যাজও নাকি ছিল। বারোমাসিয়া গান জানে, এমন যে কয়জনের কথা জানি, তাহারা প্রায় সকলেই মুসলমান। কিন্তু তাহাদের মন্ত্র ও আচার সবই হিন্দুবৎ।

তাহা হইলে, 'বিরুয়া' ও 'বারোমাসিয়া'—যাহা হাতীকে নানা সময়ে শোনানো হয়,—এই দুই প্রকার গানই মন্ত্রধর্মী, একথা বলা যাইতে পারে। যে বারোমাসিয়া গানের মন্ত্রে মানুষ মরিয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, তাহাই বনের হাতীর বন্যতাকে 'মারিয়া' তাহাকে বশ করায়। পূর্বে হয়তো কেবল গুহ্য মন্ত্রাত্মক গানগুলিই গাওয়া হইত ; কালক্রমে উহাতে লৌকিকতা ও মানবিকতার গুণ ও ভাব আরোপ করিয়া সাধারণ গান রচনা করা হইতে থাকে, যদিও প্রাচীন ধারার গানও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

ওঝা-যাদুকরগণ যে 'বিরুয়া' গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে 'ফুল বিরুয়া' অর্থাৎ আসল 'বিরুয়া' গান বলা হয়। এই গান বারো মাসকে অবলম্বন করিয়া গীত হয় বলিয়া ইহাকে 'ফুল বারোমাসিয়া' গানও বলে। হাতীর সহিত বারোমাসের এই যোগ-সম্পর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মানুষের রোগ-ব্যাধি দূর করিবার জন্য ওঝারা এই 'ফুল বারোমাসিয়া' গান গাহিয়া থাকে এবং রোগীর উপর 'ভর' করা অপদেবতাকে দূর করে, তেমনি সদ্য-ধৃত বন্য হাতীকেও এই গান শুনাইয়া বশ করা হয়। মাহুতেরা বিশ্বাস করে, যীর

ও দীর্ঘ বিলম্বিতলয়ে গীত এই গান শুনিলে যে অপদেবতা বা 'দেও'-এর কুপ্রভাবে ধৃত হাতী বশ মানিতেছে না, সেও বশীভূত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ এই গান যে যাদুবৎ শক্তিশালী এবং ইহাতে একটি যে অলৌকিকতা আছে, তাহা ইহারা বিশ্বাস করে। এই ধরণের একটি 'ফুল বারোমাসী' গান বহু কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি :

মানুষির দেহাটা সদায় এক মতন হায় রে অহে না[১] ।
মরিম বলি' করি ক্ষ্যাত,[২] বাঁচিলে কিবা খাই ।
আগে-পাছে যাইতে হোবে এড়ান্ কারো নাই ॥
ফাগুন মাসে কৃষির আশে জমিন চাষায়[৩] ।
চৈত্ মাসে ডুফরের গুউদে ভিরাত অগুন নাগায়[৪] ॥
বৈশাখ মাসে মনের সুখে জমিত ফেলায় ধান ।
জ্যাঠ মাসে আবাদের বাদে[৫] হয়া যায় রে বান ॥
আষাঢ় মাসে গাড়ে গুয়া[৬], শাওণে ভরথর[৭] ।
ভাদর মাসে হয় রে গ্যাদর[৮], আশ্বিনে গাছ থরথর ॥
কাত্তিকে কৃষি দেখিয়া কৃষক করে গান ।
অঘণ মাসে পড়িলে জমিনত পাকে ধান ॥
পোষ মাসতে কাটে ধান, মাঘতে হয় নাড়া[৯] ।
ওই মতন মানুষির দেহা হয়া যায় রে সারা[১০] ॥

এই গানটি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ধান গাছকে পটভূমিকা রাখিয়া, তাহারই রোপণ হইতে কর্তনকাল (অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু) পর্যন্ত সময়কে মানব-জীবনের পরিসর ধরা হইয়াছে। গানটি যে কৃষির সহিত যুক্ত তাহা

১ মানুষের দেহটি সর্বদাই একরূপ থাকে না ২ ক্ষেত ৩ চাষ করে ৪ বড়ো মাটির ঢেলা ও আগাছা পোড়াইবার জন্য আগুন ধরানো হয় ৫ আবাদের জন্যে ৬ ধানের চারা রোপণ করে ৭ শ্রাবণে তাহা শেষ হয় ৮ প্রচণ্ড কাদা ৯ ধান গাছ কাটিয়া লইয়া গেলে, যে গোড়ার অংশ পড়িয়া থাকে তাহাকে বলে 'নাড়া' ১০ সুন্দর মোহন রায় (সরকার পাড়া, জলপাইগুড়ি)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত। ভ্রমক্রমে গানটি মূল সঙ্কলনে প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া এখানে দেওয়া হইল।

বলিয়া বুঝাইতে হয় না। কিন্তু ওই ধান গাছ যখন মানব-জীবনের সূচক হইয়া উঠে, তখন কল্পনা করা যাইতে পারে, গানটি সেই গোষ্ঠীর গান,—ধানগাছ যাহাদের totem ; নতুবা ইহা শ্রবণের সঙ্গে taboo জড়িত হইবার কোনো কারণ নাই। দ্বিতীয়ত, হাতীর উপর মানবিক চেতনা আরোপের ফলে, কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো গোষ্ঠীর হাতীকে totem বলিয়া মানিবার ফলে অতঃপর সেই গান হাতীর উপরও প্রযুক্ত হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। হাতীকে এই অঞ্চলে দৈব-প্রতিভার অধিকারী বলিয়া মনে করা হয় : হাতী নাকি 'ইচ্ছা-মৃত্যু' প্রাণী, এবং নিজের মৃত্যুকাল নিজেই বুঝিতে পারে। হাতী তখন নিজেই পাহাড়ের সানুদেশে উঠিয়া যায়, এবং সেখান হইতে স্বেচ্ছায় নিজ-দেহকে ভূপাতিত করিয়া দেয়॥

॥ ৫ ॥

'বিরুয়া' গানগুলির মধ্যে অল্প এমন দুই-চারিটি গান পাই, যে গুলিতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে বন্দী হাতীর দুঃখ-ব্যথা ব্যক্ত হইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া এই সকল গানের কারুণ্যের সীমা নাই। 'বিরুয়া' গানগুলির মধ্যে ইহা এক বিশেষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

আদিম মানুষের নিসর্গপ্রীতি যেমন অসাধারণ, পশুপ্রীতিও তেমনি উল্লেখযোগ্য। তাহাদের জীবন ও বুদ্ধিবৃত্তির আদিমতা ও সারল্য হইতেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। তাই দেখা যায়, রূপকথা-লোককথা-লোকসঙ্গীতে মানুষের দুঃখ-ব্যথায় গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে, নদীর ঢেউ থামিয়া যায়, পশু-পাখী কাঁদিয়া আকুল হয়। ইহারই উল্টা ফলরূপে দেখি,—পশু-পাখীর উপরও মানবিকতা আরোপ করা হইতেছে। 'বিরুয়া' গানে বন্দী হাতীর ব্যথা প্রকাশের মধ্য দিয়া এই ধারারই প্রকাশ ঘটিয়াছে।

বন্দী হাতীর ব্যথার গান আবার তাহারাই গাহিতেছে,—যাহারা হাতীকে বন্দী করে—অর্থাৎ, মাহুতরা। একদিকে মাহুত হাতীকে বন্দী করিতেছে খেদায় ফেলিয়া,—অপরদিকে সেই মাহুতই বন্দী হাতীর ব্যথার গান সেই হাতীকেই শোনাইতেছে।

এই সকল গানের মধ্যে হাতীকে অরণ্যের কন্যা এবং অরণ্যকে হাতীর পিত্রালয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পিত্রালয় হইতে সদ্য বিবাহিতা নারীর

CENTRAL LIBRARY

শ্বশুরালয়ে আগমন যেরূপ করুণ ব্যাপার, অরণ্য হইতে হাতীকে বন্দী করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়াও সেইরূপ করুণ। অনেক সময় আবার অরণ্যকেই হাতীর শ্বশুরালয় বা স্বামীগৃহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মাহুত যেন ডাকাত হইয়া হস্তী-কন্যাকে চুরি করিয়া আনিয়াছে।

গানে দেখি, পিলখানায় বাঁধা হস্তী-নারীর বাপের বাড়ী যাইবার সাধ জাগিয়াছে। সে কাঁদিয়া বলে—

মাহুত ভাই,
খুলিয়া দে মোর পায়ের বেড়ি—
বিদায় হয়া যাই ॥—সং ৩৮৪

পরবর্তী স্তবকেই আবার অরণ্যকে হস্তী-নারীর স্বামীগৃহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। হস্তী যেন পুত্রবতী নারী। পুত্রবতী নারীকে মাহুত অর্থাৎ ডাকাত-দল অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। পুত্রবতী নারী তাই বলে, ওগো, সেখানে আমার দুইটি সন্তান কাঁদিতেছে, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া দাও—

জঙ্গলে মোর বাচ্চা দুই
কান্দে দোনো উভরায়—
কে দোয়য়া করিবে উমায় ।—সং ৩৮৪

হস্তী-নারীর পায়ে আজ বেড়ি পড়িয়াছে। সেই বেড়ির শব্দে তাহার মন ঝুরিতেছে (সং ৩৮৪)। এই গানটির কারুণ্য সত্যই সুন্দর। ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ 'বিরুয়া' গানের মর্যাদা দেওয়া চলে।

ডাকাতদলের হাতে পড়িয়া হস্তী-কন্যার জাতিও গিয়াছে। সে ছিল অরণ্য-রাজের কন্যা, জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু আজ সে জাতি-ভ্রষ্ট জেলেনী। আজ মাছের পসরা মাথায় লইয়া সে মাছ বিক্রয় করে। আজ পিত্রালয়ে গেলে তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না (সং ৩৮৫)। হাতীর এই ব্যথাও মর্মস্পর্শী। মনে হয়, এইসব কল্পনার পশ্চাতে অপর কোনো 'মিথ' ছিল, যাহার সন্ধান আমি পাই নাই।

অনেক সময় হস্তী-নারী কুমারী-কন্যারূপেও কল্পিত হইয়াছে। মাহুত এখন সেই কুমারী-কন্যার প্রেম-প্রার্থী যুবক পুরুষ। কন্যারূপে কল্পিতা হইবার ফলে নারী-জীবনের অন্যান্য দিকগুলিও হাতীর উপর আরোপিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

মানব-কন্যার মতোই হস্তী-কন্যাও তাই জল আনিতে কলসী কাঁখে লইয়া জলের ঘাটে যায়। মাহুত-প্রেমিক সেই জলের ঘাটে হস্তী-কন্যাকে প্রেম নিবেদন করে। হস্তী-কন্যা মাহুত-প্রেমিকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলে লৌকিক জগতের অভিমান-আহত প্রেমিকের মতোই তখন মাহুত-প্রেমিক বলে,

ও হস্তী-কইন্যা রে,
দোয়য়া নাই তোর—
পর-পুরুষক দেখিয়া রে॥—সং ৩৮৬

গানখানির অন্তর্নিহিত অর্থ এই : কন্যা জল আনিতে জলের ঘাটে গেল, প্রেমিক তাহাকে সঙ্গে যাইতে বলিল। অর্থাৎ অরণ্যের হাতীকে মাহুত খেদায় আসিতে আহ্বান জানাইতেছে।

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী জল আনা ও জলের ঘাটের প্রসঙ্গে হস্তী-কন্যা শেষ পর্যন্ত রাধা এবং মাহুত কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়। বড়াই বুড়ীও আসিয়া তাহার নির্দিষ্ট ভূমিকা লইয়াছে। 'মৈষালি' গানেও মৈষাল কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মাহুত-প্রেমিক বড়াই বুড়ীকে শুধায়, হস্তী-কন্যার সহিত একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে। হস্তী-কন্যার কিন্তু মাহুত-প্রেমিককে মনে ধরে নাই। তাই মাহুত-প্রেমিক যখন হস্তী-কন্যাকে তাহার কথা শুনিতে বলিল, সে শুনিল না। তখন মাহুত-প্রেমিক ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী-কন্যার তামার কলসী ভাঙিয়া দিল। কিন্তু হস্তী-রাধাও চতুরা। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকার মতো ছলচাতুরী তাহারও কিছু কিছু জানা আছে। সে বাড়ী আসিয়া কহিল, ওগো মা, উঁচুনীচু পথে হাঁটিতে পারি না, এই দেখ, পিছলাইয়া পড়িয়া আমার কলসী ভাঙিয়া গিয়াছে (সং ৩৮৬ক)। এই তামার কলসী হস্তী-কন্যার আভিজাত্য ও আঞ্চলিক বিশেষত্বের সূচনা করিতেছে।

৩৮৭-সংখ্যক গানটিতে মাহুত-প্রেমিক ও হস্তী-কন্যার প্রেমের একটি দিক বর্ণিত হইয়াছে। গানে বলা হইতেছে,—অরণ্যরাজের দুহিতা হস্তী-কন্যা যেরূপ রজ্জু-দ্বারা বন্দী হইয়াছে, আমি মাহুতও হস্তী-কন্যার সেই প্রেম-রজ্জুতে বন্দী হইয়াছি। হাতীর প্রতি মাহুতের এই প্রেমে মৈষালি পর্যায়ের ৩৬১-সংখ্যক গানখানিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সেখানেও দেখিয়াছি— মহিষের প্রতি মৈষালের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

আলোচ্য গানটির পরবর্তী স্তবকগুলিতে মাহুতের বক্তব্য আরো স্পষ্ট। মাহুত বলে, চন্দ্রহীন আকাশে তারার আলো অন্ধকার দূর করিতে পারে না। সেইরূপ যে হস্তীর মাহুত নাই, তাহার জীবনও অন্ধকার। অতএব, তুমি আমাকে মাহুত রূপে স্বীকার কর। এইরূপ দুই-চারিটি উপমা দিয়া মাহুত তাহার বক্তব্য হস্তীর নিকট পেশ করিয়াছে। এই সকল উপমার মধ্যে হস্তীর উপর মানবিকতা আরোপের চেষ্টা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

এই সমস্ত গান সত্যসত্যই হাতীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অনেক মাহুতের মুখে শুনিয়াছি, হাতীর সঙ্গীত-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। বিজন বনে অথবা নির্জন রাস্তায় মাহুত যখন হাতীর পিঠে চড়িয়া এই সকল গান গায়, তখন প্রতিবার সমের সময় মাথা ঝাঁকাইয়া হাতী তাহাতে তাল দেয়। 'বিরুয়া' গানের সুরের কারুণ্য হাতীকেও বিচলিত করে। মাহুত যখন নিজের জীবনের দুঃখ-ব্যথা অথবা হাতীর বন্দী-জীবনের ব্যথাকে 'বিরুয়ার' করুণ সুরের মধ্যে রূপ দেয়, তখন অনেক সঙ্গীত-প্রিয় হাতীর চোখ দিয়া জল পড়ে। গান দিয়া পশুকে যে এভাবে ভোলানো যায়, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। ভাবের মধ্যে আন্তরিকতা এবং সুরের মধ্যে কারুণ্য 'বিরুয়া' গানের সম্পদ।

গান দিয়া হাতীকে বশ করিবার প্রথা কিছু নতুন নয়। চর্যাপদের একটি গানে (সং ১৭) হাতী ধরার গানের উল্লেখ মিলে। বাঙলাদেশের অন্যত্র—যে সকল স্থানে হাতী ধরা হইয়া থাকে, সেখানেও হাতী বিষয়ক গানের চলন আছে। দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" (১৯৩০)-র তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'হাতী খেদার গান' নামে একটি রচনা পাই। গানখানি চট্টগ্রামের পার্বত্য-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং উহার বিষয় হইল—অছি মিঞার পিতা গোলবদনের শিকার কাহিনী।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 'বিরুয়া' গান এবং চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত উক্ত 'হাতী খেদার গানে'র তুলনা করিলে দুইয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য মিলে না। 'বিরুয়া' খণ্ডগীতি। প্রেম, বিরহ, দুঃখ, কারুণ্যই ইহার উপজীব্য। চট্টগ্রামের হাতী খেদার গান, পালা গান, উত্তেজনাপূর্ণ শিকার-কাহিনীই ইহার বিষয়। 'বিরুয়া' গানের করুণ-কোমলতা ইহাতে নাই, ইহাতে বাস্তবজগতের হস্তী শিকারীর কাহিনী। সাহিত্যিক মূল্য ও মানবিক আবেদনের দিক দিয়া বিচার করিলে

CENTRAL LIBRARY

'বিরুয়া' গানের পার্শ্বে চট্টগ্রামের হাতীখেদার পালা-গানটিকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। মানুষের জীবনের যে সর্বব্যাপী বৈচিত্র্য এবং হস্তী-জীবনের যে দুঃখ-গাথা 'বিরুয়া' গানকে সাহিত্যসম্পদ দ্বারা বিভূষিত করিয়াছে, সেই জীবন-বৈচিত্র্য, পশু ও মানুষের মিলিত দুঃখ-পাঁচালি চট্টগ্রামের পালাগানে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ॥

॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বিরুয়া'-গানগুলির সম্পর্কে নতুন কিছু বলিবার নাই। এইগুলি নির্বিশেষ নর-নারীর বিরহের গান। হাতী বা মাহুতের জীবনের সহিত ইহাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই। বিষয়ের দিক দিয়া দেখিলে, এই গানগুলিকে প্রেমের গানের সঙ্গেই সঙ্কলিত করা উচিত ছিল। কেবলমাত্র 'বিরুয়া' গানের আর একটি রূপ দেখাইবার জন্যই এই গুলিকে 'বিরুয়া' গানের সঙ্গে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। নতুবা 'বিরুয়া' গানের সহিত ইহাদের সঙ্কলিত করিবার অপর কোনো হেতু নাই। অবশ্য, 'বিরুয়া' নামীয় একটি সুর (গায়কদের মতে) এই সমস্ত গানের মধ্য দিয়া উদাহৃত হইয়াছে বটে।

প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-ব্যথার আন্তরিক প্রকাশ এইসকল গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিরহ-কাতরা প্রেমিকা খেদ করিয়া কহিতেছে, তাহার 'প্রাণোনাথ' অন্য নারীর গৃহে যায়,—তাহারই আঙিনা দিয়া। অন্য নারীর সহিত 'প্রাণোনাথের' এই আলাপ-পরিচয়ে প্রেমিকা অভিমান করিয়া বলে, 'এ হোন যৌবনো সাগরে ভাসামো পাষাণে ভাঙিব মাথা'। শয্যায় 'প্রাণোবন্ধু'-র অনুপস্থিতি তাহার বুকখানিকে ব্যথায় ভরাইয়া তুলিয়াছে। জলের ঘাটে যাইবার কালে 'বন্ধু'-কে ইশারা করিয়াও তাহার নিকট হইতে সন্তোষজনক সাড়া পায় নাই (সং ৩৮৮)। অভিমানআহত প্রেমিকার খেদ এই গানে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে।

পরের গানখানিতে গোপন প্রেমের অনিবার্য দাহ-জ্বালার কাব্যিক প্রকাশ

CENTRAL LIBRARY

লক্ষ করা যায়। নলখাগড়ার বনের আগুনের মতো প্রেমিকার মনে ধিকি ধিকি প্রেমের আগুন জ্বলিতেছে। গভীর খেদ ও অভিমানে সে গায়,

আজি মোর নারীটার অন্তর জ্বলে
ভিতরে বাহিরে।
আজি পর কি আপনার হয়
বান্ধব রে॥—সং ৩৮৯

পরকীয়া প্রেমের মধ্যে একপ্রকার জ্বালাময় আকর্ষণ আছে। পিতামাতা এবং স্বামীর দৃষ্টি এড়াইয়া প্রেমিকা তাহার প্রেমিককে দেহ-মন দান করিয়াছে। আজ সেই বন্ধুর নিকট পান-সুপারি প্রেরণ করিতে না পারিয়া প্রেমিকা ব্যথা-কাতর হইয়া গাহিতেছে, 'আজি কার হাতে জোগামো বন্ধুর গুয়া' (সং ৩৯০)।

৩৯১ ও ৩৯২-সংখ্যক গানে দাম্পত্য-বিরহের প্রকাশ দেখা যায়। সোনার বাটিতে ক্ষার এবং রূপার বাটিতে 'খইল' লইয়া কন্যা গিয়াছে নদীর ঘাটে স্নান করিতে। এক রাজা নৌকা লইয়া যাইতে যাইতে কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। স্ত্রী-র বিরহে স্বামী উদাসী হইয়া পথে পথে চলিল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে। পথে যাহারই সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাকেই সে শুধাইয়াছে—'কেশমতী নারী'-কে পথ দিয়া কেহ যাইতে দেখিয়াছে কিনা।

৩৯৩-সংখ্যক গানেও প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের ব্যথা বর্ণিত হইয়াছে। বক এবং দুধের চেয়েও যাহার হাতের শাঁখা শুভ্রতর, চন্দ্র-সূর্য এবং ডালিমের ফুলের চেয়েও যাহার সীঁথির সিঁদুর উজ্জ্বলতর, সে আজ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই কন্যার জন্য তাহার পিতা-মাতা, পশু-পাখী কাঁদিতেছে, প্রেমিকের মন ঝুরিতেছে। গানটির মধ্যে লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট রচনা-রীতিটি অনুসৃত হইয়াছে।

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলিত হইবার আকুল আকাঙ্ক্ষার কাব্যিক প্রকাশ ৩৯৪-সংখ্যক গানটিতে দেখা যায়। প্রেমিক পুরুষ প্রেমিকাকে বলে, নদীতে যেমন শ্যাওলা ভাসে, তুমিও তেমনি ভাসিয়া আমার ঘাটে আসিয়া পৌঁছাও। তোমার জন্য আমার প্রাণ-মন ফাটিয়া যাইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

৩৯৫-সংখ্যক গানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ইহা বিরহের গানই বটে, কিন্তু সে বিরহ মৃত্যু-জনিত বিচ্ছেদ। প্রেমিকার নাম সমারী, সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃতদেহকে ঘিরিয়া তাহার পতি ও অন্যান্য স্বজনেরা কাঁদিতেছে। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি কাঁদিতেছে, সমারীর প্রণয়ী। পরিশেষে, সমারীকে দাহ-কালে যে ধোঁয়া উঠিয়াছে, প্রেমিক যেন সেই ধোঁয়ার সহিতই উধাও হইতে চাহিয়াছে।

বিরহের গান হিসাবে বিচার করিলে, 'বিরুয়া'র দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিটি গানই আবেদনের দিক দিয়া মর্ম-স্পর্শী এবং সব কয়টি গানই সমান সুন্দর।

CENTRAL LIBRARY

॥ সোনারায়ের গান ॥

॥ ১ ॥

অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত মানুষ যেমন দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতাকে পূজার মাধ্যমে তুষ্ট করে, তেমনি উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত মানুষ ইতর প্রাণীর পূজা করিয়া থাকে। এমনি করিয়াই সর্প ও ব্যাঘ্র উপাসনার প্রচলন হইয়াছে। সাপ-বাঘকে কুল-প্রতীক (totem) রূপে গণ্য করিবার প্রবণতাও ইহার পশ্চাতে আছে। tiger-cult, tiger-lore-এরই অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ।

উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্র-দেবতাকে বলা হয় 'সোনারায়'। ব্যাঘ্রের উপাসনা উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গের সর্বত্রই চালু আছে। পূর্ববঙ্গে এই ব্যাঘ্র-দেবতাকে 'বাঘাই' এবং তাঁহার গানকে বলা হয় 'বয়াত'[১]। দক্ষিণ বঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে 'কালুরায়' ও 'দক্ষিণরায়' নামে ব্যাঘ্রদেবতা পূজা পাইয়া থাকেন। tiger-lore-এর নিদর্শন ভারতবর্ষের তিনটি রাজ্যে বিশেষ করিয়া মেলে: আসাম, বাঙলা এবং মধ্যপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশেও মেলে।

সোনারায় নামে ব্যাঘ্র-দেবতা উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন[২]। পাবনা, রঙপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি হইতে শুরু করিয়া আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী অঞ্চলেও ব্যাঘ্র-দেবতা সোনারায় নামেই পূজা পান।

সোনারায়েরা দুই ভাই,—সোনারায় ও রূপারায়। ইহারা ব্যাঘ্র-দেবতারূপে পূজা তো পানই, উপরন্তু অন্যান্য দেবতার আরাধনার সময়েও মন্ত্রে ইহাদের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে।

সোনারায়ের গান বা পাঁচালি বর্তমান সঙ্কলনেই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে না। ১৩১৬ সালের রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় দুই দফে সোনারায়ের গানের দুইটি পাঠ মুদ্রিত হয়। পরে ১৯২২

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯।

২ জার্নাল অফ্ দি ডিপার্টমেন্ট অফ্ লেটার্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টম খণ্ড, ১৯২২, পৃঃ ১৪১-২০৬।

CENTRAL LIBRARY

সনে 'জার্ণাল অফ্ দি ডিপার্টমেণ্ট অফ্ লেটার্স'-এ অষ্টম-খণ্ডে তুইটি পাঠ পুনর্মুদিত হইয়াছিল। ১৩৪৫ সালে ধুবড়ী হইতে শ্রীঅজয় কুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'সোনারায়ের গীত' মুদ্রিত হয়। জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনও রঙপুর জেলা হইতে সোনারায়ের গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সোনারায়ের পাঁচালির এই সকল পাঠ ও পাঠান্তর পাঠ করিলে সোনারায়ের গানের তুইটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। উহার এক ধারায় রহিয়াছে সোনারায় এবং রূপারায়ের জন্ম-কাহিনী এবং মুসলমান মোগল সৈন্তদের পরাজিত করিয়া আপনাদের মহিমা প্রচার; অপর দিকে পাই এই সোনারায়ের নাম করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা মাগার গান। এই শেষোক্ত ধরণের গানই বর্তমান সঙ্কলনে সঙ্কলিত হইয়াছে। কেননা, এই ধরণের গান অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই।

সোনারায়-রূপারায়-এর পরিচয় প্রসঙ্গে জনৈক ঐতিহাসিক লিখিতেছেন ঃ

"মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা তৎপূর্বে, কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় এবং রূপারায় নামক তুইজন ধর্ম-সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহাদের প্রকৃত বিবরণ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। সোনারায়, রূপারায় এবং গোরক্ষনাথের দেশ-প্রচলিত গীতে মুসলমানদের প্রসঙ্গ থাকায় ঐ গীতগুলি এদেশে মুসলমান আগমনের পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সোনারায়ের সহিত মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্তও গীতে শ্রুত হয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের গড় বা পাট এ পর্যন্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সোনারায় ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক এবং তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত কতকটা শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ। সোনারায় এবং রূপারায়ের গীত এখনও এতদঞ্চলে (কোচবিহারে) শুনা গিয়া থাকে[১]।"

ধর্ম-সংস্কারক সোনারায় ও রূপারায় যে কেমন করিয়া ব্যাঘ্র-দেবতা হইয়া উঠিলেন, তাহা এক বিস্ময়ের বিষয়। চতুষ্পদ প্রাণীর Anthropomorphic রূপ-প্রাপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তেমনি মানুষের সঙ্গে ইতর প্রাণীর একাত্মতাও দৃষ্টি এড়ায় না। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সোনারায়ের গানের কাহিনী এই :

১ কোচবিহারের ইতিহাস (১৯৩৬) : খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহ্মদ, পৃঃ ৬০।

CENTRAL LIBRARY

নন্দ ও নন্দরাণী অপুত্রক ছিল, 'আটকুড়া' বলিয়া কেহই তাহাদের স্পর্শ করিত না। শেষে নন্দরাণী ধর্মঠাকুরের পূজা করিল এবং সোনারায় ও রূপারায়ের জন্ম হইল। এদিকে গ্রামে হইল ব্যাঘ্রের উপদ্রব। রাখাল বালকেরা তখন সোনারায়ের গান গাহিয়া বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা মাগিতে থাকিল। ঠাকুর সোনারায় তখন সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন মোগল সৈন্য ঠাকুরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। ঠাকুরের আহ্বানে ত্রিশ কোটি বাঘ উপস্থিত হইয়া মোগল সৈন্যকে হত্যা করিল এবং ঠাকুরের মহিমা প্রচার করিল।

সোনারায় এবং রূপারায়ের গোয়ালের ঘরে জন্ম লইবার প্রসঙ্গে ডাঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—"প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে রচিত "ডাকের বচন" নামক ছড়ার ডাককে "ডাক গোয়ালা" বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাঘ্রের দেবতা সোনারায়-ও নন্দ নামক জনৈক গোপগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহা অতিমানব বা দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে[১]।"

উপরোক্ত কাহিনী হইতে জানা যায়, সোনারায় ও রূপারায় হয়তো ধর্মসংস্কারকই ছিলেন। ধর্ম ঠাকুরের আশীর্বাদে, শ্রীকৃষ্ণ শ্বেত মাছির রূপ লইয়া গোয়ালিনী নন্দরাণীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই সোনারায় এবং রূপারায় এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে ইঁহারাই জনগণকে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ জনগণের মনে মুসলমান প্রতাপ এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, মানুষের চেয়ে অধিক প্রতাপশালী ব্যাঘ্রের আশ্রয় লইয়া, কল্পনায় সেই দুর্দান্ত মোগল সৈন্যদের পরাভূত করা হইয়াছে। বস্তুত সোনারায় ঠাকুরের গান দেশের ধর্ম-ইতিহাসের এক বিশেষ দিককে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, এই লৌকিক গানের সাহিত্যিক মূল্য না থাক, ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও উল্লেখযোগ্য। মুসলমান মোগল সৈন্যের নিধনকারী সোনারায়ের গান পাবনা জেলাতে মুসলমানগণই পৌষমাসের ভোর রাত্রিতে বাড়ী-বাড়ী যাইয়া গাহিয়া থাকে। অবশ্য, সেখানে উপরের

১ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫১), পৃঃ ২১৮।

CENTRAL LIBRARY

কাহিনীটি বলা হয় না, সোনারায়ের নাম করিয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করা হয় এবং ভিক্ষা চাওয়া হয় ॥

॥ ২ ॥

এই বাঘ পূজা করিবার পশ্চাতে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, নানা কিংবদন্তী ও বিশ্বাস ক্রিয়াশীল হইয়াছে। বাঘ totem ও দেবতার মর্যাদা পাইয়াছে প্রথমে। তারপর তাহা সাহিত্যের উপকরণে পরিণত হইয়াছে। বাঙলা দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ব্যাঘ্র-সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা সমধিক প্রাধান্য অর্জন করিলেও উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্র-সাহিত্যও পরিমাণে কিছু কম নহে। উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্র-দেবতা 'সোনারায়' নামে পরিচিত, সোনা রায়ের গান লইয়া পরে আলোচনা করিয়াছি। কি দক্ষিণবঙ্গ, কি উত্তরবঙ্গ, উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যাঘ্র-দেবতা ও ব্যাঘ্র-সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমান আক্রমণ ও অত্যাচার জড়িত আছে। মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের পিছনে এবং ওই কাব্যের দেব-দেবীর চরিত্র-পরিকল্পনার পটভূমিকায় তুর্কী বিপ্লবকে খোঁজা হয় সাপকে অবলম্বন করিয়া যেমন 'মনসা মঙ্গল' কাব্য উদ্ভূত হইয়াছিল, বাঘকে অবলম্বন করিয়া তেমনি ব্যাঘ্র-মঙ্গল কাব্যও সম্ভবত সৃষ্ট হইয়াছিল। যে কোনো কারণেই হোক, সেই ব্যাঘ্র-মঙ্গলের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী সর্বত্র মিলে নাই, কিন্তু বাঘকে অবলম্বন করিয়া ছড়া-পাঁচালি-গান-গাথা-শ্লোক এখনও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে নাই।

রঙপুর হইতে প্রাপ্ত 'চম্পাবতী কইন্যার পালাগান' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার বাঙলা একাডেমী হইতে এই দীর্ঘ পালাগানটি প্রকাশিত হইয়াছে (লোকসাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থমালা, সং ৭ : আষাঢ়, ১৩৭০)। ইহার কাহিনী এই প্রকার : শাহ্ সেকান্দর এবং তাঁহার রাণী অকুপা বসবাস করিতে-ছিলেন ; একদা রাণী নদীর জলে একটি ছয়মাসের শিশুকে পান, নাম রাখেন গাজী। তাহার পর নিজের সন্তান হইলে নাম রাখেন কালু। গাজীর সহিত পরীগণ চম্পাবতী কন্যার মিলন সাধন করিয়া আবার বিচ্ছেদ ঘটান। ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া গাজী চম্পাবতীকে না দেখিতে পাইয়া ভ্রাতা কালুকে ঘটক হিসাবে প্রেরণ করেন। চম্পাবতীর পিতা হিন্দু, তাই গাজীর সহিত

CENTRAL LIBRARY

কন্যার বিবাহ দিতে চাহিলেন না, কালুকেও বন্দী করিয়া রাখিলেন। গাজী তখন হাজার হাজার বাঘ লইয়া কালুকে উদ্ধার করেন এবং চম্পাবতীকে বিবাহ করেন।

পালাগান ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতার পূজার জন্যে চাঁদা সাধিবার ছড়া পাওয়া যায়। অধ্যাপক আলমগীর জলিল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : চৈত্র, ১৩৭০) বইতে এই ধরণের কয়েকটি ছড়া প্রদত্ত হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলায়, তিস্তানদীর পূর্বাঞ্চলের এক লৌকিক দেবী 'ভাণ্ডারণী'র কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। 'ভাণ্ডারণী' ব্যাঘ্র-বাহনা দেবী, বিজয়া দশমী বা তাহার পরদিন এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। দেবী দুর্গাই নাকি স্বর্গের পথে 'ভাণ্ডারণী' সাজিয়া থাকেন। ইহা যে পরবর্তী-কালীন সংযোজন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অধুনা এই কিংবদন্তীর প্রভাবে 'ভাণ্ডারণী'র বাহন বাঘটি ক্রমেই সিংহ হইয়া পড়িতেছে।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবাড়ীর দুর্গা প্রতিমার বিশেষত্ব এইখানে লক্ষ করিতে হইবে। এ বিষয়ে একটি কিংবদন্তী আছে : কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সময় হইতে কোচবিহারে দুর্গোৎসব প্রচলিত হয়। নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ, তাঁহারই বাহুবলে কোচবিহার রাজ্য প্রসারিত হয়। শুক্লধ্বজকে এই বলিয়া কেহ কেহ উস্কাইতে থাকে যে, যেহেতু তাঁহারই পরাক্রমে এই রাজ্য প্রসারিত হইয়াছে, অতএব তাঁহারই রাজা হওয়া উচিত। প্ররোচিত হইয়া শুক্লধ্বজ নরনারায়ণকে হত্যা করিতে গেলেন, যাইয়া দেখেন দশভুজা দুর্গা রক্তবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া নরনারায়ণকে রক্ষা করিতেছেন। দেবী তারপর শুক্লধ্বজের নিকট নিজরূপ প্রদর্শন করেন। মহিষাসুর মর্দিনীরূপের মধ্যে শুক্লধ্বজ দেখিলেন, অসুরের ডান হাত সিংহ দংশন করিয়াছে কিন্তু বাঁ হাত সম্পূর্ণই অক্ষত আছে। দেবীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, দেবী তাঁহাকে অসুরের বাঁ দিকে একটি ব্যাঘ্র স্থাপন করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অদ্যাপি কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবাড়ীর দুর্গা প্রতিমাতে দেখা যায় অসুরকে ডানদিকে সিংহ ও বাঁ দিকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিতেছে; দেবীর গাত্রবর্ণও রক্তের ন্যায় লাল এবং নবমীর রাত্রিতেই দেবীর বিসর্জন হইয়া

থাকে। এই কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, দেবীর পৌরাণিক মূর্তির সহিত আঞ্চলিক ও লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতা যুক্ত হইয়াছেন।

লৌকিক দেবতারূপে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্র-দেবতা মূলত 'বনদেবতা', এবং তাঁহার নাম কখনো 'কণ্ঠপাল'। মনে হয়, বনের উপকণ্ঠস্থিত মানুষ ও পশুর পালন-কারী বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে ইহার বিশেষ প্রতাপ। করতোয়া এবং নীম নদীর সংযোগস্থলে, একটি দ্বীপময় ভূভাগ এই ব্যাঘ্রদেবতার আবাসভূমি বলিয়া কল্পিত হয়। খানিকটা ইতিহাসও আবার ইহার মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে: বাঙলার পালবংশের এক রাজার নাম ছিল 'কণ্ঠপাল', করতোয়া-নীম নদীর সংযোগ স্থলেই ছিল তাঁহার রাজধানী। সে রাজবাড়ী একটি মাটির ঢিবিতে কালক্রমে পরিণত হয়। প্রতিদিন তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিত দুইটি বৃহদাকার কুকুর,—ইহারাই কণ্ঠপালের দুই সদা জাগ্রত প্রহরী। আজও কেহ কেহ সেই কুকুর দুইটিকে দেখিতে পায়। প্রতি বৎসর কণ্ঠপালের উদ্দেশে পূজা-বলি নৈবেদ্যাদি না দিলে অরণ্যের বাঘেরা ক্ষেপিয়া উঠে এবং মানুষ ও গবাদি পশুর উপর আক্রমণ চালাইয়া থাকে। এই বিশ্বাস অনুসারে 'কণ্ঠপালে'র কুকুর (নেকড়ে ?) ও বাঘ একাকার হইয়া গিয়াছে।

রাখাল ও মহিষপালকগণও গোরু-মহিষ চরাইবার জন্যে অরণ্য ও সন্নিহিত অঞ্চলে যায় বলিয়া ব্যাঘ্র-দেবতার পূজা করিয়া থাকে। মহিষপালকদের বলা হয় 'মইষাল' বা 'মৈষাল'। মহিষের বাচ্চা হইলে তাহার দুধ খাইবার পূর্বে সেই দুধ ব্যাঘ্রদেবতার নামে নিবেদন করিয়া নানা উপচারে পূজা দিতে হয়। এই ব্যাঘ্রদেবতার নাম 'ডাং-ধরা ঠাকুর'। ইহার হাতে একটি 'দণ্ড' (ডাং) থাকে বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। সকল মহিষপালকের পুরোহিত সাজিয়া এই ব্যাঘ্রদেবতাকে পূজা করিবার অধিকার নাই, এ বিষয়ে taboo রহিয়াছে। যে মহিষপালক কোনো গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছেন তিনিই এই পূজা করিবার অধিকারী। এইরূপ পুরোহিতকে বলে 'ভজামৈষাল' অর্থাৎ ভজনা করিবার অধিকারী তিনি। 'ভজামৈষাল' গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র প্রাপ্ত হন, তাহাই উচ্চারণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলে বাঘের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। অনুরূপ বিশ্বাস সুন্দরবনের সম্পর্কেও প্রচলিত আছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ ৩ ॥

এইবার প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ এবং আসামের ধুবড়ী-গোয়ালপাড়া জেলার সোনা-রায়ের পূজা-পদ্ধতির ও গানের পরিচয় দিব।

সমস্ত পৌষমাস ভরিয়া বালক ও কিশোরগণ বাড়ী-বাড়ী যাইয়া সোনা-রায়ের ছড়া গায় এবং চাঁদা সংগ্রহ করে। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বনে বা নদীর ধারে যাইয়া সেই চাঁদায় বন-ভোজন করিয়া থাকে।

দল বাঁধিয়া ভিক্ষা চাওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে থাকে মাঝারি আকারের এক-একটি বাঁশ বা লাঠি। সেই বাঁশ বা লাঠিকে কাপড়, ফুল ও রঙ দিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া লওয়া হয়। উহাই সোনারায়ের নামে উত্তোলিত বাঁশ বা লাঠি। প্রসঙ্গত, মাদারপীর বা মদনকামের নামে উত্তোলিত বাঁশের কথাও স্মর্তব্য। শিয়াল-কুকুর ক্ষেপিয়া উঠিলে মাদার পীরের নামে উত্তোলিত বাঁশের প্রতিক্রিয়ায় উহারা ঠাণ্ডা হয়। শিয়াল-কুকুরের ক্ষেপিয়া যাইবার সঙ্গে ক্রুদ্ধ বাঘকেও ভুলিতে পারা যায় না।

দলের মধ্যে কেহ খোল বাজায়, কেহ করতাল বাজায়। এইভাবে প্রতি বাড়ীর দরজায় যাইয়া সোনারায়ের ছড়া গাওয়া হয়। একমাস ধরিয়া এই ভাবে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পৌষ-সংক্রান্তির দিন সবাই কোনো নির্জন প্রান্তর, উপবন বা নদীর ধারে জমায়েত হয়। একটি স্থান বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া সোনারায়ের নামে উত্তোলিত সেই বাঁশ বা কাঠি পুঁতিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে হয় পূজা। পূজাতে পুরোহিত নাই, ঘটস্থাপন নাই। নিজেরাই কোনো রকমে তাহা সারিয়া লইয়া, সংগৃহীত চাঁদায় চড়ুইভাতি করিয়া থাকে। ইহাকে কেহ কেহ 'আখাল সেবা' বা 'আখাল ভোগ'ও বলিয়া থাকে। রাখাল বালকগণই এই পূজার প্রধান উদ্যোক্তা এবং গোরু-মহিষ ইহারাই চরাইয়া থাকে বলিয়া বাঘের ভয় ইহাদেরই বেশি। এইজন্য সোনারায়ের নামে চাঁদা নেওয়ার নামান্তর 'আখাল সেবা' বা 'আখালভোগ' হইয়া থাকিবে।

যে ছড়া গান গাহিয়া সোনারায়ের নামে চাঁদা চাওয়া হয়, তাহাতে বলা হয়, 'দুঃশাসনী বাঘ নিয়া' সোনারায় ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গের সব বাঘই 'মান্‌ষি-কাম্‌ড়া'। সুতরাং সেই সোনারায়ের নামে সকলে দক্ষিণা দাও। এজন্যে লাগিবে পূর্ণ এক কুলা ধান এবং এক জোড়া সুপারি। যে রমণী সোনারায়ের দক্ষিণা দিতে অবহেলা করিবে, গোরু চরাইবার কালে

CENTRAL LIBRARY

তাহার স্বামীকে বাঘে খাইবে। শুধু তাহাই নয়, তাহার হাত-পা খসিয়া পড়িবে, চোখে ছানি পড়িবে। আর সোনারায়ের দক্ষিণা দিলে ধন বাড়িবে, জন বাড়িবে, রাজদরবারে মান বাড়িবে। তাহার শত্রুকে বাঘে খাইবে, জাঙলায় বড়ো-বড়ো লাউ ফলিবে (সং ৩৯৬)।

বাঙলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পশ্চাতে তুর্কী বিপ্লবোত্তর মুসলমান শাসন ও অত্যাচারের কথা বলা হয়। যবন শাসকদের ক্রোধোন্মত্ত মূর্তিই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সোনারায়ের গানে তাহারই অপর দিক ধরা পড়িয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

দশম অধ্যায়

। ভক্তিগীতি ।

॥ গারামগীতি ও নাড়ুখোয়া গান ॥

॥ ১ ॥

গ্রাম-জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা গ্রামদেবতা। এই গ্রাম-দেবতাকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে বলা হয় 'গারাম'। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন ইত্যাদি উপলক্ষে 'গারাম' দেবতার পূজা করা হয় সর্বাগ্রে। ইহা ছাড়া, কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি মহামারী বা অন্যান্য আধি-দৈবিক ও আধি-ভৌতিক বিষয়েও 'গারাম' দেবতার পূজা করা হয়।

এই গ্রাম-দেবতার যখন পূজা করা হয়, তখন ভক্তিগীতি গাওয়া হইয়া থাকে। পূজা দেওয়াকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে 'সেবা' দেওয়া বলা হয়। গারাম-দেবতার পূজা-কালীন গানকে তাই 'গারাম সেবার' গানও বলা হইয়া থাকে।

৩৯৭-সংখ্যক গানখানি এইরূপ একখানি গারামসেবার গান। গানখানির বক্তব্য এই : গারাম ঠাকুরের ক্ষুধা পাইয়াছে, তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইবে, তাই তাহার আয়োজন করা হইতেছে, তাই গারাম-তলায় ঢাকের বাদ্য শোনা যাইতেছে।

গানখানির বক্তব্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু, এই সামান্য চারি পঙক্তির একখানি গানের মধ্য দিয়া লোক-মানসের যে প্রকাশ হইয়াছে তাহা অপূর্ব। দেবতাকে কতোখানি আপনার করিয়া লইলে, তবে তাঁহার মানুষের মতো ক্ষুধা পাইবার কথা উল্লিখিত হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেবতার উপর সাধারণ মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণার ভাব আরোপের মধ্যে গানখানির বিশেষত্ব আছে। জড় বস্তুর উপর এখানে মানবিক চেতনা আরোপ করা হইয়াছে। ইহা **Animism**-এর ফল।

॥ ২ ॥

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষত জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানায়,—গ্রামদেবতার পূজার নৈবেদ্যের বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত এখানে দই-চিঁড়া-মুড়কি এবং বিচিওয়ালা কলার ভোগ দেবতার

CENTRAL LIBRARY

উদ্দেশে অবশ্যই নিবেদন করিতে হইবে। চিঁড়া-মুড়কির সহিত অনেকে মোয়াও দিয়া থাকে। মোয়া-কে ওই অঞ্চলে বলা হয় 'নাড়ু' (শব্দের অর্থ পরিবর্তন)। যে গান দেবতার নাড়ু-মোয়া খাইবার সময়, অর্থাৎ পূজার সময় গীত হয়, তাহাকে বলে 'নাড়ু-খোয়া গান'। ৩৯৭ক-সংখ্যক গানটি এইরূপ একটি 'নাড়ু-খোয়া' গান।

কিন্তু, নামে 'নাড়ু-খোয়া' গান হইলেও গানটির বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে নাড়ুর নাম নাই। সেখানে আছে করুণাময় ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনের আকুতি। ভক্ত গাহিতেছেন, ভগবান, কি দিয়া তোমার রাঙা চরণ পূজা করিব। ফুল দিয়া পূজা করিতাম, কিন্তু সে ফুল 'ভোমোরা' খাইয়া গেল। দুধ দিয়া তোমার নৈবেদ্য সাজাইতাম, কিন্তু বাছুরে তাহা খাইয়া ফেলিল। দূর্বা দিয়া পূজা করিতাম, কিন্তু, ছাগলে আসিয়া তাহা খাইয়াছে। মন দিয়া পূজা করিতে পারিতাম। কিন্তু, সে মনও আমার ভালো নয়।

এই গানের মধ্যেও লোক-মানসকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আদিম মানুষের সরলতা ও স্পষ্টতা লইয়া নিজের মনের মলিনতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ভ্রমরা, বাছুর ও ছাগলের ফুল, দুধ ও দূর্বা খাইবার উল্লেখের মধ্যেও একটি সারল্য লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা লোক-সাহিত্যের রচনা-রীতির এক বৈশিষ্ট্য॥

CENTRAL LIBRARY

॥ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গীতাবলী ॥

॥ ১ ॥

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের আহেল বাসিন্দা রাজবংশীদের জীবনে বৈষ্ণবতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ইহাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব যেমন আছেন, তেমনি নিছক বৈষ্ণবতাকেও অনেকে জীবনে স্থান দিয়াছেন।

বৈষ্ণবের তুলসী গাছ প্রায় প্রতি বাড়ীর অঙ্গনেই দেখা যায়। আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণবগণ এক-একজন বৈষ্ণব গুরুর 'পাঠ' গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'পাঠ' গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে বলা হয় 'পড়ুয়া'। রাজবংশীদের মধ্যে অনেক পড়ুয়া সম্প্রদায় আছে; যেমন, নিত্যানন্দ, রামানন্দ, কৃষ্ণ, নিমানন্দ, সইদগুরু কানাইয়া, বলাইয়া প্রভৃতি। বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর 'পাঠ' গ্রহণ করে। সাধারণত একই পড়ুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি হয় না। এই 'পাঠ' দিয়াই অনেক সময় রাজবংশী বৈষ্ণবদের গোত্র নির্ণয় করা চলে।

বৈষ্ণবতা রাজবংশীদের ধর্ম জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। ক্রিয়া-কর্মেও তাই বৈষ্ণবতা লক্ষিত হয়। সন্তানের বয়স হইলে রাজবংশিগণ তাহার মাথা মুড়াইয়া কান বিঁধাইয়া 'পাঠ' দেয়। ইহাকেই বলে 'চূড়াকরণ'। অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ও মৃতদেহ দাহ কালে ইহারা 'কীর্তন' গান গাহিয়া থাকে। রাঢ়বঙ্গের কীর্তনের সুর ও টাইপ, যেমন গড়ানহাটী, রেনেটি, মনোহরশাহী প্রভৃতির কোনো ছাপ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কীর্তনে নাই। উহার কীর্তনের সুর অনেকটা আলাদা। বৈষ্ণবের শ্রীখোল রাজবংশীদের সর্বপ্রকার গানের বাদ্যযন্ত্র।

রাজবংশীদের মধ্যে বৈষ্ণবতার এই প্রাবল্যের ঐতিহাসিক কারণও খুঁজিয়া পাই। আসামের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম জগতের মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশঙ্কর দেব (১৪৫৯-১৫৬৯) আসামের পশ্চিমে, কোচরাজগণ কর্তৃক শাসিত কামতা রাজ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৫৪০ খ্রীঃ শঙ্করদেব কামরূপ জেলার বরপেটা নামক স্থানে আসেন। তখন বরপেটা কোচরাজগণের শাসনাধীন ছিল।

"He spent the remaining years of his life in Barpeta in comparative peace. The major portion of his writings namely

the songs, dramas and kavyas were composed here.[১] শুধু ইহাই নহে। শঙ্করদেব "Paid occasional visits to the court of the Koch Kings at Coochbehar at the invitation of the Kings. He passed away at Cooch Behar in 1569 A. D. on one of such visits."[২]

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও স্মর্তব্য। ১৫৩৩ খ্রী: (অথবা ১৫৪০ খ্রী:) কোচরাজ নরনারায়ণ শাসক, সংস্কারক ও বিজেতারূপে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। অনেক দিক দিয়াই, বিশেষত তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার মধ্য দিয়া, তিনি একজন আদর্শ হিন্দু নরপতি ছিলেন। ইনি ১৫৬০ খ্রী: গৌহাটির নিকট কামাখ্যা মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করান, ইনিই বৈষ্ণব ধর্মের পুন: প্রবর্তন করেন। ইংরেজ পর্যটক রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ যখন কোচরাজ্য পরিদর্শন করিতে আসেন তখন "The neo-Vaishnavism of Sankardeva of Assam had made great progress among the people—at least among some sections of it."[৩]

ইহারই প্রভাবে কোচবিহারে কিছু বৈষ্ণব পদ, নাট বা যাত্রাপালা রচিত হইয়াছিল। কোচবিহারের পশ্চিমে অবস্থিত মধুপুর গ্রামেই শঙ্করদেব দেহরক্ষা করেন। এইজন্য গ্রামটি শঙ্কর-পন্থিয়াদের একটি তীর্থস্থান হইয়াছে। মন্দিরে শঙ্করদেবের পাদুকা রক্ষিত আছে। প্রতিদিন কীর্তন এবং শঙ্করদেবের অনূদিত ভাগবত পূজা করা হয়। প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী এক মেলা হয়, তাহাতে শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবদের সম্মিলন ঘটে।

কোচবিহার ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে শঙ্করদেব কর্তৃক পুন:প্রবর্তিত বৈষ্ণবতা কিন্তু জনসাধারণের মনকে শেষ পর্যন্ত নাড়া দিতে পারে নাই। সেখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের। তাই দেখি, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গীতাবলীতে শঙ্করদেবের নাম বা তাঁহার বৈষ্ণবতার কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে, শঙ্করদেবই কোচরাজ্যে বৈষ্ণবতার পুন:প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

১. Aspects of Early Assamese Literature (1953), edited by B. K. Kakati, P. 68.

২. প্রাগুক্ত গ্রন্থ।

৩. S. K. Chatterjee : Kirata-Jana-Krti (1951), P. 65.

CENTRAL LIBRARY

এ সম্পর্কে ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য : 'কোচবিহার রাজসভা উৎপীড়িত শঙ্করদেবকে আশ্রয় দিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বৈষ্ণব ধর্মের দীপটি সযত্নে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল।'[১]

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মূলসূত্রগুলি নিরক্ষর রাজবংশীর মুখে মুখে ফেরে। বর্তমান সংগ্রহের ৩৫৩-সংখ্যক দীর্ঘ পাঁচালি গানটি হইতে ইহার উদাহরণ মিলিবে। এই পাঁচালি গানটি একটি সামাজিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া রচিত। ইহাতে নায়ক ও নায়িকার প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবতার মূল তত্ত্বগুলি আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনার সার নীচে সঙ্কলিত হইল।

৩৫৩-সংখ্যক গানের নায়িকা মালতীশোরী বলিয়াছে : 'নারী হইল্ তোর আসল গুরু কহচে ভাগবত'। 'নারীর প্রেমে জগৎ বাঁধা, শ্রীগুরু হয় শ্রীমতী রাধা'। 'নারী ছাড়া নাই হর-হরি'। 'নারী নোকটা আইনমত অনাদি ঈশ্বর ; নারীটায় তো ব্রহ্মার ঘর'। 'কলি যুগে নিমাই চান…কিষ্টো নামে পাগল হয়া ধরিল্ রাধার ভাব। রাধার ভাবে ভাব ধরিয়া হইল্ সন্ন্যাস'। 'স্ত্রী-পুরুষ এক ; দুই জনেতে প্রেম হয়, শাস্ত্র খুলি' দেখ'। 'দুই দেহায় এক দেহা হও ;…যুগল হবা' না পারিলে দেহার নাইরো মুক্তি'। 'দুই দেহায় এক দেহা হলে ভগবান করে দয়য়া।' 'স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে সমান হওয়া চাই। যেনং ছিল রাধা—দনো ঝনে হিষ্ট-পিষ্ট, কাম-বাসনা নাই।' 'মাইয়া হইল্ প্রেমের গুরু, অয়হে বাঞ্ছা কল্পতরু'। 'নারীকে কর বশ, সাধন কর পঞ্চরস। না করিয়ো কাম,—তবে সে যাইতে পার মহা নিত্যধাম।' 'রাধা হইল্ বিষ্টপিয়া কিষ্টো হইল্ নিমাই। দনোঝনে ছাড়াছাড়ি তিলমাত্র নাই।'

বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব এবং শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্ক ও স্বরূপ উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যাইবে, বৈষ্ণব তত্ত্বাদর্শ সম্পর্কে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের ধারণা কি ও কেমন। বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে যাঁহারা এতোখানি চিন্তা করিতে পারেন এবং সেই চিন্তাকে রচনার মধ্যে রূপ দিতে পারেন, বলাই বাহুল্য, বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণেও তাঁহারা গান রচনা করিবেন।

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। ১৯৪৮) পৃঃ ৩১০।

॥ ২ ॥

সংগৃহীত গানগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে 'বৈষ্ণবপদাবলী' নয়। এই জন্যই সঙ্কলনে ইহাদিগকে 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন গীতাবলী' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী কীর্তনের একটি বিশিষ্ট সুররূপ আছে, উহাতে কবির ভনিতা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা আছে। বর্তমান গানগুলির এই সকল বিশেষত্ব নাই।

১৯৮-সংখ্যক গানখানি গৌর বিষয়ক। 'গয়ুর রূপের নাই তুলনা।' এই গয়ুরের প্রেমে কবির অন্তর জর্জরিত হইয়া গিয়াছে, এ প্রেম 'শিমুল গাছের কাঁটার নাখান পাটাউ পাটাউ করে'। গানটির তৃতীয় স্তবকে দেহতত্ত্বের ক্ষীণ আভাস আছে মনে হয়।

কয়েকটি গানে শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার ব্যথা ও আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শ্রীরাধার মনে গভীর জ্বালা ধরাইয়া দেয়। রাধা তাই বলেন,

বাঁশিটা তুই বাজাইস্ কেনে।
ভাগা দিলো আরে কান্হাই
অবলারো পাণে' ॥—সং ৩৯৯

রাধা বলেন, তোমার বাঁশি কাড়িয়া লইব, মা যশোদার কাছে নালিশ করিব। 'ছিঁড়া পাটানী (রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র) দিয়া বাঁশিটাক বান্ধিয়া থুমো।' কবির কল্পনায় শ্রীরাধাও এখানে রাজবংশী মেয়ের মতো 'পাটানী' পরিয়াছেন।

৪০০ ও ৪০০ক-সংখ্যক গান দুইটি শ্রীরাধার জল ভরিতে যাওয়া লইয়া রচিত হইয়াছে। সখীসহ রাধা জল ভরিতে যাইতেছেন, পথে পথরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত কৌতুক করিতেছেন। রাধা বলেন, 'হুতি কণেক কালা তুই সরিয়া যা না রে।' কিন্তু সরিয়া যাইবার বদলে কৃষ্ণ তাঁহাদের কলসী কাড়িয়া লইলেন (সং ৪০০)। বাঁশি বাজাইয়া 'ভুল্কি মারি' ডেকায় বন্ধু নদী যাবার আলে।' কিন্তু, 'ও আই, কুন বা ছলে যাইম মুই জলর ঘাটে'। তবু যখন জল আনিতে ঘাটে যান, তখন শাশুড়ী-ননদী কেহ দেখিয়া ফেলে, এই ভয় তাঁহাকে ছাইয়া ফেলে :

CENTRAL LIBRARY

হাঁটিয়া যাও, ফিরিয়া চাও—
কাঁহো যুদি আইসে—
ওভাগোনী নারীর মন
সোদায় রে কান্দে ॥—সং ৪০০খ

৪০২-সংখ্যক গানটিতে নৌকা-বিলাসের ছাপ আছে। রাধিকা কানাই-মাঝিকে নদী পার করিয়া দিতে বলিতেছেন। কানাই নানান টালবাহানা করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন।

৪০০ক ও ৪০৩-সংখ্যক গানে শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতার পরিচয় মিলে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকার মতো এ রাধিকাও ঈর্ষায় কানাইকে গঞ্জনা দিয়াছেন। শ্রীরাধা বলেন,

কালার বাদে কান্দিয়া কান্দিয়া
নয়ন জলে বস্‌সন ভিজিয়া যায়—
···কালা বিনা তুই চউক্ষের জল
মুছিয়া দিবে রে কাঁয় ॥—সং ৪০০ক

কিন্তু, 'কালা' বুঝি অন্ত গোপিনীতে মজিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে দয়া-মায়া থাকিলে 'তাপিস পরাণ জুড়ায় হয়'। কিন্তু, কালা পুরুষ মানুষ। সাদা কাপড়ে যেমন সহজেই দাগ ধরে, 'ওইমন্ পুরুষের মন নড়ে'।

'কালাচন'-এর প্রেমে মজিয়া গভীর দুঃখে রাধার জীবন ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন,

কাঁকোতে কলোসী নিয়া
জল ভরিমো যমনা যায়া।
কলোসী ভরিমো নয়নের জলে—
রে বন্ধু ধন ॥—সং ৪০৩

৪০১-সংখ্যক গানটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। একটি পঙক্তির মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে,

ও সুন্দোরী আধে,
কদম তলাত্, বাজাও বাঁশি
তোক্ দেখি'র বাদে ॥—সং ৪০১

॥ তুক্কা ও মনঃশিক্ষা ॥

॥ ১ ॥

আপনার রসিক ও ভক্তমনকে উদ্দেশ করিয়া যে গান রচিত ও গীত হয়, তাহাকেই বলে 'তুক্কা' বা 'মনঃশিক্ষা' গান।

'মনঃশিক্ষা' এই পদটি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়—গায়ক, রচয়িতা এবং শ্রোতার মনকে ইষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই ইহা রচিত, গীত এবং শ্রুত হইয়া থাকে। ইহা যেন গায়ক বা রচয়িতার আপন মনের প্রতি আপন মনের উক্তি। বস্তু জগতের বিচিত্র বন্ধন এবং আবিলতায় আমাদের মন ভক্তিময় নিষ্কাম জগৎ হইতে নিরন্তর সরিয়া আসিতেছে। মনঃশিক্ষার গান যেন সেই সরিয়া-আসা মনকে ভগবৎ প্রসঙ্গ স্মরণ করাইয়া দেওয়া। মনকে এই গানের মাধ্যমে এইরূপে 'শিক্ষা' দেওয়া হয় বলিয়াই এই ধারার গানকে বলা হয় 'মনঃশিক্ষা' গান।

'মনঃশিক্ষা' গানকে 'তুক্কা'-ও বলা হইয়া থাকে। 'তুক্কা' শব্দের অর্থ কী, তাহা সহজে বোঝা যায় না। অভিধানে 'তুক্ক' নামে একটি শব্দ পাওয়া যায়। ইহার অর্থ 'তীব্র, ধারালো বা মর্মস্পর্শী লোকোক্তি'[১]। অপর এক অভিধানের মতে ইহার অর্থ 'শিক্ষাকালে ব্যবহার্য হুলহীন বাণ। শ্লোকের শেষ বা চতুর্থ চরণ; কীর্তনের অঙ্গ বিশেষ'[২]। 'তুক্ক' ছাড়াও 'তুক্ষ' নামেও একটি শব্দ মিলে, যাহার অর্থ 'তোষযুক্ত, সন্তুষ্ট'[৩]।

'তুক্কা' বা 'তুক্ষ' শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোনটি আলোচ্য 'তুক্কা' পদটির সহিত সম্পর্কান্বিত, তাহার বিচার করা যাক। 'তুক্কা' যেহেতু 'মনঃশিক্ষা'-রই নামান্তর, তখন মনঃশিক্ষা গানের সংজ্ঞার সহিত যেখানে 'তুক্ক' বা 'তুক্ষ' শব্দের অর্থের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, তাহাকেই 'তুক্কা' শব্দের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায়।

১. বাংলা ভাষার অভিধান : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।
২. সংসদ বাংলা অভিধান।
৩. বিশ্বকোষ : ৮ম ভাগ।

CENTRAL LIBRARY

সহজেই বোঝা যায়, যে গান তীব্র, ধারাল, মর্মস্পর্শী, যাহা ঐহিক জীবন হইতে মুক্ত হইয়া পারত্রিক প্রসঙ্গের প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিয়া রসিক ভক্তকে বস্তু জগতের আবিলতা জয় করিতে প্রণোদিত করে, তাহাই 'তুক্কা' গান। 'তুকা' শব্দ আলোচ্য উপভাষায় 'তুখ্যা' বা 'তুক্ষা' (আমরা এই বানানই ব্যবহার করিয়াছি। 'তুখ্যা' রূপেও ইহাকে লেখা চলিতে পারিত) রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। আলোচ্য উপভাষায় অল্পপ্রাণ বর্ণ অনেক সময় মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই হিসাবে তুকা—তুক্‌কা—তুক্‌খা—তুখ্যা, তুক্ষা সহজেই হইতে পারে ॥

॥ ২ ॥

আলোচ্য তুক্ষা-মনঃশিক্ষা পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে প্রতিফলিত প্রধান ভাব-সূত্র হইল—জীবনের শেষ দিনে, যে দিন মৃত্যুর ডাক আসিবে, সেই দিন ইহ জগতের তুচ্ছ সকল ধন-সম্পত্তি পিছনে পড়িয়া রহিবে, স্বজনাদির কেহই সঙ্গে যাইবে না; অতএব ধন-সম্পত্তির প্রতি লোভ করিয়ো না, স্বজনাদির প্রতি মায়া না বাড়াইয়া নিস্পৃহ হইতে চেষ্টা কর। মৃত্যু-সমুদ্র পার হইতে হইলে একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীভগবানের শরণ লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

গায়ক তাই উদাস কণ্ঠে গাহেন, ওগো মন, মিথ্যাই তুমি সংসারের ভরসা করিয়া আছ, মরণকালে এ সবই পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ বাঁশের খাটে শুইয়া তোমাকে শ্মশানে যাইতে হইবে (সং ৪০৪)। একাই তুমি ভব-সংসারে আসিয়াছ, একাই তোমাকে মৃত্যু-সাগর পাড়ি দিতে হইবে, সুতরাং আত্মীয়ের জন্য মায়া বাড়াইয়া লাভ নাই। আর যে আত্মীয়ের জন্য তুমি এতো মমতা করিতেছ, মৃত্যু হইলে তাহারা আগে তোমার ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া পরে তোমার সৎকার করিবে,—তোমার ধন-সম্পত্তিকেই তাহারা বড়ো করিয়া দেখিবে (সং ৪০৫)। কাজেই এই ঘর-বাড়ী, মায়ার বন্ধন, সবই মিথ্যা। যমদূত যখন মৃত্যুর শমন লইয়া হাজির হইবে,—তখন তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাঁদিলেও যমের হাত হইতে তোমাকে তাহারা ফিরাইতে পারিবে না (সং ৪০৬)। বাহির হইতে এই সংসারকে সোনার খাঁচা বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু, ওগো মন-ময়না, এই সোনার খাঁচা তো একদিন পরিত্যাগ করিতেই

CENTRAL LIBRARY

হইবে, তবে কেন এই সোনার খাঁচার জন্য এতো মায়া। সুতরাং 'ময়হার ছিকল কাটবি যদি মুখে বলো হরি' (সং ৪০৭)।

৪০৮-সংখ্যক গানখানিতে রচয়িতার মনের দ্বন্দ্ব ফুটিয়াছে। তাঁহার মন কখনো স্থূল জগতের ক্ষণিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় কখনো বা পারত্রিক জগতের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। রচয়িতা তাঁহার 'পাগল মন'কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, ওগো মন, দ্বিধাগ্রস্ত হইয়ো না, সম্মুখের দিকে শ্যামের নাম লইয়া অগ্রসর হইয়া যাও, চিত্তের দৃঢ়তায় সকল দুঃখের অবসান হইবে।

পরবর্তী গানখানিতে (সং ৪০৯) রচয়িতা প্রেমের নদীর অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। রসের জগতে ডুব দিয়া প্রেমময় অচিন মানুষকে চেনা যায় ; কিন্তু তাহা বড়ো দুরূহ ব্যাপার, এবং রচয়িতা সেই দুরূহ পথের সাধনার কঠোরতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

তুক্ষা ও মনঃশিক্ষা পর্যায়ের গানগুলি ভাবে ও সুরে সত্যই সুন্দর। উপযুক্ত দরদ দিয়া গায়ক যখন ইহা গাহেন, তখন মনের মধ্যে একটি পবিত্র ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই পর্যায়ের গানগুলির ভাষা খাঁটী প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা নহে। বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চলিত ভাষার সহিত ইহাদের পার্থক্য বড়ো একটা নাই। ইহা এক লক্ষণীয় ব্যাপার॥

CENTRAL LIBRARY

॥ দেহতত্ত্ব ॥

আপনার দেহের মধ্যেই বিশ্ব-তত্ত্বকে খুঁজিয়া বেড়ানো হয় যে গানের মাধ্যমে, তাহাকেই বলে দেহতত্ত্ব-মূলক গান। অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হইয়া প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ইহা 'দেহতথ্য' রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথপন্থ, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম, সুফী ও বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেহতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। হিন্দুতন্ত্রে দেহের ভিতর বিভিন্ন 'চক্র' এবং বৌদ্ধতন্ত্রে দেহের ভিতর বিভিন্ন 'কায়'-এর কল্পনা করা হইয়াছে। সাধনার পথে এই সকল 'চক্র' ও 'কায়'-এর গুরুতর ভূমিকা আছে। এইসকল সাধন-ক্ষেত্রে দেহকেই একটি ক্ষুদ্র বিশ্বরূপে কল্পনা করিয়া উহার অভ্যন্তরে আকাশ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। সাধন-পথে দেহকেই আত্মোপলব্ধির সোপান বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

বর্তমান সংকলনের ৪১০ হইতে ৪১৫-সংখ্যক দেহতত্ত্বমূলক গানগুলির মধ্যে হিন্দুতন্ত্রের সাধারণ ধারণাগুলি ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য দেহতত্ত্বমূলক গানগুলির ব্যাখ্যা যাঁহার নিকট জানা, তাঁহার নিকট ইহা কিছুই নতুন ঠেকিবে না। তবে দুই-একটি গানে ইহাদের সামান্য বিশেষত্ব আছে, সেইটুকুরই শুধু উল্লেখ করিব।

৪১০-সংখ্যক গানে আছে: 'বারোশুজ্জ চব্বিশ চন্দ্র এ দেহাতে আছে।' হিন্দুতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী করনখে দশ, দুইগণ্ডে দুই, অধরে এক, জিহ্বাতে এক এবং ললাটে আধখানা, মোট এই সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ, বর্তমান ক্ষেত্রে পাইতেছি, 'চব্বিশ চন্দ্রে'-র উল্লেখ। মনে হয়, ইহা গায়কদেরই ভুল। তেমনি 'বারো শুজ্জ' কথারও সন্তোষজনক উত্তর মিলে নাই।

৪১১-সংখ্যক গানে 'বিনা দুধের দই', 'বিনা ধানের খই', 'বিনা বাঁশের নড়ি' এবং 'বিনা পাটার দড়ি'-র উল্লেখ আছে। 'বিনা দুধের দই' খুব সম্ভব তান্ত্রিকের মতানুযায়ী দেহস্থিত 'মহারস'। মেরুদণ্ডকে বিনা বাঁশের নড়ি এবং দেহের শিরা-রগকে বিনা পাটের দড়ি বলা হইয়াছে। কিন্তু 'বিনা ধানের খই'-এর উত্তর পাই নাই। ইহাকেই কি 'পরমব' বলা হইয়াছে?

CENTRAL LIBRARY

৪১২-সংখ্যক গানের শেষে আছে : 'ষোলো নামের ষোলো রে খুঁটি, আর আছে মন সাড়ে চার টাটি'। ষোলো নামের অর্থ হইল,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, ও ষড়রিপু। মল, মূত্র, শুক্র ও রজঃ—এই চারি চন্দ্রের উল্লেখ তন্ত্রে মিলে বটে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রের 'সাড়ে চার' কি, তাহা বোঝা যায় নাই। মনে হয় ৪১০-সংখ্যক গানে 'সাড়েচব্বিশ' যেমন 'চব্বিশ' হইয়াছে, বর্তমান গানে তেমনি 'চার' 'সাড়ে চার' হইয়াছে।

৪১৩-সংখ্যক গানে দেহস্থিত যে 'ছয়ঝোন ভাই'-এর কথা বলা হইয়াছে, অনায়াসেই বুঝি উহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ষড়রিপু। ৪১৪-সংখ্যক গানের 'পাঁচ ঝোন মান্‌ষি' হইল—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

তত্ত্ব প্রকাশই এই সকল গানের মূল লক্ষ্য বলিয়া গায়ক বা রচয়িতার ব্যক্তিগত স্পর্শ ও কবিত্ব-ছোঁয়া লাগাইবার সুযোগ ইহাতে অত্যন্তই সীমাবদ্ধ। সুর ছাড়া কেবল কথার মাধ্যমে আন্তরিকতা দেহতত্ত্বমূলক গানগুলিতে খুব অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

॥ গুরুর উদ্দেশে ॥

"The whole field of Indian Philosophy and religion is characterised by a unanimous emphasis on the Guru-Vāda or the doctrine of the Preceptor. It will be seen that in a sense all the systems of Indian Philosophy and religion are mystic, for according to all the systems truth always transcends intellectual apprehension or discurssive speculation,—it is to be intuited within through the help of the Preceptor, who has already realised it."[১]

ভারতীয় যে কোনো সাধনার মধ্যে 'গুরু' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। হিন্দুতান্ত্রিক ধর্ম, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম, বাউল ধর্ম, সুফী ধর্ম এবং নাথ ধর্মে গুরুর মূল্য অসাধারণ। বৈদিক যুগ হইতে ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত গুরু ও শিষ্যের আলোচনা ও স্মৃতির মাধ্যমেই বহিয়া আসিতেছে।[২]

ভারতের বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান ধর্মাবলীর সাধনার এক-একটি বিশেষ স্তরে গুরু একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা সেই আলোচনা করিব না, কেননা তাহা অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের বলিবার কথা কেবল এই,—আলোচ্য 'গুরুর উদ্দেশে' গুচ্ছের গানগুলি কোনো বিশেষ একটি ধর্মপন্থীর রচনা নহে। ইহা বাউলের গুরুবাদ হইতে পারে, সহজিয়া বৈষ্ণবের গুরুবাদ হওয়াও আশ্চর্যের নহে। সুতরাং কোনো বিশেষ একটি ধর্মমতকে পটভূমিকা রাখিয়া, সেই ধর্মমতের আলোকে বর্তমান 'গুরুর উদ্দেশে' গানগুলির বিচার করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই, সাধারণভাবে, ভারতের সকল প্রধান ও অপ্রধান ধর্মে গুরুর গুরুত্ব ও ভূমিকা কি ও কেমন, সেই দৃষ্টি হইতেই বর্তমান গানগুলি বিচার করিব।

সঙ্কলিত 'গুরুর উদ্দেশে' গুচ্ছের গানগুলির প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল,—এইগুলি যেমন একদিকে বিশেষ কোনো একটি ধর্মমতকে পটভূমিকা রাখিয়া রচিত হয় নাই; তেমনি, সাধনার বিভিন্ন স্তরে গুরুর ভূমিকা কি ও কেমন, তাহাও আলোচিত হয় নাই। গানগুলির মধ্য দিয়া কেবল একটা জিনিসই

১. Dr. S. B. Dasgupta : Obscure Religious Cults (1946) PP. 101-2.

২. ডাঃ উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য : বাঙলার বাউল (১৩৬৪) পৃঃ ৩০৩-৩২২।

CENTRAL LIBRARY

দেখা যায় যে,—সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর অপরিসীম মূল্যকে স্বীকার করা হইয়াছে এবং শিষ্য করুণভাবে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। গুরুই সকল সাধনার ক্ষেত্রে পথ দেখান এবং গুরু ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব, ইহাও স্পষ্ট করিয়া গানে বলা হইয়াছে। বাউলের ধর্ম সাধনায় 'গুরুতত্ত্ব' বলিয়া একটি তত্ত্বই আছে এবং বাউল গানের মধ্যে তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে। বর্তমান গানগুলির মধ্যে কোনো প্রকার 'তত্ত্ব' আলোচিত হয় নাই। এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া বর্তমান গানগুলির পরিচয় গ্রহণ করা চলিতে পারে॥

॥ ২ ॥

গানে বলা হইয়াছে, হাড়-মাংস দিয়া গুরুই মানুষের দেহের 'ঘর' তৈয়ারি করিয়াছেন। সেই গুরুকে ভজনা করিতে শিষ্য এতোকাল ভুলিয়া গিয়াছিল। যৌবন ছাড়াইয়া বার্ধক্যে পৌঁছিয়া আজ তাহার মনে হইতেছে 'গুরুক ভজিমো কুনকালে' (সং ৪১৬)। এ ভবে কেহ কাহারো নয়, দু দিনের জন্ম এ ভবে আসিয়া মায়া বাড়াইয়া লাভ নাই। কাজেই 'শেষের উপায় কইরতে হলে ভজো গুরুর ছিচরণ' (সং ৪১৭)। গুরুকেই সকল সাধনার উপায়রূপে দেখিয়া অপর একজন গাহিয়াছেন, 'ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সখী ছিগুরু লাগিয়া' (সং ৪১৮)। গুরুর প্রতি আত্মসমর্পণের করুণ আর্তিটি এই গানে বড়োই সরল ও গভীরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভব-নদীর উত্তাল তুফানের কাণ্ডারীও গুরু। তাই গাওয়া হইয়াছে, 'যুদি গুরু করে দোয়য়া, দিতে পারো পারের খেওয়া' (সং ৪১৯)। সাধনার পথে গুরুই 'মহামন্ত্র' সাধকের কানে তুলিয়া দেন; গুরুর কৃপাতেই সাধনার দুর্গম পথ সহজ হয়, ছয়মাসের পথ ছয়দিনেই অতিক্রম করা যায় (সং ৪২০)।

সাধনার দুর্গম পথকে অপর একটি গানে নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নদীর পরপারে, সিদ্ধির ঘাটে যাইতে হইলে একান্তভাবে প্রয়োজন গুরুর সাহায্য। কিন্তু গুরুর সহিত শিষ্য যদি সংযোগ সাধন করিতে না পারে, তবে বৃথাই তাহার সাধনা। তাই বলা হইয়াছে,—'গুরুই-শিষ্যে দেখা না হয় রে—

CENTRAL LIBRARY

হে ক্ষেপা, ঠারাঠারিই সার' (সং ৪২১)। ৪২২-সংখ্যক গানে গায়ক আপন মনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, 'চলো গুরুর কাছে'।

'গুরুর উদ্দেশে' গীত এই সকল গানের মধ্যে 'গুরুতত্ত্ব' সম্পর্কে কোনো তথ্য নাই। কিন্তু, সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর সহায়তা যে অপরিহার্য, একথা গানে স্বীকার করা হইয়াছে এবং অকৃত্রিম ভঙ্গিতে গুরুর চরণে ভক্ত আপনাকে নিবেদিত করিয়াছে। এই অকৃত্রিম আকুতি সুরের স্পর্শে করুণতর হইয়া ভক্তের কানে ও মনে বাজে।

গানগুলির ভাষা সম্পর্কে একটি বক্তব্য আছে। ভাষার মধ্যে খাঁটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার ছোঁওয়া যেন অনুভবযোগ্য রূপে কম। বস্তুত তুক্কা-মনঃশিক্ষা-দেহতত্ত্ব পর্যায়ের যে কোনো গানের ভাষা সম্পর্কেই এই মন্তব্য অল্প-বিস্তর খাটে॥

CENTRAL LIBRARY

॥ হেঁয়ালি ॥

॥ ১ ॥

সুপ্রাচীন কাল হইতে, ভারতের বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি কেবল মাত্র সাধক-গোষ্ঠীর মধ্যেই বহিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে এমন অনেক ধর্ম-সাধনা আছে, যে গুলির সাধন-পদ্ধতি একান্ত ভাবেই গোপন রাখিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এইজন্য সেই সকল ধর্ম-সাধনার গানগুলির মধ্যেও অনেক সময় স্পষ্ট করিয়া সোজাসুজি ভাবে সাধনার কথা না বলিয়া ইঙ্গিতে বা দ্ব্যর্থ ভাষায় তাহা বলা হইয়া থাকে। যেন, সাধক ছাড়া অপর কেহ সহজে তাহা বুঝিয়া না ফেলে।

সাধনার ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থ ভাষায় গান রচা ভারতে খুবই প্রাচীন। বৈদিক মন্ত্রেও ইহা লক্ষ করা গিয়াছে। এই রূপ ভাষাকে বলা হইয়াছে 'সন্ধ্যা ভাষা'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার বৌদ্ধ গান ও দোহার মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।'

সন্ধ্যাভাষার এই ব্যাখ্যা মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মানেন নাই।[১] তাঁহার মতে ইহা 'সন্ধাভাষা',—'সন্ধ্যা' নয়। ইহা অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হয়, কেননা ইহার প্রকৃত অর্থ লুক্কায়িত থাকে।

বাংলা সাহিত্যের যাহা প্রাচীনতম নমুনা অর্থাৎ চর্যাগীতি, তাহার রচয়িতা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ এই সন্ধাভাষায় অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতির মধ্যে প্রহেলিকা-ধর্মী রচনার জন্য ৩৩-সংখ্যক চর্যাটি ('টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী') দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের মতো বৈষ্ণব সহজিয়াগণও প্রহেলিকা-পূর্ণ পদ রচনা করিয়াছেন। ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এই রীতিকে

১ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল্ কোয়ার্টারলি, ১৯২৮, চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত-কর্তৃক তাঁহার 'অব্‌স্কিয়োর রিলিজিয়াস্ কাল্টস্' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৭৭।

CENTRAL LIBRARY

"an extremely enigmatic and paradoxical" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। উত্তর ভারতের সন্তগণও সাধকদের জন্য দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক ও হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় মতবাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই হেঁয়ালি পূর্ণ ভাষাকে বলা হয় 'উলট বাঁসিয়াঁ'[১]।

হেঁয়ালিতে রচা গানগুলির অর্থোদ্ধার করিতে বসা বিড়ম্বনা মাত্র। সর্বদা ইহার অর্থও হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ইহা অর্থহীন পদসমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উহার অন্বয় করা না গেলেও অন্তর্নিহিত সত্য বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান সংকলনে ধৃত হেঁয়ালি-গীতিগুলি সম্পর্কে এই মন্তব্য বেশি করিয়া খাটে। সংকলিত পদগুলির অর্থোদ্ধার করিতে আরো বেশি বেগ পাইতে হয় এই জন্য যে, এগুলি বিশেষ কোনো একটি ধর্মমতকে পটভূমিকা রাখিয়া রচিত হয় নাই। এইগুলিকে যতোখানি বৌদ্ধ সহজিয়া বলা যায়, ততোখানি বৈষ্ণব সহজিয়া বলিলেও কিছু যায় আসে না। আসলে হেঁয়ালি করিয়া গান রচা ভারতের সকল ধর্ম সাধনারই একটি উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোনো বিষেষ একটি ধর্মমতের দৃষ্টিকোণ হইতে এই হেঁয়ালি-গীতিগুলি বিচার না করাই ভালো বলিয়া মনে হয়।

॥ ২ ॥

৪২৪-সংখ্যক গানের একস্থানে বলা হইয়াছে, 'ওরে তামান জমি পতিত জমি, মাঝের জমি খাল'। এই 'মাঝের জমি' বলিতে হিন্দু তান্ত্রিকের 'সুষুম্না'-কে বোঝাইতে পারে, বৌদ্ধ সহজিয়ার বাম দক্ষিণের সমন্বয়ও হইতে পারে। এই গানেই 'ছয় বলদ' বলিতে ষড়রিপুকে বোঝানো হইয়াছে।

বর্তমান সংগ্রহের অন্যান্য হেঁয়ালিগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। অধিকাংশই 'উলট বাঁসিয়াঁ'-র মতো উল্টা কথায় ভরা। যেমন ৪২৩-সংখ্যক গানে: সুতা দিয়া হাতী বন্দী হইল, লোহাকে খাইল ঘুণে; বৃন্দাবনে আগুন লাগিল, রসিক জনে তাহা দেখিতে পাইল। অপর একটি গানে: বাঘ-মহিষ একত্র জুড়িয়া হলকর্ষণ করা হইতেছে, ছাগল আসিয়া বাঘকে ঢুঁ মারিল,

১ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: 'বাংলার বাউল' (১৩৬৪) পৃ. ৪২২।

মারিল, লাঙ্গল হাসিয়া উঠিল (সং ৪২৪)। কিংবা : ইন্দুর ধানের চারা রোপণ করে, পানকৌড়ি বাছে জমির আগাছা, টুনটুনি পাখী ঢেলা ভাঙ্গে, খরগোস করে হাল চাষ। চিল মই দেয়, গোরু খেদাইবার লাঠির মাথায় দই (সং-৪২৫)। স্বর্গে ছিল যে গাছ, মর্তে তাহার ফল ফলে (সং ৪২৮)।

এই সমস্ত উল্টা কথার সরলার্থ নাই, অসাধকের নিকট তাহা জানাও নহে। তবে, ইহার মধ্য দিয়া সাধনার কঠোরতা এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে উহার আশ্চর্য ফল লাভের মাহাত্ম্য ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

এই সকল গানের সাহিত্য-মূল্য প্রায় নাই বলিলেই চলে।

॥ ষাইটোন ॥

॥ ১ ॥

'ষাইটোন' এই নাম হইতে প্রাথমিকভাবে ইহাকে ষষ্ঠী দেবী বলিয়া মনে হয়। জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-রঙপুর—ভগ্নীস্থানীয়া এই তিন জেলাতেই ষাইটোনের পূজা হইয়া থাকে।

কিন্তু নামে এক হইলেও উক্ত তিন জেলাতে দেবী ষাইটোন বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পূজিতা হন।

কোচবিহার জেলায় দেবী ষাইটোনের পূজা করা হয় সাধারণত আষাঢ় মাসের চার তারিখে। সধবা নারীগণই এই পূজা করিয়া থাকেন। পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিবার উদ্দেশ্যে এই পূজা করা হয়। অনেকে কোচবিহারের 'ষাট্'-পূজাকে বর্ষা-মঙ্গল উৎসব হিসাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। কোচবিহারের এই ষাট্ পূজার ব্রতকথা আছে তিনটি,—(১) উকনাই-গৌরাই ও ছত্রকাকই (২) দায়ো বায়ো (৩) পাতলি ভাষা।

কোচবিহারের ষাট্ পূজাকে অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "অম্বুবাচীর চারদিন পূর্বে (বসুমতী ঋতুমতী হবার পূর্বে, প্রসিদ্ধি এই—কামাখ্যা বা কামদা দেবীর যোনীপীঠে শ্বেতবস্ত্র দিলে তা রক্তে রঞ্জিত হয়) হর-গৌরীর মিলন হয়। ষাট্ পূজো প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ পূজো।"[১]

রঙপুর জেলার ষাইটোন-এর পূজা সম্পর্কে নিম্নের অংশটুকু দ্রষ্টব্য :

"ষাইটের পূজা is generally done a month after the delivery of a child. In case of a vow মানত it may be done at anytime. ষাইট মাও is the presiding deity of child birth and children. No prist or পুরইত is required for the ceremony. Womenfolk who are her devotees do the job. Parched paddy খই, sweet parched paddy or মুড়কুনি, bananas, flowers and leaves of wood apple ব্যালপাত are offered to the deity. No earthen image of d.ity is made…it is painted on a cylindrical roll

১ 'জনমত' (জলপাইগুড়ি) পত্রিকা : শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৬, পৃ : ৮৮।

of sponge wood or sola with rings বেরুয়া at the top and the bottom. The bottom ring has got a fringe ঝুল, ঝালর with sola flowers hanging from it. The whole frame is tied to the top of a bamboo pole which is planted near the বাইস্তো ঘর, the south facing hut. The ceremony starts just in the evening পোইনাসাজত accompanied with music and continue the whole night. Parched is scattered after every hour, and songs যাইটোর গীত are sung by female singers গীদালী। The ceremony closes at down. The painted frame of the deity is hung at the loft of the hut."[১]

জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র যাইটোন পূজার প্রথা চালু নাই। তিস্তার পূর্বাঞ্চলে, বিশেষত ধূপগুড়ি থানাতেই ইহার প্রচার সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। দেবী যাইটোন এখানে রঙপুর জেলার মতো পুরাপুরি ষষ্ঠী দেবী নহেন; কিংবা কোচবিহার জেলার মতো বসুধাকে শস্যশালিনী করিবার জন্য লিঙ্গ-পূজাও নহে।

জলপাইগুড়িতে যাইটোনের পূজা করা হয় সাধারণত বিবাহাদির পূর্বে। রঙপুরের মতো সন্তানাদির মঙ্গল কামনায় জাত্যাশৌচের পরও ইহার পূজা করা হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে যাইটোন যথার্থই ষষ্ঠীদেবী এবং কাহিনী লক্ষ করিলে দেবী যাইটোনকে ষষ্ঠীদেবীই বলিতে হয়।

যাইটোন দেবী বটেন, কিন্তু কাহিনীতে তাঁহাকে লৌকিক জগতের সাধারণ রমণীরূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে। দেবী মনসার বরে সাইটোনের সন্তান হইয়াছিল, মনসার বরেই যাইটোনের মৃত পুত্রগণ বাঁচিয়া উঠিয়াছিল,—এই কাহিনীই যাইটোনের ব্রতকাহিনী।

যাইটোনের ব্রতকাহিনী আসলে দেবী মনসার কীর্তি-কাহিনী। মনসা যখন যাইটোনের পুত্রদের হত্যা করিয়া পূজা পাইবামাত্রই আবার তাহাদের জীবিত করিয়া দেন, তখন চাঁদসদাগরের কাহিনী মনে পড়িয়া যায়। মনসা-

১ Folk life and Culture of Rangpur (পাণ্ডুলিপি): Dr. Kaliprasad Biswas. P. 152.

CENTRAL LIBRARY

মঙ্গল কাব্যের মতোই এখানে পূজা না পাইলে ষাইটোন অসন্তুষ্ট হন এবং পূজা পাইবামাত্রই মৃত পুত্রদের বাঁচাইয়া দেন। তবে মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে দেবী মনসার যে প্রতিহিংসাপরায়ণ উগ্র মূর্তির পরিচয় পাই, ষাইটোনের কাহিনীতে ততটা নাই। এখানে দেবী মনসার গোসা হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। বন্ধ্যা ষাইটোনকে পুত্র-বর দিবার সময় দেবী মনসা শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন যে, সেই পুত্রদ্বয়ের বিবাহকালে ষাইটোন মনসার পূজা করিবেন। কিন্তু কার্যকালে তিনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ভুলিয়াছিলেন। অকারণেই যিনি চাঁদসদাগরের সাতপুত্রের প্রাণ হরণ করিতে পারেন, সকারণে তিনি কেন ষাইটোনের দুই পুত্রের প্রাণ লইবেন না?

দেবী ষাইটোন তাহার পুত্রদের বিবাহ দানকালে মনসাকে পূজা দিতে ভুলিয়াছিলেন, তাই অধিবাসের দিন তাঁহার দুই পুত্র—লব ও কুশ, মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য এখন পর্যন্ত জলপাইগুড়ির রাজবংশী সমাজে বিবাহের পূর্বে মনসার পাঁচালি গান গাহিবার প্রথা আছে। বিবাহ-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন-চূড়াকরণ ইত্যাদি প্রতিটি অনুষ্ঠানের পূর্বে বিষহরির পূজা ও গান করা একটি অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠান।

বিষহরির এই মাহাত্ম্য খ্যাপন করা হইয়াছে অন্যভাবে, ষাইটোনের ব্রত-গানে। বিষহরি কেবল যে ছলে-বলে-কৌশলে চাঁদ সদাগরের নিকট হইতেই পূজা আদায় করেন না; উপরন্তু, বন্ধ্যা নারীর ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া পুত্রবর দান করেন,—বিষহরির চরিত্রের এই নতুন দিক ষাইটোনের ব্রত-কাহিনীর মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে লোক-সমাজে বিষ-হরির চরিত্রের এই অভিনব দিক লইয়া কাহিনী রচিত পারে, সেই সমাজ বিষহরিকে কি চোখে দেখিয়া থাকে, এই কাহিনী হইতে তাহারও হদিশ মেলে।

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানায় ষাইটোনের পূজা-পদ্ধতি অল্পবিস্তর রঙপুর জেলার ষাইটোনের পূজার সহিত এক। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইহা মেয়েদের গান। সন্ধ্যা রাত্রি হইতে শুরু করিয়া সারা রাত্রি ধরিয়া এই গান তাহারা গাহিয়া থাকে। রঙপুরের মতোই, জলপাইগুড়িতেও ষাইটোনের মাটির মূর্তি নাই, শোলার মূর্তিই পূজিত হইয়া থাকে। তবে, জলপাই-গুড়িতে দেখা যায়, শোলা দিয়াই চোঙার মতো করিয়া ছয়টি 'ডোল' তৈরী

CENTRAL LIBRARY

করিয়া ষাইটোনের শোলার মূর্তির সম্মুখে স্থাপন করা হয়। এই ছয়টি 'ভোল' আসলে দেবী মনসার আশীর্বাদের ঝুলি। কাহিনীতে আছে, মনসা ঝুলি ঝাড়িয়া ষাইটোনকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। রংপুর জেলাতে ষাইটোনের পূজা করা হয় সাধারণত সন্তানাদির জন্ম হইলে। জলপাইগুড়িতে ষাইটোনের পূজা হয় সাধারণত বিবাহাদির পূর্বে। সন্তানের জন্ম ও বিবাহ,—দুই প্রসঙ্গই ষাইটোনের কহিনীতে আছে। উহার যে কোনো একটির জন্য ষাইটোনের পূজা করা যাইতে পারে ॥

॥ ২ ॥

ষাইটোনের যে ব্রত-গান (সং-৪২৯) বর্তমান সঙ্কলনে গ্রথিত হইয়াছে, তাহার কাহিনী এই :

শরদই (ইহা ষাইটোনের অপর এক নাম) একদিন উঠোন ঝাঁট দিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, শরদই যেন আজ হইতে ঘরে না ঢোকেন। কেননা, তিনি বন্ধ্যা। বন্ধ্যা নারী সংসারে অমঙ্গল আনে। ষাইটোনের ননদও তাঁহাকে এই একই কথা বলিল। শাশুড়ী আসিয়া ষাইটোনের স্বামীকে বলিলেন ষাইটোনকে বনবাস দিতে। বন্ধ্যা নারী সম্পর্কে এই taboo দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মায়ের আজ্ঞা পাইয়া ষাইটোনের স্বামী ষাইটোনকে বনবাস দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ষাইটোনকে বলিলেন, চলো, আজ তোমাকে তোমার বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া আসি। ষাইটোন বলিলেন, আমার তো পিতা-মাতা কেহ নাই, কাহার বাড়ীতে যাইব। ষাইটোনের স্বামী (ইহাকে কাহিনীর মধ্যে 'বাগুরাজা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে) বলিলেন, চলো তবে আজ আমার মামার বাড়ীতেই বেড়াইতে যাইবে।

ক্ষার-'খইল' দিয়া ষাইটোন পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। তারপর সাজিয়া-গুঁজিয়া স্বামীর সহিত পথে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা একটি অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনেক পথ হাঁটিয়া ষাইটোনের ক্লান্তি আসিয়া পড়িল। তিনি তাঁহার স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। বাগুরাজা তখন নিজের আঙুল কাটিয়া সেই রক্ত চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন এবং নিদ্রিত ষাইটোনকে অরণ্যের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

CENTRAL LIBRARY

ঘুম ভাঙিয়া থাইটোন দেখিলেন, চতুর্দিকে রক্ত ছড়ানো এবং তাঁহার স্বামী নাই। নিশ্চয়ই তাঁহার স্বামীকে বাঘে খাইয়াছে, এই মনে করিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঠাকুর ও ঠাকুরাণী তখন রথ লইয়া যাইতেছিলেন। থাইটোনের কান্না শুনিয়া ঠাকুরাণী রথ হইতে নামিলেন এবং নিকটে আসিয়া থাইটোনের কান্নার কারণ শুধাইলেন। সব শুনিয়া ঠাকুরাণী কহিলেন, তোমার স্বামীকে বাঘে খায় নাই, সে তোমাকে বনবাস দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। তুমি বন্ধ্যা, তাই তোমাকে বনবাস দেওয়া হইয়াছে।

থাইটোন তখন তাঁহার নিকট পুত্রবর মাগিলেন। ঠাকুরাণী থাইটোনকে পুত্রবর দিলেন না। বলিলেন, পিছনে চণ্ডী আসিতেছেন, তাঁহার নিকটে পুত্রবর চাহিয়ো।

কিন্তু, চণ্ডী আসিয়াও পুত্রবর দিলেন না। তিনি বলিলেন পিছনে ডিঙ্গা লইয়া পদ্মা আসিতেছেন, তিনি তোমাকে বর দিবেন।

পদ্মা আসিয়া বলিলেন, তুমি সতিনীর ছেলেকে ভালোবাসো নাই, ঘরের কোণে হাড়ীতে করিয়া আগুন জ্বালাইয়া রাখো নাই—এই পাপে তুমি আজ বন্ধ্যা হইয়াছ। তারপর তিনি থাইটোনকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। থাইটোন স্নান করিয়া আসিলে দেবী পদ্মা তাঁহাকে পুত্রবর দিলেন। পুত্রবর লইয়া থাইটোন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ী আসিয়া থাইটোন তাঁহার স্বামীর সহবাস করিতে চাহিলেন। প্রথমে স্বামী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। পরে ঢেঁকি ঘরে যাইয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া উভয়ে রাত্রি যাপন করিলেন। থাইটোন গর্ভবতী হইলেন।

ইহার পর থাইটোনের সাধ ভক্ষণ। থাইটোনের শাশুড়ী থাইটোনের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাই থাইটোনের স্বামী বিবিধ দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া দিলেও সাধ ভক্ষণের সময় কিছুই খাইতে দিলেন না। থাইটোন পোড়ামাটি খাইতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া থাইটোনের প্রসবকাল উপস্থিত হইল। কিন্তু, শেষ সময় তাঁহার পরিচর্যা করিতে পড়শীরা কেহ আসিল না। থাইটোনের আচরণের ত্রুটি উল্লেখ করিয়া 'দাইয়ানী'ও প্রথমে আসিতে চাহে নাই। অবশেষে

CENTRAL LIBRARY

অনেক বস্তুর লোভ দেখাইয়া তাহাকে আনা হইল এবং সে আসিয়া ষাইটোনের দুই পুত্র—লব ও কুশের নাড়ী ছেদন করিল। নয়দিনের দিন ক্ষৌরকার্য করিতে নাপিতও সহজে আসিতে চাহিল না।

দিন কাটিতে লাগিল। লব-কুশের বয়স যখন নয় মাস হইল, তখন তাহাদের অন্নপ্রাশন হইল। তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহারা বিদ্যাভ্যাস করিল। অবশেষে তাহাদের বিবাহকাল উপস্থিত হইল।

অনেক দেখা-শোনার পর গপ্‌স রাজার মেয়ের সহিত লব-কুশের বিবাহ (খুব সম্ভব দুই মেয়ের সহিত, কাহিনীতে কেবল একজন মেয়ের উল্লেখ পাই) স্থির হইল। অনেক টাকা খরচ করিয়া বিবাহের বাজার করিলেন 'বাঙ্গা'-রাজা। বিভিন্ন স্থান হইতে স্বজনাদি আসিয়া সকলের আনন্দ বাড়াইলেন।

কিন্তু 'অধিবাসে'র সময় ঘটিল এক দুর্ঘটনা। পান-সুপারি দিয়া লব-কুশকে বরণ করিবার সময় তাহাদের মৃত্যু হইল। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল।

ঠিক সেই সময় এক পড়শীর বাড়ীতে দেবী পদ্মা আসিয়াছিলেন বেড়াইতে। কান্নার শব্দ শুনিয়া তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সব শুনিয়া তিনি বলিলেন,

আজি মুই দিহুঁ বাঙ্গীন্যাড়ের বেটীকে পুত্রবর রে।
মোক পূজি'র চাইসে জোড়ো মন্দির ঘরে রে॥
তারে বাদে মা লবাই ঢলিয়া পড়ে রে।
তারে বাদে মা কুশাই ঢলিয়া পড়ে রে॥

ষাইটোনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে অথচ তিনি দেবী পদ্মাকে পূজা দিতে ভুলিয়াছেন, সেই পাপে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ষাইটোন প্রথমে এই পুত্রবরের কথা অস্বীকার করিলেও পরে তিনি দেবী পদ্মাকে পূজা দিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লব ও কুশ বাঁচিয়া উঠিল। অতঃপর শুভলগ্নে দুই ভাইয়ের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

এই খানেই কাহিনী শেষ। রূপকথার ছাপ কাহিনীটির সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে। ষাইটোনকে বনবাসে দেওয়া, বাঙ্গারাজার ঘুমের ছল ও আঙুল কাটা, পরপর তিন দেবীর আগমন এবং শেষোক্ত জনের বরদান, ষাইটোনের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিবাহকালে পুত্রদের মৃত্যু, দেবীর বরে আবার তাহাদের পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি

CENTRAL LIBRARY

Motif-গুলি বিশ্বের যে কোনো দেশের রূপকথার সঙ্গে মিলিয়া যায়। ব্রতগান ও রূপকথার Motif যে একই হইতে পারে, ইহা হইতে সে কথাও বুঝিতে পারি ॥

॥ ৩ ॥

যাইটোনের কাহিনী হইতে যাইটোনের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে বাস্তব জগতের এক সাধারণ নারীরূপে কল্পনা করিয়া লইতে মোটেই অসুবিধা হয় না। যাইটোন যখন জানিতে পারিলেন যে, বন্ধ্যা বলিয়াই তাঁহাকে বনবাস দেওয়া হইয়াছে, তখন সন্তানের জন্য তাহার মধ্যে যে করুণ প্রার্থনার প্রকাশ দেখা যায়, তাহা সত্যই সুন্দর। সাধারণ নারীরূপে যাইটোনের আচার-আচরণের মধ্যে ত্রুটীও আছে অনেক। তাঁহার অপ্রিয় ব্যবহারের জন্য সন্তান প্রসবকালে পড়শী, 'দাইয়ানী' ও নাপিত আসিতে চাহে নাই। দেবী পদ্মার নিকট হইতে পুত্রবর লইয়া দেবীকে পূজা দিতেও তিনি ভুলিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা সত্বেও যাইটোন সহজে স্বীকার করিতে চাহেন নাই যে, পদ্মার বরেই তাঁহার পুত্র হইয়াছে। কিন্তু, যাইটোনের চরিত্রে ত্রুটি থাকিলেও, এই ত্রুটির মধ্য দিয়াই তিনি বাস্তব জগতের রমণী হইয়া উঠিয়াছেন এবং সকল ত্রুটি সত্বেও তাঁহার বনবাস, সন্তানাকাঙ্ক্ষা এবং পরিশেষে তাঁহার সন্তানদ্বয়ের মৃত্যু শ্রোতার মনকে এমনভাবে আর্দ্র করিয়া রাখে যাহার ফলে যাইটোন সকলের সমবেদনা সর্বদা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাইটোনের স্বামী অর্থাৎ বাঞ্চারাজার ভূমিকা কাহিনীতে যাইটোনের তুলনায় অনেকটা গৌণ। তাহা হইলেও স্বল্প দুই একটি ক্ষেত্রে ইহার চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা সত্য, পিতা-মাতার কথা-অনুযায়ী কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া কৌশল করিয়া ইনি পত্নীকে বনবাস দিয়াছেন। কিন্তু পত্নীকে বনে রাখিয়া ইনি যখন কাঁদিয়া বিদায় লইতেছিলেন তখন ইহার অন্তরস্থিত চিরন্তন প্রেমিক পুরুষকে দেখিতে পাই। স্ত্রীর প্রতি ইহার ভালোবাসার অপর নমুনা পাই সাধ ভক্ষণের সময় মায়ের মনকে পরীক্ষা করিবার মধ্যে। আবার, পিতা-মাতা না চাহিলেও, ইনি বনবাস হইতে

CENTRAL LIBRARY

প্রত্যাগত স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোটের উপর বাঙ্গারাজার চরিত্রও বেশ সুন্দর।

দেবী পদ্মার চারিত্রিক বিশেষত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি॥

॥ ৫ ॥

অন্যান্য পূজার গানগুলির মতো এই গানটিতেও 'নামানি', 'বসানি', 'চুমানি' এবং সমাপ্তি সঙ্গীত আছে। এইগুলি হইল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ব্রত-গান বা পূজার গানের বৈশিষ্ট্য।

'নামানি' গানে বলা হইতেছে, স্বর্গ হইতে ষাইটোন ভূতলে অবতরণ করিয়া গৃহস্থের বাড়ীর ওপারে আসিয়া পৌছাইয়াছেন। কিন্তু গৃহস্থ দরিদ্র, সোনার নৌকা নাই যে ষাইটোনকে প্রত্যুদ্‌গমন করিবে। ওগো মা ষাইটোন, নিজেই খেয়া পার হইয়া এপারে আইস। ওগো গৃহস্থ, তুমি আসিয়া ষাইটোনের পা ধোয়াইয়া দাও।

'বসানি' গানে বসুমতীর নিকট স্থান প্রার্থনা করা হইতেছে—দেবী ষাইটোনের আসন বসাইবার জন্যে। 'চুমানি' অর্থাৎ বরণ করিবার গানে বলা হইয়াছে, দেবী ষাইটোনকে বরণ করিবার জন্য দুধ লাগিবে। দোহক আসিয়া তাই দুধ দোহন করিতেছে। কলা পাতার অগ্রভাগে ষাইটোন ও বিষহরির নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াছি।

'সমাপ্তি সঙ্গীতে' দেবী বিষহরির নিকট গৃহস্থের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য বর প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম দেবতার প্রভাব এতোই গভীর যে, বিষহরির নিকট বর প্রার্থনা কালে 'স্বাব-নিরঞ্জন'-এর কথাটি বাদ পড়ে নাই॥

CENTRAL LIBRARY

একাদশ অধ্যায়

॥ বিচিত্র ॥

॥ ১ ॥

কিছু গান পাওয়া যায়, যেগুলিকে অন্য কোন শ্রেণীতে আবদ্ধ করিতে পারা যায় না, অথবা অন্য কোনো কারণে একটি বিশেষ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি নাই। এই ধরণের কয়েকটি গান লইয়া 'বিচিত্র' নামে একটি অধ্যায় গড়িয়াছি। এই পর্যায়ের গানগুলি সংখ্যাতেও স্বল্প।

'বিচিত্র' পর্যায়ের প্রথম গান হইল 'নটুয়া'। অবশ্য এক 'নটুয়া' গান দিয়াই একটি অধ্যায় করা চলিত। কিন্তু এই গান চর্চার অভাবে এমন ভাবেই অবলুপ্ত হইয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করা সত্বেও 'নটুয়া' গানের একটি বিশেষ পর্যায়ের কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। অসম্পূর্ণ কতকগুলি পদ একটি গানের মধ্যে (সং ৪৩০) দিয়াছি।

'নটুয়া' রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান। জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র ইহার প্রচলন নাই। উক্ত জেলার যে বিশেষ অংশ বিহারের সীমান্তবর্তী, 'নটুয়া' কেবল সেই সকল অঞ্চলেই গীত হইয়া থাকে। শিলিগুড়ি ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল, দার্জিলিঙ ও বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং শিলিগুড়ির নিকটবর্তী জলপাইগুড়ির কিয়দংশ—এই হইল 'নটুয়া' গানের ব্যাপ্তি সীমা। ইহা জলপাইগুড়ি বা দার্জিলিঙের নিজস্ব বস্তু নয়। 'নটুয়া' এই অঞ্চলের বস্তু হইলে ইহা হয়তো কিছু সংগ্রহ করা যাইত।

'নটুয়া' যে বিহারের জিনিস, তাহার প্রমাণ একাধিক। প্রথমত এই গান কেবল বিহারের সন্নিহিত অঞ্চলেই চালু আছে। দ্বিতীয়ত, 'নটুয়া' গানে বিশেষ এক ধরণের ঢোলক ব্যবহৃত হয়। এই ঢোলক, দেখিলেই বোঝা যায় বাঙালী ঢোলক নয়। দেখিতে খাটো এবং গোল। ইহা স্পষ্টতই বিহারের ঢোলক। তৃতীয়ত, 'নটুয়া' গানের সুরেও বিহারের দেহাতী অঞ্চলের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

'নটুয়া' শব্দটি অবশ্য বর্তমান সংগ্রহের অন্য দুই একটি গানেও মিলে। যেমন ২৬৪-সংখ্যক গানে পড়ি : "জরম-ঠেঙুয়ার বেটাটা এতয় নাটক জানে

CENTRAL LIBRARY

-রে।" কিংবা ৩৫৭-সংখ্যক গানের কথান্তরে পাই : "চ্যাং বড়ো নটুয়া ভাই রে, নটু করিবা' জানে।" উদ্ধৃত পঙক্তি দুইটির মধ্যে 'নাটক' ও 'নটুয়া' রঙ্গ ও রঙ্গকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নাট' শব্দটি চলিত বাঙলাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে 'নৃত্য, অভিনয়' ইত্যাদি অর্থে। 'রঙ্গ' অর্থেও 'নাট' ব্যবহৃত হয়। 'নাটের গুরু নিত্যানন্দ' এই প্রবাদমূলক উক্তির মধ্যেই তাহার পরিচয় আছে। 'নটুয়া' শব্দটি চলিত বাঙলাতে চলিত না থাকিলেও, 'নটুয়া' কথাটি প্রচলিত আছে, যাহার অর্থ 'নট, নর্তক' ইত্যাদি। এই সব বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়,—রঙ্গ করিবার নাচকেই 'নটুয়া' বলে। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'নটুয়া' শব্দটির সহিত রঙ্গের ইঙ্গিত থাকিলেও, 'নটুয়া' গানে রঙ্গের ভাব খুব বেশি নাই।

'নটুয়া' গান, পূর্বেই বলিয়াছি,—রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক গান। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের মধ্যে যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের এক-একটি স্তর বা দিক লইয়া এক-একটি পালা রচিত হয়, নটুয়া গানও তেমনি এক-একটি খণ্ডে বিভক্ত। বর্তমান সংগ্রহে 'কুঞ্জবান্ খণ্ড' নামে একটি খণ্ডের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

'কুঞ্জবান' হইল লীলা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাশায় শ্রীরাধা কর্তৃক পুষ্পকুঞ্জ সাজাইয়া রাখা। বিচ্ছিন্ন পদ কয়টি হইতে জানা যাইতেছে,—শ্রীরাধা সন্ধ্যাবেলা কুঞ্জ বাঁধিয়া অর্থাৎ সাজাইয়া তাহাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধা বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়া লোক-কবির চোখে সাধারণ নারী হইয়া উঠিয়াছেন। তাই দেখা যায় কুঞ্জ সাজাইবার সময় ঝাঁটা হাতে আঙিনা ঝাঁট দিতেছেন। তারপর সখী ললিতার সহায়তায় ফুলপাতা দিয়া তিনি কুঞ্জ সাজাইলেন। কিন্তু, রাধার এই বাসক সজ্জা বৃথা হইল, শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। একটি পদে শ্রীরাধার এই ব্যথা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার 'সাধের পালং' পড়িয়া রহিল।

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গানে 'কালী'-র উল্লেখ কেন করা হইল তাহা বুঝিতেছি-না। এই প্রসঙ্গে 'পাণ্ডবহিনী' এবং উদ্ধব ও মাধবের নামোল্লেখের সূত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নটুয়ার বিচ্ছিন্ন অপর তিনটি স্তবকের একটিতে দেখা যায়, রাধা ও কৃষ্ণ কালো গাই দোহন করিতেছেন। শেষ স্তবকে প্রেম-পাগলিনী শ্রীরাধার

CENTRAL LIBRARY

প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি কুল-মান ত্যাগ করিয়াছেন, তবু সেই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পান নাই, তাঁহারই জন্য নিশিদিন তিনি কাঁদিতেছেন॥

॥ ২ ॥

'বিচিত্র' পর্যায়ের অন্যান্য গানগুলির পরিচয় দিতেছি।

৪৩১-সংখ্যক গানটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের সঙ্গীতশিল্পীর একটি প্রিয় গান। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গানটির কথান্তর পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই ইহার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যাইতে পারে। গানটির বিষয়টিও সুন্দর। দোতরাকে উদ্দেশ করিয়া গায়ক বলিতেছেন, ওরে কাঠের দোতরা, তোর সুর আমাকে উদাসী করিয়াছে। তুই-ই আমার বউ। কথান্তরে পাওয়া যায়: ওরে দোতরা, তুই আমাকে বাড়ী-ছাড়া করিয়াছিস। তুই যদি গায়করূপে আমার খ্যাতি আনিয়া দিস, তবে তোকে সোনা-রূপা দিয়া বাঁধাইয়া রাখিব। ওরে দোতরা, কাঠ কাটিয়া বাজনা শিখিবার জন্য তোকে আমি গড়াইয়াছি। সব সময় তোকে লইয়াই থাকি বলিয়া আমার স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। দোতরা রে, তোকে ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারি না। ওরে দোতরা, তুই আমাকে উদাসী করিয়াছিস,—তোর জন্য পিতা-মাতা-পাড়া-পড়শী সকলেই আমাকে তিরস্কার করিয়া থাকে। দোতরা রে, তোকে লইয়া গান গাহিয়া আমার আশ মিটে না। তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।

গানখানি পড়িলেই বোঝা যায়, ইহার মধ্য দিয়া শিল্পীর বিশুদ্ধ মূর্তিটির স্পষ্ট বিকাশ হইয়াছে।

৪৩২-সংখ্যক গানটি উড়োজাহাজকে উদ্দেশ করিয়া রচিত। গ্রাম্য মানুষের শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনে উড়োজাহাজের কর্ণভেদী শব্দ একটি উপদ্রব বিশেষ। শুধু তাহাই নয়, জিনিসটির প্রতি সাধারণ মানুষের একটি ভীতিও আছে বটে। এইজন্য গানে বলা হইয়াছে, ওরে উড়োজাহাজ, রান্নাঘরে আমার স্ত্রী ভাত চড়াইয়াছে, এমন সময় তুই শব্দ করিয়া আসিতেছিস। এদিকে তোর শব্দে আমার ছেলেটা চমকাইয়া উঠিতেছে। হয়তো তুই বোমা ফেলিবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় গানখানি পঠিতব্য। উড়োজাহাজকে এখানে জীবন্ত প্রাণী বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

রাজনৈতিক কারণে বঙ্গ-ভঙ্গকে পটভূমিকা রাখিয়া ৪৩৩-সংখ্যক গানটি পড়িলে ইহার অর্থ সুন্দররূপে বোঝা যায়। বিধির অভিশাপে জনৈক ব্যক্তি আজ তাহার সাধের গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। সে জমি ছাড়িয়াছে, বাড়ী ছাড়িয়াছে,—তাই চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছে। তাহার বাড়ীর পিছনে যে 'কুরুম' নদীটি ছিল, আজও সে তাহা ভুলিতে পারে নাই। গানটির অন্তর্নিহিত কারুণ্য সহজেই মনকে নাড়া দেয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলপাইগুড়ি শহরে, তিস্তার নদীর তীরে বারো মাইল দীর্ঘ এবং সুউচ্চ এক বাঁধ নির্মাণ করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের মনকে এই বাঁধ বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। প্রতিদিন শহরের মেয়ে-পুরুষেরা ইহার উপর হাঁটিয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ায়। গ্রামের মানুষের চোখে এই দৃশ্য এক অপূর্ব বিস্ময়। সেই বিস্ময় ও বিস্ময়জাত আনন্দ-বেদনার প্রকাশ লক্ষ করা যায় ৪৩৪সংখ্যক গানে। জনৈকা গ্রামবধূ বলিতেছে, ওগো, বাঁধের উপর কতলোক হাওয়া খাইতেছে। প্রেমিক-প্রেমিকা হাত ধরা-ধরি করিয়া বেড়াইতেছে। আমার দুঃখের কথা কি বলিব, আমার স্বামী গিয়াছে ধানের ক্ষেতে কাজ করিতে। সে থাকিলে আমিও তাহার হাত ধরিয়া বাঁধের উপর বেড়াইতাম। গ্রামবধূর স্নিগ্ধ কল্পনার মনোরম বিকাশের জন্যই গানটি সঙ্কলিত হইয়াছে।

তিস্তার পূর্ব পারে ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত ভোটপাট্টি নামে একটি স্থান আছে। ১৯৩০ সনে ভোটপাট্টিতে প্রথম ধানের কল বসে। ধানের কল স্থাপিত হইবার ফলে, যে সকল অসহায়া রমণী ধান ভানিয়া জীবিকার্জন করিত, তাহাদের জীবনে এক বিপর্যয় আসিয়া পড়ে। কেননা, কলে ধান ভানাইলে খরচ কম। কাজেই কেহই আর হাতে ধান ভানাইতে চাহিত না। এই ব্যাপার উল্লেখ করিয়া রচিত হইয়াছে বর্তমান সংকলনের শেষ গান, ৪৩৫-সংখ্যক গানটি।

গানটিতে কিন্তু অসহায়া রমণীগণ ধানের কলকে দোষারোপ করে নাই। বরং ইংরাজের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছে এবং ধানকলের ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে। এই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ধান বেশ আক্রা হইয়া উঠে। গানে তাই বলা হইয়াছে, ধনীরা সবাই বেশি করিয়া ধান কিনিয়া মেশিনে দিতেছে, যাহারা ধান ভানিয়া জীবিকার্জন করে তাহারা ধান

পাইতেছে না। অগত্যা, সেই সকল বিধবাকে নতুন করিয়া এক-এক জন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিতে হইতেছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, রাজবংশী অনাথা বিধবাগণ ধান ভানিয়া জীবিকার্জন করে এবং বিধবা বিবাহ সেখানে অপ্রচলিত নাই।

গানখানির অপর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হইল—ইহাতে রচয়িতার ভনিতা পাওয়া যাইতেছে,—লোক-সঙ্গীতে যাহা দুর্লভ। সবনেশ্বরী নামে এক বিধবা গানটির রচয়িতা। শেষ স্তবকে তিনি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ভনিতা থাকিলেই কোনো রচনাকে যাঁহারা লোক-সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি হইতে খারিজ করিয়া দেন, আমি তাঁহাদের দলে নই। তাহা প্রমাণিত করিবার জন্যই গানটি সঙ্কলিত করিয়াছি। কোনো রচনা খাঁটি লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত কিনা, তাহা নির্ভর করে লোক-সাহিত্যের নিজস্ব রূপতত্ত্বের (Morphology) মধ্যে। পরবর্তী অধ্যায় তাহারই আলোচনা করিতেছি॥

CENTRAL LIBRARY

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ রচনাভঙ্গি : রূপতত্ত্ব ॥

॥ ১ ॥

লোকসাহিত্য সমীক্ষার নানা দৃষ্টিকোণ রহিয়াছে। সেই দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করিবার মধ্যেই এক-একজন গবেষকের বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয়। ওই দৃষ্টিকোণটি আবার লোকসাহিত্যের যে সংজ্ঞাটিতে গবেষক বিশ্বাস করেন, তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

আমারও এ বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে এবং তাহা লোকসাহিত্য সম্পর্কে আমার ধারণা দিয়াই গড়া। লোকসাহিত্যকে আমি কখনোই কেবল 'মৌখিক সাহিত্য' বলিয়া মনে করি না; ইহা যে সর্বদাই 'ঐতিহ্যমূলক' হইবে, তাহাও বিশ্বাস করি না। ব্যক্তিগতভাবে শত-শত গান সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিয়াছি, অনেকেই গান লিখিয়া রাখিয়াছে বা লেখা-পড়া জানিবার দরুণ লিখিতভাবেই রচনা করিতেছে; এবং তাহার বিষয় নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনাও হইতেছে। সুতরাং 'মৌখিকতা' ও 'ঐতিহ্যমূলকতা'-কে লোকসাহিত্যের অপরিহার্য লক্ষণ বলিয়া আমি মনে করি না। এইজন্য ভনিতা-সহ কোনো কোনো রচনাকেও আমি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকি।

আমি মনে করি, লোকমানসের একটি বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব ও জীবনবোধ আছে, তাহাই লোকসাহিত্যের রচনারীতিকে মূলত নিয়ন্ত্রিত করে, সুতরাং তাহাকেই লোকসাহিত্যের মাপকাঠি ধরা উচিত। ভনিতাসহযোগে রচনাই হোক, কিংবা লিখিতরূপেই তাহা রচিত হোক, অথবা নিতান্ত আধুনিক ঘটনাই তাহার বিষয় হোক, ওই বিশেষ রূপ ও রীতির অনুসরণ থাকিলে তবেই একটি রচনাকে খাঁটি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিব, নতুবা নয়।

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ রূপভঙ্গি আছে। না জানিয়াই বিশ্বের তাবৎ লোকমানস তাহার অনুসরণ করিয়া যায়। আজ পর্যন্ত আমি তাহার ব্যতিক্রম কোথাও দেখি নাই। ইহাকেই আমি বলি লোকসাহিত্যের 'রূপতত্ত্ব' (Morphology)। বর্তমান ক্ষেত্রে আমার আলোচ্য বিষয় প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের

CENTRAL LIBRARY

লোকসঙ্গীত বলিয়া কেবল ওই অঞ্চলের গান অবলম্বন করিয়াই লোকসঙ্গীতের রূপতত্ত্বের পরিচয় দিয়াছি। আমার প্রদত্ত এই রূপতত্ত্বের আদর্শটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে অল্প-বিস্তর খাটিবেই খাটিবে।

আসলে রূপতত্ত্বের এই কাঠামোটি লোকমানস হইতেই উৎসারিত, বিশ্বের তাবৎ লোকমানস যেখানে এক। এই সাদৃশ্য বোধই একদিন ফিনল্যাণ্ডে লোককথা সমীক্ষার ক্ষেত্রে 'ফিনিস্ মেথড্'-এর জন্ম দিয়াছিল, গোটা বিশ্বের গবেষক তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। Diffusionism এবং তাহার বিপরীত মতাবলম্বী না হইয়াও এ কথা বলিতেই হয়, আদিম মানবের মনস্তত্ত্ব মূলত এক ও অভিন্ন হইয়া থাকে।

লোকসাহিত্যের এবং বর্তমান ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের যে রূপতাত্ত্বিক আদর্শটি নির্দেশ করিয়াছি, 'লোকচিত্রে'র মধ্যেও সেই একই Motifগুলি দেখা যায়। একটি আল্পনাচিত্রের মধ্যে বা একটি বাঁশের ঝুড়ি বয়ন করিবার মধ্যে কিংবা একটি কাঁথা সেলাইয়ের কালে যে মনোভঙ্গি ও মনস্তত্ত্ব কাজ করিয়া থাকে, তাহাই Formalised Folklore-এর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।

॥ ২ ॥

সংগৃহীত ৪৩৫টি গানকে পর্যবেক্ষণ করিলে উহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট রচনারীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিয়া সেই সকল বৈশিষ্ট্য এই অধ্যায়ে আলোচিত হইল। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সব কয়টিই একান্তভাবেই কিন্তু প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়,—উহার কয়েকটি বিশেষত্ব সাধারণ ভাবে যে কোনো দেশের লোক-সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য হইতে পারে।

সঙ্কলিত গানগুলির রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি লক্ষ করা যায়:

(ক) ধুয়া ও পুনরাবৃত্তি;

(খ) অর্থহীন পদ, পদসমষ্টি বা বাক্যাংশ দিয়া পঙক্তির পাদপূরণ;

(গ) বাক্য গঠনে বিশেষত্ব;

(ঘ) একই গানের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ;

CENTRAL LIBRARY

(ছ) সাদৃশ্য ও সাংকেতিকতা ;

(চ) বিশিষ্ট উপমা-অলঙ্কার।

এইবার এক-একটি পরিচ্ছেদে, উদাহরণসহ এই বিষয়গুলির আলোচনা করা হইবে ॥

॥ ৩ ॥

'ধুয়া' ও পুনরাবৃত্তি লোক-সাহিত্যের এক বিশেষত্ব। যে কোনো দেশের লোক-সাহিত্যের মধ্যে ইহা লক্ষ করা চলিতে পারে। 'ধুয়া' শব্দটি আসিয়াছে 'ধ্রুবপদ' হইতে। অর্থাৎ ধ্রুবতারার মতো যে পদ স্থির থাকে এবং গানের মধ্যে প্রতি কলির শেষে যাহা অসকৃৎ গীত হইতে থাকে। ইংরেজীতে ইহাকে Refrain বলে।

কিন্তু, ইংরেজী Refrain শব্দটি দিয়া 'ধুয়া'-র অর্থ প্রকাশ পাইলেও, যে বিচিত্র ও ব্যাপক অর্থে 'পুনরাবৃত্তি' শব্দটি আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়াছি, Refrain ঠিক তাহার সব অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। শুধু প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ কেন, বাঙলা ও ভারতের লোক-সাহিত্যের রচনার মধ্যে এমন অনেক কয়েকটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় যে তাহা ঠিক ধ্রুবপদ নয়; ইহাকে ব্যাপক অর্থে 'পুনরাবৃত্তি' বলা যায়।

'ধুয়া' ও 'পুনরাবৃত্তি'-র মধ্যে আমরা পার্থক্য লক্ষ করিয়াছি। অবিকৃত রূপে একই পদের অসকৃৎ উল্লেখই 'ধুয়া'। গানের মধ্যে প্রতিবার প্রতি কলির শেষে 'ধুয়া' যখন গীত হয়,—তখন ধ্রুবপদখানি একই ভাষায় বারংবার গীত হইতে থাকে; গানের প্রতি কলির ভাষার সহিত (সময় সময় ভাবের সহিতও) ইহার সঙ্গতি ও সুষমা না থাকিলেও অনেক সময় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।

কিন্তু, 'পুনরাবৃত্তি'-র জন্য প্রধান প্রয়োজন একটি শৃঙ্খলাবোধ, সঙ্গতি ও সুষমাবোধ। একটি স্তবক হয়তো গানের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইল,—প্রতি বারের 'পুনরাবৃত্তির' মধ্যে ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তন আসিবেই। কিন্তু, এই পরিবর্তনের পশ্চাতে একটি শৃঙ্খলা ও সুষমাবোধ থাকিবেই। একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, একই স্তবককে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বারংবার গাহিলে তাহা 'পুনরাবৃত্তি' হয়। 'ধুয়া' যেখানে অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রূপে বারংবার গীত

CENTRAL LIBRARY

হয়, 'পুনরাবৃত্তির' স্তবক সেখানে একটি রসময় সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে প্রতিবার ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া গীত হয়। 'ধুয়া'-র মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু রসময় বৈচিত্র্যই 'পুনরাবৃত্তি'-র প্রাণ। উদাহরণ দিয়া এই সকল কথা এইবার স্পষ্ট করা যাইবে।

বর্তমান সংগ্রহের কয়েকটি 'ধুয়া'-র নমুনা এই : শামের বলো দিয়া রে—সং ১৪। ওহি দেশে মোর আছে গাভুরা গে—সং ২০। আজি কালা মুই এ্যাখেলায়—সং ২৪। বাঁশী আছে, বাই মোর মান্‌ষি নাই—সং ২৬ক। তুই গে তিস্তাবুড়ী বড়য় হাউসালী—সং ৩৫। শুনো মোরে সাউদানিয়া—সং ৩৭। মোর সোয়ামী এ্যাখেলায়—সং ৪০। বাবুরি ছাটা—সং ৪১। করলা না মোর করলা—সং ৪৫। চাইরমাস বরিষা গে, কাঙ্গে নাই মোর ছাতি—সং ৪৭। কি ওনা মোর কে—সং ৫০। হুতুমা, আয়, আয়, আয় রে—সং ৫৮। এখনো না আইল মোর নিলাজী চোর—সং ৮০। ওকি কালা রে—সং ২৪১। গোদা পারে না—সং ৩৩২। কে কই না মোর কে—সং ৩৫৭। রে নসিবে এই ছিল—সং ৩৮৫। আজি কেনে আইলাম ছান করিতে—সং ৩৯১। শুনো মোরে ওগে বাই—সং ৪৩৫।

গানের সহিত মিলাইয়া লইয়া উল্লিখিত ধুয়াগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে, ধুয়াগুলি কোনোরূপ পরিবর্তিত না করিয়া প্রতি কলির শেষে গাওয়া হইয়াছে। ধুয়া হইল গানের মধ্যে সুরগত একটি ফর্ম বা রীতি বিশেষ ; ইহার আক্ষরিক অর্থ অপেক্ষা সুরগত মূল্যই বেশি। ধুয়ার আক্ষরিক অর্থ গানের মধ্যে ভাবের ক্ষেত্রে নতুন কোনো ব্যঞ্জনার সঞ্চার করিতে পারে না। ধুয়ার 'পুনরাবৃত্তি' গানের মধ্যে সুরগত একটা সুষমা ও সামঞ্জস্য আনিয়া দেয়।

এই বার 'পুনরাবৃত্তির' প্রসঙ্গে আসিতেছি।

১-সংখ্যক গানে দেখা যায়,—পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই চারি দিকস্থ বিভিন্ন দেবতা ও উপদেবতার বন্দনা করা হইতেছে। বিভিন্ন দিকের নাম করিয়া এক-একটি পঙক্তি গড়া হইয়াছে এবং প্রতি পঙক্তির শেষে 'তাহারো চরণো বন্দো ছুইয়ো পাও' প্রতিবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই চারিদিকের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া পর-পর উল্লেখের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই শৃঙ্খলা পূর্ণতর হইয়াছে,—যখন প্রতি পঙক্তির শেষে বারংবার 'তাহারো চরণো বন্দো ছুইয়ো পাও' উল্লিখিত

CENTRAL LIBRARY

হইয়াছে। যদি গানটির মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা রক্ষা না করিয়া, কেবল প্রতি কলির শেষে 'তাহারো চরণো বন্দো দুইয়ো পাও' উল্লিখিত হইত, তবে ইহা 'ধুয়া' হইত ; শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি ভাবের ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে এই পঙক্তি ১-সংখ্যক গানে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান ক্ষেত্রে ইহা 'পুনরাবৃত্তি'র পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

এই ব্যাপার ৬ক-সংখ্যক গানেও উদাহৃত হইয়াছে। ইহার উদ্বোধনী স্তবকটি এইরূপ :

তিস্তাবুড়ীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালী ;
আনন্দে বরিয়া নেহ গে
হমার পাকবহিনি ॥

এই একই স্তবক সমগ্র গানটিতে পাঁচবার গীত হইয়াছে,—কেবল প্রত্যেক বার 'তিস্তাবুড়ী'-র স্থলে পর্যায়ক্রমে একটি বিশিষ্ট ক্রমবিবর্তনের ধারা রক্ষা করিয়া 'গুছি লক্ষ্মী', 'ডাক লক্ষ্মী', 'অঘন লক্ষ্মী', 'পৌষ লক্ষ্মী'-র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী ৬খ-সংখ্যক গানেও দেখা যায়, উহার প্রথম স্তবকটির 'আজি কেনে আলোয়ার বাস উঠে রে', ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া দ্বিতীয় স্তবকে 'আজি কেনে ধুপের বাস উঠে রে', হইয়াছে। পঙক্তি প্রায় অবিকৃতই আছে, —কেবল আতপ চালের (আলোয়া) সহিত ভাবসঙ্গতি রক্ষার্থে 'ধুপ'-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

২৬-সংখ্যক গানের 'পুনরাবৃত্তি' আরো সুন্দর। এই গানে প্রতি স্তবকের অন্তে "মনে আছে জানা রে শ্যাম, মনে আছে"—এই পঙক্তির বারংবার উল্লেখই ইহার বিশেষত্ব নয় ; তাহা হইলে ইহা 'ধুয়া' হইয়া উঠিত। লক্ষ করিয়া দেখা যাইবে,—দ্বিতীয় স্তবকটিই গানখানির মূল স্তবক। এই স্তবকটিকেই আদর্শ করিয়া এবং একটি বিশেষ পর্যায় বা শৃঙ্খলা বা নিয়ম অনুসরণ করিয়া, পরবর্তী স্তবকগুলি রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ অন্য কথায় বলা চলে, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে আসলে দ্বিতীয় স্তবকের পরিবর্তিত রূপ।

২৭-সংখ্যক গানেও পুনরাবৃত্তির এই একই আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। এই গানটির চারিটি স্তবককে সরল গদ্য করিলে ভাবটি এইরূপ হয় : আমের গাছে

CENTRAL LIBRARY

আম নাই, ওগো সখী, তবু কেন চেঙ্গড়া ছেলেটা ঘুরিতেছে। কুলের গাছে কুল নাই, ওগো সখী, তবু কেন গাছে ঢিল পড়িতেছে। পুকুরে জল নাই, ওগো সখী, তবু কেন চিল উড়িতেছে। খোপে 'কবুতর' নাই, ওগো সখী, তবু কেন বকম্-বকম্ শব্দ হইতেছে। দেখা যাইতেছে, প্রতি স্তবকে এক-একটি নতুন বিষয়ের উল্লেখ (যেমন, আম, কুল, পুকুর, 'কবুতর' ইত্যাদি) মাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু উহার ভাব ও ভাষা প্রতি স্তবকেই প্রায় এক। অর্থাৎ মূল স্তবকই ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

২৯-সংখ্যক গানের প্রথম স্তবকে বলা হইয়াছে : উঁচু ধানের আলি ডিঙ্গাইতে যাইয়া গলার হার ছিঁড়িয়া গেল। কে এখন এই হার পুনরায় গাঁথিয়া দিবে?

কাঁয় গাঁথিবে হারো গে ;
অহি অসের দেওরা—
অয়হে গাঁথিবে হারো গে।

পরবর্তী স্তবকে এই ভাবটিই ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া পুনরাবৃত্ত হইয়াছে :

কায় পিন্ধিবে হারো গে ;
অহি অসের ভাউজী—
অয়হে পিন্ধিবে হারো গে॥

প্রথম স্তবকে 'দেবর' ও হার 'গাঁথার' উল্লেখ ; দ্বিতীয় স্তবকে বউদি ও হার পরিবার উল্লেখ। দেখা যাইতেছে, একটি ভাবেরই দুইটি পর্যায় যেন দুইটি স্তবকে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩১গ-সংখ্যক গানের পুনরাবৃত্তি এইরূপ : বড়ো বাড়ী দেখিয়া দেবী মেছেনীর ডালা তোমাদের বাড়ীতে আনিয়াছি। তোমাদের যদি চাউল না থাকে, তবে ধান ভানিয়া আমাদের চাউল দাও,—আমরা তোমাদের বিঘ্ন খণ্ডাইব। তোমাদের যদি সিঁদুর না থাকে, তবে কৌটা ঝাড়িয়া আমাদের সিঁদুর দাও,—আমরা তোমাদের বিঘ্ন খণ্ডাইব। তোমাদের যদি তেল না থাকে, তবে বোতল নিষ্কাশিত করিয়া আমাদের তেল দাও,—আমরা তোমাদের বিঘ্ন খণ্ডাইব। তোমাদের যদি 'কড়ি' না থাকে, তবে টাকা ভাঙ্গাইয়া আমাদের 'কড়ি' দাও,—আমরা তোমাদের বিঘ্ন খণ্ডাইব। এখানেও দেখিতেছি,—বক্তব্য বিষয় ও তাহার ভাষা একই, কেবল প্রতি স্তবকে এক-

CENTRAL LIBRARY

একটি নতুন বিষয়ের (যেমন, প্রথম স্তবকে চাউল, দ্বিতীয় স্তবকে সিঁদুর, তারপর তেল, তারপর পয়সা) উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

৩৭-সংখ্যক গানের পুনরাবৃত্তি একটু অন্য ধরণের। এই গানে একই স্তবক ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া প্রতিবার পুনরাবৃত্ত হয় নাই। একটি ভাব একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিয়া ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহাই প্রতিটি স্তবকের মধ্যে পুনরাবৃত্তির আভাস আনিয়া দিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে : বিহার দেশে যাইয়া স্বামী 'বেউলালী' শাঁখা কিনিয়া ভাবিতেছে,—কেমন করিয়া এই শাঁখা গৃহে লইয়া যাইব। ছাতার তলে এই শাঁখা লইয়া গেলে উহাতে কালো দাগ পড়িবে। হাতে করিয়া এই শাঁখা লইয়া গেলে উহা রৌদ্রে জলিয়া যাইবে। ধুতির আঁচলে এই শাঁখা লইয়া গেলে উহা পড়িয়া যাইবে। স্বামী তারপর ভাবে : 'বেউলালী' শাঁখা স্ত্রীর জন্য কিনিলাম,—কিন্তু তাহা স্ত্রীকে পরাইব কখন এবং কেমন করিয়া। আঙিনায় এই শাঁখা পরাইলে স্ত্রীর জায়েরা এই শাঁখার ভাগ চাহিবে। বারান্দায় এই শাঁখা পরাইলে স্ত্রীর ননদিনীরা এই শাঁখার ভাগ চাহিবে।···

এই গানে দেখিতেছি,—প্রথম অংশে শাঁখা ক্রয় এবং তাহা আনিবার জন্য স্বামীর চিন্তার মধ্যে এবং উত্তরাংশে শাঁখা আনিয়া তাহা পরাইবার জন্য স্বামীর ভাবনার মধ্যে একটি পর্যায় অনুসরণ করিয়া (যেমন, শাঁখা আনিবার সময় পর্যায়ক্রমে ছাতা, হাত, ধুতির আঁচলের উল্লেখ ; পরে জা' ও ননদিনীর উল্লেখ) সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইখানেই গানের মধ্যে পুনরাবৃত্তি—এবং ইহাই গানটিতে রস সঞ্চারিত করিয়াছে।

৩৭-সংখ্যক গানের পুনরাবৃত্তির এই রীতি ৪২-সংখ্যক গানেও পাওয়া যায়। এখানেও একই স্তবক ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে বারংবার উল্লিখিত না হইয়া, একই বস্তুর বিভিন্ন অংশ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তবকে উল্লিখিত হইয়াছে এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইতেছে : ঘর বাঁধিলাম, চালের খড় বাতাসে উড়িয়া গেল। সেই ঘরের বেড়া বাঁধিলাম, হইলাম বিধবা। সেই ঘরের দরজা লাগাইলাম, বুকে পাইলাম শেল। সেই ঘরের ছেঁচতলা বাঁধাইলাম, মনে পাইলাম দুঃখ। এখানেও লক্ষ করা যাইবে, একটি ঘরের বিভিন্ন অংশের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ প্রতি স্তবকে প্রায় একই ভাব ও ভাষায় করা হইতেছে। পর্যায় ধরিয়া একটি ঘরের বিভিন্ন অংশের উল্লেখে

এবং প্রতি অংশ সম্পর্কে প্রায় একই প্রকারের মন্তব্য করার মধ্যে গানটিতে পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাই।

৪৫-সংখ্যক গানেও এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি। গৃহবধূ বলিতেছে: সারি-সারি করলা গাছ (তরকারি বিশেষ) রোপণ করিলাম। ননদিনী সেই গাছে জল দিল, শ্বশুর সেই গাছের জন্ম জাঙলা তৈরি করিল, ভাশুর সেই গাছ জাঙলার উপর তুলিয়া দিল, শাশুড়ী সেই গাছ হইতে করলা ছিঁড়িয়া আনিল, আমি সেই করলা রাঁধিলাম। শ্বশুর সেই করলা খাইয়া স্বাদ পাইল, ভাশুর সেই করলা খাইয়া স্বাদ পাইল, কিন্তু স্বামী সেই করলা খাইয়া স্বাদ পাইল না।...

এইখানে দেখা যাইতেছে, একটি করলা গাছের বিভিন্ন অংশের পরিচর্যা করিয়াছে একটি পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি। ইহা রোপণ করিয়াছে একজন, বারি সিঞ্চন করিয়াছে একজন, জাঙলা তৈরি করিয়াছে একজন, জাঙলায় সেই গাছ তুলিয়া দিয়াছে একজন, গাছ হইতে ফল পাড়িয়াছে একজন এবং রাঁধিয়াছে অপর আর একজন। একই গাছের বিভিন্ন স্তরের সহিত উহার পরিচর্যাকারীরূপে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির পর্যায়ক্রমিক উল্লেখের মধ্যে এই গানে পুনরাবৃত্তি আসিয়াছে।

পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপরে দশখানি গান আলোচনা করিয়া বলিলাম। আশা করা যায়,—ইহাতে বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এইরূপ পুনরাবৃত্তি বর্তমান সংকলনের অনেক গানেই লক্ষ করা যাইবে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গানগুলির নাম উল্লেখ করিতে পারি:

সং ৪৮, সং ৫৫গ, সং ৫৭, সং ৫৮খ, সং ৬২খ, সং ৬৯খ, সং ১০৩, সং ১১৫ (শেষ স্তবক), সং ১২৩, সং ১৩৬ক, সং ১৩৬গ, সং ১৩৪, সং ১৩৮ক, সং ১৩৯, সং ১৪৭, সং ১৫১, সং ১৫৯, সং ১৬০, সং ১৬৩, সং ২০৩, সং ২০৬, সং ২১০, সং ২১১, সং ২১২খ, সং ২২৫, সং ২৩০, সং ২৩৫, সং ২৪০, সং ২৫০, সং ২৫৬, সং ২৬০গ, সং ২৬২ক, সং ২৬৫, সং ২৬৭, সং ২৭১, সং ২৭২, সং ২৭৪, সং ২৭৮, সং ২৮০, সং ২৮৬, সং ২৮৮, সং ২৯০, সং ২৯৪, সং ২৯৯ (কথান্তর), সং ৩০৩, সং ৩০৩ক, সং ৩১৫, সং ৩১৭ (নামানি; কালী-কর্তৃক ছলনা: প্রথমাংশ; ঝিমিলার শৈশব ও যৌবন; ঝিমিলার বিবাহের আয়োজন; পতির মরণে বামুনতির খেদ; শান্তি সঙ্গীত), সং ৩১৮ক (প্রথম স্তবক),

সং ৩৩৬, সং ৩৬৪, সং ৩৬৬, সং ৩৬৯, সং ৩৮০ক, সং ৩৯২, সং ৩৯৩, সং ৩৯৫, সং ৩৯৭ক, সং ৪০৬ এবং ৪২৯-সংখ্যক গানের বিভিন্ন অংশ।

এইরূপ পুনরাবৃত্তি সমগ্রভাবে লোক-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য॥

॥ ৩ ॥

পুনরাবৃত্তিরই অপর একটি স্তর লক্ষ করা যায়,—যাহা ধুয়া-র মতো অবিকৃত রহিয়া সারা গানে বারবার গীত হয় না; কিংবা, পুনরাবৃত্তির মতো পর্যায় বা নিয়ম রক্ষা করিয়া ঈষৎ পরিবর্তিতরূপেও পুনরাবৃত্ত হয় না। ইহা গানের একটিমাত্র পঙক্তির (বা একটিমাত্র স্তবকের) মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং সেই পঙক্তির বা স্তবকের মধ্যেই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় আবার ইহা ঠিক পুনরাবৃত্তি-ও নয়—সমান ওজনের ও সমান ধর্মের দুইটি ভাব একটি পঙক্তির দুইটি অর্ধে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়,—তাহাতে ওই একটি পঙক্তির মধ্যেই সমধর্মী দুইটি ভাবের পুনরাবৃত্তি সূচিত হয়। এই ধরণের পুনরাবৃত্তিগুলির বিশেষত্ব হইল,—ইহা গানের একটি পঙক্তির বা স্তবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সেই পঙক্তি গানের মধ্যে কখনই পুনরাবৃত্ত হয় না।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই ধরণের পুনরাবৃত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিতে পারা যায়। নীচে তাহার দৃষ্টান্ত দিলাম।

(ক) সমভাবার্থক পুনরাবৃত্তি :

হাটো সে নাই যাও, পথো সে নাই যাও, নাই যাও যমুনারো ঘাটে—সং ১৯। সনা খেলি পাটো হে এগিনা, উপা খেলি খুলি - সং ৩৩। সনার নাঙ্গোল, উপার ফাল, হুদুমা ঠাকুর জুড়িসে হাল—সং ৫৮। এ ঘাট দরিয়া, ও ঘাট দরিয়া—সং ৫৮গ। বনত্ কান্দে বন, সখী হে, পাথারত্ কান্দে ধেনু—সং ৮২। আইলে করিম্ আল্-সিঁত্তিনা, জমিনে করিম শেয়া—সং ৮৫, কথান্তর। চলিল্ নরসিং, করিল্ গমন—সং ১৩৭। হাটের নিন্, পথের নিন্, চখুত্ ভাসা বান্ধে—সং ১৩৯খ। হাতত্ নিলো ক্ষার গে থইলা—সং ১৭০। এড়িয়া দে রে বুড়া, ছেড়িয়া দে—সং ১৭০খ। নদীর শোভা বান-বরিষা দীঘির শোভা চুল—সং ১৭১। টাকা না ভাঙ্গেয়া ভীঘি না দিলেন গে,—আখিলি না ভাঙ্গেয়া চারি ঘাটো গে - সং ২৬১। সরুয়ালি কদমের তলে গুণ শিখালো, হেলানী কদমের তলে গুণ মুই পরখীম—সং ৩১৭, পিতার নিকট

CENTRAL LIBRARY

কালীর মন্ত্রশিক্ষা। কিনা বুদ্ধি করে আথোয়াল, কিনা চরিচর—সং ৩১৭, কালী-কর্তৃক ছলনা। কিসোত্ কি কাম করলো মাই, কিসোত্ কি কাম করলো—সং ৩১৭, মাশানের জন্ম। হাটো হইসে গুম্ গুম্, বাজার হইসে শেষ—সং ৩১৭, ঝিমিলার বেসাতি। অন্তর জ্বালা জানিস গে দাইয়ানী, চিতের জ্বালা জানিস গে দাইয়ানী,—সং ৩১৭, বামুনতির সন্তান প্রসব। কাম করি'র না মোনায় মোক, কাম করি মুই কিসে/কাম করি'র না মোনায় মোক, এই কমরটার বিষে/কিসের কি মোর কমরের বিষ, নাঠির ঠেকা দিয়া হাটে'।/কিসের কি মোর মাথার বিষ, গল্গলেয়া ছাদে'।—সং ৩৪৩, কথান্তর। আম গাড়িলেন, জাম গাড়িলেন, আরো নারিকেল—সং ৩৭৮গ। আজি সনার বাটিত্ ক্ষার-খইল, হে কইন্যা, উপার বাটিত্ ছেঁকা—সং ৩৮৩।

(খ) বিপরীতার্থক পুনরাবৃত্তি :

আগ দুয়ারী কে রে মোর, পাছ দুয়ারী কে রে—সং ৫৪। হাতত্ দিলে হাতেরে বান্ধন, পায়ে নোয়ার বেড়ি—সং ৮৫। মাও গেইছে হাট, বাপ গেইছে হাট : মাও আনিবে নাড়ু-মোলা, বাপ আনিবে খাট—সং ১৪৫। আগ দুয়ারে পাছ দুয়ারে সোদর আসিসে—সং ১৫৩। ডাইন হাতে কৌটা রে মোর, বাঁও হাতে মোর ঝারি—সং১৭১। আজি কাঁচাগুয়া, মাই, পাকা পান, ও মাই, সেলায় কেনে খালো—সং ১৮৬ক। তুই বেড়াছিত্ বনে রে বনে, মুই কান্দেছুঁ মনে রে মনে—সং ২০২। আজি ডাইন বগলে ছাওয়া দুইটা, বন্ধুধন, বাঁও বগলে বইসো—সং ২৩০। ভাটি দেশে বাড়ী কন্যা ও, উজান বেপার করি ;···তালের নাখান গুয়া বন্ধু ও, কুলার নাখান পান—সং ২৪৫ক। ভাটি ঘাটে পদ্মক বান্ধে, উজান ঘাটে রঞ্জন কান্দে—সং ২৪৯। হে কূলে সাহেবের বেটা সাজনি সাজে ; হকূলে গলামের বেটা থোরহোলি কাঁপে—সং ২৫৭খ, কথান্তর। ওই আগা ঘরে পাছা ঘরে দিয়া গেইল্ পাত্—সং ৩১৭, ঝিমিলার বিবাহ-যাত্রা। ও কইন্যা, হাত ধরে'। তোর, পাও ধরে'।—সং ৩৩০। ডাইন ঠ্যাংদি' ত্যাল আনি'র পারে'।, বাঁও ঠ্যাংদি' ঘাঁটো—সং ৩৩৪। বাপো দিলে খড়িরে খুটা, মাও দিলে রে বাসন,···ছোটো বহিনি বারা গে ভুকে, মাজকিনী বইনি গে ঝাড়ে—সং ৩৮৫। আজি বাপোক না ভাঁড়েয়া রে এই দই খিলাছু রে সই, মাওক না ভাঁড়েয়া খিলাছু চুঁড়া—সং ৩৯০। কলো মইধ্যে

CENTRAL LIBRARY

গুয়া রে, পাতারি মইধ্যে পান। তিরি মইধ্যে আধে গে, পুরুষো মইধ্যে শ্যাম—সং ৪৩০।

(গ) সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি :

একটা তারা, দুইটা তারা, তারার মাও মোত্তিহারা—সং ১৫৬। একেলায়-দোকোলায় না যায় আরো হাঁটা—সং ১৬১। এক শিয়ালী আন্দে বাড়ে, দুই শিয়ালী খায়—সং ১৬২। বারো না ব'সেরে যৈবন মাই তুই আখিবো বান্ধিয়া ; ষোলো না ব'সে রে যৈবন মাই তোর পড়িবে হালিয়া—সং ১৭২। এক ডুব, দুই ডুব, তিনো ডুব দিল—সং ৩১৭, সৃষ্টি পত্তন। একো মাসের বেলা কালী দুইয়ে দিলে পাও—সং ৩১৭, কালীর জন্ম। এক নল, দুই নল করি' তিনো নলের বেলা—সং ৩১৭, কালীকে পূজা দান ও রাখালের পুত্র লাভ। দশো-বিশো টাকা নিলে আঞ্চলে বান্ধিয়া—সং ৩১৭, বিবাহের জন্য ঝিমিলার সওদা। বারো গাছি গুয়া রে মোর, তেরো গাছি পান—সং ৩৪৬।

উপরের এই পুনরাবৃত্তিগুলি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, এখানেও একটি বিশেষ পর্যায় বা রীতি বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ফলে ভাবটি পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। একটিমাত্র পঙক্তি বা স্তবকের মধ্যে এই প্রকার পুনরাবৃত্তিও লোক-সাহিত্যের রূপতাত্ত্বিক দিকের এক সাধারণ বিশেষত্ব।

॥ ৫ ॥

পুনরাবৃত্তির মূল কথা হইল,—সঙ্গতি, সুষমা, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলাবোধ। এই বোধেরই অপর পরিণতিরূপে অনেক সময় দেখা যায়,—একটি পঙক্তি বা স্তবকের মূল ভাবের আনুষঙ্গিক অপর একটি ভাবকে খাড়া করা হইয়াছে। কিন্তু সেই আনুষঙ্গিক ভাবটি অর্থহীন। মূল ভাবটিকে পরিস্ফুট করিতে উহার সহিত ধ্বনি-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিশিষ্ট কোনো পদ বা পদ সমষ্টি জুড়িয়া দেওয়া হয়। ব্যাকরণের দৃষ্টি দিয়া অন্বয় করিতে বসিলে উহার কোনই অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, কিন্তু লোক-সাহিত্য-রসিকের রসদৃষ্টি তাহাতে এক প্রকার রসের সন্ধান পাইতে পারে। এই সকল অর্থহীন পদ বা পদসমষ্টি অথবা বাক্য বা বাক্যাংশ পঙক্তির মধ্যে একটি ধ্বনি-সুষমার সৃষ্টি করে এবং মূল ভাবটির অন্তর্নিহিত ধ্বনিটিকে স্পষ্টতর করিয়া তোলে। অর্থহীন পদ বা পদ-

CENTRAL LIBRARY

সমষ্টি, বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়া পঙক্তির পাদপূরণ করিবার প্রবণতা লোক-সাহিত্যে ব্যাপকভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে।

উদাহরণ দিয়া এই সকল কথা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। যেমন এই পঙক্তিটিতে ঃ

ওই ইঠো ধানের পিঠো
দুই গাহেনে কুটোঁ—সং ১০৫, কথান্তর।

ইহার অর্থ হইল : দুই মুষলে (দুই জনে মিলিয়া) পিঠা তৈরি করিবার জন্য 'ইঠো' ধানের চাল কুটিতেছি। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় উত্তম পুরুষে, বর্তমান কালে 'কুটি'-র স্থানে 'কুটোঁ' হয়। এই 'কুটোঁ', 'পিঠা'-কে 'পিঠো' করিয়াছে, ছন্দের খাতিরেই এইরূপ হইয়াছে ;—সহজেই তাহা বোঝা যায়। কিন্তু 'ইঠো' ধান কি ? কেহ কথনো এই ধানের নাম শোনে নাই। না শুনুক, তাহাতে লোক-সাহিত্যের কিছুই যায়-আসে না। তাহার দরকার ধ্বনি, ছন্দ। তাই 'পিঠো'র ভাবানুষঙ্গ রক্ষা করিবার জন্য একটি নিরর্থক পদ 'ইঠো' প্রযুক্ত হইয়াছে। পঙক্তিটি হইতে কোনো বৈয়াকরণ যদি অর্থের লোভে 'ইঠো'-কে হঠাইয়া এক অর্থপূর্ণ শব্দ বসাইয়া দেন, তবে তিনি তাহাতে আনন্দ পাইবেন বটে, কিন্তু সমস্ত পঙক্তিটির রস বা ধ্বনি-সুষমা বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

কেবল ধ্বনির খাতিরে নিরর্থক পদই এইরূপ ব্যবহৃত হয় না, নিরর্থক বাক্যও এইরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন,

ইকা করে টোরোত-টারাত্—
ছিলিমের কটিত্ ছাই।
এই বাড়ীর ভিক্ষা নিয়া
অন্য বাড়ীত্ যাই ॥—সং ১৩৫

এই স্তবকের প্রথম পঙক্তির নিজস্ব একটি অর্থ আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তির সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। প্রথম পঙক্তিটি যেন কেবল স্তবককে পূর্ণ করিতে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। নতুবা অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে সমগ্র স্তবকের সহিত ইহার কোনোই সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

CENTRAL LIBRARY

'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়ার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'মনের বন্ধন তাহার (বালকের) পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্য কারণ সূত্র ধরিয়া জিনিস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।'—পৃঃ ৮।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকেই টানিয়া প্রসারিত করিয়া লইয়া বলা যায়, তিনি যাহা কেবল শিশুর ছড়ার মধ্যেই লক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্রভাবে লোক-সাহিত্যেরই এক বিশেষত্ব। সঙ্গতি, সুষমা ও ধ্বনি-সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিবার জন্য শব্দাশ্রয়ী 'অর্থ'-কে লইয়া লোক-সাহিত্যে নিরর্থক টানাটানি করা হয় নাই। অর্থ ভাসিয়া যাক,—কিন্তু ছন্দ, সুর ও তাল রক্ষা হইলেই সবটা রক্ষা হইল।

অর্থহীন পদ বা পদসমষ্টি বা বাক্যাংশ দিয়া পঙক্তি বা স্তবকের পাদপূরণের অন্যান্য উদাহরণ এই :

উড়িয়া মাথা গুঁড়িয়া ভাঙ্গিম—সং ৩৯। মাছ ন হায়, মাছিকা ন হায় বড়াই, চিলা কেনে ঘুরে—সং ৪৩। জগতেরে উনি-ঝুনি—সং ৬৪। গাঙ্গের পানি ইত্তল-পিত্তল, সাতখান পিত্তলে গড়ায়ে নাও—সং ১৪৮। বাপোই পোই-পোই, শৌনি ধানের খই। বুড়া উবায় নাঙ্গল-জোঙ্গাল, বুড়ী উবায় মই—সং ১৫০। ওই হিলারে হিলা, মাছ নিকাউক চিলা। ওই গাওকেনা তোর হুদুম্-দুম্, নাচন কেনে ঢিলা—সং ১৫০ক। ওই হোলো রে হোলো, মাছ মারিবা' গেলো। শৌল মাছে গুঁতা খায়া বিচা আউলিয়া আসিলো—সং ১৫০খ। তা-তুর্-তুর্-তুরা রে ভাই, তা-তুর্-তুর্-তুরা। ঘরে নাচে শ্যাম-সুন্দরী, বাহেরে নাচে বুড়া—সং ১৫৪। মাকলা বাঁশের পিতারি, ওইঠে দাদার কাচারি—সং ১৫৫। চানুঘুঘু, চানুঘুঘু, তোর্ হে দোহাই। এক বেটী বিহায়, ষোলো জামাই—সং ১৫৭। মাও কান্দেছে নাটু-মুটু, বইনি কান্দে সুয়া ;···এড়ি কান্দে, বেড়ি কান্দে, আরো কান্দে সুয়া—সং ১৬২। চালত্ ফলে চাল-কুমড়া গে, ঝিঁকত্ ফলে কদু। দেখা-দেখি মানুষি হলো মাই গে, ও তোর পরে খাবে মধু—সং ১৬৭ক। দোমহনীর হাটের দই-চুঁড়া রে, নেওরা নদীর পানি। আখিয়াছিলাম গোপনের পিরিতি, হইল্ রে জানাজানি—সং ১৭৮। পাটায় কাটেঁা, পাটায় ছাটেঁা, পাটার বাক্কো ওরে হাঙ্গা। তোম্হাকে নাগিয়া কইন্যা মোর চিত্ত অহিল্ বাক্কা—সং ২২৩।

CENTRAL LIBRARY

হামার হাতের সরু শাংকা, সতোনীর হাতের খাড়ু ; সিতানের মাথাত্ জলের ঝারি, শিকিয়ার উপর নাড়ু—সং ২২৮। আজি আজার হস্তী বন্দী হইল্ রে প্রাণোনাথ, নয়া ছিকল দিয়া ; আর মুই নারীটা বন্দী হইনু পিরতির নাগিয়া —সং ৩৪৮। ছান ফেলাও মুই নাচার-মুচুর—সং ২৩০। আমের পাতো চিকণ-চাকণ রে বন্ধু, তেঁতেলির পাত সরু। এছিয়া-বেছিয়া করিস পিরিত, যারে কমর সরু—সং ২৩৮। হাড়িয়া কোণে নাগিল্ দেওয়া, তিনঝন ঢেনা হছে বেনোয়া। জোলপাইগুড়ির ঘন রে গলি, ওইঠে আছে পানের রে খিলি—সং ২৭০, কথান্তর। তাংকু বাড়ীত্ নাফাশাকা, ঢ্যাপা-ঢ্যাপা কুশি। আজিকার মনে ঘুরিয়া যা রে কাড়োয়া, মনত্ নাই মোর খুশি—সং ২৫৩ক। হেকেয়া-ভালিমের গাছো গে বাবা, ওগে বাবা, এখিনায় না ধরে ছেয়া। জাঞুই করিবা' গেলেন গে বাবা, 'অমুক' পাড়ার ভিতি—সং ২৫৪। উত্তর কাশিয়া গে, কাশিয়া মেইনং ফুটে, —ওগে, সেই না কাশিয়ার তলে গে বাবা ঘরো বান্ধে—সং ২৬২। দুয়ারের আগে মোর নালো বিয়ার থোপো গে ; নালো বিয়া মোর জলিয়া যাছে গে হে পাগুড়ির তলে—সং ২৬৪ক। কালা মেঘার তলে গে আই গেছা হল্ফল্ করে। হল্দা-মাখা দামান গে আই টক্-টক্ করি' দেখে—সং ২৭৬। ইড়িয়া বান্দো, ভিড়িয়া বান্দো, চন্দন বিরিখের গাছো : আজল জাঞুই বিদায় চাহে কি কি দিবেন দানো—সং ২৮১। সং ৩০১গ, সং ৩০১ঘ, সং ৩০৫, সং ৩০৬, সং ৩০৬ক, সং ৩০৯, সং ৩১১, সং ৩১১ক। নাড়ী না কাটিয়া নাড়ীর কলে থাক। নাড়ীর উপর চড়ি' ছাখেক বেরুবাড়ীর হাট—সং ৩১৭, মাশানের জন্ম। একে শূন্য দশ, দুইয়ো শূন্য বিশ, ভালো অধিকারী দিয়া একটি গাবা দিস্—সং ৩৫২। এণ্ডাবাড়ী-ভেণ্ডাবাড়ী কুহা নাগাইসে। ভাঁড়া-ভাঁড়ীগিলা মরাই নাগাইসে—সং ৩৫৪গ। সোনারে আরুনী আধে গে, উপারে বাড়ুনী—সং ৪৩০॥

॥ ৬ ॥

সঙ্কলিত গানগুলির বাক্য-গঠনের মধ্যেও বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। বাক্য-গঠনের এই বিশেষত্ব গানগুলির রচনাগত দিকটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। বাক্যের মধ্যে "গে, রে, না, সে, হে, হো, এ, এনা, বা, কিবা, ভালা, হোকর, মোর, তোর, আজি, ওই, ওকি, কি ওহোরে, ওকি ওই মরি

CENTRAL LIBRARY

রে, ও মোর, হায় রে" প্রভৃতি অব্যয় ও অব্যয়পদের সমষ্টি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইগুলিও আসলে উপরের উদাহরণগুলির মতো নিরর্থক ব্যবহৃত হয়,— কথার মাত্রা হিসাবে।

ইহা ছাড়া, কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার ; কর্মকারকে একই সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের উত্তর ক-এর ব্যবহার ; বস্তুবাচক নির্দেশক সর্বনামের শেষে -ক-এর প্রয়োগ ; করণকারকে য়ে-র ব্যবহার ; ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া-চতুর্থীর – ক-এর প্রয়োগ ; ষষ্ঠী বিভক্তিতে এ এবং অনাবশ্যক র-এর যোগ প্রভৃতি লক্ষণীয়।

এই প্রসঙ্গে আরো কতকগুলি কাব্যিক বিশেষত্বের কথা এইখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন, বিশিষ্ট বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে কতকগুলি পদ বা পদসমষ্টির ব্যবহার ; কয়েকটি সংখ্যা-বাচক বিশেষণের কাব্যিক ব্যবহার ; বিশিষ্ট নদী-বাচক ও স্থান-বাচক শব্দের ব্যবহার ; বিশিষ্ট তরু-লতা, ফুল-ফল ও পশু-পাখীর নামের ব্যবহার ; চলিত কতকগুলি পদের কাব্যিক বিকৃতি ; বিশিষ্ট কতকগুলি সম্বোধন ও কাব্যিক গালিগালাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়।

॥ ৭ ॥

একই গানের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক সংলাপের ব্যবহার লোকসঙ্গীতের অপর এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। বহু গানেই দেখা যায়, উহার এক অংশ প্রশ্ন এবং অপর অংশ তাহার উত্তর। একই গানের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর সঙ্কলিত করিবার প্রবণতা আদিম সমাজ-জীবনের এক বিশিষ্ট দিককে তুলিয়া ধরে। আদিম সমাজে মানুষের ব্যক্তিগত দিক অপেক্ষা সমষ্টিগত দিকটাই প্রধান ছিল। একই গানের মধ্যে দুইজনের বক্তব্য ধরিয়া রাখিবার মধ্যে ব্যক্তি-ধর্ম অপেক্ষা সমষ্টি-ধর্মটিই মুখ্য হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, মানুষের একক কণ্ঠের গান অনেকটা আধুনিক ব্যাপার। সমবেত বা দ্বৈতকণ্ঠের গানই আদিম গান। উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক গানের মধ্যে সেই আদিমতার ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাই।

কেহ-কেহ মন্তব্য করিয়াছেন, একই গানের মধ্যে এইরূপ উক্তি ও প্রত্যুক্তির ব্যবহারে গানের সুর ও ভাবগত অখণ্ডতা ব্যাহত হয়। কিন্তু,

CENTRAL LIBRARY

লোক-সমাজের নিজস্ব দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে, এই উক্তির মধ্যে রসবোধের পরিচয় মিলে না। এই প্রসঙ্গে লোক-সঙ্গীত গাহিবার পদ্ধতিটিও স্মর্তব্য। লোক-সঙ্গীতের একটা বিশেষত্ব হইল, সেখানে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া গানে কোনো কথা বলা হইতেছে, তখন যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা হয় এবং যে তাহা বলে,—দুইজনে মিলিয়া দ্বৈত কণ্ঠেই তাহা গাহিয়া থাকে। একজন প্রশ্ন অংশটি গাহিল, এবং অপরজন উহার উত্তরাংশটি গাহিল—এইরূপ নহে। যেখানে প্রশ্ন ও উত্তরাংশ একই সঙ্গে দুইজনে বা ততোধিক জনে দ্বৈত বা সমবেত কণ্ঠে গাহিতেছে, সেখানে গানের সুর বা ভাবগত অখণ্ডতা ব্যাহত হইবার কেনো সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

তারপর আরো একটি কথা। লোক-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত 'রস' বস্তুটি খুব তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, অখণ্ড নহে। উহার তাল ও লয়ের মধ্যেও মার্জিত গানের মতো হিসাব-করা মিল দেখা যাইবে না। কিন্তু, সবটা মিলাইয়া উহার মধ্যে একপ্রকার স্পষ্ট-অস্পষ্ট, ঢিলে-ঢালা রস, সুর, তাল আছে যাহা বিশিষ্ট লোক-সমাজেরই সমষ্টিগত জীবনের অঙ্গীভূত। কাজেই, লোক-সঙ্গীতের রসের অতো সূক্ষ্ম বিচার করিয়া 'তুলা ধুনি' ধুনি' আঁসুরে আঁসু' না করিলেও চলিবে। উহা মার্জিত সঙ্গীত ও সাহিত্য বিচার করিবার জন্যই জমা থাকুক।

একই গানের মধ্যে উক্তি ও প্রত্যুক্তির ব্যবহার করিবার দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে বর্তমান সঙ্কলনের নিম্নলিখিত গানগুলির নামোল্লেখ করিতে পারি :

সং ৬৯গ, সং ১৭০, সং ২০৬, সং ২৪৫ক, সং ২৫৯, সং ৩০৪খ, সং ৩৩৩, সং ৩৩৭, সং ৩৫৬গ, সং ৩৫৯, সং ৩৭৬, সং ৩৮১ক ও সং ৩৮৩ক।

এই সমস্ত গানগুলির দুইটি করিয়া অর্ধ আছে। কিন্তু এই অর্ধ-বিভাগ এমন ভাবে করা হইয়াছে, যাহাতে মনে হয় - উহারা সমগ্রভাবে একটি গান। উহার প্রথমাংশে যে কথা বলা হইয়াছে, উত্তরাংশে হয় তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে,—নয়তো প্রথমাংশের উক্তিকেই স্পষ্টতর করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ ৮ ॥

ডাক্তার ভেরিয়র এল্‌উইন ছত্তিশগড়ী লোকসঙ্গীতের কয়েকটি রচনাগত বিশেষত্ব লক্ষ করিয়াছেন। উহার একটি হইল সাংকেতিকতা বা প্রতীকতা (symbolism), অপরটি হইল সাদৃশ্য (parallalism)। লোকসঙ্গীতের মধ্যে এই যে সাঙ্কেতিকতা ও সাদৃশ্যের ব্যবহার, ইহা কেবল ছত্তিশগড়ী লোকসঙ্গীতেরই বৈশিষ্ট্য নয়, ব্যাপকভাবে বিচার করিলে ইহা যে কোন ভারতীয় লোকসঙ্গীতেরই বৈশিষ্ট্য[১]।

লোক-সঙ্গীতের মধ্যে এই সাঙ্কেতিকতা ও সাদৃশ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায় প্রধানত নিসর্গ জগতের বিভিন্ন দিককে আশ্রয় করিয়া। নিসর্গ জগৎই আদিম মানুষের মনে প্রথম বিস্ময় জাগাইয়া তুলিয়াছিল,—তাই আজো নিসর্গ জগৎই মানুষের আনন্দ-বেদনার আশ্রয় হইয়া আছে। তাহার মনে দুঃখ জাগিলে সহজেই সে নিসর্গের মধ্যে উহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পারে,—তাহার আনন্দে নিসর্গ জগৎ মুখর হইয়া সাড়া দিয়া উঠে।

লোক-মানসে নিসর্গ-প্রীতি অসাধারণ। কিন্তু, সেই নিসর্গ-প্রীতির প্রকাশ মার্জিত সাহিত্যের মতো সূক্ষ্ম কারুকাজে ভরা নয়, গভীর অন্তর্দৃষ্টিও তাহাতে নাই। নিসর্গকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে দেখিয়া উহার স্থূল দিকটাকেই এমন কারু-মণ্ডিত করিয়া লোকসঙ্গীতে প্রকাশ করা হয় যে, দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতাকে এড়াইয়া সময়-সময় তাহাও নির্মল কাব্য-রসের আধার হইয়া উঠে।

এই সাঙ্কেকিকতা ও সাদৃশ্যমূলকতা লোকসঙ্গীতের মধ্যে হফম্যান লক্ষ করিয়াছেন। ডাব্লউ. জি. আর্চার (W. G. Archer) ইহা ওরাওঁ কবিতার মধ্যে দেখিয়াছেন। এল্‌উইন লক্ষ করিয়াছেন, ভারতীয় লোকসাহিত্যে

১ Verrior Elwin : Folk-songs of Chhattisgarh (1946), PP. L—Li, Introduction : "The Symbolism in the East is so much a part of life, so recognised and so easily understood that it naturally dominates its Poetry. This is not the case in Europe, those poets who have used symbolism to any considerable extent have been accused of obscurity." —Ibid, P.LV.

CENTRAL LIBRARY

মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের প্রতীকতার মাধ্যমে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই সাঙ্কেতিকতা চীনীয় সাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায়।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত সঙ্গীতগুলির মধ্যেও উপরের বিশেষত্বগুলি উদাহৃত হইয়াছে। নীচে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

ফুলো মইধ্যে মালতী ফুল রে বড়াই
সইন্ধ্যা হালে ফুটে;
শেষার শিতান কলাত্ নিয়া
'পিয়া-পিয়া' বলে,...সং ৪৩

এক স্বামীহীনা নারীর ব্যথা-কাহিনী এইখানে ব্যক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যা-মালতী ফুল যেমন সন্ধ্যা বেলায় ফোটে, স্বামীর জন্য নারীর ব্যথাও তেমনি রাত্রিবেলায় বিকশিত হইয়া উঠে। তখন উপাধানকেই বক্ষে ধারণ করিয়া সে তাহার স্বামীর সাধ মিটাইয়া থাকে।

নদীর বসন্ত কালে
ভাঙ্গিয়া পড়ে মাটি;
মাছের বসন্ত কালে
করে উজান-ভাটি।—সং ৬৯খ

নদীর বসন্ত কালে (অর্থাৎ বর্ষাকালে) যেমন সে উচ্ছল হইয়া উঠে, উহার পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে; মাছের যৌবনকালে যেমন সে উজান-ভাটি ভাসিয়া বেড়ায়, (তেমনি মানুষের যৌবন কালেও সে উন্মনা হইয়া উঠে)।

শাওণ মাসোতে মোর
বরষারে ভরথর—
হে জগদীশ্বর;
ঘর দিয়া জল পড়েছে
ঝরো-ঝর॥
...দেয়ার জলে চখুর জলে
ভিজেছে মোর আন্তর॥—সং ৮০

স্বামীর অনুপস্থিতির কথা এক সধবা নারী বর্ষা রাত্রিতে ভাঙ্গা ঘরে শুইয়া

CENTRAL LIBRARY

চিন্তা করিতেছে। বাহিরের বর্ষা ও অন্তরের বর্ষা এইখানে এক হইয়া গিয়াছে।

বনত্ কান্দে বন, সখী হে
পাথারত্ কান্দে ধেনু।
মোর বন্ধুয়াক ধরিয়া যাছে রে
খুড়িয়ার কাছারি ॥—সং ৮৫

সধবা নারীর স্বামীকে থানা হইতে দারোগা আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। সধবা নারীর সেই দুঃখে সমস্ত বন কাঁদিতেছে, পথের ধেনু কাঁদিতেছে।

আষাঢ়-শাওণ ভাই পড়িলে
ঢেপের ফুল ভাই ফুটিবে ;
চৈত-বৈশাখে পড়িলে
ফুল শুখিয়া যাবে।—সং ১১৫

'ঢেপে'র ফুল যেমন স্বল্পস্থায়ী, নারীর যৌবনও তেমনি স্বল্পস্থায়ী।

চৈতকে চাতকী পখী বলে 'পিয়া-পিয়া' ;
নৌতন ব'সে আড়ী হয়া—
এলাও যে মোর না জুড়ায় হিয়া ॥—সং ১২০

চৈত্র মাসে চাতক পাখীর কূজন সদ্য বিধবার মনে স্বামী-প্রেম জাগাইয়াছে।

আজি জলত্ কান্দে জলহুয়া
ডালত্ কান্দে টিয়া ;
আজি ঘর-যুবতী নারী কান্দে
খাট-পালঙে শুইয়া ॥—সং ১৯০গ

অবিবাহিত নারীর যৌবন-বেদনায় কীট-পতঙ্গ কাঁদিতেছে।

তিস্তা নদীর বান আসিয়া
ফুটাইল্ রে কাশিয়া।
সনার বন্ধু পিরিত করিয়া
দিয়া গেইল্ মোক জালা ॥—সং ১৯৩গ

CENTRAL LIBRARY

তিস্তার বন্যায় পলি পড়িয়া তিস্তা-চরে যেমন অজস্র কাশ ফুল ফোটায়, তেমনি প্রেমিক প্রেমের স্পর্শ দিয়া প্রেমিকার মনে প্রেমের ফুল ফোটাইয়াছে।

ও জোঙ্গল পোড়া যায় রে,—
শড়কে উড়ে ছাই ;
এ হোন সুন্দরী কইন্যার
নাই বাপো ভাই।—সং ৩২৫

দাবানলে গাছ পুড়িয়া যেমন ছাই হইয়া যায়, তেমনি রূপ-যৌবন থাকিতেও বিবাহ না হইবার জন্য কন্যার জীবন যেন ছাই হইয়া গিয়াছে।

তুই রে কোইলা কুল্‌কুলাছিত্‌,
বাঁশের ছায়া পায়া ;
মোর নারীটার মন ঝুরেছে
বুড়া ভাতার পায়া ॥—সং ২১৩

ছায়া-শীতল নীড়ে মনের আনন্দে কোকিল ডাকিতেছে। কোকিলের সেই আনন্দ নারীর জীবনের দুঃখকে স্পষ্ট করিয়াছে।

ভাদোরো-আশিনো মাসে
নয়া-দেওয়া ঘন বষ্‌রে,—
দোকোনা হালি' পড়ে পানি ॥—সং ২১৫

সতিনীর ঘরে বাপ-মা কন্যাকে বিবাহ দিয়াছে। ভাদ্রমাসে বৃষ্টির ফোঁটা যেমন কলার পাতাকে হেলাইয়া দিয়া ফোঁটায়-ফোঁটায় ঝরিয়া পড়ে, কন্যার দুঃখের অশ্রুও যেন তেমনি করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

তিস্তা নদীর ধাই-ধাই বালা,—
পদ্মর মা-বাপ কান্দে হালা রে হালা ॥—সং ২৪৯

তিস্তা-চরের ধু-ধু করা বালুকা প্রান্তর যেন সন্তান-হারা মাতা-পিতার শূন্য হৃদয়ের প্রতীক।

এ বাড়ী যাইতে, ও বাড়ী যাইতে
পন্থে শিম্‌-শিম্‌ পানি।
বরের ভিজিল্‌ ধুতি জামা
কইন্যার ভিজিল্‌ শাড়ী ॥—সং ২৮৪

সদ্য বিবাহিতা কন্যা শ্বশুর বাড়ী চলিয়াছে। পিতা-মাতার নিকট হইতে

CENTRAL LIBRARY

কন্যার বিচ্ছেদ যেন বৃষ্টির আকারে ঝরিয়া পড়িয়া বর ও কনের ধুতি ও শাড়ীকে ভিজাইয়া দিয়াছে।

বাড়ীর পাছ-পাখোত্
কাঁয় বা বাজাইল্ সুড়্-সুড়ি,
মনটা কইরে ছাতুছান্।
আউলাইল্ মোর সুতার খ্যাওখান্॥—সং ৩১৪

নিশুতি রাত্রিতে কন্যা একা ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছে। এমন সময় ঘরের পিছনে তাহার প্রেমিক শিস্ দিয়া তাহার মনকে উন্মনা করিয়া দিল। চরকার এলোমেলো সুতা তাহার উন্মনা মনকে দ্যোতিত করিতেছে।

শাল বনত্ কান্দেছে রে টিহা
মুই থাছো নিদারুণ হয়য়া।—সং ৩১৭, বামুনতির উদ্বেগ

বামুনতির পতির মৃত্যুতে শালবনের টিয়া পাখী কাঁদিতেছে।

আম মউলায়, জাম মউলায়
কাঁঠোলে ছাড়ে মুচি।
মুই নারীটা আছো ঘরে
মনত্ নাই মোর খুশি।—সং ৩১৮গ

নারীর জীবনের পূর্ণতা মাতৃত্বে। অবিবাহিতা নারী ফলবতী বৃক্ষকে দেখিয়া আপনার জীবনের অপূর্ণতাকে উপলব্ধি করিয়াছে।

টিটির কান্দে, পঙ্খী কান্দে
বালাতে পড়িয়া।
জোলপইগুড়ির মাহুত কান্দে
ঘর বাড়ী ছাড়িয়া।—সং ৩১৯

স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনাদিকে ছাড়িয়া মাহুত বিদেশে আসিয়াছে চাকুরি করিতে। তাহার অন্তরের ব্যথা পাখীর কান্নার দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

চরা কান্দে, চুরী কান্দে
কান্দে বালি হাঁস।
আজি জঙ্গলেরো হরিণী কান্দে
ছাড়িয়া মুখের ঘাস।—সং ৩৮৯

CENTRAL LIBRARY

অবিবাহিত নারীর যৌবন-বেদনায় অরণ্যের পশুপাখী কাঁদিতেছে।

আষাঢ়ো না শাবণো মাসে
জলতে শ্যাওয়ালি ভাসে, গে সই—
চল্ সজনী হামার দেশে॥—সং ৩৯৪

প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে পিতা-মাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বলিতেছে। বর্ষার জলস্রোতে শ্যাওলার ভাসিয়া যাওয়া যেন প্রেমিক-প্রেমিকার নিরুদ্দেশ যাত্রার সূচনা করিতেছে।

কাঁকোতে কলোসী নিয়া
জল ভরিমো যমনা যায়া।
কলোসী ভরিমো নয়নের জলে—সং ৪০৩

দুঃখের অশ্রু ও দরিয়ার জল এইখানে এক হইয়া গিয়াছে।

উপরে সঙ্কলিত উদাহরণগুলি লক্ষ করিলে দেখিব, মনের ভাবটিকে সেখানে নিসর্গ জগতের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিসর্গ জগৎ এখানে একটি সক্রিয় ভূমিকা নিয়া মানুষের আনন্দ-বেদনার সাথী হইয়াছে। মানুষের মনের সহিত নৈসর্গিক জগতের এই সাদৃশ্যকে কাব্যের উপাদান করিয়া তোলা লোকসঙ্গীতের এক বিশেষত্ব।

সাঙ্কেতিকতা বা প্রতীকতা লোকসঙ্গীতের অপর এক রচনাগত বৈশিষ্ট্য। একটি কথাকে সোজাসুজি না বলিয়া কেবল বিশিষ্ট ইঙ্গিত দিয়াই তাহাকে বর্ণনা করা হয়। এই রীতির দৃষ্টান্ত রূপে নিম্নের স্তবকগুলি দ্রষ্টব্য।

পাটা-বাড়ীত্ মোর শিয়াল কান্দে
কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে।
আজি কালা মুই এখেলায়॥—সং ২৪

সর্ব-সমক্ষে প্রেমিকা প্রেমিকের নাম উল্লেখ করিতে পারে না। তাই পাটের ক্ষেতে শিয়াল কাঁদিতেছে,—ইহার অর্থ হইল, প্রেমিক প্রেমিকার জন্য ঝুরিতেছে।

মরুচের গছগিলা খাগেরা-থুওরি
ফল বিস্তর ধরে।
হাত বাড়াইতে মরুচের গছ
হালিয়া-হেলিয়া পড়ে॥—সং ৪৬

ফলন্ত 'মরিচে'র গাছ এইখানে পূর্ণ যুবতী নারীকে নির্দেশ করিতেছে।

কোন্ বা দেওরায় অসিয়া গে
বিছাইল্ অঙ্গীল পাটি।...
চাইর মাস বরিষা গে
কাঙ্গে নাই মোর ছাতি॥—সং ৪৭, কথান্তর।

এইখানে দেবর-বউদির অবৈধ প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে। চার মাস বর্ষা কাল, অথচ ছাতা নাই,—ইহার অর্থ চারি মাস ধরিয়া স্বামী অনুপস্থিত।

বাবার ঘরের পারেয়া জড়া
হামশি' এগিনায় পড়ে।
মুঠি মুঠি সইষা ফেলেয়া দেওঁ
খায়া ভুল্কি মারে॥—সং ৪৯

শ্বশুরালয়ে অবস্থিত কন্যার মন পিত্রালয়ের প্রেমিকের জন্য কাঁদে। তাহার মন যেন পারাবত হইয়া এবাড়ী-ওবাড়ী যাওয়া-আসা করিতেছে। কন্যা সেই পারাবতকে সরিষা খাইতে দেয়, ইহার অর্থ—প্রাক্তন প্রেমিককে এখনও সে মন-প্রাণ অর্পণ করে।

পাটানীখান পড়েছে খসিয়া—
আইসেক রে হুদুমা-দেওয়া
তোর বাদে মুই আছোঁ রে বসিয়া॥—সং ৬০

বারি দেবতা 'হুদুমা' অসন্তুষ্ট হইলে বৃষ্টি দেন না। কল্পনা করা হয়, নারীদেহ ভোগ করিলে তিনি তুষ্ট হইবেন। গানে তাই দেখি, 'পাটানী' (জলপাইগুড়ির রাজবংশী মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ) খসিয়া পড়িতেছে,—অর্থাৎ ওগো হুদুমা, এইবার আসিয়া আমাদের দেহ ভোগ কর।

গাহাইন বলে সোলং-সোটং
নিত্যো ভুকাওঁ ধান।
ছাম বলে পাতিয়া থুইসুঁ
যেইঠে-সেইঠে হান॥—সং ৬১

উপরের ব্যাপারটাই এখানে অন্যভাবে বলা হইতেছে। 'গাহাইন' হইল উদুখলের মুষল, ইহা পুংলিঙ্গের প্রতীক। উদুখলের গর্ত হইল স্ত্রী-অঙ্গের প্রতীক। অর্থাৎ হুদুমার সঙ্গে যৌনলীলা চলিতেছে।

CENTRAL LIBRARY

৯৯ ও ১৩৮খ-সংখ্যক গান ও উহাদের টীকা দ্রষ্টব্য। এই দুইটি গানেও সাঙ্কেতিকতার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে।

চোপ রে চোপ্,
শিয়াল কান্দেছে ;
কালা কুত্তাটা দুয়ারে ভুকেছে ॥—সং-১৪৩ক

মা ছেলেকে চুপ করাইবার জন্য বলিতেছে, শিয়াল কাঁদিতেছে, কুকুর ডাকিতেছে অর্থাৎ নিকটেই বাঘ আসিয়াছে।

যেলা ডালিম মোর কোণ্ডা ধরে—
সেলা যাছুঁ মুই পরার ঘরে,...
আষাঢ়ো-শাওণ মাসে
বান-বরষা মোর চান্দে-চান্দে
ভাসে শেওয়াল মোর
আগম দরিয়ার মাঝে ॥—সং-১৬৭

প্রথম ঋতুমতী কন্যা বলিতেছে, তাহার ডালিমের এইবার কুঁড়ি ধরিয়াছে, অর্থাৎ স্তন পুষ্ট হইয়াছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নদীতে যেমন ঢল নামে, তেমনি প্রতি চাঁদে অর্থাৎ প্রতি মাসে তাহার দেহের নদীতেও ঢল নামে।

১৭০ক-সংখ্যক গানে স্তনকে বলা হইয়াছে 'জোড় জামুরি'। 'জামুরি' এক ধরণের বুনো লেবুকে বলা হয়। অপর একটি গানেও স্তনকে 'জোড় কমলা' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

ছাগল বান্ধিবা' যাছিস মাই তুই
ছাগলের দুইটা শিং ;
নেভির হেঁটত্ দেখ দি মাই তোর
কতোখানি নিন ॥—সং-১৭২

ছাগলের 'শিং' এখানে পুংলিঙ্গের প্রতীক, অপর পঙক্তিতে স্ত্রীলোকের কথা বলা হইয়াছে।

আর বাট্টায় আছে মাই তোর পানগুয়া,
কাঁয় বা খাবে মাই তোর পানগুয়া।
এখেলায় থাকিয়া নবো
ছোবা খুঁটাটা ॥—সং-১৮৬

CENTRAL LIBRARY

প্রেমিক-পুরুষ কন্যাকে বলিতেছে, তোমার বাটার পান কেহ না খাইলে তাহা শুকাইয়া যাইবে। অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে তোমার সঙ্গী না আসিলে যৌবন একদিন ঝরিয়া যাইবে।

ওরে ধান ভুকায় হাইড়ানী মাগী
বগোরি গাছের তলে রে।
তোতারাম পাক পাড়েছে
বগোরি খাবার আশে ॥—সং ২৪৮

কুল গাছের তলায় একটি মেয়ে ধান ভানিতেছে, তোতারাম নামীয় জনৈক পুরুষ কুল খাইবার জন্য ঘুরিতেছে। অর্থাৎ তোতারাম সেই মেয়েটির দেহ ভোগ করিতে চায়।

২৬১ক-সংখ্যক গানে, বিবাহকালে এয়োগণ কন্যাকে বলিতেছে, তোমার নদীতে কাপড় কাচিতে দিবে কি, তোমার নদীতে মাছ ধরিবার জন্য 'ছিপ' ফেলিতে দিবে কি? এই নদী স্ত্রী-অঙ্গের এবং 'ছিপ' পুরুষ অঙ্গের প্রতীক।

খেসেরি কালাই, মা মোর মুসুরি কালাই,
মা মোর মরুচ ঝুম্-ঝুম্ ফলে ;…সং-২৭৩

বিবাহ কালে কন্যার জবানীতে এয়োগণ কন্যার মা-কে উদ্দেশ করিয়া করিয়া কহিতেছে, আমার দেহের জমিতে 'খেসারি কলাই', 'মুসুরি কলাই' ও 'মরিচ' ফলিয়াছে। অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে কন্যার সন্তানবতী হইবার বাসনার কথা বলা হইয়াছে।

আজি লাল টিয়ার গছত্ ডে
শালটিয়ার ভাসা রে সই।
ও ডালিমের গছত্ ঘুগুর ভাসা—
আজি কার হাতে জোগামো
বন্ধুর গুয়া ॥—সং-৩১০

লালটিয়ার গাছে শালটিয়ার বাসা ইহার অর্থ একজনের বিবাহিত স্ত্রীর মনে অপর একজনের প্রতি ভালোবাসা।

উপরের উদাহরণগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কখনোই বক্তব্য বিষয়কে সোজাসুজি ভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। প্রেম,

বিবাহ এবং যৌন প্রসঙ্গে সাধারণত সকলেই লজ্জা অনুভব করিয়া থাকে। এই জন্য এই সকল ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

॥ ৯ ॥

নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের চারিদিকে ছড়াইয়া থাকা বিষয়কে উপমান বা উপমেয় করিবার প্রবণতা লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ ভাবেই লক্ষ করা যায়। ইহারই ফলে লোক-সঙ্গীতের উপমা-অলঙ্কারগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া সহজেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের মধ্যে উপমার এই বৈশিষ্ট্য ডাক্তার ভেরিয়র এলুউইন, ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সুধী জনেরা লক্ষ করিয়াছেন। লোক-সঙ্গীতের মধ্যে যে সকল উপমান ও উপমেয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা চিরা-চরিত বা সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে আহৃত নহে। তাবৎ মধ্যযুগীয় ভারতীয় বা বাঙলা সাহিত্যে দেখা গিয়াছে, উপমার ক্ষেত্রে কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন। লোক-সঙ্গীতে ইহার উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। লোক-সঙ্গীতে উপমার এই স্বাধীনতা লক্ষ ডাক্তার দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন,

"...the folk-tales and folk-songs of India have managed to a certain extent to break with this old tradition."[১]

অবশ্য বাঙলা লোক-গীতিতে সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা অলঙ্কারের পুনরাবৃত্তি যে একেবারেই নাই, এমন কথাও দীনেশ চন্দ্র বলেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা ছাড়াও চিরাচরিত কতোগুলি উপমাও বাঙলা লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহাও তিনি বলিয়াছেন।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ হইতে আমাদের সংগৃহীত গানগুলির উপমা লোক-সঙ্গীত-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই উপমাগুলি জীবন ও জগতের তুচ্ছ-মহৎ সকল বিষয় লইয়াই রচিত হইয়াছে। ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। এমন সকল বিষয়কে উপমান বা উপমেয় করা হইয়াছে, মার্জিত সাহিত্যে যাহা কল্পনাও করা চলে না। সংস্কৃত সাহিত্য বা মার্জিত সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া

১ .. Folk Literature of Bengal (1920)

CENTRAL LIBRARY

দিই, বাঙলা বা ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের উপমাগুলির সহিতও ইহাদের বড়ো একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যাইবে না। নীচে তাহার দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইল।

দাদা, সেই যে কহছুঁ তোক—
নলডং-নাকা ছুলুয়াটা
আনিয়া দে গে মোক॥
মাগী মুলাইটার নাখা
দেহাটা ঠস্-ঠস্।
মুগী কুশিয়ারের নাখা
চিপিয়া খালেক অস॥—সং-৮

ভগ্নী তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহার জন্য বর আনিয়া দিবার কথা বলিতেছে। বরের রূপ কেমন—'লণ্ঠন-মার্কা' (নলডং নাকা) অর্থাৎ সুন্দর। মাঘ মাসের রাঙা মুলার মতো তাহার দেহটি টস্‌টস্। এবং মানুষ যেমন আখ চিবাইয়া উহার সকল রস নিঙড়াইয়া নেয়, ছেলেটিও যেন তাহার রূপ দিয়া কন্যার মনকে নিঙড়াইয়া লইয়াছে।

স্বগ্‌গে যদি চন্দ্র নাই বড়াই
কি করিবে তারা।
যে নারীরো পুরুষো নাই
দিনে অন্ধিহারা॥—সং-৪৩

চন্দ্রহীন আকাশে তারার আলো যেমন অন্ধকারের মতোই, পুরুষহীন নারীর জীবনও তেমনি। উপমাটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের একটি প্রিয় উপমা, বহু গানেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ও মাইয়া পুষাই রে না যায়;
সোনার মত চল্ চল্ মাইয়া
ছাড়িয়া দিবা' না মনায়॥—সং-৬৯গ

'সোনা'-র সহিত কন্যাকে উপমিত করিবার প্রবণতা ভারতীয় প্রেমসঙ্গীতে

মোটেই অপরিচিত নয় ; কিন্তু, 'সোনার মত চল্ চল্ মাইয়ার' মধ্যে বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

ভাবে রে পথি বসিয়া
চিনিলে জা'গার নোকলাক—
সোগায় মিলি' ঠেলি' দিলেক
কাঁকড়ের গাইহাত্ ॥—সং-৯৭

মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া পথি নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রামের সকলে যুক্তি করিয়া জেলে পাঠাইয়াছিল। পথির এই জেলে যাওয়াতে কবি বলিয়াছেন, সবাই মিলিয়া তাহাকে যেন কাঁকড়ার গর্তে ঢুকাইয়া দিল।

কালা মেঘা নাগিল্ যায়া গে
ওগে আরো,
আভা মেঘার গায় ;
চায়া দেখ্ ভাই আকাশ পাথে
ক্যামন শভা হায় রে হায় ॥—সং-১২২

নাতির বউ ঠাকুরমার নিকটনিজের রূপের ব্যাখ্যান করিতেছে। কালো মেঘের গায়ে রাঙা মেঘ যেমন অপূর্ব শোভা ধারণ করে, তেমনি ঠাকুরমার কালো নাতির পার্শ্বে রাঙা নাত-বউ শোভা পাইয়াছে।

আই, মুই পাকা সন্তরা :
চেঙ্গেড়াগিলা পাতিল্ হাত,—
মুই নারীটা হয়ঁ গে আই
ভাং-চরার পসাত ॥—সং-১২৫

মায়ের নিকট মেয়ে তাহার রূপের বর্ণনা করিতেছে। সে বলে, সে যেন 'ভাংচরা' ঠাকুরের (জলপাইগুড়ি জেলায় অন্তঃপাতী ধুপগুড়ি থানার গ্রাম-দেবতার এই নাম) প্রসাদ,—কমলালেবু (সন্তরা)। ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণের

CENTRAL LIBRARY

সময় সবাই যেমন হাত বাড়াইয়া প্রসাদ চায়, কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পাড়ার যুবকেরা ঠিক তেমনি ভাবেই হাত বাড়াইয়া তাহাকে প্রার্থনা করিতেছে।

আজি পাথরের নাথান মুই
ডুবিয়া যাছুঁ গে হে,
আই, মুই শলার নাথান ভাসেছুঁ।
মুই নারীটা উঠু-ডুবু করেছুঁ ॥—সং ১২৮খ

বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলেও কন্যার বিবাহ হইতেছে না। আশা-নৈরাশ্যের সংশয় দোলায় সে আন্দোলিত হইতেছে,—পাথরের মতো' একবার সে ডুবিয়া যায়, শোলার মতো আবার ভাসিয়া উঠে।

একদিন, দুইদিন, দাদা, চলি' যাছে রে—
পারোর মতন হোকর মনটা
সোদায় বাকুরে ॥…সং-১৩০

উপযুক্ত বয়সে পুরুষের বিবাহ হয় নাই। এই ব্যথা সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জানাইবার জন্য বলিতেছে, পারাবতের মনে গভীর প্রেম জাগিলে তাহারা যেমন বকম্-বকম্ করে, পুরুষের মনটাও তেমনি করিতেছে।

১৩৮-সংখ্যক গানে কন্যার যৌবন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে : 'তোম্হার যৌবন দেখি মজালি কুমুড়া'। কুমড়া যেরূপ পুষ্ট, কন্যার যৌবনও তেমনি। উপমাটিতে বিশেষত্ব আছে।

১৩৯-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, চাঁদের কোলে তারা থাকিলে রাত্রির সৌন্দর্য যেরূপ বৃদ্ধি পায়, নারীর পার্শ্বে পুরুষ থাকিলেও সেইরূপ দেখায়।

১৮১-সংখ্যক গানে কয়েকটি উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। বানবর্ষা যেমন নদীর শোভা, দীঘির শোভা তেমনি ফুল। ইহাতে বিশেষত্ব তেমন কিছু নাই। কিন্তু, এই গানেরই শেষ স্তবকে উপমা পাই :

পান্তা ভাতত্ শিদল-শানা
যেমন সোয়াদ নাগে।
বিয়াও যদি চাইস করিবা'
চেঙ্গড়ী ওইনং নাগে ॥—সং ১৮১

শুকনা মাছ গুঁড়া করিয়া, দলা বাঁধিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। পান্তা ভাতের সহিত তাহা খাইতে নাকি ভালো লাগে। বউ কেমন হইবে, সে

CENTRAL LIBRARY

প্রসঙ্গে বলা হইতেছে, পান্তা ভাতের সহিত 'শিদল' খাইতে যেমন ভালো লাগে, তেমন কন্যা চাই।

১৮৫খ-সংখ্যক গানে দেখা যায়, কন্যার দেহের সুবাসকে ভোগধানের সহিত উপমিত করা হইয়াছে : 'ভোগধান-ভোগধান মাই গে বাসায় গা'।

চেঙ্‌ড়ীর হাসি রে ওরে জীবন
ভাত-আন্ধা গুণের নাখা
দেয় দেওয়ার চিল্‌কন॥—সং ১৮৫গ

বিদ্যুতের সহিত হাসির উপমা অপরিচিত নয়। কিন্তু, লোক-কবি আকাশের বিদ্যুৎ অপেক্ষা 'ভাত-আন্ধা' আগুনকেই বেশি চিনেন।

তোর পিরিতির এমনি রে হানা
ভাসিহু মুই সাগরের ফেনা ;—সং ১৮৭খ

প্রেম প্রেমিককে ঘর-ছাড়া বিবাগী করিয়াছে। সাগরের ফেনা যেমন জলস্রোতে ভাসিয়া চলে, সে-ও তেমনি প্রেমস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

দোলা মাটির কেলা দইয়ল রে
হল্‌কল্‌ হল্‌কল্‌ করে।
আজি গুইনং নারীর যৈবন রে
দিনে দিনে বাড়ে॥—সং ১৯০খ

জলা জমিতে যেমন কলাগাছ দিন-দিন বাড়িয়া উঠে, তেমনি নারীর যৌবন প্রতিদিন বাড়িতেছে। যৌবনের ইঙ্গিতবাহী এ উপমার বিশেষত্ব লক্ষ করা দরকার।

সরিষার ফুল রে বাপোই
মাটির শোভা ;
মোর নারীটার ঢালুয়া রে খোঁপা॥—সং ১৯৪

সরিষার ফুল যেমন জমির শোভা, তেমনি বিস্তৃত খোঁপা নারী দেহের শোভা বর্ধন করিয়াছে।

দুয়ারের আগে মানায় খোপ
নালে য্যামন ধরে ;
তুই বন্ধু মোক ছাড়িয়া গেলে
মন সেইমন্ করে॥—সং ২০৪

CENTRAL LIBRARY

বাড়ীর সম্মুখে মান কচুর 'থোপ' থাকিলে যেমন তাহা বাড়ীর শোভা বাড়ায়, আমার পাশে তুমি থাকিয়া তেমনি আমার শোভা বাড়াও।

২১১-সংখ্যক গানে কয়েকটি উপমা আছে। ইহাতে স্বামীর উক্তিকে পারাবতের প্রেমের সহিত, শাশুড়ীর উক্তিকে 'ইচিলা মাছের চট্‌কা'-র সহিত, সতিনীর উক্তিকে শিঙ্গি মাছের কাঁটার সহিত এবং ননদিনীর উক্তিকে ট্যাংরা মাছের কামড়ের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই।

আই, মোর জিউটি না হয় গুয়া-পান
কাটিয়া মুই তোক দেখা'ম ;—সং ২১৩ক

আমার মনের ব্যথা কেমন করিয়া জানাইব, তাহা তো সুপারি নয় যে তাহা কাটিয়া দেখাইয়া দিব।

হালুয়া-বাড়ীর দুবাকেনা
নদীর বৈরী ফেনা।
দুই সতোনী বৈরী য্যামন
আড়ীর বৈরী ঢেনা ॥—সং ২১৮

ধানের ক্ষেতের শত্রু হইল—আগাছা ; নদীর শত্রু ফেনা ; দুই সতিনী পরস্পরের শত্রু ; তেমনি বিধবার শত্রু হইল বিপত্নীক বা অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত পুরুষ।

২১৯-সংখ্যক গানে দেখা যায়, নিজের দুর্ভাগ্যকে শুকনা জমির সহিত উপমিত করা হইতেছে : 'হামার কপালে ভাঙ্গা, নদী ভাঙ্গা রে হায়'। ৩৫৩-সংখ্যক গানেও এই উপমাটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

২২৩-সংখ্যক গানে প্রেমের অন্তঃস্থিত অপার শান্তিকে এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :

বটোবৃক্ষের ছায়া য্যামন রে
মোর বন্ধুয়ার ময়হা ত্যামন রে ;—সং ২২৩

৩৫২-সংখ্যক গানেও প্রেমিকা প্রেমিককে বলিয়াছে, 'তুই হোলো মোর শান্তির গাছ।'

একটি গানে প্রেমিকা নিজেকে 'কাকা মেঘ'-এর সহিত তুলনা করিতেছে (সং ২৩৪)। মেঘের বুকে বিদ্যুৎ হানিয়া যেমন মেঘকে চিরিয়া দেয়,

প্রেমিকও তেমনি প্রেমিকার বুকে প্রেম জাগাইয়া তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে।

অপর একটি গানে প্রেমিক প্রেমিকাকে বলিতেছে, বিচ্ছেদ ঘটিলেই প্রেম শেষ হইয়া যায় না,—জলের নীচে থাকিলেও যেমন পাথর সহজে পচিয়া যায় না: 'পানির তলে পোষাণ না হয়, পিরিতি নাকুন পচে' (সং ২৩৬)।

কইন্যা রে, যে মাচাতে নাইরো ধান
না ধরে ইন্দুর।
যে নারীরো নাই সোয়ামী
না শোভায় সেন্দুর॥
কইন্যা রে, যে ভাসাতে নাইরো কৈতর
কি করিবে তার খোপে।
যে নারীরো নাই সোয়ামী
কি করিবে তার উপে॥—সং ২৪৩

এ উপমার ব্যাখ্যা না করিলেও চলিবে।

২৬৮-সংখ্যক গানে, বিবাহ-বাসরে এয়োগণ বরের নিন্দা করিয়া বলিতেছে,—তাহার কালো পিঠটা যেন ধোপার পাটের মতো, তাহাতে কাপড় কাচা চলে।

বর বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। বধূসহ তাহাকে বরণ করিবার সময়, বরের গৃহের এয়োগণ ব্রীড়াসঙ্কুচিতা নববধূকে লক্ষ করিয়া বরকে কহিতেছে: 'কার ঘরের খোকের পায়রা চুরি করিয়া আনিলো' (সং ২৮৫)।

৩২৮-সংখ্যক গানে একটি 'টুঁটি সরু' ও পেট মোটা ছেলের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সে যেন তামাক ক্ষেতের 'নজর-কাটা' (Scare crow)। ৩২৯-সংখ্যক গানে স্ত্রীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী বলিতেছে, তাহার স্ত্রী দেখিতে খাটো,—ঠিক যেন চৌকির পায়া। স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রীকে মানায় নাই, তাই বলা হইয়াছে,—'শাগে ভাতে নাই মিল নাই'। শাক ও ভাতের মিলনের উপমা ৩৫২-সংখ্যক গানেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩৩৭-সংখ্যক গানে দজ্জাল

ভাদ্রবধূর কণ্ঠস্বরকে ভাশুর পশ্চিমা ঝড়ের সহিত উপমিত করিয়াছে : 'যেনং তমার মুখের আও, ধাই-ধাই পছিয়ার বাও।'

মনে বড়য় দুখ সখী রে
চিতে বড়য় দুখ।
ওরে, নদীরো খাদিনার মত
ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক ॥—সং ৩৫০ক

গভীর দুঃখে নদীর পাড়ের মতো বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উপমাটির অন্তঃস্থিত চিত্রখানি সুন্দর, বিশেষত্বও আছে। ইহা প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের একটি প্রিয় উপমা, বহু গানে ইহা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

৩৫১-সংখ্যক গানে দেখা যায়, নায়ক অন্যায় করিয়া নায়িকার মুখ বন্ধ করিবার জন্য একটি আংটি উপহার হিসাবে দিয়াছিল। ফলে এই অন্যায়ের কথা নায়িকা সহজে কাহারও নিকট বলিতে পারিতেছিল না। নায়িকার তৎকালীন উক্তি : 'আঙঠি হইল্ মোর বোল্লার টোপ, লিয়া পান্থ লাজ'। অর্থাৎ মাছকে যেমন আহার দিয়া বড়শীতে গাঁথা হয়, তাহাকে যেন সেইরূপ করা হইয়াছে।

যেমন নদীর জলে সগায় করে চান
মাইয়া নোক হামা নদীর সামান ॥—৩৫২

অর্থাৎ নদী যেমন সকলের, মেয়েরাও তেমনি।

নদীর চিকণ বান-বরিষা রে হে
বালার চিকণ বাও।
নারীর চিকণ পরো পুরুষ
ছাইলার চিকণ মাও ॥— সং ৩৫৬

নদীর শোভা যেমন ঢল, বালুকার শোভা যেমন বাতাস, তেমনি নারীর শোভা 'পর-পুরুষ' এবং পুত্রের শোভা তাহার মা। অর্থাৎ মাতার শোভা পুত্র।

আঁঠিয়া কেলাক কেলায় না কও
বিচি ঘস্ ঘস্ করে।
পর-পুরুষক পুরুষে না কও
হিয়া জর-জর করে ॥— সং ৩৬৩

বিচিওয়ালা কলা যেমন নামেই কলা মাত্র, অথচ কলার স্বাদ তাহাতে পুরাপুরি নাই,—পর-পুরুষও তেমনি খাঁটি প্রেমিক নয়,—সে প্রেমের তৃষ্ণা জাগায় কিন্তু তৃপ্তি দেয় না।

দুয়ারের আগত্ ঘ্যাটের‍া ঘাস
বল্‌দে না খায়, ঘিনে।
আলোয়া চাউলের ঘ্যাটের‍া ভাত
চেঙ্গেড়ী মাইয়ার গুণে ॥— সং ৩৮৭

বাড়ীর দরজার গোড়ায় হওয়া ঘাস বলদেও খায় না। তেমনি আতপ চাউলের বেশি সিদ্ধ হইয়া যাওয়া ভাতও কেহ খাইতে চায় না। তবে, যুবতী মেয়ে রাঁধিলে তাহাও খাওয়া যায়।

৩৯৩-সংখ্যক গানের উপমাগুলি অবশ্য বাঙলা লোক-সঙ্গীতে অপরিচিত নয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, বক ধলা, দুধ ধলা, তাহার চেয়েও ধলা কন্যার হাতের শাঁখা। চন্দ্র রাঙা, সূর্য রাঙা, ডালিমের ফুল রাঙা, কিন্তু তাহার চেয়েও রাঙা কন্যার সিঁথির সিঁদুর।

গয়ুর ঘ্যাটা বিষম ঘ্যাটা
জানে আমার অন্তরে।
শিমুল গাছের কাঁটার নাখান
পাটাউ-পাটাউ করে ॥ -সং ৩৯৮

গৌরের প্রেম অন্তরে শেলের মতো বিঁধে। ঠিক যেন শিমুল গাছের কাঁটা ফোটে।

যেইমন্ সাদা কাপড়ত্
দাগো ভরে,—
ওইমন্ পুরুষের মন নড়ে।—সং ৪০০ক

সাদা কাপড়ে যেমন সহজেই দাগ ভরে, পুরুষের মনও তেমনি সহজেই পরিবর্তিত হয়। উপমাটি খুব কিছু নতুন নয়।

CENTRAL LIBRARY

॥ ১০ ॥

প্রত্যেক দেশের কবিতার নিজস্ব একটি ভাষা আছে, দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার ভাষা বা লেখা গদ্য হইতে যাহা খানিকটা পৃথক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব সাহিত্য ধারার মধ্যেও এই ব্যাপার লক্ষিত হইয়া থাকে। আলোচ্য উপভাষাতে রচিত গানগুলির ভাষার মধ্যেও এমন একটা বিশেষত্ব মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ কথাবার্তার ভাষা হইতে পৃথক। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

১. বাক্যমধ্যে পাদপূরণের জন্য অথবা সুরের জন্য গে, রে, না, সে, হে, হো, এনা, এ, বা, কিবা, মোর, তোর, আজি, ওই, ওকি, ওকি গে, ওকি ওই, হায়, হায়-হায়, কি ওহোরে, ওকি ও মরি রে, ও মরি রে, হোকোর, ভালা, এ্যাখেতে প্রভৃতির অব্যয়রূপে ব্যাপক ব্যবহার। মধ্যযুগীয় বাঙলা গানে 'ওকি' এবং 'হোরে' পাওয়া যায়। যেমন, জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে' (বঙ্গবাসী সং ১৩০৮): 'অকি হো রে গৌরাঙ্গ জয় জয়।'

২. বিশিষ্ট বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহার: আগম-দরিয়া। উহুঁ-ডুবু করে বান্দা। হীরামন বাঁশী। নলডং-নাকা ছুলুয়া। খঁপা-নাসী। নিধুয়া-পাথার। অসের দেওরা। নালো-কামলা (সুন্দর ঘরামী)। শীতলকাটী মন্দির-ঘর। জোড়-বাঙ্গেলা। ঝিন্-ঝিন্ ঝান্-ঝান্ (ভালোমন্দ)। মনের পৈরপে। দুই নয়ানের জল। অন্ধিহারা। মুই নারীটা ওভাগোনী। কোলার মাইয়া। শিরের সোয়ামী। ইছল-পিছল মাটি। সরু (সুন্দর অর্থে)। চিকন (শোভা, সৌন্দর্য অর্থে)। নিদয়া। বাউদিয়া। ইমিকি-ঝিমিকি পানি। অন্-জল (আয়ু)। বসন্তকাল। যৌবনকাল। উজানি-বাহার। নিদারুণ হয়া। দিয়া যাব দারুণ শোক। দারুণো বিধি। বিধির ঘটনা। অসের গালা (সুন্দর কণ্ঠস্বর)। অঞ্জনী (রজনী)। চিতে ভাও না মানা। হাউসের বাজার। হাউসের দিন। অঙ্গের খেলা। কারুণা করা। গা জুড়ানো। মৈলান (মলিন)। কটুর হিয়া। মন ঝুরা। মন উথলি উঠা। মোর নারীটার ঘাটে। বৈদাশে (বিদেশে)। আধোকেনা আতি। হেলিবে-পেলিবে। জোড়ে-জোড়ে। সারি গে সারি। একাশোর। কাল জিউ। বইনি কান্দে সুয়া। সুয়া। বৈবন। দুই যৌবন (স্তনদ্বয়)। মন বান্ধিয়া অহা। সনার আলন। সনার বৈবন। পুবাল বাতাস।

CENTRAL LIBRARY

পছিয়া বাও। মলেয়ার ঝড়। নিরাশীর বাপ। চিতুল ব'স। নিদানো কাল। চাতুরী (চতুরা)। অবোলার বালি। সরুশাংকা। কাকামেঘ। কাকাসনা। ছিরি আংটি। দেওয়া বষ্‌ষে মধুর রসে। একলা ঘরের নারী। আন্ধা রাত্তি। কাংখের কলস। নিদারুণ কাথা। কাজিলী আম। গুণের মাইরন। গুণের বেহাই। জোড়-মাড়েয়া। ছিরি-মণ্ডপ। সরু-আলি কদম। বিজুর বন (বিজন বন)। কারণা অঙ্গ। ছুলপ নাম। আলন (আগুন)। আলন্দিত মন। মাঞ্জন-ঘষণ। আগর নয়ন। অখুটা শিমিলার নাও। তুই যৈবন হালিয়া পড়া। সুধনা অসিক। ভাবের বন্ধুয়া। লালটিন্ মার্কা কইনা। চিক্কণ কালা। নৌতন চেঙ্গেড়ী। নয়া নদারী। মন ছতোকার। চিতে ক্ষেমা দেওয়া। ধুলিয়া আগুনের পোড়। মলেয়া বসন্তের বাও। তাপিস পরাণ। আঞ্চলের গুয়া। হরিষমন। আগুনি পাটের শাড়ী। সনার নও বুড়ি কড়ি। শিশু-বালক কইনা। শিশুয়া বইনি। পাক্ক কড়ি। ভাব-অঙ্গিয়া। সোদায়-সোনায়। কাজল-ভমরা। হাড়িয়া কোণ। আধাই বুড়ী। ঝুম্‌কা নাড়ু। ইত্যাদি।

৩. বিশিষ্ট নদী-বাচক শব্দ ও স্থানের নামের ব্যবহার: আগম-দরিয়া। নিধুয়া-পাথার। চড়ক-ডাঙ্গি। গোদাল ঘাট। উজানিয়ার হাট। হিরাল নদী। নিধুয়া ডাঙ্গা। কাজল কাটা মন্দির-ঘর। শীতল কাটা মন্দির-ঘর। জোড় মন্দির-ঘর। জোড়-বাঙ্গেলা। ছিরি কবিলাস (কৈলাস)। ছিরি মণ্ডপ। মক্ক (মর্ত্য)। শ্রীকইলার হাট। নেলিয়ার কান্দর। ছিরন নদী। কুরুম নদী। ইহা ছাড়া, তিস্তা ও তোরসা নদীর অসক্কৎ উল্লেখ মিলে।

৪. বিশিষ্ট তরু-লতা ও ফুল-ফলের নামের ব্যবহার: কাঁচা শাকের ডুগডুগ কুশি। কাতিশালি ধান। সরুকদম গাছ। বাঁশের পিতারি। শেওয়াল (শ্যাওল)। শাল্মলি-শিমিলার গাছ। বটোবৃক্ষ। জোড়-শিমিলার গাছ। হেকেরা ডালিমের গাছো। পাখুড়ি। ইহা ছাড়া, মান কচুর নাম বহু গানে পাওয়া যায়।

৫. বিশিষ্ট ইতর প্রাণীর নামের ব্যবহার: তোতা। ময়না। চকোয়া-শারালি। সুয়া। টিহা। শিয়ালো। ভোটা (কুকুর)। কুহলি। কোকিলা। দইয়ল। হরোণী। মিরিংগি। কোড়া। কুড়ী। কুড়ুলা।

CENTRAL LIBRARY

জল-হুয়া। বগুলা। শ্বেত কাউয়া। চিঠির। চন্দন-কুরুসা। চান্দা-চপরা (মাছ)।

৬. চলিত কতকগুলি পদের কাব্যিক বিকৃতি: ওভাগোনী (অভাগিনী)। স্তাও (সেই)। তিড়পিতে (তড়পাইতে, ডিঙ্গাইতে)। শাংকা (শাঁখা)। নয়ান (নয়ন)। বিধতা (বিধাতা)। অঞ্জনী (রজনী)। নেফুর (নূপুর)। লদীয়া (নদী)। ঝাম্পো (ঝাঁপ)। ময়হা (মায়া)। পিরতি। পাংখা। পাংখী। আংখি। পালঙখী। নিরল (নিরালা)। এ হোন (এ হেন)। কাখালি (কাঁখ)। তাঁতীয়া। শাড়ীয়া। মুঠিয়া। ঝোনি (যেন)। নাম্বে (নামে)। ছত্রেকধর (ছত্রধর)। চিরংকাল। আনাদিন (অন্যদিন)। আঞ্চল (আঁচল)। নেউকা (নৌকা)। শয়ন (শয়ন)। উজালা (উজ্জ্বল)। কলোসা (কলসী)। দয়েমযে। খাঁচারি (খাঁচা)। পিতারি (পাতা)।

৭. হিন্দী শব্দের ব্যবহার: মনমেরা। চিতো মেরা। থোড়া কেইসা। জিউ। দোসা সাধি (দ্বিতীয় বিবাহ)। নিকাল। ছাপানো (লুকানো)। বাতানো।

৮. কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গের কাব্যিক ব্যবহার: গোড়, কোল, বদল, ভিড়ি', দাত্তি, আড়া, ব্যাল, কারণ, প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার।

কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার, কর্মকারকে একই সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের উত্তর 'ক'-এর ব্যবহার, বস্তুবাচক নির্দেশক সর্বনামের শেষে 'ক'-এর ব্যবহার, করণ কারকে 'য়ে'র ব্যবহার, ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া-চতুর্থীর 'ক'-এর প্রয়োগ, ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'এ' এবং অনাবশ্যক 'র'-এর যোগ প্রভৃতি কাব্যিক ভাষার বিশেষত্ব।

৯. বিশিষ্ট ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈতের ব্যবহার।

১০. কয়েকটি বিশিষ্ট সংখ্যাবাচক বিশেষণের ব্যবহার: পাঞ্চ ডাল। পাঞ্চ তিরি পাতা। সনার নও বুড়ি কড়ি, ইত্যাদি।

১১. বিশিষ্ট কতকগুলি সম্বোধন ও কাব্যিক গালাগালির ব্যবহার: বাবুরী-ছাটা। সিঁতা-পাড়া। দোশি-ঝুলা। ধুতি ঝুলা। শিকই ঢেলী। ছাই-পড়ী। ভাতার-খুয়াতী। পানিয়ামড়া। জরমঠেঙ্গুয়া। বখত্তা। আছিদ্দর।

CENTRAL LIBRARY

জোহিলা-পড়া। দো-ভাতারীর বেটী, বেটা। জলভোদা। বাঙ্গীয়াড়ের বেটা, বেটী।

১২. বিশিষ্ট অর্থে বিশেষ কয়েকটি শব্দের ব্যবহার: 'সব' ও 'কত' অর্থে 'যতো': যতো মান্‌ষিক গোটো করিল্‌। সারি-সারি হাট বেসাইতে যায় যতো নারী। কেমন অর্থে 'য্যামন': এখেলা বিছিনায় থাকিয়া মন য্যামন করে।

১৩. প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরকে বিচিত্র নাম ধরিয়া সম্বোধন: প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমিককে সম্বোধন: বাপোই, চেঙ্গেড়া, গাবুরা, ভাবের বন্ধু, বন্ধুয়া, বান্ধব, পোরাণের নাথো, প্রাণোপতি, পতিধন, সোয়ামী, মন, বন্ধুধন, গুণের বন্ধুয়া, বাউদিয়া, বাউধিয়া, সনার বন্ধু, কবিরাজ, হালুয়া (স্বামী অর্থে), কালা, চিকণকালা, প্রাণো কালা, ধন কানাইয়া, শ্যামকালা, প্রাণের সুয়া, সনা-বান্দা ভাইয়, অসের ঢেনা।

প্রেমিকের জাতি ও পেশা লইয়া সম্বোধনের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। 'পছিমা বন্ধুয়া' বা 'পছিয়া' সম্বোধন বহু গানেই মিলে। পেশার মধ্যে পাইকার, বানিয়া, সিপাই, প্রাণ-সাধু প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তেমনি প্রেমিককে 'ভাই' রূপে এবং 'আপনি' করিয়া সম্বোধনও লক্ষ করিবার মতো।

অপরপক্ষে, প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকাকে সম্বোধনের মধ্যে বৈচিত্র্য তেমন নাই। 'মাই', 'চেঙ্গেড়ী', 'কইন্সা (কইনা)', এই তিনটিই প্রধান সম্বোধন। গার্হস্থ্যজীবনের প্রেমের গানগুলিতে প্রেমিকা অনেক সময় 'শালী' রূপে সম্বোধিতা হইয়াছে। কচিৎ 'সুন্দরী', 'ময়না' ইত্যাদির সম্বোধনও মিলে। প্রেমিকার দেখাদেখি প্রেমিকও মাঝে মাঝে প্রেমিকাকে 'ভাই' রূপে সম্বোধন করিয়াছে এবং প্রেমিকাও স্থানে-স্থানে 'আপনি' রূপে সম্বোধিতা হইয়াছে॥

CENTRAL LIBRARY

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত

দ্বিতীয় খণ্ড : সংগ্রহ

॥ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ॥

। দ্বিতীয় খণ্ড : সংগ্রহ ।

প্রথম অধ্যায়

॥ বন্দনা ॥

। ১ ।

পূর্ব্বে না[১] বন্দিয়া গায়োঁ[২] ধর্ম্ম নিরাঞ্জন ;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ ধর্ম্ম নিরাঞ্জন ॥
উত্তরে বন্দিয়া গায়োঁ গইন্সাৎ[৩] মাহাকাল ;[৩]
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও ॥

পছিমে বন্দিয়া গায়োঁ পীরো পগম্বর ;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও ॥

দক্ষিণে বন্দিয়া গায়োঁ সম্পতি সাগর[৪] ;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও ॥

চাইরপুখে[৫] চাইর কণা[৬] বন্দোঁ,
মইধ্যে জল্‌পেশর[৭] ;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও[৮] ॥

১ এমনিই ব্যবহৃত হইয়াছে ২ গাহিব ৩ স্থানীয় দুই দেবতা ৪ কুবের ৫ চারিদিকে ৬ চারিকোণা ৭ জল্‌পেশ্বর। সতীদেহের বাম পদ এইস্থানে পড়িয়াছে বলিয়া বিশ্বাস ৮ পা।

। ২ ।

এই সন বন্দনা করিমোঁ কার !
বিপদ কান্টারী[১] হরি
ভরসা তমার ॥

ওরে দিনে দিনে দুঃখ বাড়েচে
কলির সংসার ;
হায় রে অভাগীর বিধি,
এ কি তোর বিচার ।
যেমন আইজত্‌[২] হইচে এই সন
ধান-চাউলের বাহার ॥

গরীপ নোকের[৩] কপাল মান্দা[৪],
কতয় করিবো ধান্দা[৫],
জীবন বাঁচা ভার ;
প্যাটের ভোকে কান্দে ছোয়া
পোয়া[৬] না যায় ধার-উধার ।
কলিতে ভগমান বুঝি
ধইচে[৭] অবতার ॥

। ৩ ।

ওরে কি বন্দনা করিমোঁ রে,
বন্দি এই সন কলির সংসার
বন্দি দেশের ব্যবহার ।
সুখশান্তি নাই যে আর
উল্টাং-ভাল্টাং[৮] কলির সংসার ॥

১ কাণ্ডারী ২ রাজ্যে ৩ গরীব লোকের ৪ মন্দ ৫ লোককে আর কতোই ধান্দায় ঘুরাইবি ৬ পাওয়া ৭ ধরিয়াছে ৮ এলোমেলো, অপ্রত্যাশিত।

CENTRAL LIBRARY

কলির রাজ্যে ছলি বুদ্ধি[১]
আয়্যান[২] হইছে জারি,—
জোতদারের জোত নষ্ট
উঠিল্ জমিদারী[৩] ॥

ওরে রাজ্য নষ্ট, জীবের কষ্ট
কোতয়[৪] দেখিবো ফান্[৫] ;
ঘনজলে[৬] নষ্ট হইল্ ভাই রে
পাটা-ভাদই[৭] ধান ॥

। ৪ ।

বন্দনা করিম্ কার !
বন্দিবার ছল নাইরো আর ;
বন্দু[৮] মা জগত-জননী[৯],
ভরোসা তমার ॥

সদায়[১০] দিন ভাবিতে যায় গে মা,
কি করি উপায়,
ভাসে তরী আগম দরিয়ায় ।
এ বড় তরং নদী[১১],
পার করিবে কাঁয় ॥

ওকি ওই মরি রে,
উঠু-ডুবু করে বান্দা
ঢোকে ঢোকে পানি খায় ;
এলাও তো[১২] মা
দুঃখের আতি না পহায়[১৩] ॥

১ ছলের বুদ্ধি ২ আইন ৩ জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেল ৪ কতই ৫ মজা, কৌতুক ৬ অতিবৃষ্টিতে ৭ পাট ও আউশ ধান ৮ বন্দনা করি ৯ জননী ১০ সদাই ১১ তরঙ্গসঙ্কুল নদী ১২ এখনও তো ১৩ পোহাইল না ।

CENTRAL LIBRARY

। ৫ ।

এই বছর বন্দনা কি করি !
গানো মইধ্যে মোর বিষহরি,
তাঁক[১] বন্দিয়া গাই রে ॥
যন্ত্র মইধ্যে মোর খঞ্জরী
গানো বন্দিলে আছে ঢের[২] ॥

অঙ্গের গান[৩] দেখো মধুমালা[৪]
মাইয়ার বাদে[৫] মদনকুমার
কেমন হইসে[৬] পাগেলা ॥

ওরে সইত্‌পীর[৪], নয়ানশোরী[৪],
হুমাকো[৭] বন্দনা করি ;
নিজাম পাগলা[৪], চন্দ্রাবলী[৪],
তার নাম নব-কুশা[৪] ।
দক্ষিণদেশী[৮] গান করেছে
তালে-খোলে কি সুন্দোর
চড়িয়া আসরের উপর ॥

১ তাঁহাকে ২ বন্দনা করিবার অনেক বিষয় আছে ৩ রঙ্গের গান ৪ মধুমালা, সত্যপীর, নয়ানশোরী, নিজামপাগলা, চন্দ্রাবলী, কুশানী (লব-কুশের গান, রামায়ণ গান) প্রভৃতি বিভিন্ন পালাগানের নাম ৫ বউয়ের জন্য ৬ হইয়াছে ৭ উঁহাদেরও ৮ অর্থাৎ নিম্নবঙ্গের ।

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ষ পরিক্রমা : বৈশাখ-আশ্বিন

॥ মেছেনী ॥

নামানী

। ৬ ।

তিস্তাবুড়ী নামে[১] রে—
বাজে হীরামন বাঁশি রে[২] ॥
মোর মনে নাগিয়া গেইল্
গায়ের পাছোড়া[৩] হারেয়া গেইল্[৪] ॥
গাঁয়ের গারাম, সালাম রে[৫]—
বলদ না দিয়া টাকা রে[৬] ॥

১ তিস্তাবুড়ী অবতরণ করেন ২ স্বর্গ হইতে তাঁহার অবতরণ কালে হীরামন বাঁশি বাজিতেছে ৩ উত্তরীয় ৪ হারাইয়া গেল। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি দুইটির অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছি না। মনে হয়, ইহা কেবল গাহিবার খাতিরেই গাওয়া হইয়াছে ৫ ওগো গ্রামদেবতা, তোমাকে সালাম জানাই ৬ এই পঙ্‌ক্তির অর্থও করিতে পারি নাই। যাঁহার নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছি, তিনিও ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই।

দেবী তিস্তার ডালা গারাম ঠাকুরের সম্মুখে নামাইয়া এই গানটি গীত হয়।

শ্রীমতী পুষ্পনীদেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি)-র নিকট হইতে ২. ১১. ১৯৫৮. সনে শেষ দুই পঙ্‌ক্তির অতিরিক্ত কথা মিলিয়াছে,

গাঁয়ের গারাম, সালাম রে—
বল্‌দে নাগিয়া[১] সোন্দাও[২] রে ;
ওরে মোর ডোলালিয়া[৩] পিয়ারে[৪]—
হেরোয়া[৫] নাগিছে[৬] ।

১ কথান্তর—বলদ না দিয়া। অর্থ করিতে পারি নাই ২ প্রবেশ কর ৩ দুলালিয়া ৪ প্রিয়া, প্রিয়তম ৫ হাসিমস্করা করিয়া যে নিন্দাত্মক গান গাওয়া হয়, তাহাকে 'হেরোয়া গান' বলে ৬ লাগিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

। ৬ক ।

তিস্তাবুড়ীর নামান্ গে হচে[১]
বড়য় হাউসালী[২] ;
আলন্দে[৩] বরিয়া[৪] নেহ গে[৫]
হুমার পাঁচ বহিনী[৬] ॥

গুছি নক্ষীর[৭] নামান্ গে হচে
বড়য় হাউসালী ;…
ডাক লক্ষীর[৮] নামান্ গে হচে
বড়য় হাউসালী ;…
অঘন নক্ষীর[৯] নামান্ গে হচে
বড়য় হাউসালী ;…
পৌষ নক্ষীর[১০] নামান্ গে হচে
বড়য় হাউসালী ;…॥

১ হইতেছে ২ সৌখীন, আহ্লাদী ৩ আনন্দে ৪ বরণ করিয়া ৫ লহ গো ৬ উঁহাদের পাঁচ বোনকে ৭ বৎসরের প্রথম ধান্য রোপণ করিবার সময় গোছা করিয়া ধান রোপণ করিতে হয় ৮ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন ধানের গোছা বাড়ীতে আনিয়া পূজা করা হয়। এই দিন হইতে ধানের শীষ্ বাহির হইতে থাকে, ইহাকে 'ধানের ফুল দেওয়া' বলা হয় ৯ প্রথম ধান কাটার উৎসব ১০ এইদিন ধান কাটিয়া আনিয়া পুঁজি করিয়া তাহাকে পূজা করা হয়।

অতিরিক্ত কথা—

ভদ্রকালীর নামান্ গে হইসে[১],
বড়য় হাউসালী ;…
গাঁয়ের গারাম[২] নামান্ গে হইসে
বড়য় হাউসালী ;…॥

১ হইয়াছে ২ গ্রামদেবতা

CENTRAL LIBRARY

। ৬থ ।

আজি কেনে আলোয়ার বাস[1] উঠে রে !
না জানি তিস্তাবুড়ী কুন কামো করে।
হরিষমনে বাইজন[2] বাজে রে[3] ॥

আইসো মাও, বইসো ঘরে
স্থাবা দিচু[4] তমার তরে ;
হাল-হাতিয়ার সুখ্‌খো-শান্তি[5]
তমার চরণে ॥

আজি কেনে ধূপের বাস উঠে রে !
না জানি তিস্তাবুড়ী কুন কামো করে।
স্থাবা নেও তমরা হরিষ মনে রে ॥

১ আতপচালের গন্ধ ২ আনন্দের বা একটানা বাজনা বাজিতেছে ৩ কথান্তর—আনন্দে মঙ্গলো বাইজো বাজে ৪ পূজা দিয়াছি ৫ সুখ-শান্তি।

কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা—

আজি কেনে ধূপের বাস উঠে রে !
না জানি তিস্তাবুড়ী মাও নামিছে[1]
পূজা খাবার আশে[2] রে।

স্বর্গে ছিল মাও মোর
মর্ক্তে[3] দিলে পাও রে ;
নামিছে নামিছে মাও মোর
বটো বিরিখের তলে রে।
বসিছে বসিছে[4] মাও মোর
বসুমতীর কোলে রে।

১ নামিয়াছে ২ আশায় ৩ মর্ত্তে ৪ বসিয়াছে।

পাথারিয়া

। ৭ ।

কাঁচা শাকের মোর ডুগ্ ডুগ্ কুশি[১]—
সরকারের[২] হাতোত্ না দেন বেটী[৩] ;
সরকার যাবে ইস্কুল পড়িবা'
আই গে,
এথেলায় নবে[৪] বেটী ॥

। ৮ ।

দাদা,
সেই যে কহচুঁ তোক[৫]
নল্ডং-নাকা[৬] ফুলুয়াটা[৭]
আনিয়া দে গে মোক ॥

মাগী মুলাইটার[৮] নাথা[৯]
দেহাটা ঠস্-ঠস্[১০] ;
মুগী কুশিয়ারের[১১] নাথা
চিপিয়া থালেক্ অস্[১২] ॥

১ কচি ডুগ্ডুগে পাতা, কিশলয় ২ পড়ুয়ার ৩ পণ্ডিতের সহিত মেয়ের (অর্থাৎ আমার) বিবাহ দিয়ো না ৪ একলাই র'বে, রহিবে ৫ সেই যে তোকে বলিতেছি ৬ লণ্ঠন মার্কা। কোনো কিছুর সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে ব্যবহৃত হয়। কাব্যিক বাগ্ধারার বিশেষত্ব। 'সুন্দর' অর্থে ৭ জামাই, বর ৮ মাঘ মাসের মুলার ৯ মত ১০ ডাগর-ডোগর ১১ বিশেষ এক ধরণের আখ ১২ নিঙড়াইয়া রস খাইল। মাঘ মাসের রাঙামুলার মতো দেখিতে ছেলেটি, আখের মতো আমার মনকে নিঙড়াইয়া লইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

। ৯ ।

জলেয়া[১] মোমের বাত্তি
ভাত খিলালেন[২] মোক চোপরাতি ;
তোর পিরতির বড়য়[৩] শোক[৪]—
না নাগে মোক তিষা-ভোক[৫] ॥

ও মোর সুন্দরী,
তোক না নিলে মোর জলম মিশ্‌শা[৬]
কতয়[৭] কান্দিম্‌ মাই তোক দেখিয়া ॥

। ১০ ।

তোতা কান্দে, ময়না গে কান্দে
জোঙ্গলে কান্দে শুয়া[১] ;
আজার ঘরের সিপাই গে কান্দে
হাতের কলম থুইয়া :
খঁপা নাসী[২] আয় গে আয় ॥

। ১১ ।

হুপারে[৩] কাবেঙ্গার গছ[৪]
টিয়া ঠোগেয়া[৫] খায় ;

১ জ্বালাইয়া ২ ভাত খাওয়াইলেন। আসল অর্থ—সারারাত্রি ধরিয়া সঙ্গ দান করিলেন ৩ বড়োই ৪ আকর্ষণ, জ্বালা, ইত্যাদি অর্থে ৫ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ৬ জন্ম মিছা ৭ কতোই।

শ্রীমতী পুষ্পী দেবীর নিকট হইতে এই গানটির কথান্তর পাইয়াছি,—

নাসের খঁপাটা[১] দেখিয়া
দুই চইক্ষের জল মোর পড়ে ধায়া[২] ;
তোক না নিলে মোর জলম মিশ্‌শা
কতয় কান্দিম্‌ মাই তোক দেখিয়া ॥

১ সুন্দর খোঁপাটি ২ ধাইয়া।

১ শুক। পাখী বিশেষ ২ নাসের অর্থাৎ লাস্যময় সুন্দর খোঁপা যাহার, সে 'খঁপা নাসী'। ৩ ওপারে ৪ কামরাঙ্গার গাছ ৫ ঠোকরাইয়া। কথান্তর—"টিয়ায় ঠোগে' খায়"।

CENTRAL LIBRARY

সুন্দোর গালের চুমা খালে[১]—
জাতি নাকুন[২] যায় ॥

। ১২ ।

উতরদখিণ মোর ডারী[৩] রে ঘরা—
ওইঠে[৪] আছে ঢেনার[৫] ধুরা[৬] ;
সিন্‌জা[৭] ভাঙ্গিয়া ওগুন জালা[৮] ।
ঢেনা রে,
তোর দতরা আছে তোলা[৯] ॥

। ১৩ ।

উতরদখিণ ডারী[১০] রে ঘরা—
ওইঠে[১১] থাকে জড়ারে[১২] ঢেনা[১৩] ;
ঢেনা রে বিহাতি মাইয়ার নাথা ॥

আজি কটরায়[১৪] ভিজাইচুঁ রে[১৫] খইলা[১৬]—
আইসেক[১৭] ঢেনা ঘষেক রে মাথা ।
পিঠিখান[১৮] ঘষেয়া দে রে ঢেনা,—
ঢেনা রে, কোপালত্[১৯] নাই তোর মাইয়া[২০] ॥

১ "গালে চুমা খাওয়া" নয়, "গালের চুমা খাওয়া" । কাব্যিক বাগ্‌ধারা বিশেষত্ব ২ নাকি । মৈথালী গানের একটি কলি রূপেও এই গানটি মিলিয়াছে ৩ বাহিরের ঘর । অবিবাহিত যুবকেরা সাধারণত এই বাহিরের ঘরেই শয়ন করে ৪ ওইস্থানে ৫ অবিবাহিত বা বিপত্নীক পুরুষের ৬ বাসস্থান, ইত্যাদি অর্থে ৭ পাটকাঠি ৮ আগুন জ্বালা ৯ আগুন জ্বালিয়া দেখ, ঘরের চালের বাতায় তোর দোতরা রাখা আছে (এবং সেই দোতরা বাজাইয়া আমাকে শোনা) ১০ বাহিরের বসিবার ঘর ১১ ওইখানে ১২ একজোড়া ১৩ অবিবাহিত, বিপত্নীক । বর্তমান ক্ষেত্রে অবিবাহিত ১৪ বাটিতে ১৫ ভিজাইয়াছি রে ১৬ খলি । বাটিতে মাথা ঘষিবার জন্যে খলি ভিজাইয়াছি ১৭ আয় ১৮ পিঠটা ১৯ কপালে ২০ বউ ।

CENTRAL LIBRARY

জোলপইগুড়িয়া ঝাটি[১] রে হাঁড়ী[২]
ধান তাড়াইসু[৩] কাতিরে শালি[৪] ;
গুটিক চুঁড়া খায়া যা রে ঢেনা,—
ঢেনা রে, কোপালত্ নাই তোর মাইয়া ॥

। ১৪ ।

বোল্দিয়া[৫] বান্দে[৬] পাগ্-পাগুড়ি
বোলদানী কুটে চুঁড়া[৭] রে ;—
শামের বলোদিয়া[৮] রে ॥

ছামও ভাঙ্গিল্[৯], খুরিও[১০] চট্কিল্[১১]—
কীসে খাবো[১২] চুঁড়া রে ;
শামের বলোদিয়া রে ॥

বোল্দিয়া যাছে[১৩] দুরোন্থাশে—
হামাক নাগে ধান্দা গে ;
শামের বলোদিয়া রে ॥

আকাঁড়ি চাউলের ভাতো রে বোলদিয়া,
বিচিয়া বাইগনের[১৪] শাকো[১৫] ;
খায়া যারে বোল্দিয়া মোর
গাসো চারিক[১৬] ভাতো।
শামের বোলোদিয়া রে ॥

১ বড়ো ২ হাঁড়ীতে ৩ সিদ্ধ করিয়াছি ৪ শালিকাতি—এক ধরণের ধান বিশেষ ৫ বলদিয়া, বলদ ; তিস্তাবুড়ীর স্বামীকে এই নামে ডাকিয়া ঠাট্টা-রসিকতা করা হয় ৬ বাঁধে ৭ বলদনী চিঁড়া কুটে ৮ বলদিয়াকেই 'শ্যাম' বলা হইতেছে ৯ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ঢেঁকির প্রচলন নাই। পরিবর্তে উদুখল চলে। যাহার মধ্যে ধান্যাদি রাখা হয়, তাহাকে "ছাম" বলে। ছামও ভাঙ্গিল ১০ বাটিও ১১ চট্কাইয়া গেল, অর্থাৎ ভাঙ্গিল ১২ খাইবি ১৩ যাইতেছে ১৪ যে বেগুনে বিচি হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বুড়া বেগুন ১৫ 'শাক' কথাটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। রন্ধিত যে কোন তরকারি বুঝাইতেই 'শাক' ব্যবহৃত হয়। যেমন, "ডাইল শাক," "লাউ শাক" ১৬ গ্রাস চারি। ছাম ভাঙ্গিয়া গেল, খুরি ভাঙ্গিয়া গেল,—চিঁড়া খাওয়া হইল না। বুড়া বেগুনের তরকারি দিয়া আকাঁড়া চালের ভাতই না হয় চারটি খাইয়া যাও।

। ১৫ ।

গৌরীহাটের[১] সরু গে আলি
গাড়ী যাছে[২] মোর সারি গে সারি ॥
গাড়ী বয়হা[৩] মরিবে ভারি[৪] ;
ভারি রে, তোর মাইয়া[৫] হোবে আড়ী[৬] ॥
গাড়ী যাছে মোর সারি গে সারি ॥

। ১৬ ।

পব্বতেরো কোলে কোলে[৭]
হেঁটা-উচল মাটি[৮] ;
ওইঠে হাতে[৯] পড়িলে গাড়োয়ান
যাবেন অধোগতি ॥
আর কুনকালে ঘুরিবেন
গাড়োয়ান ডে[১০] ॥

মোথার উপর[১১] হোকা-ছিলিম
চালের বাঁতাত্ তাংকু[১২] ;
অস্তে-অস্তে [১৩]শুস্‌কিয়া[১৪] খাবেন
ডে গাড়িয়াল—
যাবেন অ্যানেক দুর ॥

। ১৭ ।

দুয়ারের আগত্[১৫] হাপানাপা[১৬] সিপাই,
তারে তলত্ জাঙ্গি[১৭] ;
বিয়াও[১৮] করিয়া ছাড়িয়া গেলেন সিপাই
বৈস্থাশের চাখিরি ॥

১ শহর জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি গঞ্জ ২ যাইতেছে ৩ বহিয়া। "গাড়ী চালানো"—এই অর্থে 'গাড়ী বহানো'। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ৪ গাড়ীয়ালটির নাম ৫ বউ ৬ বিধবা হইবে ৭ পর্বতের গা বাহিয়া ৮ উঁচুনীচু মাটি ৯ ওইস্থান হইতে ১০ রে। "রে" "ডে" রূপে কোন কোন অঞ্চলে উচ্চারিত হয় ১১ চৌকাঠের উপর ১২ তামাক ১৩ আস্তে-আস্তে ১৪ হাতে টিপিয়া, মোজ করিয়া ১৫ দরজার সম্মুখে ১৬ লাফা শাকের ক্ষেত (?), বড়ো শাকের গাছ ১৭ তারই তলে জাঙলা ১৮ বিবাহ।

ছোয়ার[১] বাদে[২] পিরান-ধুতি
মোরো বাদে খাড়ী[৩] ;
আর তোমার বাদে আনেন সিপাই
মহুয়[৪] বান্দা পাগুড়ি ॥

সুবোদে[৫] শুনিসুঁ[৬] সিপানী গে,
তোমার সিপাই গেইসে মারা ;
ডিকিয়া[৭] ভাঙ্গো সিপানী গে
তোমার পাঙ্কো-মুঠি শাংকা[৮] ॥

সিপানী গে,
আর কুন কালে ঘুরিবে তোমার
সিপাই গে ॥[৯]

। ১৮ ।

মোর সোয়ামীটা ভালয়[১০] কিস্ষাণ
খিল্ ভাডিয়া[১১] ফেলাইল্ ধান[১২] ;

১ ছেলের ২ জন্যে ৩ শাড়ী ৪ ময়ূরের পাখা ৫ লোকমুখে ৬ শুনিয়াছি ৭ আছাড় দিয়া ৮ জলপাইগুড়িতে কখনো একটি শাঁখা পরা হয় না। চার-পাঁচটি শাঁখা একত্র জোড়া করিয়া পরা হয়, ইহদেরই বলে 'শাঁখামুঠি' ৯ মনে হয়, এই গানটির পরবর্তী অংশ আছে। টুপামারী হইতে প্রাপ্ত অপর এক কলি মেছেনী গানকে এই গানের পরবর্তী অংশ বলিয়া আন্দাজ করি। অংশটুকু এই :

ময়রা-মইরী[১] গে কান্দে
জোঙ্গলে কান্দে শুয়া,
আজার ঘরের সিপাই গে কান্দে
হাতর নাটি থুইয়া।

১ ময়ূর-ময়ূরী।

১০ ভালোই ১১ পতিত, জঙ্গলা জমি পরিকার করিয়া, চাষের উপযুক্ত করিয়া। বাগধারার বিশেষত্ব ১২ ধান রোপণ করা অর্থে—"ধান ফেলানো"। বাগধারার বিশেষত্ব।

CENTRAL LIBRARY

স্যাও ধান[১] মোর খায়া গেইল্[২] টিয়া রে—
সোয়ামী, হায় রে হায় ॥

হাতেরো দেছোঁ[৩] মুই, কছুভারো দেছোঁ মুই[৪]
সোয়ামিধন, এখনে ফিরিয়া আইস বাড়ী ;—
সোয়ামী, হায় রে হায় ॥

। ১৯ ।

ইছ্লাম নদীর পিছিলা ঘাট—
হেঙ্গা[৫] দিয়া সে মারে মাছ,
হায় হায়, হেঙ্গা দিয়া সে মারে ;
সেইকিনা মাছো চেঙ্গেড়ী
হুনেতে আঙ্কে ॥

আবো, টেঙ্গন-দাড়িয়া[৬]
মোর মন ভুলাইল্ গে আবো !
হাটো সে নাই যাও—
পথো সে নাই যাও,
নাই যাও যমুনারো ঘাটে ।
হায় হায়, নাই যাও যমুনারো ঘাটে ॥

ওইনা বাড়ীর চেঙ্গেড়াগিলা
মোক যান্চাল কাটে[৭] ;
আবো, টেঙ্গন-দাড়িয়া মোর মন ভুলাইল্—
নাই যাও যমুনারো ঘাটে ॥

১ সেই ধানও ২ খাইয়া গেল ৩ হাতে যাহা ছিল, তাহা দিতেছি ৪ কোঁচড়ে যাহা ছিল, তাহা দিতেছি ৫ মাছ ধরিবার বাঁশের তৈরী সরঞ্জাম বিশেষ ৬ ছুঁচালো গোঁফওয়ালা লোক ৭ চুকলি কাটে, নিন্দা করে ।

। ২০ ।

আই[১], মোর মাচা ভরি' ভরি' ধান আছে[২] :
ও মুই নাই কুটিম্ বাহেচা[৩] গে
ওহি দেশে—
ওহি দেশে মোর আছে গাভুরা[৪] গে ॥

আই, মোর পর-পুরুষক্ দেখিয়া গে—
আই, মোর হালেছে হিয়া গে,
ওহি দেশে—
ওহি দেশে মোর আছে গাভুরা গে ॥

। ২১ ।

তিস্তানদীর সরল রে খুটা[৫]—
ভালো করিয়া মাঠাইম্[৬] রে পিঁড়া ;
দানো ঝনে[৭] শিতান দিমো[৮]
বাউদিয়া, নড়িস্‌কো না[৯] ॥

জামখুরিত্[১০] ভিজাইস্ গে খইলা
আয় বাউদিয়া, ঘষি রে মাথা ;
পিঠিখান ঘষেয়া দিবেন
বিহাতি মাইয়ার[১১] নাথা[১২] ॥

। ২২ ।

নগর[১৩] কানাই রে, হালখানি জুড়িয়া
আতরখানি কানাই
নাই মারিলো[১৪] রে।
নগর কানাই রে ॥

১ মা ২ আমার ঘরে মাচা ভরা ধান আছে ৩ অন্য লোকের বাড়ী হইতে ধান আনিয়া, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধান ভানিয়া দেওয়াকে "বাহেচা-কুটা" বলে ৪ 'প্রেমিক' অর্থে ৫ সরল, সোজা, অবক্র কাঠ ৬ চাছিব, ছুলিব,—পালিশ করিব ৭ দুই জনে ৮ দুইজনে তাহাতে মাথা রাখিয়া শুইব ৯ নড়াচড়া করিস না। "একটুও নড়াচড়া করিস না"—এই অর্থে "নড়িস্‌কো না।" বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১০ জামবাটিতে ১১ বিবাহিত স্ত্রীর ১২ মত ১৩ নাগর ১৪ লাঙ্গলের ফাল দিয়া জমির চারিদিকে, হলকর্ষণের পূর্বে দাগ কাটাকে "আতর মারা" বলে। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব।

আজায় নিলেক্ আইজ্য-ভার—
আনী নিলেক্ কাশীবাস ;
ওরে আনীর শোগে[১]
জোঙ্গলে হোবে বাস ॥

নগর কানাই রে,
গোরু পালাইল্ নিধুয়া পাথারে।
নগর কানাই রে[২] ॥

। ২৩ ।

হিপারে[৩] গে অসিয়া[৪]—
বাঁশি বাজায় বসিয়া ;
হুপারে[৫] সোমারী[৬] ভরায় জল।
মন মেরা করে হায় হায়
চিতো মেরা করে হায় হায়[৭] ॥

১ শোকে ২ কৃষ্ণকে শুধু রাখাল করিয়াই রেহাই দেওয়া হয় নাই, তাহাকে দিয়া হলকর্ষণ পর্যন্ত করানো হইয়াছে। অবশ্য, বলা বাহুল্য, 'নাগর কানাই' এখানে লৌকিক প্রেমিক মাত্র ৩ এপারে ৪ রসিয়া, রসিক ৫ ওপারে ৬ সোমারী নাম্নী একটি মেয়ে ৭ হিন্দী প্রভাব লক্ষ্য করিবার মতো।

এই গানের সমভাবাত্মক অপর একটি গান এই :

চিপিরিত্[১] চড়িয়া
বাঁশি বাজালো[২] রে অসিয়া ;
মন মেরা মানে না
চিতো মেরা মানে না—
মানে না রে,
গাবুরার[৩] পিছা[৪] ছাড়ে না।

১ চিপি, উঁচু স্থান ২ বাজাইলি ৩ গাবুর অর্থাৎ যুবক। এখানে 'প্রেমিক পুরুষ' অর্থে ৪ পিছু।

CENTRAL LIBRARY

। ২৪ ।

পাটা-বাড়ীত্[১] মোর শিয়াল কান্দে[২]
কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে ;
আজি কালা মুই এখেলায়[৩] ॥

বাপো ছাল্লে[৪] কালার মাও ছাল্লে
ভাই-বন্ধ কালা সোগায়[৫] ছাল্লে,
আজি কালা মুই এখেলায় ॥

কালার বাদে[৬] মুই পাতিনু দই
তাঁহো[৭] কালার দেখা কই ;
আজি কালা মুই এখেলায় ॥
যে দিয়া দেখোঁ[৮] কালা
সে দিয়া ধুঁয়া[৯] ;
শুকি' আছে[১০] কালা
বাট্টার পান-গুয়া ॥

যাবা' চাছো[১১] কালা তোরে নগদে[১২]
বাদী হইল্ কালা মোর বাপো-মাও
আজি কালা মুই এখেলায় ॥

। ২৫ ।

দুয়ারের আগত্[১৩] আউরারে বাউরা[১৪]
ওইঠে[১৫] আছে কালার বাঁশি জড়া[১৬] ;
বাঁশি আছে, বাই মোর মান্‌বি নাই ॥

১ পাটের ক্ষেতে ২ প্রেমিক কাঁদে ৩ একলাই ৪ ছাড়িল ৫ সকলেই ৬ জন্যে ৭ তবুও ৮ যে দিক দিয়া দেখি ৯ সেই দিকেই নৈরাশ্যের ধুঁয়া ১০ শুকাইয়া আছে ১১ যাইতে (যাইবার) চাহিতেছি ১২ তোরই সঙ্গে ১৩ দুয়ারের সম্মুখে ১৪ আউল বাউল—'প্রেম-পাগল' অর্থে ১৫ ওইস্থানে ১৬ বাঁশি দুইটি।

কালার[১] মাথাত্ দিয়া রে ত্যালো[২]
খোঁপা বান্ধোঁ হ্যাদেল্-স্যালো[৩] ;
বাঁশি আছে, বাই মোর মান্‌ষি নাই ॥

কালার মুখত্[৪] দিয়া রে গুয়া
কালায়[৫] দিলেক্ মোক সারী-শুয়া ;
বাঁশি আছে, বাই মোর মান্‌ষি নাই ॥

কালায় দিলেক্ কানের সনা[৬]
ও রূপ দেখিবে মোর ছুফোর বেলা ;
কালায় দিলেক্ নীলো শাড়ী
উপ দেখিবে মোর বেলা ভাটি[৭] ;
বাঁশি আছে, বাই মোর মান্‌ষি নাই ॥

কালায় গেইসে[৮] জোলপইগুড়ি
কিনি' আনিবে[৯] নীলো শাড়ী ;
বাঁশি আছে, বাই মোর মান্‌ষি নাই ॥

কালায় দিলেক্ জড়া রে ডীঘি[১০]
ছিনান করোঁ[১১] বাই[১২] মুই নিশা-আতি[১৩] ;
বাঁশি আছে, বাই মোর মান্‌ষি নাই ॥

১ প্রেমিকের ২ তেল ৩ বড়ো-সড়ো করিয়া ৪ মুখে ৫ কালা। কর্তায়—'য়' ৬ সোনা, অলঙ্কার ৭ বিকাল বেলা ৮ গিয়াছে ৯ কিনিয়া আনিবে ১০ জোড়া দীঘি দিল, অর্থাৎ খনন করাইল ১১ স্নান করি ১২ দিদি ১৩ দিনে রাত্রিতে প্রেমের জ্বালা জুড়াইতে দীঘিতে স্নান করি।

CENTRAL LIBRARY

। ২৬ ।

ও পারে শ্যামের বাড়ী—
কেলা গানু[১] সারি গে সারি,
দয়া দেখি'[২] না কাটিনু পাতো রে[৩] ;
শ্যাম মনে আছে,
মনে আছে জানা রে শ্যাম,
মনে আছে ॥

পানো আছে, সুপারি আছে
খাইবারো মনো আছে[৪] ;
খাইলে রে শ্যাম,
খাইলে হোবে জানাজানি,
শ্যাম মনে আছে,…

খাটো আছে, পালং আছে
শুতিবারো[৫] মনো আছে ;
শুতিলে রে শ্যাম,
শুতিলে হোবে জানাজানি,
শ্যাম মনে আছে,…

শ্যামের গায়ে পাছোড়া[৬] আছে
গায়ে দিবার মনো আছে ;
গায়ে দিলে রে শ্যাম,
গায়ে দিলে হোবে জানাজানি,
শ্যাম মনে আছে,…

১ কলা গাছ গাড়িলাম ২ দয়া দেখাইয়া অর্থাৎ করিয়া ৩ পাতা কাটিলাম না ৪ খাইতে ইচ্ছাও আছে ৫ শুইবার, শুইতে ৬ উত্তরীয়।

। ২৬ ক ।

শ্যামবান্দার ঘাটে[১] সাহুত[২]
খেইল্-কদমের[৩] গাছো ;
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥

"অজালা[৪] কদম কইনা
কোন্ গুণে নাগিবে[৫] ;"
সাহুত, কদম পাড়েয়া[৬] দে মোর হাতে ॥

অজালা কদম সাহুত
বসিয়া খেলি খেলামো[৭] রে ;
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥

দুই চরু[৮] কাটিয়া সাহুত
নায়ে সাজামো ডিঙ্গা রে[৯] ;
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥

দুই বাহু কাটিয়া সাহুত
নায়ে সাজামো বৈঠা রে ;
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥

দশ নগুল[১০] কাটিয়া সাহুত
নায়ের সাজামো গোরী[১১] রে ;
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥

মাথার চুলি কাটিয়া সাহুত
নায়ের সাজামো ডোর রে ;
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥

মাঝ নদীতে যায়া নৌকা
করে উঠুডুবু রে ;
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥

১ যে ঘাটে শ্যাম থাকে ২ সাধু, সাউধ, সাউদ, সাহুত ৩ যে কদমের কচি গুটি দিয়া খেলা হয় ৪ অজালা, কচি ৫ কোন্ কাজে লাগিবে ৬ পাড়িয়া ৭ খেলা খেলিব ৮ উরু ৯ নাও, ডিঙ্গা একার্থক। পাদ পূরণের জন্য ব্যবহৃত। কাব্যিক বিশেষত্ব ১০ আঙুল ১১ আড়াআড়ি ভাবে লাগানো নৌকার কাঠ,—ইহার উপর নৌকার পাটাতন থাকে।

CENTRAL LIBRARY

। ২৭ ।

আমের গছত্ আমো যে নাই
সখী গে,
হ'[১] ত্থাখ সখী,
চেঙ্গেড়া কেনে ঘুরে ;
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই,
নাই সখী গে ॥

বোগোরির গছত্[২] বোগোরি যে নাই
সখী গে,
হ' ত্থাখ সখী,
ঝাটা[৩] কেনে পড়ে ;
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই,
নাই সখী গে ॥

পোখোরিত্[৪] যে জল নাই
সখী গে,
হ' ত্থাখ সখী,
চিলা[৫] কেনে ঘুরে ;
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই,
নাই সখী গে ॥

খোপত্ যে পায়েয়া নাই[৬]
সখী গে,
হ' ত্থাখ সখী,
বাকু-বাকু করে[৭] ;
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই,
নাই সখী গে ॥

১ কোনো দৃশ্য বা বস্তুর প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে "হোর," "হের" ব্যবহৃত হয়। তাহা হইতে 'হ' আসিয়াছে ২ কুলের গাছে ৩ চিল। তু° ঝাপটা ৪ পুকুরে। 'ত' সপ্তমী বিভক্তির ৫ চিল ৬ খোপে যে পায়রা নাই ৭ বকম্-বকম্ করে।

CENTRAL LIBRARY

। ২৮ ।

তেঁতেলিরো গোড়ে[১] রে ধানকুনি[২] শুকায় রে—
দেওরা-ভাই মোর—
নাড়িয়া চাড়িয়া শুকায় রে,
রে সজনী ॥

আজায় নিলে আজভার
আনী নিলে জমিন, রে সজনী ।
আজার বেটী কোটোয়াল-ভাতারী[৩],
রে সজনী ॥

। ২৯ ।

উচা কেনে গে আলি,
শ্যাও[৪] আলি তিড়পিতে[৫]
চিঁড়িল[৬] গালার হারো গে ॥

কাঁয়[৭] গাঁথিবে হারো গে ;
অহি[৮] অসের[৯] দেওরা—
অয়হে[১০] গাঁথিবে হারো গে ॥

কাঁয় পিন্ধিবে হারো গে ;
অহি অসের ভাউজী[১১]
অয়হে পিন্ধিবে হারো গে ॥

১ তেঁতুল গাছের গোড়ায় ২ ধানচারটি। স্বল্পার্থে 'কুনি' ৩ যাহার স্বামী কোটাল—তাহাকে "কোটোয়াল-ভাতারী" বলে। এইরূপ "মৈষাল-ভাতারী।" ৪ সেই ৫ তড়পাইতে, লাফাইতে, ডিঙাইতে ৬ ছিঁড়িল ৭ কে ৮ ওই ৯ রসের ১০ ওই-ই ১১ বউদি।

CENTRAL LIBRARY

। ৩০ ।

কালি না হোবে মদনা[১] কালিয়াগোঞ্জের[২] হাট ;
কিনিয়া আনিমো
সাতেশোরীর হার ।[৩]
তোমারলার[৪] হার তোমোরায়[৫] নেও
পাক্ক-কড়ি করি' হামকা[৬] দিয়া যাও ॥

বাড়ী ঢুকা

। ৩১ ।

বড়ো বাড়ী, বড়ো বাড়ী,
রে মোর মাক্‌লা বাঁশের[৭] থুপ[৮] ;
মোর বাড়ী না[৯] যাইস কানাই রে—
মোর বাড়ী গেলে রে মুই
কুকুর হুলেয়া[১০] দিম্[১১] ॥

১ মদন। প্রেমিককে উদ্দেশ করিয়া এই সম্বোধন ২ স্থান বিশেষ ৩ সাতনরীর মালা ৪ তোমাদের। "লা" বহুবচন বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় ৫ তোমরাই। "ই" "য়" হইয়াছে ৬ আমাদিগকে ৭ এক ধরণের মোটা বাঁশ ৮ স্তূপ, ঝাড় ৯ অর্থহীন ১০ হুলাইয়া, লেলাইয়া ১১ দিব।

গৃহস্থের বাড়ী ঢুকিবার পুর্বে এই গানখানি গীত হয়।

শ্রীমতী গুলেশ্বরী দেবী (বুড়য়াপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)-র নিকট হইতে ১৩. ৬. ১৯৫৮ সনে হুবহু এই গানটিই পাইয়াছি, ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে—

দুয়ারের আগত[১] রে মোর
মাক্‌লা বাঁশের খোপ,
মোর বাড়ী না যাইস কেনে রে[২] , ইত্যাদি।

১ দুয়ারের সম্মুখে ২ কথান্তর—কানাই রে। অন্যান্য বহু মেছেনী গানে 'কানাই'য়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

। ৩১ক ।

গাঁয় গারাম ঠাকুর রে[১],
তোকো[২] ভক্তি করিম্[৩] রে ;—
হায় রে দুলালিয়া ঠাকুর,
হেরোয়ার নিগাইল্[৪] চোরে রে[৫] ॥

না-হায়, না-হায়[৬], গিথানী[৭] রে,
ভাশুর-শ্বশুরের বাড়ীত্ রে ;
আর কোয়ারীর[৮] হুড়্কা[৯] দিয়া
পালাইসে[১০] গিথানী রে[১১] ॥

। ৩১খ ।

আসিয়া নোখোমী মাও[১২]
দুয়ারে দিলে পাও[১৩] ;
আগুবাড়ি'[১৪] শুদো করে[১৫]—
বিধুর[১৬] বাপো-মাও ॥

১ গ্রামের গারাম ঠাকুর রে ২ তোকে ৩ 'প্রণাম করা' এই অর্থে "ভক্তি করা," "ভক্তি দেওয়া।" বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ৪ লইয়া গেল ৫ "নামানী" গানেও এই পঙ্‌ক্তিটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে পাইয়াছি ৬ না, না ৭ গৃহস্থনী, গিন্নী, গৃহিণী ৮ দরজার কপাটের ৯ খিল ১০ পলাইয়াছে ১১ দরজায় খিল দিয়া এ বাড়ীর গৃহিণী হয়তো পলাইয়াছে। বাড়ীর গৃহিণীকে নিন্দা করিয়া গীত অপর গানগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ১২ মা লক্ষ্মী ১৩ পা ১৪ বাড়ীর সম্মুখের অংশে, আগ বাড়িয়া ১৫ শুদ্ধ করে ১৬ বিধি (?), বুড়া।

CENTRAL LIBRARY

কেনে রে-নোখোমীয়া দেব[১]
ঘন ঘন পাও;
আসিয়া নোখোমী মাও
দুয়ারে দিলে পাও ॥

। ৩১গ ।

বড়ো বাড়ী দেখিয়া আইলো[২]
নছমী রে;
বড়ো বাড়ীর বড়ো পিঁড়াখান
পাইলো[৩] রে ॥

১ লক্ষ্মী দেব

শ্রীমতী অসেশ্বরী রায় (গড়ালবাড়ী, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)-এর নিকট হইতে ১৩. ৬. ১৯৫৮ সনে এই গানটির যে কথান্তর পাইয়াছি, তাহা এই,

আসিয়া নোখোমী মাও মোর—
দুয়ারত্ দিলে পাও,
আগোবাড়ি[১] শুদো করে[২]
বিধু[৩] বাপো-মাও ।
কেনে রে পুত্রাদির
ঘন ঘন পাও[৪]
শাশুড়ীর অলন-জ্বলন[৫]
ননন দিলে বোল[৬] ॥

১ অগ্রসর হইয়া। শ্রীমতী রায়ের মতে "আগো" অর্থ 'প্রথমে' ২ শুদ্ধ। প্রথমে দেবী লক্ষ্মী বাড়ী শুদ্ধ করেন। ৩ শ্রীমতী রায়ের মতে "বিধু" অর্থ 'বুড়া' ৪ এই লক্ষ্মীর কৃপাতেই বাড়ীতে ঘনঘন পুত্রের পা পড়ে, অর্থাৎ পুত্রাদি হয় এবং বাঁচিয়া থাকে ৫ এই লক্ষ্মী দেবীর কৃপাতেই যন্ত্রণাদায়ক শাশুড়ীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় অর্থাৎ শাশুড়ী পুত্রবধূর উপর তুষ্ট থাকেন ৬ ননদিনী নিন্দা করিলেও, লক্ষ্মী দেবীর কৃপায় তাহা ফলবতী হয় না।

সধবা নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এই গানে ব্যক্ত হইয়াছে।

২ আসিলি ৩ পাইলি।

CENTRAL LIBRARY

তমার[১] যদি চাউলো নাই—
ধান ভুকেয়া[২] হামাক্[৩] চাউলো দেও রে ;
চাউলো ধরিয়া বেড়াই হামেরা[৪]
বড়োই না সুন্দরী রে।
তমার ঘরের হামেরা
বিঘিনি খওাইয়ো গে[৫] ॥

তমার যদি সেন্দুরো[৬] নাই—
কটুয়া[৭] ঝাড়িয়া হামাক্ সেন্দুরো দেও রে ;
সেন্দুরো মাগিয়া বেড়াই হামেরা
বড়োই না সুন্দরী রে।…

তমার যদি ত্যালো নাই—
বোতল নিকাশিয়া[৮] হামাক্ ত্যালো দেও রে ;
ত্যালো মাগিয়া বেড়াই হামেরা
বড়োই না সুন্দরী রে।…

তমার যদি কড়ি নাই—
টাকা ভাঙ্গেয়া[৯] হামাক্ কড়ি দেও রে ;
কড়ি মাগিয়া বেড়াই হামেরা
বড়োই না সুন্দরী রে।…

১ আসলে বহুবচনাত্মক। 'তোমাদের' এই অর্থে ২ ধান ভানিয়া ৩ আমাদিগকে ৪ আমরা ৫ তোমাদের সংসারের বিঘ্নাদি খণ্ডাই অর্থাৎ বিঘ্ন খণ্ডায় ৬ সিঁদুর ৭ কৌটা ৮ নিকাশিত করিয়া ৯ ভাঙ্গাইয়া।

CENTRAL LIBRARY

। ৩২ ।

হি বাড়ীর[১] গিথানীটা[২]
বড়য়[৩] ঘেচেরী[৪] রে ;
বাইর হয়া[৫] জোয়াব দেও[৬]
আঙ্গিয়াত্[৭] মেছেনী[৮] রে ॥

বসানী ও চুমানী

। ৩৩ ।

সনা খেলি[৯] পাটো হে এগিনা[১০]
উপা খেলি[১১] খুলি[১২]
ডানো[১৩] দিবার বিরাইল্[১৪]
মাও মোর পরমা সুন্দরী ॥

১ এই বাড়ীর ২ গৃহিণী, গৃহস্বনী ৩ বড়োই ৪ অলস, দীর্ঘসূত্রী ৫ বাহির হইয় ৬ জবাব দেও অর্থাৎ মেছেনী দেবীকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বরণ কর ৭ অঙ্গনেতে ৮ মেছেনী দেবী আসিয়াছেন।

মেছেনী-দেবীসহ শোভাযাত্রা-কারিণীরা গৃহস্থের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীর গৃহিণী যদি তাহাদের অভ্যর্থনা ও বরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া না আসে, তবে তাহাকে নিন্দা করিয়া এই গান গাওয়া হয়।

কথান্তর—

হি বাড়ীর গিথানী ভাতার-জাঙ্গালা[১] গে ,—
গিরি-গিথানী[২],
বাইর হয়া জোয়াব দে ।—
অঙ্গিয়া মেছেনী[৩] ॥

১ স্বামীর কাছ-ছাড়া হইতে চায় না যে। গালি বিশেষ ২ স্বামী ও স্ত্রী। গৃহস্থ ও গৃহিণী ৩ তোর দুয়ারে রঙ্গিয়া মেছেনী। শৌখীন—এই অর্থে 'রঙ্গিয়া' ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯ সোনায় মোড়া ১০ পাট আঙিনা ১১ রূপায় মোড়া ১২ বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। ইহাকে 'খুলি' 'খল্তা', 'খোলান' ইত্যাদি বলা হয় ১৩ দান ১৪ বাহির হইল।

কুলাত্ করিয়া ধানো দিলে[১]—
মাও মোর ধনে-জনে বাড়ে ;
হাতত্ করিয়া ধানো দিলে—
মাও মোর হাতর শাংকা নড়ে[২] ॥

তোমার হাতর্ ডানো পালে[৩]—
মাও মোর খামো না বিলামো[৪] ;
তোমার হাতর্ ডানো পালে—
মাও মোর মেছেনী চুমামো[৫] ॥

। ৩৪ ।

হেন্দুর ঘরের আচারো দেখিয়া
মেছেনী চায় বাসোঘরো রে ।
ও মোর নোখোমী-সরস্বতী[৬] মাও রে—
এইঠে[৭] নেও বাসোঘরো রে ॥

১ কুলায় করিয়া ধান দিলে   ২ সধবা হইয়া বাঁচিয়া থাকে   ৩ তোমার হাতের দান পাইলে   ৪ খাইবও না, বিলাইবও না   ৫ 'চুমাইব'। ফুল-জল ইত্যাদি দিয়া ঠাকুর বরণ করাকে বলে "চুমানো"। যে অনুষ্ঠান দ্বারা চুমানো হয়, তাহাকে 'চুমানী" বলে   ৬ লক্ষ্মীর সহিত 'সরস্বতী' কথার মিল রাখিবার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে   ৭ এইস্থানে, এই বাড়ীতে।

CENTRAL LIBRARY

সাঞ্ঝা হলে[১] সাঞ্জো বাতি
জুড়িমো রে[২]
সাকালে উঠিয়া ছান ছড়ামো[৩] রে ॥

নাচানী

। ৩৫ ।

কালিয়াগঞ্জের কালা সুতা
তাক দিয়া[৪] গাঁথিনো[৫] মালা
ঢুলানি[৬] করিয়া গে[৭],
তুই গে তিস্তাবুড়ী হাউসালী[৮] ॥

তুই গে তিস্তাবুড়ী হাউসালী :
গাও[৯] ধুইবার গেলো[১০] গে তুই :
ছয় বুড়ি হালুয়া[১১] গে—
তুই গে তিস্তাবুড়ী হাউসালী ॥

১ সন্ধ্যা হইলে ২ "বাতি দেওয়া"—এই অর্থে "বাতি জোড়া।" বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব
৩ গোবর ছড়া দেওয়াকে "ছান ছড়ানো" বলে। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব।

শ্রীমতী কনকবালা রায় (নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি), পুরাতন পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি হইতে নভেম্বর, ১৯৫৮ সনে এই গানটির যে অতিরিক্ত কথা পাইয়াছেন, তাহা এই,

মেছেনী চাছে[১] মোর
নিশি-পাড়িয়া শাড়ী[২] রে ;—
মেছেনী না মোর কে রে।[৩]
মোর মেছেনী অঙ্গতে[৪] মন রে।

১ চাহিতেছে ২ নিশি-পেড়ে শাড়ী। রাত্রির মতো অন্ধকার অর্থাৎ কাল পেড়ে শাড়ী
৩ গানের ধুয়া ৪ রঙ্গে। রঙীন শাড়ী পরিতে তাহার সাধ। অথবা, রঙ্গ-রসিকতায় তাহার মন আছে—এই অর্থও করা চলে।

"বসানী" ও "বাড়ী ঢুকা" গান অনেক সময় মিশিয়া যায়। এই গানটি কোনো কোনো অঞ্চলে "বাড়ীঢুকা" গানের শেষাংশ রূপে গীত হইয়া থাকে।

৪ তাহা দিয়া ৫ গাঁথিলাম ৬ ঢিলেঢালা করিয়া অর্থাৎ বেশ বড়োসড়ো করিয়া
৭ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে "গো" সম্বোধন "গে" রূপে করা হয় ৮ আহ্লাদী, শৌখীন ৯ গা
১০ গেলি ১১ হাল বহে যে। বর্তমান ক্ষেত্রে পরিচারক অর্থে।

CENTRAL LIBRARY

ওইলা[১] চলনের বাদে[২]—
ধর্‌লা[৩] গে পাড়ে গালি,
তুই গে তিস্তাবুড়ী হাউসালী ॥

। ৩৬ ।

আগাঘরের[৪] ধাপোতে[৫]
দেউনিয়া বসিসে[৬] ;—
নালো পাটানীটা[৭]
দিবা'[৮] চাহাছে[৯] ॥

বুঝোক্ দিনি[১০] মন রে
মাও-বাপর্ সাথে ;
যাবো[১১] নাকি মন রে
চেঙ্গেড়ার সাথে ॥

সইত্‌কারী হবেন[১২],
সইততে ন'বেন[১৩] ;
চেঙ্গেড়া হাতোর বাঁশি
থুইয়া ঘাটোতে—
সইত্য করিবা' গেইল্[১৪]
সইত্য-কালীর ঘাটে :
নছর-পছর চেঙ্গেড়াটা[১৫] মনে আখিবেন ॥

১ ওই সমস্ত। বহুত্ব বুঝাইতে "লা" ব্যবহৃত হয় ২ জন্যে ৩ তিস্তাবুড়ীর কল্পিত স্বামী। তিস্তাবুড়ী স্নান করিতে গিয়াছে বলিয়া ধর্‌লা গালি পাড়িতেছে। ধর্‌লা একটি নদীর নাম। গানখানিতে তিস্তাবুড়ীর সঙ্গে ঠাট্টা করা হইতেছে ৪ পূর্ব দিকের ঘরে ৫ সিঁড়িতে ৬ বসিয়াছে ৭ লাল পাটানী ৮ দিবার, দিতে ৯ চাহিতেছে ১০ বোঝ দেখি, "দিকিনি" ১১ যাইবি ১২ সত্যকারী হইবেন ১৩ সত্যতে রহিবেন ১৪ সত্য করিতে (অর্থাৎ নায়িকাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিবে)—এই প্রতিজ্ঞা করিতে গেল ১৫ প্রেমে ডুবু-ডুবু, সুন্দর চেহারার চেঙ্গড়া।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৭ ।

উতরতিকার[১] আসিল্ হে
নালো কাম্‌লা[২] ;
তাক্ দিয়া বান্ধিয়া নিমো[৩] হে
জোড়-বাঙ্গেলা ।
শুনো মোরে সাউদানীয়া ॥

বেহারত্ যায়া সোয়ামী
ভাবে মনে মনে ;
কিনিমো[৪] বেউলালী-শাংকা[৫]
নিগামো কেমনে[৬] ।
শুনো মোরে সাউদানীয়া ॥

ছাতিত্ নিগালে শাংকা
কালা পড়ি' যাবে ;
হাতত্ নিগালে শাংকা
ওদে জলি' যাবে ।
ধুতিত্ নিগালে শাংকা
বাড়ী চলি' যাবে ।
শুনো মোরে সাউদানীয়া ॥

কিনিনো[৭] বেউলালী-শাংকা
পিন্ধামো[৮] কেমনে ;
এগিনাত্[৯] পিন্ধালে শাংকা
জা'লে[১০] বাটা[১১] চাবে ।
চালিত্[১২] পিন্ধালে শাংকা
নন্দে[১৩] বাটা চাবে ॥

১ উত্তর দিক হইতে ২ ঘরামী ৩ তৈরি করাইয়া লইব ৪ কিনিব ৫ এক ধরণের শাঁখা ৬ লইব কেমন করিয়া ৭ কিনিলাম ৮ পরাইব ৯ অঙ্গনে ১০ জা'য়েরা ১১ ভাগ ১২ বারান্দায় ১৩ ননদেরা ।

শীতলকাটা মন্দির-ঘর হে
গছাখান্[১] জলেয়া ;
সেইঠে পিন্ধামো শাংকা
চরুতে বসেয়া[২] ।
শুনো মোরে সাউদানীয়া ॥

। ৩৮ ।

ঝিন্-ঝিন্-ঝান্-ঝান্[৩] খাবার আশে
ভাতার ধরিনু[৪] বড়াই[৫] আশে ;
আর মোক্ খোয়ালো
আলির কচু, টেকিয়া[৬]—
বাবুরি-ছাঁটা[৭] ॥

দিবা[৮] চালো নালো থাড়ী[৯]
কয়া বেড়ালো টাড়ী-বাড়ী[১০] ;
বাবুরি-ছাঁটা ॥

কইয়া-মুখত্[১১] তোর বাধিনী[১২] ভাঙ্গাও[১৩]
পরবে-পুজায় মুই
কাপড়ে না পাও[১৪] ।
বাবুরি-ছাঁটা ॥

। ৩৯ ।

পাও পিছ্লিল্[১৫], কমর দম্কিল্[১৬],
ছিঁড়িল্ গালার হার[১৭]—
ওহি হারের[১৮] বান্দে[১৯]
হে[২০] মাইরন মারিলো[২১] ॥

১ প্রদীপখানি ২ উরুর উপর বসাইয়া ৩ ভালোমন্দ জিনিষ ৪ স্বামী গ্রহণ করিলাম ৫ বড়োই ৬ কচু, টেঁকি ইত্যাদি অখাদ্য ৭ গালি বিশেষ ৮ দিবার, দিতে ৯ লাল শাড়ী ১০ পাড়ায়-পাড়ায় ১১ যে মুখ দিয়া বলিয়াছ ১২ ঝাঁটা ১৩ মারি ১৪ কাপড়ই পাই না ১৫ পা পিছলাইল ১৬ কোমর ভাঙ্গিল ১৭ গলার হার ছিঁড়িয়া পড়িল ১৮ সেই হারেরই ১৯ জন্যে ২০ এমন, এই ২১ প্রহার করিলি ।

CENTRAL LIBRARY

পাটানী[১] শুকিবা' ওদ্ দ্যাছোঁ[২]
আজার পাইকারের[৩] আগে[৪] ;
তাঁহো যে[৫] আজার পাইক
না-হায়[৬] মহুমান্[৭] ॥

। ৪০ ।

মাথাত্ ময়ুরের পাখা
মোর সোয়ামী সিঁতা-পাড়া[৮] ;
মোর সোয়ামী এখেলায়[৯] ॥

পন্থতে[১০] বাজাইয়া বেনা
মোর সোয়ামী নতুন ঢেনা[১১] ;
মোর সোয়ামী এখেলায় ॥

ঘরের পাছত্ ভাঙ্গিয়া হাঁড়ী
মোর সোয়ামী আনিলেক্ আড়ী[১২] ;
মোর সোয়ামী এখেলায় ॥

। ৪১ ।

উতর ঘরটা চিকন-ছাটা[১৩]
পছিম ঘরটা আছে ভালা ;
দখিণ ঘরটা হোবোলিয়া পইচ্ছে[১৪]—
বাবুরি-ছাঁটা[১৫] ॥

১ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র ২ শুকাইবার জন্য রৌদ্রে দিতেছি ৩ রাজার পাইকের। খুব সম্ভব 'ব্যবসায়ী' অর্থে এখানে 'পাইকার' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই ৪ আগে ৫ তবু-ও যে ৬ না হয়, হয় না ৭ সন্তুষ্ট, ক্রোধ-শূন্য ৮ টেরি-কাটা, গালি অর্থে ৯ একলাই ১০ পন্থেতে, পথে ১১ যাহার স্ত্রী অল্পদিন হইল মারা গিয়াছে, তাহাকে "নতুন ঢেনা" বলা হয় ১২ বিধবা বিবাহ করিয়া আনিল। "আড়ী আনা"—অর্থ বিধবা বিবাহ করিয়া আনা। রাজবংশী সমাজে বিধবা-বিবাহের চলন আছে। বাগ্ধারার বিশেষত্ব ১৩ খড়হীন চাল ১৪ হেলিয়া পড়িয়াছে ১৫ যাহার বাব্রি (বাবুরি) ছাঁটা, গালি অর্থে।

বাবুরি-ছাঁটা না টিকি-ছাঁটা
কার সঙ্গে কহিম্ কাথা ;
বাবুরি-ছাঁটাক্ মুই মিছায় দিনু আশা।
বাবুরি-ছাঁটা ॥

আসিবার কনু[১] সইন্জা বেলা[২]—
আসিলো তুই দুপোর বেলা,
সেলা[৩] হামার গাও ধোয়ার পালা ;
বাবুরি-ছাঁটাক্ মিছায় দিনু আশা।
বাবুরি-ছাঁটা ॥

। ৪১ ।

ঘরখানি বান্ধিনু বান্ধব রে,
মনের দুখতে ;
চালের খ্যাড় খসেয়া নিগাইল্[৪]
পড়িয়া বাতাসে ॥

চাটিখান্[৫] বান্ধোঁ, বান্ধব রে,
অঠেয়া[৬] বাঁশের নীলি[৭] ;
হেন কালে ছাড়িয়া গেইসে
গাভুর ব'সের আড়ী[৮] ॥

কেয়ারিখান্[৯] বান্ধোঁ বান্ধব রে
বালা-পাতো[১০] দিয়া ;
গাভুর ব'সে ছাড়িয়া গেইসে
বুকুকে শ্যালো দিয়া ॥

১ কহিলাম ২ সন্ধ্যাবেলা ৩ তখন ৪ খসাইয়া লইয়া গেল ৫ বেড়াটা ৬ উঠাইয়া ৭ বাঁশের নীল রঙ তুলিয়া অর্থাৎ ভালো করিয়া চাছিয়া ৮ এই যৌবনবয়সে (গাভুর ব'সে) বিধবা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ স্বামী মারা গিয়াছে) ৯ দরজাটা ১০ রাস্তা।

CENTRAL LIBRARY

আজি ছাইন্চাখানি বান্ধো বান্ধব রে
মনের গৈরপে[১] ;
ঘরখানি বান্ধিনু বান্ধব রে,…

তুই নয়ানের জলে রে বান্ধব
ভিজি' গেইল্ মোর পাটানী ;
কান্দিয়া কান্দিয়া বান্ধব রে
আজি পোহানু রজনী[২] ॥

। ৪৩ ।

মাছ না হায় মাছিকা না হায়[৩] বড়াই,
চিলা কেনে ঘুরে ;
মুই নারীটা ওভাগোনী
ঘরে বসি' কান্দোঁ ॥

ফুলো মইধ্যে মালতী ফুলো রে বড়াই,
সইন্ঝা হালে[৪] ফুটে[৫] ;
শেযার[৬] শিতান[৭] কলাত্ নিয়া হে বড়াই,
"পিয়া পিয়া" বলে ;
ছবা দেছোঁ[৮] তোর তুলার শিতান
স্বগ্‌গে ধোমা উঠে ,
ফুলো মইধ্যে মালতী ফুলো রে বড়াই,
সইন্ঝা হালে ফুটে ॥

স্বগ্‌গে যদি চন্দ্র নাই বড়াই,
কি করিবে তারা ;
যে নারীরো পুরুষো নাই
দিনে অন্ধিহারা ॥

১ মনের হর্ষে, গৌরবে ২ রজনী ৩ না হয়, নয় ৪ সন্ধ্যা হইলে ৫ সন্ধ্যা হইলে যেমন মালতী ফুল ফোটে, তেমনি রাত্রি হইলে শূন্য শয্যায় আমার মনে বিরহের জ্বালা ফোটে ৬ শয্যার ৭ শিরস্থান, বালিশ ৮ পোড়া দিতেছি অর্থাৎ পোড়াইয়া ফেলিতেছি ।

CENTRAL LIBRARY

। ৪৪ ।

শিবের মইচ্ছে বোলে[১]
কোলার মাইয়া[২] ;—
দুই চইক্ষের জল পড়ে ধায়া[৩] ।
শুনরে নগরিয়া নোক[৪]—
মাইয়া-মরার[৫] বড়য়[৬] শোক ॥[৭]...

। ৪৫ ।

করলা গাড়িনু সারি গে সারি
স্থাও[৮] করলা মোর নাস্তে[৯] ছেঁকে পানি[১০] :
করলা না মোর করলা ॥

শ্বশুরে দিলেক্ ঝিঁকেরে-ঝাঁকারি[১১]
ভশুরে[১২] দিলেক্ ঝাঙত্[১৩] অঠেয়া[১৪] ;
করলা না মোর করলা ॥

শাশুড়ী তুলে গণ্ডা চারি
হামারা তুলি ঢাকি রে চারি ,
করলা না মোর করলা ॥

শ্বশুরে খালেক্ সোয়াদ গে পালেক্,
ভশুরে খালেক্ সোয়াদ গে পালেক্ ;
শিবের সোয়ামী খালেক্
সোয়াদ গে নাই পালেক্ :
করলা ডিকিয়া[১৫] ভাঙ্গি' ফেলাও রে—
করলা না মোর করলা ॥

১ মরিয়াছে বলে ২ বউ। আদরের বউ বা স্বামী বুঝাইতে সর্বত্র "কোলার" অর্থাৎ "কোলের" এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যিক বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ৩ ধাইয়া ৪ নগরের লোকগণ ৫ মাইয়া অর্থাৎ বউ মরিয়াছে যাহার—সে "মাইয়া-মরা"। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ৬ বড়োই ৭ গানখানি অসম্পূর্ণ ৮ সেও, সেই ৯ ননদে ১০ জল দেয়। "পানি ছেঁকা"—বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১১ ছোটো ছোটো বাঁশের কাঠি গুঁজিয়া দিল ১২ ভাশুরে ১৩ জাঙলায় ১৪ উঠাইয়া ১৫ যে হাঁড়ীতে করলা রান্না করা হইয়াছিল।

। ৪৬ ।

মরুচের[১] গছগিলা[২] থাগেরা-থুগুরি[৩]
ফল বিস্তর ধরে ;
হাত বাড়াইতে মরুচের গছ
হালিয়া-হেলিয়া পড়ে[৪] ।
ভাগিনা ধান মাড়িয়া দে ॥

ভাগিনা গেইসে অ্যানেক দূর
খবরে নাই পাওঁ[৫] ;
আনো তো পুরওীর পাত্[৬]
নেখিয়া পেঠাওঁ ॥

উমার ভাগিনা ধান মাড়ে
আথারে-পাথারে ;
মোর ভাগিনা ধান মাড়ে
জোড়-মন্দির ঘরে ॥

। ৪৭ ।

এগিনায় কিল্-কিল্ কাদো[৭] গে
দেওরায় ভরায় মাটি ;
ভরাউক্ ভরাউক্ মাটি গে
আজিকারে আতি[৮] ॥

চাইর মাস বরিষা কান্ধে[৯] নাই মোর ছাতি ;
কোন্-বা দেওরায় অসিয়া গে
বিছাইল্ অভীল পাটি[১০] ।

১ মরিচের ২ গাছগুলি। বহুবচনে-"লা"- ৩ সুপুষ্ট, ডাগর-ডোগর ৪ নুইয়া পড়ে ৫ খবরই পাই না ৬ কলার পাতা ৭ আঙ্গিনায় থিক্‌থিক্ করা কাদা ৮ রাত্রি ৯ কাঁধে ১০ রঙ্গীন পাটি বিছাইল।

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গল-ঝঙ্গল পাটি গে
তাঁহো[১] হইল্ মোর মাটি ;
চাইর মাস বরিষা গে,
কান্ধে নাই মোর ছাতি ॥

ঘন-আউটা দুধত্[২] পড়িয়া গেইল্ মাছি ;
পড়োক-পড়োক মাছি গে
আজিকারে আতি ;
ঘন-আউটা দুধত্ পড়িয়া গেইল্ মাছি,—
চাইর মাস বরিষা গে
কান্ধে নাই মোর ছাতি ॥

হাটোত্ যায়া শুনোঁ গে হাটুয়া নোকের গালি ;
বাড়ীত্ আসিয়া শুনোঁ গে
শাশুড়ী-ননদের গালি ;
ঘর যায়া শুনোঁ গে
কলার সোয়ামীর[৩] গালি ॥

। ৪৭ ক ।

কালা কচুর নং নং ডাঁড়ি[৪]—
আন্ধিয়া থুইছুঁ[৫] হুনের ছিঁটা[৬],
জলম-ঢেনা[৭] আইসেছে[৮]—
খড়মে চালো দিয়া[৯] ॥

১ তাহাও ২ ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া দুধে ৩ কোলের স্বামীর। কাবিক বিশেষত্ব ৪ কচি ডাটা ৫ রাঁধিয়া রাখিয়াছি ৬ নুনের ছিঁটা দিয়া ৭ সারাজীবন যে অবিবাহিত থাকে, তাহাকে "জলম-ঢেনা" বলা হয় ৮ আসিতেছে ৯ খড়মের শব্দ করিয়া। অবিবাহিত দেবরের প্রতি সধবার এই উক্তি।

। ৪৮ ।

দুয়ারের আগত্ বালি গে সরু আলির ডীঘি[১],
সেই না ডীগির ঘাটোতে বালি গে অয়হা[২] ছিলান করে।
ছিলানো করিতে বালি গে হারাইল্ নাকের নতোয়া[৩] :
হারাইল্ হারাইল্ নতোয়া বালি গে,
হাম দিমো গড়েয়া[৪] ॥

ঘরতে আছে বালি গে ঝালাপড়ী[৫] শাশুড়ী ;
ঝালাপড়ী শাশুড়ী বালি তোর
হে মাইরো জোগাবে[৬] ॥

ছিলানো করিতে বালি গে হারাইল্ গলার হাঁসেলা[৭] ;
হারাইল্ হারাইল্ হাঁসেলা বালি গে,—
হাম দিমো গড়েয়া ॥

ঘরতে আছে বালি গে কুটুনী ননন্[৮] ;
কুটুনী না ননন্ বালি গে—
হে মাইরো জোগাবে।
হারাইল্ হারাইল্ হাঁসেলা বালি গে—
হাম দিমো গড়েয়া ॥

। ৪৯ ।

বাবার ঘরের পারেয়া জড়া[৯]
হাম্‌শি'[১০] এগিনায় পড়ে ;
মুঠি-মুঠি সৈষা ফেলেয়া দেওঁ[১১]
খায়া ভুল্‌কি মারে[১২] ॥

১ বাড়ীর দুয়ারের সম্মুখেই সুন্দর পাড় বাঁধানো দীঘি ২ রহিয়া ৩ নথ ৪ গড়াইয়া ৫ যে শাশুড়ী গালাগালি করিয়া কান ঝালাপালা করিয়া তোলে। একটি গালি ৬ প্রহার করিবে ৭ গলার হাঁসুলি ৮ ননদিনী ৯ পায়রা জোড়া ১০ উপুড় হইয়া, হুম্‌ড়ি খাইয়া, ঘনঘন ১১ সরিষা ফেলিয়া দিই ১২ পেখম ধরে, লোটন ধরে।

সজনীর কমর কেইসা হালে[১]
সজনীর হাত ঝুম্-ঝুম্ করে ;
বাবার ঘরের পারেয়া জড়া
হাম্‌শি' এগিনায় পড়ে ॥

কে কে যাবেন হাতীশালা
হাম্ সে[২] যাইমো[৩] সঙ্গে ;
উড়িয়া মাথা গুঁড়িয়া ভাঙ্গিম্[৪]
তাঁহো যামো গাবুরার সঙ্গে[৫] ॥

। ৫০ ।

মুঠি-মুঠি মোর মথুয়া শাগ[৬]
দনো মুঠি[৭] মোর তেঁতেলিরো পাত[৮] ;
কি গুনা মোর কে ॥

এই সন আসিবে শাঙেনা[৯]
কিনিয়া দিবে মোক্ পাছোড়া[১০] ;
কি গুনা মোর কে ॥

সেই না পাছোড়া পায়া
নাচে বালি মোর কাঙ্খালি হালেয়া[১১] ;
কি গুনা মোর কে ॥

১ কেমন করিয়া হেলে, নাচে। হিন্দী প্রভাব লক্ষণীয় ২ আমি সে ৩ যাইব ৪ স্ত্রী প্রেমিক-গৃহে যাইবার জন্ম নিজেই হাতীশালায় যাইয়া, হাতীর পিঠে চড়িতে চাহিতেছে। স্বামী তাহাকে প্রহারের ভয় দেখাইতেছে ৫ স্ত্রী বলিতেছে, প্রহারের ভয় দেখাও, তবুও আমি প্রেমিকের (গাবুরার) সঙ্গে যাইব। বিবাহ-গীতি রূপেও এই গানখানির প্রথম স্তবকটি পাইয়াছি ৬ বথুয়া শাক ৭ দুই মুঠি ৮ তেঁতুলের পাতা ৯ উপপতি, অবৈধ প্রণয়ী, দ্বিতীয় পতি ১০ উত্তরীয় ১১ কোমর দোলাইয়া। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গানখানির বিচিত্র কথান্তর পাইয়াছি।

উঠানী

। ৫১ ।

নয়া কুলাখান্ বেতের বান্[১] গে—
বেতের বান্ ;
কট্কী[২] দিলেক্[৩] ধান।
ভাতার শুনিলে তোক ডাঙ্গাবে[৪] গে—
এই কুনিক্[৫] ধান দিয়া নাচালো[৬] গে,
শিকুই-ঢেলী[৭]—
ভাতার শুনিলে তোক ডাঙ্গাবে ॥

। ৫১ ক ।

যারে বাড়ীত্[৮] যাছি[৯] গে আই,
তাহে কহছে[১০]—ধান গে নাই ;
গসা হয়া পালাছে[১১]—
নেন্দুর[১২]-নেকেনাই[১৩] ॥

যাত্-সিনানী : নামানী

। ৫২ ।

তিস্তাবুড়ী সাজেছে
সোনার খড়ম বাজেছে[১৪] ;
গালাত্[১৫] ঝিন্ঝিরি মালা[১৬]—
পায়ে নেফুর[১৭] বাজেছে ॥

১ নূতন কুলাখানি বেত দিয়া বাঁধা ২ কৃপণ মহিলা ৩ দিল ৪ প্রহার করিবে ৫ এইটুকু মাত্র ৬ নাচাইলি ৭ যাহার কোমরের সূতা ঢিলা করিয়া বাঁধা। ইহা এক কাবিক গালি। মেছেনী গায়িকাদের অল্প ধান দিলে, গৃহিণীর নিন্দা করিয়া "উঠানী" গান রূপে ইহা গীত হইয়া থাকে ৮ যাহারই বাড়ীতে ৯ যাইতেছি ১০ সেই-ই কহিতেছে ১১ পলায়ন করিতেছে ১২ নেংটি ইঁদুর ১৩ ধেড়ে ইঁদুর ১৪ স্বর্গ হইতে খড়ম পায়ে দিয়া তিস্তাবুড়ী মর্তে অবতরণ করিতেছেন, তাই খড়ম বাজিতেছে ১৫ গলায় ১৬ মালা বিশেষ ১৭ নূপুর।

যাত্-সিনানী : ভুরাভাসানী

। ৫২ ক ।

বাড়ীর কেলা[১] কাটিয়া গে
ভুরা সাজামো[২] গে :
কোর্‌তো নদী[৩] হেলিয়া[৪] হমো[৫] পারো গে ॥

। ৫২ খ ।

ওই দিয়া[৬] যাছে[৭]
তিস্তাবুড়ী উড়িয়া রে ;—
ফুল নেও তো বাঁটিয়া ॥

১ কলাগাছ ২ সাজাইব, ভেলা বানাইব ৩ করতোয়া নদী ৪ অনায়াসে ৫ হইব ৬ ওই দিক দিয়া ৭ যাইতেছে। মুসলমানগণ মুরগীর গলায় এক টুকরা শাদা কাপড় বাঁধিয়া, তিস্তাবুড়ীর নামে তাহা উড়াইয়া দিয়া, এই গান করে।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় অধ্যায়

॥ শিবখেলা ॥

। ৫৩ ।

শিবো শিবো বন্দো গঁসাই[১]
ভোলা মহেশ্বর ।
গাইলে শিবেরো বাণী
যমক্ নাইরো[২] ডর ॥
ছালা ভরি' মালা শিবের
প্যাট ভরি' মন্তর ॥

সাকালে[৩] বইসে ঠাকুর সেবা
বেলা যায় গড়িয়া ।
মুণ্ড হস্তে দিয়া কান্দে
গঙ্গা-দুর্গা ॥

গঙ্গা-দুর্গা কান্দে
কাতিক-গণরাই ।
হাবাতিয়া শিবের ঘরে
অন্নমুঠি নাই ॥

অন্ন অভাগে[৪] চণ্ডী
হইল দিগম্বরী ।
তৈল্ল বিনা মাথার কেশ
বান্ধিতে না পারি ॥

১ গোঁসাই ২ নাই ৩ সকালে ৪ অভাবে ।

CENTRAL LIBRARY

ভাশুর আইলো, শ্বশুর আইলো
অন্নপারাশন তাত্[১]।
মোরো চণ্ডীর শাংকা[২] নাইরো
নইজ্জা নাগে তাত্ ॥

গাঞ্জা খায় স্যারে স্যারে[৩]
বিষেরে ভোজন।
আড়াই মুঠি চাউল হলে
হয় শিবের আন্দন ॥

আন্দিয়া-বাড়িয়া দিলেক্
ভোলা শিবের আগে[৪]।
আড়াই মুঠি চাউলের ভাত খায়
গাঞ্জারো ধমকে[৫] ॥

সেই না শিবের বাণী
কি বলিব হায়।
কাতিক-গণো দুইটি ছাইলা
ভোকেতে নালায়[৬] ॥

কান্দিয়া কান্দিয়া ছাইলা
ঢেঁকিশালা যায়।
চাউলের গুণ্ডা বলি' ছাইলা
ভাঙ্গের গুণ্ডা খায় ॥

সাতমাসিয়া ছাইলার নগত্
কোন্দলো নাগায়।
কোন্দলো ঘুচাইতে
চণ্ডীর দিনো যায় ॥

১ তাহাতে আবার অন্নপ্রাশন ২ শাঁখা ৩ সেরে সেরে গাঁজা খায় ৪ সম্মুখে ৫ গাঁজার নেশার চোটে ৬ ক্ষুধায় ঝিমাইতে থাকে।

॥ হুদ্‌মা, হুহুমা, হুহুম্‌চুকা, জলভুকা ॥

। ৫৪ ।

আগ দুয়ারী কে রে মোর
পাছ দুয়ারী কে রে ;
আসিছে[১] হুহুমা—
খুলিয়া দুয়ার[২] খুলিয়া দে রে ॥

হাত ধরোঁ[৩] তোর রে কুকুর
পাও ধরোঁ তোর রে ;
ঘড়িক্‌-ঘড়িক্[৪] রইক্ষা[৫] কর্‌
হুহুমা সন্দাইল্[৬] ঘর রে ॥

ঘরত্‌ সন্দেয়া হুদ্‌মা
নাই কাড়িল্‌ আও[৭] রে ;
শিতানের আগত্[৮] পানের বাটা
চুন তাকেয়া[৯] খা'রে ॥

। ৫৪ক ।

আসিল্‌ হুহুমা দেও
দুয়ার ছাড়িয়া দেও ;
বেটা ছাওয়া নোকলা[১০] তমরা
পালাও রে পালাও ॥

১ আসিয়াছে ২ বাড়ীর সম্মুখের দরজা ৩ ধরি ৪ একটু ৫ রক্ষা ৬ প্রবেশ করিল
৭ কথা বলিল না ৮ শিয়রের সামনে ৯ হাতে টিপিয়া ১০ লোকেরা

৫৪ ও ৫৪ক সংখ্যক গান দুটি বাড়ী ঢুকিবার সময় গীত হয়।

CENTRAL LIBRARY

। ৫৪খ ।

মেঘী গেইছে[১] সোদর খাবা'[২]
মেঘা, হয় রে হয়[৩] ;
যা কেনে মেঘা,
পব্বত ফাটেয়া[৪] জল আনেক্ নে'[৫]
ছোয়া দুইটা ভোকে নালায়[৬] ।
মেঘা, হয় রে হয় ॥
খোড়ায়-গুটিক[৭] চাউল আছে রে হদুমা[৮],
মেঘা হয় রে হয় ॥

। ৫৪গ ।

আরে ওরে নিদয়া ম্যাঘ,
স্থাখ্ নজর ঘুরিয়া[৯] ;
ওরে তুই আবানে[১০] নারীর বুক
চিরল্ ফাটিয়া[১১] ॥

আরে ওরে নিঠুর ম্যাঘ রে
আরে ওরে কটুর[১২] ম্যাঘ রে,—
আরে ওরে বাউদিয়া ম্যাঘ
আগুনে ভাজিলু ।—
ওরে মোক্ নারীক্ ফেলেয়া
কোন্ স্থাশান্তরী হলু ॥

১ গিয়াছে ২ আত্মীয়ের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াকে 'সোদর খাইতে যাওয়া' বলা হয় ৩ হায় রে হায় ৪ পর্বত ফাটাইয়া ৫ জল আন্ না কেন ৬ ছেলে দুইটি ক্ষুধায় ঝিমাইতেছে ৭ সামান্ত চারটি ৮ মেঘকেই 'হদুমা' বলা হইতেছে ৯ চোখ ফিরাইয়া ১০ আবিনে, তুই বিনা ১১ ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল ১২ কঠোর ।

CENTRAL LIBRARY

। ৫৫ ।

হুদুমের ঘর সাত ভাই
কারোর দেখং[১] পানি নাই।
"বইল্‌-পেটী[২]" ম্যাঘ রে
তুই "খটাম্বর"[২] ;
মোর গাও ধোয়া জল দেওং[৩]
জল পান কর্‌ ॥

। ৫৫ক ।

আধারাত্তি মোক্‌ পাঠালু[৪] মেঘা
হয় রে হয়[৫] ;
মেঘা, যা কেনে পব্‌বত ভাঙিয়া জল
আনেক্‌ নে'[৬] ॥

হরিয়ার ঘর দুই ভাই
কারোয়[৭] দেহায়[৮] পানি[৯] নাই ;
ওগে হরিয়া,
দে জল তুই ধরিয়া ॥

। ৫৫খ ।

ওহো রে হরিয়া[১০],
জল নিকা ধরিয়া[১১] ।

১ দেখি ২ গালি বিশেষ ৩ দিই, দিতেছি। গানখানিতে হুদুমকে ধিকার দেওয়া হইতেছে ৪ পাঠাইলি ৫ হায় রে হায় ৬ আন্‌ না কেন ৭ কাহারও ৮ দেহে, পুরুষের অঙ্গ বিশেষে ৯ এখানে বীর্য, রেতঃ ১০ নাম বিশেষ। বহুগানেই এই নামটি পাইতেছি। ইহাকেই জল আনিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে এবং বহুগানে ইহাকে অকথ্য, অশ্রাব্য, অলেখ্য ভাষায় গালি দেওয়া হইয়াছে সময় মত জল না আনিবার জন্য ১১ জল ধরিয়া লইয়া যা। অর্থাৎ জল লইয়া আয়। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব।

মেঘা গেইছে[১] জলো গে আনিবা'[২] ;
চট্ করিয়া ভাত আন্ধেক গে ঝল্‌মলী[৩]
আসিল্ দেওয়ার পানি।
উলু—লু—লু ॥

। ৫৫গ ।

আয় রে হাড়িয়া ম্যাঘ[৪]
আয় পর্বত ধায়া ;
তোক্ ম্যাঘক্ বান্দি' থুইম্
মাথার ক্যাশ দিয়া[৫] ॥

আয় রে কালিয়া ম্যাঘ
আয় পর্বত ধায়া ;
তোক ম্যাঘক্ বান্দি' থুইম্
গালার মালা[৬] দিয়া ॥

। ৫৫ঘ ।

হুদুম, হুদুম রে
হুদুম কি কাম করে রে ;
ক্যাশ দিয়া ঘর ছায়া
হুদুম ভিজি' মরে[৭] রে ॥

১ গিয়াছে ২ আনিবার, আনিতে ৩ কাহারও কাহারও মতে ঝল্‌মলী মেঘরাজের কন্যা। বিদ্যুৎ ৪ বায়ুকোণকে "হাড়িয়া কোণ" বলা হয়। হাড়িয়া কোণের মেঘ। মনে হয়, এই 'হাড়িয়া' হইতেই 'হরিয়া' আসিয়াছে। হরিয়ার উল্লেখ অসকৃৎ পাইতেছি ৫ মাথার চুল দিয়া তোকে বাঁধিয়া রাখিব ৬ গলার মালা ৭ ভিজিয়া মরে। হুদুমকে ধিকার দেওয়া হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

। ৫৬ ।

পানি না পড়ে রে ইমিকি-ঝিমিকি[১]
হাড়িয়া মেঘেরো[২] পানি ;
আর কণেক্ নাচেক্[৩] রে
হাড়িয়ার বহিনী[৪] ॥

দশে দিবে দশো গে আনা
হাড়িয়া দিবে টাকা,—
গে হাড়িয়ানী ॥

। ৫৬ক ।

যাবার বেলা গেলেন বাবা রে
হাটুখানি জল ;—
আসিবার বেলা হয়া গেইল্ পহর[৫] ॥

শ্বশুর বাড়ী গেলো বাবা রে,
কি কি দানে পালো :
বুড়া শ্বশুর দিলে ধেনু-গাই ;
শাশুড়ী দিলে ইচ্ছামতী কইনা দান ;
পাঁচো বর্ধনায়[৬] দিলে পাঁচো না ছিরি-আংটি[৭] ;
পাঁচো বর্ধনীত্ দিলে পাঁচো না নেউকা[৮] ।
নেউকাত্ চড়িয়া গেইল্
পারো না হয়া রে ॥

১ রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়ে ২ বায়ুকোণকে "হাড়িয়া কোণ" বলা হয় ৩ আর একটু নাচ, তাহা হইলে, এখন রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িবে ৪ হাড়িয়া ও হাড়িয়ানী ভাই-বোন ৫ সাঁতার। আসিবার সময় সাঁতার দিবার মত জল হইয়া গেল ৬ স্ত্রীর বড়ো ভাইকে 'বর্ধনা' এবং তাহার স্ত্রীকে 'বর্ধনী' বলা হয় ৭ শ্রী-আংটি ৮ নৌকা ।

CENTRAL LIBRARY

। ৫৭ ।

হুদুমার বিয়াও[১] হয়—
সাত বিশ মাটি দানত্ পায়[২] ।
হুদুমার বিয়াও হয়—
সাত হাল গরু দানত্ পায় ॥

। ৫৮ ।

হুদুমা, আয়, আয়, আয় রে—
হাল্ বহাবার[৩] যাই ;
তোক্ কি আরো কবার নাগে[৪]
তোর কি ক্ষমে[৫] নাই ।
হুদুমা আয়, আয়, আয় রে ॥

সনার নাঙ্গোল, উপার ফাল
হুদুমা ঠাকুর জুড়িসে[৬] হাল্ ;
হাঁড়িয়া ম্যাঘের[৭] আসিল্ জল—
নাঙ্গোল-জোঙ্গাল ভাসিয়া গেইল্ ।
হুদুমা, আয়, আয়, আয় রে ॥

হাঁড়িয়া কোণাত্ নাগিসে ম্যাঘ[৮]
মোর মনের হুর্-হুর্ ছাথ্—
হুদুমা, আয়, আয়, আয় রে ॥[৯]…

১ বিবাহ ২ সাত বিশ পরিমাণ জমি যৌতুক পায় ৩ বহিবার ৪ কহিতে হইবে ৫ স্মরণে ৬ জুড়িয়াছে ৭ বায়ুকোণের মেঘের ৮ মেঘ জমিয়াছে। মেঘ করাকে 'মেঘ লাগা' বলা হয়। বাগধারার বিশেষত্ব ৯ শেষাংশ গায়িকার স্মরণে নাই ।

CENTRAL LIBRARY

। ৫৮ক ।

ওই সনারে[১] নাঙ্গল, উপারে[২] জোঙ্গাল,—
হুদুমা বয় হালো রে ;
পানি বিনা মরে হুদুমা
ধাড়াই আছেড়েয়া[৩] রে ॥

হুদুমী যায় চাউল-পানি ধরিয়া[৪] রে ;
মোর হুদুমা মরে
ধাড়াই আছেড়েয়া রে ।
সনার ঝাড়-জঙ্গল[৫] মারিয়া রে
হুদুমা ফেলাইল্ ধানো[৬] রে ;—
স্তাও[৭] ধান মোর গেইল্
বানায় ভাসিয়া[৮] রে ॥

। ৫৮খ ।

হালুয়া যে কান্দেছে[৯]
হালের ঘোষাত্[১০] বসিয়া রে ;
জলো দে'রে হুদুমা
জলো দে ॥

১ সোনারই ২ রূপারই ৩ খড় আছড়াইয়া ৪ ক্ষেতে হুদুমা কাজ করিতেছে, হুদুমী তাহার জন্য চাউল ভাজা ও জল লইয়া যায় ৫ সুস্পষ্ট অর্থ নাই। পঙ্‌ক্তির পাদপূরণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে, 'গভীর জঙ্গল' এই অর্থে নেওয়া চলে ৬ রোপণ করিল ৭ সে-ও, সেই ৮ বানে ভাসিয়া। ইহার অর্থ দুইটি। প্রথম অর্থ : কষ্ট করিয়া জমি চষিয়া যে ধান ফেলা হইয়াছিল, অনাবৃষ্টিতে তাহা নষ্ট হইয়া গেল। দ্বিতীয় অর্থ : প্রার্থনায় দেবতা তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি দিয়াছেন, তাই অনাবৃষ্টির মধ্যেও বন্যা হইয়াছে ৯ কাঁদিতেছে ১০ লাঙলের ফাল চালাইবার দরুণ জমিতে যে দাগ পড়ে, তাহাকে 'হালের ঘোষা' বলে।

মাড়েয়ানী[১] নাচেছে
উদয়-নাঙ্গট[২] হয়া রে ;—
টানো দে'রে হুদুমা
টানো দে ॥

মাড়েয়ানী নাচেছে
মাথাত্ ঘোঙ্গর[৩] দিয়া রে ;—
টানো দে'রে হুদুমা
টানো দে[৪] ॥

। ৫৮গ ।

যার হালুয়া[৫] আগে গেইসে
তার হালুয়া পাছে গে ননন্-বাই[৬] ;
সোনার নাঙ্গল-জোঙ্গাল
উপারে পেনটি[৭] গে ননন্-বাই ॥

তেরলা বাঁশের[৮] মই—
বারো চাষের ভুঁইয়ো রে ইন্দ্ররাজা
তেরো চাষের মই ;
তাঁহো[৯] তুই না উঠিস রে ইন্দ্ররাজা
তুই ডুবালো[১০] রে মই ॥

১ যাহার বাড়ীতে হুদুমা পূজা ও নাচ-গান হইতেছে, তাহাকে 'মাড়েয়ানী' বলে, গৃহিণী ২ উদাম ল্যাংটা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ ৩ ঘোমটা ৪ মাড়েয়ানীর সারা দেহে কোন আবরণ নাই, কেবল মাথায় একটু ঘোমটা আছে, ওগো হুদুমা, তাহাও তুমি টান দিয়া সরাইয়া লও (এবং তাহার দেহ ভোগ করিয়া তৃপ্ত হও, আমাদের বৃষ্টি দাও) ৫ হাল বহে যে, কৃষক ৬ ননদিনী। বাই—দিদি ৭ যে লাঠি দিয়া গরু খেদানো হয়, তাহাকে 'পেনটি' বলে ৮ এক ধরণের লম্বা গাঁট-ওয়ালা বাঁশ ৯ তবুও ১০ নষ্ট করিলি।

CENTRAL LIBRARY

এ ঘাট দরিয়া, ও ঘাট দরিয়া
কোন্‌ঠে[১] পাম্[২] মুই সোনার নৌকা রে
কাঙাল বাপ-মাও—
কোন্‌ঠে পাম্ মুই সোনার নাও ;
এ দরিয়া হাঁটিয়া হইম্ পার ॥

। ৫৯ ।

গোদা মাছ মারে
বসিয়া মারে কই ;
খাবার বেলা খায় রে গোদা
কালা কচুর বই[৩] ॥

[ইহার পর উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক সামান্য অভিনয় হয়

জনৈকা ॥ গোদা গে গোদা, কি করেছিত্[৪] গে ?
গোদা ॥ মাছ মারেছুঁ[৫] ।
জনৈকা ॥ কি মাছ পালো[৬] ? দে কেনে মোক দুইটা ।
গোদা ॥ মাছ নাইকে[৭] ।
জনৈকা ॥ কেনে কি হইল্ ? মাছ নাই কেনে ?
গোদা ॥ পানিয়ে নাই[৮] । মাছ আসিবে কিতায়[৯] ?
জনৈকা ॥ হ' হ' ! জলে নাই, ফাঁকোতে[১০] মাছ ধরেছিত্ তুই ! খাছিত্ কি, কহ দি[১১] ?
গোদা ॥ খাছুঁ আর কি, এই কালা কচুর নতিলা[১২] !
জনৈকা ॥ থু থু ! কচু খাচিত্ গে । নে নে, খা এইটা খা—

[অশ্লীল দেহভঙ্গী

১ কোন্ স্থানে ২ পাইব ৩ কচুর গোড়া হইতে শিকড়ের মতো লম্বা একপ্রকার ডাঁটা বাহির হয় । তাহাকেই বলে "কচুর বই" ৪ করিতেছিস ৫ মারিতেছি ৬ পাইলি ৭ নাই-ই । নিশ্চয়ার্থক 'ই' 'কে' হইয়াছে ৮ জলই নাই ৯ কি জন্যে, কেমন করিয়া ১০ এমনি-এমনি ১১ বল্ দেখি ১২ 'বই'কেই 'নতি' বা 'লতি' বলে ।

। ৫৯ক ।

হুদুম মারে মাছ,
হুদুমানী ধরে খোলোই ;—
বেশ শবাইসে[১] খোলোই-ধরীটা[২] ।
মাছ নিবেন গে টাড়ীর পড়োশ্ ভাই[৩],
নয়া বিলের মাছ, "—" ত্[৪] মারা ॥

। ৬০ ।

হিল্-হিলাছে[৫] কমরটা মোর
শির্-শিরাছে[৬] গাও ;
কোন্ঠেকেনা[৭] গেলে এলা[৮]
হুদুমার দেখা পাও[৯] ॥

পাটানীখান্[১০] পড়েছে খসিয়া,—
আইসেক্ রে হুদুমা-দেওয়া[১১]
তোর বাদে[১২] মুই আছো রে বসিয়া ॥

ডিং- সল্-সল্ কমরটা[১৩]
তাতে নাই মোর ভাতারটা ।
করো কি মুই কাঁয় বা কয়
কোন্ঠে গেলে দেখা হয় ;
দেখা হালে[১৪] দেহাটা[১৫] জুড়ায় ॥

১ শোভা পাইয়াছে ২ মাছ রাখিবার বাঁশের পাত্রটি ধরিয়াছে যে, হুদুমানী ৩ পাড়ার পড়শী ভাই। হুদুমা-হুদুমানী পাড়ায়-পাড়ায় মাছ বিক্রয় করিতেছে ৪ এই মাছ স্ত্রীলোকের "অঙ্গ বিশেষে" মারিয়াছি ৫ হিল্হিল্ করিতেছে ৬ শির্শির্ করিতেছে ৭ কোন্খানে ৮ এখন ৯ পাই ১০ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ ১১ হুদুমা দেবতা ১২ জন্যে ১৩ সরু লিক্লিকে কোমরটি ১৪ হইলে ১৫ দেহটা।

CENTRAL LIBRARY

। ৬১ ।

ও ধান ভুকাইম্[১] নাতেন্ কি[২] ।
দুই বগলে দুইটি বাহা[৩] ॥
গাহাইন্[৪] বলে সোলংসোটং[৫]
নিত্যে ভুকাও ধান ;
ছাম্[৬] বলে, পাতিয়া থুইস্যু[৭]
যেইঠে-সেইঠে হান্[৮] ।
ও ধান ভুকাইম্ নাতেন্ কি ॥

ধান কাঁড়া গেইল্, চাউল কাঁড়া গেইল্,
মাইল্কা[৯] না গেইল্ কাঁড়া ;
মাইল্কা কাঁড়াইতে নাগে
মুরগী জড়া-জড়া[১০] ।
ও ধান ভুকাইম্ নাতেন্ কি ॥

। ৬২ ।

হুদুম ম্যাও, হুদুম ম্যাও,
এক ছল্কা পানি ম্যাও ।
ছুয়ায় আছি[১১] নাই পানি—
ছুয়ায়-ছুঁতি বারা বানি[১২] ॥

কালা ম্যাঘ, ধওল ম্যাঘ
ম্যাঘ সোদর ভাই[১৩] ;
এক ঝাঁক পানি ম্যাও
গাও ধুবার চাই ॥[১৪]

১ ধান ভানাকে "ধান ভুকানো" বলে ২ ধান ভানিব নয়তো কি ৩ দুই বগলে দুইটি বাহু ৪ ধান ভানিবার মুষলটিকে "গাহাইন" বা "পাইন" বলে ৫ আঘাত-জনিত ধ্বনি ৬ যাহার মধ্যে ধান রাখিয়া ধান ভানা হয় তাহাকে "ছাম্" বলে ৭ থুইয়াছি ৮ যেখানে খুশী, সেইখানে হানো ৯ ময়লা ১০ জোড়া-জোড়া ১১ অশুচি অবস্থায় আছি ১২ ধান ভানি ১৩ মেঘকে আত্মীয় রূপে সম্বোধন করা হইতেছে ১৪ গানখানিতে হুদুমার নিকট বৃষ্টি ভিক্ষা করা হইতেছে ।

। ৬২ক ।

দেওয়া বাড়ি' আয় রে[১]—
উড়িয়া টোকা-টোপা[২] :
আধোয়া্ মইলাং[৩]—
গাও ধোয়া যাউক রে।
দেওয়া বাড়ি' আয় রে ॥

। ৬২খ ।

ওহো রে হল্‌দিয়া ম্যাঘ[৪],
দেহার দুর্গতি ছাখ্ ।
দেহাত্ পইচ্ছে ছানি[৫]
গাও ধোয়ার দে পানি ॥
ওহো রে কালা ম্যাঘ,
দেহার দুর্গতি ছাখ্ ।[৬]...

। ৬৩ ।

চল্ রে বাপোই,
জোলপই খাবা'[৭] যাই ;
ওত্তি যায়া[৮] হুদুম-চুকা খেলাই ।
ওরে জোলপই খামো য্যামন-ত্যামন,
হুকুচুকু হুকুচুকু হুদুম-চুকা খেলাই ॥

১ বৃষ্টি, আগ বাড়িয়া আয় রে ২ টপ্-টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ুক ৩ মরিলাম ৪ হলুদ মেঘ ৫ দেহে নোংরা লাগিয়াছে ৬ এইরূপে বিভিন্ন রঙের মেঘের নাম করিয়া জল প্রার্থনা করা হয়। গানখানি অনুষ্ঠানের শেষ গান। অনুষ্ঠান-শেষে নদী কিংবা পুকুরে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতে হয়। অনুষ্ঠানের শেষে স্নান করিতে করিতে এই গানটি গাওয়া হইয়া থাকে ৭ জলপাই খাইতে ৮ ওই দিকে যাইয়া, ওই স্থোথা যাইয়া। গানখানি পুরুষেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গাহিয়া থাকে। ইহা স্পষ্টতই 'হুদুম-চুকা' খেলিতে যাইবার জন্ম আহ্বান। মেয়েদের মত পুরুষরাও ধানের জমিতে যাইয়া উলঙ্গ হয় এবং নানান গান গাহিয়া থাকে। তবে, মেয়েদের মতো পুরুষদের গানে আনুষ্ঠানিকতার বালাই তেমন নাই।

CENTRAL LIBRARY

। ৬৪ ।

শিব রে শিব[১] সাজে—
কানা খড়িটা ঝুমুর বাজে[২] ।
বাজুক ঝুমুর বাজুক তাল—
এই গিরিটা[৩] জগৎ ভাল্[৪] ।
জগতেরে[৫] উনিঝুনি[৬]
সোনায়ে[৭] বান্ধিছে টানি' ।
সোনারে[৮] কেকুয়া হার[৯]
আসুক বৃষ্টি, আসুক ঝড়,
না আসিলে শিবের দোহাই
বেলা নাই, বেলা নাই—
চল রে সবাই বাড়ী যাই ॥

১ হুদুমার পরিবর্তে 'শিবের' নাম উল্লিখিত হইয়াছে ২ শিব বৃষ্টি দানের জন্যে সাজিতেছেন, তাঁহার পায়ের নূপুর বাজিতেছে ৩ গৃহস্থ। যাহার বাড়ীতে এই গান গাওয়া হইতেছে ৪ সেই গৃহস্থ জগতের মধ্যে ভালো ৫ জগতেরই, জগতের ৬ সুস্পষ্ট অর্থ নাই ৭ সোনাদ্বারা ৮ সোনার, সোনারই ৯ কেয়ূর ও হার।

CENTRAL LIBRARY

॥ জিতুয়া ॥

নামানী

। ৬৫ ।

এখন কি করি, এখন কি করি—
কোন্ বেটী চুয়া খুঁড়িল্[১],
বলিতে না পারি ;—
কোন্ যুগে জিতুয়া ঠাকুর পূজিল্[২] ।
ভাবিয়া দেখ মনে রে মন ॥

মাইলানীর[৩] ছাতির উপর
ডেলার উপর[৪] কেলা[৫],—
বন্দনা করুঁ[৬] তোক্ এই বেলা ;
বন্দোঁ[৭] ঠাকুর জিমূতবাহন ॥

কেউটিয়া আবণ

। ৬৬ ।

ও মোর কাকা গে,
কেমন লাখা[৮] জুড়িলেন কইনা[৯]—
ছান্[১০] ফেলাইতে হেঁসফেঁসাছে[১১] মোর ন'দারী[১২] ;
পসন্-পাসান্ করিয়া দেখুঁ[১৩]
মোর ন'দারী হইসে[১৪] গাভরী[১৫] ॥

১ কূপ খনন করিল ২ পূজা করিল ৩ যে পূজা করিতেছে। অর্থাৎ 'মাড়োয়ানী'র ৪ ডালার উপর ৫ কলা ৬ বন্দনা করি ৭ বন্দনা করি ৮ কেমন ধরণের ৯ বিবাহের জন্য পাত্র-পাত্রী স্থির করাকে "জোড়া" বলে। যেমন, "কইনা জোড়া" ১০ গোবর ১১ হাঁসফাঁস করিতেছে ১২ নবদারা ১৩ ঠাহর করিয়া দেখি ১৪ হইয়াছে ১৫ গর্ভবতী।

CENTRAL LIBRARY

ওকি আহা মরি রে,
মান্ষির ন'দারী কেমন বেড়ালে
দম্কিয়া ফেলায় পাও[১] ;
মোর ন'দারী ধীরে বেড়ালে
হেঁসফেঁসাছে গাও।
আর চারি দিনে মোর ন'দারী
গে হে কাকা,
হোবে গে ছোয়ার মাও[২] ॥

। ৬৭ ।

শাবাইশ[৩] দাদা তোর কাড়োয়ার পসন[৪]—
কইনা মিলিল্ দাদা মনের মতন ;
চিতের মিটিল্ আস্বাদন ॥

ওকি আহা মরি রে,
ওরে যেইনং কইনার দেহার বান্[৫]
দল্-দল্ পাছিলাখান[৬] ;
খুবে[৭] জানে ভাতারের মান,
ছামে-ছামে ভুকায় ধান ;
দেখিয়া নদারীর মান-গেয়ান,
হামার বুড়া খুশী হইছে ;
সাতবার করেছে পসন[৮] ॥

। ৬৮ ।

কলির কইনালার[৯] নয়া ঢঙ্
শুনেক্ আবো[১০] দিয়া রে মন ;
মোক তো লাগে কুলসন্[১১] ॥

১ হুম্-হুম্ করিয়া পা ফেলে ২ ছেলের মা ৩ শাবাশ ৪ তুই ,ঘটকের পছন্দ ৫ দেহের বাঁধুনি ৬ নিতম্বটি ৭ খুবই ৮ সাতবার করিয়া দেখিতেছে পছন্দ করিতেছে ৯ কন্যাগুলির ১০ ঠাকুরমা ১১ কুলক্ষণ। আমার নিকট কুলক্ষণ বলিয়া মনে হয়।

ওকি আহা মরি রে,
হাট হাতে[১] আসিল্ যদি
আগত্ দিলে জ্যাবেত্ হাত[২] ;
বিড়ি-শালাই-গুয়ার বাদে[৩]
নাগে ফেলাইল্[৪] উৎপাত ॥
হিলা[৫] খরচ য্যামন-ত্যামন
আগত্ নাগে বিড়ির মঠা[৬] ;
ফিকিয়া ফেলাছে নাইতে[৭]
গুয়া-পান-সাবোন-ছটা[৮] ॥

ওকি আহা মরি রে,
একদিনা নাই আনু বিড়ি[৯]
গসা হইসে মোর নদারী ;
সেলা[১০] মোক আও না কাড়ে[১১]
বিছিনাত্ দেখাছে তাল।
হা মোরতি[১২] গে নাই ঘুরে
হায়-নিকাশ[১৩] ফেলাছে মন মোর
পহরে গে পহরে ॥

তাম্শাকয়া গান

। ৬৯ ।

তাম্মা নাইরো[১৪], তুলসী নাইরো
টঁড়া সাপের[১৫] মাথা ;
নয়া অস্তাদের[১৬] তামশা
নিক্লে না[১৭] রে বাবা ॥

১ হইতে ২ আগেই পকেটে হাত দিল ৩ জন্যে ৪ লাগাইয়া ফেলিল ৫ এই সমস্ত ৬ মুঠা, প্যাকেট ৭ নয়তো ৮ সাবান-সোডা ৯ একদিন বিড়ি আনি নাই ১০ তখন ১১ আমার সহিত কথা কহে না ১২ আমার দিকে ১৩ দীর্ঘনিশ্বাস ১৪ তামা নাই ১৫ ঢোঁড়া সাপের ১৬ ওস্তাদের ১৭ বাহির হয় না।

CENTRAL LIBRARY

। ৬৯ক ।

আড়ী-গিলার[১] সঙ্গে ভাই রে
ভাতার-আউলী[২] না পারে ;
এ্যাখো আড়ীর এ্যাখো বাহার[৩]
বাহা ঢুলিয়া[৪] বেড়াছে[৫] ॥

য্যামন আড়ীর ঢঙ্-চলন
তেরিয়া খঁপা[৬] ;
চেনা-রাঙা-কালা-ফোতা[৭]
আড়ী-গিলায়[৮] পিন্ধেছে ॥

য্যামন আড়ীর ঢঙ্-চলন
সদায়[৯] উমার[১০] হাসি-রঙ্ ;
কাঁহো করে নাড়ুর দকান[১১]
কাঁহো বেচায় গুয়া-পান ।
ওরে মোটী-ধাউলী[১২] আড়ীটা
সগারে প্রধান[১৩] ॥

ওইটা মাইয়ার[১৪] কাথা কাঁহোয়
অঠেবায় না পারে[১৫] ;
ঢকেতে চেঙ্গেড়াগিলা
উয়ার[১৬] পাছত্ ঘুরে ॥

১ বিধবা-গুলির ২ "ভাতার-ওয়ালী" এই অর্থে, সধবা ৩ এক-একটি বিধবার এক-এক রকম বাহার ৪ বাহু ঢুলাইয়া ৫ বেড়াইতেছে ৬ বাঁকা খোঁপা ৭ বিভিন্ন রঙের 'পাটানী'। বিধবা হইয়াও সাদা 'পাটানী' পরে না ৮ বিধবাগুলি ৯ সদাই ১০ উঁহাদের ১১ কেহ নাড়ুর দোকান করে। রাজবংশী বিধবারা হাট-বেসাতি করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। বহু গানে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি ১২ মোটা ও ধবলী অর্থাৎ ফর্সা ১৩ সকলের প্রধান ১৪ ওই মেয়েটির। "মাইয়া" অর্থে এখানে স্ত্রী নয় ১৫ উঠাইতেই পারে না অর্থাৎ ফেলিতে পারে না। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১৬ উঁহার।

। ৬৭খ ।

নাগর-চাঁদ কানাইয়া রে,
হাটের শভা[১] মল-মুড়কি[২]
ঘাটের শভা নাও ;
বাড়ীর শভা গছ-বাগিছা[৩]
ছাওয়ার শভা মাও।
নাগর কানাইয়া রে ॥

নাগর-চাঁদ কানাইয়া রে,
পুরুষের বসন্ত কালে
হাতে মোহন-বাঁশি ;
নারীর বসন্তকালে
মুখে মুস্কি হাসি[৪] ।
নাগর কানাইয়া রে ॥

নাগর-চাঁদ কানাইয়া রে,
নদীর বসন্তকালে
ভাঙিয়া পড়ে মাটি ;
মাছের বসন্তকালে
করে উজান-ভাটি ।
নাগর-চাঁদ কানাইয়া রে ॥[৫]

। ৬৭গ ।

ও মাইয়া পুষাই রে না যায়[৬] ;
সোনার মত চল্-চল্[৭] মাইয়া
ছাড়িয়া দিবা' না মনায়[৮] ॥

১ শোভা ২ মুড়ি-মুড়কি ৩ গাছ-বাগিচা ৪ মুচ্‌কি হাসি ৫ দ্রঃ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-সংকলিত 'হারামণি' (১ম খণ্ড। বৈশাখ ১৩৩৭)-র ৫৮ সংখ্যক গান ৬ বউ পোষাই যায় না ৭ উজ্জ্বল ৮ ছাড়িয়া দিতে মন সরে না।

CENTRAL LIBRARY

ওরে আলির কচু[১], সজির বই[২]
কাউনির ভাত, আর মকাইর খই ;
কল্মুর কুঞ্জি[৩], হেল্‌চার শাক—
আন্দিছে ভাণ্ডা পাইলাত্‌[৪] ;
জল খা'ছে কানা নোটাটাত্‌[৫] ।
—ও মাইয়া পুষাই রে না যায় ॥

আর পাড়ার মান্‌ষি সগায়[৬] ক'ছে[৭] রে
করেছে গান্দাঘুষা[৮] ;
হাম্‌রা বলে খাই চাউলের উন্দা[৯] ॥
হায় রে সোয়ামী হায় রে হায়,
তোক্ আরো বুঝাবে কায়[১০] ;
কণ্ট্রোলোত্‌ আসিল্‌ চাউল
ক'ছে সগায় ॥

১ আলির উপর হওয়া কচু ২ মুখীকচুর ডাঁটা ৩ কলমি শাক ৪ ভাণ্ডা পাতিলে করিয়া রাঁধিয়াছে ৫ ভাণ্ডা ঘটিতে জল খাইতেছে ৬ সকলেই ৭ কহিতেছে ৮ কানাঘুষা করিতেছে। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ৯ সিদ্ধ করা চাউল অর্থাৎ ভাত ১০ তোকে আর কে বুঝাইবে।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় অধ্যায়

॥ বর্ষ-পরিক্রমা ঃ কার্তিক-চৈত্র ॥

॥ গোরু চুমানী ॥

। ৭০ ।

ওই নোখোলিয়া[১] নাই মোর নশিবে[২],
আইসেক্ সোয়ামী,
চুমাওঁ[৩] রে তোক্।
ওগে, গোরু চুমাইতে নাগে কি :
ধান, দুবা, তুলুসী ;
আরো নাগে কাঙ্কা হোলোদি ॥

। ৭০ক ।

ন'দারী[৪] গোরু চুমাছে—
উলুই-উলুই গ্যাছে[৫] ॥

। ৭০খ ।

ওগে, বাঁশ-বাড়ীখান
ধাই-ধাই[৬] করালো গে ;
ওই নোখোলিয়া,
এই ছিলো মোর কোপালের নেখা গে ॥

১ রাখাল ২ ভাগ্যে, কপালে ৩ বরণ করি। সকাল বেলায় গোরু স্নান করানোর পর এই গানগুলি গীত হইয়া থাকে ৪ নবদারা, নতুন বউ ৫ উলু দিতেছে ৬ ধু ধু।

CENTRAL LIBRARY

॥ চোর-চুন্নী ॥

বন্দনা

। ৭১ ।

ওই বন্দনা করু[১] চোর চকরপতি[২] ;
সে চোরেরো চুন্নী[৩] বন্দু রাধা-বিনোদিনী ॥

সে চোর যদি মনে করে
দিনতে ডাকাতি পড়ে ;
কারয় সাদ্দি ধরিতে পারে—
পুরাণতে শুনি ॥

সে চোর ভয়-হাতাশ
কিছুই করেযে না ;
যারে বাড়ীত্ যায়—
তাঁহে কানা ;
জাখেয়া দিলে তাও জাখে না—
ও পড়শীর কানাকানি ।
ওই বন্দু চোরা
জগৎ মেরা[৪]
চোরের শিরোমণি ॥

১ করি ২ চক্রধারী ৩ চোরের স্ত্রী, চুন্নী। কৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী রাধা ৪ আমার। স্থানে স্থানে হিন্দী প্রভাব লক্ষণীয়।

"চোর-চুন্নী" গানের বিভিন্ন ধরণের বন্দনার মধ্যে একটি মাত্র সঙ্কলিত হইল।

CENTRAL LIBRARY

। ৭১ক ।

আমাসী পরবে[১] রে
চোর সন্দাইল্[২] ঘর রে ॥
পাইকার যদি অহিল্ হয়[৩]
চোরোক্ পিটিয়া ধোল্লে হয়[৪] ;
নাঠি দিম্-দিম্ কোল্লে হয়[৫] ।
চোর সন্দাইল্ ঘর রে—
হো-হো-হো-হো[৬] ॥

। ৭২ ।

"ও তুই যা যা চুন্নী,—
চাইট্টা খাবার জোগাড় কর্ ॥"[৭]
"ও মুই কোটে[৮] কি তোরকারী পাঙ[৯]
তোরকারী আনি'র[১০] যাঙ[১১] ॥"[১২]

১ দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে ২ প্রবেশ করিল ৩ যদি থাকিত ৪ পিটাইয়া ধরিত ৫ লাঠি দিয়া প্রহার করিত ৬ ব্যঙ্গ ও উল্লাসের শব্দ।

কথান্তর—

আমাসী পরবে রে
চোরের উধোপত্তি[১] রে।
চোর-ছায়া ঘরে নাই[২]
বিলাই সন্দাইছে ঘর রে।
ছায়া যদি ওলে হয়[৩]
চোরোক্ পিটিয়া নিনে'। হয়[৪]।

১ উৎপত্তি ২ চোরের ছায়ামাত্র ঘরে নাই ৩ ছায়া যদি থাকিত ৪ লইতাম

৭ চোরের উক্তি ৮ কোনস্থানে ৯ পাই ১০ আনিবার, আনিতে ১১ যাই ১২ চুন্নীর উক্তি।

CENTRAL LIBRARY

"খুঁড়িয়া-বতুয়ার আগাল্[১],
ডিমার ভাজি, কৈতরের ছাও[২],
নাউর পাতোত্ করিয়া দে
শিদলের[৩] পাতাও[৪] ॥"[৫]

ওকি ও মরি রে,
আমাবাইস্তা গোছার দিনা[৬]
যতো চোরে করে যাত্রা ;
খন্তা-পাশুন-হাল-হাতিয়ার
দেবল্ আনিয়া[৭] ॥

। ৭২ক ।

শুনেক চুন্নী, কাথা মোর—
যদি-না তুই করিস জোর[৮] :
কার বাড়ীত্ যে করিম্ চুরি গে।
চুন্নী, মনত্ তাক করেছে কাক্ :
এলা কার বাড়ীত্ যে করিম্ চুরি গে[৯] ॥

চুন্নী, নামজাদা মোর নাম,
ছোটো ঘরে মন না চায়—
এলা বড়ো ঘরত্ করিম্ কাম[১০] ॥

১ কাঁটাওয়ালা বাথুয়া শাকের কুশি ২ কবুতরের বাচ্চা ৩ শুকনা মাছ গুঁড়া করিয়া তাহাতে কচু এবং বিবিধ মশলা দিয়া দলা পাকানো হয়, তাহাকে 'শিদল' বলে ৪ লাউয়ের পাতায় 'শিদল' পোড়াইয়া যে তরকারি হয়, তাহাকে 'শিদলের পাতাও' বলে ৫ চোরের উক্তি ৬ যে অমাবস্যার রাত্রিতে প্রদীপ দেওয়া হয় ৭ দে আনিয়া ৮ অনেক গানেই চুন্নীর পতি-প্রেমের পরিচয় পাই। চুন্নী চোরকে চুরি করিতে দেয় না, জোর করিয়া ঘরে রাখিতে চায় ৯ কাহার বাড়ীতে যে চুরি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না ১০ বড়ো লোকের বাড়ীতে চুরি করিব।

চুন্নী. হের্ যাছো করিবা' চুরি :
দেখি' শুনি' বড়ো বাড়ী।
শান্দাইম্[১] ঘর তাক করি'
ঝুলিয়া[২] থুইসে[৩] বড়ো হাঁড়ী ;
বুঝেছো সেলা ওজন করেছে খুব ভারী[৪] ॥

ও মোর মন ভৈল্[৫] চঞ্চল ;
সেলায় ঝুঁকিয়া দেখোঁ
বোঝাই আছে শিদল[৬] ॥
ও একদিন গেনু উমার বাড়ীত্[৭] গে
দেখিলেক্ হঠাৎ :
সেলা কেনং করি' মোক্ পিটাইতে
পড়িয়া গেইল্ বকাতি চুয়াত্[৮] ॥

। ৭৩ ।

চরা রে,
আসিছে পূজার বাজার :
নাগে মোক্ এই সন চন্দ্রহার ;
দিনে দিনে দিন যাছে মোর
করেক্ তুই বিচার—
নারীর উজানি বাহার[৯] ॥

১ প্রবেশ করিব ২ ঝুলাইয়া ৩ থুইয়াছে ৪ হাতে আন্দাজ করিয়া খুব ভারী বলিয়া মনে হইল ৫ "হইল" অর্থে "ভৈল্" আর পাই নাই ৬ শুকনা মাছ ও কচু "ছামে" কুটিয়া দলা পাকাইয়া রাখা হয়। তাতে সিদ্ধ করিয়া রাজবংশীরা তাহা খাইয়া থাকে ৭ উঁহাদের বাড়ীতে ৮ এঁদো ও অব্যবহৃত কূপে ৯ নারীর যৌবনের শখের কথা একবার বিচার করিয়া দেখ।

CENTRAL LIBRARY

ওগে, এই ব'সে[১] নাই মোর
পিন্ধন-পাতি ;
বৈড়াছু মুই আড়ীর নাথাতি[২] ;
নইজ্জাতে মোক্ মনাছে মরিবার।
নাগে মোক এই সন চন্দ্রহার ॥

ও তোর পাথারত্[৩] ফুটানি ভারি ;
ফড়কায়[৪] বেড়াইস উপর দাড়ি[৫] ;
ধরিয়া বেড়াইস দেউনিয়ার[৬] বাহার।
নাগে মোক্ এইসন চন্দ্রহার ॥

। ৭৪ ।

চুন্নী গে,
না নাগে কান্দিবার[৭]—
দিবার নাই পারিম্ চন্দ্রহার।
যতোলা[৮] মাড়িনু পাটা[৯]
কি কহিম্ তোক্ আর
শালার নাই পানু বাজার[১০] ॥

ওগে, মুলুকত্ আকাল পড়িসে
কতয় মান্ষির ভাত ফুরাইসে[১১]
ধনী-গিলা[১২] খাবার ধইচ্চে ধার[১৩] ;
তুই চুন্নী না বুজিস্ কিছু
একটা কাথার সার[১৪] ॥

১ বয়সে ২ বিধবার মতো ৩ পাথারে অর্থাৎ বাড়ীর বাহিরে, পথে ৪ চুমড়াইয়া ৫ গোঁফ ৬ মান্য-গণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে "দেউনিয়া" বলে ৭ কাঁদিতে লাগিবে না, হইবে না ৮ যতোগুলি ৯ ধুইয়া পাট প্রস্তুত করাকে "পাটা মাড়া" বলে ১০ বাজার পাইলাম না অর্থাৎ পাটের দাম খুব চড়া হইল না ১১ খাদ্য-হীন হইয়াছে ১২ ধনীগুলি ১৩ ধার করাকে "ধার খাওয়া" বলে। অথবা "ধার করিয়া খাওয়া" এই অর্থেও নেওয়া চলে ১৪ একটি সার কথা, মোদ্দা কথা।

ওগে, নানান তালে[১] ঘুরে মোর মাথা
তোর চুন্নী পিন্ধনের কাথা
দিনে দিনে না মনায় শুনিবার।
ও মোর হিসাবত্ না কুলায় টাকা
কেম্‌নি গড়াইম্ চন্দ্রহার॥
তোর বাদে[২] কি ওগে চুন্নী
যাইম্ চুরি করিবার;
দিবার নাই পারিম্ চন্দ্রহার॥

। ৭৫ ।

ওহে প্রাণোপতি,
যাত্রা করি' যাইস্ কুতি[৩]।
আলো করিসে ঘর-বাহির—
সোগায়[৪] দিছে বাতি॥

বুঝা হইয়া না হইস্ বুঝা
জানিস না কি কালী পূজা;
আজি আমাসী আতি[৫]।
ওহে প্রাণোপতি॥

কহেন দেখি কেনং করি'
দিবেন আজি সিঁতি[৬];
হাল-হাতিয়ার ঘরত্ আখি'[৭]
অহেন যায়া শুতি'[৮]।
ওহে প্রাণোপতি॥

১ ধাক্কায় ২ তোর জন্যে ৩ কোন্ দিকে, কোথায় ৪ সকলেই ৫ অমাবস্যার রাত্রি ৬ সিঁধ কাটি ৭ ঘরে রাখিয়া ৮ যাইয়া শুইয়া থাকো।

যাহারা পাকা চোর, তাহাদের মধ্যে একটি প্রথা আছে: মহালয়ার দিন কাহারও গৃহে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু চুরি করিয়া দীপান্বিতা-অমাবস্যার দিন তাহা ফিরাইয়া দিয়া আসা হয়। মহালয়ার দিন চুরি করিয়া আনিয়া দীপান্বিতার দিন চোর তাহা ফিরাইয়া দিতে যাইতেছে; চুন্নী চোরকে নিষেধ করিয়া বলিতেছে,—আজ যাইয়ো না, কেননা আজ চারিদিকে দীপ জ্বলিতেছে, ধরা পড়িবে। ঘরে গিয়া শুইয়া থাকো।

CENTRAL LIBRARY

। ৭৬ ।

শুনেক্ চোর মড়া,
চুরি করিতে ধরা পড়িবো[১]
কি হোবে সেলা[২] ।
আজি এখেতে আন্ধার রে আতি,
হামার মনটার পড়েছে পানি ;—
রে সয়ামী,
অভা'[৩] না পারু[৪] মুই ন'দারী মান্ষি[৫] ॥

স্বামী নায় ন'দারী হয়ু নোক
অভা' না মনায় মোক ;
বিহো হবার ছয়মাস নাই হয় রে সয়ামী
দেহাটার নাই হয় ও মোর ভাগা-ভোগ ॥

ও মরি রে,
যেমন হইচে কলির নোক
কুন-বা দিন ধরেছে তোক ;
হাতে দড়ি নাগেয়া তোক
ধরিয়া যাবে রে সয়ামী—
দিয়া যাবো[৬] দারুণ শোক ॥

১ পড়িবি ২ তখন ৩ রহিতে ৪ পারি না ৫ কনে বউ ৬ যাইবি।

। ৭৬ক ।

ও মোর চরা গে[১],
না নাগে আর তোক
চুরি করিবার[২] ।
তুই বেড়াছিত্[৩] চুরি করি',
মোক কহেছে চুন্নী-শালী ;
নাজে মাথা মোর কাটা যা'ছে—
দারুণ বিধি ॥

চরা, মুই বেড়াছু বাহেচা কুটি'[৪]
তুই করেক্ বেপার[৫] ;
না নাগে আর তোক
চুরি করিবার ॥

। ৭৬খ ।

ও মোর স্বন্দোর চরা রে,
স্বন্দোর দেহ ধরিয়া[৬]
না যাইস চুরি করি'র[৭] রে ॥

ও তুই বুঝি'স্বঝি'[৮] করিস চুরি
না হলে তুই আসিস ঘুরি' ;
পাড়ার নোক ধরিলে তোর
উখুড়াবে[৯] দাড়ি ॥

১ ওগো আমার চোর ২ আর তোকে চুরি করিতে হইবে না ৩ বেড়াইতেছিস ৪ ধান ভানিয়া রোজগার করাকে "বাহেচা কুটা" বলে ৫ ব্যবসায় ৬ লইয়া ৭ করিবার, করিতে ৮ বুঝিয়া-শুঝিয়া ৯ উপড়াইবে ।

। ৭৭ ।

চরা,

মনে কি আর নাইরে তোর—
কাড়োয়া-মড়া[১] চোর গে চোর ;
মুহনী নাগেয়া[২] বান্ধেয়া[৩] দিলেক্ জোড়[৪]—
বিধি বাদী মোর ॥

দেখিয়া তোর চক্-ভোল্[৫]—
উঠিল্ কতো গণ্ডগোল ;
পালকি-শাঙ্গি[৬] ওরে চরা,
ঘুরেয়া[৭] দিলেক্ তোর ॥

কাড়োয়া-মড়া নাগাল্[৮] ভেল্কি[৯]
সগারে[১০] মন দিলে ভেন্টি'[১১] ;
ঘুরেয়া বসাইল্ পালকি-শাঙ্গি
মাড়োয়ার[১২] ভিতোর ॥

চরা, তোর বাড়ীত্ আসিয়া—
ওরে দুখোতে ফাটেছে[১৩] হিয়া ;
দিবানিশি ওরে চরা
ঝুরেছে অন্তোর ॥

১ ঘটক। ঘটককে "মড়া" বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে ২ মোহিনী মায়া লাগাইয়া ৩ বান্ধিয়া ৪ তোকে-আমাকে জোড় বাঁধিয়া দিল ৫ চালচলন ৬ পালকি ইত্যাদি ৭ ঘুরাইয়া ৮ লাগাইল ৯ তুক-মন্ত্রের মতো কাজ ১০ সকলেরই ১১ উল্টাইয়া ১২ বিবাহের মণ্ডপের, আসরের ১৩ ফাটিতেছে।

আছিনু যখন বাপোর ঘর
গাহানায় ঝমর-ঝমর[১] ;
সনা-বোসিয়া[২] শাড়ী পিন্দিছু[৩]
—ফুল-তোলা চাদোর ॥

চরা, তোর বাড়ীত্ আসিয়া
ওরে দুখোতে ফাটেছে হিয়া ;
এক পাটানী[৪] ওরে চরা,
দিনো যাছে মোর[৫] ॥

। ৭৭ ক।

যতশত আই[৬] মোর দাদা—
চোরের হাতোত্ দিয়া আই
খালেন ব্যাচেয়া [৭] ;
হের্[৮] শুনেক্ তোর জামইর কাথা[৯] ॥

একদিনা করিছে মোজা[১০]—
চুরি করিয়া আনিয়া দিলেক্ সজিলা[১১] ;
ওইলা[১২] ক'ছে উষিবা'[১৩]॥

১ গহনায় গা ঝমর-ঝমর করিত ২ সোনা-বসানো ৩ পরিয়াছি ৪ রাজবংশী মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ ৫ এক পাটানীতেই দিন কাটাইতে হইতেছে ৬ মা ৭ চোরের ঘরে আমার বিবাহ দিয়াছ ৮ কোন দৃশ্য বা বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে এই অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। এই ছাখ, ওই শোন—ইত্যাদি অর্থে ৯ এই শোনো তোমার জামাইর কথা ১০ একদিন মজা করিয়াছে ১১ মুখী কচুকে 'সজি' বলা হয় 'লা' বহুবচনাত্মক ১২ ওই সমস্ত, ওই গুলি ১৩ সিদ্ধ করিতে কহিতেছে।

ছাওয়ালা কান্দেছে—
অ্যাং মুঠি ক্ষুদি খায়া[১] ;
ছাওয়া ক'ছে :
"ভাত খাইম্, ভাত খাইম্"
পোয়াতী ক'ছে :
"হায় বাপো, কুঠে পাইম্, কুঠে পাইম্[২] ।"
মুই নারী চলিয়া যাছো
হে-ন্নে[৩] তোর ছাওয়া ॥

ওরে চরা,
দিনত্ নানান্ করেছিত্[৪] ;
আতি হালে[৫] ওরে চরা
বিরাজ করিয়া নিন্দাছিস্ ;
যেলায় স্থাছোঁ ডাকেয়া[৬]—
নেকেড়া বাঘের নাখা[৭] গড়্গড়াছিস ॥

১ একমুঠি করিয়া ক্ষুদ খাইয়া ছেলেরা কাঁদিতেছে ২ কোথায় পাইব ৩ এই নে তোর। 'হের্' এবং 'এই নে' দুইটি একসঙ্গে মিলিয়া "হে ন্নে" হইয়াছে ৪ দিনের বেলায় নানান টালবাহানা করিতেছিস ৫ রাত্রি হইলে ৬ যখনই ডাকিয়া দিতেছি ৭ মতো, মতন।

। ৭৭খ ।

তোর যে আজি ওগে চরা
গপ্‌ফো কাথায় সার[১] ;
ও কি কহিম্‌ আর ।
যা কেনে তুই ওগে চরা
চুরি করিবার ॥

ওগে, যে জন চরা করে চুরি—
তার মাইয়া পরে চুড়ি
নীল-পাড়িয়া বোম্বাই শাড়ী[২] ॥
মোর যে এক্না[৩] ফোতায়[৪] সার
গাও ধু'লে নাই পিন্ধিবার ;
যা কেনে তুই ওগে চরা
চুরি করিবার ॥

১ গল্পই সার ২ যে চোর চুরি করিতে জানে, তাহার বউ চুড়ি ও বোম্বাই-শাড়ী পরিতে পায় ৩ একটি ৪ স্থানীয় মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্রকে 'ফোতা' বা 'পাটানী' বলে। 'য়' নিশ্চয়ার্থে। 'ফোতাই' এই অর্থে।

প্রায় এই ভাবেরই আর একখানি গান ধূপগুড়ির পূর্বমাগুরমারী হইতে পাইয়াছি :

তোর কাথালা[১] মোর বা কেনে
নাগেছে[২] বেজার[৩] :
যা কেনে তুই ওগে মড়া
চুরি করিবার ।
ওগে, যার চরায় করেছে চুরি
তার মাইয়ায়[৪] পিন্ধেছে[৫] খাড়ী[৬] ,
গালাত্‌[৭] আরো দেখোঁ চন্দ্রহার ।
আর কানতে ফুল, মাচিয়া জোড়া[৮]
বাজ-বাজুয়া[৯], ঝুমকা জোড়া[১০] ,
সিঁতায় সিঁতায়[১১] সিঁতা পাড়ে[১২]
দেখিতে মোজা[১৩] অবাহার[১৪] ।
যা কেনে তুই ওগে চরা
চুরি করিবার ॥

১ কথাগুলি ২ লাগিতেছে ৩ অমিষ্ট, বেজার হইবার মত ৪ বউ ৫ পরিতেছে ৬ শাড়ী ৭ গলায় ৮ কর্ণ-ভূষণ বিশেষ ৯ বাজু প্রভৃতি ১০ অলঙ্কার বিশেষ ১১ সিঁথি-পাটী দিয়া ১২ সিঁথি করে ১৩ মজা ১৪ রং-বাহার ।

CENTRAL LIBRARY

। ৭৭ গ ।

স্যাখ্ রে চরা মেলিয়া নয়ান :
নয়া এলা[1] হইল্ ফেশং[2]
ছেণ্টেল[3] জুতা মাথায় ঘোঙরখান্[4] ॥

চরা রে, ওগে চরা,
তলে পিন্ধে ঘের-ঘাগুরি[5]—
তার উপরত্[6] পিন্ধে শাড়ী,
হয়া কেইনং[7] ঘোম্টা-মারী
দেখিতে বাহার ॥

আতর-স্নেও[8]-পাউটার[9] দিয়া,
কালা মাইয়া গোরা হয়া,
আল্‌তা দিয়া করে অং।
নয়া এলা হইল্ ফেশং ॥

কানে পিন্ধে ঢুল-মাখিড়ি
হাতত্ দিয়া সনার চুড়ি,
পাতা পাড়ে, কাঁকে[10] টেড়ি
রকমে রকম।
নয়া এলা হইল্ ফেশং ॥

সনা কিংবা পিতল হখান্
ছাওয়া-চমকা[11] চিতির [12] নাখান্[13]
বুকোতে পিন্ধিছে হোর্[14]।
ওইটা দেখি' মন ঝুরেছে মোর ॥

১ এখন ২ **fashion** ৩ **sandal** ৪ ঘোম্টা ৫ **Petticoat** ৬ উপরে ৭ কেমন করিয়া ৮ **snow** ৯ **powder** ১০ আঁচড়ায় ১১ এমন চক্‌চকে যে ছোটো ছেলে দেখিলে চমকাইয়া উঠে ১২ প্রজাপতির ১৩ মতন ১৪ ওই স্যাখ্—অর্থে।

। ৭৭ ঘ ।

ও মোর চরা রে,
বারোয় মাসে এক পাটানী[১]
হিদি-হুদি[২] টানাটানি,—
ধাগার উপর ধাগা দিছু[৩]
সিয়াও[৪] জোড়-বেজোড়[৫] ॥

যায় না বেড়ায় চুরি করি'
তার মাইয়াক্[৬] পিন্ধাছে[৭] হোর্;—
নয়ানশোরীর[৮] মধুমালার[৮]
ফোতা[৯] জোড়ে-জোড়[১০] ॥

। ৭৮ ।

রে মড়া, আয় আয়—
তোক্[১১] ঘোকনটা[১২] কণেক[১৩] দেও[১৪] ;
কার-বা আনিলো[১৫] শেমিয়া ধোকোড়া[১৬]
আর একনা[১৭] বেও[১৮] ॥
চুরি করিবা'[১৯] নাগে[২০] ধান
কার বা আনিলো ভাঙ্গা ছাম্[২১]
গুটার[২২] কিবা কাম ॥

১ জলপাইগুড়ির মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র ২ এদিকে, ওদিকে ৩ তালির উপর তালি দিলাম ৪ সেলাই করি ৫ সেলাই করিবারও জায়গা নাই, ঘন ঘন করিয়াছি ৬ বউকে ৭ পরাইতেছে ৮ 'পাটানী' বিশেষের নাম ৯ 'পাটানী'কেই 'ফোতা' বলে ১০ জোড়ায়-জোড়ায় ১১ তোকে ১২ গালমন্দ, তিরস্কার ১৩ খানিক, কিছু, অল্পস্বল্প ১৪ দিই, দিতেছি ১৫ আনিলি ১৬ শনের কম্বল ১৭ একটা ১৮ জোলার মাকু ১৯ করিবার, করিতে ২০ লাগে ২১ ঢেঁকির পরিবর্ত হিসাবে জলপাইগুড়িতে ব্যবহৃত হয় ২২ ওটার।

উমার[১] কণা[২] কাটিয়া
সান্দাইছিত্[৩] ঘর,
বেড়াইছিত্[৪] বিলাইর মতন[৫] ;
আরো করেছিত্—মেও মেও।
তোক ঘোকনটা কণেক দেও ॥

কালি হাতে আছো শুকিয়া[৬]
ছওয়ালাক্[৭] খোয়াছু[৮] খুঁজিয়া ;
মুই কিছুই নাই খাও[৯]।
তোক ঘোকনটা কণেক দেও ॥

। ৭৮ ক ।

শুনেক্ কেনে চোর মড়া,
আজি একখান
চুরি করিস্ ধোকোড়া[১০] ॥

ওই ছাওয়ালা[১১] যে কান্দেছে
নিন্ না ধরে,—কাঁপেছে,
ওইমন্ করি'[১২] পড়িবে নাপেড়া[১৩] ॥

এক খুঁচি চাউলের গুণ্ডা
শিদল[১৪] নাগে তোক্ এক আধা ;
স্বারে-স্বারে মরুচের[১৫] খাইস্ ছোবা[১৬]।
রে মড়া,
চুরি করিস্ ধোকোড়া ॥

১ উহাদের ২ কোণা ৩ প্রবেশ করিয়াছিস ৪ বেড়াইয়াছিস ৫ বিড়ালের মতন ৬ শুকাইয়া ৭ ছেলেদের ৮ খাওয়াইলাম ৯ খাই নাই ১০ কম্বল ১১ ছেলেরা ১২ ওই রকম করিয়া ১৩ অসুখবিসুখে ১৪ কচু ও শুকনা মাছ ঢেঁকিতে কুটিয়া দলা পাকাইয়া শুকান হয়, তাতে সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয় ১৫ মরিচের ১৬ পোড়া।

। ৭৯ ।

তোর গে চুন্নী ফুটানিটায়[১] সার ;
ও তুই সোদায়[২] করিস্ কেলেংকার ।
তোরে[৩] বাদে ইষ্টকুটুম বন্ধু-বান্ধব
সোগায়[৪] হইল্ বেজার ॥

ও তুই হল্‌দিবাড়ীর মেলায় গেলো[৫]
আয়না-কাঁকই পান-সুপারি
টিলিমিলি[৬] কিনিবার ;
ও.নাকোতে টিলিমিলি
বরুণ-বাতি[৭],
তোর গে চুন্নী সাটোকে[৮] সার ।
কাঁক্ কয়া তুই গেলো চুন্নী
মেলা দেখিবার ॥

চুন্নী, তুই বা কেমন ঢকের নারী[৯]
তোর কলঙ্ক টাড়ী-বাড়ী[১০] ;
ও মাথায় টেড়িকাটা,
দালান-খোঁপা[১১] ;
উপ[১২] দেখেয়া[১৩] বেড়াইস্ কাক্ ।
তোর গে চুন্নী ফুটানিটায় সার ॥

১ ফুটানিটাই । "য়" নিশ্চয়ার্থে ২ সবসময়ই ৩ তোরই "এ" নিশ্চয়ার্থে ৪ সকলেই
৫ গেলি ৬ নাকের নথ ৭ অলঙ্কার বিশেষ ৮ ঠাটই ৯ কি রকমের নারী
১০ পাড়ায়-পাড়ায় ১১ একধরণের খোঁপা ১২ রূপ ১৩ দেখাইয়া ।

। ৮০ ।

শাঙন মাসোতে[১] মোর
বরষারে ভরথর[২]—
হে জগদীশ্বরা ;
ঘর দিয়া জল পড়েছে
ঝরো-ঝর ॥

মুই নারীটা ছোয়া-কলাত্[৩]
জাগি আছোঁ আতিভর ;
চুরি করিবা গেইছে আজি
মোর নিলাজী[৪] চোর।
এখনো না আইলো ফিরি'
মোর নিলাজী চোর ॥

দোয়া চিল্‌কেছে[৫], চড়ক পড়েছে[৬],
জল পড়েছে ঝরো-ঝর ;
দোয়ার জলে, চখুর জলে
ভিজেছে মোর আন্তর।
এখনো না আইলো ফিরি'
মোর নিলাজী চোর ॥

ঠিক বুঝি পড়িছে ধোরা[৭]
কাঁপি' উঠে মোর আন্তর ;
আতিও পোহাইল্ রে
আসিল্ হয়া ভোর।
এখনো না আইলো ফিরি'
মোর নিলাজী চোর ॥

১ শ্রাবণ মাসেতে ২ ভরা বর্ষাকালে ৩ ছেলে কোলে লইয়া ৪ নির্লজ্জ ৫ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ৬ বাজ পড়িতেছে ৭ ধরা।

না জানোঁ[১]ঃ কি আছে নশিবে,
হে জগদীশ্বর ;
এখনো না আইলো ফিরি'
মোর নিলাজী চোর ॥

।৮১।

উঠেক্ গে শাশুড়ী-মাও
কিনা সুখে[২] নিন্[৩] যাও ;
তোর ব্যাটা যে গেইসে আজি
চুরি করিবার ॥

ওগে আই,
সুখের ওজনী[৪] হলেক্[৫] ভোর
এখনো যে না আসিল্ গে আই
মোর নিরাশীর চোর ॥

জলের নোটা খড়ম-জোড়
যেইঠে থুইসুঁ, সেইঠে হোর্ ;
এলাও কেনে না আসিল্ গে আই
মোর নিরাশীর চোর ॥

হায় রে বিধি,
মোর কোপাল[৬] পোড়া ;
মোর চরা[৭] বুঝি পড়িছে ধোরা[৮] ;
মোর মনটা গে আই
ভাওয়ে[৯] মানে না ॥

১ না জানি ২ কি সুখে ৩ নিদ্রা ৪ রজনী ৫ হইল ৬ কপাল ৭ চোরা ৮ ধরা
৯ ধৈর্যই ।

। ৮১ ক ।

ভাদ্[১] আন্ধিনুঁ[২], শাগ[৩] আন্ধিনুঁ
গে মা, মাছো দিয়া গাখোড়[৪] ;
শাগ-তোরকারি অইল্ পড়িয়া
ভাদ্ অইল্ হাড়ীর ভিতর ;
এখনো না আইলো মোর চোর ॥

বেলা হইল্ মোর দুই পহর
জলের নোটা, খড়ম-জোড
যেইঠে থুইনুঁ, সেইঠে আছে হোর্ ॥

মান্‌ষি-গিলা কয় সোগায়[৫] :
কাঁয় বলে ধরিয়া চোরোক্
নিগাইসে[৬] থানায় ॥

যার বাদে নাচন-খোঁদন
গে মা, যার বাদে মোর জোর
মুই অভাগীর কাঁহোয় নাই :
কাঁয় দিবে মোক্ ভাত-কাপোড় ।
এখনো না আইলো মোর চোর ॥

। ৮২ ।

বিধি, এই ছিলো কোপালতে[৭] ;
চোপরাতি[৮] ঘুরিয়া
ধরা পইনুঁ[৯] অল্‌ফোতে[১০] ॥

১ ভাত ২ রাঁধিলাম ৩ শাক, তরকারি ৪ গাছখোড় ৫ সকলেই ৬ নইয়া গিয়াছে
৭ কপালেতে ৮ সারারাত্রি ৯ পড়িলাম ১০ অল্পেতে ।

CENTRAL LIBRARY

সিং কাটিয়া ঘর সেন্দাতু[১],
কানর সনা[২] খুলিবার বসিনু ;
ও শালাটা চ্যাতোন পায়া—
ঝাঁপিয়া উঠিয়া হেনে
মাইয়া-ছোয়া[৩] কয়ও ঝনে[৪]—
মোক ধরিয়া চিত করিয়া—
বসিলে মোর বুকোতে।
চোপরাতি ঘুরিয়া
ধরা পইনু অল্‌ফোতে ॥

মারিয়া-ভাঙ্গেয়া বাবা
দিলেক্‌ মোর দুই হাতে দড়ি ;
যতো মান্‌ষিক গোটো করিল্‌[৫]
হাঁকায়-ডাকায় গোল করি'।
কাঁহোয় যা'ছে আতাআতি[৬]
চখিদারের বাড়ী ॥

ও মুই যারে পাও ধরেছোঁ
তাঁহে ধরি' মারেছে ;
সগ[৭] শালায় উয়ার পাখে[৮]
মোর হয়া কাঁহোয় না ক'ছে ॥

থানার মুখে নিগাছে[৯] টানিয়া রে—
আর নাই বাঁচিবার আশা ;
ওহো প্রাণ মোর যা'ছে বাহির হয়া রে
আর নাই বাঁচিবার আশা ॥

১ প্রবেশ করিলাম ২ কানের সোনা ৩ মেয়েপুরুষে ৪ কয় জনেই ৫ জড়ো করিল ৬ রাতারাতি ৭ সব ৮ উহার দিকে ৯ লইয়া যাইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

। ৮২ক ।

চুন্নী, কি খাইম্ তোর চাউলের গুঁণ্ডা[১] ;—
ঠাণ্ডা হইসে ভোক[২] :
যে খোরাক খিলাইসে[৩] আজি
প্যাট করে উলোট-পালোট—
কি আর কহিম্ তোক ॥

চুন্নী গে, ওগে চুন্নী,
যা বাড়ী, না করিস দেরি—
জোটা কিছু টাকা-কড়ি ;
জিনিস-পাতি আনিয়া বন্ধোক ।
কি আর কহিম্ তোক ॥

চুন্নী গে, ওগে চুন্নী,
কাচারী করিবে দাখিল ;
দিস একটা তুই বড়ো উকিল,
না দিলে জেহেলখানা দেখিম্ ;
কয় বচ্ছোর বা দেয় ফাটক ।
কি আর কহিম তোক ॥

। ৮৩ ।

চুন্নী, মোর কোপাল পোড়া
না হইল্ বুঝি চুরি করা ;
কুকুরটা নট্‌ফটালে কান[৪] ॥

১ ভাজা চালের গুঁড়া, দুধ-বিহীন চায়ের সহিত খাইতে এদেশের লোক ভালোবাসে। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে বলে "ভুরভুরা" ২ ক্ষুধা ৩ খাওয়াইয়াছে ৪ কুকুরটা কান নড়াইল।

CENTRAL LIBRARY

আর কাটারিখান[১] চখ্‌খেয়া[২] মুই
যাত্রা করিনু ;
বাড়ী হাতে[৩] বাইর[৪] হইতে
হুল্‌কিতে[৫] উজোট[৬] খানু[৭] ।
চেঁচেয়া উঠিল্‌ দইয়ল জড়া[৮]
না হইল্‌ বুঝি চুরি করা ॥

আর একটা বাড়ীত্‌ যায়া
স্যান্দানু[৯] মুই সাহাস করিয়া ;
ও শালালা[১০] হুত্তি পায়া[১১]
নিগাছে[১২] পিটিয়া—
আজি এলায়[১৩] পইনু হায় ধরা ।
চুন্নী, মোর কোপাল পোড়া
না হইল্‌ বুঝি চুরি করা ॥

। ৮৩ ক ।

শুনেক্‌ চুন্নী মাই,
মোর বাদে[১৪] না ভাবিস—
ও তোর কিছুই চিন্তা নাই ।
ছোয়া দুইটাক্‌[১৫] মান্‌ষি করিস—
মোর বাদে তুই না ভাবিস ॥

ও মোর চুন্নী গে,
বিধির ঘটনায় মুই পড়িনু ধরা ;
এই ছিলো মোর কোপালর নেখা—
দারুণো বিধি হইল্‌ মোর বাদী ॥

১ দা খানি ২ ধার করিয়া ৩ হইতে ৪ বাহির ৫ খুঁড়ি পথে ৬ হঁচোট ৭ খাইলাম ৮ দয়াল পাখী জোড়া ৯ প্রবেশ করিলাম ১০ 'লা' বহুবচনে ১১ সাড়া পাইয়া ১২ লইয়া যাইতেছে ১৩ এখন, এইবার, এতদিনে ১৪ জন্য ১৫ ছেলে দুইটাকে ।

ওকি ও মরি রে,
যামন মোর অদ্দিষ্ট[১] মন্দ—
গেহুঁ চুরি করিবা' ;
ফেলালে[২] মোক ধরিয়া—
নয়নের জলে বুক মোর যা'ছে[৩] ভিজিয়া ॥

। ৮৩ খ ।

যাত্রেরা কালে[৪] বাধা
ও মোক না দিস চুন্নী গে,—
ওগে, কি হোবার তে হোবে কোপালে[৫] ॥

ওই চুন্নী গে,
ঘরের গোরু, ঘরের গাই,
দুধ-দহির ভাবনা নাই ;
কতয় খাবো, খা' গে চুন্নী নালিমিঠাই ॥

ওই চুন্নী গে,
গলা[৬] ভর্‌তি আছে ধান,
ঘরের গুয়া, ঘরের পান ;
কতয় খাবো, খা' গে চুন্নী সাঁঝ আর বিহান[৭] ॥

ওই চুন্নী গে,
আম-কাঁঠোয়াল নেছুর[৮] গাছ,
আরো দীঘির পুষা মাছ[৯] ;
তোর কিসের ভাবনা চুন্নী, চাইর পাখে[১০] বাস ॥

১ অদৃষ্ট ২ ফেলিল ৩ যাইতেছে ৪ যাত্রার কালে ৫ কপালে যাহা ঘটিবার, তাই ঘটিবে ৬ গোলা ৭ সকাল-সন্ধ্যা ৮ লিচুর ৯ দীঘির পোষা মাছ ১০ চারিদিকে ।

CENTRAL LIBRARY

। ৮৪ ।

ও আজি মোর হাতে কাড়া[১]
বেড়ি পায় ;
চৌদিকে পুলিশে ঘেরি'
ধরিয়া যা'ছে[২] জেহেলখানায় ॥

ও মোর চুন্নী আইচ্চে[৩] পাছে-পাছে
মোর বুক ফাটিয়া যা'ছে ;
আজি মোক দেখেছে সোগায়[৪] ॥

কাঁক[৫] দুষিমো,
কর্মদোষে
সাজা দিলেক্ বিধতায় ;
চুরি করিয়া এই করিনু হায় ॥

আজি সোগ্[৬] শালায় বাদী হয়া
মিছায়-ছাচায়[৭] সাক্ষী দিয়া
ঠেলিয়া দিলেক্[৮] জেহেলখানায় ॥

যাঁহে[৯] দেখে, তাঁহে[১০] হাসে,
কাঁহো[১১] মাথা টক্‌টকায়[১২] ;
চুরি করিয়া এই করিনু হায় ।
চৌদিকে পুলিশে ঘেরি'
ধরিয়া যা'ছে জেহেলখানায় ॥

১ কড়া ২ যাইতেছে ৩ আসিয়াছে ৪ সকলেই ৫ কাহাকে ৬ সব ৭ সত্য-মিথ্যায়
৮ দিল ৯ যেই ১০ সেই ১১ কেহ, কেহ-কেহ ১২ নাড়ে।

CENTRAL LIBRARY

। ৮৫ ।

বনত্ কান্দে বন, সখী হে
পাথারত্[১] কান্দে ধেনু ।
মোর বন্ধুয়াক্ ধরিয়া যা'ছে রে—
খুড়িয়ার কাছারি[২] ॥

হাতত্ দিলে হাতেরে বান্ধন
পায়ে নোয়ার বেড়ি ।
মুইও বেচা'ম্ হালের গোরু
আরো বেচা'ম্ সনা[৩] ;
চেঙ্গেড়া বন্ধুক্ নাই দিম্ যাবারে
খুড়িয়ার কাছারি ॥

১ পথে ২ কাছারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে ৩ হালের গোরু ও দেহের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া মোকদ্দমা করিব ।

এই ভাবেরই অপর একটি গান এই :

তোমোরা ভাখো তো টাড়ীর[১] লোকগিলা[২] রে,
ও বাপ, ভাখো তো আসিয়া ,—
মোর বন্ধুয়াক্ নিগাছে[৩] রে
জোলপইগুড়ির থানাত্ ।

আজি বন্ধু বেচাউক্[৪] হালের গোরু রে
রে সিপাই, মুইও বেচা'ম্ সনা ;
আজি তাঁহোতো[৫] যাবারে না দিম্
রে সিপাই, বন্ধুক্ জোলপইগুড়ির থানা ॥

আইলে করিম্ আল্-সিঁথিনা[৬]
রে সিপাই, জমিনে করিম্ শেযা[৭] ;
আজি তাঁহোতো যাবারে না দিম্
রে সিপাই, বন্ধুক্ জোলপইগুড়ির থানা ।

১ পাড়ার ২ লোকগুলি ৩ লইয়া যাইতেছে ৪ বিক্রয় করুক ৫ তবু-ও তো ৬ জমির আলে সিঁথি অর্থাৎ মাথা পাতিয়া রাখিব, যাহাতে না যাইতে পারো ৭ শয্যা ।

CENTRAL LIBRARY

। ৮৬ ।

হায় বিধি,
জেহেলখানা না হয় হিটা[১] :
—যমপুরী।
কি তাড়োনাত্[২] ফেলাইল্ আজি
দারুণ বিধি ॥

দারগাবাবু[৩] বাড়ীত্ যায়া—
কমরত্ মোর ডোর[৪] নাগেয়া[৫],—
ছেঁছেড়ায়া[৬] আনিল্[৭] আজি
জেহেলখানাত্ ॥

আন্ধার ঘরোত্ মোক নিগিয়া[৮]
থুইলেক্ তালা মারিয়া ;
মোশার কামড় রে বিধি
আর সহে না ॥

সিপাই রে, বান্ধো হামাক্[১]
বাড়াইলাম হাত।
ছাড়িয়া দে রে সিপাই মোর বন্ধুয়াক্ ॥

১ আমাকে। আমার স্বামীর বদলে আমাকেই বাঁধিয়া লইয়া যাও।

অতিরিক্ত কথা :
মোরো[২] বাড়ীত্ ওলো[৩] রে সিপাই
মোরো বাড়ীত্ খালো[৪] ,
সাকালে[৫] উঠিয়া রে সিপাই
মোর বন্ধুয়াক্ ধরলো ॥…

না মারো, না মারো, রে সিপাই,
মিনতি করু তোরে ,
একদিনকার বদলে[৬] রে সিপাই
মুই নারীটা তোরে ॥…ইত্যাদি।

২ আমারই ৩ রহিলি ৪ খাইলি ৫ সকালে ৬ জন্য।

১ এইটা ২ তাড়নাতে ৩ দারোগা বাবু ৪ দড়ি ৫ লাগাইয়া ৬ হিঁচড়াইয়া ৭ আনিল
৮ আনিয়া, লইয়া।

CENTRAL LIBRARY

। ৮৬ক ।

জেহেল্ হাতে খালাস হয়া—
বাড়ীর্ মুখত্ আইসোঁ ধায়া,—
দেখিম্ যায়া মাইয়া-ছোওয়ার মুখ[১] ।
ভাবিনু মনে এতয় দিনে
হইল্ বুঝি মোর সুখ ॥

সুখ হোবে কি পড়িল্ আরো
দুখের উপর দুখ[২] ;
বিধি হইল্ বিমুখ ।
আধা ঘাটাত্ শুনিনু খবর
ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিলেক্ কমর[৩] ।
হাটিয়া যাইতে পাও না চলে
ফাটিয়া যা'ছে বুক ॥

বুড়ী মাও মোর মরিয়া গেইসে
চুন্নী-শালী ভাতার ধইচ্ছে[৪] ;
ঢিপাত্[৫] পড়ি' কাউয়ায়[৬] নাচে
ঘুগুয়ে[৭] করে ঘুক্ ।
ফাটিয়া যা'ছে বুক ॥

। ৮৭ ।

কান্দিয়া পোহানু আতি
বিছিনার উপর ;
মোর নারীর চরা মরিছে
জেহেলের ভিতর ॥

১ বাড়ীতে যাইয়া বউ-ছেলে-মেয়ের মুখ দেখিব ২ দুঃখ পড়া। বাগ্ধারার বিশেষত্ব ৩ মাঝপথে বাড়ীর দুঃসংবাদ শুনিলাম, যেন কেহ কোমরে আঘাত করিয়া চলন-শক্তি রহিত করিয়া দিল ৪ চুন্নী নতুন স্বামী গ্রহণ করিয়াছে ৫ ভিটায় ৬ কাকে ৭ ঘুঘুতে।

আজি কি দুঃখে অন্ধনী[১] পহাইল্ ;
ও মুই কি দুঃখে উঠিনু[২]—
ও মোর কি দুঃখে আসিল্ খবর :
কি দুঃখে মরিল্ চরা
জেহেলের ভিতর ॥

বিষ হইল্ কি বেদনা হইল্,
ঝাঁপ[৩] চাইল্ কি ধোকোড়া[৪] চাইল্—
জলে[৫] চাইল্ কি পানি চাইল্—
নানান ভাবেনা করুঁ
হাত দিয়া চাটিত্ :
কুন-বা দিয়া বেহুঁশ হয়া
পড়িনুঁ মাটিত্ ॥

ও মোর মনটা সেলা ক্যানং হইল্
বাড়ী-ঘরের ফম্[৬] হারাইল্ ;
জেহেল-ঘরে যাইম্ বলি' :
হালুয়ায় জুড়িসে হাল ;
মুই যাছু হেলি'-ঢুলি'—
ও মোক পন্থের উদ্দিশ দেও বলি'
মোর নারীর চরা মরিসে জেহেলে ॥

ও মোর আজু রে[৭]
একনা চেওয়ারী ঘর[৮]
আর নাইরো[৯] উয়ার [১০]উপর ;

১ রজনী ২ কাহার মুখ দেখিয়া আজ সকালে উঠিয়াছি ৩ উড়ানি, চাদর ৪ কম্বল
৫ জলই ৬ স্মরণ ৭ দাদু গো ৮ একটি চার-চালা ঘর ৯ নাই। "রো" অর্থহীন ১০ উহার।

হুটার[১] চাটি-বেড়া[২] কিছুই নাই
চাইরো পাথে[৩] ধাই-ধাই[৪] ;
মন মোর মানে না—
বগলত্[৫] যায়া দেখেচু হাতীর পিলখানা[৬] ॥

জলপোইগুড়ি শহর রে আজু
চমৎকার কারখানা :
পুলুশে ধরিয়া ও মোক
নিগিয়া দিলে থানা।
ও যাওয়া হইলো না ॥

। ৮৭ ক ।

কি দিয়া মনক্ বুঝাইম্ রে
ওরে বিধি,
চিত্তে যে না মানে ভাঁও[৭] :
ফাটোকে মইল্ মোর প্রাণের চরা—
ও জলেছে নারীর গাও ॥

১ ওটার, উহার ২ চাটিই 'বেড়া' অর্থে ব্যবহৃত হয় ৩ চারিদিকে ৪ ধু-ধু ৫ কাছে, পাশে
৬ হাতীর গোয়াল ৭ ধৈর্য।

ইহার পর অতিরিক্তি কথা—

ও কি হায় মরি মরি
বড়ো মাটির ঢিপ্‌ড়ি[১] ;
ওইঠে[২] ঘোলে করে আজু রে
ঘোড়া দৌড়া-দৌড়ি[৩] ॥

১ ঢিবি ২ ওইখানে ৩ রেস-কোর্সের মাঠ।

চুন্নী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে জলপাইগুড়ি শহরের চাঁদমারীর উঁচু ঢিবি, ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং হাতীর পিলখানার বর্ণনা দিতেছে।

আজি গেলো গে, গেলো গে,
চরা তুই জেহেল্-ঘর ;
রে নিদারুণ পর্মেশর[১]
ও তোর কণেকো[২] দোয়্যা[৩] রে নাই :
কাঁয় আর কহিবে .
"সাজেক্, বাজারত্ যাই[৪] ।"

না পারেঁা মুই ছেঁকা পাড়িবার
কিসের মোর পরব ;
নাই দিম্ মুই হোকোর ফোঁটা[৫]
ঘরের দুয়ারত্ ।
নাই দিম্ মুই মাথাত্ ত্যাল
ভাগ্যে সাধো নাই ;
কাঁয় আর কহিবে :
"সাজেক্, বাজারত্ যাই ।"

ধিকো-ধিকো নারীর জীবোন,
কিতায় মোর না হয় মরণ[৬] ;
কাল চউক্কে না ধরে নিন্
ভাবেনাটায় সার ।
ভাবিয়া নারীর দেহা
হ'ছে ছতোকার ॥

ফাটোকে মরিছে চরা
নাই আসিবে আর ;
ভাঙিল্ নারীর হাউসের বাজার[৭] ॥

১ পরমেশ্বর ২ একটুও ৩ দয়া ৪ স্থানীয় মহিলারা বাজারে যাইয়া থাকে ৫ বিজয়া দশমীর দিন প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করিয়া ঘরের দুয়ারে সিঁদুর ও চকমাটির ফোঁটা দেওয়া হয় ৬ কি জন্তে আমারও মরণ হয় না ৭ সাধ, আহ্লাদ শেষ হইয়া গেল ।

CENTRAL LIBRARY

। ৮৮ ।

নিক্‌রি[১] কাটি' কাটি'[২]
বাঙ্গালা[৩] বান্ধানু হো—
এ বাঙ্গালা মোর
এ চারি দুয়ার ॥

বাঙ্গালার তলে পালঙ্ক পাতিনু হো—
চোর বিনা মোর
বাঙ্গেলা আন্ধার ॥

। ৮৯ ।

ও মুই আর না অহিম্[৪] চোরের আশায়।
দুখো-জ্বালায় মোর জান্ যা'ছে ;
ও চাইট্টা আন্‌লু মুই বাহেচা কুটি'[৫]
আন্ধিনু মুই ঘাঁটি'-ঘুঁটি'
ছাওয়া দুইটা[৬] আসিল্ জুটি'
খায়া নিলেক্[৭] চাটি'-চুটি' ;
এলা প্যাটের ভুটি[৮] মোর দ্বল্‌কেছে[৯]—
দুখো-জ্বালায় মোর জান্ যা'ছে ॥

ও মুই কার বাড়ী যাইম্
কাঁয় দিবে মোর কাঁয় আছে ;
ও পাটা-শাক খায়া মরিল্ বুড়ী[১০]—
বুড়ীর শোগে[১১] হা-খোরাগে[১২]
মোরো দেহা পড়েছে[১৩]।
দুখো জ্বালায় মোর জান্ যা'ছে ॥

১ এক ধরণের খড় ২ কাটিয়া কাটিয়া ৩ বাঙ্গালা ঘর। চোর চুরি করিয়া জেলে গেলে একা ঘরে শুইয়া চুন্নী খেদ করিতেছে ৪ রহিব ৫ ধান ভানিয়া রোজগার করাকে "বাহেচা কোটা" বলে ৬ ছেলে দুইটা ৭ লইল ৮ পেটের নাড়িভুঁড়ি ৯ জ্বলিতেছে ১০ শাশুড়ী ১১ শোকে ১২ খোরাকের অভাবে ১৩ আমার দেহও একদিকে শাশুড়ীর শোকে এবং অপর দিকে খাদ্যের অভাবে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

। ৯০ ।

চুন্নী, নাই করিস অ্যাঙ্গা-প্যাঙ্গা[১]
ঠ্যাঙ্গাটা[২] মোর ছাড়্ ;—
জেল হাতে[৩] না হইতে খালাস—
মোক ছাড়ি' ধইচ্ছিস ভাতার[৪] ।
মনে তোর ওগে চুন্নী, নাই বিচার ॥

চুন্নী, ঘর ভাঙ্গিয়া করিছু খড়ি
তোক্ আনিছু বিভা[৫] করি' ;—
দিচু পালকি-সাঙ্গি-ভার[৬] ।
সাতটাকা দিছু পঞ্চাতি[৭]
তিন কুড়ি গিছে বৈরাতী[৮],
তোক চুন্নী আনিবার ।
মনে তোর ওগে চুন্নী, নাই বিচার ॥

চুন্নী, কান্দিয়া কী করেছিস্[৯] আজি
ঠাণ্ডা হোক তোর দাগাবাজী ;—
নিজে খুঁজি' নিলো দুঃখের ভার ।
মোর কাথা করিলো হেলা
পালো[১০] একটা ধুতি-ঝুলা[১১] ;
কান্দিয়া কী করেছিস্ এলা,
নাই কেলা তোর চোচাই সার[১২] ।
মনে তোর ওগে চুন্নী, নাই বিচার ॥

১ ঘাটানো ২ ঠ্যাঙ, লাঠি ৩ হইতে, থেকে ৪ স্বামী গ্রহণ করাকে "ভাতার ধরা" বলা হয় ৫ বিবাহ ৬ পালকি, ইত্যাদি ৭ পঞ্চায়েতগণের অনুমতি লইবার জন্য দেয় টাকা ৮ এয়ো, মহিলা বরযাত্রী ৯ করিতেছিল ১০ পাইলি ১১ যাহার কোঁচা ঝুলিয়া থাকে। কাব্যিক গালি বিশেষ ১২ অন্তঃসারশূন্য ।

CENTRAL LIBRARY

। ৯১ ।

"শুনেক্ রে তুই গাবুর-মড়া—
কয়া বুজাওঁ তোক ;
চুরি করা ভাল্ না নাগে মোক ॥"

"মোর চুন্নীটা চাতুরী[১]
আইতত্[২] ঘুরায় টাকুরি[৩] ;
সুতা কাটি' তৈয়ার করে
ঝালকের চটি[৪] ॥"

ঝালকখান মুই সরোত্[৫] থুইয়া
কান্দেছোঁ মুই বসিয়া ;
সোদায় সোদায়[৬] ফম্ পড়েছে[৭]
ঝালকখান দেখিয়া ॥

১ চতুর ২ রাত্রিতে ৩ টাকু ৪ ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া ৫ সিলিংয়ের উপর ৬ সব সময় ৭ মনে পড়িতেছে।

গানখানির অন্তর্নিহিত অর্থ বেশ সুন্দর। চুন্নী মারা যাইবার পর চোর তাহার স্ত্রীর স্মৃতি রোমন্থন করিতেছে। চোর যখন চুরি করিতে যাইতে চাহিত, চুন্নী তখন নিষেধ করিত, তবুও যখন চোর চুরি করিতে যাইত, চুন্নী তখন রাত্রি জাগিয়া থাকিত। একা-একা রাত্রি জাগা যায় না বলিয়া, চুন্নী সুতা কাটিত ও চাঁদোয়া বুনিত। আজ চুন্নী নাই, সে মৃত। কিন্তু চোরের মনে তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আজ, চুন্নীর রাত্রি জাগিয়া আপন হাতে তৈরি সিলিংয়ে টানানো চাঁদোয়া দেখিয়া, চুন্নীর কথা চোরের মনে হইতেছে এবং তাহা স্মরণ করিয়া সে অশ্রুমোচন করিতেছে। আজ চুরি করিতে বাহির হইলে বারণ করিবার কেহ নাই, পথ চাহিয়া কেহ বসিয়া থাকিবে না।

। ৯২ ।

তুই চুন্নী না কাড়িস আও[১]
আপন-আপন খাইয়া যাও ;
বেশী করি' আও কাড়িলে গে হে চুন্নী
হের্ দেখিস তুই খড়ি-কাটা দাও ॥

আজি কি যাতনা ভোগ করেছো গে চুন্নী
বুঝিবে আর কাঁয় ;
কি সাপিনী ডংশিল্ মোকে
হায় রে বিধি হায়-হায় ॥

আজি পঞ্চম রসের বিষের জ্বালা গে চুন্নী
মন মোর ছতোকার[২] ;
আজি কী যে করে দারুণ বিধি
কোন্ বা ছলে খিলাইল্[৩] বিধি
দো-আনিয়া ভাখা[৪] ॥

কান্দে মন মোর বিরলে বসিয়া গে চুন্নী,
এইটা রোগের কী যে ফল দাঁড়ায় ;
ওকি হায়, মরি মোর হায়-হায় ॥

গৌরীশঙ্কর ধবলগিরি
ওইঠে ওই ওষুদের ভুরি[৫]
ওষুদ আনা বিষম দায় ;
এমন জন মোর কাঁয় বা আছে
এমন বান্ধব হবে কাঁয় ॥

১ কথা বলিস না ২ ছত্রকার ৩ খাওয়াইল ৪ চালের গুঁড়ার পিঠা ৫ ঔষধ পাইবার স্থান।

CENTRAL LIBRARY

। ৯২ ক ।

হাল-গিরস্তি ছাড়িয়া রে মন,
কুপথে করিলো গমন
ওরে আমার রবোধ[১] মন ॥

আজি বজ্‌রো ভাঙ্গিয়া পড়োক মাথাত্‌
ও মোর বাঁচি'র[২] নাইরো[৩] সাধ ;
এ দেহা মোর মাটি খাবে
করোলার ভাঙ্গাত্‌[৪] ॥

ছাড়িয়া মন হাল-গিরস্তি
করিলো চুরি ;
নাই দেখিস তে দেখ্‌ শালার মন
জোলপইগুড়ি ॥

ও আর সহনে না যায়
ও মোর বুক ফাটিয়া রে যায় ;
নৌতন[৫] করিনু বিহু[৬]
নাই করোঁ নদারীয়াও[৭] ;
ঝাংগাও-ঝাংগাও করে[৮] গাও ॥

এ সংসারের সুখ্‌খো[৯] ভোগ তুই
করিবায়[১০] মোক্‌ আর নাই দিলো ;
ওহোরে বিধি,
আশানলে আমার প্রাণো গেল ॥

১ অবোধ ২ বাঁচিবার ৩ নাই। "রো" অর্থহীন ৪ 'করলা' জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যস্থিত একটি নদী। এই নদীর তীরেই জলপাইগুড়ির শ্মশান ৫ নূতন ৬ বিবাহ ৭ নবদারার সহিত স্ত্রী-আচার ৮ শির-শির করে ৯ সুখ ১০ করিতেই।

CENTRAL LIBRARY

। ৯২ খ ।

চুন্নী, চিরয়দিন[১] করিয়া চুরি
ডুবিনু পাপতে ;
পরকালের গতি গে চুন্নী
কি হোবে[২] মোরে[৩] ॥

শুনেক চুন্নী গে,
এই সন মুই করিছুঁ মন,
আর না করিম্ চুরির মন ;
ধম্মে-কম্মে ওগে চুন্নী
কাটাইম্ জীবোন ॥

শুনেক চুন্নী গে,
দানো ধম্মে পুজা-আদি
পুন্নিমা আর একাদোশী[৪]
উপাস করিম্ চুন্নী গে
পরোকালের নাগি' ॥

ওগে, চুরির কাইয্য আর না করিম্
দুই হাতে মলেছোঁ কান ;
এতে যুদোক[৫] মুক্তি হামাক[৬]
দেয় ভগোবান ॥

। ৯২ গ ।

চোর-মড়াটা বৈরাগী হইছে[৭] ;
ও মোর বাই[৮] গে,
আরো মাথার চৈতন-টিকি আখিছে ॥

১ চিরদিন ২ হইবে ৩ আমার ৪ একাদশী ৫ যদি ৬ আমাকে ৭ হইয়াছে ৮ দিদি ।

ওকি ওগে বাই,
পাড়িবা’ গেনু ছেঁকা[1] ;
আসিবার সম্[2] পানু দেখা—
চোর-মড়াটা বড়য়[3] কান্দিছে ॥

ওকি ওগে বাই,
বেড়েবার গেনু ওতি[4]—
ঘুরিয়া আইসেছো বাড়ী—
ছাওয়া দুইটা কাথা পুঁছেছে[5] ।
চোর-মড়াটা বৈরাগী হইছে ॥

॥ চোরচুন্নী : দ্বিতীয় পর্যায় ॥

। ৯৩ ।

শুন্ গে চুন্নী, ছাথেক বিরিয়া[6]
হুটা[7] আরো কী গে কী ;
মানখিলা সোগায় কহচে :
ছার্‌কেচের[8] বাতি ।
তাম্বুর[9] উপর আছে ওলাইট্-বাতি[10] গে
দেখা যায় চত্রুদ্দিগে[11] ;
দেখিয়া ছার্‌কেচের বাতি
চেঙ্গেড়াগিলায় করে বুদ্ধি—
জোগাড় করো পাইসা-কড়ি
চলো যাই জোলপইগুড়ি[12] ।
হোর্ দেখা যায়—
ছার্‌কেচের বাতি ॥

১ কলা গাছ পোড়াইয়া সেই ক্ষারে কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচাকে "ছেঁকা পাড়া" বলে ২ সময়ে ৩ বড়োই ৪ ওইদিকে ৫ জিজ্ঞাসা করিতেছে ৬ বাহির হইয়া ৭ ওইটা ৮ সার্‌কাসের ৯ তাঁবুর ১০ ডেলাইট, আসলে ইলেকট্রিক আলোর কথাই বলা হইতেছে ১১ চতুর্দিকে ১২ জোড়পাকড়ি হইতে চলো জলপাইগুড়ি যাই, সার্‌কাস দেখিয়া আসি ।

CENTRAL LIBRARY

স্থাখেক্ দি'[১] কতয় নোক গে
যা'ছে হোর্ দলে-দলে ;
ওগে আচম্বিতে আসিল্ ছুন্[২]
কতয় নোকের হলেক্ খুন।
কতয় নোকের হারাইল্ মাইয়া[৩]
গুণ্ডায় নিগাইল্ পালেয়া[৪] ;
নাই দেখোঁ মুই
হি মতন[৫] তামশা ॥

। ৯৪ ।

এই বছরে ওগে চুন্নী
মোজা ভাসিসে ;
যেইঠে-সেইঠে ওগে চুন্নী
কোম্পানি হইসে ॥

১ স্থাখ্ দিকি ২ ঝড় ৩ কতো লোকের বউ (মাইয়া) হারাইয়া গেল ৪ লইয়া পলাইল ৫ এই রকম।

১৯৫৩ সনে 'কমলা সার্কাস্' নামে এক সার্কাস্ দল জলপাইগুড়িতে সার্কাস্ দেখাইতে আসে। প্রতিদিন রাত্রিতে সার্চলাইট ঘুরাইয়া ইহারা বিজ্ঞাপন দিত। এই আলো জলপাইগুড়ির চতুর্দিকস্থ দশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম হইতেও দেখা যাইত। বর্তমান গানখানি জোড়পাকড়ি গ্রামের রবিধন রায় নামক জনৈক গায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। জোড়পাকড়ি জলপাইগুড়ি শহর হইতে আট মাইল পূর্বে। সেখান হইতে রাত্রিবেলায় এই সার্কাস্ দলের আলো দেখিয়া তথাকার যুবকবৃন্দ আকৃষ্ট হয় এবং চতুর্দিকস্থ বিভিন্ন গ্রাম হইতে দর্শকের ভিড় হইতে থাকে। ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৩ সনে জলপাইগুড়িতে এক প্রচণ্ড ঝড় হয়। তখন সার্কাস্ চলিতেছিল। ঝড়ে তাঁবু উড়িয়া যায়, বড়ো বড়ো খুঁটি উপড়াইয়া পড়ে, গ্যালারি ভাঙ্গিয়া যায়, যে করোগেটেড্ টিন-শীট দিয়া চতুর্দিকের বেড়া দেওয়া হয়, উন্মুক্ত প্রান্তরে সেগুলি তাসের মতো উড়িতে থাকে। বিশ সহস্রেরও উপর দর্শক সেদিন উপস্থিত ছিল। এই প্রলয় কাণ্ডে বহু নরনারী হতাহত হয়, দুর্বৃত্তের দল ইহারই মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া গুণ্ডামি শুরু করিয়া দেয়। চোর, চুন্নীর নিকট সেই ঘটনাই ব্যক্ত করিতেছে।

চুন্নী, তিস্তাবুড়ী হলেক্ বাদী[১]—
সাজায় থুলেক্ ভাব্নী-বাড়ী[২] ;
মান্ষি-গিলা ওগে চুন্নী,
সুক্কো[৩] করিল্ ॥

ওগে, নিভাতুয়া[৪] ভাত করিলেক্
জাত- ব্যবসা ছাড়িলেক্ ;
খ্যাড় কাটিয়া ওগে চুন্নী,
জীবোন বাঁচালেক্ ॥

ও মোর চুন্নী গে,
খ্যাড়ের শও হইল্ সাতটাকা
নাপিয়া[৫] নেছে[৬] দুই ফুট ঢেকা[৭] ;
আরো চা'ছে ওগে চুন্নী
লাম্বায়[৮] এলুয়া[৯] ।

যাঁয় যতো লাম্বা দিবে
উয়ার দাম বেশী হোবে ;
মরিবার ভয়ে মান্ষিগিলা
কাঁহোয় না করে[১০] ॥

। ৯৫ ।

চুন্নী, আজি না যাইম্ গে খ্যাড় কাটি'র ।
খ্যাড়-বাড়ীত্ হইসে বাগের ভয়[১১] ।
হিমন করি'[১২] ওগে চুন্নী
যাওয়া গে না যায় ॥

১ তিস্তায় বন্যা উঠিল ২ ভাব্নী ঘাস, কাশের মতো ঘাস ৩ সুখ। 'দুঃখে'র অনুকরণে ৪ যাহার খাইবার নাই ৫ মাপিয়া ৬ লইতেছে ৭ খড়ের আঁটির মাপ ৮ লম্বায় ৯ আলে হওয়া কাশকে 'এলুয়া' বলা হয় ১০ সাত টাকা করিয়া খড়ের আঁটির শ' উঠিলেও, 'নিভাতুয়া' ছাড়া কেহই বাঘ ইত্যাদির ভয়ে ভাব্নী ঘাস কাটিতে যাইতেছে না ১১ বাঘের ভয় ১২ এই রকম করিয়া।

CENTRAL LIBRARY

চুন্নী, ভাবুনী-বাড়ীত্[১] এলুয়া খ্যাড়[২]
কঠিন হইসে[৩] সংসার ;
কেইনং করি'[৪] খ্যাড় কাটিম্ মুই
বাগের পায়া সাড়্[৫] ॥

ওগে, স্থান্দেয়া[৬] ভাবুনী-বাড়ী
দেখেছুঁ মুই হিতি-ছতি[৭] ;
এমন সম্[৮] বাগ আসি'
দেখে মোর ভিতি[৯] ।
ওই কাথা শুনিয়া মুকুন্দ
দৌড়ায় বাড়ীর দি'[১০] ॥

। ৯৫ ক ।

নইজ্জা নাই তোর ওগে চরা,
নইজ্জা নাই তোর মুখোতে ।
মুখের আগত্[১১] মানুষিগিলা
কি কাম করেছে ॥

শুনেক্ চরা গে,
খ্যাড়-বাড়ীত্ হ'ছে মজা ।
টিরু, দয়াল, ঢেপেরাগিলা
ছয় টাকাত্ শত-গোটা
দে'ছে আনিয়া[১২] ॥

১ ভাবুনী ঘাসের বনে ২ আলের উপর হওয়া খড় ৩ হইয়াছে ৪ কেমন করিয়া ৫ বাঘের সাড়া পাইয়া ৬ প্রবেশ করিয়া ৭ এদিক-সেদিক ৮ এমন সময়ে ৯ আমার দিকে ১০ বাড়ির দিকে ১১ চোখের সম্মুখে ১২ ছয় টাকায় একশ' আটি খড় বিক্রয় করিতেছে ।

ওগে, আর কতোয় নোক যেইঠে পা'ছে
সেইঠে দে'ছে—
টাকার লোভে আছে।
মুখের আগত্ মান্‌ষিগিলা
কি কাম করেছে[১] ॥

। ৯৬।

ভগোবান,
বাম্‌নী নদীটার[২] উঠিসে বান[৩]।
ও চরা,
হাল ধরিয়া যাইস আজি
বাম্‌নী নদীর উঠিসে তুফান ॥

চরা রে, ভাসিবো[৪] বাম্‌নীর জলে ;
ও চরা, বাম্‌নীর পাড়ে হাল বোয়ালো
হালে-গোরু[৫] চরা ভাসিবো জলে।
হোর্ ত্থাখেক্[৬] চরা জল বাড়েছে ॥

"এই ছিলো কোপালর নেখা
মরণ হইল্ বিধি জলে ভাসিয়া।
চুন্নী গে,
দেখা না হইল্ মরণ কালে।"
চরা রে, ভাসিবো বাম্‌নীর জলে ॥

১ গানখানি চুন্নীর উক্তি। পূর্ববর্তী ৯৫-সংখ্যক গান, যাহা চোরের উক্তি, এটি চুন্নীর পক্ষ হইতে চোরের নিকট তাহার উত্তর ২ ধূপগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত একটি নদী ৩ বান উঠিয়াছে ৪ ভাসিয়া যাইবি ৫ হালে-গোরুতে ৬ ওই ত্থাখ্।

। ৯৬ ক।

ওই গয়েরকাটার[১] হাট
না নাগে যাবার ;
পুল ভাঙ্গিসে[২] ডুডুয়া নদীটার[৩] ॥

সোদায়-সোদায়[৪] চোরা
নদীর জল বাড়েছে ;
না যাইস চোরা তুই
গয়েরকাটার হাটে।
আজি মরণ হবে রে তোর
ডুডুয়ার পুলে ॥

"আর ধুপগুড়ির চুন্নী
দখিন পাথে[৫],—
তিননম্বর যে পুল ভাঙ্গিসে,
পার হয়া আসিহুঁ চুন্নী কলার ভুরাতে[৬] ॥"

আর দহাই থাছো চোরা
ঘুরেক্ বাড়ীতে ;—
না নাগে তোর খরচপাতি[৭]—
ছাওয়ালা[৮] মরেছে[৯] চোরা প্যাটের ভোকেতে ॥

১ ধুপগুড়ি থানা হইতে সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান ২ ভাঙ্গিয়াছে ৩ ধুপগুড়ি ও গয়েরকাটার মধ্যবর্তী একটি নদী ৪ ক্ষণে-ক্ষণে, সব সময়ে ৫ দক্ষিণ দিকে ৬ এই স্তবকটি চোরের উক্তি ৭ খরচ-পত্র ৮ ছেলেগুলি ৯ মরিতেছে।

CENTRAL LIBRARY

। ৯৭ ।

বোটের[1] আয়ান[2] হয়্যা জারি
নোকের হইল্ সুবিধা ভারী ;
ফাও কাথাতে[3] মামেলা নাগাইল্—
ভাবে রে পথিয়া[4] ।
হুম্‌রা[5] মামেলা নাগাইল্ রে
সদরু আর পথিয়া ;
সাক্ষীক্ হাঁস খিলাইছে এক জড়া[6] :
শালাই-বিড়ি-পান-গুয়া ॥

হুলার[7] নাই নেখা-জোখা[8] ;
সাক্ষাই সাক্ষী নরপতি
অয় তো কিছু জানে না ·
সাক্ষী দিয়া বেশী হইচে
কর্ণধর আর গাঠিয়া[9] ॥

ও মরি রে, মরি রে হায়—
ভাবে রে পথি বসিয়া :
চিনিলে জা'গার নোকলাক্
সোগায় মিলি' ঠেলি' দিলেক্
কাঁকড়ের[10] গাইহাত্[11] ॥

১ ইউনিয়ন বোর্ডের ২ আইন ৩ শুধু শুধু, মিছামিছি ৪ পথিয়া নামক ব্যক্তি ৫ উহারা ৬ এক জোড়া হাঁস ঘুষ দিয়া সদরু পথিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করিয়াছে ৭ উহাদের, সাক্ষীদের ৮ সদরু এতোই সাক্ষী জোগাড় করিয়াছে যে, তাহার আর লেখাজোখা নাই ৯ পথিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া কর্ণধর ও গাঠিয়া সদরুর নিকট হইতে প্রচুর টাকা পাইয়া মোটা হইয়া গিয়াছে। অথবা, সাক্ষিগণের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়াছে ১০ কাঁকড়ার ১১ গর্তে। টাকার জোরে সদরু পথিয়াকে যেন কাঁকড়ার গর্তে অর্থাৎ জেলে ঠেলিয়া দিল।

CENTRAL LIBRARY

। ৯৮।

কলির দিন কি হইল্ রে
কহচুঁ মুই, শুন্ :
বাগের গালাত্ খুটার[১] মালা—
ছাগুয়ার গালাত্ নগুণ ॥

ভাই রে, কি হইল্ রে ভাই
কলির দিন :
বেটায় বাপোক্ ভাবে ভিন্[২] ।
বাপোক্ ছাড়ি' বেটায়
বগোল খায়[৩] ;
কেইনং[৪] হইসে শাগ-তোরকারি
শাগে না চাখায়[৫] ॥

॥ চোরচুন্নী : তৃতীয় পর্যায় ॥

। ৯৯ ।

একটা চোরচুন্নী গাও টুম্-টাম্[৬]
পাগেলা নিতাইর চান্[৭] ;
পাগেলা-পাগলী ধরিসে গান—
পাগেলা নিতাইর চান্ ॥

ডাঙ্গা না দহলা[৮]
নদী না নাহেলা[৯]
ভাসিয়া যা'ছে চোরচুন্নীর জান্[১০] ॥

১ কাঠের   ২ বেটা বাপকে ভিন্ন ভাবে   ৩ পৃথক খায়   ৪ কিরূপ   ৫ বেটার ঘরে রান্না-করা শাক-তরকারি কেমন হইয়াছে, বাপকে খাওয়ানো দূরের কথা, চাখিয়া দেখিতেও বলে না   ৬ টুম্‌টাম্ শব্দ করিয়া অর্থাৎ বাজনা বাজাইয়া একখানি চোরচুন্নীর গান গাই   ৭ পাগলা নিতাই চাঁদ। নিত্যানন্দ   ৮ ডাঙ্গা না নাবাল জমি   ৯ নালা   ১০ চোর ও চুন্নীর দৈহিক পার্থক্য ঘুচিয়া গেল।

CENTRAL LIBRARY

নাঙ্গলে-জোঙ্গালে[১]
পেনাটি[২] আর পাটাশ[৩]
ভাসিয়া যা'ছে চোরচুন্নীর জান্।
পাগেলা নিতাইর চান্॥

১ লাঙ্গল ও জোয়ালে ২ গোরু খেদাইবার লাঠিকে "পেনাটি" বলে ৩ লাঙ্গলের খিলকে "পাটাশ" বলে। বর্ষাকালে জলের দ্বারা ডাঙ্গা ও নাবাল জমি, নদী ও নালা যেইরূপ এক হইয়া যায়, লাঙ্গল ও জোয়াল যেরূপ একত্র হইয়া কাজ করে; পেনাটি আর পাটাশের মধ্যে যেরূপ গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সেইরূপ নিত্যানন্দের মানসলোকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ-রূপী চোর ও চুন্নী এক সত্তায় মিলিত হইয়াছে এবং ভাবোন্মাদনায় নিত্যানন্দকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

॥ নয়া খোয়া ॥

। ১০০ ।

ধোক্‌পকিয়া[১] নিছে[২] হাউলী[৩],
মাইয়া চড়াইল্ ভাত ॥

আগোন মাসের দিনা গে ভোজী[৪]
ধান কাটিবা' যা'ছুঁ মুই ;
দাদাক্ কইস্ খরচ আনে[৫]—
এই আট তারিখে[৬] নয়া খাইম্ মুই ॥

ঘর-বাড়ীলা[৭] ধুয়া-মুছা
করেক্ ভোজী তুই ;
বাপ-ভাইয়ার শ্রাদ্ধ
করিম্ আজি মুই ॥

। ১০১ ।

তুই রে দেউনিয়া-ভাই[৮],
তোর কাম-কাজের ধান্দা নাই ॥

১ জনৈক কৃষকের নাম ২ লইয়াছে ৩ ধান কাটা, ঘর তোলা, ইত্যাদি কাজের জন্য এক পড়শী অপরের বাড়ীতে যাইয়া বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়া আসে। বদলে সে খুশী হইয়া চা-পান-বিড়ি, সম্ভব হইলে ভাতও খাওয়াইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে অপরের বাড়ীতে খাটিয়া আসাকে "হাউলী খাটা" বলে এবং খাটানোকে "হাউলী নেওয়া" বলে ৪ বউদি ৫ দাদা যেন নবান্নের জন্য জিনিস-পত্র কিনিয়া আনে ৬ সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে নবান্ন খাওয়া হইয়া থাকে ৭ ঘর-বাড়ীগুলি ৮ বাড়ীর কর্তাকে 'দেউনিয়া' বলা হইয়া থাকে। বড়ো ভাইকে উদ্দেশ করিয়া ছোটো ভাইয়ের এই উক্তি।

CENTRAL LIBRARY

সোদায় দেখাইস তুই
দেউনিয়া-গিরি চাই ।
মোর ঢেনাটার খাবে কাঁয়[১]
কলাত্ মোর মাইয়া নাই[২] ॥

হোর্ স্থাগ্ ভোজী,
মান্ষি-গিলা নয়া খা'ছে[৩]
পাঁঠা-পারো কতয় স্থা'ছে[৪] ।
হামার পাইসায় জুটে নাই,
দেউনিয়ার খালি বাজার খাই[৫] ।
কি করিমো রং-হাউস-তাম্শা
সুখ্খো[৬] নাই গে, সুখ্খো নাই ॥

। ১০২ ।

ওই সোদরানী[৭] সাজেয়া দেও গে
মোর নগত্[৮] ;
মুই ঢেনাটা পালিম্ কইনাগত্[৯] ॥

ওগে, খরচখান[১০] করিস মেলা
ড্যাড় হাজার কিনিছুঁ[১১] কেলা[১২] ;
চট্ করিয়া সাজেক্ মাই গে,
হোর্[১৩] ডুবেছে বেলা ॥

১ আমি অবিবাহিতের ধন-সম্পত্তি কে খাইবে ২ আমার বউ নাই ৩ মানুষেরা নবান্ন খাইতেছে ৪ পাঁঠা-কবুতর কতই বলি দিতেছে ৫ এদিকে আমার পয়সা নাই, ওদিকে দাদা বাজারে যাইয়া নিজের জন্য জিনিস কিনিতেছে ৬ সুখশান্তি ৭ স্বজনাদির গৃহে নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়াকে "সোদর খাইতে যাওয়া" বলে। যে মেয়েরা সোদর খাইতে যায়, তাহাদের "সোদরানী" বলে ৮ আমার সঙ্গে ৯ নবান্নের সময় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। ইহাকেই বলে "কইনাগত্" ১০ জিনিস-পত্রাদি ক্রয় করাকে "খরচ করা" বলা হয় ১১ কিনিয়াছি ১২ দেড় হাজার কলা কিনিয়াছি ১৩ 'ওই দেখ', 'ওই শোনো' ইত্যাদি বোঝাইতে "হের্, হোর্" ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গানটিতে একদিকে অবিবাহিত পুরুষের প্রেম, অপরদিকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিবার বাসনা—দুইই ফুটিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

। ১০২ ক ।

উত্তর ঘরের ধাপোতে[১]
অধিকারীটা[২] কেলার ঢোনা[৩] কাটে ;
ও ট্যার-চখুই ছ্যাখে[৪] ॥
ওই মুই নারীটা ভুকাছুঁ আলোয়া ধান[৫],
অধিকারীটার ফাটেছে পোরাণ ॥

। ১০৩ ।

আজি আমো[৬], আমো, আমো,
আমো হরি রে—
আম সে নারায়ণ :
যারো ঘরে আছে পিয়া
আন্দে বাড়ে খায় ;
যারো ঘরে নাইরো[৭] মোর পিয়া[৮] রে
পরার মুখ্‌খো[৯] চায় ॥

আজি সকল ফুল ফুটিল্‌,
ও মোর সই হে—
না ফুটিল্‌ রে ব্যাল :
সোয়ামী আবিনে সই হে
মাথাত্‌ নাই মোর ত্যাল ॥

১ উত্তর দিকের ঘরের সিঁড়িতে ২ পুরোহিতটা ৩ কলাগাছের বাকল,—যাহাতে পুজা- শ্রাদ্ধাদির উপচার নিবেদিত হইয়া থাকে ৪ চোখ বাঁকাইয়া দেখিতেছে ৫ আতপচাল ৬ রামো, রাম ৭ নাই ৮ প্রিয়া, প্রিয় ৯ পরের মুখে।

আজি সকল ফুল ফুটিল্,
ও মোর সই হে—
না ফুটিল্ মাকই[১] রে :
সোয়ামী আবিনে সই হে
মাথাত্ নাই মোর কাঁকই ॥

আজি সকল ফুল ফুটিল্,
ও মোর সই হে—
না ফুটিল্ তিসি রে :
সোয়ামী আবিনে সই হে—
মুখ্খে নাই মোর হাসি ॥

আজি সকল ফুল ফুটিল্,
ও মোর সই হে—
না ফুটিল্ রে দুবা[২] :
সোয়ামী আবিনে সই হে
মুখে নাই মোর গুয়া ॥

আজি আষাঢ়ো শাবনো মাসে
ও মোর নয়া বিতিরি ধান ;
কেহ মোর কাটে, কেহ মোর মাড়ে—
কেহ করে নবান্ ॥

১ ভুট্টা ২ দুর্বা।

। ১০৪ ।

নয়া খাইয়ঁ, নয়া খলাত্ ভাজিয়ঁ খই[১] ;
দো-ভাতারীর বেটীটার[২]
এলানে[৩] বিয়াও হইল্।
বোলো বোলো, হয় নাতেন কি[৪] ॥

১ নতুন খোলাতে খই ভাজিয়াছি ২ যাহার দুইটি স্বামী, সেই মেয়েটির মেয়ের ৩ এখন
৪ বলো বলো, ইহা সত্য নয় তো কি।

নবান্নের সময় মেয়েরা অনেক রঙ্গ-তামাশা করিয়া থাকে। এই গানখানি তাহার একটি নমুনা।

CENTRAL LIBRARY

॥ পুষুণা ॥

। ১০৫ ।

আলো ধানের কালো পিঠা—
তিন গাহেনে[১] কুটে আটা[২] ;
নয়া হাঁড়ী কুমারের চাক :
যেই মতনকার পিঠা রে তুই
সেই মতনে থাক ॥

ফুল ফুটিসে[৩], গটা[৪] ধরিসে
ও মোর কালো পিঠা রে :
পিঠা উড়াইল্ মোর গগন-বাতাসে ॥

১ উদুখলের তিন মুষলে   ২ চাউল কুটিয়া আটার মতো করা হইল   ৩ ফুটিয়াছে   ৪ গোটা, কুঁড়ি। কথান্তর—

ওই ইঠো ধানের[১] পিঠো—
দুই গাহেনে[২] কুটো[৩] ।...

১ অর্থ নাই। 'পিঠো'র সহিত মিলের জন্যে 'ইঠো'   ২ দুই জনে মিলিয়া   ৩ কুটি।

CENTRAL LIBRARY

॥ হোলি ॥

। ভেড়া-ছোবা, ধুলিয়া, ঢুলিয়া ।

। ১০৬ ।

আজা[১] '—' এর[২] ভাজা রে ভাই
ডিমালি[৩] '—' এর[২] ঝোল ;
'—' ত্[২] ঢালিয়া দিসে[৪]—
নাফা শাকের ঝোল ॥

। ১০৬ ক ।

উড়িয়া যাছে গাং-চিলাটা
সনারে নেক্কুর[৫] ;
ফাটা'—' ত্[৬] সেন্দুর দ্যা'ছে[৭]
গঁসাই ঠাকুর ॥

। ১০৬ খ ।

গঁসাইর-ঘর[৮] ভাই ডোল্[৯] ডোলাইসে[১০] ;
ধান্‌ন্যা চুঁড়া,[১১] পানিয়া দই[১২]
'—' ত্[১৩]পাঝাইসে[১৪] ॥

১ নির্দিষ্ট কোন অর্থ নাই, 'ভাজা'র সঙ্গে মিল দিবার জন্য ব্যবহৃত ২ স্ত্রী-অঙ্গ বিশেষের উল্লেখ ছিল ৩ ছোটো ৪ দিয়াছে। গানখানি "ভেড়া ছোবা" দিবার সময় গীত হয় ৫ সোনার নূপুর ৬ স্ত্রী-অঙ্গ বিশেষের উল্লেখ ছিল ৭ সিঁদুর দিতেছে। গানখানি ঠাকুর পাটে তুলিবার সময় গীত হয় ৮ গোঁসাইগণ অর্থাৎ পুরোহিতগণ ৯ শোলা দিয়া তৈরি ডোলের মতো বস্তু, রং দিয়া চিত্রাদি আঁকা থাকে। পূজাদির সময়, পূজা-বেদীর উপর এই চিত্রিত ডোল ঝুলাইয়া দেওয়া হয় ১০ দোলাইয়্ ছে, ঝুলাইয়াছে ১১ যে চিঁড়ার মধ্যে ধান থাকিয়া যায় ১২ জোলো দই ১৩ স্ত্রী-অঙ্গ বিশেষের উল্লেখ ছিল ১৪ পাতিয়াছে। দই পাতা-কে "দই-পাঝানো" বলে। গানখানি পূজার প্রথমে গীত হয়। প্রসাদ বিতরণের সময়ও ইহা গীত হইতে পারে

। ১০৬ গ ।

ওই ফেন্নার[1] '—' টা[2]
দুয়ার-দেওয়া নাটি ;
হাতাশে[3] '—' না দেয়
টাড়ীর[4] চেঙ্গেড়ী ॥

। ১০৬ ঘ ।

তুই গে চেঙ্গেড়ী কি মুছেচিত্[5] ঘর ;
'—'[6] দিয়া পড়েছে[7] নউ[8],—
অঝার খবর কর[9] ॥

১ ফলনা-র ২ পুরুষ-অঙ্গ বিশেষের উল্লেখ ছিল ৩ ভয়ে ৪ পাড়ার ৫ মুছিতেছিস ৬ স্ত্রী-অঙ্গ বিশেষের উল্লেখ ছিল ৭ পড়িতেছে ৮ নহ, রক্ত ৯ ওঝাকে খবর দে। গানখানি পূজার পর গীত হইয়া থাকে।

CENTRAL LIBRARY

। মরি-স্থরিয়া, সরু-মোটা-ঢাডি-উত্রা-ভাঁড়া-ঠারোয়া ও বৈঠক-হোলি ।

। ১০৭ ।

বন্দনা করেছুঁ[১] জল,
জল দানোতে[২] হয় মহাফল ;
জল না হলে এই সন মুলুকটারে—
যায় রে অস্সাতল[৩] ।
চানে[৪] হয় সবো পাপক্ষয়ো
চানে হয় দেহা[৫] সুশীতল ॥

বিষ্ণুর পদে জন্ম জলের
ভগীরথ গঙ্গা আনিতে ভেটিল্[৬] কৈল্লাস ;
ওই গোঙ্গার ছিল আগে
শিবের শির রে বাস ।
গোঙ্গা মাওর মতন
করেছে লালন-পালন—
যতো জীবের হামার[৭]
না করে বাছ-বিচার ;
ঘিন্নাই নাই অহঙ্কার[৮] ॥

মাছ মারা কর ঘোল[৯]
উহি-বোয়ালি-শোল
নদীর পাড়ত্ বাজিয়া উঠিল্ রে খোল্[১০] ।
ভবের বাজার সাঙ্গ হইছে[১১] নোকটার,
গেইছে মা গোঙ্গার কোল[১২] ॥

১ করিতেছি ২ দানেতে ৩ রসাতল ৪ স্নানে ৫ দেহ ৬ গেল, উপস্থিত হইল ৭ আমাদের ৮ ঘৃণা-অহঙ্কার নাই ৯ মাছ মারিবার সময় জল ঘোলা করিয়া লইতে হয় ১০ মৃতদেহ লইয়া নদীর পাড়ে খোল-করতাল বাজানো হয় ১১ হইয়াছে ১২ গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে ।

জলের বড়ো গুণ রে ভাই
জলের বড়ো গুণ ;
লবণ-সাগর জল হইতে
তৈয়ারি হ'ছে নুন।
জল হাতে অঠৈয়া[১] ঝিনাই
যুগী করে চুন ॥

জলের নাথা[২] সোয়াদ নাই
চিনি আর মিঠাই ;
জল আবিনে[৩] যতো জীবের
জীবন রাখিতে ধাই[৪]।
জল বন্ধু রে ভাই ॥

জ্যৈঠ্-আষাঢ়ি দেওয়ার যদি
জল নাহি পড়ে ;
'—'[৫] তমার হাল-গারস্তি[৬]
অহা[৭] না যায় ঘরে ॥

ঝসিয়া[৮] কেত্‌কেতা হ'ছে[৯]
ন'দারী মাইয়ার গাও ;
গোড় ভিড়ি'[১০] থাকিলে কহে
হুতি[১১] কণেক[১২] যাও ॥

বরুল ম্যাঘ[১৩] যায়য়া গেলা[১৪]
ম্যাঘক্ জুড়িল্ তাও[১৫] ;
কি করেছেন শালার ম্যাঘ
জল আনিবা'[১৬] যাও।

১ উঠাইয়া ২ মতো ৩ বিনা ৪ কষ্টসাধ্য ৫ "দূর হউক" এই অর্থে অশ্লীল শব্দ ছিল, বাদ দিয়াছি ৬ হালকৃষি ৭ রহা ৮ ঝলসাইয়া ৯ এলাইয়া পড়িতেছে ১০ নিকটে ভিড়িয়া, ঘাইয়া। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১১ ওদিকে, হোথা ১২ একটু ১৩ বরুণ মেঘ ১৪ তখন ১৫ ক্রোধ দেখাইল। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১৬ আনিবার।

CENTRAL LIBRARY

কালা-কালা ম্যাঘগিলার
মুখত্ নাইরো আও[১] ॥

হাতী-শুঁড়া[২] যায়য়া সোন্দাইল্[৩]
সাগরের ভিতর ;
সাগরের উপরত্ সেলা
গড়্মড়ায় পাথর ॥

দূরে হাতে দুই নয়নে
পসন্ করিয়া[৪] ছাখ ;
আশোমান-জমিনে ভাই রে
নাগে গেইসে ঠ্যাক[৫] ॥

বন্দুঁ তোক হাতী-শুঁড়া রে কল :
সাগরে অঠালো[৬] রে টলোমল ;
ভাটিয়া সাগরের পানি
ভাসালো রে ভূমণ্ডল ॥

ওকি ও মরি রে,
ওরে সীতাকুণ্ডের জল গরম
বিনাগুনে উথুলে ;
জলের মহিমা হয়—
একধার[৭] জলের আশায়
জীয়া-পুতা[৮] অংসায়[৯] ॥

১ মুখে রা নাই ২ জলস্তম্ভ ৩ প্রবেশ করিল ৪ নজর করিয়া ৫ এতো বৃষ্টি নামিল যে আকাশটা যেন মাটিতে ঠেকিয়া গেল, ঝাপসা হইয়া আশমান-জমিন এক হইয়া গেল ৬ উঠাইলি ৭ একটু, এক পসলা ৮ জীবন, ছেলেপুলে ৯ অনুসন্ধান করে।

CENTRAL LIBRARY

মরিয়াও না মিটে আশা
তাঁহো[১] অংসায় জল ;
অন্নজল টুটিলে[২]
মন তোর কে যাবে বগল্[৩] ॥

ফাগু-গয়ার[৪] জল বন্ধুঁ
সত্ যা'ছে[৫] বালুর তলে ;
ওই গোঙ্গার জল পাওয়া যায়
কণেকে[৬] খোঁক্‌ড়ালে[৭] ॥

। ১০৮ ।

আসরে উঠিয়া এই সন কি বন্দনা গাই ;
মনের সঙ্গে[৮] ভাবি' দেখি
বন্দনায়[৯] না পাই ॥

বন্দিবার চাহাছুঁ[১০] বান[১১]
বান বড়ো গুণবান্
বানে আখিছে দুনিয়াই ॥

তুই রে বান সংসারের সার
তোর নাখাত্তি[১২] নাইরে আর
মনের সঙ্গে গ্যাখেছুঁ[১৩] মুই করিয়া বিচার ॥

১ তবুও ২ অন্ন-জলের প্রয়োজন ফুরাইলে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে ৩ পার্শ্বে ৪ গয়ার ফল্গু নদী ৫ স্রোত যাইতেছে, বহিতেছে ৬ অল্প একটুই ৭ খুঁড়িলে ৮ মনের মধ্যে। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ৯ বন্দনাই ১০ চাহিতেছি ১১ বান ও বাণ শব্দ দুইটির বিভিন্ন অর্থ লইয়া গানখানি রচিত হইয়াছে ১২ মতো ১৩ দেখিতেছি।

তুই না হলে কেনং করি'
বান্ধিনু হয়[১] ঘর ;
গুণেতে তোক বুঝা যা'ছে—
তুইহে[২] পর্‌মেশর।
পাগুড়ি বান্ধিয়া যদি
বিহোক্[৩] না যায় বর—
কইন্সা না অক্[৪] টইন্সা দিবে
কইন্সা-ঘরিয়া[৫] অর্।
ত্রিভুবনের মাঝে বান তুই
গুণের সাগর ॥

আরে আরে, ওরে বান
তুই হে আখিছিস[৬] জান্ ;—
মরদের বান শিকইখান্[৭],
বান না দিলে কমরটাত্
গামছাখান পিন্ধিবো কাত্[৮]।
তুই না হলে নোকলার এলা
হইল্ হয়[৯] বড়োয় ধাতুর্‌বাত্[১০] ॥

হে বান মোর,
ষোলো আনা আশা কইছে[১১]
মুলুকের নোকলা রে তোর।
তুই যদি না করিস দোয়া
গান-বাজন মোর যাবে বয়হা[১২]—
তুই মরদের বল
ইহকাল পরকাল,
উভয় কালের সম্বল ॥

১ বাঁধিতাম ২ তুই-ই ৩ বিবাহ করিতে ৪ উহাকে ৫ কন্যার ঘর অর্থাৎ কন্যা পক্ষীয়গণ। বহুবচনে "ঘর" ৬ রাখিয়াছিস্ ৭ কোমরের দড়িটি ৮ কিসে, কাহাতে ৯ হইত ১০ বিপত্তি, ঝঞ্ঝাট ১১ করিয়াছে ১২ বহিয়া।

জ্যৈঠ্-আষাঢ়ে বান অঠৈয়া[১]
ভাসেয়া[২] দেছিত্[৩] রে দহলাত্[৪] জল ;
বান না হলে নোকলার সেলা[৫]
খাটিবে কি কৌশল ॥

বান তো সামান্য নয় রে ভাই
বান তো সামান্য নয় ;
বাণের ভয়েতে হোর্[৬] বলি রাজাটা
পাতাল ঢুকিয়া অয়[৭] ॥

চিরখে[৮] আশোমান
ইন্দ্রে মারে বাণ ;
যতো নোক কয়
ও হয় রে হয় ॥

ও মরি রে,
নাশিতে ত্রিপুরের জান্
বাণ হইসে ভগবান,
ভগবান বাণ হইসে ওই সময় ॥

১ উঠাইয়া ২ ভাসাইয়া ৩ দিতেছিস ৪ নাবাল জমিতে ৫ তখন ৬ "ওই দেখ" এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ৭ লুকাইয়া রয় ৮ চমকায়।

CENTRAL LIBRARY

। ১০৯ ।

আসিছে[১] বলে উড়োজাহাত্[২]—
দেখিবো তে[৩] বাই[৪], চল্ যাই চল্,
চান্‌মারীর ডাঙ্গায়[৫] আথিছে কল[৬] ;
নাই দেখিস তে দেখা'ম্[৭] গে
জলপাইগুড়ির দখিন বগল[৮] ॥

নোকলা[৯] সগায়[১০] দেখিবা'[১১] গেইল্[১২] :
উয়ার[১৩] নগদ[১৪] নাই পারিবে এ্যাল্[১৫] ;
উকিল-মোক্তারের মাইয়া
দেখিবা' আইচ্ছে[১৬] ঢেল্[১৭] ।
সাজেক্ গে বাই,
চল্ যাই চল্'—
বান্ধিয়া যত আত্তীর দল :
উড়োজাহাতের তল[১৮] গে সেন্দামো[১৯]
করিয়া বল[২০] ।
দিমো গে হামেরা কম্পনীর দহাই[২১],
উড়োজাহাতের পিছা
ছাড়িমো নাই ॥

১ আসিয়াছে ২ উড়োজাহাজ ৩ দেখিবি তো ৪ দিদি ৫ চাদমারীর মাঠে। জলপাইগুড়ি শহরের দক্ষিণ দিকে, তিস্তার পাড়ে। এই মাঠের প্রান্তে একটি উঁচু ঢিবি আছে, সৈন্তরা সেখানে চাদমারী করিয়া থাকে। সাধারণ লোকসমাজের নিকট এই মাঠ (আগে ঘোড়-দৌড় হইত, এখন না হইলেও লোকে বলে রেসকোস) একটি বিস্ময়ের বস্তু। বহু গানে এই মাঠ ও ঢিবিটার উল্লেখ পাইয়াছি। শহর জলপাইগুড়ির **Air-field** বলিতে শহর হইতে কয়েক মাইল দূরের একটি জায়গা, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তাহার পরবর্তীকালে সাময়িকভাবে এই চাদমারীর মাঠটিই **Air-field** ছিল, মাঝে-মধ্যে সেখানে প্লেন নামিত। প্লেন নামিলে সাধারণ লোকসমাজে তাহা দেখিবার জন্ত রীতিমতো সাড়া পড়িয়া যাইত ৬ যন্ত্র। এখানে উড়োজাহাজ ৭ দেখাইব ৮ দক্ষিণদিকে ৯ লোকগুলি ১০ সকলেই ১১ দেখিবার ১২ গেল ১৩ উহার ১৪ সঙ্গে ১৫ রেলগাড়ী ১৬ আসিয়াছে ১৭ ঢের, অনেক ১৮ উড়োজাহাজের ভিতর ১৯ প্রবেশ করিব ২০ জোর করিয়া ২১ কোম্পানীর দোহাই।

CENTRAL LIBRARY

সাঙ্গো যত আড়ীলায়[১]
হামারো আছে কাঁয়[২] ;
কি দিয়া হোবে ভাগাভোগ[৩]
সথ হোউক হামার ওইটায়।
নিগাউক[৪] হামাক[৫] বিলাতত্
নাগাবে যে কাজত্[৬]
সে কাজত্ নাগিমোঁ হামরা
বান্ধিয়া কমর ॥

ওকি ও মরি রে,
এ্যাল্‌গাড়ী, ঠেল্‌গাড়ী[৭], বাইচ্ছিকেল[৮], মোটরকাট্[৯]
যতো কলের গাড়ী
উয়ার নাথাতি নাই রে আর।
নদ্দী-নালা-জঙ্গল-ঝাড়
উড়িয়া হ'ছে পার ;
ওগে, উড়োজাহাজত্ চড়ি'
ম্যাঘেরো গোড়ে-গোড়ে
বেড়ামোঁ গে,
দেখিমোঁ গে তুনিয়াই ॥

। ১১০ ।

কলিকালের রে ভাই
দুধ বেচায়[১০] হইল্ সার ;
ওরে জোগানের দুধ কাঁহোয়[১১] না দে'[১২]
চাইর পাইসার,
— ঠাকুর সেবিবার[১৩] ॥

১ বিধবাগুলি ২ আমাদের কে আছে ৩ জীবনের ভোগ কিইবা করিলাম ৪ লইয়া যাউক ৫ আমাদিগকে ৬ যে কাজে লাগাইবে ৭ ঠেলা গাড়ী ৮ বাইসাইকেল ৯ মোটর-কার ১০ বেচাই ১১ কেহই ১২ না দেয়, দেয় না ১৩ ঠাকুর পূজা করিবার জন্যও চার পয়সায় দুধ কেহ রাখিয়া দিতে চায় না, সবাই জোগান হিসাবে বিক্রয় করিয়া দেয়। ঠাকুরকে পূজা দেওয়াকে "সেবা দেওয়া" বলে। দুধ দিয়া পূজা করা হয়।

ভালে[১] হইছে দিন-বাজার[২]
পত্তি্য দিনে[৩] যা'ছে রে[৪] জোগান দিবার।
ও ভাই রে, দুধ বাড়ী ছেঁকিয়া—
চালত্ থু'লে তুলিয়া ;
অর[৫] ছোয়া[৬] বেড়াছে কান্দিয়া—
"দুধ খাম্, দুধ, খাম্" করিয়া :
খুরি একটা ধরিয়া[৭] ॥

অর বাপ কহছে গিজ্জিয়া[৮]—
ওরে দুধ খাবা' না নাগে[৯] রে,
ভাত খাও রে শাক[১০] দিয়া ॥

ওকি ও মরি রে,
ওরে শুনিয়া বাপের ধুন্দারি[১১]
ছাওয়া অহিল্ চুপ করি' ;
পাক্তরে[১২] ফেলাইল্[১৩] খুরি।
জা'গা-জমিন টিনের বাড়ী[১৪] আছে রে
দুধ বেচা'ছে তার নারী[১৫] ॥

১ ভালোই ২ জলপাইগুড়ির বাজারের নাম ৩ প্রত্যেক দিনই ৪ যাইতেছে রে ৫ উহার ৬ ছেলে ৭ একটি বাটি লইয়া। লইয়া অর্থে "ধরিয়া"। বাগ্ধারার বিশেষত্ব ৮ গর্জন করিয়া ৯ দুধ খাইতে হইবে না ১০ 'শাক' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে-কোন তরকারি বোঝাইতেই 'শাক' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ১১ ধমকানি ১২ পাক দিয়া, ছুঁড়িয়া ১৩ ফেলিয়া দিল ১৪ অধিকাংশ গৃহস্থই গরীব বলিয়া, তাহাদের বাসঘর খড়ের। সুতরাং যাহার টিনের বাড়ী, সে নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি—এইরূপ অনুমান করা হয় ১৫ 'নারী' অর্থে এখানে 'স্ত্রী'। স্ত্রী-লোক নয়।

ওকি ও মরি রে,
ওরে হিন্দু তাঁতী মোছলমান
সগারে[১] ওইখান্[২] দকান ;
নিকিয়া স্থা'ছে[৩] জোগান
ওরে পাইসা নাই তো
খা রে গুয়া-পান ॥

দুধ-আলা কহছে :
জোগানের দুধ মুই নাই বেচা'ম্ ;
ওরে জোগানের দুধ কি দিয়া পুরা'ম্[৪]।
ও ভাই রে, কি জোড়া দিমো জল
তাও আনিয়া থুইসে কল ;
খাটে না, খাটে না ভাই
ছলচাতুরী কেবল[৫] ॥

। ১১১ ।

শুন্ শুন্ ভাই রে
হামার[৬] দেশের কাথা ;
শুনিলে মরিবেন হাসি'[৭]—
—ওনাচার কাণ্ডলা[৮] ॥
ওকি ও মরি রে,
তমরা কেমন বিয়াও-অলা[৯] :
হোর্ স্থাখেন[১০] নদী যায়া
কুলচ্ছণ[১১] কুমতি করেছে তমার
সোদরানীলা[১২] ॥

১ সকলেরই ২ ওইটি ৩ লইয়া দিতেছে ৪ পুরাইব ৫ দুধে জল মিশাইব তাহারও উপায় নাই—কেননা জল পরীক্ষার মেশিন আনা হইয়াছে ৬ আমাদের ৭ হাসিয়া ৮ অনাচার কাণ্ডগুলি। বহুবচনে 'লা' ৯ যাহাদের বিবাহ হইয়াছে ১০ ওই দেখুন ! "দেখো, দেখ্" ইত্যাদির পূর্বে "হোর্" ব্যবহৃত হয়। "হের" হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় ১১ কুলক্ষণ ১২ আত্মীয়-স্বজনাদিকে "সোদর" কহে। স্ত্রী-সোদর এই অর্থে 'সোদরানী' এবং বহুবচনে 'লা'।

ওকি ও মরি রে,
যতো সোদর যুক্তি করি'
গাও ধ'ছে[১] নদী যায়া ;
ফোতা[২]-গোঁজী খ'সে থুইয়া[৩]
জলত্ নামিলেক্ যায়া।
কোন্ঠে-কেনার[৪] বাওড়ালি[৫] আসিল্
হুম্ হুম্ শব্দ করিয়া—
ফোতা-গোঁজী নিগাইল্ উড়িয়া[৬] ॥

হা' গে[৭] ভোজী[৮], হা' গে বাই[৮] —
কাঁহো পানে[১০], কাঁহো নাই[১১],
কেনং করি' বাড়ী যাই,—
চাইট্টা ফোতার ঘের সাজাই'[১২]
কুনোমতে বাড়ী যাই ॥

। ১১২ ।

কইনা তো জুড়েছেন[১৩] গে হে দাদা,
কই পুঁছেছেন মোক এক কাথা গে এক কাথা ;
মোক[১৪] ভালে নাগে কেইনং কইনা
জুড়েন তমরা[১৫] কি নাথা[১৬] ॥

১ ধুইতেছে ২ পাটানী। রাজবংশী মহিলার পরিধেয় বস্ত্র ৩ খসাইয়া থুইয়া ৪ কোথাকার যেন ৫ উড়ো বাতাস ৬ উড়াইয়া লইয়া গেল ৭ ওগো ৮ বউদি ৯ দিদি ১০ কেহ কেহ পাইলাম ১১ কেহ কেহ নাই পাইলাম, অর্থাৎ পাইলাম না ১২ চারিটি ফোতা দিয়া একটা ঘেরাটোপ বানাইয়া, তাহার মধ্যে সকলে ঢুকিয়া, কোনক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়া বাড়ী যাই ১৩ জুড়িতেছেন, সম্বন্ধ করিতেছেন। বাগ্ধারার বিশেষত্ব ১৪ আমাকে, 'আমার' অর্থে ১৫ আপনারা, বহুবচন হইলেও আসলে একজনকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইতেছে ১৬ কেমন।

CENTRAL LIBRARY

দেখ দেখি বড়ো ভোজী
সাত ছোয়ার মাও ;
তাঁহো[১] চেঙ্গড়ী মাইয়ার নাখা
দগ্‌মগাছে[২] গাও।
হায় হায় দাদা,
কেনং মুখের মিষ্টান্ আও[৩] ॥

দাদা, কইনা নাগে মোক ওই মতন ;
ভোজীর মতন ধাউলী[৪]
বড়ো খোঁপা-আউলী[৫] ;
ও মোর দাদা গে,
য্যামন জলে-ভাসা সাবোন ॥

ওকি ও মরি রে,
বড়ো মাছের মাঝের টুমা[৬]
মাইয়া নোকের গালের চুমা ;
ধামো মইধ্যে কাশী
চেঙ্গড়ী মাইয়ার হাসি ;
নামো মইধ্যে হরিবোল
মাগুর মাছের গরম ঝোল ;
ধনো মইধ্যে ধানে[৭] ধন
মাইয়া-পুত্র-কইনাগণ[৮] ;
এই কয়টা কাথা—
হয় না, না হয় একে মতন[৯] ॥

। ১১৩ ।

বাপ-মড়াটার মুখত্‌ লইজ্জা নাই,
ভাই-মড়াটার মুখত্‌[১০] পড়ুক ছাই।

১ তবুও ২ ডগমগ করিতেছে ৩ মিষ্ট রব ৪ ধবলী, ফর্সা ৫ খোঁপা আছে যার,—খোঁপা-আউলী ৬ খণ্ড ৭ ধানই ৮ স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা ৯ একই রকম ১০ মুখে।

CENTRAL LIBRARY

বিহোর[১] ব'স[২] মোর চলিয়া যা'ছে[৩]
ব্যাচেয়া খালেক্ নাই ॥

বাপমড়া, তোক ভাত আন্দিয়া দিম্
দনো হাতে খাইস ;
এক নোটা জলের বাদে[৪]
মোক যদি ডাকাইস[৫]—
ও মুই শুনিয়া শুনিবা' না হওঁ[৬]
বাপমড়া, অধিক ডাকালে
টেঁটোয়ারা[৭] ধরিম্ টিপিয়া ॥

গুকি ও মরি রে,
মাটির দেহা মাটিয়ে খাবে
'—'[৮] ভাতারটা নগদ্[৯] যাবে ;
বাড়ীর চেঙ্গেড়ার মন আখিলে[১০]
কত নাম করিবে ॥

। ১১৪ ।

সঙ্গদ্[১১] বর-ঘর ঘুরিয়া যায়া
এলা[১২] মিলিল্ মোর বুড়া হুলুহা[১৩] ;
বাইজে-বাজনে বিয়াও গে হ'চে
বুড়া বর গে, বুড়া বর ॥

যেলা[১৪] থাকেবার[১৫] নিগা'ছে[১৬] মোক
টুহি-ভাঙার[১৭] ঘর,
সেলা[১৮] বুড়া-বুড়া গন্দা'ছে গতর[১৯] ॥

১ বিবাহের ২ বয়স ৩ যাইতেছে ৪ জন্মে ৫ ডাকিস ৬ শুনিয়াও না শুনিবার ভান করিব ৭ টুটি ৮ অশ্লীল শব্দ ছিল, বাদ দেওয়া হইয়াছে ৯ সঙ্গে ১০ বাড়ীতে কাজ করে যাহারা, তাহাদের দেহ দান করিলে ১১ সঙ্গত, যোটক ঘর, উপযুক্ত ঘর ১২ এখন ১৩ বর ১৪ যখন ১৫ শুইবার জন্মে ১৬ লইয়া যাইতেছে ১৭ যাহার ঘরের 'টুই' ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ১৮ তখন ১৯ বুড়া বলিয়া মনে হইতেছে ।

CENTRAL LIBRARY

বুড়ার কলাতে[১] মা মোক
নিন্দে[২] ধরে না ;
আল্‌সি[৩] ধরে না ;
ওগে, মুই হনু[৪] চেঙ্গড়ী মাইয়া—
দাড়ীর সুড়সুড়ি মুই সবারে[৫] পারুঁ না ॥

দুখ-সুখ না বুঝে মোর
মা-জননী হয়া ;
জিউ মোর করেছে রে কারুণা[৬] ॥

ওকি ও মরি রে,
মাহাকালের[৭] আঙ্গা মাল
খাসী-ছাগল বুড়া বর[৮] ;
বুড়া বর গে, বুড়া বর :
হাউসের মূলান[৯] জানে না—
বাহেনাটা[১০] ছাড়ে না ॥

। ১১৫ ।

সুড়ুর-ঘুড়ুর[১১] করিয়া বন্দু[১২]
আইসেছিত্[১৩] কিতায়[১৪] ;
এ বন্দু আইসেছিত্ সদায়[১৫] :
আধ-আতি নিশারাতি
বেড়েবা'[১৬] আইসেছিত্[১৭] হামারতি[১৮] ;

১ কোলে ২ ঘুমই ৩ আবেশ ৪ হইলাম ৫ সহিবারে, সহিতেই ৬ দুঃখিত অর্থে 'করুণা' হইতে 'কারুণা'। প্রয়োগটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৭ মাকালের ৮ ছাগলের মতো দাড়ী ৯ মূল্য ১০ বাহানা। বিবাহ-গীতিরূপেও গানখানি পাইয়াছি ১১ সুড়-সুড় করিয়া, চোরের মতন ১২ বন্ধু ১৩ আসিতেছিস ১৪ কি জন্যে ১৫ সদাই ১৬ বেড়াইবার, বেড়াইতে ১৭ আসিতেছিস, আসিয়াছিস ১৮ আমাদের নিকটে। 'দিকে' এই অর্থে 'তি' চলিত আছে।

CENTRAL LIBRARY

পুঁছে যদি মোর মাও-জননী,—
সেলা কহছিত্[১] :
না-হায় গে ভাউজী,
বেডেবা' আসেছুঁ[২] তোমহাররতি[৩] ॥

পিরিত যদি করিবো বন্দু
সইত্য করেক্ আগত্ ছান্‌মাটি[৪] 'ধরি ;
বেটী ছাওয়ার বাহার হামার
ওই মতন বন্দু রে—
পুরুষ নোকের বাহার তমার
চিরদিন অ'ভে[৫] ॥

ওকি ও মরি রে,
আষাঢ়-শাওন ভাই পড়িলে
ঢেপের ফুল ভাই ফুটিবে ;
ফুল শুখিয়া যাবে।
মাটির ভিতর খালি শালুক
পড়িয়া অ'ভে ॥

। ১১৬ ।

বন্ধু, কাপোড়-চপড়লা[৬] বস্কা[৭] বান্ধেক
কান্দিবো তে কান্দেক[৮] ;
ও মোর বন্ধু রে,
মিছায়-ছাচায়[৯] কণেক[১০] ॥

১ কহিতেছিল ২ আসিতেছি, আসিয়াছি ৩ তোমাদের নিকটে ৪ গোবর ইত্যাদি হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা কর্ ৫ রহিবে ৬ বহুবচনে 'লা' ৭ বোঁচকা ৮ কাঁদিবি যদি তো কাঁদ ৯ মিছায়-সাচায় ১০ অল্প।

সাজেক[১] বন্ধু হাসিয়া
চল্ যাই বন্ধু পালেয়া[১] ;
কেটে[২] ক্যানে কান্দে দেশত্
বাপ রে মাও
তোরে কলাত্ জুড়া'ম্[৩] গাও।
তোরে নগদ[৪] পালেয়া গেলে
দেখিয়া আসিম্ বন্ধু
পছিম-পাখী[৫] ভোটের গাঁও[৬] ॥

ওকি ও মরি রে,
ওরে তিস্তা-তাল্মা-চাওই
কোরতো[৭] নদী পার হই ;
স্তাও[৭] নদীত্ জলপান খা'মো[৮]
মহানন্দা[৭]নদীটার পুল দিয়া যা'মো
বালাসনটার[৭] এই পারে র'মো[৯]।
তোরে কলাত্ জুড়া'ম গাও ॥

১ পলাইয়া ২ কথার মাত্রা ৩ জুড়াইব ৪ সঙ্গে ৫ 'দিক' বুঝাইতে 'পাখ' ব্যবহৃত হয়। 'পছিম পাখী' মানে 'পশ্চিম দিকের' ৬ ভুটিয়াদের গ্রাম ৭ তিস্তা, তাল্মা, চাওই, করতোয়া, স্তাও, মহানন্দা, বালাসন—জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ জেলার ছোটো-বড়ো নদীর নাম ৮ খাইব ৯ রহিব।

শ্রী দয়ারাম রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি)-এর নিকট হইতেও ১. ৬. ১৯৫৮ সনে এই গানটি পাওয়া গিয়াছে। গানটির উদ্বোধনী স্তবকের কথা সামান্য পরিবর্তিত হওয়ায় নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :

বন্ধু, পালাবো তে চল্ আজি—
পালেয়া যা'মো পছিম্‌তি[১] ;
দেশে কান্দেনা'নে[২] বাপো রে ভাই।
ভাই, তোরে কলায় জুড়া'ম্ গাও
দেখিয়া আসিমো বন্ধু
পছিম-পাখী[৩] ভোটের গাঁও[৪] । ইত্যাদি।

১ 'দিকে' বুঝাইতে 'তি'। পশ্চিম দিকেতে ২ কাঁদুক না কেন ৩ পশ্চিম দিকের ৪ ভুটিয়াদের গ্রাম।

CENTRAL LIBRARY

। ১১৭ ।

সোয়ামী, মুই যাছু[১] মাও-বাপোর ঘরে
এ্যাখেলায়[২] অহিবো[৩] ঘরে,
মন ষ্যামন করে—
মনটা যাবায়[৪] না চাহে।
ওকি মাওরিয়া-ছোয়ার[৫] নাখা[৬]
ওরে সোয়ামী কান্দিয়া বেড়াবো
সগারে[৭] ন'দারী দেখিয়া ॥

ওকি খাইস-দাইস, তুই বেড়াইস্
মোর বাদে তুই না ধান্দাইস্[৮] ;
অভা'[৯] যদি না পারিস্
মোর সোয়ামী রে,
আধা ভাদরে আনিবা' পেঠাইস্[১০] ॥

ওকি ও মরি রে,
ওগে সর্তা-সাজি[১১] পানের বাটা
চুনের ডুকি[১২] আছে তলা[১৩] ;
খয়ের-ডিকা[১৪] আছে রে সোয়ামী
টপোলা বান্ধা ॥

। ১১৮ ।

দে তো স্বামী পেন্‌টিখান[১৫]—
মুই বয়া বুঝোঁ[১৬] হাল ;
কাঁয়[১৭] আর খোয়াবে[১৮] তাংকু[১৯]
কাঁয় ধরিবে হাল।
বিধি মোরে হাউড়িয়া কোপাল[২০] ॥

১ যাইতেছি ২ একলাই ৩ রহিবি ৪ যাইতেই ৫ মা-মরাছেলের, এখানে স্ত্রৈণ পুরুষের ৬ মতন ৭ সকলেরই ৮ চিন্তা করিস না ৯ রহিতে ১০ আনিতে পাঠাইস ১১ জাঁতি ১২ চুনের পাত্র ১৩ তোলা, উপরে ১৪ খয়ের রাখিবার পাত্র ১৫ প্রাজন, পাচনবাড়িটি ১৬ বহিয়া বুঝি অর্থাৎ বহিয়া দেখি ১৭ কে ১৮ খাওয়াইবে ১৯ তামাক ২০ ভাগ্যহীন কপাল।

CENTRAL LIBRARY

ওকি ও মরি রে,
যা রে গোরু হালোত্ যা—
মোক দেখি' তুই ভড়কিস্ না[১] ;
মুই খোয়াও মাড়-মাক্তোই[২]
মোক চিনিস না,—
মুই হনু' তোর গারস্তের মাইয়া[৩] ॥

ওকি ও মরি রে,
গোরুটা হইল্ চণ্ডীয়া[৪]
মোক দেখি' গেইল্ ভড়কিয়া ;
ধর্ তো স্বামী হাল্খান্
ফোতা[৫] যা'ছে খসিয়া ॥

। ১১৯ ।

সকের উপর[৬] বিহানু[৭] ভাই
সুন্দোরী কইনা দিয়া[৮] ;
শালার কানা যম হইল্ নিদয়া ।
প্রাণের ন'দারীক্ নিগাইল্ মারিয়া[৯] ॥

বুক ফাটে ভাউশানীর[১০] শোগে[১১]...
মদন ভাই দনো জনা হয়...[১২]
ওকি ও, দুনিয়াই হইল্ নি-সাঁই[১৩]
জীয়ত্-শোগ[১৪] দিয়া গেইল্[১৫] রে প্রাণোর ভাই ॥

১ চমকাইয়া যাইস না, ভয় পাইস না ২ মাড়-জল ইত্যাদি ৩ বউ ৪ প্রচণ্ড, উগ্র, উদ্ধত, ক্রুদ্ধ ৫ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র ৬ সখ করিয়া। 'সখের উপর'—বাগ্ধারার বিশেষত্ব ৭ বিবাহ করিলাম ৮ কন্যা দিয়া বিবাহ করা অর্থাৎ কন্যাকে বিবাহ করা। প্রয়োগটি লক্ষণীয় ৯ মারিয়া লইয়া গেল ১০ ভাত্র বধূর ১১ শোকে ১২ গায়কের স্মৃতিভ্রংশের জন্য এই স্থানে দুই তিনটি পঙ্ক্তি মিলে নাই ১৩ বন্ধুহীন, দোসরহীন ১৪ আমরণ শোক ১৫ দিয়া গেল

ওকি ও মরি রে,
শুনেক্ পরামাণিক ভাই
দশের একটা আইজ্ঞা চাই ;
ভাউশানীক বেচা'ম্[১] নাই—
মুই-হে[২] নিগা[৩] করিম্ ভাই ;
দুই শ' টাকা কিতায় করিম্[৪]
হুকুম কর্, নিগার আজি খরচ কবিবা' যাই[৫] ॥
দুনিয়াই হইল্ নি-সাঁই···

। ১২০ ।

চৈতকে[৬] চাতকী পখী বলে পিয়া-পিয়া,
নৌতন ব'সে[৭] আড়ী হয়া—
এলাও[৮] যে মোর না জুড়ায় হিয়া।
তুই মোক সোয়ামী-হারা কর্‌লো রে বিধি ;
ও মোক নিন্দে[৯] নাই ধরে রে আতি[১০] ॥

হাত দুইখান মোর সোঁকো-পোঁকো[১১]
শেযা না হয় মৈলান[১২] ;
থাকি'র[১৩] সম্[১৪] কাঁয় বা আরো[১৫]
চা'বে গুয়া-পান ॥

১ আসল বক্তব্য বোধহয় এই : শাস্ত্র-মতো আর বিবাহ করিব না। ভাত্রবধূকে নিকা করিব। কেননা তাহাতে খরচ কম। তোমরা আমাকে নিকা করিতে অনুমোদন কর। আজ হইতেই তাহার জন্য জিনিসপত্র কিনিতে থাকি ২ আমিই ৩ নিকা ৪ দুই শ টাকা খরচ করিয়া কেন ফের বিবাহ করিব ৫ জিনিসপত্র কেনাকাটা করিতে হাটে-বাজারে যাওয়াকে 'খরচ করিতে যাওয়া' বলা হয়। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ৬ চৈত্র মাসে ৭ বয়সে ৮ এখনও ৯ ঘুমই ১০ রাত্রিতে। বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই ১১ ধাকু-পাকু করে ১২ বিবাহ হইবার পর শয্যাও মলিন হয় নাই, অর্থাৎ বেশী দিন হইল বিবাহ হয় নাই ১৩ থাকিবার অর্থাৎ শুইবার ১৪ সময় ১৫ কে বা আর।

ওকি ও মরি রে,
হরিষ-মনে[১] কান্দু[২] শেযাত্
খাবায়[৩] না মনায় ভাত ,
নিন্দের আলিসে হাত্তেয়া[৪] রে দ্যাখেচু[৫] :
সোয়ামী নাই মোর কলাত্ ॥

। ১২১ ।

বাপোই,
ডাঙ্গুয়া[৬] খোটিয়া[৭] নাগালো ময়হা[৮]—
পালালো ছাড়িয়া[৯] ।
বাপোই, তোক না দেখিয়া
মন কান্দে মোর মনত্ ;
ওকি রে, দেখা হইল্ পচাগড়ের হাটত্ ॥…[১০]
কিতায়[১১] ছাড়িলো তুই মোর ময়হা ॥

ওকি ও মরি রে,
নায় নায়[১২] ডাঙ্গুয়া আসিলো
গালত্ চুমা কতয়[১৩] খালো ;
দয়া-ধর্ম কোন্ঠে ছিল
তোর মাঝে রে ;
ডাঙ্গুয়া রে, তুই শোপ্-পড়া[১৪] ॥

১ বিষাদমনে, অবিরাম ২ কাঁদি ৩ খাইতেছি ৪ হাত দিয়া অনুভব করিয়া ৫ দেখিতেছি, দেখি ৬ বিধবারা পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়বার গৃহীত স্বামী তিন রকমের হইতে পারে। 'ডাঙ্গুয়া' হইল সেই তিন শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর দ্বিতীয় পক্ষীয় স্বামী ৭ খাটিয়া ডাঙ্গুয়া থাকা এই অর্থে 'ডাঙ্গুয়া খাটা' ৮ মায়া লাগাইলি অর্থাৎ প্রেম করিলি। প্রেম করা এই অর্থে' মায়া লাগানো'। বাগ্ধারার বিশেষত্ব ৯ ছাড়িয়া পলাইলি ১০ অশ্লীলতার জন্য একটি পঙ্ক্তি বাদ দিলাম ১১ কি জন্যে ১২ নয়া নয়া, নূতন ১৩ কতোই ১৪ তুই শোকে অভিভূত হ'। গালি বিশেষ।

CENTRAL LIBRARY

। ১২২ ।

কালা মেঘা নাগিল্ যায়া গে
ওগে আবো, আড়া মেঘার গায় ;
চায়া দেখ্ ভাই আকাশ পাখে[১]
ক্যামন শভা হায় রে হায় ॥
ও মোর আবো গে,
ওই মতন তোর নাতিটা
মোরে কলাত্ শবায়[২] ॥

আবো, গেলো বেলি হাসি গে, ওগে হাসি
মাইয়া নোক হামেরা[৩]
পুরুষের গে হামেরা দাসী ॥

আবো, মুই নারী হুমন্ না হও[৪]
কাহাবাজী[৫] মোর নাও[৬] ;
হয় না'নে[৭] চণ্ডীয়া-ভাতার[৮]
হুলাক্[৯] মুই না ডরাও।
ও মোর আবো গে,
ওগে, জরের আলে[১০] তোর নাতিরঠে
চিপিয়া নেও গে পাও[১১] ॥

মরি রে মরি রে হায় হায়,—
যেলা[১২] আবো খরাক খাও[১৩],—
তোর নাতিক নাটানি নাটাও[১৪] ;

১ দিকে ২ শোভা পায় ৩ আমরা ৪ আমি ওই রকম নারী নই ৫ গলাবাজী যে করে, তাহাকে 'কাহাবাজী' বলে ৬ নাম ৭ হোক না কেন ৮ বদরাগী স্বামী ৯ উহাদিগকে ১০ অছিলায় ১১ জ্বরের অছিলায় তোর নাতিকে দিয়া পা টিপাইয়া লই ১২ যখন ১৩ খাইতে দিই। বাগ্ধারার বিশেষত্ব ১৪ খুনসুটি করি। বাগ্ধারার বিশেষত্ব।

খায়য়া-দায়য়া যেইলা বাঁচে—
সেইলা তোর নাতিক খয়াও[১]।
হে হে হে,
নেমন-মুহীটাক্[২] ভাতারে মারে ॥

। ১২৩ ।

ও মোর আজু[৩] রে,—
হোলোটিয়া[৪] ছাড়া-কাঠিখান[৫]
কেইনং[৬] শবাইসে[৭] ॥

ওকি ও মরি রে,
এগিনার শবা[৮] বউ-বেটি
মাথার শবা সিঁতাপাটি ;
কানের শবা মাখিড়ি।
হোলোটিয়া ছাড়া-কাঠিখান
কেইনং শবাইসে ॥

ওকি ও মরি রে,
ঘরের শবা ধারা-চাটি[৯],
শেযার[১০] শবা ঝালক-চটি[১১] ;
কলার[১২] শবা নয়া-ন'দারী[১৩]।
হোলোটিয়া ছাড়া-কাঠিখান
কেইনং শবাইসে ॥

১ খাইয়া-দাইয়া যেগুলি বাঁচে, সেইগুলি তোর নাতিকে খাইতে দিই ২ মুখচোরা নারীকে ৩ দাছ্, ঠাকুরদা, দাদামশাই ৪ লম্বা, ঢিলেঢালা ৫ একধরণের মালা বিশেষ ৬ কেমন ৭ শোভা পাইয়াছে ৮ শোভা ৯ ঘরের বেড়া ১০ শয্যার ১১ লেপ, তোশক এবং হাতে তৈরি সতরঞ্চি ১২ কোলের ১৩ নতুন বউ।

। ১২৪ ।

বেটা থাকিল্[১] মোর, বহু[২] থাকিল্
থাকিবার বাদে[৩] মোহো[৪] খাচুঁ পান ;
পছিম্‌তিকার[৫] একটা ঢেনা[৬]
বেনাত্[৭] মারলে টান—
মন মোর কইল্লে ছাতুখান[৮] ॥

হায় রে হায় রে, অসিক রে ঢেনা—
ও তুই বেনা বাজেবা' শিখিলো খোব ;
হায় রে হায়,
ঢেনাটা মোর দেওরা রে হোক ॥

ও মরি রে,
যেলা আছিনুঁ চেঙ্গেড়ী-বেলা—
কতই কইছুঁ অঙ্গের খেলা ;
কত চেঙ্গেড়াক্ শিখাইছুঁ রে
বারপাইতা ছাম-খোটোই খেলা[৯] ।
তাঁহো[১০] মনটা করেছে মোর
শর্‌শর্-গর্‌গর্[১১]
স্তাখেক্ পর্‌মেশ্বর ;
বজর-পড়া বেনাটায় আচ্ছায় কহচে গে—
টাংঘীকাখী[১২], টাংঘীকাখী
ভাতার ধর্ গে ভাতার ধর্ ॥

১ শুইল ২ পুত্রবধূ ৩ শুইবার জন্য ৪ আমিও ৫ পশ্চিম দিকের ৬ অবিবাহিত বা বিপত্নীক পুরুষ ৭ তারের যন্ত্র বিশেষে ৮ খানখান ৯ আঞ্চলিক খেলা বিশেষ ১০ তবুও ১১ শিরশির ১২ লম্বা, ঢ্যাঙ্গা কাকীমা ।

। ১২৫ ।

আই, মুই পাকা সন্তরা[১] :
চেঙ্গেড়াগিলা পাতিল্‌ হাত ;
মুই নারীটা হসুঁ[২] গে আই
ডং-ঢরার[৩] পসাত্‌[৪] ॥

। ১২৫ক ।

আজি শুনেক রে চুকলু[৫] দাদা
শুনেক মন দিয়া ;
আজি ছিরবলের[৬] ধন নিমোঁ[৭] কাড়িয়া ॥

। ১২৫খ ।

চিহ্নু -চিহ্নুঁ নাগেছে[৮] বাপোই,
কি ভানি তোর নাম[৯] ;
ঠিক করিয়া কহছিনি[১০] বাপোই,
তোর কোতার কতো দাম।
বাপোই, এখে সঙ্গে[১১] বাড়ী যামো
তোর সঙ্গে মোর আছে বড়ো কাম ॥

ওহো রে বাপোই,
এতোলা[১২] যে কোতা বিরাইছে[১৩],—
তাক না করো ভাও[১৪] ;
তোর কোতা দেখিয়া মোর
ভুল্‌সেছে[১৫] রে গাও :
দে একটা কোতা, নেও

১ কমলালেবু ২ হইয়াছি ৩ ডাং-ধরার। ধূপগুড়ির গ্রামদেবতা 'ডাং-ধরা' বা 'চাংভিম ঠাকুর'। ইঁহার হাতে ডাং (যষ্টি) আছে, তাই 'ডাং-ধরা' বলা হয় ৪ প্রসাদ ৫ জনৈক পুরুষের নাম ৬ জনৈক স্ত্রীলোকের নাম ৭ লইব ৮ চিনি চিনি লাগিতেছে ৯ কি যেন তোর নাম ১০ বল্‌তো ১১ একই সঙ্গে ১২ এতোগুলি ১৩ বাহির হইয়াছে ১৪ দাম করা ১৫ ভুলিয়াছে, কাঁপিতেছে।

CENTRAL LIBRARY

তোক বলে 'দাদা' কওঁ—
মাসী হয় তোর মাও।
বারো আনা কইসুঁ[১] ফোতা
বেশ কহিছুঁ ভাও রে—
দে রে ফোতা,
নাই কাড়িস তুই আও[২] ॥

। ১২৬ ।

ওকি গে নাতিনী,
আইসোক্ কি না আইসোক্ বর[৩]—
খালি সিঁতা পাড়িয়া মর্[৪] ॥

ওহো গে নাতিনী,
মটুক-কেশী[৫], খড়ম-পায়ী[৬]—
আরো উচল-দাঁত[৭] ;
নাতিনী গে,
কাঁহোয়[৮] তোক না জুড়ে ওইলা কাথাত্[৯]।
কাঁহো[১০] একহাত আগা'ছে[১১] যদি
পাছা'ছে[১২] তিন হাত ॥

১ কহিয়াছি ২ কথা বলিস না ৩ বর আসুক বা না আসুক ৪ চুল বাঁধিয়াই মর্ ৫ কোঁকড়া চুল যাহার। কোঁকড়া চুলকে কুলক্ষণ বলিয়া মনে করা হয় ৬ খড়মের মতো যাহার পা ৭ উঁচু দাঁত ৮ কেহই ৯ এই সকল কারণে ১০ কেহ ১১ আগাইতেছে ১২ পিছাইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

মাই, তুই কইনাটায় কুঠাট[১] :
আরেক ঘর যে ম্যান্-ম্যানাছে[২]
হামারে পাড়াত্[৩]—
তোর কাথা পাড়িতে উমার[৪] ঘটিছে পরমাদ[৫] ;—
খাবার বইচ্চে[৬] বরের খুড়া
টুঁটিত্ নাগিছে ভাত[৭] ;
জল আনিবার গেইছে বরের খুড়াই
পড়িয়া গেইছে চুয়াত্[৮] ॥

গে নাতিনী,
ওগে, উচিত কাথা কহছোঁ[৯] মাই—
এই বছর বিহো হোবে নাই ॥

। ১২৭ ।

কি কাথা শুনালো গে সোয়ামী,
তোর বড়ো কটুর হিয়া[১০] ;
দিয়া ধন কাড়িয়া নিলেন
ও মুই কিসে বান্দিম্[১১] হিয়া ॥

। ১২৭ক ।

আজি কোপাল রে মোর :
ওরে ধন-সম্পত্তি-জমিদারী
ওরে বেটা-পুত্র কলার নারী—
সবে অইল্[১২] মন তোর পড়িয়া ।
আজি অন্‌জল্[১৩] থাকিতে যামো
যমের দুয়ার ॥

১ কুলক্ষণ যুক্ত ২ নিমরাজী হইয়াছে ৩ আমাদেরই পাড়াতে ৪ উহাদের ৫ বিপদ ঘটিয়াছে ৬ বসিয়াছে ৭ গলায় ভাত ঠেকিয়াছে ৮ কুয়ার পাড়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে ৯ কহিতেছি ১০ কঠোর হিয়া ১১ বান্ধিব ১২ সবই রহিল ১৩ আয়ু ।

CENTRAL LIBRARY

॥ মদনকাম ॥

। ১২৮ ।

ও মোর আবো[১] গে,
হাউসের দিন[২] মোর
যা'ছে গে বয়হা[৩] ।
না খাঁও[৪] আবো দহি-চুঁড়া
করেক্ আবো চাউলের গুঁড়া[৫] ॥

আবো, বাড়ীত্ চেঙ্গেড়া আছে[৬]—
যেলায়[৭] ছ্যাখে মোক
সেলায়[৮] হাসে ;—
কুন্ দিন বা মোক ধরিয়া যাবে[৯] ॥

। ১২৮ক ।

ও মোর আবো গে,
মন কান্দেছে[১০] অয়া-অয়া[১১] সোয়ামীর বাদে[১২] ।
বিনা দোষে মোর সোয়ামীক
দিলেন ঘুরিয়া[১৩] ॥

১ দিদিমা, ঠাকুরমা ২ যৌবনের রঙীন দিন ৩ বহিয়া চলিয়া যাইতেছে ৪ খাইব না ৫ চাউল ভাজিয়া তাহা গুঁড়া করিয়া খাইতে রাজবংশীরা খুবই ভালোবাসে। সাধারণত বুড়ারাই ইহা খায়। গানটিতে বলা হইতেছে, সময়মত আমার বিবাহ দাও নাই, আমি আজ বুড়া হইয়া গিয়াছি, দই-চিঁড়া খাইবার মত দাঁতের জোর নাই, আমাকে চাউল ভাজিয়া তাহা গুঁড়া করিয়া দাও ৬ বাড়ীর কাজ-কর্ম করিবার জন্য যে সকল নব-যুবক থাকে, তাহাদের কথা বলা হইতেছে ৭ যখনই ৮ তখনই ৯ কোন দিন হয়তো তাহাদেরই কেউ আমাকে লইয়া যাইবে, অর্থাৎ বিবাহ করিবে ১০ কাঁদিতেছে ১১ রহিয়া-রহিয়া ১২ স্বামীর জন্য ১৩ আমাকে বিবাহ করিবার জন্য যে দেখিতে আসিয়াছিল, বিনা দোষেই তাহাকে পাত্র হিসাবে নাকচ করিয়া দিলে।

CENTRAL LIBRARY

আহার[১] শয়নে-স্বপনে দ্যাখোঁ[২]
মোর সোয়ামীর আইচ্চে জ্বর ;
মোরোঠে[৩] চাহা'ছে[৪] ওগে আবো
গরম জল ॥

আদ-আতি[৫] স্বপন ভাঙ্গি'
দ্যাখেছু[৬] মুই নয়ন মেলি' ;—
মোর কোপালে ওগে আবো
নাইরো সোয়ামী ॥

। ১২৮ খ ।

আজি পাথরের নাখান্[৭] মুই
ডুবিয়া যাছু[৮] গে হে,
আই, মুই শলার নাখান্ ভাসেছু[৯]।
মুই নারীটা উঠু-ডুবু করেছু ॥

ওকি ও মরি রে,
বাপো-মাও হইল্ নিদয়া
নাই করিলে সইত্য-সেবা,[১০]
ও মোর এই দশা—
ও মোর এই দশা ॥

। ১২৯ ।

ওহোই ওহোই[১১] আবো গে,
শেষাখান মোর খ্যাড়ে-খড়ি[১২]—
পাড়িবার একখান নাইরো চটি[১৩]
ভাত দেয় তে[১৪] না দেয় মোক তোরকারি ॥

১ আর ২ দেখি ৩ আমার কাছে ৪ চাহিতেছে ৫ অর্ধেক রাত্রিতে ৬ দেখিতেছি ৭ মতো ৮ যাইতেছি ৯ শোলার মতো ভাসিতেছি ১০ বিবাহের পূর্বে সত্যপীরের পূজা দিবার বিধি আছে। পূজা দেওয়া হয় নাই—অর্থাৎ বিবাহ হয় নাই ১১ সম্বোধন ১২ আমার শয্যায় কেবল খড় আর বিচালি পাতা ১৩ পাতিবার জন্য একটি কম্বলও নাই ১৪ দেয় তো।

কেনে যে আসিছু ওগে আবো,
শুনেক্ তুই মোরে :
চোপরআতিটায়[১] ওহো গে আবো
কাঁপেছু জাড়ে ॥

ওহোই ওহোই আবো গে,
দাদা মোকে মারে গে ধরি'
ওহো ভোজী মোক পাড়ে গে গালি ;
ভাত দেয় তে ওগে আবো,
না দেয় মোক তোরকারি ॥

। ১৩০ ।

বিয়াও দে গে দাদা
বিয়াও দে ;
বিয়াও না দিস্ তে থাকেছু মুই
ভোজীবুঠে[২] ।
দিনে-আতি মন ঝুরেছে
ন'দারীর বাদে[৩] ॥

একদিন, দুইদিন, দাদা চলি' যা'ছে রে[৪] —
পারোর[৫] মতন হোকোর্ মনটা[৬]
সোদায়[৭] বাকুরে[৮] ॥

১ সারা রাত্রিটাই ২ বিবাহ না দিলে, বউদির সহিতই ঘর করিব ৩ জন্যে ৪ একদিন, দুইদিন করিয়া দিন চালয়া যাইতেছে ৫ কবুতরের ৬ "হোকোর্" শব্দটি কথা ভাষায় বড়ো বেশী ব্যবহৃত হয়। "হোকোর্ মন" অর্থাৎ "ছুত্তোরি ছাইয়ের" মন ৭ সব সময়, সদাই ৮ কবুতরের মতো মনটা বউয়ের জন্য সদাই বকম্-বকম্ করে।

। ১৩১ ।

নাল খাড়ীখান[১] পিন্দিয়া[২] না[৩]
বেড়াছিত্[৪] ঢসক ধরিয়া[৫]।
ষ্যামন মাই তোর পাছিলা[৬] ভারী
ত্যামন শবাইসে[৭] নাল খাড়ী ;
ঢকে-ঢাকে হইছিত্ মাই গে
আচ্ছা ন'দারী[৮] ॥

। ১৩১ ক ।

ও তুই মোক ভাতার ধরেক্[৯] গে,
ও মাই তেইলানী[১০]।
যেলা তেলীটা যায় গোরু-বাড়ী[১১]
চাইর ঝন চেঙ্গেড়া তোর বাড়ী ;
ও মাই তেইলানী ॥

। ১৩১ খ ।

তোক বলে ব্যাচেয়া খা'চে[১২] গে
ভেলাকোপার উতরপাথায়[১৩]—
বড়ুয়া পাড়াতে ;
হির্ হির্-গির্ গির্ বাইজ বাজেছে[১৪]।
বন্ধু ধন,
তোক নেগেবার[১৫] আইসেছে[১৬] ॥

১ লাল শাড়ীটি ২ পরিয়া ৩ নিরর্থক ৪ বেড়াইতেছিস ৫ বাহার খুলিয়া ৬ নিতম্ব ৭ শোভা পাইয়াছে ৮ বেশবাসে ঠিক নববধূর মতো সুন্দর হইয়াছিস ৯ স্বামী হিসাবে গ্রহণ করাকে "ভাতার ধরা" বলে। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১০ তেলেনী ১১ গোরু চরাইবার মাঠে ১২ বিক্রয় করিয়া খাইতেছে ১৩ বেলাকোবার উত্তরদিকে। বেলাকোবা জলপাইগুড়ির একটি স্থানের নাম ১৪ বাজনা বাজিতেছে ১৫ লইয়া যাইবার ১৬ আসিতেছে।

। ১৩২ ।

ও তুই কোন্‌ঠে[১] গেলো[২] গে
ও মোর ন'দারী,
চট্‌ করিয়া আইসেক্[৩] গে বাড়ী ॥

কি ভানি[৪] কান্দেছে[৫] হোর্[৬],
কাইন্‌টা-বাড়ীত্[৭] চোদোর-গোদোর[৮]—
ধড় ছাড়িয়া জিউ পালা'ছে[৯] হোর্ ॥

খালি ঘর শয়তানের বাসা—
তুন্ নাঙ্গক্[১০] দিছিত্[১১] আশা
ছিবোচনীর পাঁঠা[১২] ॥

। ১৩৩ ।

আজি চালোতে পেনাটি[১৩] থুইয়া
তুই মোক এমন মাইরণ[১৪] মারিলো রে
সোয়ামী হয়া ॥
গোরা পিঠিখান[১৫] মোর
মাইরণ সহে না ;
ওকি গে ননন্[১৬] ছাইপড়ী[১৭],
মাইরো খিলালো[১৮] মোক ভাতার-সুয়াতী[১৯] ॥

১ কোন্‌স্থানে ২ গেলি ৩ আয় ৪ কি যেন, কে যেন ৫ কাঁদিতেছে ৬ কথার মাঝখানে, কথার কথা হিসাবে 'হোর্' ব্যবহৃত হয়। 'হের' হইতে আসিয়াছে মনে হয়। "হোর দ্যাখ্" অর্থাৎ "ওই দ্যাখ". ৭ বাড়ীর পেছনে, ঘরের কোণায় ৮ কান্নার শব্দ ৯ পলাইতেছে ১০ উপপতিকে, অবৈধপ্রণয়ীকে ১১ দিয়াছিস ১২ শুবচনীর উদ্দেশে ছাড়া পাঁঠার মতোই সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় ১৩ গোরু খেদাইবার লাঠি ১৪ প্রহার ১৫ ফরসা পিঠটা ১৬ ননদিনী ১৭ মুখে ছাই পড়িয়াছে যাহার। মেয়েদের গালি ১৮ খাওয়াইলি ১৯ স্বামী-সোহাগী। ইহাও গালি বিশেষ।

CENTRAL LIBRARY

। ১৩৪ ।

নদীর ঘাটত্ কদম গাছ
মোর কদম ফুটিছে[১] ;
কদম দেখি'[২] নারীর মন মোর
উথুলি'[৩] উঠিছে।
বন্ধুয়া, কদম পাড়েয়া[৪] দে ॥

মোর সোয়ামী বণিজে গেইছে[৫]
উজানিয়ার হাটে ;
ছয় মাসত্ না আসিল্ ফিরি'[৬]
মোর নারীটার ঘাটে।
বন্ধুয়া, কদম পাড়েয়া দে ॥

মরিসে[৭] কি আছে বাঁচি'[৮]
খবরে না পাওঁ[৯] ;
আনো তো পুরুত্তির পাত[১০]
নেখিয়া পেঠাওঁ[১১]।
বন্ধুয়া, কদম পাড়েয়া দে ॥

আর কয়টা দিন সবুর করেক্
গুণের বন্ধুয়া ;
খবর পা'লে তোরে[১২] নগদ[১৩]
ভাসিম্[১৪] বন্ধুয়া।
বন্ধুয়া, কদম পাড়েয়া দে ॥

১ ফুটিয়াছে ২ দেখিয়া ৩ উথলাইয়া ৪ পাড়িয়া ৫ গিয়াছে ৬ ফিরিয়া ৭ মরিয়াছে ৮ বাঁচিয়া ৯ খবরই পাই নাই ১০ কলার পাতা আনো তো ১১ লিখিয়া পাঠাই ১২ তোরই ১৩ সঙ্গে ১৪ ভাসিব।

॥ পাগলাপীর ॥

। ১৩৪ ।

কানী-পীরের নামস্তে ভুল্লালা[১] ;
ইকা করে টৌরত্‌-টারাত্‌[২]
ছিলিমের কটিত্‌[৩] ছাই—
এই বাড়ীর ভিক্ষা নিয়া
অন্য বাড়ীত্‌ যাই ॥

তোমার ঘরের জোড়া-জোড়া পই[৪] ;
কত্‌খুন্‌ থাকি'[৫] ঘেঙ্গাছি[৬]
ভিক্ষা মিলে কই ॥

ভাঙ্‌-বল্লার[৭] বড়য় বিষ ;
ফাইক্‌ করিয়া[৮] চাইট্টা ভিক্ষা দিস ।
কানী-পীরের নামস্তে ভুল্লালা ॥

১ কানী-পীরের নামে (নাম অস্তে—হিন্দীপ্রভাব) এই বাঁশ খাড়া করিয়াছি। একটি বাঁশকে শাড়ী পরাইয়া, উহার মাথায় চামরের মতো পরচুল লাগাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসে তাহা ফুরফুর করিয়া উড়ে। "ভুল্লালা" হইল সেই ফুরফুর করিয়া উড়িবার অনুকার শব্দ ২ হুঁকা খাইবার সময় যে শব্দ হয় ৩ ছিলিমের মধ্যে ৪ জোড়া-জোড়া খুঁটি। অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থ ৫ কতক্ষণ হইতে ৬ ঘেঙ্গাইতেছি ৭ বোল্‌তা বিশেষ ৮ বেশী করিয়া।

॥ ঘাটো পূজা ॥

নামানি

। ১৩৬ ।

রহে যা[1] গে ঘাটুশোরী
আজিকারে আতি[2] ;—
আজিকারে আতি শিয়ালো ভুকে
কুকুরো কান্দে ॥

সোগে দিনো[3] গেইল্ গে ঘাটু
তোক কাঁয় দিবে সাঞ্ঝাবাতি[4] ;—
গিরস্তেরে বহু[5], তাঁহে[6] দিবে সাঞ্ঝাবাতি ॥

মর্ত্ত-পুরী[7] গেলে গে ঘাটু
কাঁহে[8] সাঞ্ঝাবাতি ;
পাঞ্জিপুঁথি দেখো হে সই
চৈতের কয় দিনা আছে[9] ॥

সোগে দিনো গেইল্ গে ঘাটু
আছে দিনা চারি ;
দিনা চারি গেলে গে ঘাটু
কাঁয়[9] দিবে সাঞ্ঝাবাতি ॥

১ রহিয়া যা   ২ আজিকার রাত্রিটা   ৩ সব দিন   ৪ সন্ধ্যা প্রদীপ   ৫ গৃহস্থের পুত্রবধূ   ৬ সেই-ই   ৭ মর্ত্যপুরী   ৮ কে-ই বা   ৯ চৈত্র মাসের আর কয়দিন আছে   ৯ কে।

বসানি

। ১৩৬ ক ।

কালো হে মাটি, বান্দামো[১] পিঁড়া ;
গড়োঁ[২] হে মাটি, চালামো[৩] পিঁড়া।
তাহাত্ বসিয়া গেল্ ধনীকাকার খুড়া ॥
ধনীকাকার খুড়া নেও তো নাগে—
নেও তো ঝুড়ি ঝুড়ি পুড়ামো[৪] বাতি ;
সেওকেনা[৫] বাতি আধোকেনা রাতি ॥
দহিদুধো তিতা, গলায় নে মিঠা ;
বেইগনো বাড়ী, ভাইয়া আকোয়ারী[৬] ;
বেইগনো তুলুঁ[৭], এক কছা ভরুঁ[৮] ;
বেইগনো কাটুঁ[৯], সনার[১০] কাটারি দিয়া ;
বেইগনো ভাজুঁ, এক ঘিয়ে ডালুঁ[১১] ॥
থালাত্ নিলে থালভাত, কটরায়[১২] নিলে ঘি ;
চলিল্, বলিল্, গেইল্ দেওরা লালবাজার।
লালের বাজার যায়া বেসালে[১৩] সিন্দুরা ;
সেইকিনা সিন্দুরা হাজির কইরে বাবাজীর চরণে।
বাবাজী উঠিয়া বলে—"কি নাগে তমার" ;
"বাবাকে জামাই নাগে [১৪], সেই সোয়ামী হামার ॥"

১ বাঁধাইব ২ গড়ি ৩ সাজাইব, বানাইব ৪ জ্বালাইব ৫ সেইটি ৬ অবিবাহিত ৭ তুলি ৮ কোঁচড়ে ভরি ৯ কাটি ১০ সোনার ১১ ঘি-য়ে ঢালিয়া দিই ১২ বাটিতে ১৩ বেসাতি করিল, কিনিল ১৪ বাবার জামাই প্রয়োজন।

CENTRAL LIBRARY

চুমানি

। ১৩৬ খ ।

নদীয়ার[১] কিনারে গে আই,
আই, মোর কিসের বাইজন বাজে গে ;—
তোহোরে[২] সোয়ামী গে ময়না
দোসাসাধি[৩] করে গে ॥

সোয়ামী চুমাইতে[৪] গে আই,
কি কি দেহ[৫] নাগে ;
সোয়ামীক চুমাইতে গে ময়না
নাগে ধানো-দূবা ॥

সাধের সতিন চুমাইতে গে আই,
কি কি দেহ নাগে ;
সাধের সতিন চুমাইতে গে ময়না
নাগে ত্যাল-সিন্দূরা ॥

সোনার চালানী[৬] গে ময়না,
ময়না রূপার সর-সর বাতি[৭] ;
চালিনবাতি ধরিয়া গে ময়না,
সতিন চুমিবা' নাগে ॥

সোয়ামীক চুমাইতে গে আই,
আই, মোর মুখে হাসি রে কেশ[৮] ;
সাধের সতিন চুমাইতে গে আই,
আই, মোর চোখে পড়ে জল রে কেশ ॥

১ নদীর ২ তোরই ৩ দোসোরা সাদি, দ্বিতীয় বিবাহ ৪ বরণ করিতে ৫ উপকরণ ৬ চালুনবাতি, বরণডালা ৭ সারি সারি বাতি ৮ ইহা ধুয়া রূপে সমস্ত গানটিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নিজস্ব কোন অর্থ নাই।

CENTRAL LIBRARY

চালিনবাতি চুমাইতে গে ময়না,
ময়না সন্দালো[১] মন্দিল[২] ঘর এ কেশ ;
মন্দিল ঘরে সন্দেয়া গে ময়না
কেওয়াট নাগেয়া দিছে[৩] ॥

খাটে শুতে[৪] ময়না, জমিনে লুটায় কেশ ;
আজার বেটা সাজে গে আই,
আই, মোর ময়না কেতুর গাছে[৫] রে ও কেশ
তোহোরে ময়না সন্দালো মন্দিল ঘরে রে কেশ ॥

কেওয়াট ফেলায় দেছুঁ গে আই,
আই, মোর ময়না মরি' গেইসে ;
কিসে কি কাম করুঁ গে আই
আই, মোর রং-বেহা[৬] সাজিনু রে কেশ ॥

রং-বেহা করিতে গে আই,
আই, মোর ময়নাক হারানু রে কেশ
নাঙ্গুলকুটি কাটিয়া[৭] গে আই,
আই, মুই এ মালাটা সাজাইছুঁ কেশ।
চোখু দুইটা কাটিয়া গে আই,
আই, মুই এ চেরায় সাজাইছুঁ[৮] ;
নাক দুইটা কাটিয়া গে আই
আই, মুই নাক-বাঁশী বাজাইছুঁ রে কেশ ॥

১ প্রবেশ করিলি ২ মন্দির ৩ কপাট লাগাইয়া দিয়াছে ৪ শোয় ৫ গাছ বিশেষে
৬ রঙীন বিবাহ ৭ আঙুলগুলি কাটিয়া ৮ প্রদীপ (চেরাগ) বানাইয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

চুলকুটি[১] কাটিয়া গে আই,
আই, মুই চৈঁওর[২] সাজাইছুঁ ;
হাতো-ঠেঙ্গো কাটিয়া গে আই
আই, মুই এ স্তাওটা[৩] সাজাইছুঁ ।
চামকুটি ছিলিয়া[৪] গে আই
এ ঝোলা সাজাইছুঁ এ কেশ ॥

ময়নাক ধরিয়া গে আই,
আই মুই এ সইন্নাস হমো রে এ কেশ ;
ময়নাক ধরিয়া গে আই,
আই, মুই দেশে-দেশে বেড়াইম রে এ কেশ[৫] ॥

ভাসানি

। ১৩৬ গ ।

কাঁয় কাঁয় যাবেন গে পোখরি[৬] ;
সনায় ঢালাহুঁ চারি ঘাটো[৭]
গে ঝুমারী[৮] ।

১ চুল কয়টি ২ চামর ৩ দীপরক্ষটি, দেরখোটি ৪ চামড়া ছুলিয়া ৫ দ্রঃ মহম্মদ মনসুর উদ্দীন সংকলিত 'হারামণি' (১ম খণ্ড। বৈশাখ ১৩৩৭)-র ১৪-১৫ পৃঃ। গানখানি মনসুর উদ্দীন ফরিদপুর জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ৬ পুকুরে ৭ সোনা দিয়া নদীর চারি ঘাট বাঁধাইলাম ৮ নামবিশেষ।

CENTRAL LIBRARY

॥ বিষুয়া, বিষুমা ॥

ওস্থন-বান্দা

। ১৩৭ ।

চলিল্ নরসিং[১], করিল্ গমন :
আকাশ কাঁপে, পাতাল কাঁপে,
থর্ থর্ মান্‌ষি কাঁপে,—
কাঁপে জোঙ্গলের বাঘ।
মোর বন্[২] না হয়, গুরুর বন্ ;
এই বন্ হেলিবে-পেলিবে[৩],
দোহাই শিবের মাথা খাবে।
রামের বন্, সীতার বন্[৪],
আজি হাতে ফেন্না-র ঘরবাড়ী হইল্ কম্পমান[৫] ॥

তিতা-খাওয়া

। ১৩৭ ক ।

বৈশাখী ঝড় নাচে
আনন্দে[৬] মন হাসে।
কুট্ কুট্, কাট্ কাট্[৭],—
খিড়্ খিড়্, খাড়্ খাড়্[৮] ;

১ উপদেবতা বিশেষ। বহু গানে ইঁহার নাম পাইতেছি ২ মন্ত্রের বাঁধন, বান। বান 'বন' রূপে উচ্চারিত হয় ৩ অবজ্ঞা করিবে, পায়ে ঠেলিবে ৪ রাম-সীতার নাম করিয়া দেওয়া বাঁধন ৫ অশুভকারী দেবতা চলিয়া যাইবার স্বাক্ষর রাখিয়া যান—বাড়ী কাঁপাইয়া দিয়া ৬ আনন্দে ৭ বিষুব-সংক্রান্তির দিন চাল, চিঁড়া, সরিষা ইত্যাদি ভাজিয়া খাইতে হয়। ভাজা চিবানোর অনুকার শব্দ ৮ নিমপাতা, ভাঙ্গের কুশি ইত্যাদি খাইবার অনুকার শব্দ।

CENTRAL LIBRARY

আইসো টাড়ীর[১] তামান্[২] বন্ধু ভাই,
মাও-বহিন-বাপ-ভাই,
সগায় বসিয়া আনন্দে গুণ গাই।
ওই কিট্ কিট্, কাট্ কাট্,
খিড়্ খিড়্, খাড়্ খাড়্
বসিয়া খাই॥

শিকার-যাওয়া

। ১৩৭ খ।

আইসো সবে
চেঙ্গেড়া-গাবুরা-জোয়ান ভাই,—
আজি আনন্দের[৩] সীমা নাই।
ঢাল-তরোয়াল-নাঠি-ঠেঙ্গা
সগায়[৪] মিলিয়া নেও ভাই,—
হরিণ-শূয়োর-বাঘের আজি অইক্কা[৫] নাই॥

দে ন'দারী[৬], দে—
খাবার চাইট্রা করি' দে;
হরিণ আনিয়া দেছুঁ মুই—
ঘর-বাড়ীলা[৭] স্থাথেক্ তুই॥

১ পাড়ার ২ সব, সমস্ত ৩ আনন্দের ৪ সকলেই ৫ রক্ষা ৬ নতুন বউ ৭ ঘর-বাড়ী ইত্যাদি। রাজবংশি-সমাজে বিষুব-সংক্রান্তির দিন শিকার করিতে যাইবার প্রথা আছে। গানখানি শিকার করিতে যাইবার সময় গীত হইয়া থাকে।

CENTRAL LIBRARY

॥ বারোমাসিয়া ॥

। ১৩৮ ।

"অগনো মাসোতে কইন্যা দ্বিতীয়া নয়া চান[১] ;
কেহ কাটে, কেহ মাড়ে, কেহ খায় নবান্[২] ।
ওহো মোর কইন্যা হে ॥"
"পুষো না মাসোতে সাধু হে পুষো না নোকে রে পালে···
যার কোলে পতি আছে, আন্ধে বাড়ে খায় ;
যার কোলাত্ পতি নাইরো, পরার মুখ্ খো চায় ॥"
"মাঘো না মাসোতে কইন্যা কড়ুয়া[৩] বহে শীত ।
তুলা বিছায়, গাড়ু[৪] বিছায়, শিহরে বালিশ ॥
ফাল্গুনো মাসোতে কইন্যা গো-ফাগুনার গুণ ।
ওই মতন জ্বলিয়া অঠে তোর মনের আগুন ॥
চৈতো না মাসোতে কইন্যা চতুরালি রে আশ্ ।
আমো ফলে, ডালো ভাঙ্গে, কুহুলি তলায়[৫] ভাসা ॥"
"পাড়োক ডিমা, তলাক ভাসা, ভাঙ্গেয়া মারিম ছাও ।
কতোয় কতোয় শুনিমো কুহুলির ঘন আও ॥"
"বৈশাগো মাসোতে কইন্যা গারস্তে ভাঙ্গে রে পুরা ।
তোম্হার যৈবন দেখি মজালি কুমুড়া ॥"
"মজালি কুমুড়া না-হয়, মাহাকালের ফল ।
উপরে সুরঙ্গ দেগো, ভিতরে কাজল ॥"
"জেঠো না মাসোতে কইন্যা জেঠুয়া পাকে আম ।
শুকাইচে তোর মধুর যৈবন, শুকিয়া বহুক চাম ॥"
"শুকাউক হামার মধুর যৈবন, শুকিয়া বহুক চাম ।
তাঁহোতো নাই নিমো সাধু পরোপুরুষের নাম ॥"
"আষাঢ়ো মাসোতে কইন্যা গারস্তে বান্ধে আলি ।"
"সেই না আলিত্ চড়িয়া সাধুরে কাক্ পাড়ান গালি ॥

১ চাঁদ ২ নবান্ন ৩ পূর্বদিকের ৪ বালিশ ৫ তৈয়ার করে।

তমার গালি তমরায় শুনো, তুলিয়া দেও পাও।
ঘর্‌তে আছে তোর মাও-বহিন্‌, তাক্‌ কাড়েন আও॥"
"শাওন মাসোতে কইন্যা মাছে চিনে ভাটি।
তমারো যে পতি দেখিয়া আসিনু শ্রীখোলার হাটি[১]॥"
"শ্রীখোলারো হাটে না হয় সাধু, খাটো বেটোয়ার
মরি' গেইছে প্রাণের পতি, নাই দেখিমো আর॥
ভাদর মাসোতে সাধুরে ভাদর কামুনী[২];
ফুলো-জলো দিয়া পূজা করে বরমাণী[৩]॥"
"আশিনো মাসোতে কইন্যা পন্থের শুকায় পানি।
ওই নাথান কান্দিয়া বেড়ায় জোঙ্গলেরো হরোণী[৪]॥
জোঙ্গলেরো হরোণী কান্দে কইন্যা আছে জোড়ে জোড়।
তম্‌হাক যে দেখি কইন্যা হয়া একাশোর[৫]॥
কার্তিকো মাসোতে কইন্যা তুলসীর গোড়ে বাতি।
হোদ্দেখ্‌ তোর ভাতার আইচ্চে কান্ধে[৬] নিয়া ছাতি॥"

। ১৩৮ক।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মিঠাফল
আষাঢ়ো বরিষা কাল;
শাওন মাসো গেল নারীর ভাবিতে।
ওরে কাল তপোসা[৭],
ওকি বন্দেছোঁ[৮] পতি বৈদেশে॥

১ স্থানের নাম ২ ভাদ্রদেবী ৩ মনসা ৪ হরিণী ৫ একা-একা ৬ কাঁধে। প্রবাসী স্বামী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপন স্ত্রীকে নানাভাবে প্রলোভিত করিতেছে। পর-পুরুষের নিকট স্ত্রী সতীত্ব বিসর্জন দিল না। স্বামী তখন তুষ্ট হইয়া স্ত্রীর নিকট নিজের পরিচয় দিল। সমস্ত গানখানি ছদ্মবেশী স্বামী ও প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর কথোপকথন ৭ কাল তপস্যা ৮ বন্দনা করিতেছি।

CENTRAL LIBRARY

ভাদর মাসের সিংহের ঝড়[১]
আশিনে বরিষা রে শেষ ;
কাতিকো মাসো গেল নারীর বিহুশে[২] ।
ওরে কাল তপোসা,
ওকি বন্দেছো পতি বৈদেশে ॥

অঘোন মাসে নয়া রে ধান
পুষো মাসে শীতের স'ম্[৩] ;
মাঘো মাসো গেল নারীর শয়নে ।
ওরে কাল তপোসা,
ওকি বন্দেছো পতি বৈদেশে ॥

ফাগুন মাসে তিগুণ[৪] জাড়
চৈত্র মাসে বদন কালা ;
নিষেদো[৫] না মানে কাল
ও মোর বৈশাগে, ওরে বৈশাগে ।
ওরে কাল তপোসা,
ওকি বন্দেছো পতি বৈদেশে ॥

বারো মাসো পূর্ণ হইল
প্রাণের পতি না আইল ;
ওইলো পতি কাহারে[৬] মন্দিরে ।
ওরে কাল তপোসা,
ওকি বন্দেছো পতি বৈদেশে ॥

১ ভাদ্রমাস সিংহের সঙ্গম করিবার মাস ২ নারীদের কুঁড়ি ফুটিল না, অমুকুলিত রহিল
৩ সময় ৪ ত্রিগুণ ৫ নিষেধ ৬ কাহার ।

CENTRAL LIBRARY

বারো মাসো পূর্ণ হইল
প্রাণের পতি ঘরে আইল ;
আইলো পতি আপনার মহলে।
ওরে কাল তপোসা,
ওকি বন্দেছো পতি বৈদেশে ॥

। ১৩৮খ।

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ়ে বরিষা কাল ;
শ'ন মাস যাবে নারীটার ভাবিতে চিন্তিতে।
ভাদরে আউলিবে কেশ[১], আশ্বিনে বাইস্যার শেষ—
কাত্তিক মাসোতে যাবে পুরুষটা বিদেশ ॥
অগনে কাটিবে ধান, পুষ মাসে পুন্নিমার চান—
মাঘ মাসে যাবে নারীটা শহরে-বন্দরে[২]।
ফাগুন মাসোতে তেগুণ জ্বালা, চৈত্ মাসে মন কালা
বৈশাখো মাসোতে যাবে পুরুষটা বৈদেশে ॥

১ ধানের শীষ উঠিবে ২ বিভিন্ন স্থানে বিক্রীত হইতে থাকিবে। ধানকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া, সেই ধানের শীষ ওঠা হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারে বিক্রীত হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটিকে গানটির মধ্যে বর্ণনা করা হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ অধ্যায়

॥ জীবন-ছন্দ ॥

ছোয়ানিন্দানী ও ছোয়াভুল্‌কানী

। ১৩৯ ।

নিন্[১] আয় রে, নিন্ আয়—
মোর বপোইটার[২] নিন্ আয় ॥
ওরে বাঁশের পিতারি[৩] নড়েছে[৪]
চান্দ বপোই[৫] দেখি'[৬] হাসেছে ;
মোর বাপোই মোর কলাত্—
নিন্ আয় ॥
বাপোই, চুঁড়া[৭] থুইস্থঁ[৮] চকির তলত্[৯]—
—নিন্ আয় ।
বাপোই, দুধের একটা ডুগি[১০] থুইস্থঁ—
—নিন্ আয় ।
বাপোই, নাড়ু[১১] থুইস্থঁ চকির তলত্—
—নিন্ আয় ॥

১ নিদ্রা ২ সন্তানকে ডাকিবার আদরের সম্বোধন ৩ পাতা। বাঁশের ঝাড় ও বাঁশপাতার উল্লেখ বহু ঘুম-পাড়ানী গানে পাওয়া গিয়াছে ৪ নড়িতেছে ৫ বাপোই-কে। বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই ৬ দেখিয়া ৭ চিঁড়া ৮ থুইয়াছি ৯ চৌকির তলায় ১০ হাঁড়ি ১১ 'নাড়ু' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। চিঁড়া-মুড়ির মোয়াকেও নাড়ু বলা হয়। যেমন, চিঁড়ার নাড়ু।

। ১৩৭ক ।

আয় নিন্ কাইন্ঠা বাড়ী[১]
তিন বহিনী নিন্ পইরী[২],—
ঘুরি' বেড়ায় টাড়ীটাড়ী[৩] :
হামিকাটী, ঝুম্-পইরী,
ছুটকী হ'চে নিন্-পইরী[৪] ॥

হামিকাটী আসি' কহে
মাজ্‌কিনা গেইল্ কুঠে[৫] ;
মুহে যা'মো চুঁড়া ব্যাচেবা'[৬]
গড়েয়ার হাটে ॥

হামিকাটী খোলা ভাজে[৭]
ঝুম্-পইরী আনে ছাম্[৮] ;
নিন্-পইরী আসে ঘাঁটা[৯] ধরি'
চুঁড়ার নাই মোর ধান ॥

। ১৩৭খ ।

আয় রে নিন্দোয়ালী, আয় :
হাটের নিন্, পথের নিন্
চখুত্ ভাসা[১০] বান্ধে,—
কোঠেকার[১১] হাবাতিয়া নিন্
নিন্ পাড়িবা' না দে'[১২] ॥

১ ঘরের কোণ বা বাড়ীর সংলগ্ন স্থানকে "কাইন্ঠা বাড়ী" বলে ২ নিন্‌পরীরা তিন্ বোন। বড়ো বোন হামিকাটী (ঘুমের প্রথমে হাই ওঠে, তাই ইহাকে বড়ো বোন বলা হইয়াছে), মেজ বোন ঝুম্‌পরী (হাইয়ের পর ঝিমানি আসে), ছোটো বোন নিন্‌পরী ৩ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় ৪ নিন্‌পরী সবার ছোটো ৫ মেজ বোন কোথায় গেল ৬ আমিই চিঁড়া বিক্রয় করিতে যাইব ৭ চিঁড়া কুটিবার জন্য খোলায় ধান ভাজিতেছে ৮ উদূখল ৯ চিঁড়া কুটিবার সময় যে বাঁশের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়া তাহা নাড়া হয়, তাহাকে 'ঘাঁটনি' বা 'ঘাঁটা' বলে ১০ বাসা ১১ কোথাকার ১২ ঘুমাইতে দেয় না।

CENTRAL LIBRARY

আয় রে নিন্দোয়ালী, আয় :
আতি পোহালে তোর
কিবা দোশা[১] হয় ॥

। ১৩৯গ ।

আয় নিন্দালী তাড়াতাড়ি—
নিন্দত্ পড়োক[২] বুড়াবুড়ী[৩] ॥
স্বরগে ছাড়িয়া নিন্দালী
মর্ক্ষে[৪] দিলে পাও—
যোলো ডোরে ভরসা কইসুঁ[৫]
নিন্দালী গে মাই ॥

। ১৩৯ঘ ।

যা নিন্দালী নিন্দের থইলা ধরিয়া ।
এইটা বাড়ীত্ আসিয়া[৬]
নিন্ দে তুই ছাড়িয়া ;—
খ্যাড়ে-খড়িত্,[৭] জাবুড়া-যন্তরে,[৮] বিছিনা-ধোকোড়াত[৯]
যাউক পড়িয়া ॥

। ১৪০ ।

ওরে এ্যাতোয়[১০] সাকালে[১১]
তুই মোর বাঁশীটা বাজালো[১২] রে ;
নিন্দের ছোয়াক্ তুই মোর
কান্দালো[১৩] রে ॥

১ দশা ২ ঘুমাউক ৩ ছেলে-মেয়ে ৪ মর্ত্যে ৫ যোলো ডোর দিয়া নিন্দালী দেবীকে বাঁধিয়াছি ৬ এই বাড়ীতে আসিয়া ৭ খড়ের চালে এবং কাঠ-লকড়ি ইত্যাদিতে ৮ জঞ্জাল ইত্যাদিতে ৯ বিছানা, লেপ, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদিতে ১০ এতো, এতোই ১১ সকালে ১২ বাজাইলি ১৩ কাঁদাইলি ।

। ১৪১ ।

আয় জোন্‌হাকি পুষ্‌পুষ্‌[১]—
একনা[২] মাইয়া ডাকা'ছে :
আয় আয় করিয়া
ছোয়াটাক্ ভুল্‌কা'ছে ॥

কুতি[৩] গেইল্ ওগে মরদটা,—
কাল জিউটা[৪] মোর মানে না ;
তুই-হে[৫] কণেক[৬] ভুল্‌কা[৭] দেখি রে
ছোয়াটাক্ করিয়া কলা[৮] ॥

। ১৪২ ।

ছোয়াটা যে কান্দেছে :
ঢ্যাপের মোলা গে নাগে—
হোকোর[৯] ছোয়া কি তানে[১০] কান্দেছে ;
একবাকীয়া[১১] ছোয়া মিলিল্ গে মোর কোপালে ॥

হোকোর ছোয়া,
কোলা হা'তে[১২] নাম্ নাম্ ;
ভাত আন্দিবার বেলা হ'ছে—
শাগ তুলিম্ কত্‌ক্ষণ[১৩] ।

১ জোনাকির জ্বলা-নেভাকে 'পুষ্‌পুষ্‌' বলা হইয়াছে ২ একটা ৩ কোথায়. কোন্‌দিকে দিক অর্থে 'তি'। 'কোন্-তি' হইতে 'কুতি' ৪ পোড়া মনটা ৫ তুই-ই ৬ একটু ৭ ভোলা ৮ ছেলেটাকে কোলে লইয়া ৯ "হতোরি ছাই" এই অর্থে 'হোকোর' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ১০ কি জন্য ১১ এক বাকাসার যে ছেলের অর্থাৎ একগুঁয়ে ১২ কোল হইতে ১৩ কখন।

CENTRAL LIBRARY

এলানে[১] আসিবে তোর বাপ—
করিবে "ভাত আন্, ভাত আন্" ॥

। ১৪৩ ।

ওই আশোমানে
কাড়াইল্ ঝড়[২] ;
ছোয়ালারো[৩] আইছে[৪] জর ।
প্যাটের ভোকে[৫] না খায় ছোওয়া
পয়রার গুণ্ডা[৬] ॥

। ১৪৩ক ।

চোপ্ রে চোপ্,
শিয়াল কান্দেছে[৭] ;
কালা কুত্তাটা দুয়ারে ভুকেছে[৮] ॥

১ এখনই ২ কড়্ কড়্ করিয়া ঝড় আসিল ৩ ছেলে-মেয়েগুলিরও ৪ আসিয়াছে ৫ পেটের ক্ষুধায় ৬ যবের গুঁড়া অর্থাৎ ছাতু ৭ কাঁদিতেছে ৮ ভুকিতেছে, ডাকিতেছে ।

কথান্তর—

হোকোর ছোয়া,
কোলা হা'তে নাম ,—
ভাত আন্দিবার বেলা হ'ছে
শাক তুলিবা' যা'ম[১] ॥
হরিমনে কান্দেছে ছোয়া[২]
চ্যাপের মোলা চাহা'ছে[৩] গে ॥

১ শাক তুলিতে যাইব ২ হরিকে যেমন লোকে একভাবে ডাকিয়া চলে, ছেলেটিও তেমনি একভাবে কাঁদিয়াই চলিয়াছে ৩ চ্যাপের খই দিয়া প্রস্তুত মোয়া চাহিতেছে ।

। ১৪৩খ ।

চোপ্ চোপ্ রে হোকোর ছোয়া,
নাই দিলো মোক
দেবী দেখিবা'[১] ।
আজিও মাত্তা,[২] কালিও মাত্তা
উদিনায় যাত্রা[৩] ॥

। ১৪৩গ ।

হলো-লৈ[৪] গে হলো-লৈ—
বাবুরির[৫] গে ফুল ;
কানকাটা কুকুরটা
আইসে কতোদূর ॥

। ১৪৩ঘ ।

আরে হোকোর[৬] ছোওয়া,
তোর মাও গেইছে[৭] বাহো মারিবা'[৮] ;
বাহো মারিয়া আনিবে টাকা—

১ আমাকে দেবী (অর্থাৎ দুর্গাপ্রতিমা) দর্শন করিতে দিলি না ২ দুর্গা পুজার মেলা ৩ আজও মেলা বসিল, কালও মেলা বসিল, আমি যেদিন যাইতে পারিব, সেদিন কি মেলা থাকিবে ৪ 'ওই যে ওই আসিতেছে'-এই অর্থে ৫ একধরণের ফুল গাছ বিশেষ ৬ বিরক্তি-সূচক অব্যয় ৭ গিয়াছে ৮ পাড়া বেড়াইতে ।

কথান্তর—

হলো-লৈ গে হলো-লৈ—
বাবুরির গে পাত ;
কানকাটাটা আইসেছে
ফিত্ মারিয়া[১] থাক্ ॥

১ চুপ করিয়া ।

CENTRAL LIBRARY

তোর মাও-র বাদে[১] আনিবে ঘুঙনি-ফোতা[২] ।
চুপ্ রে চুপ্ বাউ[৩],
কান্দিস্ না ॥

। ১৪৪ ।

আগাতি[৪] হরিণ কান্দেছে ।
ওগে বাহামারী[৫],
তোর ছোয়া কান্দেছে ॥

। ১৪৫ ।

বাপোই, রে বাপোই,—
তোর গোরু গেইছে দূর ;
বাপ ডেকায়[৬], মাও ডেকায়
কানশিসার[৭] ফুল ।
গসা হয়া[৮] না যান বাপোই,
ঘুর্, ঘুর্, ঘুর্[৯] ॥

১ জন্যে ২ রঙীন ডোয়াকাটা 'পাটানী' ৩ সন্তানকে ডাকিবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ৪ পূর্বদিকে ৫ পাড়া-বেড়ানী ৬ ডাকে ৭ জংলী ফুল বিশেষ ৮ গোসা হইয়া, করিয়া ৯ ঘুরিয়া আইস ।

কথান্তর—

চোপ্ রে চোপ্ হোকোর ছোয়া
তোর বাপ গেইসে[১] শূয়োর চরেবা'[২] ,
শূয়োর চরাইতে[৩] পাইসে[৪] টাকা
তাক্ দি'[৫] কিনিসে নালভুমি ফোতা[৬] ।

১ গিয়াছে ২ শূয়োর চরাইবার, চরাইতে ৩ চরাইয়া ৪ পাইয়াছে ৫ তাহাকে দিয়া, তাহাদ্বারা ৬ তু° ঘুঙনি-ফোতা ।

মাও গেইছে হাট,
বাপ গেইছে হাট ;
মাও আনিবে নাড়ু-মোলা[১]
বাপ আনিবে খাট।
ওই খাটোত্ চড়িয়া যাইম মুই
বিন্দাবনের হাট ॥

বিন্দাবনের হাটোতে
পাইক বসিসে[২] ;
পাইকর হাতোত্ না খাইম গুয়া
দাড়ী মুছিসে[৩] ॥

। ১৪৬ ।

ছোয়া ভুল্‌কাইতে[৪] এই সন বাবা রে
আচ্ছা মোজা হইসে[৫] ;—
ছোয়ার মাওটা বাড়ীত্ নাইরো :
—খড়ি-বাড়ী গেইছে[৬] ॥

ও ছোয়াটা কান্দিবা' ধইচ্ছে[৭] ;—
ছোয়ার বাপ্‌টা আসিয়া
ধইল্ ছোয়াটাক্ ভুল্‌কিবা'[৮] :
"চোপ্ চোপ্, মোর বেটা রে,
তোর মাওক্ মুই ডাঙ্গাছোঁ[৯] রে ॥"

১ নাড়ু, মোয়া ২ বসিয়াছে ৩ মুছিয়াছে ৪ ছেলে ভুলাইতে ৫ ভারী একটা মজার ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে ৬ কাঠ কুড়াইতে গিয়াছে ৭ কাঁদিতে শুরু করিয়াছে ৮ ছেলেটাকে ভুলাইতে আরম্ভ করিল ৯ প্রহার করিতেছি।

CENTRAL LIBRARY

এখেনাথা ফোতা[১] ;
দূরে হা'তে[২] না যায় চিনা ;
আপেনকার মাইয়া বুলিয়া[৩]
ভাঙ্গালে রে বাবা ভাউশানীক যায়া[৪] ॥

। ১৪৭ ।

বেরুবাড়ীর হাট যদি নাই গেনু হয়[৫],
দুন-পানি-পাথরখান[৬] যদি নাই আসিল্ হয়[৭],
ইস্কুল ঘরটাত্ যদি নাই সোন্দানু হয়[৮],
টাংহা সিপাইটা[৯] যদি নাই আসিল্ হয়,
হিঙ্গুং চন্দলাল ছোওয়া[১০] কোটে পানু হয়[১১]—
খেইয়া খেইয়া করি' কাক্ নাচানু হয়[১২] ॥

। ১৪৮ ।

হাড়-গোরল[১৩], গে হাড়-গোরল,
তোর মাও কোঠে[১৪] গেইছে[১৫] ;
—ছয় কুড়ি ছোয়া নিয়া
গান শুনিবা'[১৬] গেইছে ॥

১ একই রকমের ফোতা (জলপাইগুড়ির মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র) ২ দুর হইতে ৩ আপনার স্ত্রী মনে করিয়া ৪ ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকে গিয়া প্রহার করিল । অর্থাৎ দুই জা'য়ে একই রকমের 'ফোতা' পরিত । ছেলের বাবা দুর হইতে চিনিতে না পারিয়া, আপনার স্ত্রী মনে করিয়া, ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকেই প্রহার করিয়াছে । গানখানির এই হাস্যকর বিষয়টি নাতি-নাতনীর নিকট ঠাকুরমা-দিদিমা ফলাও করিয়া গাহিয়া থাকে ৫ যদি না যাইতাম ৬ ঝড়, বৃষ্টি, শিলপড়া ৭ যদি না আসিত ৮ যদি না প্রবেশ করিতাম ৯ লম্বা সিপাইটা ১০ চন্দনের মতো রাঙা এই রকম ছেলে ১১ কোথায় পাইতাম ১২ কাহাকে নাচাইতাম ১৩ হাড়গিলা পাখী ১৪ কোনস্থানে ১৫ গিয়াছে ১৬ শুনিবার ।

গাঙ্গের পানি ইতল-পিতল[১]—
সাতখান পিতলে গড়াঙ্গু নাও[২] ;
চলিয়া গেইল্[৩] গাঙ্গর মাও ॥
গাঙ্গর মাও কেনা[৪] হাসিবে
উমুর-ঝুমুর করি' নাচিবে ॥

। ১৪৯ ।

ছোয়া নাচাও[৫] মুই
খেতেই-খেইয়া ;
খাবার স'ম্[৬] মুই
খেইয়া-পেটা[৭] ॥

। ১৪৯ক ।

তাক্ খেইয়া-খেইয়া—
মণ্ডলের ভাইয়া ॥
মণ্ডল গেইছে হাট—
করিল্ বারোবাট[৮] ॥
কাউয়ায় আনলেক্ খ্যাড়খড়ি[৯]
বগুলায় আন্দিল্ ভাত[১০] :
হামার বাউটা যে ভাত খা'ছে
ওই এ্যাখেকিনা[১১] দাঁত ॥

১ উথাল-পাথাল ২ নৌকা গড়াইলাম ৩ গেল ৪ মা'টি ৫ নাচাই ৬ সময় ৭ যে বেশী খায় ৮ নানা স্থান ঘুরিল ৯ কাক আনিল কাঠ ইত্যাদি ১০ বক রাঁধিল ভাত ১১ একটি মোটে। , কথান্তর—

খেই খেই খেইয়া
মণ্ডলের ভাইয়া ।
মণ্ডল গেইছে হাট,
কিনি' আনিলে[১] খাট ।
খাটের উপর চড়িয়া
দেখা যায় বেরুবাড়ীর হাট ।

১ কিনিয়া আনিল ।

CENTRAL LIBRARY

। ১৫০ ।

বাপোই পোই-পোই
শৌনি ধানের[১] খই ।
বুড়া উবায়[২] নাঙ্গল-জোঙ্গাল
বুড়ী উবায় মই ;—
বুড়াক্ দেখিয়া বুড়ীটা
থ্যাট্‌কেয়া পইল্[৩] ॥

। ১৫০ক ।

ওই হিলা রে হিলা[৪],
মাছ নিকাউক্[৫] চিলা ;
ওই গাও-কেনা[৬] তোর হুহুম্-হুম্[৭]
নাচন কেনে ঢিলা[৮] ॥

। ১৫০খ ।

ওই হোলো-রে[৯] হোলো—
মাছ মারিবা' গেলো[১০] ;
শৌল মাছের গুঁতা খায়া
বিচা[১১] আউলিয়া আসিলো ॥

। ১৫১ ।

হামার[১২] মাইটা ভালা[১৩]
আম পাড়িবা' ভেলা[১৪] ;
আমত্ নাগাইল্[১৫] কোটা[১৬] ॥

১ শালিধান (?) ২ বহন করে ৩ হোঁচট খাইয়া পড়িল ৪ অর্থহীন সম্বোধন ৫ লইয়া যাউক ৬ দেহটা ৭ অর্থহীন ৮ অহলর অর্থে ৯ অর্থহীন সম্বোধন ১০ মাছ মারিতে গেলি ১১ Testes ১২ আমাদের ১৩ ভালো ১৪ 'অনেক' অর্থে "ভেল্ ভেল্" শব্দটি প্রান্ত-উত্তর বঙ্গে চলিত আছে। খুব সম্ভব 'ভালো'র সহিত মিলের জন্য 'ভেল্‌ভেল্' 'ভেলা' হইয়াছে। নতুবা ইহার অন্য কোন অর্থ নাই ১৫ লাগাইল ১৬ আঁকশি।

CENTRAL LIBRARY

উয়ার[১] বাপ ঘোড়া-চড়া
উয়ার মাও শাঁখামুঠি[২],
উয়ার বইনি গালার কাঠি,
উয়ার পিসাই[৩] পচা কাঠি ॥

। ১৫১ক।

হামার বাউ কান্দে—
হাতীর কাঙ্গোত্ চড়ি'[৪]।
হাতী মাল্লে[৫] নেথা[৬] :
বাউ যায়া পইল্ ছতি[৭],—
একখান পা'লে[৮] ধুতি ॥

। ১৫২।

হামার মাই, হামার মাই
নাচন পখীয়া[৯] ;
যতো বুড়া ভাত খা'চে[১০] নাচন দেখিয়া।
হামার মাই নাচেছে—
টাকা দান পড়ে গে, টাকা দান পড়ে ॥

। ১৫৩।

আগ-দুয়ারে, পাছ-দুয়ারে
সোদর[১১] আসিসে[১২]।—
কানত্ মন্দিরা[১৩] দিয়া
খাবা'[১৪] বসিসে[১৫] ॥

১ উহার ২ একাধিক শাখার সমষ্টিকে "শাঁখামুঠি" বলে ৩ পিসীমা ৪ কাঁধে চড়িয়া ৫ মারিল ৬ লাথি ৭ হোথায় যাইয়া পড়িল ৮ পাইল ৯ পাখীর মতো নাচে (?) ১০ খাইতেছে ১১ আত্মীয় স্বজনাদি ১২ আসিয়াছে ১৩ হাত দিয়া কান ঢাকিয়া ১৪ খাইতে ১৫ বসিয়াছে।

। ১৫৪ ।

হোর্[১] স্থাথেক্[২] মামা আইসেছে[৩] :
বাঁশের পাতারি করি'[৪]
নাড়ু আনেছে[৫]—
পুকিনাতি ছামটা[৬] তড়্ পিয়া[৭] উঠেছে[৮] ॥

তা-তুর্-তুর্-তুরা রে ভাই
তা-তুর্-তুর্-তুরা।
ঘরে নাচে শ্যাম-সুন্দরী
বাহেরে[৯] নাচে বুড়া ॥

বুড়া গেইল্[১০] বাইগন-বাড়ী[১১]
কাট্-কাউয়া[১২] ঠকাইলেক্[১৩] দাড়ী ;
হামার বাবু নাচে,—
নাচতে নাচতে গান ধরে—
পান্তার হাঁড়ী বাইর করি' খাবার ধরে ॥

১ "ওই দেখ্" এই অর্থে চলিত অব্যয় ২ দেখ্ ৩ আসিতেছে ৪ বাঁশের পাতায় করিয়া। বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই ৫ আনিতেছে ৬ ধান ভানিয়া-ভানিয়া যে উদুখলের (ছামের) মধ্যে অনেকখানি গর্ত হইয়া গিয়াছে ৭ লাফাইয়া ৮ উঠিতেছে ৯ বাহিরে ১০ গেল ১১ বেগুনের ক্ষেতে ১২ কাঠ-ঠোকরা পাখী ১৩ ঠোকরাইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় (বোদাপাড়া, ধাপগঞ্জ)-এর নিকট হইতে ১৭. ১১. ১৯৫৮. সনে এই গানটির যে কথান্তর মিলিয়াছে, তাহা এই :

চোপ রে চোপ,
তোর মামা আইসেছে ;
বাঁশের পাতারিত্ করি'
নাড়্ আনেছে।

নাড়্ নাই, টাড়্ নাই—
খালি আইসেছে।

CENTRAL LIBRARY

। ১৫৫ ।

মাকলা বাঁশের[১] পিতারি[২],
ওইঠে[৩] দাদার কাচারি[৪] ।
আজি দাদা দেওবার[৫],—
কিনিয়া দে মোক দইয়ের ভার :
হামেরা যামো ময়না দিদির বাড়ী[৬]—
মাকলা বাঁশের পিতারি ॥

। ১৫৬ ।

একটা তারা, দুইটা তারা—
তারার মাও[৭] মোতিহারা ॥
চল্ গে ভাউজ[৮], পানি আনিবা'[৯] :
পানি আনিতে গড়িল্[১০] কাঁটা—
কতোয়[১১] শুনিমো[১২] সতোনীর কাথা[১৩] ॥
সতোনী গেইল্ অ্যানেক দূর—
ফিকিয়া[১৪] মারিমো চাম্পার ফুল ॥

। ১৫৬ক ।

মাই, তোর বন্ধুয়া ছাড়িয়া যা'ছে[১৫] গে,
কয়হা-বুলিয়া[১৬]
মানেয়া[১৭] আথেক্[১৮] গে ॥

১ দীর্ঘ গাঁট-ওয়ালা বাঁশ ২ পাতা ৩ ওই স্থানে ৪ বাসস্থান অর্থে ৫ রবিবার ৬ আমরা ময়না দিদির বাড়ীতে যাইব। আত্মীয়-স্বজনাদির গৃহে যাইবার সময় দইয়ের হাঁড়ী উপহার স্বরূপ লইয়া যাওয়া রাজবংশী সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৭ মা ৮ ভ্রাতৃজায়া ৯ জল আনিবার ১০ বিঁধিল ১১ কতোই ১২ শুনিব ১৩ সতিনের কথা ১৪ ছুঁড়িয়া ১৫ ছাড়িয়া যাইতেছে ১৬ কহিয়া-বলিয়া ১৭ মানাইয়া ১৮ রাখ্। নাতনীকে ঠাট্টা করিয়া ঠাকুরমা-দিদিমা গাহিতেছে।

CENTRAL LIBRARY

। ১৫৭ ।

চান্ ঘুঘু[১], চান্ ঘুঘু,
তোরহে[২] দোহাই
এক বেটী বিহাহু[৩]
ষোলো জামাই ॥
কাহার[৪] রে বেপার[৫]
ঠ্যাং-ধোয়া পানি[৬] ;
ছোটো মামার বিয়াও হ'ছে[৭]
ফুল্-টুং-টুং বাইজ ॥

। ১৫৮ ।

বাব্‌জী গে, সাতো নদীর পারে[৮]
কিসের বাইজন বাজে গে ।
বাব্‌জী গে, সেহো[৯] বাইজন বাজে
বাব্‌জী গে, তোমার দামান[১০] আইসে ॥

। ১৫৯ ।

চল্ গে চল্, আই মাই[১১]
মাটি আনিবা'[১২] যাই ;
মাটি আনিয়া করিমো কি :
ডুকি[১৩] বানাই ॥
ডুকি বানেয়া[১৪] করিমো কি :
দহি পাঝাই[১৫] ॥
দহি পাঝেয়া করিমো কি :
বেট্টীর বাড়ী যাই ॥
বেটীর নাম চাপো
সোদর খাবা'[১৬] যাবো ?

১ চাঁদ । চাঁদ মামার পরিবর্তে 'চাঁদ ঘুঘু' ২ তোরই ৩ বিবাহ দিলাম ৪ পাল্‌কি বাহক ৫ নাম বিশেষ ৬ বরকে পাল্‌কি-বাহকগণ পা ধোয়াইয়া দেয় ৭ বিবাহ হইতেছে ৮ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে ৯ সেই ১০ ক'নে ১১ মা ও মেয়ে ১২ আনিবার, আনিতে ১৩ হাঁড়ী ১৪ বানাইয়া ছেলের ঠাকুরমা-দিদিমা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া, তাহার বিবাহ প্রসঙ্গে গাহিতেছে ১৫ দই পাতি, পাতিব ১৬ স্বজনাদির গৃহে নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়াকে "সোদর খাইতে যাওয়া" বলা হয় ।

CENTRAL LIBRARY

। ১৬০ ।

কাঁয়[1] খাবে
মোর বাউ[2] খাবে।
কান্দে কেইনং[3]
কহা কহা[4]।
বাউর নাম ?
চুনিয়া চন্দন[5]।
কান্দে কেইনং ?
কহা কহা ॥

১ কে ২ শিশুসন্তানকে ডাকিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ৩ কেমন করিয়া কাঁদে ৪ "কহা কহা" করিয়া ৫ এই স্থানে ছেলেটির নাম বলিতে হয়।

কথান্তর— বাউ রে, বাউ,
তোর মামা আইসেছে :
বাঁশের পিতারিত্ করি'
নাড়ু আনেছে।
—কাঁয় খাবে ?
—হামার বাউ খাবে।
—বাউর নাম কি ?
—হীরা চন্দন।
—কান্দে কেইনং ?
—কহা কহা।

অপর কথান্তর— বাই[1] গে বাই,
কুঠে যাছিত্[2] ?
—হাট যাছু[3]।
—কি করিবা' ?
—নাড়ু আনিবা'।
—তোর নাড়ুলা কাঁয় খাবে ?
—বাউ খাবে।
—ওই বাউর নাম কি ?
—চনিয়া চন্দন ॥

১ দিদি ২ কোথায় যাইতেছিস ৩ যাইতেছি।

। ১৬১ ।

হুসন ডীঘি[১], হুসন ডীঘি,
হুবুয়া রাজার পাট।
কোর্তো নদীর[২] হাট পড়েছে
মীর নগরের[৩] ডাঙ্গাত্ ॥

শূয়োর মারা ভেরভেরী[৩]
আরো ভিতরগড়[৪]।
পূর্বে ছিল জগ্দলের হাট[৩]
জঙ্গলে কড়্কড়্[৫] ॥

একেলায় দোকোলায়
না যায় আরো হাঁটা ;
ডাকাতি করিয়া নেছে[৬]
ভাল্ মানুষির টাকা ॥

। ১৬২

এক শিয়ালী আন্দেবাড়ে
দুই শিয়ালী খায় ;
আজার বেটা নখিন্দর[৭]
ঘোড়াত্ চড়িয়া যায়।
ঘোড়া হা'তে[৮] পড়িলে
শরম বড়ো পায় ;
কইনামতী ধায় ॥

১ দীঘি বিশেষ ২ করতোয়া নদীর ৩ স্থান বিশেষ ৪ ভিতরগড় অঞ্চল বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ৫ জঙ্গলে পূর্ণ ৬ লইতেছে ৭ রাজার ছেলে লখিন্দর ৮ ঘোড়া হইতে।

কইনামতী, কইনামতী,
কি করিস বসিয়া ;
তোর ছোয়া কাটা গেইছে
ঘোড়া হা'তে পড়িয়া ॥

মাও কান্দেছে নাটুহটু
বইনি কান্দে স্থয়া ;
আজি হা'তে থামো হামেরা
নিত্যি গছের[১] গুয়া ॥

এড়ি কান্দে, বেড়ি কান্দে,
আরো কান্দে স্থয়া ;
কইনামতীর মাও কান্দে[২]
মুশুরি টানেয়া[৩] ॥

। ১৬৩ ।

আধানাথের ডীঘি[৪] রে, টুপ্ কইরেক টাকী[৫] রে ।
চ্যাঙে-ব্যাঙে কাথায় সারে
হৈড্ভারামক্ ধরি' মাইয়ায় মারে[৬] ॥
মাইয়ার মাইরনে হৈড্ভারামর দেহাত্ আসিল্ জর ।
টারে[৭] আছে ছমুড়া খেতা[৮] কণেক পিঠি কর[৯] ॥
পিঠিত্ না চড়িয়া হৈড্ভারাম ভেলেলেউ[১০] হইল্ ।
ছমুড়া ফোতা চিঁড়িয়া[১১] ধুপ করিয়া পইল্ ॥
ধুপ্ করিয়া পইলো[১২] তুই, বাপের বাড়ীত্ যাছোঁ মুই ।
বাপোর বাড়ী যাবো তুই, পিঠি করিয়া আনিম মুই ॥

১ প্রতিদিন নিজেদের গাছের (?) ২ মা কইনামতী কাঁদে ৩ মশারি টানাইয়া ৪ রাধানাথের দীঘি ৫ 'টাকী'মাছ টুপ্ করিয়া উঠিল ৬ হৃদয়রামকে ধরিয়া তাহার স্ত্রী প্রহার করে ৭ সিলিংয়ে ৮ দোরোখা কাঁথা ৯ পিঠে দাও ১০ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিল ১১ ছিঁড়িয়া ১২ পড়িলি ।

পিঠি করিয়া আনিবো তুই, পিঠি ভরিয়া '—'[১] মুই।
পিঠি ভরিয়া '—'[১] তুই, যমুনা নদীত্ ধুমো মুই॥
যমুনা নদীত্ ধুবো তুই, পয়া মাছ হইম্ মুই।
পয়া মাছ হবো তুই, খেঁকেরিমারা[২] দিম্ মুই॥
খেঁকেরিমারা দিবো তুই, কাঁকড়া খালোত্ সোন্দাম্[৩] মুই।
কাঁকড়া খালোত্ সন্দাবো তুই, কাঁকোড়-ভুকা[৪] দিম্ মুই॥

১ অশ্লীল শব্দ ছিল ২ ছোটো মাছ মারিবার বাঁশের তৈরি যন্ত্র ৩ প্রবেশ করিব
৪ কাঁকড়া মারিবার তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিশেষ।

॥ ভাত-ছোঁয়ানি ॥

। ১৬৪ ।

খাবা' দে গে মা ক্ষীরো-ননী ;
আরো খাবা' দে গে মা—
মা গে,
মোর বাছাক্ রহম করিয়া যা[1] ॥

। ১৬৪ক ।

খা খা গে বাছা ক্ষীরো-ননী
নন্দেরো দুলাল ;
ওগে, খা খা গে বাছা ক্ষীরো-ননী ॥

। ১৬৪খ ।

ভোকে[2] পোরাণো যায় গে মা,
খাবা' দে গে মা,
ওগে মা,
খাবা' দে, গে মা ॥

। ১৬৪গ ।

খা গে বাছা নন্দেরো দুলাল,
তোর মুখত্ দিবে ভাত ;—
সেলা[3] খাইস বাছা
সনার[4] যাদু ॥

১ আশীর্বাদ করিয়া যা ২ ক্ষুধায় ৩ তখন ৪ সোণার।

CENTRAL LIBRARY

। ১৬৫ ।

পইলা ছোয়াটার[১] ভাত-ছৌয়ানিত্[২]
কি কি দিবো দান ;
এলা সেনি[৩] বুজিম্ রে
তোর বাউদিয়ার[৪] মন ॥

কি বুজিবো মাই তুই
মোর বাউদিয়ার মন ;
তিরিশ-টাকীয়া গাই-বাছুরটা
ওইটায়[৫] দিমো দান ॥

না নাগে তোর গাই-বাছুরটা
ওইমনে[৬] আসিস ;
ধানদুবা দিয়া ছোয়াটাক
আশুব্বাদ করিস ॥

কালি সাকালে আসিয়া,—
পাত-পটুয়া[৭] চৈছিয়া[৮],
মান্ষি-গিলার টহল-টুকুরা[৯]
করেন রে বাউদিয়া ॥

১ প্রথম ছেলেটার ২ অন্নপ্রাশনে ৩ এখন তবে ৪ প্রেম-পাগল, প্রেমিক যুবক এই অর্থে 'বাউদিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ৫ ওইটাই ৬ এমনি, খালিহাতে ৭ কলার পাতা ইত্যাদি ৮ চাছিয়া, কাটিয়া ৯ নিমন্ত্রিতদের খোঁজ খবর, তদারক ইত্যাদি ।

CENTRAL LIBRARY

॥ ফুল-ফুটানি ॥

। ১৬৬ ।

ঘষেক্ গে বেটী,
মাথা গে ঘষেক্,—
ক্ষার-খইলা-লা[১] ভিজি' দিসু[২] ;
ঋতুর সময় যা'ছে গে বয়্যা ॥

তোর বাপোর হিমন[৩] ধারা—
ব্যাচেয়া না খায়[৪] এলা[৫] ;
মন বান্ধিয়া অহিবো[৬] কতো
গাবুর-ব'স হয়্যা[৭] ॥

। ১৬৭ ।

যেলা[৮] ডালিম মোর কেগু ধরে[৯]—
সেলা[১০] যাছু[১১] মুই পরার[১২] ঘরে ;
ও আগিলা মতন[১৩] নাই
নাই রে হে নাথো ॥

আষাঢ়ো শাওন মাসে
বান-বরষা মোর চান্দে চান্দে[১৪] ;
ভাসে শেওয়াল[১৫] মোর
আগম দরিয়ার[১৬] মাঝে ॥

১ ক্ষার-খলি ইত্যাদি ২ ভিজাইয়া দিয়াছি ৩ এমন ৪ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কন্যার পিতাই পাত্র-পক্ষের নিকট হইতে পণের টাকা পাইয়া থাকে। তাই কন্যার বিবাহ দেওয়ার নামান্তর 'বেচাইয়া খাওয়া' হইয়াছে ৫ এখন ৬ রহিবি ৭ যুবতী বয়সের হইয়া ৮ যখন ৯ কুঁড়ি ধরে ১০ তখন ১১ যাইতেছি ১২ পরের ১৩ আগেকার মতোন ১৪ প্রতি চাঁদে অর্থাৎ প্রতি মাসে 'দেহে' আমার ঢল নামে ১৫ শ্যাওলা ১৬ নদী বোঝাইতে ব্যবহৃত কাব্যের ভাষা। বর্তমান ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অঙ্গ বিশেষ।

CENTRAL LIBRARY

। ১৬৮ ।

ফুটা ফুলের মহু ভরা
কাঁয়[১] খাবে, নাই ভমরা ,
আর কতয় দিন আখিম[২] যৈবন
বুকে কাপড় দিয়া ॥

ও মোর ঋতুর সময়
যা'ছে গে বয়া[৩] ;
আই[৪], মোক কি করিবা'[৫]
কহছিত্[৬] এলা[৭] ॥

। ১৬৯ ।

হায় রে বিধি,
কান্দিয়া পোহাছুঁ আতি ;
আছে তো ডালিমের ফল
খাবারে[৮] নাই মানষি ॥

চান্দের কোলে তারা য্যামন
শোভা ধরে য্যামন আতি ;
ওই রকম নারীর যৈবন
দেও প্রাণো পতি হে পতি ॥

আর কতয়কাল আখিম যৈবন
বুকের শাড়ী বান্ধিয়া ;
মাসিক চান্দের তিথি
যা'ছে গে বিতিয়া[৯] ।
ফুলের মহু যা'ছে গে শুকিয়া[১০]
ডালোতে নাইরো ভমরা[১১] ॥

১ কে ২ রাখিব ৩ বহিয়া যাইতেছে ৪ মা ৫ করিবার, করিতে ৬ কহিতেছিল ৭ এখন ৮ খাইবারই ৯ প্রতি চাঁদে (প্রতিমাসে) যৌবনের দিন পার হইয়া যাইতেছে ১০ শুকাইয়া ১১ ডালে ভ্রমর নাই ।

। ১৭০ ।

হাতত্[১] নিলো[২] ক্ষার গে থইলা,
কচুনার পাতত্[৩] নিলো ছেঁকা[৪] ;
নদীত্ যাবা[৫] কাজ নাই গে বেটী,
চুয়াত্[৬] ঘষেক্ মাথা ॥

চুয়ার পানিত্ আই মোর
না ভিজে দেহা ;
যাত্রাকালে আই মোক
নাই করিস বাধা।
নদীত্ সিনিবার মোর
উঠিসে তিষিণা[৭] ॥

। ১৭০ক ।

উত্রাসোকের জল[৮]
আরো নাগে দুধ মিশল[৯],
তাক্ দিয়া সিনান করামো[১০]।
মোর পাপের হইল্ খণ্ড[১১]
গুরু হইল্ মোর ছাড়া
কি পাপোতে গুরু হইল্ মোর ছাড়া ॥
কোর্তো নদীর [১২] গে ঘেকেনা[১৩]
জোড় জামুরি[১৪] গে ফলেনা,
জোড় জামুরি গে গন্ধায় মোহ বাসনা[১৫] ॥

১ হাতে ২ নিলি, লইলি ৩ কচুর পাতায় ৪ কলাগাছের গোড়া পোড়াইয়া ঘরে প্রস্তুত ক্ষার দ্রব্য ৫ নদীতে যাইবার ৬ কুয়াতে ৭ তৃষ্ণা উঠিয়াছে ৮ নদী যেখানে উত্তর-স্রোতা, সেই স্থানের জল দিয়া প্রথম ঋতুমতীকে স্নান করাইতে হয়। উত্তর-স্রোতাকে 'উত্রাসোক' বলা হয়। সাধারণত নদী যেখানে বাঁক নেয়, বা উজানের দিকে মোড় ফেরে, সেইখানে নদী উত্তরবাহিনী হয়। নদীর এই বাঁককে 'ঘেকেনাই' বা 'ঘেকেনা' বলা হইয়া থাকে ৯ উত্তর-স্রোতা জলের সহিত দুধ মিশাইয়া স্নান করাইতে হয়। কোনো কোনো স্থানে দুধের পরিবর্তে পিঠুলি গোলাও দেওয়া হয় ১০ তাহা দ্বারা স্নান করাইব ১১ পাপের খণ্ডন হইল ১২ করতোয়া নদীর ১৩ বাঁক ১৪ এক ধরণের বুনো বৃহৎ লেবুকে জামুরি বলা হয়। 'জোড় জামুরি' এই ক্ষেত্রে স্তনদ্বয়ের প্রতীক ১৫ মোহ-মোহ গন্ধ (বাস)।

। ১৭০খ ।

বুড়ী ঘষে তল মুখে মাথা[১] ;—
ও বুড়া, তুই খদালো ফোতা[২] ॥
এড়িয়া দে রে বুড়া,
ছেড়িয়া দে,—
না যায় গে অহা[৩] ।
চখু দুইটা ওরে বন্ধু ধইচ্ছে ছেঁকা[৪],—
তুই তো নিশা-নাগা[৫] বাউধিয়া[৬] ॥

। ১৭০গ ।

কোর্তো নদীটার[৭] সরু গে বালা[৮]—
বালার সুখে মুই
গতর গে ঘষুঁ[৯] ;—
ছিলি-বিলিটার[১০] এতয়[১১] রে মায়হা[১২],
কুন্ ছলে মুই দেখিম রে যায়া[১৩] ॥

। ১৭১ ।

নিলু ধানের[১৪] খইয়ো রে মোর যেমন
ও মোর ফুল ফুটিসে কোঁড়া ধইন্‌সে[১৫]—
ঝুমুকিয়ার[১৬] বাইস[১৭] ।—

১ ক্ষার ইত্যাদি দিয়া স্ত্রী-অঙ্গ ঘষিতে গিয়া মাথা হেঁট করিতে হয় ২ প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র ৩ রহা যায় না ৪ ক্ষার-খলির জলে চোখ দুইটা জ্বলিতেছে ৫ হাভাতে ৬ 'প্রেমিক' অর্থে ব্যবহৃত কাব্যের সম্বোধন ৭ করতোয়া নদীটার ৮ সরু বালি ৯ সরু বালি পাইয়া মনের সুখে 'দেহ' (স্ত্রী-অঙ্গ) ঘষিতেছি ১০ ছলা-কৌশল জানে যে ১১ এতোই ১২ মায়া। ছলাকলা জানা মানুষটির জন্য এতই আমার মায়া ১৩ যাইয়া ১৪ ধান বিশেষ ১৫ কুঁড়ি ধরিয়াছে। 'নিলু' ধানের খইয়ের মতো আমার যৌবনের ফুল ফুটিয়াছে ১৬ নূপুরের ১৭ বাইজ, বাজন।

CENTRAL LIBRARY

ডাইন হাতে কৌটা রে মোর
বাঁও হাতে মোর ঝারি—
সেই না নিয়া গেন্থ মুই
ওই সোতোনীর বাড়ী ॥

কোপালতে সেন্দুরের কৌটা রে মোর
ঢালুয়া-কেশী[1]—
ও কেশী বান্ধিয়া দিবে বিহারো সোয়ামী ॥

। ১৭২ ।

"ছাগল বান্ধিবা[2] যা'ছিস্[3] মাই তুই
ছাগলের দুইটা শিং[4] ;
নেভির হেঁটত্[5] দেখ্ দি[6] মাই তোর
কতোখানি নিন্[7] ॥"

"হামাক[8] দেখিয়া ওহো রে চেঙ্গেড়া
সগারে[9] যা'ছে রে মন ;
দুই যৈবন[10] মোর বান্ধা রে আছে
সন্তরার মতন[11] ॥"

"বারো না ব'সে রে[12] যৈবন
মাই তুই আখিবো বান্ধিয়া ;
ষোলো না ব'সে রে যৈবন
মাই তোর পড়িবে হালিয়া ॥"

"শাড়ীর উপর বান্ধা আছে রে চেঙ্গেড়া
সনার আলন[13] ;
দুই যৈবন মোর বান্ধা আছে
ডকড়া ডালিমের ফল[14] ॥"

১ যাহার অনেক চুলের জন্য খোঁপা বড়ো হয় ২ বাঁধিবার, বাঁধিতে ৩ যাইতেছিস ৪ ইহা পুং-জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক ৫ নাভির নীচে, অর্থাৎ স্ত্রী লোকের অঙ্গ-বিশেষের প্রতি ৬ দেখ্ তো, দেখ্ দেখি ৭ গভীর ৮ আমাকে ৯ সকলেরই ১০ দুই স্তন ১১ কমলালেবুর মতোন ১২ বারো বৎসর বয়েসে ১৩ সোনার ওড়না ১৪ বড়ো, ডাঁশা ডালিমের মতো।

CENTRAL LIBRARY

। ১৭৩ ।

"পানি পড়ে থিনা রে থিনা[১],
বন্ধু, বাঘের বড়ো ভয়ো রে ;
তুই কিতায় আসিলো[২] রে বন্ধু,
বন্ধু, আজি ঘুরিয়া যাও রে।
আরো ও মোর নিরাশীর বন্ধু রে ॥

বন্ধু, শিকিয়ার উপর দহি রে চুঁড়া,—
বন্ধু, পাড়েয়া[৩] খাও রে ;
আরো ও মোর নিরাশীর বন্ধু রে ॥"

... ...

"ঘুরিয়া নাই যামো গে সুন্দরী,
ও মুই বড়োয় কইছুঁ আশা[৪] ;—
হুকুম করেক্, ঘরত্ যাওঁ
পূরা মনের আশা ॥"

... ...

"না আসো, না আসো, ঘরে বন্ধু রে,—
ও মুই হইসুঁ মাথা-ঘষা[৫] ;
বন্ধু, আজিকার ম'নে[৬] ঘুরিয়া যা তুই ঘর,
কাপড়লাতা[৭] সাফ করুঁ মুই
মাথা আর গতর।
আরে ও মোর নিরাশীর বন্ধু রে ॥"

১ রিমি-ঝিমি বৃষ্টি পড়ে ২ কি জন্তে আসিলি ৩ পাড়িয়া ৪ বড়োই আশা করিয়াছি
৫ মাথা ক্ষার ইত্যাদি দিয়া ঘষিয়াছি। অর্থাৎ আজ ঋতুমতী হইয়াছি ৬ আজিকার মতো
৭ কাপড়-কাঁথা ইত্যাদি।

CENTRAL LIBRARY

। ১৭৪ ।

বেটী,
তুই দুইহে-চাইরহে[১] ঘষেক্ দেহা[২],—
হাটের হাট[৩] আনি' দিম তোক
বাহারের ফোতা ॥

পিন্ধিয়া বেড়া তুই চাইরো'তি[৪]
পেখম করিয়া ময়রের নাখাতি[৫] ॥

মাইয়া মান্‌ষি হামেরা বেড়ানী,
নসর-পসর দেহার হিলানী,
হ্যাদেল্‌-ভ্যাল্ খঁপা[৬]—
হ্যাসেক্‌ভ্যাক্[৭] করিয়া বেটী তুই
পিন্ধিস্ গে ফোতা ॥

১ দুই-চার দিন অন্তর ২ দেহ ঘষিস ৩ প্রতি হাটে ৪ চতুর্দিকে ৫ ময়ূরের মতো পেখম ধরিয়া ৬ এলো খোঁপা ৭ নতুন 'ফোতা' পরিবার জন্য খস্‌-খস্ করিয়া শব্দ। গানখানি মেয়ের প্রতি মায়ের উক্তি।

CENTRAL LIBRARY

রঙ, হাউসালি, চেঙ্গেড়ী-ভুলা, বন্ধু-নাচানী ॥

অবিবাহিত পুরুষ

। ১৭৫ ।

মোর ঢেনাটার[১] অন্তর ঝুরেছে গে
মান্‌ষিগিলার[২] বিহাও[৩] দেখিয়া ;—
আজি মোর বাপ যদি অহিল্‌ হয়[৪]
মোকো[৫] বিহাও দিলেক্‌ হয়[৬] ।
মন কান্দে মোর হায় রে বিধি হায় ॥

। ১৭৬ ।

আবো,[৭]
কয় সন হা'তে[৮] বেড়াছুঁ মুই
কইনা জুড়িয়া[৯] ;—
ওগে, হতভাগা ঢেনাটার[১০] মোর
কইনায় মিলে না ॥

ও আবো,
হ'ছে-হ'ছে, তায় না-হ'ছে[১১]—
কাঁয় বোলে শয়তানি করেছে,
তাতে যা'ছে আউলিয়া[১২] ;—
ওই হতভাগা ঢেনার ব'স[১৩] মোর গে হে
আরো যা'ছে গড়িয়া[১৪] ॥

১ অবিবাহিত বা বিপত্নীক পুরুষ। বর্তমান ক্ষেত্রে অবিবাহিত ২ গুলি 'গিলা'রূপে উচ্চারিত হয় ৩ বিবাহ ৪ যদি থাকিত ৫ আমাকেও ৬ বিবাহ দিত ৭ দিদিমা, ঠাকুরমা ৮ কয়েক বৎসর হইতে ৯ পাত্রীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাকে 'কইনা-জোড়া' বলে ১০ অধিক বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষকে 'ঢেনা' বলে ১১ হইয়া হইয়াও হইতেছে না ১২ ভাঙ্গিয়া, কাহার শয়তানিতে বারবার বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ১৩ বয়স ১৪ আরো গড়াইয়া যাইতেছে।

ও আবো,

আর কুন্‌কালে বিয়াও হোবে
বৈরাতী মোক গাও ধোয়াবে[১]
ওরিয়া-বরিয়া[২],—
গে বাসনের জল[৩] দিয়া ॥

। ১৭৭ ।

চৈত্‌-বৈশাখ আশিন-কাতি[৪]
ঘসি[৫] কুড়াছু ঢাকি রে ঢাকি
তেগুণে পাটার কিষি[৬] ॥

পাটা বেচাছু মুই আশী টাকা,
ধরিয়া গেইল্‌ দাদা বড়ো মেলা ;
কিনিয়া আনলেক্‌
এক জড়া বোগ্‌ধা[৭] ॥

না কাটোঁ মুই বোগ্‌ধার ঘাস
না বওঁ মুই আর হাল ;
আতি-আতি দেহা শালা
যাউক রে বয়হা ॥

মাও নাই যে ভুকাবে চুঁড়া,
বাপ নাই যে জুড়িবে কইনা[৮] ;
ঢেনা জলম[৯] মিছা রে মিছা।
দাদা শালাটা বড়য় পাজী
কইনায় না জুড়ে ভোজী[১০] ;
কইনার বাপটা গেলে রে দেখিয়া ॥

১ এয়োরা আমাকে স্নান করাইবে ২ বরণ করিয়া ৩ ঘটের জল ৪ চৈত্র-বৈশাখ আশ্বিন-কার্তিক মাসে ৫ ঘুঁটে ৬ ঘুঁটে পোড়ানো ছাইয়ের সারে পাট ভালো হয়। পাটের ফলন তিন গুণ হইল ৭ এক জোড়া বলদ ৮ বিবাহের জন্ত পাত্রী স্থির করাকে 'কইনা জোড়া' বলে ৯ অধিক বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষকে 'ঢেনা' বলা হয়। 'ঢেনা জন্ম' ১০ বউদি।

। ১৭৮ ।

হাউসের[১] দিন মোর যা'ছে রে বয়্যা[২] ;
আর কতো দিনে হবে রে বিয়া
উলু-লু দিয়া ॥

দাদা, উতরে[৩] জড়িস্থ' কইন্যা[৪]
আশী টাকা পণ দিয়া ;
নয়টার গাড়ীত্ যাছোঁ গে দাদা
হেলানি দিয়া[৫] ॥
দাদা, মুই যাছোঁ ওই ঘাটা[৬] দিয়া
কইন্যাটা ঘষেছে মাথা।
চুলি দিয়া ঢাকা গেইসে
কইন্যার পাছিলা[৭] ॥

। ১৭৯ ।

জেওত[৮] গারাম[৯] আসিসে[১০],
বসিসে গে ভোজী—
পাখিড়ি-তলাত্[১১] ॥

লোকক্ বলে ন্যা'ছে রে বর[১২]
দেখিবার যা'ছে ঘরে ঘর
মোহো[১৩] যাছো[১৪], দিম্ দেহর[১৫]
বিহো হ'লে ॥

১ শখের, যৌবনের রঙীন দিন ২ বহিয়া যাইতেছে ৩ উত্তর দিকে ৪ সম্বন্ধ করা এই অর্থে 'কন্যা জোড়া' ৫ নয়টার ট্রেনে হেলান দিয়া বসিয়া ৬ পথ ৭ নিতম্ব ৮ জাগ্রত, জীবিত ৯ গ্রামদেবতা ১০ আসিয়াছে ১১ পাকুড় তলায় ১২ বর দিতেছে ১৩ আমিও ১৪ যাইতেছি ১৫ পুজা দিব।

CENTRAL LIBRARY

বিহো যদি হয় গে ভোজী মোর
তোর হবে আওসান[১] ;
এ্যাখেলায় আন্ধিছিস[২] ভাত তুই
এ্যাখেলায় ভুকাছিস ধান গে ধান[৩]।
তোর কাম দেখিয়া ফাটে জান ॥

আজি পূজারী ঠাকুর পূজা করেছে
খাব্‌তার খুব জহুত[৪] ;
কাঁহো খা'ছে দহি-চুঁড়া[৫]
কাঁহো খা'ছে দুধ গে দুধ।
খাবার বুরুক[৬] পাইসে জুত ॥

। ১৮০ ।

দাদা, দেখিয়া কইন্যার উপ[৭]
মন য্যামন করে ;
শরীলে না ধরে উপ
জমিনে পড়ে ॥

দাদা, যদি কইন্যার নাগাল পাও[৮]
দুই গালের মুই চুমা খাও ;
মনের ওগুন জল দিয়া নিভাও[৯] ॥

১ আরাম, কষ্টের লাঘব ২ রাঁধিতেছিস, রাঁধিস ৩ ধান ভানাকে 'ধান ভুকানো' বলে
৪ জাগ্রত, জোর ৫ দই-চিঁড়া নৈবেদ্য হিসাবে প্রদান করা রাজবংশী সমাজের এক বিশেষত্ব
৬ বুঝি, যেন ৭ রূপ ৮ পাই ৯ নিভাই, নিবাই।

। ১৮১ ।

দেওয়ান[১], হাটো মইধ্যে বাউরার হাট[২]
মেলার মইধ্যে কাশী ;
ওই মতন ওরে দেওয়ান
চেঙ্গড়ী মাইয়ার হাসি ॥

চেঙ্গড়ী মাইয়ার হাসি যেমন
কাকাতুয়ার আও[৩] ;
তবে সে জুড়াবে দেওয়ান
মোর ঢেনাটার[৪] গাও ॥

নদীর শোভা বান-বরিষা
দীঘির শোভা ফুল ;
বামনের পইতা শোভা
নারীর শোভা চুল ॥

পান্তা ভাতত্ সিদল-সানা[৫]
যেমন সোয়াদ নাগে ;
বিয়াও[৬] যদি চাইস্ করিবা'
চেঙ্গড়ী ওইনং[৭] নাগে ॥

১ মাননীয় বা প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিকে 'মহাশয়' অর্থে 'দেউনিয়া' বলিবার প্রথা প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে চলিত আছে। 'দেওয়ান' 'দেউনিয়া'-রই সমার্থক ২ স্থান বিশেষ ৩ রব ৪ অবিবাহিত অথবা বিপত্নীক পুরুষটির ৫ শুকনা মাছ লঙ্কা নুন ইত্যাদি মশলার সহিত কচু কাটিয়া উদুখলে কুটিয়া দলা পাকাইয়া রাখা হয়। রাজবংশী সমাজের ইহা এক প্রিয় খাদ্য ৬ বিবাহ ৭ ওই রকম।

CENTRAL LIBRARY

। ১৮২ ।

ওকি হায় রে হায়,
কান্দিলে কি ডাওশানীটাক[১]
পোওয়াইল্[২] যায় ॥

ডাউশাটার[৩] মান্দা[৪] বরাত
বসিয়া কান্দেছে নদীর ডাঙ্গাত্ ;
ওকি হায় রে হায় ॥

। ১৮৩ ।

তোর পিরতির এতয়[৫] জ্বালা
গে সুন্দরী,
তোর পিরতির এতয় জ্বালা ;
কতো বা আদরে করিলো কোলে
কলঙ্ক ফুলেরি মালা ॥

সরল জানিয়া গরল খাইনু
শরীল হইল্ মোর কালা ;
গে সুন্দরী,
তোর পিরতির এতয় জ্বালা ॥

। ১৮৪ ।

ও তুই শুনেক্ গে
হোল্‌হোলী[৬] ভুজাই[৭] ;—
মোর ঢেনাটার দুঃখের কথা
তোরে আগত্[৮] কওঁ :

১ ডাঁশা যুবতী মেয়েটিকে ২ পাওয়া ৩ যুবকটির ৪ মন্দ ৫ এতোই
৬ ভালো—এই অর্থে ৭ বউদি ৮ তোরই সম্মুখে।

ও মুই একটা মাইর বাড়ী যাওঁ—
মোক দেখিয়া ঝকলায় গাও[১] ;
ওই ধিকারে মুই ভাত না খাওঁ
ওই মন-মুহনী[২] মাইটা
মোক কি আর না কাড়ে আও[৩] ॥

ওই নে[৪] ওই ধিকারে
ভুজাই গে মুই
ভাত খায়া জল না খাওঁ ;
ওই মুই ঘন্নীর[৫] উপর আগ দেখাওঁ ॥

ওহো গে হোল্‌হোলী ভুজাই,
কি তানে[৬] মোক আও না কাড়ে
মন-মুহনী মাই ॥

। ১৮৫ ।

ও মাই, ভালে ও তোর নাগাল পানু[৭]—
শুনেক গে কাথা :
ও তুই না হইস গন্দা[৮] ॥

ওই ও মুই ভালে-মন্দে কাথা ক'ছোঁ[৯]—
পিরিতি করিবা' চা'ছোঁ[১০],
ও মুই করিছু আশা :
ওই আচ্ছায় বাহারের ফতা[১১]
গে মাই,
তোক দিছে কোন্ দাউশা[১২] ॥

১ গা ঝাঁকি দেয় ২ মন-মোহিনী ৩ আমার সঙ্গে কি কথা বলিবে না ৪ ওই জন্য
৫ ঘরনীর, গৃহিণীর ৬ কি জন্যে ৭ তোর দেখা পাইলাম, ভালোই হইল ৮ রাগ করিস না
৯ কহিতেছি ১০ চাহিতেছি ১১ জলপাইগুড়ির মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র ১২ যুবক। স্ত্রীলিঙ্গে
—'দাউশানী'। সম্ভবত 'ডাঁশা' হইতে আসিয়াছে।

ও মাই, ইশিত-বিশিত[১] ফতা পিন্ধিয়া
বেড়াছিত্ ঠৈসক[২] ধরিয়া ;
এ্যাখো দিন তুই এ্যাখো মতন
ধরেছিত্ শোভা[৩] ॥

ও মাই, পিন্দিছিত্ তুই বিছাহার ;
ও গে, বেড়াছিত্ তুই হাট-বাজার—
গে হে মাই,
তুই দিয়া গে বাহার ॥

। ১৮৫ক ।

ও মোর মন সোদায় ঝুরেছে গে
তোক দেখিয়া ,—
দেখিয়া তোর দেহার বান[৪]
মোর ঢেনার ফাটে প্রাণ—
দেখিয়া তোর মুখের মানান[৫] ॥

আর ছোটো হা'তে অ্যানেক জা'গা[৬]
বেড়াইছো ভরমিয়া ,
তোর মতন সুন্দরী মাইয়া[৭]
না দেখোঁ চোখ্ দিয়া ॥

দেখিয়া সুন্দরী তোক
প্যাটোত্ মোর না নাগে ভোক ;
চোপরাতি নিন্ না ধরে মোক ॥

১ সুন্দর—এই অর্থে ২ শোভা ৩ এক-এক দিন তুই এক-এক শোভা ধরিতেছিস
৪ বাঁধুনি ৫ শোভা ৬ অনেক জায়গা ৭ 'মাইয়া' কথাটি অধিকাংশ স্থলেই 'স্ত্রী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে 'কন্যা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

তোতে-মোতে দুই ঝনাতে[১]
না হয় যদি বিহা—
তোর শোগে[২] মরিয়া যাইম মুই
জলে ঝাম্পো দিয়া ॥

। ১৮৫খ ।

আজি টাড়ীর মইধ্যে[৩] মাই তোর
উচ্চল খপা[৪] ;
কমর সরু মাই তোর
যৈবন মোটা[৫] ।
ভোগধান ভোগধান মাই গে
বাসায় গা[৬] ॥

। ১৮৫গ ।

হাউসের পিরিত কুন বা দিন
ভাঙিবে গে মাই ;
তোরে[৭] বাদে[৮] চোপরাতি গে মাই
পাপের চক্ষে নাই গে নিন ;—
শুহো গে মাই,
কান্দাইম্ একদিন ॥

তোরে বাদে মোর দাদা
গালি গে পাড়া'ছে[৯] ;
নিন্ না ধরে মাই মোক
তোর মুখের হাসি বিনা ॥

১ দুই জনাতে ২ শোকে ৩ পাড়ার মধ্যে ৪ উঁচু খোঁপা ৫ সুপুষ্ট স্তন
৬ গায়ে ভোগধানের মতো সুবাস ৭ তোরই ৮ জন্যে ৯ পাড়িতেছে ।

চেঙ্গড়ীর হাসি রে ওরে জীবন
ভাত-আন্ধা ওগুনের নাথা
দেয় দেওয়ার চিল্‌কন[১] ॥

য্যামন চেঙ্গড়ীর মুখের আও
আতুল তুল[২] নরমের গাও ;
ও মোর দাদা রে, ওরে দাদা,
চেঙ্গড়ীর গালাত্‌ অহিবা' মনা'ছে
চন্দ্রহার হয়া[৩] ॥

। ১৮৫ঘ ।

শুনেক শুনেক শুনেক মাই[৪],
কাথা শুনেক মোর ,—
তোরো নাইরো শিরের সোয়ামী
মোরো নাইরো দোসর ।
গে মাই, কাথা শুনেক মোর ॥

তোরে বাদে[৫] মন মোর
কান্দে গে মাই ;
তোর শরীলে কি দোয়য়া নাই ॥

আজি পুরা মাই মোর
মনের বাসনা ;
গে মাই,
সোয়ামী বিনা তোর মিছা বর্ত্তনা[৬] ॥

১ আকাশের বিদ্যুৎ যেমন উনুনের আগুনের মতো চমকায়, তেমনি কন্যার হাসি আমার বুকে ঝিলিক দিয়া যায় ২ তুল-তুলে নরম ৩ চন্দ্রহার হইয়া কন্যার কণ্ঠে দুলিতে ইচ্ছা হইতেছে ৪ ওগো মেয়ে ৫ তোরই জন্য ৬ মিছাই বাঁচিয়া থাকা ।

CENTRAL LIBRARY

। ১৮৬ ।

ধউলী[১] গে মাই, সুন্দরী গে মাই,
তোর কোপালে পড়ুক ছাই ;
রঙ্গোরূপ তোর কাঁয় বা[২] দেখিবে
তোর কলাত্ সোয়ামী নাই ।

আর বাট্টায়[৩] আছে মাই তোর পানগুয়া
কাঁয় বা খাবে মাই তোর পানগুয়া ।
এখেলায়[৪] থাকিয়া নবো[৫]
ছোবা খুটাটা[৬] ॥

টাড়ীর[৭] মান্ষির মাই
বিয়াও গে হ'ছে[৮] ;
তোরে বাদে[৯] মনটায়
কেনং করেছে ।
একদিন—দুইদিন—তিনদিন—চাইরদিন
দিন মোর বয়া[১০] গে যা'ছে ॥

ধিকো ধিকো মাই তোরে সংসারে
সোয়ামী নাই মাই তোর কোলে ;
এখেলায় যে থাকিয়া নবো
মন কেনং করে ॥

। ১৮৬ক ।

আজি কাঁচা গুয়া, মাই,
পাকা পান—
ও মাই, সেলায়[১১] ক্যানে খা'লো[১২] ।
আজি কাজাক্[১৩] করিয়া ক'নো[১৪] কাথা
ও মাই, গসা নিকিন[১৫] হলো ॥

১ ধবলী ২ কে বা ৩ বাটায় ৪ একলাই ৫ শুইয়া রহিবি ৬ পোড়া কাঠটার মতো ৭ পাড়ার ৮ হইতেছে ৯ তোরই জন্যে ১০ বহিয়া ১১ তখন ১২ খাইলি ১৩ ঠাট্টা ১৪ কহিলাম ১৫ নাকি ।

। ১৮৭ ।

গুইলা[১] কাথাত্[২] গে মাই তুই
না হইস গোসা ;
তোকে-মোকে বিধি
নাই ন্যাখে[৩] জড়া[৪] ॥

আজি যেইদ্দিন দ্যা'ছে[৫] মাই তোর
দরগুয়া[৬],—
সেইদ্দিন মাই মোর গরুর পালা[৭] ॥

ঢিক্কিত্-মারা[৮] মাই তোর চুঁড়ার ভুকি[৯]
মুচ্কি-মারা মাই তোর
মুখের হাসি ॥

এ্যাল গাড়ী গে,
চলে নানান কলে ;—
দেখা দিস মাই তুই নানান ছলে[১০] ॥

১ ওই সমস্ত। বহুবচনে 'লা' ২ কথাতে ৩ লেখে ৪ জোড়া। তোর ও আমার বিবাহ হউক, বিধি তাহা চান না ৫ দিতেছে, দিয়াছে ৬ কন্যাকে পাত্র-পক্ষ দেখিতে আসিলে কথাবার্তা পাকাপাকির সময় পান-সুপারি ইত্যাদি আদান-প্রদান হয়। ইহাকেই বলে "দরগুয়া" ৭ যেইদিন তোর দরগুয়া হইল, সেইদিন আমার গোরু চরাইবার পালা পড়িল। অর্থাৎ আমি বাড়ীতে থাকিলে নিজেই তোর পাণিপ্রার্থনা করিতাম ৮ কন্যা খুব ভালো চিঁড়া কুটিতে পারে। উদুখলে চিঁড়া কুটিবার শব্দকে "ঢিক্কিত্-মারা" শব্দ বলা হইয়াছে ৯ উদুখলে মুষল পড়িবার শব্দ ১০ রেলগাড়ী যেমন মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া বিচিত্র রূপে চলে, তেমনি শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়াও তুই নানা বিচিত্র উপায়ে আমার সহিত দেখা করিস।

CENTRAL LIBRARY

। ১৮৭ক ।

আজি হাল বহিম্, না পাক পাড়িম্,
গে মাই, কি যাইম্ তোরে বাড়ী ;
ছাই পড়োক তোর পিরতিত্ মাই গে,
বয়হা[১] গেইল্ মোর গারস্তি[২] ॥

চালত্ ফলে চাল কুমুড়া গে
ঝিঁকত্[৩] ফলে কদু[৪] ;
দেখাদেখি মান্‌ষি হনো মাই গে
ও তোর পরে খাবে মধু ॥

যেইঠে[৫] মাই তোক ব্যাচেয়া খাবে[৬]
সেইঠে যাইম্ চাখিরি :
আজি দাদা সমন্[৭] ধরিম্ মাই গে
তোক কহিম্ গে ভোজী[৮] ॥

। ১৮৭খ ।

কইন্যা হে, ওহে কইন্যা
তোর কইন্যার পিরতির আশে—
বাপো-ভাই ছাড়িলাম হ্বাশে রে ।
কইন্যা হে,
পিরিত করিয়া ছাড়িয়া না যান মোরে ॥

তোর পিরিতির এমনি রে হানা[৯]
ভাসিনু মুই সাগরের ফেনা[১০] ;
তোর পিরিতির এমনি রে মহা[১১]
ছাড়িতে না যায় রে ছাড়া ॥

১ বহিয়া ২ গৃহস্থালি ৩ ঝাড়লায় ৪ লাউ ৫ যেই স্থানে ৬ বেচিয়া খাইবে ৭ সম্বন্ধ ৮ বউদি ৯ আঘাত, এখানে আকর্ষণ ১০ সাগরের ফেনার মতো ভাসিতেছি ১১ মায়া। গানখানি রেকর্ডগীতি রূপেও পাওয়া যায়। তাহার 'কথা' সামান্য পরিবর্তিত।

ঘুঘু না পংখী হইয়া
উড়িয়া বসিমো ডালে যায়া
সেই না ডালে কহিমো দুঃখের কাথা ॥

। ১৮৭গ ।

ও মোর মনটা পাগেলা হইছে
ওগে মাই,—
মনটাত্ সুখ-শান্তিয়ে নাই ॥

ও মুই তোরে বাদে[1]
সোদায়[2] গে ভাবো[3] ;—
আর কোনো মোর চিন্তা নাই ॥

। ১৮৭ঘ ।

ওকি গে মাই,
আর হোবে নাই[4] ॥
ও মুই বসিয়া বাজাও
মনের বেনা—
নাই শুনিস তুই মনের ক্যাকেনা[5] ॥

। ১৮৭ঙ ।

ও সুন্দরী গে,
ওগে কুন্ঠে[6] গেলো গে
হামাক্[7] ছাড়িয়া ॥

১ তোরই জন্যে ২ সদাই ৩ ভাবি ৪ আর মিলন হইবে না ৫ মনের বেদনা, আকাঙ্ক্ষা, উন্মামতা ৬ কোথায় ৭ আমাকে।

CENTRAL LIBRARY

আজি শূন্য হইল্ মোর
এ ঘর-বাড়ী ;
তোর বাদে মুই হনু[১] দেশান্তরী ॥

আজি মরিম মুই নদীতে
ঝাম্পো দিয়া ;
ও মুই হনু কলঙ্কিয়া ॥

। ১৮৮ ।

মন মোর ছতকার[২] হ'ছে ভোজী
তোক দেখিয়া ;
হায় ঢেনার কপালে[৩] পোড়া—
এমনি যাবে ঢেনার দেহা
বোরাত্ মাটিয়া[৪] ॥
কাঁহোয় না দে' গে[৫] বেটী
গরীব দেখিয়া ॥

মুই হনু গরীবের ছেইলা
উচ্চা কাথা না যায় কহা[৬] ।
কাঁহোয় দে' গে বেটী
গরীব দেখিয়া ॥

১ হইলাম ২ ছত্রখান ৩ কপালই ৪ আমার দেহের যেন কোনো মূল্যই নাই। এ যেন এক বস্তা মাটি ৫ দেয় গো। ৬ গরীব বলিয়া উচ্চ আশা পোষণ করিতে পারি না।

CENTRAL LIBRARY

। ১৮৮ক ।

ও মোর ভোজী[১] গে,
তোরে না বাদে[২] সাধের বৈরাগী
ও মোক করালো বৈদেশে[৩] ॥

আজি পরমেশর নেখিচে জড়া
ওই নে গেনু তাঁতীপাড়া ;—
কিনি' আনমু এক জড়া ফতা ॥

শুগে, হার দিমু, হাসেলা দিমু ;
চন্দ্রহারখান গালায় দিমু ;
গালার মালাখান কোন্ঠে পিন্ধিবো[৪] ॥

অবিবাহিতা নারী

। ১৮৯ ।

ওই একদিনা—
আখেছু মুই আয়না দিয়া,
পরার ছোয়া[৫] কলাত্[৬] নিয়া—
আকোয়ারী[৭] মোক শবায় না[৮] ॥

আই[৯], মোক ব্যাচেয়া খা' গে খা'[১০] :
গাবুর[১১] মন বান্ধিয়া
না যায় গে অহা[১২] ॥

১ বউনি ২ তোরই জন্য। 'না' অর্থহীন ৩ তোর জন্যই আমি বৈরাগী সাজিয়াছি। অর্থাৎ প্রেমে পাগল হইয়াছি ৪ গলায় হার, হাঁসুলি এবং চন্দ্রহার দিয়াছি, এইসব পরিবার জন্য গলায় স্থান কোথায়। তবু, গলার মালাও দিয়াছি ৫ পরের ছেলে ৬ কোলে ৭ কুমারীত্ব ৮ শোভা পায় না ৯ মা ১০ স্থানীয় প্রথানুযায়ী কন্যার পিতাই কন্যা-পণের টাকা পায়। এই জন্য বিবাহ ব্যাপারটাকে কন্যা-বিক্রয় ব্যাপার রূপে ধরিয়া নেওয়া হয়। আমাকে বিক্রয় করিয়া খাও—অর্থাৎ আমার বিবাহ দাও ১১ যুবতী ১২ রহা।

ও আই, মোর ছটলার[১] বিহো[২] গে হ'ছে
উমার[৩] ছাওয়া খেলা'ছে ;
"ডমনা গে ডুমুনি
শোড়া মাছের ঘুমুনি[৪]
শাক খায়, শুকাতি খায়[৫],
ডমনা বেটা কোন্‌ঠে অয়[৬] ॥"

মোরো যদি আই গে
বিহো হলেক হয়[৭]—
মোরো[৮] ছাওয়া
ডম্‌না ডুম্‌নি খেলা করিলেক হয়[৯] ॥

। ১৯০ ।

য্যামন কচুর পাতে জল
সোদায়[১০] করে টল্‌মল্‌ ;
মুই নারীটা ওভাগোনী[১১]
অহিম্‌[১২] কতোকাল ॥

। ১৯০ক ।

ওভাগোনীর অন্তর ঝুরেছে গে—
শাংকারিয়ার হড়পা[১৩] দেখিয়া ;
বাপ-মড়াটার শোক পড়েছে[১৪]
না খায় ব্যাচেয়া[১৫] ।
কতয় দিনে পিন্দাবে মোক শাংকা ॥

১ ছোটোদেরও ২ বিবাহ ৩ উহাদের ৪ শুকনা মাছের ঘুমুনি। 'ঘুমুনি' অর্থে তরকারি বিশেষ ৫ পাটের শুকনা পাতার তরকারিকে 'শুকাতি' বলে ৬ কোথায় রহে ৭ যদি বিবাহ হইত ৮ আমারও ৯ করিত ১০ সদাই ১১ অভাগিনী ১২ রহিব ১৩ শাঁখারিয়ার শাঁখার বায় দেখিয়া ১৪ বাপকে মড়া এবং 'শোক-পড়া' বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে ১৫ আমাকে বিক্রয় করিয়া খাইতেছে না,—অর্থাৎ আমার বিবাহ দিতেছে না।

। ১৯০খ।

দোলা মাটির কেলা[1] দইয়ল[2] রে
হল্‌কল্‌-হল্‌কল্‌ করে[3] ;
আজি ওইনং[4] নারীর যৈবন রে
দিনে দিনে বাড়ে ॥

বাপো-মাও মোর নিদয়া রে
ব্যাচেয়া না খায় ছোটোতে ;
যৈবন ঢুলে মোর
পুবাল বাতাসে ॥

ওকি ও দইয়ল রে,
কার বাদে[5] আখিমো
সনার যৈবন রে ॥

। ১৯০গ।

পড়শী আপনার না হয় বান্ধব রে।
আজি কোড়া কান্দে, কুড়ী কান্দে
কান্দে বালি হাঁস ;
আজি বনের হরনী[6] কান্দে
ছাড়িয়া মুখের ঘাস ॥

আজি জলত্‌ কান্দে জলহুয়া
ডালত্‌ কান্দে টিয়া ;
আজি ঘর-যুবতী[7] নারী কান্দে
খাট-পালঙ্কে শুইয়া ॥

১ নাবাল জমির কলাগাছ ২ দয়াল পাখী ৩ নাবাল মাটিতে কলাগাছ যেমন হলহল্‌ করিয়া বাড়ে, তেমনি দিনে দিনে আমার যৌবন বাড়িতেছে ৪ ওই মতোন ৫ জন্যে, তরে ৬ হরিণী ৭ যে নারী বাপের বাড়ীতেই যুবতী হইবার পর আছে অর্থাৎ উপযুক্ত বয়স হইলেও যাহার বিবাহ হয় নাই।

। ১৯১ ।

দাদা রে,
যৈবন দেখি' ছাতি ফাটে মোর ।
ওরে মাও কয় ছোটো ছোটো—
দাদা বেচে'[১] না খায় বাপে ;
আজি মাসে মাসে গুয়া কাটে[২]
বেচে' না খায় দাদা—ঢক ত্থাখে ॥

। ১৯১ক ।

দাদা, গাবুর কাল মোর যা'ছে রে গড়েয়া[৩] ।
জ্বলেছে মনে রে গুন
কাঁয় আর[৪] বুঝিবে ॥

দাদা, কতয়[৫] করিসি[৬] হাসি-ঠাট্টা
কতয় খাইসি পান গুয়া ;
—সংশরীরটা[৭] দেসৌ শুকেয়া[৮] ॥

দাদা, মাও আরে মোক
এই করালেক ;—
এমন গাবুর ব'সে
সোয়ামীধন নাই মোর কোলে ॥

১ বিক্রয় করিয়া ২ বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করিবার অনুষ্ঠানে দুই পক্ষ পান-সুপারি আদান-প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে "গুয়াকাটা" ৩ গড়াইয়া ৪ কে-বা আর ৫ কতোই ৬ করিয়াছি ৭ সর্ব শরীরটা ৮ শুকাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ শুকাইয়া গিয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

। ১৯২ ।

আজি মুই নারী খুলিনু
পেমের পসহার[১] ;
যে জন ভাবের বন্ধু হোবে
পেম-দরিয়ায়[২] দিছোঁ সাঁতার ॥

ওরে নিরাশীর বাপ বুঝে না ;
ওরে বিভাও তো হামাক দেয়-কে না[৩] ।
কাল-জীবন মোর
থাকিবা' মনায় না[৪] ॥

। ১৯৩ ।

মুই কান্দেছোঁ[৫] চালিত্ বসিয়া[৬] ;
মোক ধরিয়া খা রে—
মোহোনী-নাগা[৭] বন্ধুয়া[৮] ॥

কত্ দিন হাতে[৯] নাই খাওঁ[১০]
ও মুই অসের পান-গুয়া ;
ও তোর হাতে তুলিয়া
ও তোর মুখত্ তুলিয়া ॥

১ প্রেমের প্রসার ২ প্রেম দরিয়ায় ৩ দেয়-ই না ৪ এ পোড়া জীবন রাখিতে ইচ্ছা হয় না ৫ কাঁদিতেছি ৬ বারান্দায় বসিয়া ৭ মোহিনী-মায়া লাগাইয়াছে যে, সে ৮ বন্ধু ৯ কতোদিন হইতে ১০ খাই নাই ।

CENTRAL LIBRARY

। ১৯৩ক।

কিরে মোজার দখিণা হাওয়া
বাইরা খলানে[১] ॥
আজি মনের হাউসে[২] বান্দিনু খপা
আউলাইল্ বাতাসে ;
আসিবা[৩] চাইছে সনার বন্ধু
ওই না কদমতলে।
মোর বন্ধু এলাও[৪] না'ইসে[৫] ॥

। ১৯৩খ।

ত্যাল দিয়া কাঁকাইসোঁ[৬] মাথা—
হামার বাড়ীতে বন্ধু যাবার কাথা ;
যাবার চায়া কেনে গেলেন না ॥

বান্নি ধানের ভাজিনু খই
নয়া পাইলাত্[৭] পাতিনু দই ;
নয়া গাছের মোর
মালভোগ রে কলা ॥

। ১৯৩গ।

তিস্তা নদীর বান আসিয়া
ফুটাইল্[৮] রে কাশিয়া[৯] ;
সনার বন্ধু পিরিত করিয়া
দিয়া গেইল্[১০] মোক জ্বালা ॥

১ গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণকে 'খলান' বা 'খল্তা' বলে ২ শখে, সাধে ৩ আসিবার, আসিতে ৪ এখনও ৫ না আইসে ৬ আঁচড়াইয়াছি ৭ পাতিলে, হাঁড়ীতে ৮ ফুটাইল ৯ কাশফুল ১০ গেল।

। ১৯৪ ।

বাপোই চেঙ্গেড়া রে,
গোরু নিয়া যাইস বাপোই
গান টানিয়া[১] রে।
ভুল্‌কি মারি'[২] ডাকাও[৩] বাপোই
তাঁহো[৪] শুনিস না ॥

সরিষার ফুল রে বাপোই
মাটির শোভা ;
মোর নারীটার ঢালুয়া রে খঁপা[৫]।
মোর নারীটার দুঃখের কাথা
ও মুই কাক্‌ কহিম খুলিয়া ॥

। ১৯৫ ।

এমন পিরিত করলু বাউদা[৬] রে—
মনের হাউস[৭] মোর মিটিল্‌ না,
মোক করলু তুই কাথা-শুনা[৮]।

উত্তর পাখে[৯] বড়ো ঘর
কাটিয়া গেইল্‌ গুয়া[১০] ;

১ দীর্ঘলয়ে গান গাহিয়া ২ গলা উঁচু করিয়া, হাত ছানি দিয়া ৩ ডাকি ৪ তবুও ৫ বিস্তৃত, বৃহৎ খোঁপা ৬ 'বাউদিয়া' শব্দটি উদাসী, আত্মভোলা, ইত্যাদি অর্থে চলিত ছিল। বর্তমানে শব্দটির অর্থাবনতি হইয়াছে। নিন্দার্থেই ইহার প্রয়োগ বেশী। 'প্রেমিক' অর্থে ইহার ব্যবহার হয় ৭ শখ, আহ্লাদ, সাধ ৮ প্রেমের ব্যাপারে পাড়াপড়শী সবাই প্রেমিকাকে নানাকথা তিরস্কার বা নিন্দার ছলে বলিয়াছে। কথা শুনা হইয়াছে যে, সে 'কাথা-শুনা' ৯ উত্তর দিকে ১০ পাকা দেখিবার দিন, বর ও কন্যা পক্ষ বিবাহের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইবার নিদর্শন রূপে পরস্পর পান-সুপারি আদান-প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে 'গুয়াকাটা' অনুষ্ঠান।

হেটে না দেং, হোটো না দেং[১]
কহছে মোর বাপো-দাদা ॥

আর কতয়[২] দিন অইম্[৩] চায়া[৪]
ও মোর দাদা গে,
মনের গুণ্ডন কাঁয় নিভি' দিবে ॥
সোগায়[৫] থাকে জোড়ে-জোড়ে
মুই নারীটা এ্যাখেলায়[৬] ;
ও মোর দাদা গে,
পায়োর নাথান জোড় মিলিয়া দে ॥

। ১৯৬ ।

শালমলী-শিমিলার গাছ[৭]
তারে হইল্ পাক্ক ডাল সই
তারে উপর বইসে কাকাতুয়া ;
পাড়ার পড়োশী সই
স্তাও[৮] প্রাণের বৈরী
সই রে, কার হস্তে পেঠাইম[৯] বন্ধুর গুয়া ॥

কাকাতুয়া, বলেঁা তোক[১০],
ঠোঁটে করি' গুয়া তুই
নিয়া যা প্রাণ-বন্ধুয়ার ঠাশে ॥

আজি স্বজন কাণ্ডারী হও
নৌকাত্ নিশ্চানো[১১] দেও রে
স্তাও নৌকাত্ চড়িয়া আসে বন্ধু ॥

১ এখানে (হেটে) মেয়ে দিব না, ওখানে (হোটো) মেয়ে দিব না—এইরূপ আপত্তি
২ কতো ৩ রহিব ৪ চাহিয়া ৫ সকলে ৬ একলাই ৭ শিমুল গাছ ৮ সে-ও ৯ পাঠাইব
১০ তোকে বলি ১১ নিশান, পাল।

মোর নারীর লাম্বা কেশ
　　মটুক চুলির[১] বেশ ;
মুই নারী তুলিয়া বান্ধোঁ খোঁপা[২]

। ১২৭ ।

ভালে আসিলো[৩] রে
　　তুই মোর অসিয়া[৪] বাপোই।
　　তোরে[৫] বাদে[৬] চান্দেয়া বেড়াও[৭]—
পোওয়া[৮] না যায় দই,
　　রে পোওয়া না যায় দই ॥

বাপোই, খায়য়া-দায়য়া থাক্
　　চড়েয়া স্থাছোঁ[৯] ভাত ;
ছেঁকা শাক[১০] আন্ধেছোঁ[১১] বাপোই
　　ঘিত্ কুমড়ার[১২] পাত ;
　　রে ঘিত্ কুমড়ার পাত ॥

বাপোই, আরো কাথা[১৩] শুন
　　স্থাকেয়া[১৪] স্থাও[১৫] ওস্থন[১৬]।
　　　　আলোয়া ধানের চুঁড়া বাপোই
　　খোওয়া না যায় মুন[১৭] ;
　　　　রে খোওয়া না যায় মুন ॥

১ কোঁকড়া চুলের　২ এই গানের প্রথমাংশ রেকর্ড-গীতি রূপে পাওয়া যায়　৩ আসিয়া ভালোই করিলি　৪ রসিক　৫ তোর-ই　৬ জন্যে　৭ চাহিয়া খুঁজিয়া বেড়াই　৮ পাওয়া　৯ দিতেছি　১০ কলাগাছ হইতে প্রস্তুত ক্ষার দিয়া রাঁধা তরকারি　১১ রাঁধিতেছি　১২ মিষ্টি কুমড়া　১৩ কথা　১৪ খোসা ছাড়াইয়া　১৫ দিতেছি, দিই　১৬ রসুন　১৭ ধান সিদ্ধ না করিয়া, কেবল জলে ভিজাইয়া, পরে ভাজিয়া চিঁড়া কুটিলে তাহাকে 'আলোয়া ধানের চিঁড়া' বলে। এই চিঁড়ার সহিত নাকি নুন খাওয়া নিষিদ্ধ।

CENTRAL LIBRARY

। ১৯৭ক ।

চিতো-সখী রে,
বন্ধুর মতন না ছাখো[১]
কাঁহকে রে[২] ॥

মোর বন্ধুয়া মান্‌ষি ভাল্‌
না বুঝে মোর সইন্‌ঝা কাল রে ;
না বুঝে মোর এ নারীর জঞ্জাল ॥

মোর বন্ধুয়া নাই খায় চুঁড়া
কোন্‌ঠে[৩] পাইম[৪] মুই মাণ্ডাভুরা[৫] রে ;
কোন্‌ঠে পাইম মুই ঘন-আউটা দুধো[৬] রে ॥

মোর বন্ধুয়া নাই খায় ভাত
কোন্‌ঠে পাইম মুই মাগুর মাছ ;
কোন্‌ঠে পাইম মুই চন্দন-কুরুসা[৭] রে ॥

। ১৯৮ ।

ওই অসিয়া[৮] দাদা,
তুই না দেখিস মোক
চুল্‌কি মারিয়া[৯] ॥

চুল্‌কি মারিয়া দেখিলে মোক
মন্দ কহিবে পাড়ার নোক ;
জুড়ি গাঁথিয়া[১০] বিহাও করেক মোক ॥

১ দেখি ২ কাহাকেও ৩ কোনস্থানে ৪ পাইব ৫ চিনি জ্বাল দিয়া ছাঁচে ঢালাই করিয়া যে মিষ্টান্ন হয়, তাহাকে 'মাণ্ডাভুরা' বলে। 'মাণ্ডা' স্পষ্টই 'মণ্ডা' হইতে ৬ ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া দুধ ৭ মৎস্য বিশেষ ৮ রসিক, রসিয়া ৯ উঁকি দিয়া দেখা ১০ ঘটক ডাকিয়া, জোড় মিলাইয়া।

CENTRAL LIBRARY

দোমহনীর[১] হাটের দই-চুঁড়া রে
নেওরা[২] নদীর পানি ;
আখিয়াছিলাম গোপনের পিরতি
হইল্ রে জানাজানি ॥

। ১৯৮ক ।

আরে ও মোর অসিয়া দাদা
সোদায়[৩] দেখিস দাদা
চুল্‌কি মারিয়া[৪] ॥

চুল্‌কি মারি' দাদা দেখিস তুই ;
তিন শও টাকা পণ দিয়া
বিয়াও করেক দাদা আসিয়া[৫] ।
সেলা কহিমো দাদা ছুখের কাথা ॥

। ১৯৯ ।

ও মোর আভোং দেহাটা[৬]
নাড়িলো[৭] রে চেঙ্গেড়া
কি মনে করিয়া ॥

ও কি ও বাপোই রে,
বুঝিনু চেঙ্গেড়ার মন ;
নাই কহিতে আনিয়া দিলেক
পানিয়া-ভাসা সাবোন[৮] ॥

১ তিস্তার পূর্বপারে বর্ধিষ্ণু স্থান বিশেষ ২ জলপাইগুড়ির পাহাড়ী নদী বিশেষ ৩ সদাই, সবসময়েই ৪ উঁকি দিয়া ৫ রাজবংশী সমাজে বরকেই কন্তাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় ৬ যে দেহ আজ পর্যন্ত কেহ ভোগ করে নাই ৭ স্পর্শ করিলি, ভোগ করিলি ৮ জলে-ভাসা সাবান।

CENTRAL LIBRARY

। ২০০ ।

আরে ও মোর বাঙ্কাদাদা[১]
চিতুল ব'স[২] না যায় আখা।
তুইহো[৩] যাবো[৪] দাদা গাড়ীবাড়ী
মোকো[৫] নিগা[৬] সঙ্গে করি'।
যৈবন[৭] বাড়ে দাদা কাপোড় চিঁড়ি' ॥

কেনে করিস দাদা ধোকর-ফোকর[৮]
অস্তে[৯] ফেলাও[১০] বুকর[১১] কাপোড়।
কেনে করিস দাদা হাই রে খাই[১২]
ঘর সেন্দাও[১৩] দাদা, মান্‌ষি নাই[১৪] ॥

। ২০০ক ।

ওরে পর পুরুষের এমনি মন্ত্রহা
মন ভুলালে বিড়ি দিয়া ;
কি দিয়া শুধিমো বিড়ির দেনা ॥

যদি যৈবন খাইতে চাও[১৫]
দুয়ারের আগত্‌ পাটা বও[১৬] ;
পাটাশাক তুলিতে তুলিতে
যৈবন করিমো দান ॥

১ নাম বিশেষ। অথবা, 'বাঞ্ছিত দাদা' এই রূপ অর্থও করা চলে ২ চটুল বয়স অর্থাৎ যৌবন কাল ৩ তুইও ৪ যাবি ৫ আমাকেও ৬ লইয়া যা ৭ স্তনদ্বয় ৮ ইতস্তত, দ্বিধা ৯ আস্তে ১০ ফেলি ১১ বুকের ১২ ইতস্তত, দ্বিধা ১৩ প্রবেশ কর ১৪ ঘরে আর কেহ নাই।

দ্বিতীয় স্তবকের অতিরিক্ত কথা :—

মোর নিরাশীর মাথা খাবো ॥ ইত্যাদি

১৫ দেহ ভোগ করিতে চাও ১৬ বাড়ীর সম্মুখে যে পাট ক্ষেত আছে, তাহাতে কাজ করিতে থাকো।

CENTRAL LIBRARY

। ২০১ ।

বন্ধু ধন ধন রে,
এতয়[১] গোসা কি তোর অন্তরে ॥

বাপো-মাও মোর ময়হা-ছাড়া[২]
ব্যাচেয়া নাই খায় ছোটোতে ;
যৈবন উড়ায় মোর
পুবাল বাতাসে ॥

বাপো-মাও মোর হ্যাদেল্-দেল্[৩]
দিবা' না জানে[৪] মাথার ত্যাল।
ওই বাদে মোর খোঁপা হ্যাদেল্-দেল্[৫] ॥

বাপো-মাও মোর হ্যাদেল্-দেল্
দিবা' না জানে ক্ষার-খইল্।
ওই বাদে মোর দেহাটা ভুষুং-ভাষাং[৬] ॥

মুই তো পিরিত করোঁ না
টাড়ীর[৭] চেঙ্গেড়াগিলায় ছাড়ে না
মোক দিয়া গেইল্ পিরতির বাহেনা[৮] ॥

। ২০২ ।

ধরিয়া চালেরো বাতা,
দানো ঝনে[৯] কমো কাথা,—
ওরে কমো কাথা নিরলে হে বসিয়া[১০]।
ওরে বন্ধু রে,
ওরে নিদানো ওরে কালে ॥

১ এতোই ২ নির্দয় ৩ উদাসীন ৪ দিতে জানে না, দেয় না ৫ এলো মেলো ৬ নোংরা, অপরিষ্কার ৭ পাড়ার ৮ বায়না, এখানে জ্বালা ৯ দুই জনে ১০ নিরালায় বসিয়া কথা কহিব ১১ বিপদের দিনে, বিচ্ছেদের দিনে।

ওরে বন্ধু, তুই বেড়াছিত্[১] বনে রে বনে,
মুই কান্দেছু[২] মনে রে মনে।
ওরে মোর কান্দনে
বিরিখের পাতা ওরে ঝরে ॥

বন্ধু, তুই যেই দিনা থাকিবো বনে,
মহো[৩] কান্দিম ঘরের রে কোণে ;
ওরে বিছিনাত্ বসিয়া মুই
মরিম রে বন্ধুয়া—
ওরে নিদানো ওরে কালে ॥

।২০৩।

বাড়ী না মোর পুবে রে
হে সুন্দর গাছো না রে আছে :
সেই না গাছের পঞ্চতিরি[৪] পাতা ;
মধুরে[৫] না মোর ভরেতে রে
হে ডালো ভাঙ্গিয়া না রে পড়ে—
আজি তিন দিন হাতে বন্ধুয়ার নাই হয় দেখা ॥

বাড়ী না মোর পছিমে রে
বিরুবাঁশের থোপো না রে আছে :
সেই না বাঁশে বগুলা জোড়ায় ভাসা[৬] ;
তোক্ বগুলা ভাসা রে দিয়া
মোর টুটালো আশা—
আজি তিন দিন হাতে[৭] বন্ধুয়ার নাই হয় দেখা ॥

১ বেড়াইতেছিস ২ কাঁদিতেছি ৩ আমিও ৪ 'তিরি'র অর্থ, যিনি গানখানির গায়ক তিনিও করিতে পারেন নাই। খুব সম্ভব পাঁচ মাথাযুক্ত পাতা ৫ মধুর দ্বারা ৬ বাসা তৈরি করে ৭ হইতে।

বাড়ী না মোর দখিণে রে
হে সুন্দর ডীঘি[১] না রে আছে :
সেই না ডীঘিত্‌ হংস রে জোড়া চরে ;
তোক্‌ হংস ভাসা রে দিয়া
মোর টুটালো আশা—
আজি তিন দিন হাতে বন্ধুয়ার নাই হয় দেখা ॥

বাড়ী না মোর উতরে রে
হে সুন্দর নদী না রে আছে :
সেই না নদী বন্ধুয়া
কেইনং[২] হোবে পারো রে ;
কলা না কাটিয়া রে ভুরা না বানাছু রে
সেই না ভুরায় বন্ধুয়াক্‌ করিমো পারো রে—
আজি তিনি দিন হাতে বন্ধুয়ার নাই হয় দেখা ॥

। ২০৪ ।

দুয়ারের আগে নয়া ডীঘি
চক্‌চকাছে বালা[৩] ;
তুই বন্ধু মোক ছাড়িয়া গেলে
কার ধরিমো গালা ॥

দুয়ারের আগে মানার খোপ[৪]
নাসে[৫] ষ্যামন ধরে ;
তুই বন্ধু মোক ছাড়িয়া গেলে
মন সেইমন[৬] করে ॥

১ দীঘি ২ কেমন করিয়া ৩ দুয়ারের সম্মুখস্থ নতুন দীঘিটার বালি চক্‌চক্‌ করিতেছে মানকচুর খোপ ৫ শব্দটি 'লাস্ত' হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুন্দর দেখায়—এই অর্থে। ৪ বহু গানে মানকচুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে ৬ সেই মত। উপমাটি স্পষ্ট নয়। অন্তর্নিহিত অর্থ বোধ হয় এই : বাড়ীর সম্মুখে মানের খোপ থাকিলে বাড়ীর সৌন্দর্য বাড়ে এবং সেই মানের খোপ অন্তর্হিত হইলে বাড়ীর সৌন্দর্যের হানি হয়। তুমিও আমার সেই রূপ।

CENTRAL LIBRARY

॥ গার্হস্থ্য জীবন ॥

। ২০৫ ।

কেইনং বিয়াও দিলে দাদা রে
ভাল্-মাইয়াটা কানে না শুনে।
মোক নাগাইসে ঠন্[১] :
খাবা'[২] চাহু[৩] চাউলের গুণ্ডা—
আনিয়া দিলেক ধান ॥

। ২০৬ ।

আং[৪] মোর উঠিল্ রে ধীরে।
আলু-শাগ[৫] আন্দিস[৬] গে শালী,
খাকেয়া ফেলাইস চসা [৭]
ত্যালোতে ভাজিয়া অঠাইস[৮]
শৌলের পহনা[৯] ॥

আং মোর উঠিল্ রে ধীরে।
আলু-শাগ আন্দিতে রে স্বামী,
দেরি হোবে মোর[১০] ॥
দেরি হলে শুগে শালী
চক্[১১] ফাটাইম্ তোর ॥

। ২০৭

হাতত্ টোকা[১২], পিঠিত্ ছোওয়া[১৩]—
বেড়ানি ফাবেনারে[১৪] দূরের হালুয়া ॥

১ ঠাণ্ডা ২ খাইবার, খাইতে ৩ চাহিলাম ৪ রাগ ৫ আলুর তরকারি ৬ রাঁধিস ৭ খোসা ছাড়াইয়া ফেলিস ৮ উঠাইস ৯ শোলের পোনা ১০ স্ত্রীর উক্তি ১১ উক্ত ১২ লাউয়ের বস ১৩ পিঠে ছেলে বাঁধিয়াছি ১৪ সহজে হাঁটিয়া (বেড়াইয়া) আসিতে পারি না।

সকালে কর্নু[১] ছান-এগিনা[২]
ছফোরে ভুকান্থ ধান[৩]।
তুই কি না বুঝিস হালুয়া রে
একলা বাড়ীর কাম[৪] ॥

। ২০৭ক ।

হাল বহিলো তুই চড়কডাঙ্গি[৫]
খা রে বুড়া[৬] তুই চাউল-পানি[৭]।
বাহেচা ধানের[৮] চাটিক[৯] রে চুঁড়া
খাইসে[১০] তোর ছুইটা ছাওয়া ॥

। ২৩৮ ।

ও স্বামিধন,
তুই বুঝিয়ায়[১১] বুঝিস না কিতায়[১২];
ভাবিলে কি ভাবেনা স্বামী
দূরে রে পালায় ॥

তুই রে স্বামী করেক কাম
মুই কুটেছুঁ বাহেচা-ধান[১৩];

১ সকালে করিলাম ২ গোহাল পরিষ্কার করাকে "ছান ফেলানো" বলা হয়। গোহাল পরিষ্কার করিলাম, উঠান ঝাঁট দিলাম ৩ তারপর দুপুর বেলায় ভানিলাম ধান ৪ তুই কি বুঝিতে পারিস না, বাড়ীর এই সমস্ত কাজ আমাকে একলাই করিতে হয় ৫ জমির কাল্পিক নাম বিশেষ। এইরূপ অপর নাম 'নিধুয়া-পাথার' ৬ স্বামীকে স্ত্রীর সম্বোধন ৭ চাউল ভাজা ও জল ৮ অপরের বাড়ী হইতে ধান আনিয়া নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধান ভানিয়া দেওয়াকে "বাহেচা-কুটা" বলে এবং সেই ধানকে "বাহেচা ধান" বলে ৯ চারটি ১০ খাইয়াছে, খাইয়া ফেলিয়াছে ১১ বুঝিয়াও ১২ কি জন্যে ১৩ অন্যের বাড়ি হইতে ধান আনিয়া নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধান ভানিয়া দেওয়াকে "বাহেচা কুটা" বলা হয়।

CENTRAL LIBRARY

টাকার বদলি মোক
আনি' দে ধান[১] ।
ধান ভুকায়া[২] মুই হাট নাগা'ম[৩] ॥

আশিন-কাতিক দুইখান মাস
রে স্বামী,
কাটিমো আকাল[৪] ॥

। ২০৯ ।

সাটোক করিয়া[৫] ডাং[৬] মাঠালো[৭]
ধান-ভুকা গাহেনটা কাটিয়া[৮],—
কি ওহোরে শোপ্-পড়া[৯],
কাটাবো কাটাবো এই সন্[১০] :
গালাটা চক্‌চকায় মোক দিবো রে গাহেনা[১১] ॥

ওরে শাবাইশ্[১২] কহুঁ[১৩] মুই ।
মান্‌ষির ভাতার[১৪] কেনং কিনেছে পাটা[১৫]—
ওরে এই সন দখুন[১৬] অঠাবো[১৭] তুই
পাইকারি বাহারটা[১৮] ॥

১ টাকা দিয়া আমাকে ধান কিনিয়া দে ২ ধান ভানিয়া ৩ হাটে বিক্রয় করিব ৪ আশ্বিন ও কাতিক মাসে কৃষক-সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়। তখন 'ভাদই' ধান শেষ হইয়া যায় এবং 'হৈউতি' ধান উঠে না ৫ অহঙ্কার করিয়া, দেমাক দেখাইয়া ৬ দণ্ড, তুলাদণ্ড ৭ চাছিলি, পরিষ্কার করিলি ৮ ধান ভানিবার মুষলটি চাছিয়া পাট ওজন করিবার তুলাদণ্ড করিলি ৯ 'শোকপড়া'—শোকে আচ্ছন্ন করুক (পড়ুক) তোর মন—এই অর্থে গালি বিশেষ ১০ এই বৎসর ১১ আমার গলা চকচক-করা গহনা দিবি নাকি ১২ শাবাশ ১৩ কহি ১৪ ভাতার মানুষ—বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১৫ কি রকম পাট কিনিতেছে ১৬ দেখি, বুঝি ১৭ উঠাইবি, দেখাইবি ১৮ পাইকারি ব্যবসার পরাকাষ্ঠা।

CENTRAL LIBRARY

কয় শও আনসিস্[১] দাদনিটাকা
ওরে কুন্‌তি[২] খাবে আড়েয়া পাথর[৩]
কুন্‌তি খাবে পাটা ;—
কহদিন[৪], কুন্‌তি ডাঁড়িটার মাথা[৫] ॥

থাউক তোর পাইকারি করা।
মুইহে[৬] হারেবা[৭] পারু[৮] রে—
মুই তো মাইয়া মান্‌ষিটা।
কয় ছটাকে মণ জুমিবে[৯]
কহদি এইটা মোক কাথা ;—
ওইঠে হিসাবের ফুটিবে ছোওয়া[১০] ॥

। ২১০ ।

ধুতি কিনেক্ মন[১১] তুই
জামা কিনেক্ ;
ছাতি কিনেক্ মন তুই পদ্ম-কামানি[১২]।
ছাওয়ার বাদে[১৩] জেংজেঙ্গা[১৪] গোঞ্জি[১৫]
মাইয়ার[১৬] বাদে কিনেক্ মন তুই
মালদই পাটানী[১৭] ॥

ছাম-গাহেন, ভাতের ডাঁই[১৮],
শাগ-আন্দা কাস্তাই[১৯],
ও তুই কিনেক্ রে
নুন-হল্‌দি মশলা।

১ আনিয়াছিস ২ কোন্‌দিকে ৩ তুলাদণ্ড বাঁকা (আড়) করায় যে পাথর, বাটখারা। অর্থাৎ পাল্লার কোন্ দিকে পাথর আর কোন দিকে পাট রাখিতে হইবে ৪ বল্ দেখি। দেখি ৫ তুলাদণ্ডের প্রান্ত ৬ আমি-ই ৭ হারাইতে ৮ পারি ৯ কতো ছটাকে এক মণ পূরিবে (জুমিবে) ১০ টাকা পয়সার এইরূপ হিসাব করিতে করিতে টাকার বাচ্চা হইবে, অর্থাৎ টাকা বাড়িবে ১১ আদর করিয়া স্বামীকে স্ত্রীর এই সম্ভাষণ ১২ পদ্ম ছাপওয়ালা ১৩ ছেলের জন্যে ১৪ ফাঁক ফাঁক সুতার গাঁথনি দেওয়া, যেমন-তেমন ১৫ পরিধেয় বিশেষ ১৬ স্ত্রীর ১৭ মালদহের পাটানী ১৮ ভাতের হাঁড়ী ১৯ তরকারি রাঁধিবার কড়াই।

CENTRAL LIBRARY

মশল্লা রে মশল্লা,
জিরা-গুলমরিচ-ধনিয়া,
ঝাল-মরুচটা না কিনিলে
কি ছাই খাবো মন তুই রবলা [১] ॥
তাংকু[২] যদি খাবো মন তুই
কিনেক্ বান্দা-হুঁকা-ছিলিমটা ॥

। ২১১ ।

সাধের ছুড়[৩] বল্ দেখি তোর :
শ্বশুরেরো বল্ রে বচন ক্যামন।
—মৈষেরো হাঁকনে য্যামন[৪] ;
শুন্ গে দিদি শ্বশুরেরো বচন ॥

সাধের ছুড় বল্ দেখি তোর :
সোয়ামীরো বল্ রে বচন ক্যামন।
— লাগজুড়ি পারোর য্যামন[৫] ;
শুন্ গে দিদি সোয়ামীরো বচন ॥

সাধের ছুড় বল্ দেখি তোর :
শাশুড়ীরো বল্ রে বচন ক্যামন।
—ইচিলা মাছের চট্কা রে য্যামন[৬] ;
শুন্ গে দিদি শাশুড়ীরো বচন ॥

সাধের ছুড় বল্ দেখি তোর :
সোতোনীরো বল্‌রে বচন ক্যামন।
—শিঙ্গিমাছ বিন্দালে[৭] য্যামন ;
শুন্ গে দিদি সোতোনীরো বচন ॥

১ ওবেলা ২ তামাক ৩ সাধের দৌড়, রূপ, সীমানা ৪ মহিষের হাঁকের মতো ৫ জোড়া পারাবতের মধুর বুলির মতো ৬ চিংড়ি মাছের তড়বড়ানোর মতো ৭ বিঁধিলে।

সাধের চুড় বল্ দেখি তোর ঃ
নননেরো বল্ রে বচন ক্যামন ।
—ট্যাংরা মাছ বিন্দালে য্যামন ;
শুন্ গে দিদি নননেরো বচন ॥

॥ বিপত্নীকের ব্যথা ॥

। ২১২ ।

ও মোর দাদা গে,
আরেকটা মোর জুড়েক্ কইন্যা—
একেলা থাকিয়া[১] অভা[২] না মনায়[৩] মোকে ॥
দাদা, মন ঝুরেছে আতিদিন,
বিছিনাত্ না ধরে নিন—
মোর নদারীর[৪] শোগে ।
মোর নদারী কুনদিন আসিবে
ও মোর দাদা গে ॥

জান যা'ছে মোর মাঘ মাসের জাড়ে ।
দাদা, সাতবার কহচুঁ তোক
না নাগে ভার-শাদি[৫] মোর ।
মোর নদারী কয়হা গেইছে মোক—
ও মোর দাদা গে,
আনিবা' মুই যাছুঁ মোর্‌রো[৬] জোড় ॥

১ শুইয়া ২ রহিতে ৩ ইচ্ছা হয় না ৪ নবদারা, নববিবাহিতা পত্নী ৫ মিষ্টান্ন, উপহার ইত্যাদি লাগিবে না অর্থাৎ অল্প খরচেই বিবাহ করিব ৬ আমার ।

। ২১২ক ।

ঢকের মাইয়াটা[১] মরিয়া গে বাই[২]
এলাও[৩] অহিবা'[৪] জা'গা[৫] নাই ॥

মাইয়া ছিলো মোরে চাতুরী[৬]
আইততে[৭] ঘুরাইছে পাক্কি[৮] ;—
সুতা দিয়া গড়েয়া থুইচে
ঝালঙ্গের চটি[৯] ॥

নাইরো মোর জ্যেঠাই-খুড়াই—
মোর মাইয়াক মারি' নিগাইল্
ঈশ্বর গয়াই ।
ওই চটি উরিবার[১০] এলা
মান্‌ষি রে নাই ॥

। ২১২খ ।

আবো গে, মোর নদারী মরিয়া গেইছে
মোর সে হইছে হানি[১১] ;
আন্ধার ঘরত থাকিয়া আছোঁ[১২]
পড়ে চকুর পানি :
টিপ্পিস্ কি টাপ্পাস্ করিয়া[১৩] ॥

আবো গে, মোর নদারী মরিয়া গেইছে
মোর সে হইছে দুখ ;

১ সুন্দর স্ত্রী ২ দিদি ৩ এখন ৪ রহিবার ৫ জায়গা। অর্থাৎ দুঃখ রাখিবার জায়গা ৬ এখানে কর্মিষ্ঠা ৭ রাত্রিবেলায় ৮ টাকু ঘোরাইয়াছে ৯ গায়ে দিবার চট, ঝালর দেওয়া ১০ পরিধান করিবার ১১ দুঃখ, কষ্ট ১২ শুইয়া আছি ১৩ টপ্ টপ্ করিয়া।

নদীরো ধাদিনার মত[1]
ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক :
হিব্‌রিম কি হার্‌রাম[2] করিয়া ॥

আবো গে, মোর নদারী থাকিল্ হয়[3]
মাছ মারিয়া আন্‌হু হয়[4] ;
মাছ চাইরটা মোর আন্ধিলে হয়[5] :
ভেট্‌টেস কি ভুট্‌টুস্[6] করিয়া ॥

আবো গে, পাড়া-পড়শী নাইয়র যায়[7]
নাল খাড়ীখান[8] পিন্দিয়া ;
ঘরে আছে ঘুঙ্‌নি ফোতা
কাঁয় বা যাবে পিন্দিয়া[9] :
চস্‌সর কি মস্‌সর[10] করিয়া ॥

। ২১২গ ।

মোর গুইলা[11] কাথা কম্ পড়েছে গে[12],
ওগে আবো, ছয়মাস ভরিয়া—
নদারী[13] মরিয়া ॥

মাইয়াটা[14] মরিয়া মুই হনু পাগেলা ;
দিনে-দিনে কান্দেছোঁ মুই
দহলাত্[15] বসিয়া,—
গে আবো, ঘরবাড়ী ছাড়িয়া ॥

১ পাড়ির মতো ২ অনুকার শব্দ ৩ যদি থাকিত ৪ আনিতাম ৫ রাঁধিত ৬ অনুকার শব্দ ৭ সধবা নারীর বাপের বাড়ীতে যাওয়াকে "নাইয়র যাওয়া" বলা হয় ৮ শাড়ীটা ৯ পরিয়া ১০ অনুকার শব্দ ১১ ও সমস্ত। বহু বচনে 'লা' ১২ মনে পড়িতেছে ১৩ নবদারা ১৪ স্ত্রী, বউ ১৫ ধানের জমি, এখানে প্রান্তরে।

CENTRAL LIBRARY

কাঁয়[১] আর খিলাবে[২] মোক্
আহ্নিয়া বাড়িয়া।
কাঁয় আর ডাকাবে[৩]
মোর বগলত্[৪] আসিয়া,—
কি কৈর্-কৈর্ করিয়া॥

কাঁয় দিবে মোক, শুগে আবো,
বিছিনা পাড়িয়া[৫]।
কাঁয় আর হাঁকাবে পাখা[৬]
বগলত্ বসিয়া,—
কি কেরেত্-কুরুত্ করিয়া॥

আড়ের দিনে আছোঁ মুই
একলায় থাকিয়া[৭]।
কাঁয় আর থাকিবে
মোক বগলত্ ধরিয়া,—
শেষা গরম করিয়া॥

গিরস্তি ছাড়িয়া আবো
মুই হইছুঁ বাউধিয়া[৮]।
যেত্তি-সেত্তি বেড়াছোঁ মুই[৯]
ঢুলিয়া পড়িয়া,—
গে আবো, নদারী মরিয়া॥

মাইয়ার বাদে[১০] মোর দেহাটা
যাছে তো জ্বলিয়া।

১ কে ২ খাওয়াইবে ৩ ডাকিবে ৪ পার্শ্বে ৫ পাতিয়া ৬ পাখা নাড়াইবে ৭ শুইয়া
৮ উদাসী ৯ যেখানে সেখানে বেড়াইতেছি ১০ স্ত্রীর জন্যে।

পারিস যদি একটা মোক
তুই আড়ী[১] দে আনিয়া,—
গে আবো, দয়া করিয়া ॥

॥ সধবা ও বিধবা ॥

। ২১৩ ।

ও জোঙল পোড়া যায় রে
সড়কে উড়ে ছাই ;
এহোন[২] সুন্দরী কইন্যার
নাই বাপো-ভাই ।
মন মোর সোদায়[৩] ঝুরে রে ॥

মন মোর সোদায় ঝুরে রে
দেখিয়া পাথার ;
বাপো-মায় ব্যাচেয়া খাইসে[৪]
নাবালক ভাতার[৫] ॥

১ বিধবা ২ এ হেন ৩ সদাই ৪ খাইয়াছে ৫ যাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছে সে আমার চেয়ে বয়সে ছোটো এবং সাবালক নয়।

G. A. Grierson সম্পাদিত Linguistic Survy of India, Vol. V, Part 1 P. 183 হইতে উদ্ধৃত।

বানান, স্তবক পরিকল্পনা ও যতি-চিহ্নাদি আমাদের।

গ্রীয়ারসন গানখানির সংগ্রাহক রূপে বাবু মুরলীধর রায়চৌধুরীর নাম করিয়াছেন। কেহ কেহ গানখানির রচয়িতা রূপে স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ রায়-এর নাম করিয়া থাকেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত এক মাসিক পত্রিকায় (উত্তরবাংলা। আশ্বিন, ১৩৫৮) লিখিত একটি প্রবন্ধে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ রায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় জানাইতেছেন যে, তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং চৌকিদারের কাজ করিতেন।

CENTRAL LIBRARY

বাপো-মাওক কয়া[১] পেঠাও[২]
কিনিয়া দিবে গাই ;
দুধো খায়া মান্‌ষি হউক
নাবালক জামাই ॥

। ২১৩ক ।

তোর টাকা-খাইয়া মুখত্‌[৩]
বাধিনী ডাঙ্গাও[৪] তোর গে আই[৫],
এমন বেসালেন[৬] জাঞই[৭]
আর মুলুকত্‌ বর কি পালেন নাই ॥

ও আই, টাকার লোভত্‌ বুড়াক দিলেন—
আর মুলুকত্‌ বর নাই পালেন ;
মোক কি শবাইসে[৮] গে বুড়ী আই ॥

সোগায়[৯] ক'ছে, 'জ্যেঠাই-খুড়াই'[১০] ;
কাঁহো ক'ছে, 'বুড়ী আই, বুড়ী আই।'
নদারী ক'থার গে মান্‌ষি নাই[১১] ॥

ও আই, সাজি বুড়ার গুয়া-পান
বুড়া বরের ফ্যাদেলান্‌[১২] ;
গুয়া ভুকাইতে কি যাবে জান[১৩] ॥

১ কহিয়া ২ পাঠাই ৩ কন্যাপণের টাকা যে মুখ দিয়া খাইয়াছ, সেই মুখে ৪ কাঁটা মারি ৫ দিদিমা ৬ বসাইলেন, বিবাহ বসাইলেন বা দিলেন ৭ জামাই ৮ শোভা পাইয়াছে ৯ সকলেই ১০ জ্যেঠিমা, খুড়িমা বলিতেছে ১১ কেহই নববধূ বলিতেছে না ১২ পান খাইবার দরুণ ঠোঁটের দুই দিকে যে ফেনা হয়, সেই ফেনা ১৩ হামানদিস্তায় বুড়া বরের পান-সুপারি ছেঁচিতে ছেঁচিতেই (অর্থাৎ ভুকাইতে) কি আমার জীবন যাইবে ?

CENTRAL LIBRARY

। ২১৪ ।

মান্‌ষির মুখে শুনা যা'ছে[১]
রে সোয়ামীধন,
তুই নোক না হইস ভাল্‌ ॥

ব্যাচেয়া[২] খোলানের[৩] ধান
বাতাসী-রাড়ীর[৪] গালার মালা
গড়েয়া দিছিস একখান।
তোক ধরিয়া বাঁচা মিছা
রে সোয়ামীধন ॥

ওরে বাতাসীক নাগে যদি
ওইঠে[৫] অহিস্‌[৬], ওইঠে খা ;
ওইঠে বাতাসীর বাড়ী যা ॥

ও সোয়ামী রে,
দেখিয়া বাতাসীর ঢক[৭]—
জিউ করেছে তোর লক্‌-পক্‌ ;
ধান ব্যাচেয়া মেটাছিস্‌ শখ—
তুই মাইয়ার কাঙাল।
রে সোয়ামীধন,
তুই নোক না হইস্‌ ভাল্‌ ॥

। ২১৪ক ।

ওকি ও মোর পতিধন,
এখন ছাড়ো কিনা দোসর পায়া।

১ শোনা যাইতেছে ২ বেচিয়া ৩ বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণকে 'খোলান' বলা হয়। খোলানের ধান অর্থ বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে যে গোলাঘর রহিয়াছে, তাহার ধান ৪ বাতাসী নাম্নী বিধবার ৫ ওইস্থানে ৬ রহিস ৭ সৌন্দর্য।

CENTRAL LIBRARY

ভাত আন্ধিবার সোয়ামী
নাই যান কয়া,
তাতে সোয়ামী যাছেন গসা হয়া ॥

ভিক্ষা আখা সোয়ামী রে কাকা খড়ি,
ভাত আন্ধিতে সোয়ামী হইসে দেরি।
ওকি ও মোর পতিধন,
এখন ছাড়ো ভাউজের বুদ্ধি ধরি' ॥

বিভা-আইতত[১] পিন্ধাইছেন[২] শাড়ী
সেইদিন হাতে[৩] তোম্হার নারী।
বিভা-আইতত্ পিন্ধাইছেন গয়না
সেইদিন হাতে মুই তোম্হার ময়না ॥

গুয়া খায়া সোয়ামী ফোলাইসেন খোসা।
অগাভুর কালে[৪] তোমার কিসের গসা ॥

। ২১৫ ।

ভাদোরো আশিনো মাসে
নয়া দেওয়া ঘন বষ্‌ষে[৫],—
দোকোনা[৬] হালি' পড়ে পানি[৭] ॥
কলারো পুতুলি[৮] মুই বড়ো আহ্লুনী[৯],
পাখুড়ির পাতোগিলা[১০] পানোঁ[১১] ॥

দাদা স্থাথে বড়ো ঘর
ঘুণে কইরে জরোজর ;
মুই নারীটা না যাইম ভাইয়ার বাড়ী ॥

১ বিবাহের রাত্রিতে ২ পরাইয়াছেন ৩ হইতে ৪ যৌবনকাল চলিয়া যাওয়ার পর ৫ বর্ষে, বর্ষণ করে ৬ কলার পাতা ৭ কলার পাতাকে হেলাইয়া দিয়া বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ে ৮ কোলের পুতুল ৯ আহুরে, আহুরী ১০ পাকুড়ের পাতাগুলি ১১ পাইলাম।

CENTRAL LIBRARY

মাও ঝোনি[১] মোর না কান্দে
বাপ ঝোনি মোর না ভাবে।
মোর নারীটাক দিলেক
সাত-সতোনীর ঘরে ॥

সতোনীয়ো আছে কাঁটা
দিলেক আজি মোক দারুণ খোঁটা ;
বিষে মোর ডংশিয়া[২] নিলে দেহা ॥

। ২১৬ ।

দাদা আইচ্চে[৩] আলে-ঝালে[৪]
নাইয়র[৫] নিগিবার[৬] আলে[৭] ;
পানিয়া-মড়া[৮] নাইয়র যাবার না দে'[৯] ।
ওকি ও হায় রে হায়,
পানিয়া-মড়া নাইয়র যাবার না দে' ॥

কি ক'ছেন[১০] তে ক'লে হয়[১১]
আজি বুঝি ওই বেলা যায় ;
বেলা গেলে মুই নাইয়র যাবা নও[১২] ।
হোঁকা-ছিলিম-ভুতি[১৩] নিয়া
খুলির[১৪] মাথাত্ বসিল্ যায়া—
আল-কুশা-কুল[১৫] ওগিনা কাথায় নাড়ে[১৬] ;
ওকি ও হায় রে হায়,
আল-কুশা-কুল ওগিনা কাথায় নাড়ে ॥

১ যেন ২ দংশন করিয়া ৩ আসিয়াছে ৪ অছিলায় ৫ পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্যে। আত্মীয় বাড়িতে (এখানে পিত্রালয়ে যাওয়া)—'নাইয়র যাওয়া' ৬ লইয়া যাইবার ৭ জন্যে, অছিলায় ৮ গালি বিশেষ ৯ না দেয় ১০ কহিতেছেন ১১ কহিলেই হয় ১২ না হও। অর্থাৎ যাইতে পারিব না ১৩ তামাক ইত্যাদিতে আগুন ধরাইবার জন্য 'পোয়াল' পাকাইয়া তাহাতে আগুন জাগাইয়া রাখা হয়। ইহাকেই বলে 'ভুতি' ১৪ বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণকে 'খুলি', 'খোলান', 'খলতা' বলা হয় ১৫ আজে বাজে, এলোমেলো, যুক্তিহীন বাজে ওজর ১৬ ওই গুলি। ওই বাজে ওজরের কথাই বারবার বলাবলি করিতেছে।

ওই না তোর বাপো জ্যাঠো খুড়ায় কয় :
নাইয়র যাবা' হবার না-হয় ;
নাইয়র গেলে ছোয়া না টিকে ॥
ওকি ও হায় রে হায়,
নাইয়র গেলে মোর ছোয়া না টিকে ॥

আইত পোহালে ছাও বার[১]
দেহাটা মোর হইছে ভার[২] ;
শুক্রবারে মুই নাইয়র যাবার নওঁ।
ওকি ও হায় রে হায়,
শুক্রবারে মুই নাইয়র যাবার নওঁ ॥

তোমার বড়ো ভাউজক কইছু[৩]
চাউল ঝাড়িয়া বসত[৪] থুইসুঁ[৫] ;
তুলিয়া খাবেন কলসী কত পানি।
বাস্কত্‌ আছে গুয়া-পান
শিকিয়াত[৬] আছে জলপান—
মোথাত[৭] আছে ছোড়ানির ঝোঁপা[৮] ॥

। ২১৭ ।

হায় বিধি,
ঘট-গোছায় নাই পড়ে কালি[৯]।
তাতে বিধি কল্লেক আড়ী ॥

১ রবিবার ২ আমি গর্ভবতী হইয়াছি ৩ কহিয়াছি ৪ বুড়া লাউয়ের মধ্যাংশ পচাইয়া, উহার শক্ত খোল জিনিসপত্র রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে 'বস' ৫ রাখিয়াছি ৬ শিকাতে ৭ চৌকাঠের মাথায় ৮ চাবির গোছা ৯ প্রদীপ ইত্যাদিতে কালি পড়ে নাই, অর্থাৎ বিবাহ-রাত্রি পোহায় নাই।

চিঠুর ব'সে আড়ী হনু'[1]
পাড়ায় চেঙ্গেড়ার চখুত পনু[2]।
হায় বিধি,
ধানের ছালা মাথাত্‌ করি'[3]
দুই চইক্ষের জল দিনু ছাড়ি'॥

। ২১৭ক।

ও মোর আজু রে[4],
এমন ব'সে[5] আজু
সোয়ামী নাই মোর কোলে॥

বিয়াও হয়য়া আজু নাই হয় আঠোরা[6];
তাতে সোয়ামী আজু গেইছে[7] মরিয়া॥
বিছিনাখান আজু পাড়িয়া—
মুই আছোঁ আজু থাকিয়া[8];
চোখুর জলে বিছিনাখান যাছে ভিজিয়া॥

। ২১৭খ।

হামার মন কান্দেছে রে ভাই;
কোনঠে[9] গেলে সোয়ামীর নাগাল পাই॥

১ চটুল বয়সে অর্থাৎ অল্প বয়সে বিধবা হইলাম ২ পড়িলাম ৩ রাজবংশী সমাজের অনেক অনাথা বিধবা ধান ভানিয়া জীবিকার্জন করে, নিজেরাই অনেক সময় ধান ইত্যাদি হাট হইতে মাথায় করিয়া বহিয়া আনে। এখানে তাহার কথাই বলা হইতেছে ৪ দাদু রে ৫ বয়সে ৬ অষ্টমঙ্গলা ৭ গিয়াছে ৮ শুইয়া ৯ কোনস্থানে।

গানখানি বিষহরি গানে বেহুলা বিধবা হইলে ধুয়া রূপে গীত হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় এমন কোন অঞ্চল নাই, যে অঞ্চলে গানখানি প্রচলিত নাই।

CENTRAL LIBRARY

যদি সোয়ামীর নাগাল পাওঁ[১]
এলায়[২] ওইঠেঁ[৩] মুই চলিয়া যাওঁ[৪]।
সোয়ামীর শোগে আতিদিন
দুই চক্ষে না ধরে নিন্ ॥

। ২১৮ ।

পর বিছানে[৫] হাকাওঁ গাও[৬] রে
তাঁহো[৭] না জুড়ায় গাও।
শীতল চায়া[৮] মাটিত বইসোঁ[৯]
তাঁহো না জুড়ায় গাও রে ॥

বিছিনাতে থাকিয়া[১০] আছোঁ[১১]
বুকে বালিশ দিয়া।
হায় হায় রে তুলারো বালিশ
তাঁহো উঠে ফুলিয়া রে ॥

হায় হায় রে তুলার বালিশ
পুড়িয়া[১২] করিম ছাই।
এহোনো[১৩] যৈবনো ব'সে[১৪]
কলাত[১৫] সোয়ামী নাই রে ॥

হালুয়া বাড়ীর[১৬] দুবাকেনা[১৭]
নদীর বৈরী ফেনা;
দুই সতোনী বৈরী য্যামন
আড়ীর বৈরী ঢেনা[১৮] ॥

১ পাই ২ এখনই ৩ ওইস্থানে ৪ যাই ৫ পরের বিছানায় ৬ গা ঢালিয়া দিই ৭ তবুও ৮ ঠাণ্ডা হইবার জন্ত ৯ বসি ১০ শুইয়া ১১ আছি ১২ পোড়াইয়া ১৩ এহেন ১৪ বয়সে ১৫ কোলে ১৬ কৃষিক্ষেত্রের ১৭ সাধারণ দূর্বাও ১৮ বিধবার শত্রু বিপত্নীক বা অ'ববাহিত পুরুষ।

CENTRAL LIBRARY

। ২১৯ ।

হামার কপালে[১] ভাঙ্গা
নদী ভাঙ্গা রে হায়[২] ।
ওরে বেটা, কে বুঝিবে মনের বেদনা ॥
ভবের জ্বালা কোলে দিয়া[৩]
তাঁয়[৪] গেইসে সইন্ন্যাসী হয়য়া ।
মন কান্দেছে অয়হা অয়হা[৫] সারা অজনী[৬] ॥
কি দিয়া নিভাইম মনের জ্বালা তুষের অগুনি ।
মুই নারী বড়োয়[৭] ওভাগোনী ॥

। ২২০ ।

মুই নারীটা ঘষোঁ মাথা
সারা নদী[৮] ভাসে খইলা ;
ভাঙ্গক খইলা মোর আগম-দরিয়ার মাঝে ।
দারুণ বিধাতা কিতায়[৯] ভাঙ্গিল্ রে জড়া ॥
ওরে অভয় ঢেনাটা[১০] মাজ মারে
পুরান জালে ছিটিল টানে[১১] ॥
মাজ[১২] মারিয়া করিমো কি
আন্ধনে মোর নাই রে মাইয়া[১৩] ॥
দুয়ারের আগত মেগ্‌নাল পাটা[১৪]
চেঙ্গেড়ায় ঘষে চেঙ্গেড়ীর মাথা ;
তুই কি আর জানিস রে
মুই কি আরো তোরে[১৫] মাইয়া[১৬] ॥

১ কপালেই ২ নদী ভাঙ্গা হইলে যেমন হয়, আমি যেন তেমনই হইয়া গিয়াছি ৩ অর্থাৎ সন্তানকে কোলে দিয়া ৪ সে, স্বামী ৫ রহিয়া রহিয়া ৬ রজনী ৭ বড়োই ৮ নদীতে, বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই ৯ কি প্রকে ১০ অবিবাহিত বা বিপত্নীক ১১ জাল ছোঁড়াকে 'ছিটিল টানা' বলে ১২ মাছ ১৩ রান্না করিবার জন্য বাড়ীতে স্ত্রী নাই ১৪ এক ধরণের লাল পাট বিশেষ ১৫ তোরই ১৬ স্ত্রী । শেষ স্তবকের অর্থ বিশেষ পরিষ্কার নয় ।

। ২২১ ।

ওরে তুই রে বানিয়া বন্ধু রে,
যুগের চিনা-জানা রে
আজি খাতির আথেক মোরে[১] ॥

হামার বাড়ী গেলে বানিয়া
বসিতে দিমো পিঁড়া ;
জলপান করিতে দিমো
নেনিয়া ধানের চুঁড়া ॥

"তোরোঠে[২] যদি পাইসা নাই
কালি যাইস মোর বাড়ী ;
হাতোত্ গড়েয়া দিম তোর
শংক মার্কা চুড়ি[৩] ॥"

ও মোর বানিয়া বন্ধু রে,
একটা মোক তাবিজ গড়েয়া দে ;
মরিয়া গেইসে বিয়ার সোয়ামী
স্বপনে আইসে ॥

। ২২২ ।

...[৪] শালীর গুষ্টি,
এতয়ভরি[৫] তোর কান্দানী—
নাডের[৬] আগত্[৭] ফুটাংটাং[৮]
নাড্ না হায় তোর আংশাং[৯]—

১ আমার, আমাকে ২ তোর কাছে ৩ শঙ্খ-মার্কা চুড়ি—শাঁখা (?) ৪ অশ্লীল সম্বোধন ছিল। তাহা বর্জিত হইয়াছে ৫ এতই ভারি। 'এতোখানি' এই অর্থে ৬ উপপতি, দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ৭ আগে, সম্মুখে ৮ ফুটানি ৯ ফেল্না, অবহেলার যোগ্য নয়।

এইলা[1] কাথাত কুন্‌বা দিনা গে
মোর হাতে তুই খাচিত[2] গে ডাং[3]।
টাড়ীর[4] মাইয়াগিলা[5] কেইনং
ভাতার-ডুলালিয়া হয় ;
কোন্‌ঠে গেলো কই, কোন্‌ঠে গেলো কই[6]।
চাইল্‌-মস্তে[7] আনিয়া আছে[8]—
হুঁকা-ছিলিম আর দিয়াশলই॥

। ২২৩ ।

শাল গাছেরো পাতা বন্ধু রে,
ও বন্ধু, বান্ধিয়া দিনু বিড়ি।
ঘরতে না অহিতে দিলো
কুলবধূ নারী (বন্ধু রে)॥

ওউদের মিঠা ছায়া বন্ধুরে
ছায়ার মিঠা ওরে বাও।
সুন্দোর নারীর জবানের মিঠা
যদি কাড়ে আও[9] (বন্ধু রে)॥

পাটায় কাটো, পাটায় ছাটো
পাটার বান্ধো ওরে হাল্লা[10]।
তোম্‌হাকো নাগিয়া কইন্যা
মোর চিত অহিল্ বান্ধা (কইন্যা হে)॥

১ এই সময় ২ খাইতেছিস। 'খাইবি' অর্থে ৩ প্রহার ৪ পাড়ার ৫ বউয়েরা ৬ কোথায় গেলি—বলিয়া ডাকিতে হয় না। ৭ চাওয়া মাত্রই ৮ দিতেছে, দেয়—অর্থে ৯ যদি কথা বলে ১০ বোঝা।

বটো বৃক্ষের ছায়া য্যামন রে
মোর বন্ধুয়ার মরহা তেমন রে,
আরে ও মোর কাজল ভমোরা রে।
কুনদিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও
যেইদিন বন্ধু যা'বার চাও—
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও ;
আরে ও মোর কাজল ভমোরা রে॥

। ২২৪ ।

ও ছোটো দেওরা রে,
হাত বাড়েয়া[১] দুইটা জোলপই[২] পাড়েয়া দে॥

তোহো[৩] দুইটা নে রে দেওরা
মোকো[৪] দুইটা দে।
আরো দুইটা দে রে দেওরা,
ছাওয়ার[৫] বাদে[৬]॥

এমন শাড়ী কিনিয়া দিলো
মনতে না ধায়[৭]।
শাড়ী দিয়া ওরে দেওরা
গাও দেখা যায়॥

১ হাত বাড়াইয়া ২ জলপাই ৩ তুই-হো, তুইও ৪ আমাকেও ৫ ছেলেপিলেদের ৬ জন্যে ৭ পছন্দ হয় না।

CENTRAL LIBRARY

। ২২৫ ।

দুয়ারের আগে[১] ডালিম গছ[২]
টিয়া পড়ে ঝাঁকে হে পরাণের নাথো।
যেলা আছিনু মুই অবলারো বালি[৩]
সেলা যোতাইসু[৪] মুই ষোলো পাইকারের খিলি[৫] ॥
যেলা আছিনু মুই দুই ছাইলার মাও
বড়ো বড়ো জমিদারের বিছানায়
গড়েয়া দিসু[৬] গাও ॥
ও দেওরা রে মাথায় মোর না দিস হাত,
মাথায় আছে মোর শও-শও টাকার খঁপা[৭]।
খঁপা মোর আউলিবে[৮]—
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥
ও মোর দেওরা রে, গালায় মোর না দিস হাত,
গালায় মোর আছে এনা সাতেশরীর হার[৯]।
হারো না ছিঁড়িবে—
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥
ও মোর দেওরা রে, বুকে মোর না দিস হাত,
এ যৈবন[১০] মোর হালিহেলি' পড়িবে—
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥
ও মোর দেওরা রে, কমরে মোর না দিস হাত,
কমরে মোর আছে শও-শও টাকার শাড়ী।
শাড়ী না ফাড়িবে—
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥

১ সম্মুখে ২ গাছ ৩ অবলা-বালিকা ৪ যোগাইয়াছি ৫ ষোলোজন পাইকারের জন্য পানের খিলি অর্থাৎ অনেক প্রেমিকের মন ৬ গা গড়াইয়া দিয়াছি ৭ খোঁপা ৮ আলুলায়িত হইবে ৯ সাতনরী হার ১০ স্তনদ্বয়।

CENTRAL LIBRARY

ও মোর দেওরা রে, ঠ্যাঙে মোর না দিস হাত,
ঠ্যাঙোত আছে মোর হাজার টাকার নেপুর[১] ।
নেপুর না ভাঙিবে—
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥

। ২২৬ ।

আগাও না যায়, পাছাও না যায়[২],
যম-বেটীর ফাঁস[৩] ।
জিউটা করেছে মোর হাকাস-হাকাস[৪] ॥
ওই কি-না যাদু করলো রে জাঞই
মন আউলালো[৫] মোর ।
জান গেলে নাই ছাড়িম পিছা[৬]
ওরে জাঞই তোর ॥

এলা[৭] তুই-হে হোলো জাঞই
শিরের সোয়ামী[৮] ;
হাউসে-অঙ্গে কাটিমো আতি[৯] ॥
তোহো[১০] গড়া ঢাকি - কুলা
মোহো[১১] যাইম হাট[১২] ।
খরচের ঢাকিটা[১৩] ওরে জাঞই
অঠৈয়া দে মাথাত[১৪] ॥

১ নূপুর ২ সম্মুখেও যাওয়া যায়না, পিছনেও যাওয়া যায়না ৩ এমেন যমের ফাঁস ৪ প্রাণ আমার তাই ধুকপুক করিতেছে ৫ উদাস করিলি ৬ জীবন গেলেও পিছন ছাড়িব না ৭ এখন ৮ স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার কাব্যিক ভাষা ৯ হাউস-রঙ্গ করিয়া রাত কাটাইব ১০ তুই-ও ১১ আমি-ও ১২ হাটে যাইব অর্থাৎ সেই ডালি কুলা বিক্রয় করিব ১৩ বেসাতি করা পয়সা দিয়া 'ঢাকি'-ভরা সওদা কিনিব । কেনা কাটা করাকে 'খরচ করা' বলা হয় ১৪ মাথায় উঠাইয়া দে । এতো ভারী হইয়াছে সে, একা সেটাকে নিজের মাথায় তোলা যায় না ।

CENTRAL LIBRARY

। ২২৭ ।

"ওগে, নদীসিনিবার[১] আইচ্চেন[২] দাদা—
ও মোর সুখ্ খে নাগে না[৩] ;
তোক দেখিয়া ও মোর দাদা
অভায় মনায় না[৪] ।"

"তুই যদি মোক থুইস্ ভাঙ্গুয়া[৫]
কতয় খাবো, খাইস পানগুয়া—
ঠসোরা ভ্যাল্‌টেয়া[৬] ।
পানগুয়া আনি' দিম তোক
ওঝালি করিয়া ।"

"তুই গে দাদা কেনং মান্‌ষি
দেহাত দেছিত হাত[৭] ;
ফাঁকে-চাকে[৮] আনিয়া মোক
ফেলালো নেঠাত[৯] ।"

। ২২৮ ।

ঝুটুং করিয়া[১০] আইসেন[১১] কবিরাজ[১২]
পাও না ঝোন[১৩] বাজে ।
হামার বাড়ীর বারিয়া ভোটা[১৪]
সোদায়[১৫] ভুকিয়া উঠে[১৬] ।

১ স্নান করিবার, করিতে ২ আসিয়াছেন ৩ আমার সুখই লাগেনা ৪ রহিতেই ইচ্ছা করেনা ৫ বিধবার সম্মতি লইয়া, দণ্ড (ডাং) হস্তে যে পুরুষ পতিত্ব করিবার জন্য তাহার গৃহে আনুষ্ঠানিকরূপে প্রবেশ করে, তাহাকে 'ভাঙ্গুয়া' বলে এবং এইরূপ পতি রাখাকে 'ভাঙ্গুয়া রাখা' বলে ৬ ঠোঁট উল্‌টাইয়া ৭ দেহে হাত দিতেছিস। 'দেহ' বলিতে সাধারণত স্তন বুঝাইয়া থাকে ৮ ভুলাইয়া-ভালাইয়া ৯ লাঠায় ফেলিলি ১০ চট্ করিয়া, টুক করিয়া ১১ আসিয়ো ১২ প্রেমিক পুরুষকে সম্বোধন বিশেষ ১৩ যেন ১৪ বাহিরে থাকে যে কুকুর ১৫ সদাই, প্রায়ই ১৬ ডাক দিয়া উঠে।

CENTRAL LIBRARY

আগে যে কহিছং[১] কবিরাজ
না যান গোয়ালপাড়া।
গোয়াল পাড়ার চেঙ্গেড়ীগিলা[২]
জানে ধুলা পাড়া॥

হামার হাতের সরু শাংকা
সতোনীর হাতের খাড়ু।
শিতানের[৩] মাথাত জলের ঝারি
শিকিয়ার[৪] উপর নাড়ু॥

। ২২৯।

ও তোর বাপো[৫] নিন্দাইসে[৬] রে ছাওয়া
তুইয়ো নিন যারে[৭]॥

আজি দেওয়া বয়্ যে ইমা-ঝিমা
ম'লে ভুলে বাও[৮]।
ঘরের পাছত মানার খোপ
মাথাত কাটিয়া দাও॥

আজি ডাইন বাগলে ছাওয়া দুইটা
বন্ধুধন, বাঁও বগলে বইসো।
শিতানে আছে বেদেনী হুঁকা[৯]
জল ফ্যালেয়া[১০] খাইসো[১১]॥

১ কহিয়াছিলাম ২ মেয়েরা ৩ শিয়রের ৪ শিকার ৫ বাপ ৬ ঘুমাইয়াছে
৭ নিদ্রা যা ৮ মলয় বাতাস বহিতেছে ৯ বাঁধানো হুঁকা ১০ ফেলিয়া ১১ আসিয়া খাও।

। ২৩০ ।

আজি গাও তুলো, গাও তুলো, রে প্রাণোনাথ
উঠিয়া যাও বাড়ী ;
আইত পোহালে বলিবে হামাক[১]
কোলোঙ্কিনী নারী ।
রে প্রাণোনাথ গাও তুলো ॥

আজি এ্যাখেতে[২] ঢালুয়া খঁপা[৩] রে প্রাণোনাথ,
জোড়া বেতের বান[৪] ;
ইন্দুরে কাটিল চুলো
না পাইলোঁ চ্যাতোন[৫] ।
রে প্রাণোনাথ গাও তুলো ॥

আজি আজার হস্তী বন্দী হইল্ রে প্রাণোনাথ,
নম্বা ছিকল দিয়া ;
আর মুই নারীটা বন্দী হইনু
পিরতির নাগিয়া ।
রে প্রাণেনাথ গাও তুলো ॥

আজি গাও তুলো, গাও তুলো, রে প্রাণোনাথ,
উঠিয়া যাও বাড়ী ;
আইত পোহালে চকিদার
তোমার হস্তে দিবে দড়ি ।
রে প্রাণোনাথ গাও তুলো ॥

১ আমাকে ২ একে তো ৩ বিস্তৃত, বড়ো খোঁপা ৪ আঁটো করিয়া বাঁধা ৫ চেতন ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৩১ ।

ছান[১] ফেলাওঁ[২] মুই নাচার-হুচুর[৩]
বোগোরির[৪] গাছের তলে।
হুত্তি মারি[৫] ডেকায়[৬] বন্ধু
নদী যাবার আলে[৭]॥

এলায়[৮] মুই না যাইম নদী
যাইম অবেলা[৯]।
দুই হাতে ছিঁড়ি' দিম তোক
জোড় কমলা[১০]॥

চ্যাঙ্গেড়া, ভাল্তে[১১] না কওঁ তোক ;
আমোর গোড়ত[১২] হুত্তি মারিয়া
মাইর খোওয়ালো মোক[১৩]॥

। ২৩২ ।

আজি কোন দোষে ছাড়িলো
প্রাণের বান্ধব রে।
আজি আঙ্গিনা সামুটেঁা[১৪] সিড়িত-সাড়াত[১৫]
রে বান্ধব, বাঁশের বাড়ুন দিয়া :
আজি কোন অসিকে বাড়ুন দিলেক
গুয়ার পাতা দিয়া রে[১৬]॥

১ গোবর ইত্যাদি ২ ফেলি ৩ অনুকারশব্দ বিশেষ ৪ কুলগাছের তলে ৫ শিস্ দিয়া ৬ ডাকে ৭ ছলে, অন্তে, উদ্দেশে ৮ এখন ৯ ওবেলা, বিকালবেলা ১০ নিজের স্তনের কথা বলা হইতেছে ১১ ভালো তো ১২ আম গাছের গোড়ায় ১৩ আমাকে মার খাওয়াইলি ১৪ ঝাঁট দিই ১৫ 'সিড়িত-সাড়াত' শব্দ করিয়া ১৬ সুপারির পাতা গাছ হইতে পাড়িয়া, তাহা দিয়া আমার রসিক বন্ধু ঝাটা তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিল। উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে সেই কথা মনে হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

আজি তুই বান্ধব আসিবো বলিয়া
রে বান্ধব, ও মুই ঘটিত পাতিনু দই।
আজি ঘটির দই ঘটিত অহিল্
বন্ধুধন মোর কই ॥

আজি তুই বান্ধব আসিবো বলিয়া
রে বান্ধব, ও মুই দুয়ারে নাই দেওঁ কাঠি[১]।
আজি কোন অসিকের অসিয়া আসিয়া
যৈবন করিলে মোর চুরি রে ॥

। ২৩৩ ।

বাড়ীর পাছত বাঁশের আগা
ও সরলা পংখীর ভাসা[২]।
দিনা চারিক পিরিত করিয়া রে বন্ধু
হলেন ময়হা-ছাড়া ॥

তোমার বাড়ী হামার বাড়ী
ও মইধ্যে ব্যাতের ব্যাড়া[৩]।
তোমাকো পান সাজায় দিতে বন্ধু রে
দেখিল্ ছোটো রে দাওয়া ॥

তোমার বাড়ী হামার বাড়ী
ও মইধ্যে হিরাল নদী।
পাংখা নাইতে[৪] উড়িয়া যামো বন্ধুরে
ও পাংখা নাই দেয় বিধি।

১ তুমি আসিবে বলিয়া দুয়ারের হুড়কা দিই নাই ২ বাসা ৩ বেড়া ৪ নাই যে।

CENTRAL LIBRARY

বাউদিয়া

। ২৩৪ ।

ও মোর বাউদিয়া রে,
হানিলো তুই মোর কাক্সা মেঘে[১] ।
তোর বাউদিয়ার কি-না.খানু[২]
ময়য়া-জালে[৩] বন্দী হনু ॥

তুই বাউদিয়া হবো গসা[৪]
মোর নিরাশীর[৫] খাবো মাথা ।
আইসেক বাউদিয়া কোলে কর—
চপরআতি কান্দিয়া মর ॥

ও মোর পেণের[৬] বাউদিয়া,
যেলা চাইট্টা খাবার বইসোঁ
তোর বাউদিয়ার কান্দন শুনোঁ ॥

ও মোর বাউদিয়া রে,
তোমার বাড়ী হামার বাড়ী
মইধ্যে হীরা নদী ।
হাত ধরিয়া করো পার
জল খাইয়া মরি ॥

তোমার বাড়ী হামার বাড়ী
মইধ্যে ব্যাতের আড়া[৭] ।
দিনা চারিক পিরিত করিয়া
হলো ময়হা-ছাড়া[৮]

১ নবযৌবন অর্থে ব্যবহৃত কাব্যিক ভাষা ২ কি খাইলাম ৩ মায়াজালে ৪ যদি তুই রাগ করিবি ৫ আমি হতভাগীর ৬ প্রাণের ৭ বেতের বেড়া ৮ মায়া-ছাড়া হইলি।

CENTRAL LIBRARY

ও মোর বাউদিয়া রে,
তোর সে বড়ো বুদ্ধি।
দিবার চালো ছিরি আংটি[১]
দুবার আংটি[২] দিয়া রে মন ভুলালি॥
দিবার চালো ঢাকাই শাড়ী
কেলার পাতো দিয়া
মোর মন ভুলালি॥

যেলায় দিবো ঢালা ফোতা[৩]
তখন ছাড়িমো গাবুর বেটা[৪]।
ও মোর বাউদিয়া রে,
হানিলো তুই মোর কাঙ্কা মেঘে॥

। ২৩৫ ।

ডালত[৫] পড়িয়া রে কাগা
করে জোড়া-জুড়ি।
না জানি হোকোর[৬] চর়া[৭]
গেইসে[৮] জোলপইগুড়ি॥

যেলা[৯] আই মুই ধান ভুকাও
পইল্[১০] বাউদিয়ার ফম্[১১]।
হের্ নোউক[১২] তোর বারা-কুটা[১৩]
পইল্ বাউদিয়ার ফম্।
—হোকোর[১৪] থঁপা সদায় খইসে[১৫]॥

১ শ্রী-আংটি ২ দূর্বাঘাসের আংটি ৩ বড়ো রঙ্গীন পাটানী ৪ যুবক বন্ধু ৫ ডালে ৬ বিরক্তি সূচক অব্যয় ৭ চোর। প্রেমিক (বাউদিয়া)—কে চোর বলা হইতেছে। খুব সম্ভব চোর-চুন্নীর নায়ক এখানে প্রভাব ফেলিয়াছে ৮ গিয়াছে ৯ যখন ১০ পড়িল ১১ স্মরণ। মনে পড়িল ১২ এই রহিল—এই অর্থে। 'হের' বা 'হোর' কোন বস্তু বা কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে ব্যবহৃত হয় ১৩ ধান ভানা ১৪ 'হোকোর'—এর আর একরূপ ১৫ সব সময়েই খসিয়া পড়ে।

যেলা মাও মুই ভাত চড়াও
পইল্ বাউদিয়ার ফম্ ।
হের নোউক তোর আন্দা-বাড়া[১]
বাউদিয়া নাই মোর ঘরে ।
—হোক্কোর থঁপা সদায় থইসে ॥

যেলা মাও মুই শেয়া পাড়োঁ[২]
পইল্ বাউদিয়ার ফম্ ।
হের নোউক শেয়া রে বিছানা[৩]
বাউদিয়া নাই মোর ঘরে ।
—হোক্কোর থঁপা সদায় থইসে ॥

যেলা মাও মুই গুয়া কাটোঁ
পইল্ বাউদিয়ার ফম্ ।
হের নোউক তোর গুয়া-পানো
বাউদিয়া নাই মোর ঘরে ।
—হোক্কোর থঁপা সদায় থইসে ॥

। ২৩৬ ।

কান্দিয়া কাটিয়া বাউধা রে
মুই পাড়িছুঁ ছেকা[৪] ।
কালি যাইম[৫] শশুরের বাড়ী
পুরা মনের আশা ॥

জামথুরিত ভিজাইছুঁ খইলা[৬]
আয় রে বাউধা ঘষি মাথা ।
গাওখান তোর ঘষেয়া দেওঁ রে[৭]
আপোনকার সোয়ামীর নাখা[৮] ॥

১ রাধা বাড়া ২ শয্যা প্রস্তুত করি ৩ শয্যা বিছানো—এই অর্থে । শয্যার প্রতিশব্দ রূপেও নেওয়া চলে ৪ কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচাকে 'ছেকাপাড়া' বলা হয় ৫ যাইব ৬ জাম-বাটিতে 'খইলা' ভিজাইয়াছি ৭ ঘষিয়া দিই ৮ আপন স্বামীর মতো ।

CENTRAL LIBRARY

"হইমো হইমো দেখা মাই গে
ঈশ্বর যদি করে ;
পানির তলে পোষাণ না হয়[১]—
পিরতি নাকুন পচে[২]।
যেই দিন মাই তোর কাটে গুয়া[৩]
সেইদিন মাই মোর গোরুরে পালা[৪] ॥"
হাড়িয়া কোণের[৫] চিকন রে মাটি
তাক দিয়া[৬] ঢালাইসু[৭] চাটি[৮] ;
ঠ্যাঙে থেঁচি[৯] হাতে গড়াম[১০]
তোরে নাথা মূর্তি[১১] ॥

কালা-র উদ্দেশে

। ২৩৭ ।

প্রাণোকালা,
যখন তমরা[১২] বাজান বাঁশী
তখন হামরা[১৩] আক্কন রে আন্ধি[১৪] ;
বাহির হয়য়া মুছো চোখুর পানি ॥

হায় হায় রে প্রাণোকালা,
তোর পিরতির এতয়[১৫] রে জালা ॥
প্রাণোকালা, তোমহাক আসিবার বলি'
ছুয়ারত মুই নাই দেওঁ রে নড়ি।
বানায়[১৬] থুইসু হে পানের খিলি ॥

১ পাষাণ যেমন জলের তলে পচেনা পিরিতিও তেমনি কোনদিন নষ্ট হয়না। ২ নাকুন—নাকি ৩ বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া অঙ্গীকার বদ্ধ হইবার কালে দুই পক্ষে পান-সুপারি আদান প্রদান করা হয়। ইহাকেই বলে 'গুয়াকাটা' অনুষ্ঠান ৪ সেইদিন আমার গোরু চরাইবার পালা ৫ বায়ুকোণ ৬ তাহাকে দিয়া, তাহা দিয়া ৭ লেপিয়াছি ৮ বেড়া। মাটি দিয়া বেড়া লেপা এক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ৯ পায়ে মাখিয়া, চটকাইয়া ১০ গড়াইব ১১ তোমারই মতো মূর্তি গড়াইব ১২ তুমি ১৩ আমি ১৪ রান্না করাকে বলা হয় 'আক্কন আক্কা' ১৫ এতোই ১৬ বানাইয়া।

CENTRAL LIBRARY

হায় হায় রে প্রাণোকালা[১],
দেখায়[২] না হয় কোন বা করমের দোষে।
বালিশ মুই দিয়া রে বুকে
মুই কান্দোঁ মনের দুস্কে[২] ;
বুক বয়হা পড়ে চোখুর পানি॥

।২৩৭ক।

দাঁড়াও কালা মোর
ওই না[৩] রাজোপন্থে রে।
জনমের মত দেখিয়া নেঁও[৪]
মোর প্রাণো কালা রে॥

মোর কালা বাড়ী রে আইসে
পিঁড়া দিতে কালা মাটিত বইসে রে ;
মোর কালা মানষি রে ভাল্
যাওয়া-আইসা করে চিরকাল রে॥
মোর কালার কটুর[৫] রে হিয়া
মন বান্ধিছে কালা পোষাণ[৬] রে দিয়া॥

।২৩৮।

চেঙ্গড়া বন্ধু রে,
তোর জ্বালাত মন মোর ঘরে আর বাইরে[৭]॥
কদম গাছত চাড়িয়ারে চেঙ্গড়া
বাঁশীত দিলো টান।
বাড়ী ঘরের কাম ফেলেয়া[৮]
বাঁশীত দিছোঁ[৯] মন।
—চেঙ্গড়া বন্ধু রে॥

১ দেখা-ই ২ দুঃখে ৩ ওই। 'না' এমনি ব্যবহৃত হইয়াছে ৪ দেখিয়া লই ৫ কঠোর হিয়া ৬ পাষাণ ৭ মন ঘর আর বাহির করে ৮ ফেলিয়া ৯ দিয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

আমোর পাতো চিকন-চাকন রে বন্ধু
তেঁতেলির পাত সরু ;
এছিয়া-বেছিয়া[১] করিম পিরিত
যারে[২] কমর সরু।
দহলায়-দহলায়[৩] যাবেন চেঙ্গড়া
এক নজর তোক দেখুঁ[৪]।
—চেঙ্গড়া বন্ধু রে ॥

মোর ঘরেরো পাগলা সোয়ামী
দেখিলে মারিবে তোরে :
দূরে দূরে যারে বন্ধু
নদীর ঘাটোতে।
—চেঙ্গড়া বন্ধু রে ॥

। ২৩৯ ।

ও ধন মোর কানাইয়া রে,
সারা ঘরে জলে বাতি—
তোর ঘরে কেনে আন্ধারাতি
ও ধন মোর কানাইয়া রে ॥

আষাঢ়ো-শাবনো মাসে
দেওয়া বষ্ষে[৫] কানাই মধুর রসে ॥
ও ধন মোর কানাইয়া রে,
কালো নদীত কুমীরের ভয় —
মান্ষি-গোরু কানাই ধরিয়া খায়।
পহর[৬] দিয়ো না ওইনা[৭] নদীর জলে ॥

১ খুঁজিয়া-পাতিয়া, বাছবিচার করিয়া ২ যাহারই, যাহার ৩ ধানের ক্ষেত দিয়া ৪ দেখি
৫ বর্ষে ৬ সাঁতার ৭ 'না' নিরর্থক।

CENTRAL LIBRARY

। ২৪০ ।

কালা, মুই একেলা ঘরের নারী[১] গে কালা ;
দিবা' চালো[২] কালা রে তুই
গালাত রে মালা :
মোক করিলো কালা রে তুই
মানুষি-হাসা[৩] ।
—ও মোর কালা রে কালা ॥
দিবা' চালো কালা রে তুই
কানের রে সোনা :
মোক করিলো কালা রে তুই
শূলারে মূলা[৪] ।
—ও মোর কালা রে কালা ॥
দিবা' চলো কালা রে তুই
নাকের রে ফুল :
মোক করিলো কালা রে তুই
মানুষি-হাসা ।
—ও মোর কালা রে কালা ॥

। ২৪১ ।

ওকি কালা রে, ঘাটা[৫] ছাড়ি'দে,
যামো জল ভরিতে ॥
আজি কাংখের কলস কাংখে অইলো—
জল বিনা পতি মইলো ॥
ওকি কালা রে,
যদি আইসে মোর প্রাণের নাথো
কাটিয়া আনিবে কলার পাতো ।
ওকি কালা রে,
সেই পাতোত বাড়িয়া দিমো ভাতো ॥

১ এক পুরুষের ঘর করিয়া থাকি ২ দিতে চাহিলি ৩ মানুষ হাসে যাহাকে দেখিয়া
৪ হৃদয়ে শাল দিয়া গেলি (?) ৫ রাস্তা ।

CENTRAL LIBRARY

ওকি কালা রে,
যদি আইসে মোর প্রাণের সুয়া
পাড়েয়া[১] আনিবে গাছের গুয়া।
ওকি কালা রে,
সেই না গুয়া কাটিয়া দিমো হস্তে॥

। ২৪২ ।

আজি তিস্তা নদীর পারে পারে গে দিদি,
জোড়-শিমিলার[২] গাছ।
ওইঠেকেনা[৩] চড়িয়া চ্যাঙ্গেড়া বন্ধু
ছাড়িল নিক্কাশ[৪]॥
আজি তিস্তা নদীর পারে পারে গে দিদি,
গোয়ালেরো বসতি।
দুধো-দইয়ো খাবার আশে
নাগাইলাম পিরিতি॥
তরসা নদীর পারে পারে গে দিদি,
ঘুমারি[৫] সারি সারি।
ডাল হ্যালেয়া ফুল তুলেছে নৌতন যুবোতী[৬]॥

১ পাড়িয়া ২ জোড়া শিমুল গাছ ৩ উহাতে, ওইস্থানে ৪ নিশ্বাস ৫ ফল বিশেষ ৬ অল্প বয়সী যুবতী।

আজিদার রহমান (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি)-এর নিকট হইতে এই গানটির দ্বিতীয় স্তবকের যে কথান্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই :

তিস্তা নদীর পারে পারে গে দিদি,
জড়া নৌকা ভাসে ;
ওই মতন নারীরো যৌবন দিনে দিনে বাড়ে॥
তিস্তা নদীর পারে পারে গে দিদি,
জড়া হংস পড়ে ;
হংসের কান্দনে দিদি মনটা না অয় ঘরে॥

। ২৪৩ ।

কইন্যা, ভাবো কারে[১] নাগিয়া[২] ।
বিদায় দিলে না যাবে তোর
শাম অসিয়া ॥

কইন্যা রে, যাকে চাবো, তাকে পাবো —
আইসেক মোরেঠে[৩] ।
মাথাত দিম তোর সিঁতাপাটী
গট্ট কমরে ॥

কইন্যা রে, যে মাচাতে নাইরো ধান
না ধরে ইন্দুর ।
যে নারীরো নাই সোয়ামী—
না শোভায় সেন্দুর ॥

কইন্যা রে, যে ভাসাতে[৪] নাইরো কৈতর
কি করিবে তার খোপে ।
যে নারীরো নাই সোয়ামী —
কি করিবে তার উপে[৫] ॥

মাঝির গান

। ২৪৪ ।

ও মোর প্রাণ-সাধু রে সাধু[৬],
আশিনো-কাতিকো মাসে
গম-সইবা সাধু ভূমে রূপে[৭] ।
বতর[৮] গেইলে কি করিবে চাষে রে
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ॥

১ কাহার ২ লাগিয়া ৩ আমারই কাছে ৪ বাসাতে ৫ রূপে ৬ সম্বোধন বিশেষ
৭ ভূমিতে রোপণ করে ৮ কৃষিকার্যের মৌসুম, সময় ।

CENTRAL LIBRARY

আজি ভাঁড়ী মাঝি সাধু বোলো রে জন[১] ;
কাকো[২] না বলেন সাধু দুরবচন[৩] ।
সুখের প্রেমে বয়া[৪] যাবেন নাও রে
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ॥

যেই ধারে তরঙ্গ রে জল—
সেই ধারে সাধু বালু রে চর[৫] ।
গহীর জলে বয়া যাবেন নাও রে
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ॥

যদি করেন সাধু পর রে বাস[৬]
ঘপা[৭] দেখি' সাধু বান্ধেন নাও ।
নিজো হাতে বান্ধেন নৌকার ডোরো রে ;
পহরে পহরে দেখিবেন উঠিয়া রে ।
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ॥

যদি করেন সাধু পর রে বাস
না করেন সাধু পরার আশ ।
নিজো হস্তে আন্ধিয়া খাবেন ভাত ;
কছার[৮] কড়ি সাধু না করেন বয়[৯]
পরনারী সাধু আপন রে নয় ।
পর নারী বধিবে জীবন রে,
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ।

১ গানখানিতে দেহতত্ত্বের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে ২ কাহাকেও ৩ দুর্বচন ৪ বহিয়া ৫ বালুর চর ৬ প্রবাস । 'রে' ছন্দানুরোধে ৭ গভীর । যেইদিকে জল গভীর, সেইদিকে নৌকা বাঁধিয়ো । জল যেখানে কম, তরঙ্গ সেখানে বেশী এবং সেখানেই বাশি চোরা । দেহতত্ত্বের আভাস পাওয়া যাইতেছে ৮ কোঁচার ৯ ব্যয়, খরচ ।

এই গানটির কথান্তর গ্রীয়ারসন-সম্পাদিত Linguistic Survey of India, Vol. V., Part I. p. 192-তে পাওয়া যায় ।

। ২৪৫ ।

খাটো-খুটো নাইয়া রে তুমি
লাম্বা মাথার কেশ।
যে ঘাটোতে চাপাইবেন[১] নাও
ওইটায়[২] বন্ধুর দেশ।
নাও চাপাও সুন্দরো নাইয়ার রে॥
নাও চাপাও, নাও চাপাও, রে নাইয়া
নাও চাপাও মোর ঘাটে ;
মুই নারীটা দেখা করিম—
সাকালে বিকালে[৩]।
নাও চাপাও সুন্দরো নাইয়ার রে॥

। ২৪৫ ক ।

খাটো-খুটো মোর নাইয়ের[৪] মাঝি
ও মাঝি, ডীঘল[৫] মাথার কেশ।
সরু করিয়া[৬] কনো[৭] কাথা[৮]
যাবেন কোনো রে দেশ॥
কোন্ বা দেশে ঘরো মাঝি,
ও মাঝি কিসেরো বেপারী।
যাবেন কোনো রে দেশ মাঝি
কহো সইত্য করি' (মাঝি ও)॥
"ভাটি-দেশে বাড়ী কন্যা ও
উজান বেপার করি[৯]।
দোহাই নাগে তোমার বাপোর[১০]
বিয়াও না করি (কন্যা ও)॥"

১ বাঁধিবেন, থামিবেন ২ ওইটাই ৩ সকালে বিকালে ৪ নায়ের, নৌকার ৫ দীঘল ৬ আস্তে করিয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া ৭ কহিনু, কহিলাম ৮ কথা ৯ ভাটি দেশে থাকি, উজান দেশে বাণিজ্য করি ১০ বাপের।

CENTRAL LIBRARY

তালের নাখান[1] শুয়া বন্ধু ও
কুলার নাখান পান।
বাটা ভরা পান সুপারি
হামার বাড়ী যান (মাঝি ও)॥
... ...
ও মাঝি সাকালে ধুইসুঁ গাও—
খাসি মারিয়া আন্ধন আন্ধিসুঁ[2]
ভাত খাইয়া যাও (মাঝি ও)॥
"না খাও তোমার খাসি-ভাতো কন্যা ও
তোমরা খাবেন কি।
আসিবে শশুর-পিতা
জোয়াব[3] দিবেন কি॥"

। ২৪৫ খ।

নাইয়া, বাহু তুলো রে,
ওরে মোর সনার নাইয়া
নৌকারে[4] তিরপালক[5] তুলিয়া॥
আজি উজান স্থাশে বাড়ী
হে কইন্যা,
ভাটির স্থাশে কড়ি[6]।
আজি পরার নারী দেখি'
হিয়া ফাটি মরি॥

তেলেঙ্গার গান

। ২৪৬।

ধাউলী[7] গে মাই, মধুভাষী গে মাই :
তোর ছাগলে খায়া[8] গেইল্[9] মোর
বিছনের কালাই[10]॥

১ মতোন ২ রাঁধিয়াছি ৩ জবাব ৪ নৌকার ৫ পাল ৬ ভাটির দেশে টাকা উপার্জন করিতে আসিয়াছি ৭ ধবলী, গায়ের রঙ যাহার ফর্সা ৮ খাইয়া ৯ গেল ১০ কলাই গাছের চারাগুলি।

টাড়ীর মইধ্যে[১] মাই ছাগল-আউলী[২] তুই।
হুফোরে-তাফোরে[৩]
কতো পিটাইম[৪] মুই।
মুখের শর্মে[৫] আও না কাড়ো[৬]
জুতে[৭] পাইছিত[৮] তুই॥
যেই দিন মাই মোর উঠে তাও[৯]
বাচ্চা-ভুরানী[১০] থোয়াড়ত[১১] দেঁও[১২]।
মনত কয়, ছাগল-আউলীক ধড় ফড়ি অঠাঁও[১৩]॥

গোঁসাই গঞ্জের হাটত মাই সরিষার ভাও[১৪] ;
না চাইস মাই তুই ত্যালের ফাও[১৫]।
ক'ছা[১৬] আগা, খইলা দেঁও[১৭],
ঘষিস মাথা-গাও॥

য্যামন মাই তোর মুখের আও[১৮]
চান্দি-উপার নাখা[১৯] জলেছে গাও।
তোক পালে[২০], ওগে মাই,
মুই ছাড়োঁ[২১] বাপো-মাও॥

থুইয়া যা মাই ত্যালের বাঁশা[২২] ;
শ্যাষ হাটে[২৩] আসিস মাই
না নাগে[২৪] পাইসা।
তোর নগদ[২৫] আছে মাই
নিদারুণ কাথা[২৬]॥

১ পাড়ার মধ্যে ২ ছাগল আছে যে মেয়ের ৩ সকালে, বিকালে, দুপুরে। যখন তখন ৪ পিটাইব ৫ শরমে ৬ কথা বলিনা ৭ জুৎ। খুবই জুৎ—এই অর্থে ৮ পাইয়াছিস ৯ রাগ, তাপ ১০ ছাগলের বাচ্চা ও মা-কে ১১ খোঁয়াড়ে ১২ দিই ১৩ চিন্তায় ফেলি ১৪ মূল্য ১৫ ফাউ ১৬ কোছা, কোঁচড় ১৭ খইল দিই, দিতেছি ১৮ রব ১৯ রূপার মতো ২০ পাইলে ২১ ছাড়ি ২২ মোটা বাঁশের মধ্যে তেল, দুধ, দই ইত্যাদি রাখা হয় ২৩ হাট শেষ হইলে, যখন কেহ বিশেষ থাকিবেনা ২৪ লাগিবে না ২৫ তোর সঙ্গে ২৬ বিশেষ দরকারি কথা।

। ২৪৭ ।

ও মোর মাহৈ গে,
পাইকারের[১] হাতে মাহৈ তুলার ডাঁড়ি[২]
পাইকার বেড়ায় মাহৈ বাড়ী বাড়ী ।
পাইকার বিনা চখুত নাইও[৩] নিন্দো গে,
ও মোর মাহৈ গে ॥
পাইকার দিলে[৪] মাহৈ ছাড়াকাঠি[৫]
ঢক দেখে মাহৈ নিশাআতি ।
পাইকার দিলে মাহৈ ভুনী-ফোতা[৬]
ঢক দেখে মাহৈ তুফোর বেলা ।
পাইকার বিনা চখুত নাইও নিন্দো গে,
ও মোর মাহৈ গে ॥
ছাওয়া দুইটাক মান্‌ষি করিস[৭]
মুই যাছো[৮] মাহৈ পাইকারের বাড়ী[৯] ।
ও মোর মাহৈ গে,
পাইকার বিনা চখুত নাইও নিন্দো গে ॥

। ২৪৮ ।

হাইড়ানীর[১০] কমর ঢুলে রে—
ঘুঙুর বাজে রে ।
এহোনো[১১] হাইড়ানী তুই মোর
এ্যাখেলায় অহিলো[১২] ঘরে ॥
ওরে ধান ভুকায়[১৩] হাইড়ানী মাগী
বগোরি গাছের তলে রে ।
তোতারাম পাক পাড়েছে[১৪]
বগোরি খাবার আশে রে ॥

১ Retailor ২ দাঁড়ি-পাল্লা ৩ নাই । 'ও' নিরর্থক ৪ দিল, দিয়াছে ৫ গলায় পরিবার অলঙ্কার বিশেষ ৬ রঙীন সুতার ঘন গাঁথনির ফোতা বা পাটানী ৭ ছেলে দুইটাকে মানুষ করিস ৮ আমি যাইতেছি ৯ পাইকারের সহিত ঘর করিতে ১০ হাড়ীয়ানী, 'নম্রশ্রেণীর স্ত্রীলোক ১১ এহেন ১২ একলাই রহিলি ১৩ ধান ভানে ১৪ ঘোরাঘুরি করিতেছে ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৪৯ ।

ও প্রাণো-সখী রে

বানিয়াটাড়ী[১], দীঘলটাড়ী[২]—

ওইঠে[৩] আছে তিন ঝন[৪] আড়ী রে ॥

ও প্রাণো সখী রে,

যেলা[৫] পদ্ম ছিল ঘাটে—

হালায়-হালায়[৬] পদ্ম মাছো দিছে।

যেলা পদ্ম ছিল হাটে—

জড়ায়-জড়ায়[৭] পদ্ম ফতা দিছে ॥

ও প্রাণো সখী রে,

হবার কাজ মোর

হইতে না দিল্ বিধি রে ॥

ও প্রাণো সখী রে,

ভাটি-ঘাটে পদ্মক বান্ধে,

উজান-ঘাটে রঞ্জন কান্দে রে।

আগে-পাছে সিপাই যাছে—

মাঝোতে পদ্ম যাছে রে সখী ॥

ও প্রাণো সখী রে,

তিস্তা নদীর ধাই-ধাই বালা[৮]—

পদ্মর মা-বাপ কান্দে হালা রে হালা[৯] ॥

ও প্রাণো সখী রে,

জোলপইগুড়ির চড়কডাঙ্গি[১০]

ওইঠে পদ্মর হ'ছে ফাঁসি রে।

পদ্মর মাও ক'ছে দেখি' আসি—

বাপে ক'ছে হইসে ফাঁসি।

ও প্রাণো সখী রে,

পিরিত করার গালায় হইল্ ফাঁসি ॥

১ ময়নাগুড়ির নিকটস্থ গ্রাম বিশেষ ২ ঐ ৩ ওই স্থানে ৪ তিন জন ৫ যখন পরিমাণ সূচক শব্দ ৭ জোড়ায় জোড়ায় ৮ ধব ধবে, সাদা বালি। অথবা ধু ধু করা বালি ৯ হাপুস নয়নে কাঁদে ১০ ফাঁসির স্থান।

CENTRAL LIBRARY

এই গানের যে কথান্তর মিলিয়াছে তাহা এই :

সখী রে সখী,
পিরিত করার গালাত হইল্ ফাঁসি।
অংপু রতে ১ বাজিল্ বেনা ২—
তিনজন ছেনা ৩ হছে বেনোয়া ৪ ॥…
… অংপুরেতে বাজিল্ বাঁশী—
জোলপইগুড়িত সখী ফাঁসির রে কুঠি ॥…
… জোলপাইগুড়িত সখী
… জোলপইগুড়ির ঘনরে গলি—
চড়কডাঙ্গিত ৫ হছে রে ফাঁসি ॥…

সখী রে সখী,
হাড়িয়া কোণে ৬ নাগিল্ দেওয়া ৭
তিনজন ছেনা হছে বেনোয়া।
জোলপইগুড়ির ঘনরে গলি
ওইঠে ৮ আছে পানের রে খিলি।
ওরে পিরিত করার গালাত হইল্ ফাঁসি ॥

১ রংপুরে ২ বেনা বাজিল ৩ অবিবাহিত যুবক বা বিপত্নীক পুরুষ ৪ বাড়ী ঘর ছাড়া হইতেছে ৫ শহর জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে মাসকলাই-বাড়ী নামক স্থান। যাঁহাদের নিকট হইতে গান দুইটি পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি—আগে মাসকলাই বাড়ীতেই ফাঁসি দেওয়া হইত। ফাঁসির মঞ্চকে 'চড়কডাঙ্গা' বলে এবং ব্যাপকার্থে স্থানের নামও তাহা হইয়া গিয়াছে। মাসকলাই বাড়ী বর্তমানে শহর জলপাইগুড়ির শ্মশান ৬ বায়ুকোণে ৭ মেঘ করিল ৮ ওইস্থানে।

গানখানির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। বাংরু নামীয় জনৈক চোরের কোনো এক বিশেষ অপরাধে ফাঁসি হয়। সে নাকি প্রেমিক ছিল। বাংরু চোরের এই ফাঁসির লৌকিক সত্যকে পটভূমিকা রাখিয়া, আলঙ্কারিক অর্থে পিরিতের ফাঁসির কথা গানে বলা হইয়াছে। বাংরু চোরের কাহিনী কতো দূর সত্য, জানিনা।

। ২৫০ ।

মোতি-মোতি করিয়া রাজ্য ঢুঁড়িনু রে—
তাঁহো না পানু মোতি-আড়ীর[১] বাড়ী।
নোটা[২] না[৩] ভাঙ্গিয়া রে
গোপীযন্ত্র সাজানু রে—
তাঁহো না পানু মোতি আড়ীর বাড়ী ॥
খোরা[৪] না ভাঙ্গিয়া রে
খঞ্জরি সাজানু রে—
তাঁহো না পানু মোতি আড়ীর বাড়ী ॥
থালি না ভাঙ্গিয়া রে
করতাল সাজানু রে—
তাঁহো না পানু মোতি আড়ীর বাড়ী ॥
ধুতি না ফাড়িয়া রে
কোপীনো সাজানু রে—
তাঁহো না পানু মোতি আড়ীর বাড়ী ॥
বাঁশো না কাটিয়া রে
গোপালডাং[৫] বানানু রে—
তাঁহো না পানু মোতি আড়ীর বাড়ী ॥
চন্দনো ঘষিয়ারে
তিলকো কাটিনু রে—
তাঁহো না পানু মোতি আড়ীর বাড়ী ॥
হালুয়া ভাইয়া রে,
তোকে না পুছো রে—
কোন্‌টা হয় মোতি আড়ীর বাড়ী ॥
"মোতি আড়ীর দুয়ারতে
জড়া তালের গাছো রে—
ওইঠে আছে মাতি আড়ীর বাড়ী।"
গারস্ত[৬], বাবা রে, তোক না পুছো রে—
দেও বাবা মোক মোতি আড়ীর ভিক্ষা রে ॥

১ মোতি নাম্নীয়া বিধবা ২ ঘটি ৩ 'না' নিরর্থক ৪ বাটি ৫ বৈষ্ণবের লাঠি ৬ গৃহস্থ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৫১ ।

বাপোই, তুই তো হইল্ চাকরিয়া[১] ॥
অক রাখিনো[২] ঘর-জেয়া[৩]—
কাম-কাজ দেখিমো কেমন কার[৪] ॥
চাটি-ফুড়কি ঘর দুয়ার
বেটী হাসোছে কার সঙ্গে আর[৫] ;
যাকয়[৬] দেখিমো বেশী পারক[৭]—
বেটীর সঙ্গে বিহো দিমো তার ॥
ও বাপোই রে,
যার নারী তায়ে[৮] পায়—
নোকে করে হায় রে হায়।
সাদি-কর্ম ওরে বাপোই,
আগে বলা'না যায় ॥

। ২৫২ ।

জামাই, বাড়ীঘর তামান[৯] তোমার।
মোরঠে[১০] কাথা শুন আর :
খুব খাটায়[১১] নেও চাকরটার[১২]—
কণকও[১৩] জিরিবার[১৪] না দেন তার[১৫] ॥
দেহাত[১৬] বাবা দেও রে টান[১৭]—
রোয়ার ভুঁই ঢাকাও তামান[১৮] ;
পাটা কাটো ভাদই ধান
ভাঙ্গা আলির বান্ধো শান[১৯] ॥

১ যে চাকরি করে ২ উহাকে রাখিলাম, রাখিয়াছি ৩ ঘর জামাই ৪ দেখিব, কার কেমন কাজ ৫ মেয়ে কার সঙ্গে হাসে অর্থাৎ মেয়ে কার প্রতি ঝুঁকিয়াছে ৬ যাহাকেই ৭ বেশী কাজ করিতে পারে যে ৮ তাহে, সেইই ৯ সবই ১০ আমার কাছে, নিকটে ১১ খাটাইয়া ১২ চাকরটাকে ১৩ একটুও, কণামাত্রও ১৪ জিরাইবার, জিরাইতে ১৫ তাহাকে ১৬ দেহে, শরীরে ১৭ শক্তি ধর, উৎসাহী হও ১৮ রোয়া গাড়িয়া সমস্ত জমি ঢাকিয়া ফেল অর্থাৎ জমি পতিত রাখিয়ো না ১৯ যে আলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা জোড়া দাও।

CENTRAL LIBRARY

বাইগন-বাড়ীত উভাও[১] সার ;
কিরষির চাইর মাস খুবে ধাও[২]—
আট মাস বসিয়া খাও।
গিরস্তির কাম খুবে[৩] আরাম
খুবে সুখ মজার ॥
পোহাক দিন[৪], গড়াই গাহনা
বেটীতো হইছে সেয়ানা।
বিহো দিবার পাল্লে রে
ভাবনা যায় হামার[৫] ॥

১ বহন কর। সার দাও ২ ধকল, কষ্ট ৩ খুবই ৪ দিন (ব্যাপকার্থে) যাউক
৫ বিবাহ দিতে পারিলেই আমাদের ভাবনা যায়। শ্বশু ঘর-জামাইদের প্রতি শাশুড়ীর উক্তি।

CENTRAL LIBRARY

॥ বিহোর গান ॥

। ২৫৩ ।

ফেমী-র[১] কারোয়া[২]
যাছে গে আইসেছে—
ফেমীর নানান কম্ পড়েছে[৩]।
হোকার গুয়া[৪]
ফেলা গে ফিকিয়া[৫] ॥

। ২৫৩ ক ।

উতরতিকার[৬] গে বাই[৭]–
কারোয়া আইসেছে[৮] :
এলা[৯] তোক জুড়ে[১০] কি মোক জুড়ে –
দনো বইনি[১১] ঝগড়া নাগাইসে ॥

তাংকু বাড়ীর[১২] নাফাশাক
ঢ্যাপা-ঢ্যাপা কুশি[১৩]।
আজিকার মনে[১৪] ঘুরিয়া যারে কারোয়া
মনত নাই মোর খুশি ॥

। ২৫৪ ।

আগাতিকার[১৫] সইষা[১৬] গে খটু[১৭]
আই[১৮], মুই গেনু শাক তুলিবা'[১৯]
কুনবাতিকার ধুতি গে ঝুলা[২০]
আই, মোর খালে গালের চুমা
— গে বিষমো ভাবিয়া'[২১] ॥

১ 'ফলনা'র স্ত্রীলিঙ্গ। এইখানে যাহার বিবাহ হইবে, তাহার নাম বলিতে হয় ২ ঘটক ৩ স্মরণে আসিতেছে ৪ বিবাহের পাকা দেখিবার দিন বর ও কনে'র দুই পক্ষ একত্র বসিয়া পান-সুপারি আদান-প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকে 'দর-গুয়া' বা 'গুয়া-কাটা' অনুষ্ঠান বলে ৫ ছুঁড়িয়া ৬ উত্তরদিকের ৭ দিদি ৮ আসিতেছে ৯ এখন ১০ বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করাকে বর বা কইনা 'জোড়া' বলে ১১ দুই বোন ১২ তামাক ক্ষেতের ১৩ বড়ো বড়ো কুশি ১৪ মতো ১৫ পূর্বদিকের ১৬ সরিষা ১৭ এক এক খণ্ড বা জমির প্লটকে 'খটু' বলা হয় ১৮ দিদিমা ১৯ তুলিবার, তুলিতে ২০ কোঁচা ঝুলাইয়া ধুতি পরিয়াছে যে যুবক। কাব্যিক গালাগালি বিশেষ ২১ হঠাৎ আসিয়া।

মাই-র[১] কারোয়া[২] যাছে আইসেছে
মাই-র মন য্যামন করেছে —
গালাতে কাটারি দিয়া মরিবা মনাছে ॥

হেকেরা ডালিমের[৩] গাছো গে বাবা,
ওগে বাবা, এখিনায় না ধরে ছেয়া[৪] ।
জাক্রই করিবা গেলেন গে বাবা
অমুক পাড়ার ভিতি[৫] ।
তোম্‌হার মনত থালে, রে বাবা,
ওগে বাবা, হামার মনত নাই থায় রে ॥

। ২৫৫ ।

কইনা দেখিবা[৬] গেলেন সোগায়[৭]
কহো কেনং দেখিলেন কাঁয়[৮] ।
মোর হুলুয়ার নগদ[৯]
শবাবে, না নি-শবাবে[১০] গায়-গায়[১১] ।
বেশী নাগুক দশটাকা ভাল্[১২]—
তাঁহো[১৩] নাগে সঙ্গত্ মাল ।
হামার হুলুয়া দেখিয়া
হুমার সোগার[১৪] পড়ে নাল ॥

কইনা দেখিবা গেলেন সোগায়
তমরা ছাড়ো দেখি আও ;
কইনার আছে না নাই মাও ?
বেহানীটা সঙ্গত্ নাগে ।
হকল-বকল আও[১৫]—
হুমন[১৬] হামাক
না নাগে বেহাইটাক ॥

১ মেয়ের ২ ঘটক ৩ একধরণের ডালিম ৪ ছায়া ৫ দিকে । অমুক পাড়ার দিকে ৬ দেখিবার, দেখিতে ৭ সকলে ৮ বলো, কে কেমন দেখিলে ৯ আমাদের ছেলের সঙ্গে ১০ শোভা পাইবে কি পাইবেনা ১১ পাশাপাশি ১২ দশটাকা বেশী কন্যাপণ লাগে, সে-ও ভালো ১৩ তবুও ১৪ উঁহাদের সকলের, কন্যা পক্ষীয়দের ১৫ ফড়্ ফড়্ করিয়া যে বেশী কথা বলে ১৬ ওই রকম ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৫৬ ।

চান্নি[১] শুদো[২] করেঁ।[৩] গে,
চান্নি শুদো করেঁ।—
আজি বাপোইর ঘন অদিবাসো[৪] গে ॥
কুলা শুদো করো গে,……ইত্যাদি ॥
ঘোট[৫] শুদো করেঁ। গে,……ইত্যাদি

। ২৫৬ ক ।

গারাম ঠাকুরের দুয়ারে
কিসের বাইজন বাজে ;
বরের মাওটা[৬] আঝিলি[৭]
এল্‌হানি[৮] গারাম[৯] পূজে ॥
কাঁখত নিছে চাইলান বাতি
হাতত নিছে ঝারি ;
গারাম পূজিবা'গেইল্ বরের মাও
ওই ঠাকুরের বাড়ী ॥
কাংঘের চাইলান বাতি
মাটিতে থুইয়া :
ত্রিশালী দেবগণ[১০] পূজে বরের মাও
উলু-লু করিয়া ॥
দেবতা পূজিয়া বরের মাও
করিলেক সারা।
জল বরিতে বরের মাও
দিলেক পন্থে মেলা ॥

১ চালুন ২ শুদ্ধ ৩ করি ৪ অধিবাস ৫ ঘট
৬ কন্যার বাড়ীতে গীত হইলে 'কইনার মাওটা' বলিতে হইবে ৭ ক্ষ্যাকা, এলোমেলো গোছের ৮ এখন, এখনি ৯ গ্রাম দেবতা। যে কোন শুভকর্মের পূর্বে গারাম পূজা করিতে হইবে ১০ ত্রিশকোটি দেবতা।

জল বরিতে বরের মাও
গেইল্ যমুনা নদী।
যমুনারো পারে পারে
বামোনেরো বসতি ॥
বামোনেরো বহু-বেটী
বরের হাউসালী।
নাই চাহিতে নিক্‌লি[1] দিলেক
সনা-রূপার ঝারি ॥
এইকিনা[2] ঝারির জল
কিনা[3] করিবেন গে।
হামার বাপোইর[4] বিয়াও হ'চে[5]
সিনান করামো গে ॥

। ২৫৭ ।

আজি বাতাস থামাম,
চাইলন[6] সাজাম,
আজি বাবার অধিবাস করা'ম।
বৈরাতী[7] ডাকেয়া হল্‌দা বাটিম,
আজি বাবার অধিবাস করা'ম ॥
উপার খুন্তি[8] দিয়া ঘাটো না খুঁড়িম,
চৌপাখে[9] বসেয়া দিম কড়ি।
মাকলা বাঁশের পাতা দিয়া
ঘাটো না সাজা'ম —
চন্দন-খুটার[10] ফেলেয়া[11] দিম পিঁড়ি ॥
নাউয়া[12] ডাকেয়া, কামান করেয়া,
আজি বাবার অধিবাস করা'ম।

১ বাহির করিয়া ২ এইটুকু ৩ 'না' নিরর্থক ৪ কন্যার বাড়ীতে গীত হইলে 'মাই-র' বলিতে হইবে ৫ হইতেছে, হইবে ৬ চালুন, বরণডালা ৭ এয়ো ৮ রূপার খুন্তি। আসলে লোহার খুন্তিই ব্যবহৃত হয়। আদরার্থে রূপার নাম উল্লিখিত হইয়াছে ৯ চারিদিকে ১০ চন্দন কাঠের ১১ পাতিয়া, ফেলিয়া ১২ নাপিত।

হল্দা মাখেয়া সিনান করা'ম—
কোমরে পরেয়া দিম দশ হাতিয়া ধুতি ॥
নন্দন কাজল দিয়া বাবাক সাজা'ম,
মাথাত বাঁধিয়া দিম শাস্তকের পাগুড়ি[১] ।
তুলুসী তলাত বাবাক বসেয়া[২]
মাও দিবে আশুব্বাদ ॥

। ২৫৭ ক ।

সন্দার[৩] জন্ম কোন্ঠে[৪] রে
সন্দার জন্ম কোন্ঠে :
—সন্দার জন্ম পাসারীর দকানে ॥

কড়ি লইয়া আইস
সন্দা লইয়া যাও,—
আজি বাবার গন্ধ-অধিবাসো গে ॥

নাই হল্দার বাপো রে
নাই হল্দার মাও,—
আজি হল্দার ঘুচাবে থুবুড়াও[৫] ॥

। ২৫৭ খ ।

কাঁচো কাঁচো হল্দা[৬]—
অঙে নাহি উঠে[৭] গে !
ছি গে ছি, নারীর বেটী[৮],
ছিরি[৯] নাহি উঠে গে !

১ মুকুট পরিবার প্রথা নাই। পরিবর্তে লাল পাগড়ি মাথায় দেওয়া হয়। সাদা কাপড় বাঁধিয়া তাহাতে সিঁদুরের কৌটা দিতেও দেখিয়াছি   ২ বসাইয়া   ৩ গন্ধ দ্রব্য বিশেষ   ৪ কোন স্থানে   ৫ কৌমার্য, অরক্ষণীয়ত্ব   ৬ কাঁচা কাঁচা হলুদ   ৭ এই হলুদের রঙ নাই   ৮ তাহার কারণ, কুরূপা কনেরই রূপের অভাব   ৯ শ্রী।

হল্দির জন্ম কোন্ঠে[১] গে !
হল্দির জন্ম বাপো-ভাইয়ার ঘরে গে !
ছি গে ছি, নারীর বেটী,
ছিরি নাহি উঠে গে !

। ২৫৮ ।

বাবার ভাইটা[২] বল্দা[৩],
গে বল্দা সাজাইছে ;—
সনার মহর ভাঙ্গেয়া[৪] গে
হল্দা কিনাইছে ॥
আধা-কাঠা হল্দা
দেও বাবার মুখে ।
বাবার মুখে ফুল গে
ফুটিয়া গে পড়ে ॥

১ কোন স্থানে ২ বরকে আদর করিয়া 'বাবা' বলা হইতেছে। তাহার ভাই ৩ সে বলদের মতো বোকা ৪ সোনার মোহর ভাঙাইয়া।

কথান্তর—

কাঁচো কাঁচো হল্দা—
অঙ্গে নাহি উঠে গে !
আধাই-বুড়ীটার ১ ছিরি নাহি উঠে গে !
কাটিয়া আনো রে বাবা
খোরহোলির ২ গছরে ;—
ঝুরিয়া আন রে ৩ বাবা
থুবুড়ীর ৪ বৈরাতীরে ।
হে কূলে ৫ সায়েবের বেটা
সাজনি সাজে ;
হকূলে ৬ গলামের বেটা ৭
খোরহোলি কাঁপে ৮ ।

১ আধা বয়সী বুড়ীটার ২ দেশীয় গাছ বিশেষ ৩ কাটিয়া আনোরে ৪ অধিক বয়স্কা, অরক্ষণীয়া, সহজে যাহার বিবাহ হইতে চায়না ৫ একূলে ৬ ওকূলে ৭ গোলামের বেটা ৮ থর থর করিয়া কাঁপে ।

CENTRAL LIBRARY

বাবার উপ[১] গে
কাঁয় নইয়া যাছে ;
ফেন্না-র[২] বেটী
তাঁয় নইয়া যাছে ॥

। ২৫৯ ।

আইস মাই, আইস,—পিঁড়াত চড় গে।
—নাই হামার পিঁড়াত চড়িবা' সখ রে ॥
আইস মাই, আইস,—হল্দা মাখো রে।
—নাই হামার হল্দা মাখিবা' হাউস রে ॥
আমুক তো জরম-ঠেঙুয়ার[৩] বেটারে—
উয়ার[৪] নগদ[৫] মাখিম হামেরা হল্দা রে ॥
তুই শাড়ী পিন্দিস মাই,—তোক শাড়ী শুবে রে।
শাড়ীয়ো গোড়ে গোড়ে জোড় ভমরা ঘুরে রে—
আসিয়া মাই ওরে ॥

। ২৬০ ।

গাও-কেনা[৬] দেখুঁরে বাপোই,—
হুহুয়া-হুহুয়া[৭] রে বাপোই,
বাপোই, হল্দি কোনঠে পালো[৮] ॥

তোর যে শাশুড়ী হল্দা-ভাতারী[৯]
রে বাপোই,
তাঁহে[১০] দিয়া গেইল্ হল্দি রে বাপোই ॥

১ রূপ ২ এইখানে কনের বাপের নাম বলা হয় ৩ জন্ম হইতে যে খোঁড়া। বরকে এই বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে ৪ উহার ৫ সঙ্গে ৬ দেহটি। আদরার্থে 'কেনা' ৭ নাদুস-নুদুস, সুন্দর, আদরার্থে ৮ পাইলি ৯ তোর শাশুড়ীর স্বামী (ভাতার) হলুদ বিক্রয় করে ১০ সেই-ই।

। ২৬০ক ।

গাও ঘষু[১], গাও রে বাপোই,—
গাওত নাই তোর মইলা[২] রে বাপোই ;
এই গাওর বাদে[৩] রে বাপোই,
বহিনি হইল্ তোর বাঁদী রে বাপোই[৪] ॥

যে বান্দী নাই পালো
দশটাকা দিতে[৫] রে বাপোই ;
আজি বান্দী পালো
সিনানের ঘাটে রে বাপোই ॥

। ২৬০খ ।

আজি সিনানো করিমো হে বাবা,
আগিনারো মাঝে রে বাবা,
আজি সিনানো করিমো হে বাবা,
আথারে-পাথারে রে বাবা ॥
আজিকার সিনানে রে বাবা,
পাইলেন শেযার দোসর[৬] রে বাবা ॥

। ২৬১ ।

টাকা না ভাঙ্গেয়া[৭] ডীঘি না দিলেন গে[৮],—
আখিলি না ভাঙ্গেয়া
চারি ঘাটো গে[৯] ।
সেই ঘাটে হামার মাই[১০] সিনানো করে গে ॥

সেই ঘাটে হামার মাই সিনানো করে গে,—
সেই ঘাটে আমো মুহলে[১১] গে ॥

১ ঘষি, ঘষিতেছি ২ ময়লা ৩ জন্যে ৪ আজ তোর বোন তোকে স্নান করাইয়া দিতেছে, সে তোর বাঁদী হইয়াছে ৫ দিলে ৬ শয্যাসঙ্গী ৭ ভাঙ্গাইয়া অর্থাৎ খরচ করিয়া ৮ দীঘি কাটিলেন ৯ চারিঘাট প্রস্তুত করাইলেন ১০ আমাদের মেয়ে ১১ মুকুলে, মুকুলিত হয় ।

CENTRAL LIBRARY

আমোতে আমো ফলে
কাজিলী আমো[১] গে,—
আমো ফলে সিন্দুরো বরণো গে।
আনো তো তুলিয়া, দেখি তো কাটিয়া,—
কি হোবে মাইর কোপালে গে॥

। ২৬১ক।

তোর নদীটাত[২] রঙ-রঙিয়া[৩] পানি[৪]
গে ফেন্নী[৫],
তোর নদীটাত রাজাই[৬] ধুবা'[৭] দিবো নাকি
গে ফেন্নী॥

যেত্‌কে[৮] রাজাই খেঁচা-খেঁচি করে[৯]
গে ফেন্নী,
তোর চুয়াটাত[১০] ছিপ ফেলেবা'[১১] দিবো নাকি
গে ফেন্নী,
যেত্‌কে ছিপ ঝিকাঝিকি[১২] করে গে ফেন্নী॥

। ২৬২।

উত্তর কাশিয়া[১৩] গে, কাশিয়া যেইনং ফুটে—
ওগে, সেই না কাশিয়ার তলে গে
বাবা ঘরো বান্ধে॥

সেই না ঘরের তলে গে
বাবা কিতাব পড়ে[১৪]—
সেই না কিতাব শুনিয়া গে
বেটী কান্দিয়া মরে॥

১ কাজল বরণ আম ২ নদীতে ৩ টলটলে ৪ জল ৫ যাহার বিবাহ, তাহার নাম বলিতে হয় ৬ কাঁথা-কম্বল ইত্যাদি ৭ ধুইতে ৮ যখন ৯ কাচে ১০ কুয়াটিতে ১১ ফেলিতে ১২ উঠানো-নামানো ১৩ কাশ ফুলের গাছ ১৪ পঞ্জিকা দেখে।

CENTRAL LIBRARY

আজি না কান্দো, না কান্দো,
বেটী গে, টাকা ঘুরিয়া দিমো।
আর নাকুন[১] ঘুরিবে গে
হোলোদি মাথা দামানো[২] ॥

। ২৬২ক।

উত্তর পাথের[৩] আইলোতে
কাশিয়া ভালা[৪] গে ফুটে।
সেই না কাশিয়া কাটিয়া গে
বাবা বাঙ্গেলা[৫] বান্ধে ॥

যে হইল্ সে হইল্ বেটী গে,
তোরে নসিবতে ;
আর নিকিন ঘুরিবে গে
হোলোদি-মাথা দামান[৬] ॥

কুনবা বানিয়ার বেটা
মুঠিয়া[৭] গড়াইসে ভালা।
মাগে, সাড়ীয়া ঝলকে ঝোনি জলে[৮]।

। ২৬৩ ;

তিস্তা নদীর ধাই-ধাই বালা
ওইঠে[৯] শুন্ মোর বেহাইর গালা ;
ও মোর গুণের বেহাই রে ॥

১ নাকি ২ বর ৩ উত্তর দিকের ৪ ভালো ৫ বাঙ্গলা ঘর ৬ বর ৭ কয়েকটি শাঁখা একত্র করিয়া যে অলঙ্কার হয়, তাহাকে 'মুঠিয়া' বলে। এইরূপ পাঁচ বা সাতটি শাঁখা একত্র করিয়া যে শাঁখা হয় তাহাকে বলে 'শাঁখামুঠি' ৮ 'মুঠিয়া' যেন ঝলক দিয়া জ্বলিতেছে ৯ ওইখানে।

CENTRAL LIBRARY

বন্দরে-শহরে ব্যাড়েয়া[১] ছাখোঁ
দামান[২] কতেক দূর ;
আইসেছে[৩], আইসেছে চ্যাঙ্গেড়া দামান ডে[৪]
মাথাত টগরের ফুল ॥

। ২৬৪ ।

দুয়ারের আগে[৫] মোর
চন্দন-বিক্ষের গাছো রে ।
তার তলে আসিয়া মাই
ফেলাইসে পালংখি[৬] রে ॥

পালংখি থাকি[৭] মাই
নিন্ যায় রে ।
হেম্ সময়[৮] আসিয়া ঠেকিল্[৯]
জরম-ঠেঙ্গুয়ার বেটা রে ॥

জরম-ঠেঙ্গুয়ার বেটাটা
এতয় নাটক[১০] জানে রে ।
নিন্দের মাইক হামার
ঝঁকেয়া চ্যাতন করে[১১] রে ॥

কোন্‌ঠেকেনা[১২] গেলো মাইর
বড়ো ভাইয় রে ;
নিকাল্ করিয়া দে তো[১৩]—
জরম-ঠেঙ্গুয়ার বেটাক রে ॥

১ বেড়াইয়া ২ বর ৩ আসিতেছে ৪ 'রে' 'ডে' রূপে উচ্চারিত হয় কোনো কোনো অঞ্চলে। বর আগমন কালে কন্যার বাড়ীর এয়োরা কন্যার মায়ের জবানীতে গাহিতেছে ৫ সম্মুখে ৬ পালকি ৭ পালঙ্কে শুইয়া ৮ এমন সময়ে ৯ পৌঁছাইল ১০ কৌতুকাদি ১১ ঝাঁকাইয়া চেতন করাইল ১২ কোন স্থানে ১৩ বাহির করিয়া দে তো।

। ২৬৪ক ।

দুয়ারের আগে মোর
নালো বিন্নার[১] থোপো[২] গে ;
নালো বিন্না মোর জ্বলিয়া যাছে গে—
হে পাগুড়ির তলে ॥

ব'স-গড়াটাক[৩] কাঁয় গেইসে বরিবা'[৪] গে,
হে পাগুড়ির তলে ।
দাচীয়ামারীটা[৫] আপনে আসিছে[৬] গে
হে পাগুড়ির তলে ॥

। ২৬৫ ।

কি দ্যাখেছিত্‌,[৭] বাপোই রে চায়ি-কুলার ভিতি[৮] ।
ওই চায়ি গণাইছে[৯] তোর মাও ধাগিরী[১০] ॥

কি দ্যাখেছিত্‌, বাপোই রে ঘোট-গছার[১১] ভিতি ।
ওই ঘোট গণাইছে তোর বহিনি ধাগিরী ॥

কি দ্যাখেছিত্‌, বাপোই রে কিয়া-কাঁকইর ভিতি ।
ওই কিয়া গণাইছে তোর কাখী[১২] ধাগিরী ॥

কি দ্যাখেছিত্‌, বাপোই রে আয়না-কাঁকইর ভিতি ।
ওই কাঁকই গণাইছে তোর পিসাই[১৩] ধাগিরী ॥

১ এক ধরণের ঘাস ২ ঝাড় ৩ বয়স গড়াইয়া গিয়াছে যাহার, তাহাকে ৪ বরণ করিতে ৫ যে নিজেই যাচিয়া আসে ৬ নিজেই আসিয়াছে ৭ দেখিতেছিস ৮ দিকে ৯ গুণিয়াছে অর্থাৎ বলিয়াছে ১০ দুশ্চরিত্রা ১১ ঘট ও প্রদীপের ১২ কাকীমা ১৩ পিসিমা ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৬৬ ।

কতো খেলি খেলাও ময়না
বোন্‌ফুলের[১] তলে রে ফুল-ময়না ;
কালি যে আসিচে ময়না
হরিচ্চন দেউনিয়ার[২] বেটা রে ।
আজি ধরিয়া যাবে রে ময়না
মন্দির করিয়া খালি রে ।
—ফুল-ময়না রে ॥

যাঁয়ে[৩] সেন্দুরের মান্‌ষি
তাঁহে ধরিয়া যাবে ;
যাঁয়ে শাংকার মান্‌ষি
তাঁহে ধরিয়া যাবে ;
—ফুল-ময়না রে ।
যাঁয়ে গহনার মান্‌ষি
তাঁহে ধরিয়া যাবে ;
—ফুল-ময়না রে ॥

খাবার বেলা খালো বাবা
ছাচি-কাছা দহি রে ;
এলা ক্যানে কান্দিস বাবা
মাথায় হাতো দিয়া রে ।
—ফুল-ময়না রে ॥

১ বনফুলের ২ হরিশ্চন্দ্র দেউনিয়ার । এইখানে বরের পিতার নাম বলিতে হয় ৩ যে ।
ফুল মারামারি অথবা চরণ বন্দনার সময়ে গীত হয় ।

। ২৬৭ ।

কালা কালা বাইগন রে গোছি[১]
দীঘল দীঘল পংখী ;
সেই না পংখী উড়িয়া গেইল্‌
দামাল[২] শালার বাড়ী ॥

মুঠা[৩] দিবা' চালো রে দামাল
মুঠা কইরো দিলো ;
তোর বাপোর মুখত নইজ্জা-নাইরো
কবুল ক্যানে করলো ॥

মালা দিবা' চালো রে দামাল
মালা কইরো দিলো ;…

খাড়ী[৪] দিবা' চালো রে দামাল
খাড়ী কইরো দিলো ;…

নোলো[৫] দিবা' চালো রে দামাল
নোলো কইরো দিলো ;…

অন্তি[৬] দিবা' চালো রে দামাল
অন্তি কইরো দিলো ;…

কাটা বাজু[৭] দিবা' চালো রে দামাল
কাটা বাজু কইরো দিলো ; …

ঠ্যাংখাড়ু[৮] দিবা' চালো রে দামাল
ঠ্যাংখাড়ু কইরো দিলো ;… ॥

১ বেগুনের গাছ ২ বর ৩ একাধিক শাঁখার একত্র সম্মিলনকে 'শাঁখামুঠি' বলে
৪ শাড়ী ৫ নোলক ৬ কানের দুল ৭ বাহুর অলঙ্কার ৮ মল।

CENTRAL LIBRARY

। ২৬৮ ।

চান্দের নাখা[1] ছাটা[2]
উপার নাখা জলে গে ;
হামার মাইটা সনার নাখাতি ।
ওগে, আগ[3] উঠিসে, আগ উঠিসে
কালা খুটাখান[4] দেখিয়া' গে ॥

ওগে, আগ উঠিসে, আগ উঠিসে
ভ্যাটেরা চখুটাক[5] দেখিয়া'গে ।
হুমার[6] পিঠিখান দেখিয়া
ছ্যাকা পাড়িবা'[7] মনাছে[8] গে ॥

। ২৬৯ ।

তোক যদি ব্যাচেয়া খাচে[9] মাই
পাড়া হ'ছে খালি ;
কাঁয় আরো বেড়াবে মাই
মেলিয়া মাথার চুলি ।
বেচা যাছিত[10] মাই খোঁপা-চুলি[11] ॥

দেখিতে শুনিতে মাই
কল্‌কল্ করি' বাড়িলো ;
পরার বাদে[12] মাই তুই
এতোটা হলো ॥

১ মতো ২ ছটা ৩ রাগ ৪ কাঠখানা ৫ ড্যাব্‌ডেবে চোখ ৬ উঁহার ৭ কলা গাছের ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাপড় কাচাকে 'ছেঁকা পাড়া' বলে ৮ মনে হইতেছে ৯ বেচিয়া খাইতেছে ১০ বিক্রীত হইতেছিস ১১ যাহার চুল খোঁপা করিয়া বাঁধা ১২ জন্যে । কন্যাকে সাজাইবার সময় গীত হইয়া থাকে ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৭০ ।

কইন্যা কান্দে উ উ,
নাই চোখের পানি।
ভট্‌রা মরিচ[১] ভাঙ্গিয়া দেউ'ক
বিরাউক[২] চোখের পানি॥

। ২৭১ ।

হাত-পা ধুইয়া ময়না
গেলো বাপোর কাছে,—
বাবায় তুলিয়া নিলে কোলে :
এমন সুন্দর মাও মোর
পরায় নিগাবে[৩]—
ঘর মোর করিয়া যাবে খালি রে॥
"আগোতে[৪] খাইসেন[৫] বাবা
বাটা-ভরা টাকা রে ;
এলায়[৬] কেনে কান্দেন বাবা
দরবারে[৭] বসিয়া রে॥"
হাত-পা ধুইয়া ময়না
গেলো মাওয় কাছে ;—
মাও তুলিয়া নিলে কোলে :
এমন সুন্দর মাও মোর
পরায় নিগাবে—
আন্দন[৮] মোর করিয়া যাবে খালি রে॥
"আগোতে খাইসেন মাও
বাটা-ভরা পানো রে ;
এলায় কেনে কান্দেন মাও
আন্দনে বসিয়া রে॥"

১ এক ধরণের মোটা মরিচ বিশেষ ২ বাহির হউক। বিবাহ বাসরে হয়তো কন্যা বেশী কাঁদিতেছে না, তখন তাহার সহিত রসিকতা করিয়া এয়োরা এই গান গায় ৩ পরে লইয়া যাইবে ৪ পূর্বেই ৫ খাইয়াছেন ৬ এখন ৭ বাহির বাড়াতে ৮ রান্না ঘর।

। ২৭২ ।

মায়েরে[১] আগত[২] যায়া কান্দিবাকো[৩] ধইল্ :
ও মোর মাও গে,
আধা-বসা[৪] ছুলুয়াটা[৫] মোক বদলেয়া[৬] দে ॥

"তামা না হায়, কাঁসা না হায়[৭]
বদলেয়া দিম্ ;—
ও মোর বেটী গে,
যে আছে কপালের লেখা
খণ্ডাবে আর কে ॥"

ভাইরে আগত যায়া কান্দিবাকো ধইল্ :
ও মোর দাদা গে,
দাঁত-ভাঙ্গা ছুলুয়াটা মোক বদলেয়া দে ॥
"তামা না হায়, কাঁসা না হায় ইত্যাদি।

। ২৭৩ ।

কেলা গাড়ো সারি-সারি[৮]
ঢাইগন[৯] খিরিলেক বাড়ী ;
ফেলাও-ফেলাও তমার সায়েবান্-চটি[১০]
দেখি বাবার বাড়ী ॥

খেদেরি কালাই মা মোর মুহুরি কালাই
মা মোর মরুচ ঝুম্-ঝুম্ ফলে,...[১১]।

১ মায়ের ২ সম্মুখে ৩ কাঁদিতে ৪ আধাবয়সী ৫ বরটা ৬ বদলাইয়া
৭ তামাও নয়, কাঁসাও নয় ৮ সারি সারি কলাগাছ গাড়ো ৯ বড়ো বড়ো কলাপাতা
১০ শামিয়ানা ইত্যাদি টাঙাও ১১ শেষটুকু পাই নাই।

CENTRAL LIBRARY

। ২৭৪ ।

যেমন তোর আপেনকার মাও[১]
মাই গে, দিলে দিলে মাই তোক
হাউড়িয়ার হাতত, মাই গে ॥

হাউড়িয়ার ঘরে দেহা করিবে কালা
মাই গে, দিলে দিলে মাই তোক
খুজুনা গাহেনা[২] মাই গে ॥

য্যামন তোর আপেনকার খুড়া
মাই গে, দিলে দিলে মাই তোক
খুজুনা কাপেড়া, মাই গে ॥

। ২৭৫ ।

ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বসিস গে ফেন্নী
ঝালং[৩] চিঁড়া যাবে[৪] গে ॥
ওই ঝালংয়ের বাদে[৫] গে
তোর মাও হোবে বাঁদী[৬] গে ॥

। ২৭৬ ।

কালা-মেঘার তলে গে আই
গেছা[৭] হল্‌ফল্‌ করে[৮] :
হল্‌দা-মাখা দামান গে আই
টকুটক্‌ করি' দেখে[৯] ॥

১ আপনার মা ২ অপরের বাড়ী হইতে চাহিয়া আনা গহনা ৩ ঝালর দেওয়া শাড়ী ৪ ছিঁড়িয়া যাইবে ৫ জন্যে ৬ দাসী ৭ গাছ অথবা প্রদীপ ৮ দোলে ৯ মাথা ঝাঁকাইয়া দেখে।

CENTRAL LIBRARY

। ২৭৭ ।

আঁটো চুয়ার[১] টিল্‌টিল্‌ গে পানি[২]
মাছ মারলো ফেল্লা
জোড়ে জোড়ে গে পুঁঠি[৩],
এতর আতি[৪] ॥

মাছ মারলো ভালে[৫] গে করলো
সরু বেতের মাইরন সারি সারি গে পিটালো[৬],
এতর আতি ॥

। ২৭৭ক ।

বাঁশের আড়ায়-আড়ায়
গোরু চরালো রে ;
এচিয়া-বেচিয়া[৭] কোঙ্কি
হাতোত নিলো রে ॥

সে-কিনা[৮] কোঙ্কি দিয়া
কাক মাইরন[৯] মারলো রে ;
সে-কিনা কোঙ্কি দিয়া
ফেন্নীক[১০] মাইরন মারলো রে ।

এমন মাইরন মারলো
গাভো খসালো রে[১১] ;
ছয়ো মাসের কামাই
জলে ভাসালো রে[১২] ॥

১ যে কুয়া বন্ধ হইয়া আসিয়াছে ২ পরিষ্কার জল ৩ জোড়ায় জোড়ায় পুঁটি মাছ
৪ এতো রাত্রিতে ৫ ভালোই ৬ সরুবেত দিয়া বেদম প্রহার করিলি ৭ বাছিয়া বাছিয়া
৮ সেইটি ৯ প্রহার ১০ এইখানে যে মেয়ের বিবাহ হইতেছে তাহার নাম বলিতে হয়
১১ গর্ভপাত করাইলি ১২ ছয় মাসের গর্ভ নষ্ট করিলি ।

। ২৭৮ ।

ঝাঙ্গ্‌-ঝাঙ্গ্‌ পিঙ্গাবির তলে রে
যতো ঝাঙ্গরে ঘিরিয়া ধরে রে ॥

হামার মাইর আছে আছে
পাঙ্ক বইনি রে ;
পাঙ্ক বইনি ঘিরিয়া ধরে—
ব'স গড়াটার[1] কাহোয় নাই রে।
—যতো ঝাঙ্গরে ঘিরিয়া ধরিসে ॥

হামার মাই শাড়ী পিন্ধে—
অল্‌ফ কাপড়ে ঠেসক ধরে রে ;
ব'স-গড়াটা কাপড় পিন্দে
চরুটা[2] হোর দেখা যাছে রে ॥

হামার মাই ঘোঙ্গর দেয় রে.
অলফ ঘোঙ্গরে ঠেসক ধরে রে।
ব'স-গড়াটা ঘোঙ্গর দেয় রে
ভিহা কপালখান[3] দেখা যাছে রে ॥

হামার মাই ভক্তি দেয় রে
এঘিনা[4] মেন-মেন ঝলক ধরে রে।
ব'স-গড়াটা ভক্তি দেয় রে
ভিহা কপালখান ভিকিৎ করে রে ॥

১ বয়স গড়াইয়া গিয়াছে যাহার ২ উরুটা ৩ উঁচু কপালটি ৪ আঙিনা ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৭৯ ।

পায়ে বা ঘুঙুরা বাজে রে
ও মুই কেমনে বাইরে যাও ;
ঘরে মোর শ্বশুর, বাইরে মোর ভশুর
শিয়রে ননদি জাগে।
—আই, মুই কেমনে বাইরে যাও ॥
পিরিতির আশে, পিরিতির বাসে
ঘুঙুরার বায়না দিছে ;
কি কহিম বানিয়াটাক রে
এলা কালাইয়া ভরেয়া দিছে।
—আই, মুই কেমনে বাইর হও ॥
চিপিয়া ধরেঁা, ঠাসিয়া ধরেঁা,—
আই, মুই অস্তে ফেলাও পাও ;
জলের ঝারি হাতত নিয়া
এলা ঢেঁকিয়া-বাড়ীত যাও ॥

। ২৮০ ।

সুতা-হরতকী হাতে নিয়া দয়ার বাবা
করে জোড়ো হাতো রে :
আজি হাতে[১] হলো বেটী
কুলেরো বাহিরো রে।
—কি ওরে দয়ার বাবা রে ॥
ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়া
দয়ার বাবা মুছে চোখুর পানি রে ;
কি ওরে দয়ার বাবা রে।
আজি হাতে হলো বেটী
গোতের[২] বাহিরো রে—
—কি ওরে দয়ার বাবা রে ॥

২৭৯-সংখ্যক গানখানি নাচের সহিত গীত হয়।

১ হইতে ২ গোত্রের। পিতা-কর্তৃক কন্যা সম্প্রদানের সময় গীত হয়।

। ২৮১ ।

ইড়িয়া বান্দো, ভিড়িয়া বান্দো
চন্দন-বিরিখের গাছো :
আজল জাঞই[১] বিদায় চাহে
কি কি দিবেন দানো ॥
নটা[২] দিবেন, থালা দিবেন
আরো দিবেন ঝারি ।...ইত্যাদি ।

। ২৮২ ।

মাগে, এই ছিল তোর মনে ;
বাচ্চা হাতে[৩] পুষিনু মা-জলনী[৪]
কোলা-পিঠি করি[৫] ॥

মাগে, এই ছিল তোর মনে ;
বাচ্চা হাতে পুষিনু মা-জলনী
থনের[৬] দুধো দিয়া ॥

আগে যদি জানিনু হয় মা-জলনী
টাকা নিনু হয় তোরে[৭] ;—
যাবা[৮] সমৃ[৮] যাবো[৯] মাগে
বুকে শ্যালো দিয়া[১০] ॥

১ আদরের জামাই ২ লোটা, ঘটি ৩ বাচ্চাকাল হইতে ৪ মা-জননী ৫ কোলে পিঠে করিয়া ৬ স্তনের ৭ আগে যদি জানিতাম (যে তুই পরের ঘরে চলিয়া যাইবি) তাহা হইলে (এতোকাল তোর জন্যে যে কষ্ট করিয়াছি, তাহার জন্যে) টাকা লইতাম ৮ যাইবার সময় ৯ যাইবি ১০ বুকে শেল দিয়া ।

CENTRAL LIBRARY

। ২৮৩ ।

কেনে কান্দিস কইনার মাও
উনিয়া-গুনিয়া[১] :
না দিলে কোলার ছাইলা
কাঁয় নিবে কাড়িয়া ॥

"সেলায় না কমু[২] বাবা
পব্‌দোলায়[৩] ঘিরিয়া আখেন বাড়ী ;
মুই ময়না বাহির হলে
মন্দির হোবে খালি ॥"

আজায় লুটে ধনপরী[৪]
সাউদে[৫] লুটে বাড়ী ;
হল্‌দা-মাখা দামান[৬] লুটে—
মাওর কোলা খালি ॥

। ২৮৪ ।

বাবার ঘরের কৈতর[৭] জড়া
মোরে এগিনাত[৮] পড়ে ;
মুঠি মুঠি সইষ্যা দেও
খায়য়া ফ্যাকন[৯] ধরে ॥

এ বাড়ী যাইতে, ও বাড়ী যাইতে
পন্থে শিম্‌-শিম্‌[১০] পানি ;
বরের ভিজিল্‌ ধুতি-জামা
কইনার ভিজিল্‌ শাড়ী ॥

১ গুন গুন করিয়া ২ তখনই না বলিয়াছি ৩ বেড়া দিয়া ৪ রাজা ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি লুটে ৫ সাধু ৬ জামাই, বর ৭ কবুতর ৮ আঙিনাতে ৯ পেখম ১০ অল্প অল্প বৃষ্টি ।

। ২৮৫ ।

এ্যাখেলায়[১] গেলোরে বাপোই,
দোসরে[২] আসিলো ;
খার ঘরের খোকের[৩] পায়রা
চুরি করিয়া আনিলো ॥

মাথারে মটুকে, ধুত্তিরে ঠসকে[৪]
হাইড়ানীক[৫] ধরিয়া আইচ্ছেন[৬] পিছে'॥

"নাই যাও মুই শহরে
নাই যাও মুই বন্দরে ;
নাই যাও মুই
হাড়ীপাড়া দিয়া ॥"[৭]

। ২৮৬ ।

শোবোদে[৮] শুনিচু[৯] গে ফেন্নী,
ভেল্-ভেল্[১০] তোর ভাইয় গে,—
হায়রে হায় ।
নগদ আসিবার বেলা[১১]
নাইরো[১২] তোর ভাইয় গে,
হায়রে হায় ॥

শোবোদে শুনিচু গে ফেন্নী,
ভেল্-ভেল্ তোর বইনি গে,—
হায়রে হায় ।
নগদ আসিবার বেলা
কইরো[১৩] তোর বইনি গে,
হায়রে হায় ॥

১ একলাই ২ দুইজনে, দোসর সহ ৩ খোপের ৪ বাহারে ৫ কনের প্রতি কটূক্তি করিয়া তাহাকে 'হাড়ীয়ানী' বলা হইতেছে ৬ আসিয়াছ ৭ এই অংশটি বরের পক্ষ হইতে জবাব ৮ লোকমুখে ৯ শুনিয়াছি ১০ অনেক অনেক ১১ সঙ্গে আসিবার বেলা ১২ নাই ১৩ কই ।

। ২৮৬ ক ।

আলি বান্ধেন, আলি বান্ধেন
সরেয়া সরেয়া মাটি[১] ;
ও দিনা আইসেছে[২]
শূয়োর চরার বেটী ॥

শূয়োর চরার বেটী গে,
এতোয় কেনে আতি[৩] ;
শূয়োরক ভাও দিতে[৪]
হয়া গেইছে আতি ॥

। ২৮৬ খ ।

ঘর ছুইটা চিলাং-ঝাটাং[৫]
কাউয়ায়[৬] মাইল্লে[৭] হাঁড়ী[৮] ।
ওহো গে ফেয়ী,
তোর সাটোক[৯] ভারী ।
সাটোক করি' পিন্দি[১০] আইচ্চে গে
কাইয়া বাপের[১১] শাড়ী ॥

আশমান করে চাল্‌কাউ-চাল্‌কাউ[১২]
দূরের বন্ধু মোর কই আসে ।
বন্ধু বিনা পানের খিলি
কাঁয় আরো খাবে[১৩] ॥

১ মাটি সরাইয়া সরাইয়া ২ আসিতেছে ৩ এতোই কেন রাত হইল ৪ শূয়োরের দেখাশোনা, পরিচর্যাদি করিতে ৫ ভাঙা-চোরা ৬ কাক, কাকে ৭ মারিল ৮ ভাঙা-চোরা ঘর, কাক আসিয়া ভাতের হাঁড়ীতে ঠোকর দিল ৯ অহঙ্কার, দেমাক ১০ পরিধান করিয়া ১১ কন্যার পিতাকে মারোয়াড়ী বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে ১২ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ১৩ কে আর খাইবে। প্রথম স্তবকের সহিত শেষ স্তবকের ভাবগত কোন ঐক্য নাই।

CENTRAL LIBRARY

। ২৮৭ ।

হামার বাপ কাক্কা সনা রে কারোয়া[১],
আনিয়া দিলো কালুয়া-পেঁচী[২] কইনা।
হামার বাপোইর মনত
নাই খায়[৩] রে কারোয়া,
ধরিয়া যা[৪] তোর কালুয়া-পেঁচী কইনা ॥
তোরে হোবে[৫] হোঁক্কোর শুল্‌কি[৬]
রে কারোয়া,
ধরিয়া যা তোর কালুয়া-পেঁচী কইনা ॥

। ২৮৭ক ।

চাইর পুখে[৭] জলে রে চাইর
চাইলন বাতি,—
মাঝতে জলে রে
সনার চাইলন বাতি ॥
কম্বক্তার[৮] বেটী শুকা পান পালেক রে,—
বিহোত[৯] পালেক রে
সুন্দর বাপোইর নাগাল[১০] রে ॥

। ২৮৮ ।

কড়ি খেলাইতে[১১] ফেন্নী হারিলো গে,—
ল্যাম্‌-ল্যাম্‌[১২] তোর বাপোর দাড়ী
ডুবালো গে ॥
কিয়া[১৩] খেলাইতে ফেন্নী হারিলো গে,—
ল্যাম্‌-ল্যাম্‌ তোর বাপোর দাড়ী
ডুবালো গে।···ইত্যাদি ॥

১ ঘটক ২ কালো প্যাঁচার মতো ৩ মনে ধরে নাই ৪ ফেরৎ লইয়া যা ৫ তোরই হইবে ৬ হুঁকার ডাঁটি। অর্থাৎ কন্যা খুবই লিক্‌-লিকে এবং লম্বা ৭ চারিদিকে ৮ গালি বিশেষ। ফারসী 'কম্বখ্‌ৎ', অর্থ—হতভাগা ৯ বিবাহের মাধ্যমে ১০ সঙ্গ ১১ খেলিতে ১২ লম্বা লম্বা ১৩ কাঁকই।

। ২৮৯ ।

হামার বাপোই ধুতি পিন্ধে
ধুতি ভালো শুবে[1] গে ;
ধুতিরে গোড়ে গোড়ে[2]
ঝুম্‌কা নাড়ু[3] বান্ধে গে ॥

ফেন্নীটা নিলাজী
নাড়ু খাবা' চাহেছে গে ।
চায়হা চায়হা[4] নাড়ু খালেক
গটা চারি[5] গে ॥

। ২৯০ ।

ঝের ঝেরা পিরানের[6] তলে গে
চাইরখান চুলি মেলান হইচে ;
হামার বাপোই ইকিনাত[7] বইচ্ছে গে
ইকিনাখান ঝলক ধরেছে ।
ফেন্নীটাতে ইকিনাত বইচ্ছে গে
ইকিনাখান আন্ধার হইচে ॥

১ শোভা পায় ২ ধুতির মধ্যে ৩ নাড়ু বিশেষ ৪ চাহিয়া চাহিয়া ৫ গোটা চারি
৬ ভাড়া-চোরা বিবাহ-মণ্ডপে (?) ৭ আঙিনাতে ।

। ২৯১ ।

আগাতি উঠিসে[১]

মেঘেরো ঘাটা[২] রে বাপোই,—

বাপোই রে,

বিনা মেঘে বরষিলো পানি।

পানির কোবোতে[৩]

হায়রানি হোলো রে বাপোই,

বাপোই রে,

দৌড়িয়া সন্দালো[৪] কারোয়া[৫] শালার বাড়ী ॥

কারোয়া শালাটা

দশটাকা খালে[৬] রে বাপোই,

বাপোই রে,

তোক্ বুঝাইল্ ডিমা-মাউরিয়ানীটা[৭] দিয়া।

ডিমা-মাউরিয়ানীটা

তোক নাকিন[৮] শুবে[৯] রে বাপোই,

বাপোই রে,

তোক্ বুঝাইল্ আধা ব'সীটা[১০] দিয়া ॥

। ২৯২ ।

উতরতিকার[১১] গে শিয়র জড়া[১২]

সোদায়[১৩] আইসে ধোঁক্-ধোঁক্ করিয়া :

বাপোই রে,

কমরে রে ছুরি নিয়া

আন তো শিয়র জড়া জবো করিয়া ॥

ফেন্নী শালীটা হইসে গসা[১৪] :

শিয়রের টুঁমা[১৫] দিয়া

আনো ভক্ষেয়া[১৬] ॥

১ পুর্বদিকে উঠিয়াছে ২ রামধনু ৩ জলের কোপে অর্থাৎ ধারাবর্ষণে ৪ দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল ৫ ঘটক ৬ খাইল ৭ রোগা, বেঁটে, মা-মরা ৮ নাকি ৯ শোভা পায় ১০ আধা-বয়সী, অধিক বয়স্কা ১১ উত্তর দিকের ১২ শূয়োর জোড়া ১৩ সদাই ১৪ গোসা হইয়াছে ১৫ খণ্ড, টুকরা ১৬ আনিয়া ভোজন করাও।

CENTRAL LIBRARY

। ২৯৩ ।

পাটা না[1] নেলায়[2] কালা মোর
নিধুয়া ডাঙ্গাত[3] গে আই।
কার হাতে দিয়া পেঠাইম
এ জলর ঝারি গে আই[4] ॥

হামার বাপোইর মারোয়া[5] খানি
ঝলক ধরিসে ;
কত্‌খণ ভাল্‌ আইসেছে[6],
কত্‌খণ ভাল্‌ নাইসেছে[7],
জরম ঠেঙ্গুয়ার বেটী রে[8] ॥

। ২৯৪ ।

জল আনেক গে, জল আনেক
নয়া কলোসীত করিয়া ;
দিমিত-দিমিত করিয়া[9] ॥

১ 'না' নিরর্থক ২ নিড়ায় ৩ শুকনা জমি, কাবিক নাম বিশেষ ৪ কালা পাট নিড়াইতে নিড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার তৃষ্ণা দূর করিবার জন্ত কাহার হাতে জলের ঝারি পাঠাইব ৫ চারিদিকে কলা গাছ পুঁতিয়া যে বিবাহ-মণ্ডপ তৈরি হয় তাহাকে বলে 'মারোয়া' ৬ কখনো বা কিছুক্ষণ ভালো লাগিতেছে ৭ কিছুক্ষণ ভালো লাগিতেছে না ৮ কন্তার পিতাকে 'জরম-ঠেঙ্গুয়া' বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে। গানখানি বরের বাড়ীর গান। বরের রূপে বিবাহ-মণ্ডপ উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কন্তার রূপ একবার ভালো লাগিতেছে আর পরমুহূর্তেই খারাপ লাগিতেছে ৯ দ্রুত গতিতে।

CENTRAL LIBRARY

ভাত আন্ধেক গে, ভাত আন্ধেক
মন্দির ঘরোত সন্দেয়া[১] :
শুহুর-গদোর করিয়া[২] ॥

ভাত পশেক[৩] গে, ভাত পশেক
নয়া থালাত করিয়া :
থালা উছাল করিয়া[৪] ॥

ভাত খারে বাউ, ভাত খারে
খাপাচালিত[৫] বসিয়া :
চাকাম-চাকাম করিয়া[৬] ॥

। ২৯৫ ।

সিনানেরো ঘাটে না ভাবেন
বসিয়া রে বাবা,—
সিনানেরো ঘাটে সনার চাইলন বাত্তি ॥
যাঁয়[৭] তমার মাও-বাবা,
স্যাও[৮] হইল, হুষ্টা রে বাবা ;
কালা কইন্যাটা
গালাত[৯] বান্ধিয়া দিলে রে বাবা ॥

১ প্রবেশ করিয়া ২ তাড়াতাড়ি করিয়া ৩ পরিবেশন কর ৪ ভর্তি করিয়া
৫ খেঁচতলায় ৬ খাইবার অনুকার শব্দ বিশেষ ৭ যে ৮ সে-ও, সে ৯ গলায়।

CENTRAL LIBRARY

। ২৯৬ ।

মারোয়া-গুড়গুড়, মারোয়া-গুড়গুড়
মারোয়ার[১] তলে পানি।
কইনার বাপটা ঠেঙ্গুয়া[২]
ঠেঙ্গে ছেঁকে পানি॥

ঝালকাইনচাত[৩] কেনে কইনার বাপ
ঝালকাইনচাত কেনে;
আনিছেন জুতার ভার
বাড়ী না আইসেন কেনে॥

টাকা সে দিমো, কড়ি সে দিমো,
তাঁহো না জুতার ভার
স্বাদেয়া[৪] নিমো॥

। ২৯৭ ।

শূয়োর চরাইস বামোন[৫]
শূয়োরের না জানিস ভাও[৬];
উল্‌টিয়া-ঘুরিয়া[৭] ধরিস তুই
কালো ডুমনীর[৮] পাও।
বামোন, কান্দে তোর দেশে বাপ-মাও॥

বামোনের বাপ কান্দে, মাও কান্দে
কান্দে বামোনের হিয়া;
তোর বামোনের জাতি গেইল্
কালো ডুমনীক দিয়া[৯]।
বামোন, কান্দে তোর দেশে বাপ-মাও॥

১ বিবাহ-মণ্ডপ ২ খোঁড়া ৩ বাড়ীর বা ঘরের কোনা ৪ লাথি দিয়া ৫ পুরোহিত
৬ এখানে শূয়োরের প্রকৃতি ৭ ফিরিয়া ফিরিয়া, বারে বারে ৮ ডোমনীর ৯ ডোমনীর দ্বারা।

। ২৯৮ ।

বয়স-গড়া[১] নাউয়া নিন্দতলে[২] পইছে[৩]।
উঠ রে নাউয়া,
দেহা রে কামাও ॥

জোড়-মারেয়ার তলে[৪] উলু-লু পড়েছে
উঠ রে নাউয়া,
দেহা রে কামাও ॥

নাউয়া না কওঁ তোক
নাউয়া না কওঁ তোক—
হামার মাইক ভালো করিয়া
কামাও রে,
ক্ষুর না[৫] নাগিলে ক্ষুর কাড়ি' নিমো রে ॥

। ২৯৯ ।

দূরে দূরে শুনিছি[৬]
আছিন্দরের[৭] চৌচালা বাঙলা—
মরি হায় রে।
ব্যালত যায়া[৮] দেখোঁ[৯]
আঙিনা খাটো[১০], দুয়ারে কাদো[১১]
মরি হায় রে ॥

চাইরে পুখে[১২] চাইরোখান চালা
মাঝিয়াত[১৩] নাই মাটি।
তায় বড় বড় কাথা কয় আছিন্দর
মুখত নাই লজ্জা।
মরি হায় রে ॥

১ বয়স গড়াইয়া গিয়াছে যাহার ২ নিদ্রাভিভূত ৩ পড়িয়াছে ৪ কলা গাছ পুঁতিয়া বিবাহের যে আসর তৈরি হয়, তাহাকে বলে 'মারোয়া' ৫ নিরর্থক। ক্ষৌরকার্যের জন্য নাপিত আসিলে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া গীত হয় ৬ দূর হইতে শুনিয়াছি ৭ গালি বিশেষ ৮ নিকটে যাইয়া ৯ দেখি ১০ ক্ষুদ্র আঙিনা ১১ কাদা ১২ দিকে ১৩ মাঝখানে।

CENTRAL LIBRARY

। ৩০০ ।

বরের ঘরের বৈরাতী[১],
ধুমা-ধুমা কটি[২] ।
আনো তো দাহুকী[৩]—
চেঁচিয়া[৪] ফেলাও কটি ॥

। ৩০১ ।

আহ্নিয়া ওহুনি-শাকের[৫] ঝোল
দিয়ু ঢালিয়া ;—
বৈরাতী পালাছে[৬] রে বাবা
'তবা তবা'[৭] করিয়া ॥

প্রায় এই ভাবেরই (সং ২৯৯) অপর একটি গান এই :

কারোয়ার ১ মুখে শুনা যাছে
জোড়-জোড় বাঙ্গেলা ২,
মরি হায় হায় হায় রে ;—
বাড়ী যায়া দেখু বাপোই রে
শূয়োরের খোপোরা,
মরি হায় হায় হায় রে ।
কারোয়ার মুখে শুনা যাছে
ছামে-কুটা ৩ চুঁড়া-মুড়ি ৪,
মরি হায় হায় হায় রে ।
খাবার পাতত দিয়া যাছে
ধানুয়া চুঁড়া-মুড়ি ৫,
মরি হায় হায় হায় রে ।

১ ঘটকের ২ জোড়-বাঙলা ঘর ৩ উদুখলে কোটা । অর্থাৎ নিজেদের হাতে ভালো করিয়া কোটা ৪ চিঁড়া-মুড়ি ৫ ধান-ওয়ালা চিঁড়া-মুড়ি ।

১ বরযাত্রীদের সহিত এয়োরূপে আগত মহিলাদের 'বৈরাতী' বলা হয় ২ গুরু নিতম্ব ৩ দা, খুরপি ৪ চাছিয়া ৫ রসুনের ঝোল ৬ পলাইতেছে ৭ "তৌবা তৌবা" করিয়া ।

। ৩০১ক ।

ওই মুছা-চাটিখান[১] ডাঙ্গালেন[২] গে কাঁয়[৩]
কালা করিয়া বুড়াটা
হবা[৪] দখুন পায়[৪] ॥
তুই গে ফেন্নী নোট-পটী[৫]
দিনোতে দ্যাখেছিত মান্‌ষি[৬]—
বগলত[৭] আসিয়া আছে বুড়া গে সোয়ামী ॥

। ৩০১খ ।

আমের গছটা[৮] দো-ডালিয়া[৯]
পাতারি ঘস্‌-ঘস্‌[১০] ।
রে বুড়া না যায় রে চিনা[১১] ।
তোর কি মনে এই ছিলো রে
বুড়া ভাঁড়ুয়া[১২],
আম তুলিয়া মারলো রে ঝাঁটা[১৩] ।

। ৩০১গ ।

হাত ঢুলানি, পাও ঢুলানি
শিকিয়া-বান্ধা দই[১৪] ।
ওইদিয়া-ওইদিয়া[১৫] যাছিত গে বুড়া
আও কাড়িস কই[১৬] ॥

১ মাটি দিয়া লেপা বেড়া (চাটি) টা ২ আঘাত করিলেন ৩ কে ৪ হইলেও হইতে পারে ৫ বোকা ৬ দিনের বেলায় ছোকরা মনে হইতেছে ৭ পার্শ্বে, কাছে ৮ গাছটা ৯ দুই ডালের ১০ ঘন পাতা ১১ বুড়াটা সেই ঘন পাতার আড়ালে লুকাইয়া আছে, তাহাকে দেখা যায় না ১২ গালি বিশেষ ১৩ ঢেলা। ঘন পাতার আড়াল হইতে বুড়া আম ছুঁড়িয়া মারিয়াছে ১৪ শিকায় দই বাঁধিয়া, হাতে দোলাইতে দোলাইতে চলিয়াছে ১৫ দূর দূর দিয়া ১৬ কথা বলিতেছিস না কেন।

CENTRAL LIBRARY

। ৩০১ঘ ।

ধারিরো[১] গোড়ে গোড়ে[২]
বেইগনের হালা[৩] ।
আজি রে বুড়া দেখেচু কেনে
তোর মনটা কালা ॥

বট-পাকুড়ের বিবাহের গান

। ৩০২ ।

বটো না পাখুড়ি গাড়িনু রে,
স্থাও[৪] পাখুড়ি মেলে পাক্কো[৫] ডালো রে ;
তোক, পাখুড়ি বিহায় দ্যাছু[৬]
বড়য়[৭] আশা করি'রে ।
ওহো মোর পাখুড়ি রে ॥

না জানোঁ মুই সাঁতার
না জানোঁ মুই পহর[৮] রে ;
না জানোঁ মুই ভুরা খিয়াইবারে[৯] রে ।
ওহো মোর পাখুড়ি রে ॥

ঘাটিয়ারক[১০] দিনু আনা আনা,
খেউনিয়ারক[১১] দিনু কানর সনা ।
ওহো মোর পাখুড়ি রে ॥

১ ঘরের উঁচু ভিটা ২ সেই ভিটার নিকটে ৩ গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুন ফলিয়া রহিয়াছে ৪ সে-ও ৫ পক্ক ৬ তোকে বিবাহ দিতেছি ৭ বড়োই ৮ সাঁতার ৯ ভুরা বাহিতেও জানি না ১০ ঘাট রক্ষককে ১১ যে খেওয়া দেয় ।

CENTRAL LIBRARY

॥ গর্ভবতীর প্রতি ॥

পড়শীদের ঠাট্টা

। ৩০৩ ।

তুই নান্দো[১] মাও-ছুলালী[২]
গে নান্দো,
কই পড়ে তোর মাওর চখুর পানি[৩] ॥

তুই নান্দো বাপ-ছুলালী
গে নান্দো,
কই পড়ে তোর বাপোর চখুর পানি[৪] ॥…

গর্ভবতীর উত্তর

। ৩০৩ক ।

ছিকো-ছিকো[৫] বাই[৬]
মরিয়া সে যাই[৭]
হিলা কেনং কাথা[৮] গে,
ভওড়া নাকীটা[৯] বসিয়া গে আছে—
কাথা কবার বাদে[১০] গে ॥…[১১]

১ নন্দরাণী ২ মা-র আছুরে মেয়ে ৩ ঠাট্টা করিয়া পড়শীরা কহিতেছে, তুইতো মায়ের এতো আদরের। কিন্তু তোর প্রসব কাল উপস্থিত হইলেও তোর মা কাঁদিতেছে না (অর্থাৎ চিন্তিত নয়) ৪ এইরূপে ভাই, বোন, জেঠা-খুড়া—পরিবারের সকলের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে ৫ ছি ছি ৬ দিদি ৭ শরমে মরিয়া যাই ৮ এইগুলি কিরূপ কথা ৯ দণ্ডের মতো যাহার নাক খাড়া। লক্ষ করা দরকার, 'উঁচু-নাকী' বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে ১০ কথা কহিবার জন্ত ১১ এইরূপে ইহার পর 'ব্যাচের-চোখী' (ট্যারা), 'বেঁকা-মুখী', 'ন্তাড়েড়া-ঠেঙী' (ন্যাংড়া), 'ভীঘল-মুখী' (লম্বা মুখী) ইত্যাদি গালি দিয়া গান গাওয়া হয়।

CENTRAL LIBRARY

॥ কর্ম-জীবন ॥

ধান-কাটা

। ৩০৪ ।

ওই ধান কাটিলে
নাড়া[১] রে ভাসে,—
নাড়া ভাসে কিবা জলতে,
ওই ধান কাটিলে[২] ॥

। ৩০৪ক ।

ওই তমা'[৩] কাঁয় কাঁয়[৪] বা'রে[৫]
বসো[৬] বা'রে ॥
ওরে এ্যাখেতে[৭] মোর বুঢ়ালি ব'স[৮],—
বল-শক্তি মোর জুটে না।
মনটাত ধরা পাইনু'[৯]
যাবা'[১০] নাগে ধান কাটিবা'[১১] ॥

১ ধান কাটিয়া লইবার পর, গোড়ায় যে অংশটুকু মাটিতেই রহিয়া যায়, তাহাকে 'নাড়া' বলে ২ ধান কাটিয়া লইবার পর, নাড়া জলে ভাসিয়া যাক (অর্থাৎ তাহা যদি না-ও পাওয়া যায়) তবুও ক্ষতি নাই। ধান-প্রাপ্তির আনন্দে চাষী নাড়াকে অবহেলা করিতেছে, যদিও নাড়া দিয়া যথেষ্ট কাজ করা হইয়া থাকে। চাষীর মনের এই আনন্দ লক্ষ করিবার মতো। গানখানি মনঃশিক্ষা গানরূপেও পাইয়াছি। তখন ইহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করা হইয়া থাকে ৩ তোমরা ৪ কে কে ৫ রাজবংশী সম্বোধন। 'ওহে' এই অর্থে ৬ বসিয়া আছো। ওহে, তোমরা কে কে বসিয়া আছো অর্থাৎ কাহার কাহার অবসর আছে ৭ একে তো ৮ বুড়া বয়স ৯ মনস্থ করিয়াছি, বুঝিয়াছি ১০ যাইবার ১১ কাটিবার।

। ৩০৪ খ ।

ধান কাটে বীরে রে মোর
বীরে কেনে রে উভায়[১] :
বীরের কান্ধ্ থাকি'[২] ধান
হস্‌কিয়া[৩] কেনে পড়ে রে ।
ওহো মোর বীরের ধানো রে ॥
তুই যদি বীর আপন রে হইতো[৪]
তোর ধান কি হস্‌কিয়া পইড়তো ।
ওহো মোর বীরের ধানো রে ॥
"মোর হছে ঘেস্‌কেটা দাও[৫]
মোর হছে ভোকের গাও[৬] ।
চম্‌কিয়া উঠিনু মুই
সনাবান্দা[৭] ভাইয়[৮] রে ॥"

ধান-ভুকানিয়া গান

। ৩০৫ ।

হেইসো হেইসো হেইসো[৯]
তিলের নাড়ু খাইসো[১০] ॥
তিল হইল্ গটা[১১] ।
মোর হইল্ বেটা ॥
তোর হইল্ নাতী ।
ধান ভুখা[১২] হাতী[১৩] ॥

১ বহন করে ২ কাঁধ হইতে ৩ হাত ফস্‌কাইয়া ৪ আপনজন হইতিস ৫ আমার হইতেছে (হইল) ঘাস-কাটা দা-য়ের মতো ধার-বিহীন দা ৬ আমার দেহ ক্ষুধার (অর্থাৎ ক্ষুধা পাইয়াছে) ৭ সোনা দিয়া মোড়া ৮ ভাই অর্থাৎ ভালোবাসার জন । প্রথম দুই স্তবক দেবরের প্রতি বউদির উক্তি, তৃতীয় স্তবক দেবরের উক্তি ৯ ধান ভানিবার সময় দৈহিক শ্রম লাঘব করিবার জন্ম মুখে সুর করিয়া উচ্চারিত অর্থহীন শব্দ ১০ আসিয়া খাও ১১ ইহার সুস্পষ্টঅর্থ নাই, মিলের জন্ম ব্যবহৃত ১২ ধান ভান্‌ ১৩ মিলের জন্ম ব্যবহৃত ।

। ৩০৬ ।

ওই দিয়া[১] যারে ভইষ[২]—
ধান বাকড়[৩] হইস ॥
বাঁশের গোড়ত তারা[৪] ।
চাউল যাউক মোর কাঁড়া[৫] ॥

১ অন্যদিক দিয়া ২ মহিষ ৩ কাঁড়ানো। খুবসম্ভব 'বাকল' এবং তাহার সহিত 'কাঁকর' (ধানের খোসা অর্থে)-এর মিলনের ফলে 'বাকড়্'-এর উৎপত্তি হইয়াছে ৪ রাত্রি বেলায় ধান ভানা হইতেছে। বাঁশ গাছের ফাঁকে ফাঁকে তারা দেখা যাইতেছে ৫ আমার চাউল কাঁড়ানো হউক।

৩০৫-সংখ্যক গানের প্রথম স্তবকের কথান্তর—
স্তাও, স্তাও, স্তাও ১ ।
তিলের নাড়ু খাও ॥

শেষাংশের কথান্তর—
তোর হইল্ বেটা,
মোর হইল্ নাতী ।
কলাত ২ করিয়া থাকি ৩ ॥

১ ধানের সব খোসা যখন উঠিয়া যায়, তখন তাহাতে মুষলটি পড়িলে 'স্তাও স্তাও' করিয়া শব্দ উঠে ২ কোলে ৩ শুইয়া থাকি। একাধিক স্ত্রীলোক যখন ধানভানে, তখন এই সুর-করা ছড়া গাওয়া হয়। বর্তমান ছড়াটির এক-একটি পংক্তি একজনের প্রশ্ন ও অপরজনের উত্তর।

। ৩০৬ ক ।

ওই দিয়া[১] যারে ছুটি[২]
তোর চাউল হউক ক্ষুদি[৩] ॥
ওই দিয়া যারে ভইষ্
মোর বারা[৪] হইস্ ॥
ওই দিয়া গেইল্ বল্দিয়া
মোর চাউল হল্দিয়া[৫] ॥
ওই দিয়া যায় হাতী
তোর বারা হউক আত্তি[৬] ॥
মোর ধান দিয়া যাউক নাড়া
চাউল যাউক মোর কাঁড়া ॥

। ৩০৭ ।

হেইসো বারার ভুকি[৭] ঃ
হালুয়া[৮] মুখামুখি ।
যেত্‌কে[৯] হালুয়া কিচ্‌কিচায়[১০] :
তেত্‌কে[১১] বারার ভুকি ॥
হালুয়া আসিল্ বাড়ীত,
চাউল থিয়াছু[১২] হাড়ীত ॥
আন সোয়ামী পাত কাটিয়া,
দেছি হামরা ভাত বাড়িয়া[১৩] ॥
ভাতো ক'ছে[১৪] গরম,
শাগো[১৫] ক'ছে গরম,—
হের দেখিস[১৬] শালী খড়ম ॥

১ ওই দিক দিয়া, দূর দিয়া ২ ছোট লাল পিঁপড়া ৩ তোর চাল ভাঙিয়া ক্ষুদ হইয়া যাউক ৪ ধানভানা ৫ হলুদ। অর্থাৎ ভালো। সুস্পষ্ট অর্থ নাই, মিলের খাতিরে ব্যবহৃত ৬ ধান ভানিতে ভানিতে তোর রাত বাড়িয়া যাক অর্থাৎ কিছুতেই যেন ধান ভানা শেষ না হয় ৭ ধান ভানাকে 'বারাভুকানো' বলে ৮ হাল বহে 'য। স্ত্রী কর্তৃক সম্বোধিত গৃহস্থের সাধারণ নাম। এই হিসাবে গৃহিণী 'হালুয়ানী' রূপে সম্বোধিতা হইয়া থাকে ৯ যখন ১০ তিরস্কার করে ১১ তখন ১২ চড়াইলাম ১৩ আমরা (আমি) ভাত বাড়িয়া দিতেছি ১৪ করিতেছে, লাগিতেছে ১৫ যে কোনো তরকারি বুঝাইতেই 'শাক' কথাটি ব্যবহৃত হয় ১৬ কাহারো দৃষ্টি বা শ্রুতি আকর্ষণ ক'রতে ব্যবহৃত হয়। 'এই দেখিস'—এই অর্থে।

। ৩০৮ ।

বইল্দা[১] ক'ছে[২] 'সাজিম্-সাজিম্'[৩],—
বইল্দানী কুটে বারা।
একঘড়ি দেবি[৪] কর্ রে বইল্দা
খায়া যাবো[৫] চুঁড়া[৬]॥

হেত্তি যাবো[৭], হোত্তি যাবো[৮]
যাবো আঙ্গামাটি[৯]।
ছাওয়ার তানে[১০] য্যামন-ত্যামন
মোর গালার কাঠি[১১]॥

হেত্তি যাবো, হোত্তি যাবো
যাবো দূরোন্তাশ।
তমার গাওর ভিজা গামছা
থুইয়া যাও বান্ধা॥

তমার গাওর ভিজা গামছা
খামো না বিলামো[১২]।
যখনে[১৩] পড়িবে মনে
হিদ্দে[১৪] তুলি' নিমো[১৫]॥

১ বলদ। গালি বিশেষ ২ কহিতেছে ৩ সাজিব সাজিব, অর্থাৎ জামা-কাপড় পরিব ৪ একটু দেরি ৫ যাবি ৬ চিঁড়া ৭ এখানে যাবি ৮ ওখানে যাবি ৯ রাঙামাটি। স্থানের নাম ১০ জন্যে ১১ গলার অলঙ্কার বিশেষ ১২ খাইবও না, বিলাইবও না ১৩ যখনই ১৪ হৃদয়ে, বুকে ১৫ তুলিয়া লইব।

। ৩০৯ ।

চাউল কাঁড়াও মই চিকিত্‌-চাকাত্‌[১]
গকোলাতি ছাম[২] ।
বইনার নাঙ্গে[৩] আনিয়া দিছে
টেঙ্গা[৪] গছের[৫] আম ॥

বইনা রে হুঁ,
মুই নাইয়র[৬] যাবা' চাও[৭] ।
মাগে মা,
কাজল-মন্দির ঘরটা কাক[৮] দিয়া যাও[৯] ॥

। ৩১০ ।

ও মোর টিপুয়া[১০] রে,
ও তুই কাচাল্‌[১১] করাইস্‌ না ।
হালুয়া-ঘাস্থয়া[১২] আইসেছে[১৩],—
ও মোর ভুক্কিবা'[১৪] আছে ধান ॥

১ 'চিকিত্‌-চ'কাত্‌' শব্দ করিয়া চাউল কাঁড়াইতেছি ২ যে 'ছাম'-এর গর্ত অনেকখানি । বেশী গর্তওয়ালা 'ছামে' চাউল কাঁড়াইতে সুবিধা ৩ উপপতি, অবৈধ প্রেমিক ৪ টক ৫ গাছের ৬ পিত্রালয়ে যাওয়াকে 'নাইয়র যাওয়া' বলা হয় ৭ যাইতে চাই ৮ কাহাকে ৯ দিয়া যাই ১০ যে সধবা ধান ভানিতেছে, তাহার দেবরের নাম ১১ বিরক্ত, খুন-সুটি ইত্যাদি অর্থে ১২ যে ঘাস কাটে ১৩ আসিতেছে ১৪ ভুকাইবার, ভানিবার ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩১১ ।

ওই চিকা কইর্লে[১] চিকিৎ[২] ।
মাঝিয়া[৩] কইর্লে চিকিৎ[৪] ॥
আন্ বেহানী[৫] বেও[৬] ।
চিকাটা মারিয়া দেও ॥

খা বেহানী খা ।
ঝোলে-ঝোসে খা ॥
ঝোলে-ঝোসে খায়া বেহানী
বাড়ী চলিয়া যা ॥

। ৩১১ ক ।

চিকা[৭] করে চিক্
কইল্লা[৮] ভাতোত দিস্ ।
কইল্লা করে ঘাচাউ-ঘাচাউ[৯]
হুনের ছিটা দিস্ ॥

। ৩১১ খ ।

চল্টুং[১০] মোর দতরারে,
কইরো[১১] মুই পায়ু রে ॥
হেইসো বারার ভুকি রে,
ওইঠে[১২] না[১৩] মুই থুইয়ু রে[১৪] ॥

১ করিল ২ ছুঁচোর ডাকের শব্দ ৩ ঘরের মেঝে ৪ গর্ত ৫ বৈবাহিকা ৬ জোলার মাকু ৭ গন্ধ মূষিক ৮ উচ্ছে, করলা ৯ সিদ্ধ না হইবার দরুণ ঘচ্ ঘচ্ করিতেছে ১০ দোতরার তারে ঘা দিলে যে শব্দ হয়। 'চল্টুং' করিয়া শব্দ হওয়া আমার দোতরা ১১ কোথায় ১২ ওই স্থানে ১৩ নিরর্থক ১৪ থুইয়াছি রে।

মাছ-মারা

। ৩১২ ।

কালা মেঘে বরষিলো দেওয়ারে—
কালা মেঘে বরষিলো :
হাড়িয়া কোণের ভিতি[১]
দেওয়া গিরিজিলো—
মাগুর, কই, টাকী মাছ সাজিবা'[২] নাগিল ॥

চিলিমাছ, পুঁঠি মাছ, বেড়ায় সারি সারি :
উই, কাতেলা[৩] মাছ
করে দৌড়াদৌড়ি।
বোয়ালি মাছ দৌড়ায় হালিহালি[৪]—
ভাদই বাড়ীত[৫] কুস্‌সা মাছ
করে ঝাঁপাঝাঁপি ॥

দেওয়ায় করে হিরির-গিরির
আকাশে জ্বলে বাতি।
জল ছাড়িয়া মাছ
ডাঙাত করে খেলাখেলি ॥

ঝোঁকা[৬] নিলে, জাল নিলে
কান্ধত[৭] করিয়া ;
মাছ মারিবা' যায় চেঙ্গেড়া-বুড়া
দৌড়াদৌড়ি করিয়া।
আলির গোড়ত[৮] বোয়ালি মাছক
ফেলালে[৯] ধরিয়া ॥

১ বায়ু কোণের দিকে ২ সাজিবার ৩ রুই, কাতলা ৪ অনেক অর্থে ৫ আউশ ধানের ক্ষেতে ৬ মাছ মারিবার জন্য বাঁশের তৈরী সরঞ্জাম বিশেষ ৭ ঘাড়ে ৮ ধানের আলির নিকটে ৯ ফেলিল।

কাঠ-কুড়ানো

। ৩১৩ ।

বেলাটা যাছে গড়িয়া[১],
চট্ করিয়া দে খোরাক[২] করিয়া।
মুই যা'ম[৩] খড়ি কাটিবা'[৪] ॥

। ৩১৩ ক ।

আজি চল্ যাই, চল্ যাই,
গে বাই,[৫],
চল্ যাই পাঙ্গার নদী[৬]।
আজি পাঙ্গার নদীর দীঘল গে জঙ্গল—
বাই, মুনিয়া কাটেন খড়ি[৭] ॥
খড়ি কাটিনো বেছা গে বেছি[৮]
বাই, ছাড়িমো বট-পাখিড়ি ॥[৯]

চরকা-কাটা

। ৩১৪ ।

চের্খা গে কাটেছু[১০],—
নিন্দে গে টুপেছু[১১],
উল্টিয়া-পাল্টিয়া গে পড়েছু[১২] ॥
বাড়ীর পাছ-পাখোত[১৩]
কাঁয় বা বাজাইল্ সুড়সুড়ি[১৪],—
মনটা কইরে[১৫] ছাতুছান[১৬]।
আউনাইল্ মোর সুতার খ্যাওখান[১৭] ॥

১ গড়াইয়া যাইতেছে ২ খাদ্যদ্রব্যকে 'খোরাক' বলে ৩ যাইব ৪ কাটিবার, কাটিতে ৫ দিদি ৬ জলপাইগুড়ির একটি নদী ৭ ছোটা ছোটো গাছের ডাল-'খড়ি' ৮ বাছিয়া বাছিয়া ৯ বট-পাকুড় ইত্যাদির ডাল ভাত রাঁধিবার জন্য পোড়াইতে নাই। এইজন্য এইগুলি ছাড়িয়া দিব। 'খড়ি' কাটিতে যাইবার সময় ছোটো বা বড়ো বা-কে বলিতেছে ১০ চরকা কাটিতেছি ১১ ঘুমে ঢুলিতেছি ১২ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া যাইতেছি ১৩ পিছন দিকে ১৪ কে বা শিস্ দিল ১৫ করিল ১৬ ছত্রখান, উন্মনা ১৭ খেই-টা।

। ৩১৪ ক ।

এক পাইসার[১] নিছা মাছ[২] গে
নাই দিলো[৩] আন্দিয়া ;
চোপরাতি মারিম তোক
কোয়ারি বান্ধিয়া[৪] ॥
বান্ধ বেটী, বান্ধ,
দাড়ী ধরিয়া টান।
বা-কুমকুম্ করেছে চরখা
গান শুনিয়া যান ॥

। ৩১৪ খ ।

সজনী গে, শুনিয়া এতো আতি
চরখার গুনগুনি,
কোন্ বা নিরাশী বলে রে—
চরখার নাই মোর জুত।
চরখার গোড়ত কাটিয়া দেও মুই
তারে ভাতার-পুত ॥
রে ভগোমান-জগোবান,
হঁকা[৫] আন, তাংকু[৬] আন্
চুনচুনাতি[৭] আন্, দা-বোসিলা[৮] আন্—
কুড়াল, খোন্তা আন্,—
নাগিয়া চাপিয়া বসিস্ রে :
এতো আতিত কোন্ নিরাশীর
চরখা গ্যান্-গ্যান্ করে ॥
কোন্ বা নিরাশী বলে রে
চরখার কামাই থোড়া—
রে মোর চরখার কামাই থোড়া :
চরখার জোরত আগাহাল কিনিসু[৯]
দুয়ারত বান্ধিসু ঘোড়া ॥

১ পয়সার ২ ছোটো চিংড়ি মাছ ৩ না দিলি ৪ দরজা দিয়া ৫ হুঁকা ৬ তামাক ৭ চুন ইত্যাদি ৮ বাঁশ ইত্যাদি কাটিবার জন্ত ছোটো কোদালাকৃতি অস্ত্র বিশেষ ৯ হাল কিনিয়াছি অর্থাৎ জমি বাড়াইয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

॥ ওঝালি ॥

। ৩১৫ ।

ওই খ্যাওটাক[১] বান্ধোঁ রে[২] ছান্দোঁ রে[৩]—
কারুণা হুষিয়া[৪] খ্যাওটাক বান্ধোঁ রে ;
ওই নেন্দুরকানি[৫],—
উত্তরের খ্যাওটাক আনিছু বান্ধিয়া গে,
ওই নেন্দুরকানি ॥
ওই নেন্দুরকানি—
পূবের খ্যাওটাক আনিছু বান্ধিয়া গে,
ওই নেন্দুরকানি ॥
পছিমের খ্যাওটাক আনিছু বান্ধিয়া গে,
ওই নেন্দুরকানি ॥
ওই নেন্দুরকানি—
দক্ষিণের খ্যাওটাক আনিছু বান্ধিয়া গে,
ওই নেন্দুরকানি ॥
ওই নেন্দুরকানি—
আকাশের খ্যাওটাক আনিছু বান্ধিয়া গে,
ওই নেন্দুরকানি ॥
ওই নেন্দুরকানি—
পাতালের খ্যাওটাক আনিছু বান্ধিয়া গে,
ওই নেন্দুরকানি ॥
ওই খ্যাওটাক বান্ধোঁ রে, ছান্দোঁ রে
কারুণা হুষিয়া খ্যাওটাক বান্ধোঁ রে ॥

১ অপদেবতাটিকে ২ বাঁধিরে ৩ কথার কথা মাত্র, অর্থ নাই ৪ উহার দোষ দেখিয়া, করুণা করিয়া ৫ ইঁদুর। 'টি' এই অর্থে 'কানি'।

॥ ধুয়া ॥

আজি গে কালী, তোর জলম[১] হইল্ গে, জলম হইল্ ।
আজি গে মাশান ঠাকুর, তোর জলম হইল্ গে জলম হইল্ ।
আজি গে তিস্তাবুড়ী, তোর জলম হইল্ গে, জলম হইল্ ।
বাড়ীরো বিষহরি, তোর জলম হইল্ গে, জলম হইল্ ।
আজি গে গাঁয়ের গারাম[২], তোর জলম হইল্ গে, জলম হইল্ ॥
স্থাও, তুই শান্তি নে[৩] রে,
শান্তি নে,—
এই গুণীয়ার হাতে ।
এই বান্দাক ছাড়িয়া দিয়া
যা তুই কবিলাসোক নাগিয়া[৪] রে ॥

॥ মন্ত্র ॥

উমুকি-ঝুমুকি বাজে—
না জানি বামোনতি কালী
কু-মঙ্গলে সাজে ॥
চান্দেরো ঝিকিমিকি
সুজ্জেরো ঘাও[৫],
ধাও কি ধাও—
ফেম্না-র[৬] অষ্টং দেহা[৭] ছাড়িয়া
দক্ষিণে যাও ॥

১ জন্ম ২ গ্রাম দেবতা ৩ স্থির হ' ৪ কৈলাসের প্রতি ৫ সূর্যের রশ্মি ৬ এইখানে যাহার রোগ হইয়াছে, তাহার নাম বলিতে হয় ৭ অষ্টঅঙ্গ ।

॥ ধুয়া ॥

আজি গে কালী, তোর জলম হইল্,
গে জলম হইল ॥

॥ মন্ত্র ॥

খাটোখুটো মাশান,
তোর শ্যাম্-শ্যাম্ দাড়ী[১]।
যারে মাশান তোর, বাপোর বাড়ী ॥
চিঙ্কা-কালিকা-বারিকা-মাশান[২]
যা তোর বাপের বাড়ী ॥
যদি আসিবো ঘুরিয়া,—
শঙ্করের দহাই দেছুঁ
নাগিবে বেড়িয়া ॥

॥ ধুয়া ॥

আজি গে মাশান ঠাকুর, তোর জলম হইল্,
গে জলম হইল্ ॥

॥ মন্ত্র ॥

নান্দা হাতে[৩] নামিল্—
ছেদেনী-মেছেনী-তিস্তাবুড়ী-বুড়াবুড়ী[৪]
অঙ্গে নিয়া ছাতি[৫]।
এই পূজা খায়য়া
ভক্ত ভালে হলে ফুলো-জলো দিয়া
পূজা করিবে তোর ॥

॥ ধুয়া ॥

আজি গে তিস্তাবুড়ী, তোর জলম হইল্,
গে জলম হইল্ ॥

১ লম্বা লম্বা দাড়ী ২ বিভিন্ন নামীয় মাশান ঠাকুর ৩ নন্দন হইতে ৪ বিভিন্ন নামীয় তিস্তাবুড়ী ৫ তিস্তাবুড়ীর মাথার ছাতা।

॥ মন্ত্র ॥

চন্দ্রখেড়ী[১] বিনাসুতায় বান্ধিছু হাতে
থাক বিষহরি মোর পাটে[২] ।
ফেন্না-র অষ্টং দেহা ছাড়িয়া
যা শিবের কবিলাসোক নাগিয়া ।

॥ ধুয়া ॥

বাড়ীরো বিষহরি[৩], তোর জনম হইল্,
গে, জনম হইল্ ॥

॥ মন্ত্র ॥

শিবের শক্তি-বীজে নাম
বীজের শক্তি শিবে নাম ।
শিবশঙ্কর গদাধর—
আজি রে গাঁয়ের গারাম সইন্ন্যাসী[৪]—
ফেন্না-র অষ্টং দেহা ছাড়িয়া
দক্ষিণে চল্ ॥

॥ ধুয়া ॥

আজি গে গাঁয়ের গারাম, তোর জনম হইল্,
গে জনম হইল্ ॥

১ চন্দ্রখড়, উলুখড়, কাশ ২ গৃহে, প্রতিষ্ঠিত স্থানে ৩ গৃহদেবীরূপী বিষহরি । বিষহরি গৃহদেবী রূপে প্রত্যহ গৃহে পুজিতা হন ৪ গ্রামদেবতা বিশেষ । যাঁহার নিকট হইতে গানখানি সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার মতে গারাম ত্রিবিধ । 'ঢেনা গারাম', 'সইন্ন্যাসী গারাম' এবং 'শালেশ্বরী মহারাজ' । 'ঢেনা গারাম' অবিবাহিত যুবকদের উপাস্য । 'সইন্ন্যাসী গারাম' এর বাহন হইল হাতী । ইনি গৃহস্থদের উপাস্য । ব্যাঘ্রবাহী ব্যাঘ্রদেবতা হইলেন, 'শালেশ্বরী মহারাজ ।' শিকার বা অন্য কোন ব্যাপারে জঙ্গলে প্রবেশের পূর্ব্বে ইহার পূজা হয় । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মানতপূজা ছাড়া, এই সকল গারামদের বার্ষিক পূজা সমগ্র সমাজের তরফ হইতে বৎসরে করা হয় দুইবার—আষাঢ় ও অগ্রহায়ন মাসে । অর্থাৎ ধান্য রোপণ ও কর্তনের পূর্বে ।

সৃষ্টিতত্ত্ব

নাই জলো, নাই থলো[১]
নাই তোর-হে[২] আকাশ।
এ ছিরি-মণ্ডপে[৩] নাই তোর
ছিরি কবিলাস[৪] ॥
জলে-থলে বাসমাতা[৫]
ভাসে একাশর[৬]।
পাতিলে ছিরিষ্টি—
কূর্মের বুকত করিল্ থামানী[৭] ॥

নামানি

উপরে দেখুঁ ফাই আর ফুই[৮]—
তলত দেখুঁ কালী আর মুই ॥
সাইঙ্গের কালী[৯] সাইঙ্গে আসিবো[১০]—
আহাবনের কাথাগিলা[১১] আনিয়া জোগাবো ॥
সত্[১২] কয় সতী, মিছা কয় পাপী।
সইত্য কাথা ছাড়িয়া মিচ্ছা কাথা কবো—
দোহাই শিবের মাথা খাবো ॥
... ...
স্বর্গে ছিল ডাকিনী —
মক্কে[১৩] দিয়া পাও,—
মোর ঘটত[১৪] আসিয়া নহরী খেলাও[১৫]।
ভালো মন্দ কাথা গিলা মেছেনী,
আনিয়া জোগাও ॥
সত্য কয় সতী, মিছা কয় পাপী।
সইত্য কাথা ছাড়িয়া মিচ্ছা কাথা কবো—
ঈশ্বর স্বর্গের মাথা খাবো ॥

১ জল নাই স্থল নাই ২ তোরই ৩ শ্রীমণ্ডপে ৪ শ্রীকৈলাস ৫ বসুমাতা ৬ একাকার ৭ কূর্মের বুকে প্রথম সৃষ্টির পত্তন করিলেন ৮ ধু ধু করা শূন্য ৯ জাগ্রত কালী ১০ জীবন্ত হইয়া আবির্ভূতা হইবি ১১ গায়ক ইহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি,—'প্রশ্নের উত্তর' এই অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে 'আহবনীয়' শব্দের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহাও ভাবা দরকার ১২ সত্য ১৩ মর্ত্যে ১৪ মোর ঘটে, দেহে ১৫ লহরী খেল, অর্থাৎ ঢেউ তোল, ভর কর।

॥ গান ॥

পূবে না হাংকিনু[১] কালী,
ধনী[২] গে, পছিমে চলি' যা।
পূজাপানি[৩] হাতত নিয়া,
কারুণাক[৪] নেস্তার[৫] দিয়া,—
শিবের কাছে যা॥

॥ মন্ত্র ॥

দেবী গেইছে[৬] ফুল বাড়ী[৭]
কালী আছে শুইয়া।
'—'[৮] শিবের শাস্তি ফুল
কারুণাক নাগিয়া[৯]॥

॥ গান ॥

কালী, রহ রহ গে।
যেই নাথা[১০] ধরতি[১১]
সেই নাথাতি
শোহো[১২] মোর কালী গে॥

॥ মন্ত্র ॥

ধোল্ ধোল্ ধলিয়া,—
যেই ছাও দান গায়
সেই যায় উড়িয়া॥

॥ গান ॥

আউলিয়া মাথারে বেণী
কান্দিয়া ফিরে মাশান[১৩]।
মাও বড়ো জননী,—
আয় রে মাশান ঘরে আয়॥

১ হাঁকাইলাম, তাড়াইলাম, খেদাইলাম ২ সুন্দরী ৩ পূজার সহচর শব্দ রূপে 'পানি' সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে ৪ যাহার উপর দেবীর করুণা হইয়াছে, তাহাকে। রোগীকে ৫ অব্যাহতি ৬ গিয়াছে ৭ ফুল বাগানে ৮ অশ্লীল শব্দ ছিল। যতো পবিত্র মন্ত্র, ততো অশ্লীল শব্দ ব্যবহৃত হয় ৯ রোগীর জন্য ১০ যেইমতো ১১ ধরিত্রী ১২ শুইয়া থাকোহ ১৩ দেবী মেচেনীর ছেলের নাম মাশান।

॥ মন্ত্র ॥

ওই গাঙ্গো[১] নাম্তে[২] হেকা-বেঁকা[৩]
পইরী নাম্তে রথে।
শিবের হাংকারে[৪] পইরী
চল পথে পথে ॥

॥ গান ॥

পছিমে উলুলাইল্ বাও[৫]
আজি গে গাঙ্গো হুলোসিল্[৬] গাও।
সমুদ্রের পানি লে—
তুলসীর জল,
এই গানে গাঙ্গো রা·অসাতল[৭] ॥

॥ মন্ত্র ॥

স্বর্গে হইল্ পইরী, মর্ত্তে দিয়া পাও
খিয়ালী-পইরী[৮], জৈরী-পইরী[৯],—
ফিরেক মোর মাও।
ফির্ কি ফির্
আজি হাতে খিয়ালী ছাড়িয়া[১০]
স্বপনে হয়া থির ॥

॥ গান ॥

মাও, তোক ডাকায়[১১] পইরী গে
ভাব-কোলঙ্কিনী,—
ছোয়ার খিয়াল ছাড়িয়া আসেক
মোর জননী ॥[১২]

১ বিকৃত অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ২ নামে, অবতরণ করে ৩ আঁকা বাঁকা, বিকৃতাঙ্গ ৪ হুঙ্কারে ৫ পশ্চিম দিকের বাতাস চঞ্চল হইল ৬ দেহ উল্লসিত, রোমাঞ্চিত হইল ৭ রসাতল ৮ স্বপ্ন দেবী ৯ স্বপ্ন দেবী ১০ খেয়াল ছাড়িয়া অর্থাৎ যে রোগীর উপর ভর করিয়াছ তাহাকে অব্যাহতি দিয়া ১১ তোকে ডাকে ১২ ইহার পর একেএকে বিভিন্ন দেবদেবী (যথা, হিঁয়ালপরী, কান্দনাপরী, হাগুড়াপরী, শালেশ্বরী, সইয়াসী গারাম ইত্যাদি)-র আবাহন গান গাওয়া হয়। আবাহনের ভাব ও ভাষা উপরে উল্লিখিত গানের মতোই। অনাবশ্যক বোধে সেগুলি সংকলিত হইল না। ইহার পর সমাপ্তি-সূচক শান্তি সংগীত।

॥ শান্তির গান ॥

ঘরের আগত[১] শিয়াল গে কান্দে—
তিনখান '—' জোড়া গে লাগে ;
বোধ লে[২] ফেন্না[৩] শীগিল্ করিয়া[৪] ।
আজি হাতে[৫] এইঠে[৬]
অহিবো পড়িয়া[৭]—
দোহাই শিবের নাগিবে বেড়িয়া ॥

। ৩১৭ ।

॥ নামানি ॥

ঘরখানি নেপিনু
ধর্মঠাকুর আসি'র বাদে[৮]—
শালেশ্বিরী গাঁয়ের গারাম, তিস্তাবুড়ী[৯],—
নাই আসিল্[১০] কার বা দোষে রে ঠাকুর ॥
ঘরখানি নেপিনু
মাদার সাহেব[৯] আসি'র বাদে,—
আশী হাজার পীর আসে
ফেন্না'র কারণে।
তুই রে খচ্‌পীর[৯] ঠাকুর,
নাই আসিলো কেনে রে –
ফেন্না'র কিবা কর্ম দোষে রে ।
ঘরখানি নেপিনু
সম্পতি[১১] আসি'র বাদে ।
খানেশ্বিরী গইন্নাত মহাকাল[৯],
নাই আসিলো কেনে রে—
ফেন্নার' কিবা কর্ম দোষে রে ॥
হায় রে ঠাকুর,
সেবো[১২] কিবা কর্ম দোষে রে ॥

১ ঘরের সম্মুখে ২ জ্ঞান ধারণ কর্ ৩ যে রোগী, তাহার নাম বলিতে হয় ৪ শীঘ্র করিয়া
৫ আজ হইতে ৬ এইস্থানে ৭ পড়িয়া রহিবি ৮ আসিবার জন্য ৯ বিভিন্ন স্থানীয় দেবদেবী
১০ আসিল না ১১ ধন দেবতা, কুবের ১২ সেবা দিই, পূজা করি ।

॥ বসানি ॥

পুবো না দিকে দিকে
গাড়িনু ঝাণ্ডা[১]—
ধর্মঠাকুর আসি'র বাদে ॥
ধর্মঠাকুর নাই আসিল্
কেন্না'র কিবা কর্ম দোষে ॥

ধাপ দিছুঁ[২] , ধূপ দিছুঁ,
আরো দিছুঁ গুড় ॥
ধর্মঠাকুরের বাদে দিছুঁ
শুকুলো কাপেড়া[৩] ॥

আইসো ঠাকুর, বইসো পাটে,—
স্থাবা নেও[৪] ভক্তের আলোকলতে[৫] ।
স্থাবা পুজা খায়্যা মারেয়াক[৬] দে বর ॥
বছরে বছরে বাড়ে যেন বাড়ীর ভিতর ।
গোয়ালিত গোরু বাড়ুক, ভাণ্ডারিত ধন ।
পুজা পানি[৭] খায়্যা রে ঠাকুর,
মারেয়াক দে বর ॥

১ পতাকা ২ মঞ্চ বা বেদী প্রস্তুত করিয়াছি ৩ সাদা (শুক্ল) কাপড় ৪ পূজা গ্রহণ কর
৫ ভক্তের একাগ্রতায় তুষ্ট হইয়া ৬ যে বাড়ীতে পূজা হইতেছে সেই বাড়ীর গৃহস্থ ও গৃহিণী
৭ পূজা ইত্যাদি ।

॥ সৃষ্টিপত্তন ॥

নাহি জলো, নাহি স্থলো, নাহি তো আকাশ।
এ ছিরিমণ্ডপে[1] নাই ছিরি কবিলাস[2] ॥
ধান-দূবা নাহি ছিল, লক্ষ্মী সরস্বতী।
ঘরেরো গহণী[3] নাই, গঙ্গা ভাগ্যবতী ॥
চাইরো পুখে[4] চাইর পব্বত, মইধ্যে গোঙ্গার ঘর ॥
বাইর হইল্ গোঙ্গামাতা হয়্যা ছত্রেকধর[5] ॥
আগে আগে যায় ভগীরথ শঙ্খধ্বনি দিয়া।
পাছে পাছে যায় গোঙ্গা নিবারণ করিয়া ॥

ও বাছা নিছিলা[6] রে,
ও বাছা নিছিলা রে ॥ ধ্রু ॥
বাপোর কালের কোদাল নিলে
ঘাড়োত করিয়া।
নেলিয়ার কান্দর[7] নাগি'
চলিল হাঁটিয়া ॥
এক ডুব, দুই ডুব, তিনো ডুব দিল,—
তিনো না ডুবের বেলা
পাতাল চলি গেল ॥
পাতালত বসি' আছে বাসুকি ;
'মসি'[8] বলিয়া নিচা ধরিল্ সমন্[9]।
ভক্তি দেয়[10] নিচা বাসুকির চরণ ॥
কোলাত করি' নিচিলাক
লইক্ক চুমা খায় ॥

১ শ্রীমণ্ডপে, পৃথিবীতে ২ শ্রীকৈলাস ৩ গৃহিণী ৪ চারিদিকে ৫ ছত্রধর হইয়া
৬ ছোটো চিংড়ি মাছ ৭ কাবিাক নাম বিশেষ। 'কান্তার' হইতে আসিতে পারে ৮ মাসি
৯ সম্বন্ধ স্থাপন করিল ১০ প্রণাম করিল।

"কুন্‌তি হাতে[১] আসিলো তুই
মোর ভাগিনা—
কি কারণে আসিলো
কিসেরো কারণ।
মোর কাছে কহ তোর বিবরণ ॥"
নিচা বলে,
"মসি, শুনেক মোর কাথা :
ধর্ম্ম পাঠাইছে মোক
মাটিরে কারণ[২] ॥"
তিন চোট মাটি নিলে
পৌটলা করিয়া।
বাহুকিক ভক্তি দিয়া নিচা
উঠিল্ ভাসিয়া ॥
চৈত-বৈশাগের দিনা
প্রখর ওউদ ;
ওউদ্রের তাপে নিচার দেহা
হইসে কালা।
পায়া বিক্ষের ছায়া
ঢুলিয়া পড়ে নিচা ॥
ধর্ম বোলে,
"হুরা, শুনেক সমাচার :
তুই কি জানিস কিছু
নিচার সমাচার।"
একথা শুনিয়া হুরা
করিলে গমন ॥
বিক্ষের তলে নিচা
আছে তো পড়িয়া :

১ কোন দিক হইতে ২ মাটির জন্ত।

কমরত[১] পাও দিয়া মাটি
নিলে তো কাড়িয়া ॥
সেইকিনা[২] মাটি নিলেক
ডাকাতি করিয়া ;
ধর্মের আগতে[৩] মাটি
দিলে তো মিলিয়া[৪] ॥
পৌটলা হারেয়া[৫] নিচা
কান্দে খোপাখোপা[৬] ॥
কান্দিতে কান্দিতে নিচা
করিলে গমন,—
ধর্মের আগতে যায়া
দিলে দরশন ॥
"অইন্দের কাজে গেলে প্রভু
পান-ফুলো[৭] পাই।
তোমার কাজে গেলে প্রভু
জীবনো হারাই ॥"
ধর্ম বোলে,
"নিচা, তুমি না কর ক্রন্দন।
আশুব্বাদ করি—
মরিলে পাতালে তুমি
করিবে গমন।
আর মাছ মরিলে, উঠিবে ভাসিয়া,—
তোর বংশধর মরিলে
যাবে পাতালক নাগিয়া[৮] ॥"
সেইকিনা মাটি গোঁসাই

১ কোমরে ২ সেইটুকু ৩ সম্মুখে ৪ মিলাইয়া দিল, পৌঁছাইয়া দিল ৫ হারাইয়া ৬ ঘনঘন, ভীষণ ভাবে ৭ পুরস্কার ইত্যাদি ৮ চিংড়ি মাছ মরিলে ভাসিয়া ওঠে না,—ডুবিয়া যায়, তাহা নাকি ধর্ম ঠাকুরেরই আশীর্বাদে। চিংড়ি মাছের কোমরে লাথি দিয়া মাটি কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল। তাই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস,—চিংড়ি মাছ ঈষৎ বাঁকা।

CENTRAL LIBRARY

নাড়িবা' নাগিল[১],—
নাড়িতে নাড়িতে গোঁসাই
নওগুলি[২] পাকাইল।
সেইকিনা গুলি গোঁসাই
নও দিকে ফিকিল।
নও পাথে[৩] নও সংসার
ছিষ্টি যে হইল॥

॥ কালীর জন্ম ॥

গে জলম নামিল্[৪],
জলম নামিল্,—
হইল্ দেবী কালী মাই
জলম নামিল্॥
একো মাসের বেলা কালী
ছুইয়ে দিলে পাও[৫]।
চাইরো' না বছরের কালী
দশতে দিলে পাও।
—গে জলম নামিল্॥
বাড়িল্ বাড়িল্ কালীটা
বাপো-মাওর ঘরে।
সরু সুতার কাপড় ফাড়ে[৬]
বাপো-মাওর ঘরে।
—গে জলম নামিল্॥

১ নাড়িতে লাগিল ২ নয়টি গুলি ৩ নয় দিকে ৪ জন্ম লইল, হইল ৫ এক মাস ছাড়াইয়া দুই মাসে পা দিল ৬ যুবতী হইয়া উঠিবার দরুন ছোটো কাপড় ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

॥ পিতার নিকট কালীর মন্ত্র শিক্ষা ॥

এই না[১] গুণ[২] মুই কাক পরখিম্[৩]
রে গুরু বাপ,—
তোমার গুণ এলায়[৪] তোমাক পরখিম্[৫]
—রে গুরু বাপ ॥
সরু-আলি[৬] কদমের তলে
গুণ শিখালো।
হেলানী[৭] কদমের তলে
গুণ মুই পরখিম।
—রে গুরু বাপ ॥

॥ কালী-কর্তৃক ছলনা ॥

রথখানি হাঁকেয়া[৮] দিলে পূর্বকে নাগিয়া[৯]।
পূর্ব দিক থাকি[১০] ফিরি[১১] আসিল্ কালী
শুধামুখী হয়্যা[১২] ॥
রথখানি হাঁকেয়া দিলে উত্তরকে নাগিয়া।
উত্তরদিক থাকি ফিরি আসিল্ কালী
শুধামুখী হয়্যা ॥
রথখানি হাঁকেয়া দিলে পছিমকে নাগিয়া।
পছিম থাকি ফিরি আসিল্ কালী
শুধামুখী হয়া ॥
রথখানি হাঁকেয়া দিলে দক্ষিণক নাগিয়া।
দক্ষিণতিকার[১৩] নোথোলিয়ার ছোয়াক[১৪]
ফেলালে ছলিয়া[১৫] ॥

১ নিরর্থক ২ মন্ত্র, বিদ্যা ৩ কাহাকে পরীক্ষা করিব ৪ এখন ৫ তোমাকে পরীক্ষা করিব ৬ সরু ডালওয়ালা, সুন্দর। 'সরু-আলি' কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ নাই। 'সুন্দর' এই অর্থে ব্যবহৃত। ইহা কাব্যিক শব্দ বিশেষ। বহু গানে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ৭ হেলান দেওয়া, বাঁকা কদম গাছ। ইহারও সুস্পষ্ট কোন অর্থ নাই ৮ হাঁকাইয়া, চালাইয়া ৯ পূর্ব দিকে ১০ হইতে, থেকে ১১ ফিরিয়া ১২ হইয়া ১৩ দক্ষিণদিককার ১৪ রাখালের ছেলেকে ১৫ ছলিয়া ফেলিল।

কিনা বুদ্ধি করে আখোয়াল
কিনা চরিচর[১]।
এখো[২] বুদ্ধি নাই তার
শরীলের ভিতর॥
বিদ্দ্রূপে গেইল্[৩] কালী
আখোয়ালের ঠাঁই।
কি বাদে[৪] বসিয়া কান্দেন
আখোয়াল ভাই॥
ফাড়ার[৫] কর মন্ত্র[৬]
ফড়িঙের দাও বলি।
ঝিনাইর[৭] কর নেফুর তাল[৮]
স্যাবা[৯] দিতে বলি॥

॥ কালীকে পূজাদান ও রাখালের পুত্র-লাভ ॥

ওকি নোলুয়া[১০] হাড়ীরে পাল[১১]—
কতো মিরিংগি[১২] মারো বিজুর বনতে[১৩]॥
বাপোর কালের নল নিলে ঘাড়োতে করিয়া।
লেলিয়ার[১৪] কান্দরক[১৫] নাগি, চলিল্ হাঁটিয়া॥
গাছোতে ছিল ময়রা[১৬] হ্যাটের[১৭] পাখে[১৮] চায়।
ময়রাক দেখিয়া নোলুয়া ছুপুনি পাতায়[১৯]॥
এক নল, দুই নল করি' তিনো নলের বেলা
ময়রা শূন্যে উড়ায়॥
ময়রা উড়িয়া যায়য়া নোলুয়ার দুখ হইল্ মন।
নিজ্পুর বলিয়া নোলুয়া করিলে গমন॥

১ কি আচরণীয়, এই জ্ঞান লোপ পাইল ২ একটুও ৩ বৃদ্ধের বেশ ধরিয়া গেল ৪ কি জন্যে ৫ শোলার ৬ মঞ্জুষা। শোলার মূর্তি এবং শোলার উপর বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র ঝাঁপির আকারে তোলা ৭ ঝর্ঝর, কাঁসর ৮ নূপুর। পূজাকালীন নৃত্য ৯ পূজা ১০ শিকারী বিশেষ ১১ হাড়ীর বংশধর ১২ মৃগ ১৩ বিজন বনে ১৪ 'লেলিয়া' একটি নদীর নাম। তুঃ পূর্ববর্তী গানে 'লেলিয়া' ১৫ কান্তার। লেলিয়ার পাড়ের দিকে ১৬ ময়ূর ১৭ নিচের ১৮ দিকে ১৯ ফাঁদ পাতিল।

CENTRAL LIBRARY

নোলুয়ার দুই ছোয়াক[১] আনে ডাকো দিয়া
গাছেরো উপরে তুলে ছোয়াক অঠৈয়া[২] ॥
এক নল, দুই নল করি' ঘাও[৩] দিলে চড়েয়া[৪] ।
নোলুয়ার ছোয়াক ফেলালে মারিয়া ॥
ভালে ভালে মসং[৫] নিলে টুকুলি করিয়া[৬] ।
করিলে গমন নোলুয়া নিজ্‌পুর বলিয়া ॥
তিনোগটো[৭] নারিকল টিহিরা করিয়া[৮] ।
আন্ধনো চড়ালে নোলুয়ানী চণ্ডীক স্থহরিয়া[৯] ।
একশো পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ফেলালে আন্ধিয়া ॥
মাঝিয়ায়[১০] বসেয়া দিলে পাঁচখান পাত ।
দেবীকালী, চণ্ডীকালী, হাওয়াকালী,
তিস্তাবুড়ী, ভদ্রকালী-পাঞ্চ বহিনি[১১] বসিল্‌ সারি সারি ॥
নোলুয়াক ডাকেয়া কাথা বলে মাও কালী :
"ন্তাখ্‌, ন্তাখ্‌, নোলুয়া পূর্ব দিকে ধায়য়া ।"
নোলুয়ার দুই ছোয়া আসে হাসিয়া-খেলিয়া ॥
দুই ছোয়াক দেখি' নোলুয়ার মনে হইল সুখ ।
দুই কলাত[১২] দুই ছোয়ার মুখ্‌খে[১৩] দেয় চুমুক[১৪] ॥
চিনিহু চিনিহু এ্যায়[১৫] বড়য় সতী ।
মড়া ছোয়াক জিয়ায় দিলে বাপোর ঠাকুরাণী[১৬] ॥

১ ছেলেকে ২ উঠাইয়া ৩ আঘাত ৪ আঘাত হানা এই অর্থে 'আঘাত চড়ানো' ৫ মাংস ৬ টুকরা করিয়া ৭ তিন গোটা, তিনটি ৮ তিনটি নারিকেল দিয়া উনুনের তিন মাথা তৈয়ারী করিয়া ৯ স্মরণ করিয়া ১০ ঘরের মেঝেতে ১১ পাঁচ বোন গ্রাম দেবীরূপেও পূজিতা হন ১২ দুই কোলে ১৩ মুখে ১৪ চুমু ১৫ ইনি ১৬ শ্রদ্ধাস্পদা মহিলাকে 'ঠাকুরাণী' বলা হয় । ইনি এতো বড়ো শ্রদ্ধাস্পদা যে, পিতারও শ্রদ্ধার পাত্রী ।

॥ মাশানের জন্ম ॥

জলম জলম করিস গে কালীমাই,
জলম তোমার গে ভাল্[১]।
তোর জলমের কাহিনী গে মাই
শুনেক মোরে ঠাঁই[২] ॥

॥ ভাঙ্গন ॥

সগারে[৩] হালুয়া[৪] হাল বয়হা[৫]
আসিল্ গে মাই,—
মোর হালুয়া আজি কেনে এলাও[৬] আসিল্ নাই ॥
গোরু দুইটা আছে মাই গে ধর্মক স্মহরিয়া[৭] ॥
মোর হালুয়ার এলাও কেনে মুখ দেখুঁ না[৮] ॥
কহিতে কহিতে কালীমাইর প্যাটের বিষ উঠিলো।
হেম্-সম্[৯] তোর রে মাশান[১০] জলম হইলো ॥
গে মা কিসোত[১১] কি কাম করলো মাই
কিসোত কি কাম করলো,
না বুঝিয়া ধর্মের সঙ্গে এ ভাব বাড়ালো[১২] ॥
নিশিরে[১৩], কি করেছিত[১৪] নিশিরে, তুই নিচন্তে[১৫] বসিয়া।
যা কেনে ধাই-মা-কেনাক[১৬] আন্ কেনে ডাকেয়া[১৭] ॥
কতেক ছাড়ি' নিশিবুড়া কতেক দূরে গেইল্।
ধাইমা-কেনাক যায়য়া ডাকেয়া আনিল্ ॥
নাড়ী না কাটিয়া নাড়ীর করে থাক।
নাড়ীর উপর চড়ি' ছাখেক বেরুবাড়ীর হাট ॥
এক নাড়ী জলে ফ্যালেয়া যে দিল।
কলমু শাক হয়া নাড়ী ভাসিতে নাগিল ॥
ভাদর মাসে কলমু শাক যেবা জন খায়।
মাশানের নাড়ী সে অবশ্য চবায়[১৮] ॥

১ ভালো ২ আমারই নিকটে ৩ সকলেরি ৪ সাধারণ অর্থে যে হাল বহে সেই 'হালুয়া'। অধিকাংশ গৃহীই হালচাষ করে এবং ইহাই প্রধান পেশা। এই জন্য কথাটি ব্যাপকার্থে 'স্বামী' রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৫ বহিয়া ৬ এখনও ৭ স্মরণ করিয়া ৮ দেখি না ৯ এমন সময়ে ১০ মাশান ঠাকুর ১১ কিসে ১২ ভাব করিলি ১৩ নিশি ঠাকুর ১৪ কি করিতেছিস ১৫ নিশ্চিন্তে ১৬ ধাই-মাকে ১৭ ডাকিয়া ১৮ চিবায়।

॥ ঝিমিলার জন্ম ॥

ইষির ঘরে[১] জন্ম হইল্ ঝিমিলার।
ইষি ছিলো যুগের ভাঙ্গা-ভাঙ্গী[২]॥
ছান করিতে গেইসে ইষি
সাগরেরো কুলে।
ঝিমিলা যায় মাটির পাইলাত ভাসি[৩]।
পাইলা খুলিয়া পাইল্ ব্যাটাখানি॥

ব্যাটাক ধরিয়া ইষি করিলে গমন।
নিজো বাড়ীত যায়া দিলে দরশন॥
ইষি বোলে, ইষিরাণী শুনেক দিয়া মন।
নেত-খেত কাপড় দিয়া বান্ধেক দুই থন[৪]॥
নগরেতে বেড়ায় রাণী গর্ভবতী হইয়া।
কৌতরের অক্ত খুটার পুতুলে আখে মাখিয়া[৫]॥
গ্রামের মানুষি করে কানাকানি।
কুন্‌দিয়া[৬] বসিল্ দেওয়া নিয়য় না জানি[৭]॥
ইষির ঘরে জন্ম নিলে ঝিমিলাগুড়ি।
মারেয়াক ডাকেয়া[৮] ঘোটত[৯] দাও পানি॥

১ ঋষির ঘরে ২ ঋষি ও তাঁহার পত্নী দুইজনেই বাজা ছিলেন ৩ 'পাতিলে' ভাসিয়া। ঝিমিলা আসলে কানীন পুত্র। লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য তাহার মা তাহাকে হাঁড়ীতে ভরিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল ৪ ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি দিয়া ঋষি পত্নীকে স্তন সুপুষ্ট করিতে বলিলেন ৫ একটি কাষ্ঠখণ্ডে কবুতরের রক্ত মাখাইয়া রাখিল ৬ কোনদিক দিয়া, কেমন করিয়া ৭ হদিস পাইনা ৮ ডাকিয়া ৯ ঘটে।

CENTRAL LIBRARY

॥ ঝিমিলার শৈশব ও যৌবন ॥

পঞ্চ মাসের বেলা ঝিমিলার হাতে দিলে খড়ি।
দশো মাসের বেলা ঝিমিলা খেলায় হামাগুড়ি ॥
বারো না মাসের বেলা পাও দিলে দুয়ারে।
দিনে দিনে বাড়ে ঝিমিলা বাপো মায়ের ঘরে ॥
বারো বৎসর হইল ঝিমিলার. লেখাপড়া করে।
ষোলো বৎসরের বেলায় বিভার[১] আয়োজোগ[২] করে ॥
ইষি বোলে, ইষিরাণী, শুনেক দিয়া মন।
বিভার লাক[৩] হইসে[৪] বেটা, বিভার করি জঠন[৫] ॥

॥ ঝিমিলার বিবাহের আয়োজন ॥

হস্তে করি,নিলে ইষি নাসিকার শর[৬]।
পথমে প্রেবেশিল[৭] যায়া পূবো না শহর ॥
স্যাও দিকের[৮] কইনা ইষির মনে নাহি খায়[৯]।
নগতের দোসরক ডাকিয়া[১০] সকল কাথা কয় ॥
অহতিকার[১১] কইনা ইষির মনে নাহি খায় ॥
হস্তে করি'নিলে ইষি নাসিকার শর।
তারপর প্রেবেশিল যায়া উত্তরো না শহর ॥
উত্তরতিকার কইনা বাম চক্ষু কানী।
কইনা দেখিবা' যায়া পন্থে আসিল পানি[১২] ॥
নগতের দোসরক ডাকেয়া সকল কাথা কয়।
অহকিতার কইনা ইষির মনে নাহি খায় ॥
হস্তে করি'নিলে ইষি নাসিকার শর।
তারপর প্রেবেশিল যায়া পছিমো না শহর ॥

১ বিবাহের ২ আয়োজন ৩ বিবাহ-যোগ্য ৪ হইয়াছে ৫ বিবাহের সম্বন্ধ করি
৬ নাকের মতো বাঁকানো (টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো) লাঠি। সাচীকৃত যষ্টি
৭ প্রবেশ করিল ৮ সেই দিকের ৯ পছন্দ হইল না ১০ সঙ্গের লোসরকে ডাকিয়া
১১ ওই দিককারও ১২ কন্যা দেখিতে যাইয়া কাহারও কোন বিপদ বা অসুবিধা হইলে, সেই কন্যাকে অলক্ষণযুক্তা বলিয়া মনে করা হয় এবং তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়না।

পছিমতিকার কইনার কোপালে সিন্দুর।
থপা ঝাড়িতে পড়ে ছয় কুড়ি নেন্দুর[১] ॥
নগতের দোসরক ডাকেয়া সকল কাথা কয়।
অহতিকার কইনা ইষির মনে নাহি খায় ॥
হস্তে করি' নিলে ইষি নাসিকার শর।
তারপর প্রেবেশিল যায়া দক্ষিণো শহর।
দক্ষিণতিকার কইনার কাথা কি কহিমো আর।
অকুমারীতে[২] কলঙ্ক উঠিসে[৩] সাতবার ॥
পূব-পছিম-উতর-দক্ষিণ আসিল ঘুরিয়া।
কোনো পাখে[৪] কইনার খোঁজ না পাইল খুঁজিয়া।
কইনা না পায়া ইষি ফিরিয়া যায় ঘর।
মাঝ পথে বামুনতির নগত[৫] হইল্ দরশন ॥
ইষি বোলে, দোসরের ঘর[৬], শুন মন দিয়া।
কার ঘরের কইনা শুধাও তো পুছিয়া ॥
এ কাথা শুনিয়া কইনা শরমে মাথা নাহি তুলে ॥
আগে আগে যায় কইনা, পিছে চলে ইষি।
কইনার বাড়ীত যায়া হইল্ অবস্থিত ॥
"তোমার ঘরে কইনা আছে, হামার[৭] ঘরে বর।
তাক দি'[৮] বিভা দিতে চাই নগরের ভিতর ॥"
"নাই খামো টাকা কড়ি, নাই খামো গুয়া।
তোমার সঙ্গে সমন্ করিম শুন মন দিয়া ॥"[৯]...

১ নেংটি ইঁদুর ২ কুমারীকালে ৩ উঠিয়াছে ৪ কোনও দিকে ৫ সঙ্গে
৬ বহুবচনাত্মক 'রা' বুঝাইতে 'ঘর' ব্যবহৃত হয়। দোসরেরা। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে একজনকে বুঝাইতেই বহুবচনাত্মক প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে ৭ আমাদের ৮ তাহাকে দিয়া, তাহার দ্বারা, তাহার সঙ্গে ৯ বামুনতির পিতার উত্তর। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী কন্যার পিতাই পণের টাকা পাইয়া থাকে। বিবাহ সম্বন্ধ যেদিন পাকাপাকি রূপে স্থির হয়, সেইদিন দুই পক্ষ পান-সুপারি বিনিময় করিয়া থাকে। ইহাকে 'গুয়া-কাটা' অনুষ্ঠান বলে। বামুনতির পিতা বলিতেছে, তোমার নিকট হইতে পণের টাকাও লইব না, গুয়াও খাইব না।

CENTRAL LIBRARY

॥ বামুনতির আবাহন ॥

ও মোর কালী গে কালী—
তুই কালী মোর আন্ধার করলো গে কালী[১]
আজ বামোত-বামোত[২] পাড়ু গে ডাক
ও মোর মেছেনী নাই মোর ঘরে।
আজি বামোত-বামোত পাড়ু গে ডাক
ও মোর কালোনী[৩] নাই মোর ঘরে ॥
আয় বামোত মোর পূজাকে নাগিয়া[৪]
গে বামোতিরিয়া[৫] ॥

॥ বিবাহের জন্য ঝিমিলার সওদা ॥

দশো-বিশো টাকা নিলে[৬] আঞ্চলে[৭] বান্ধিয়া।
শ্রীকইল্লার হাট[৮] নাগি' চলিল্ হাঁটিয়া ॥
হাড়ীর ঘরের চাইলন বাতি[৯], মালীর ঘরের শোলা।
বামুনতির বাদে কিনি' নিলেক শুকুল কাপেড়া ॥
ধাপ নিলেক, ধুপ নিলেক, আরো নিলেক গুড়।
বামুনতির বাদে কিনি' নিলেক একামো সিন্দুর ॥
কতো না খরচ[১০] নিলেক এ ভারো বান্ধিয়া।
নিজো বাড়ী বলি' ঝিমিলা চলিল্ হাঁটিয়া ॥
যতো না খরচ নিগেয়া[১১] ঝিমিলা আখে[১২] সারি সারি[১৩]।
শাগাই-সোদরক[১৪] ডাকেয়া ঝিমিলা সাজাইল্ বৈরাতী[১৫] ॥

১ তুই কালী আমার জীবন অন্ধকার করিয়া দিলি ২ বামুনতি দেবী ৩ কালী ৪ পূজা স্থানে এসো ৫ বামুনতি। ছন্দ-সঙ্গতির জন্য 'তিরিয়া' ব্যবহৃত হইয়াছে ৬ লইল ৭ আঁচলে ৮ কাল্পনিক স্থান বিশেষ ৯ চালুন বাতি ১০ জিনিস-পত্রাদি ক্রয় করাকে 'খরচ করা' বলা হয়। বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ১১ লইয়া ১২ রাখে,রাখিল ১৩ অনেক জিনিস সাজাইয়া রাখিল—এই অর্থে ১৪ আত্মীয়-স্বজনাদিকে ১৫ বরযাত্রী। স্থানীয় নিয়মানুযায়ী পুরুষ বরযাত্রীদের সহিত কয়েকজন মেয়েও এয়ো রূপে যাইয়া থাকে। সাধারণত ইহাদেরই 'বৈরাতী' বলা হইয়া থাকে।

CENTRAL LIBRARY

॥ 'বৈরাতী' হইবার জন্য জনৈকা পড়শীর বায়না ॥

বাপোই রে, হে বাপোই।
বিহো[১] করলো, মোক নিগালো[২] কই॥
মোক যদি নিগালো হয়[৩]—
ধান-চুঁড়া ভুকাম্থ হয়[৪];
হাউসে-অঙ্গে[৫] দুইখান গান গা'ম্থ হয়[৬]॥
তোর বিহোর বড়য় আশা
ছিলো রে বাপোই।
নালো খাড়ীখান পিন্দিয়া[৭],
গোরুর গাড়ীত চড়িয়া,
হাউসে-অঙ্গে বৈরাতী গেম্থ হয়[৮] রে বাপোই॥

॥ ঝিমিলার বিবাহ-যাত্রা : বামুনতির সহিত বিবাহ ॥

গে কাঁয় কাঁয়[৯] যাবেন
ঝিমিলার বৈরাতী।
গে মাই,
কাঁয় কাঁয় যাবেন ঝিমিলার বৈরাতী॥
ওই আগা ঘার[১০] পাছা ঘরে
দিয়া গেইল্ পাত।
কাহো খালে[১১] দহি-চুঁড়া
কাহো খালে ভাত॥
গে মাই,…

১ বিবাহ ২ আমাকে লইলি ৩ আমাকে যদি লইয়া যাইতি ৪ ধান ভানিতাম, চিড়া কুটিতাম ৫ রঙ্গ-কৌতুকে ৬ গান গাহিতাম ৭ লাল শাড়ীটি পরিয়া ৮ যাইতাম ৯ কে কে ১০ সম্মুখের ঘরে। 'পূর্ব দিক' অর্থেও নেওয়া চলে ১১ কেহ খাইল।

দেবী সাজে, কালী সাজে
কুকুতিকার হালা[১],—
গে মাই,...
তেলি সাজে, মালী সাজে
ধপা আর নাউয়া[২]।
অধিকারী[৩] সাজে
বগলে পাঞ্জি নইয়া॥
গাড়িল্ থমোকা গাছ[৪]
উপরে দিলে চালা।
ডাহিন বাঁও করিয়া বোসাইল্
বামুনতি-ঝিমিলা॥
ঘোটের জল দিয়া
করে ছিটাছিটি।
দেখায় সারি-সারি
চামি-কুলার আরতি॥
এই না পন্থে গেইল্ মোর
মাঝিয়া-জোলী[৫] গে মাই।
মাঝিয়া আন্ধার মোর
করিলো গে মাই॥

১ কোথাকার। 'হালা'-র অর্থ পাই নাই ২ ধোপা আর নাপিত ৩ পুরোহিত ৪ কলা গাছ গাড়িল ৫ রূপের ছটায় যে ঘরের মেঝে আলাইয়া রাখিত।

॥ ঝিমিলা-বামুনতির গার্হস্থ্য জীবন : মাছ-মারা ॥

বাপের কালের জাল-ছিটি[১] নিলে ঘাড়োতে করিয়া।
নেলিয়ার কান্দরক নাগি' চলিল হাঁটিয়া ॥
প্রথমেতে জাল ফেলায় ধর্মক সুহরিয়া[২]।
টান দি' অঠায়[৩] ঝিমিলা সুধু গাঙ্গের পানি ॥
তার পরে জাল ফেলায় শিব সুহরিয়া।
মাছ নাই থার[৪] নাই শুধু গাঙ্গের পানি ॥
মাছো না মারিতে ঝিমিলার পহরেক হইল বেলা।
ঝিমিলার আন্দিশে[৫] বামুনতি চলিল হাঁটিয়া ॥
কতকদূর যায় বামুনতি কতক পন্থ পায়।
আগত যাছে গোরু-নোখোয়াল ডাক দিয়া কয় ॥
বামুনতি বোলে, "আখোয়াল, শুনেক মোরে ভাই।
নেলিয়ার কান্দর মুই কুন পন্থে যাই ॥"
বামুনতির কাথা শুনি' দিলে ঘাটা দেখেয়া[৬]।
নেলিয়ার কান্দর বামুনতি উপনীত হইল যায়া ॥
আপেনকার নাম নিয়া ঝিমিলা জলে ফেলায় জাল।
মাছ নাই, থার নাই, শুধু গঙ্গার জল
মাছখান নাই পায়া ঝিমিলার মনে হইল আগ[৭]।
কাটিয়া কাঁচা কঞ্চি বামুনতিক নাগাইল বেড়া-বেড়ি কোপ[৮] ॥

॥ বামুনতির ক্রন্দনে পড়শীদের সান্ত্বনা ॥

বামুনতি, চোপ্ গে চোপ্,—
কাঁচা কঞ্চি দিয়া মারে[৯] তোক।
বামোত[১০], চোপ্ গে চোপ্ ॥

১ জাল ইত্যাদি ২ স্মরণ করিয়া ৩ টান দিয়া উঠায় ৪ শেওলা জাতীয় ঘাস বিশেষ। তুঁতুপ ৫ উদ্দেশে ৬ পথ দেখাইয়া ৭ রাগ হইল ৮ এলোপাতাড়ি প্রহার ৯ মারিল
১০ বামুনতি-কে আদরে 'বামোত' বলা হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ বামুনতির মাছ-মারা ॥

স্বামীর হাতের জাল-ঝাটি নিলেক নিজের হাতে করিয়া।
জলে জাল ফেলায় বামুনতি ধর্মক সুহরিয়া॥
নদীরে[1] ভিলিঙ্গি মাছ[2] নাগিল, সারি সারি[3]।
চন্দন-কুরুসা মাছ ফেলায় পাক দি'॥
উই, কাতেলা অঠায় বামুনতি নেথায়-জোথায় নাই॥
যতো না মাছ[4] মারিয়া করিল, ভার চারি।
স্বামীর ঘাড়ে মাছ দিয়া বামুনতি চলিল, বাড়ী॥

॥ ঝিমিলার বেসাতি : বামুনতির প্রতীক্ষা ॥

মাছো নিয়া ঝিমিলা হাটের পাখে[5] ধায়।
হাটো হইসে[6] গুম্-গুম্, বাজার হইসে শেষ॥
হেম্-সম্[7] ঝিমিলা যায়া উপস্থিত হইল্॥
যেমনকার মাছ ঝিমিলা সেমন করিয়া আথে।
মান্‌ষি-জন নাই হাটোত কেনং করি' বেচে॥
দিন গেইল্, আতি হইল্ পহরেক হইল্ দেরি।
সেলায়[8] বামুনতি কান্দে ঘরতে বসি'॥

॥ বামুনতির নারী-জন্মের দুঃখ : সংসার-জ্বালা ॥

আন্ধার আতি[9] গে মোর
দূরের গে পথ।
ঝিমিলা নহিল্[10] মোর শ্রীকইন্নার হাটত॥
মুই নারী এখেলা ঘরে—
কেমনে যাইম মুই ঝিমিলার খবরে।
কান্দু[11] নারী মুই ঘরত বসি'—
দুই চইক্ষের মোর পড়ে পানি।
এতয়[12] জ্বালা সহা না যায় রে বিধি॥

১ নদীর ২ মাছ বিশেষ ৩ ঝাঁকে ঝাঁকে পড়িল ৪ সব মাছ ৫ দিকে ৬ হইয়াছে ৭ হেন সময়ে ৮ তখন ৯ রাতি ১০ রহিল ১১ কাঁদি ১২ এতোই।

CENTRAL LIBRARY

এতয় দুঃখ ছিল
নারীর কোপালের উপর।
দুঃখের সীমা নাই রে আর
ঝরে চক্ষুর জল।
কাক কহিমো[১] মনের কাথা
কাঁয় বা পইতায়[২]॥
স্বামী হইল্ মোর আজেলা[৩]
সংসার মোর চলে না।
এতয় দুঃখ নারীর প্রাণে
আর তো সহে না॥
একি ছিলো ওরে বিধি তোর মনে।
নারী কুলে জন্ম দিলো বা কেনে॥
গৃহ-জালা বড়য় জালা,
না সহে নারীর এতয় জালা।
দুঃখের সংসারে দেহা কালা,
মরণ হয় রে সে-ও ভালা॥

॥ কিংকর্তব্যবিমূঢ় বামুনতি ॥

কি না বুদ্ধি করে বামুনতি, কি না চরিচর[৪]।
একো[৫] বুদ্ধি নাই তার শরীলের ভিতর॥

॥ ধুয়া ॥

কালা গেইল্ দূরো দ্যাশে
খবরে না পাঙ[৬]।
এ দেশে পণ্ডিতো নাই,
নিখিয়া পেঠাঙ[৭]॥
ও মোর কালা রে, হে কালা,—
তোর কালার এতয় জালা।
খবর-উদ্দিশ না যায় রে পোওয়া,
এতয় জালা প্রাণো সহে না॥

১ কাহাকে কহিব ২ কেবা বিশ্বাস করে ৩ অবুঝ ৪ কি আচরণীয়, সে জ্ঞান লুপ্ত
৫ একটুও ৬ খবরই পাই না ৭ লিখিয়া পাঠাই।

॥ বামুনতির হাটে গমন : গৃহে প্রত্যাবর্তন ॥

ঝিমিলার আদ্দিশে বামুনতি চলিল হাটিয়া।
শ্রীকইয়ার হাটক গেইল্ উপনীত হয়া॥
শিরে হাত দিয়া ঝিমিলা আছে বসিয়া।
বামুনতিক দেখিয়া ঝিমিলা নাগিল্ কান্দিবা'[১]॥
বামুনতি বোলে, "ঝিমিলা তুই কান্দন ক্ষেমা কর[২]।
মাছ-খার বেচাম মুই শ্রীকইয়ার বাজার॥"
দুই পাইসা দিয়া বামুনতি কিনি' আন্‌লে[৩] পান।
গুয়া-পান খায়া বামুনতি ফিকিয়া ফেলায় পিক॥
ভালো ভালো অসিয়াগিলার কাড়িয়া নিলে চিত॥
মাছ-খার বেচেয়া বামুনতি হাটর পাখে যায়।
যতো না খরচ করি'[৪] রাখিল্ সারি সারি॥
ঝিমিলার কান্ধোত[৫] দিয়া বামুনতি গেইল্ বাড়ী॥
ঝিমিলা নেয়, নেয় রে খরচ বুঝিয়া।
চল্ ঝিমিলা হে, বাড়ীক নাগিয়া॥
আগে আগে বামুনতি, পাছে ঝিমিলাগুড়ি।
উপনীত হইল্ যায়া আপনার বাড়ী॥

॥ কালীর কোপ : ঝিমিলার মৃত্যু ॥

হালো বহিতে হালুয়ার পহরেক হইল্ বেলা।
যাত্রা করি' যায় কালী, হালুয়ার পালে দেখা॥
কালী বোলে, "হালুয়া, শুনেক মোরে ভাই।
যাত্রা কালে হাল ছাড়ি' দে, নাগে মোর দহাই[৬]॥"

১ কাঁদিবার, কাঁদিতে ২ কান্না থামানোকে 'কান্দন ক্ষেমা করা' বলা হয়। বাপ্‌দাদার বিশেষত্ব ৩ কিনিয়া আনিল ৪ সমস্ত জিনিস ক্রয় করিয়া ৫ কাঁধে ৬ কোনস্থানে যাইবার সময় হলকর্ষণরত কৃষকের মুখ দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়।

CENTRAL LIBRARY

"এ্যাখেতে ছুফোরো বেলা[১], না করিস কাচাল[২]।
হালের গোরু ছাড়ি' দিয়া তোক জুড়িমো হাল[৩]॥"
এ কথা শুনিয়া কালীর ক্রোধে জ্বলে গাও।
নিজ মূর্তি কালী করিল ধারল[৪]॥
হালের গোরুক কালী দিলেক ছাড়িয়া।
হালের ঘোষোত[৫] ঝিমিলাক আগে[৬] ঘাড় মোচড় দিয়া॥

॥ বামুনতির উদ্বেগ ॥

শাল বনত[৭] কান্দেছে[৮] রে টিহা[৯]
মুই যাছো নিদারুণ হয়য়া[১০]॥
ওগে ননব-বাই[১১],
মোর হালুয়ার এলাও[১২] নাগাল নাই।
যার হালুয়ায় গেইছে পাছে
তার হালুয়ায় আসিল আগে,
মোর হালুয়ার এলাও নাগাল নাই॥
রে হালুয়া,
পড়িয়া গুলো[১৩] হালের ঘোষো[১৪]
এলাও নাগাল কেনে নাই।
ওগে ননন বাই॥
কার ঘরের কাটিয়া খান্থ
বাড়ীর পাছর মানা।
মোর সোয়ামী মরিয়া আছে
যেন কাঞ্চা সনা॥

১ একেতো ছুপুরবেলা ২ ঝামেলা করিস না ৩ জোয়ালে গোরুর বদলে তোকেই জুড়িব
৪ ধারণ ৫ লাঙলের ফাল চালাইয়া লইয়া গেলে মাটির বুকে যে রেখা পড়ে তাহাকে 'ঘোষা' বলে
৬ রাগে ৭ বনে ৮ কাঁদিতেছে ৯ টিয়া পাখী ১০ সেই পাখীর ক্রন্দনে আমি মর্মাহত হইতেছি
১১ দিদি। ননদিনী-দিদি ১২ এখনও ১৩ রহিলি ১৪ লাঙলের ফাল দিয়া জমির উপর যে
গভীর দাগ দেওয়া হয়, তাহাকে 'ঘোষা' বলে।

॥ পতির মরণে বামুনতির খেদ : ঝিমিলার পুনরুজ্জীবন ॥

ঘর ছাড়িয়া হালুয়ানী[1] কতকদূর যায়।
টিপরিত[2] চড়িয়া হালুয়ানী নিরখিয়া চায়॥
আনা[3] দিনকার গোরু করে ঘুরাঘুরি…
আজিকার গোরু আছে ধর্ম সুহরিয়া।
না-জানি হালুয়াধর পালাইছে ছাড়িয়া॥
পেটের ভোকেতে[4] হালুয়াধর পালাইছে ভুখুলি খাইয়া[5]।
এক পাও দুই পাও করিয়া হালুয়ানী কাঙ্কাইত চাপিল[6]।…
বুকে হস্ত দিয়া চায়, গরম নাহি পায় তার পাথল[7] সমান॥
কারে কনু[8] দোষ-গুনা[9] কারে কমু হানি।
ডেকুয়া ব'সতে[10] মোক বিধি করলে আড়ী॥
কারে কাঙ্কালি[11] মুই বাড়ায় দিনু পাও।
বিভা আইতত্[12] সোয়ামীধন মোর করালে উড়াও[13]॥
কাহারে[14] খানু মুই খটুয়ারে গুয়া[15]।
উড়িয়া গেইছে সোয়ামীধন মোর
পড়িয়া আছে শুয়া[16]॥
কাহারে খানু মুই মুখেরে গরাস।
হায় হায় রে দারুণ বিধি, না পূরাইল্ আশ॥
কাহারে কাটিয়া খানু খুলি বাড়ীর[17] মানা[18]।
সোয়ামীধন মরিয়া আছে যেন কাঙ্কা সনা॥
এ্যাখেতে[19] দুঃখীয়ার দুঃখ অউদের[20] মুখে হাটে।
তাহাতে অধিকা দুঃখ পরার ঘরে খাটে॥
এ্যাখেতে দুঃখীয়ার দুঃখ পরবাসে ভাঙ্গে হাড়ী।
তাহাতে অধিকা দুঃখ চিতল ব'সের[21] আড়ী॥

১ যে হাল চাষ করে সে হালুয়া। হালুয়ার স্ত্রী ২ ঢিবি বা উঁচুজায়গায় ৩ অন্য ৪ পেটের ক্ষুধায় ৫ ঝিন্ ধরিয়া ৬ ঘরের পিছনে গেল, নিকটে গেল ৭ পাথর ৮ করিলাম ৯ গুনাহ্ ১০ যৌবন বয়সে ১১ গৃহ-প্রাঙ্গণে ১২ বিবাহের রাত্রিতে ১৩ উড়াইয়া দিল ১৪ কাহারই বা ১৫ কৌটার সুপারি ১৬ এখানে কেবল 'দেহটি' ১৭ বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের ১৮ মানকচু ১৯ একে তো ২০ রৌদ্রের ২১ চটুল বয়সে অর্থাৎ যৌবন বয়সের।

এ্যাখেতে দুঃখীয়ার দু খ নদীত্ মরে নাও।
তাহাতে অধিকা দুঃখ যারে সং মাও॥
নদীর চিকন[1] বান-বরিষা, বালুর চিকন বাও।
তিরীর[2] চিকন পর পুরুষ ছোয়ার চিকন মাও॥
স্বরগেতে চান্দ নাইবো, কি করিবে তারা।
যে নারীর পুরুষ নাই দুনিয়া অন্ধিহারা[3]॥
উঝর[4] নয়নে হালুয়ানী জুড়িলে কান্দন।
হালুয়ানীর কান্দনে বৃক্ষের ঝরে পাত॥
হালুয়ানীর কান্দনে কালীর নাহি চলে রথ[5]॥
যাবার কালে কালী আসিল্ ঘুরিয়া[6]।
"কিতায়[7] কান্দেছিত্[8] তুই ওকারণ করিয়া[9]॥
না কান্দিস, না কান্দিস, মাগে
কান্দন ক্ষেমা কর।
তোর হালুয়াখান বড়য়[10] আছিদ্দরো[11]॥
মন্দ-ছন্দ[12] গালি বহুত দিছে মোক।
তাত্ করিয়া[13] হালুয়াটাক ফেলাইছু মারিয়া॥
জীয়ত্[14] করিয়া দিম্ এলা কতো বড়ো কাথা[15]॥"
অমনি গেইল্ কালী সাঁতালীক নাগিয়া[16]।
সাত্তিকার[17] সাত ডাল আনিল্ ভাঙ্গিয়া॥
অমনি বসিল্ কালী ধরনতরী[18] হইয়া॥
এক ঝাড়ন, দুই ঝাড়ন, ঝাড়ন তিনবার।
আখি ঘষিবা' নাগিল্ হালুয়া না পারে দেখিবার॥
শ্বেত মাছি মারিয়া চখু দিলেক দান।
আর ঘমনা[19] মারিয়া দিলেক বাহুত্ বল॥

১ সুন্দর, শোভা ২ স্ত্রী লোকের ৩ অন্ধকার ৪ অঝোর ৫ হালুয়ানীর ক্রন্দনে কালীর রথ নিশ্চল হইয়া গেল ৬ কালী যাইতে গিয়াও ফিরিয়া আসিলেন ৭ কি জন্যে ৮ কাঁদিতেছিস ৯ অকারণে ১০ বড়োই ১১ উদ্ধত ১২ 'ছন্দ' অর্থহীন ১৩ তাহাতে ১৪ জীবিত করিয়া ১৫ সে জীবিত থাকিতে চায় কোন সাহসে ১৬ সাঁতালীর উদ্দেশে ১৭ সাত দিকের ১৮ ধন্বন্তরী ১৯ পোকা বিশেষ।

জিয়ায়[১] উঠিল্‌ হালুয়া এ্যালাক্কা[২] বছর ।
ফিরিয়া না যাইস বেটা ওই যমর ঘর ॥
সনার নাঙ্গল সনার ফাল
হালুয়াক করলেক দান ।
ফিরিয়া না যাইস বেটা ওই যমর ঘর ॥
"শুন্‌, শুন্‌ মাগে, তোর বরের নাই মোর কাম ।
হামার আজাখান ধনের কাঙ্গালিয়া—
ধন দেখিলে লুটিবে শতবার[৩] ॥"
খুটার[৪] নাঙ্গল বাঁশের ফাল হালুয়াক করলেক দান ।
তবে নে[৫] হালুয়াখান হইল্‌ ভাগ্যমান ॥
"শাও[৬] দিয়া না যাইস মাগে বর দিয়া যা ।"
"যা যা হালুয়া, তোমাক দিমু বর ।
আথালতে[৭] গোরু বাড়োক[৮], বাখড়াইত্‌[৯] বাড়োক চাউল ॥
কোলায় পুত্র বাড়োক, দেবগিরি মন[১০] ।
ওই ধান দিয়া প্তাবা[১১] হউক ত্রিশাল দেবগণ[১২] ॥"
হালুয়াক বর দিয়া কিনা পালো ক্ষতি ।
মোর কারুণাক[১৩] বর দে, লে পূজা-পানি ॥
পূজা-পানি দেছু মাগে তোমাক্‌ জানিয়া ।
ছাড়েক মানবীর দেহা তালাক কহিয়া[১৪] ॥

১ জীবিত হইয়া ২ অর্থ করিতে পারি নাই ৩ আমাকে সোনার লাঙ্গল-ফাল দিয়া কাজ নাই, কেন না, এ দেশের রাজা অত্যন্ত দুরাচারী, সে তাহা লুটিয়া লইবে ৪ কাঠের ৫ তবেতো ৬ শাপ ৭ গোয়াল ঘরে, এই অর্থে ৮ বাড়ুক ৯ গোলাতে ১০ মন দেবতাদের মতো হউক ১১ সেবা। 'পূজা' অর্থে ১২ ত্রিশ কোটি দেবতাগণ ১৩ আমাকে করুণা করিয়া ১৪ অর্থ করিতে পারি নাই ।

॥ বামুনতির সন্তান-প্রসব ॥

অন্তর-জালা জানিস গে হাড়ীয়ানী।
চিত্তের জালা জানিস গে দাইয়ানী॥
আসিতে দেরি করিলো গে আজি
বিষের দেহা মোর, পোরাণে না বাঁচি॥
তিনটা বাধিনীর খাটি[১] ঝর্‌ঝরালো গে চোপরাতি[২]।
ও মোর কালো দাইয়ানী,
যদি ছোয়া মোর ভাল্‌ ভালে হোবে—
গে সনার দাইয়ানী,
তোক পিন্দাম মুই অণ্ড-চণ্ডের পাটানী[৩]॥
পাটার খেতুয়া[৪] দিয়া
নাড়িক বান্ধিলো গে।
বাঁশের ছুঁচকেনা[৫] দিয়া
নাড়িক কাটিলো গে।
গে সনার দাইয়ানী॥

॥ শান্তি-সংগীত ॥

ছাড়িয়া দে, এড়িয়া দে
বালকের পোরাণো রে স্থাও,
তুই মোক ছাড়িয়া দে॥
মাথাত বসিল্‌ স্থাও মাথা-শূলা হয়া।
কমরে বসিল্‌ স্থাও কমর-শূলা হয়া।
বুকে বসিল্‌ স্থাও বুকো-শূলা হয়া।
ছাড়িয়া দে, এড়িয়া দে…

১ ঝাঁটার তিনটি কাঠি ২ সারা রাত নড়াইলি। সন্তান প্রসব-কালে কোনো বাধা উপস্থিত হইলে, একটি পাত্রে জল ভরিয়া, ঝাঁটার তিনটি কাঠি দিয়া সেই জলে বার বার আঘাত করা হইয়া থাকে। তাহাতে নাকি প্রসব সুগম হয় ৩ তোকে রঙ-চঙের 'পাটানী' পরাইব ৪ পাটের সুতা ৫ বাঁশের চৌচাড়ি।

চক্ষে বসিল্ দ্যাও চক্ষ্-শূলা হয়া ।
হাঁটুত বসিল্ স্থাও হাঁটু-শূলা হয়া ।
পিঠিত বসিল্ স্থাও পিঠি-শূলা হয়া ।
ছাড়িয়া দে, এড়িয়া দে···
ঝালানী পড়িল্ গে আই,—
আই মোর নরসিংহের[১] ঝালানী ।
আই মোর বিষুয়া-মাশানের[১] ঝালানী ॥
ঝালানী পড়িল্ গে আই,—
আই মোর ছুঁচিয়া-মাশানের[১] বিষো গে ।
আই মোর ঘোড়া-ভূতা[১], জিন-ভূতা[১],
পিস্তু-হয়া[১], তার-ভূতা[১],
ঝালানী পড়িল্ গে আই ॥

। ৩১৮ ।

ওই ঝাড়োঁ ফুকোঁ বিষো নাই—
কালকুট গরলো বিষো ঝাড়ে পদমাই[২] ॥
এইবার বন্দনা গোলেমালে রইল্ রে ।
যাক্[৩] বন্দিমো তাহে[৪] মইল্ রে ॥
অংসেয়া[৫] তার ধৈয্য পায় নাই ॥
এইবার ভাবহারা হয় মুই ।
পথম[৬] বন্দনা মোর গোলেমালে রইল্ ।
ভাব দেখাইতে ভাবর চরা[৭] সাগর মথিল্[৮] ॥
সরপো রোজ্জু দিয়া ভাব-সাগর মথিল্
কালকুট গরলো বিষ তাহাতে পাইল্ ॥
আখিতে না পারেন বিষো দিলেন বাঁটিয়া ।
বিষধর পাইলেন বিষো, শিঙ্গি আর ট্যাঙ্গেনা[৯] ॥

১ বিভিন্ন উপদেবতা ও অপদেবতার নাম ২ পদ্মাবতী ৩ যাহাকে ৪ সেই-ই ৫ অনুসন্ধান করিয়া ৬ প্রথম ৭ চোর ৮ মন্থন করিল ৯ শিঙ্গি ও ট্যাঙরা মাছকেও কিছু কিছু বিষ দেওয়া হইল ।

CENTRAL LIBRARY

বাঁটেয়া দিলেন বিষো কণেকো[১] বাঁচিল্ ।
সে বিষ ভাবের চরা ভক্ষণো করিল্ ॥
গালাতে ধরিল্ বিষো চখু হইল্ ঘুল[২] ।
মাথাত উঠিল্ বিষো মুখে নাইরো[৩] বুল[৪] ॥
তুই মোর ভাব-অঙ্গিয়া চরা রে,
যাহে দ্যাখে, তাহে কয় :
বাঁচিবে, মরিবার নয়—
আকাশ হাতে দ্যাবোগণ[৫] কহে 'জয় জয়' ॥

। ৩১৮ক ।

ওই ঝাড়োঁ বিষো নাই গে,
ফুকোঁ বিষো নাই ।
কারুণা অঙ্গের[৬] বিষ নাই গে নাই ॥
ওই ফিরো কালী ফিরো[৭] ভমোরা[৮]
ওই মোর হাত্তী রে দ্যাও[৯] ।
ওই তোর গুণের মাইরণ[১০]
সামাল্[১১] গে মাই ।
ওই ঝাড়োঁ বিষো নাই গে…

১ অল্প, কণামাত্র ২ চক্ষু ঘোলাইয়া গেল ৩ নাই । 'রো' এমনিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৪ মুখের বুলি ৫ দেবগণ । গানখানি সর্প-দংশনের পর ওঝার গান বলিয়া অনুমিত হয় । নীলকণ্ঠ শিব-কে এখানে ভাব-রসিক চোর বলা হইয়াছে । 'চোর' কথাটির উল্লেখ থাকায় কোন-কোন স্থানে গানটিকে 'চোরচুন্নী'-র বন্দনা গান রূপে গাওয়া হয় ৬ যাহাকে ঝাড়া হইতেছে, তাহার উপর দেবতার করুণা হইয়াছে । সেই করুণা-করা দেহকে 'করুণা অঙ্গ' বলা হইয়াছে ৭ কালীকে উদ্দেশ করিয়া ওঝা বলিতেছেন, কালী শাপ দিয়াই চলিয়া যাইয়ো না, ফিরো—ফিরিয়া তোমার শাপ ফিরাইয়া লও ৮ রোগীকে 'ভমরা' বলা হইয়াছে ৯ যে অপদেবতা রোগীর উপর ভর করিয়াছে, সে হাতীর মতো বিরাট ও বলবান । ছন্দ-সঙ্গতির জন্য 'রো' ব্যবহৃত হইয়াছে ১০ গুণের মাইরণ অর্থাৎ অপগুণের দৃষ্টি । দেবতাকে প্রত্যক্ষভাবে অপগুণের কথা বলা যায় না, তাই উল্টা করিয়া 'গুণের' কথা বলা হইয়াছে ১১ সামলাও ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩১৯ ।

অঝা[১] না হই, বোঝা[২] না হই, মাই,
অঝার ছোটো গে ভাই।
ওগে, তোর বন্ধুয়াক ভাল্[৩] করিলে
হামরা কিছু পাই॥
ওগে, তোর বন্ধুয়া না পারে জরে[৪]।
কালা কালা চেঙ্গেড়া দেখুঁ বাই[৫]
দনো কানে গে সনা[৬]।
ওগে, তোর বন্ধুয়াক ভাল্ করিলে…

। ৩২০ ।

শঙ্করী ওঝা মোর নাম,
মোর খালি রঝালি[৭] কাম॥
শুনেক রঝানী[৮],
ছয়-মাসিয়া মড়াক মুই
জিয়াইতে পারোঁ।
এইলা[৯] করেছুঁ নানান ঠাট[১০]
ঘরত্ মোর না জুটে ভাত।
শুনেক রঝানী॥

১ ওঝা ২ কথার কথা। অর্থহীন ৩ ভালো ৪ তোর বন্ধু জ্বর আর সহিতে পারিতেছে না ৫ ওগো দিদি, কালো কালো চাগুড়া দেখিতে পাইতেছি ৬ দুই কানেই তাহাদের সোনার অলঙ্কার। গানের সহিত এই পংক্তির কি সম্পর্ক, তাহা বোঝা গেল না ৭ ওঝাগিরি ৮ ওঝার স্ত্রীলিঙ্গ ৯ এই সমস্ত ১০ নানান রঙ্গ-রসিকতা করিতেছি।

CENTRAL LIBRARY

॥ বিভিন্ন মন্ত্র ॥

বাড়ী-বন্ধের মন্ত্র

। ৩২১ ।

বন্[১] দেবী, বন্,
বন্দে করহু সার[২]—
চৌপারে[৩] ফেলান্থ বাড়ীটার
নোহার বর্মজাল[৪] ॥
জাল কা জাল—
এই জাল ফেলালে কে :
এই জাল ফেলালে সে ॥
ইটালের[৫] ঘরখানি
পাথরের ছাউনি।
যম বেটা আসি' গেইল্
না পালে থিত্[৬]।
স্বর্গের চান[৭] বেটা ধরিবার পারে.—
আউস-হাউস-বাউসমতী নড়িবা' পারে[৮] ॥
হুহুঙ্কার বজ্র হুঙ্কার
এই বন্ দেছু[৯] কার ॥
আজিকার বেলা পহর
কালিকার চৌপরাত[১০] :
এই বন্ হেলিবো-পেলিবো[১১]
চড়াবো গাও[১২]—
ঈশ্বর মহাদেবের মাথাত
পুছিবো দুই পাও[১৩] ॥

১ বাঁধন, বান   ২ বাঁধনই সার করিলাম   ৩ চারিদিকে   ৪ এই মন্ত্র এতোই শক্তিশালী যে তাহা লোহার বর্মের মতো   ৫ ইটের   ৬ যম আসিলাও স্থিতি পাইল না, ঢুকিতে পারিল না   ৭ চাঁদ   ৮ যেখানে খুশি সেখানে যাইতে পারে (কিন্তু মন্ত্র-দেওয়া ঘরে ঢুকিতে পারে না)   ৯ দিতেছি   ১০ আজিকার দ্বিপ্রহর এবং কালিকার সমস্ত রাত্রি (এই মন্ত্র কার্যকরী থাকিবে)   ১১ অবহেলা করিবি   ১২ ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিবি   ১৩ তবে মহাদেবের মাথায় পা মুছিবি।

CENTRAL LIBRARY

ঘর-বন্ধের মন্ত্র

। ৩২১ ক ।

ঘর বন্দু[১] দুয়ার বন্দু, আরো বন্দু ধাপ[২] ।
শিবের হাঙ্কারে দুয়ারে নাগিল্ কপাট ॥

দেহার বান-মন্ত্র

। ৩২২ ।

গাও বন্[৩], দেহা বন্,
জিব্বার তালুকা[৪] বন্,
মাথাত্ কেশ বন্,
চাতুর জুড়িয়া[৫] পইল[৬] মোর বন্ ॥
এই বন হেলিবো-পেলিবো[৭]—
ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাবো ॥

॥ জ্বর-কাটানীর মন্ত্র ॥

। ৩২৩ ।

নামানী

চিল্ চিল্ চিল্কা,—
স্বর্গের ডাকে মর্ক্কে[৮] নামে
কালীর বেটা মাশান ॥
এই পুজা-পানি হাতত্ নিয়া,
ঘিতের ভোগা[৯] ভইক্ষণ করিয়া[১০],—
চলি' যা তুই দক্ষিণক নাগিয়া ॥

১ বাঁধ দিই ২ সিঁড়ি। এই মন্ত্র দুইটি বাড়ী বা ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া পড়া হয়। ইহাতে চোর-ডাকাত বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না ৩ গা বাঁধিলাম ৪ জিহ্বা, তালু ৫ সমস্ত অঙ্গন, চত্বর জুড়িয়া ৬ পড়িল ৭ অবহেলা করিবি, পায়ে ঠেলিবি। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্ধকার, নির্জন, বিপদসঙ্কুল পথে হাঁটিলে চোর-ডাকাত, সাপ-বাঘ, ভূত-প্রেত কাছে আসিতে পারে না ৮ মর্ত্তো ৯ ঘৃতের ভোগ, প্রসাদ ১০ ভক্ষণ করিয়া।

ঝাড়ানী

আল্লার[১] চক্র কাটি' কয়্ খান্ খান্,
শিবে জপে শিবের ছুলপ[২] নাম।
ব্রহ্মায় জপে ব্রহ্মার ছুলপ নাম—
কারুণা শুনিলে দেও দান[৩]॥
শাশান-মাশান ধীরস্থির।
ভাগ-ভোগা পূজা-পানি খায়া—
ফেম্মা'র অষ্টং ধড়[৪] ছাড়িয়া
চলি'যা তুই বৈকুণ্ঠক নাগিয়া॥

অপর একটি ঝাড়ানী-মন্ত্র

। ৩২৩ ক।

শনিবারে উবজিল[৫] মাশান
মঙ্গলে তুই কান।
এখেঠে[৬] ফিরানী করেছু[৭]
আঠারো মাশান[৮]
ভাগ ভোগা পূজা-পানি খায়া…

পিলাই-কাটার মন্ত্র

। ৩২৩ খ।

পিলাই[৯], পিলাই অন্-জাতি[১০]
পিলাইর জলম[১১] বাও ভিতি[১২]।
রামচন্দ্রের বান—
ফেম্মার পিলাই কাটি' কয়্ খান্-খান্[১৩]॥

১ মুসলমানি ওঝার কাছে কৃষ্ণের চক্র 'আল্লার চক্র' হইয়াছে, মনে হয় ২ দুর্লভ ৩ করুণার্ত্র প্রার্থনা শুনিয়া পূরণ করিয়ো ৪ অষ্টাঙ্গ ৫ উপজিল, উপস্থিত হইল ৬ একই স্থানে ৭ যে মাশানেরা ভর করিয়াছে, মন্ত্র দ্বারা তাহাদের ফিরাইতেছি ৮ কালীর আঠারো পুত্র। মাশানের আঠারো ভাই। কাহারও জ্বর হইলে তাহাকে ওঝা ঝাড়িবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন ৯ প্লীহা ১০ অন্ন অর্থাৎ ভাত হইতে জাত ১১ অবস্থিতি ১২ পেটের বাম দিকে প্লীহা থাকে ১৩ মন্ত্র দ্বারা কাটিয়া খান্-খান্ করিলাম। কাহারও পেটের প্লীহা কমাইতে হইলে ওঝা এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।

॥ আন্ধা-শূলার মন্ত্র ॥

শাশান ঘাটের মাশান,
  ছয় ঘাটের গহিলা[১] ।
আজি হাতে[২] ফেন্নার আন্ধাশূলা[৩]
  নিহু কাড়িয়া[৪] ॥
উঠ্‌, আন্ধাশূলা, ছাড়্‌ পাট
  যা আন্ধাশূলা, দক্ষিণ ঘাট ।
    ফেন্নাক ধরিস কি ছাড়িস ঝড়[৫] —
      নি-ঝড় গোড়লের[৬] হাঙ্কারে[৭]
ফেন্নার আন্ধাশূলা ভূমিত পড়্‌, কি ভূমিত পড়্‌ ॥

॥ মিলের মন্ত্র ॥

। ৩২৪ ।

উঠ উঠ ধম্ম ঠাকুর লোহিত বরণ
  ফেন্নীর সঙ্গে করাও দরশন ।
    হরিষৎ, দরিশন, পাঁচ ইন্দ্রি[৮] হুতাশন
      ছাড় কবিলাস[৯], ছাড় আও[১০]—
      ছাড় ফেন্নী বাপ্মাও[১১] ॥

১ রাত্রির দেবতা 'গহিলী' । গহিলী দেবীই রাত-কানাদের রাত-কানা করিয়া রাখেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ২ আজ হইতে ৩ রাত-কানা রোগ ৪ কাড়িয়া লইলাম ৫ আন্ধাশূলার দৌরাত্ম্যকে 'ঝড়' বলা হইয়াছে ৬ শান্তিময় গরুড় দেবতা ৭ হুঙ্কারে । এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 'আন্ধাশূলা' তাহাকেই বলে যে সারারাতই রাত-কানা হইয়া থাকে । যাহারা কেবল সন্ধ্যাবেলায় রাত-কানা হয়, তাহাদের 'কালা-কুক্রী' বলে । কালাকুক্রী ও দেবী । রাত-কানাদের ঝাড়িবার সময় এই মন্ত্র বলা হয় ৮ ইন্দ্রিয় ৯ কৈলাস ১০ রস ১১ বাপ-মা ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩২৪ ক।

চক্ষু, চক্ষু দরশন
চাইর চক্ষু নিরাঞ্জন[১]।
হরে কৃষ্ণ হরে—
মোক না দেখিলে ফেন্নী
কান্না আছড়ে মরে[২]॥

। ৩২৪ খ।

নজরে নজর বন্দু পবন বন্দু মন—
শক্তিশেল বাণ বন্দু ফেন্নী'র দুই থন[৩]।
রাম লক্ষ্মণ সীতা—
ফেন্না-কৃ দেখি' ফেন্নী'র সোদায়[৪] চিন্তা॥

১ নিরঞ্জন ২ মাথা কুটিয়া যেন মরে ৩ স্তন। ৪ সব সময়েই। হাতের তেলোয় তেল বা ঘি ঘষিতে ঘষিতে ওঝা এই মন্ত্র বলিয়া তাহা পূত করিয়া দেন। সেই মন্ত্রপূত তেল বা ঘি কোন নারীর দেহে ছোঁয়াইতে পারিলেই সে বশীভূতা হইয়া যায় এবং পিতা-মাতা ছাড়িয়া প্রেমিক পুরুষের অনুগত হয়।

॥ মড়া-খোয়া ॥

। ৩২৫ ।

এমন কেনে হলো রে গৌরাং
এমন কেনে হলো।
বান্ধিয়া পেমের ঘর
আলন[১] কেনে রে দিলো॥
নাসো[২] করনু, ভ্যাশো[৩] করনু—
সঙ্গে যাবার আশে।
না পানু সাধুর সঙ্গ
অদ্দিষ্ট কোপালে॥
ভাই বলো, ভাজিতা বলো,
সম্পতিরো ভাগী।
মরণো কালেরো বেলা
কিক্কো সারথি॥
কাঁচা বাঁশের খাট-পালং[৪]
শুকান্ পাটার ডোর।
ভাই-ভাজিতা ভিড়িয়া বান্ধে
পাম্মা সিন্ধের চোর[৫]॥

। ৩২৫ ক ।

নগর হাতে[৬] বাইর হলো রে
ওকি ও মোর শচীর দুলাল গোরা।
ওরে চলিসে[৭] গোরা নিজো পন্থে
দুই নয়নে বহে ধারা॥

১ আগুন ২ নাস্ত ৩ বেশ ইত্যাদি ৪ পালঙ্ক ৫ সিঁদ-কাটা চোর যেমন ধনের আশায় চুরি করে, সেইরূপ শয়নাদি ধনের লোভে মৃতদেহ বাঁধিতেছে। মৃতদেহকে তুলসী তলায় নামাইয়া গানটি গীত হয় ৬ হইতে ৭ চলিয়াছে মৃতদেহকে লইয়া শ্মশানে যাইবার সময়ে পথে গানটি গীত হয়।

। ৩২৫ খ ।

এ দেহা[১] ভাই মাটির ভাণ্ড
পুড়িয়া করিবে ছাই।
মিছায় মিছায় কান্দিবে তোর
জ্ঞাশের যত ভাই ॥
ওরে আঙ্গরা ভাসাইয়া জলে[২]
বাড়ী আসিবার কালে
'হরিবোল' বলি' দিবে
আমচন্দ্রের দহাই[৩] ॥

। ৩২৫ গ ।

দে দে জানকী বালুর পিণ্ড দে।
পিণ্ড পায়া যশোরাজো[৪]
স্বর্গে বাসো হইলো রে ॥

। ৩২৫ ঘ ।

মন রে, দিনো গেল গৃহ-জালাতে,
আর কি এমন হোবে।
আসিবে শমন, করিবে বন্ধন,
'হরি হরি' বলো বদনে ॥

১ দেহ ২ চিতা ধুইয়া ৩ দোহাই। মৃতদেহের আত্মা যেন সৎকারীদের সহিত বাড়ী না আসে, সে জন্যে বাড়ী ফিরিবার সময় রামচন্দ্রের দোহাই দিবার প্রথা আছে। মৃতদেহ দাহকালে গানটি গীত হয় ৪ দশরথ (?)। শ্মশানে প্রথম পিণ্ডদানের সময় গানটি গীত হয়। শ্মশান হইতে ফিরিবার পথে ৩২৫ ঘ সংখ্যক গানটি গীত হয়।

॥ মুন-মাটি ॥

। ৩২৬ ।

ঘোর কলিকাল পইচ্চে[১] ভাই রে,
কলির পইচ্চে কাল :
গাভুর বেটা[২] না পুষিবে
বুড়া-বিদ্ধ মাও[৩]।
ওই আরে হায় ॥
মুসলমানের মড়া মরে
আশে পাশে মাটি[৪] ;
হিন্দু নোকের মড়া মরে
নিগায়[৫] গাঙের ভাটি[৬]
ওই আরে হায় ॥
সওয়া সের মুন দেয় রে
ময়দানেরো[৭] মাঝে,···[৮]
ওই আরে হায় ॥

। ৩২৬ ক ।

খাকে[৯] গলি'[১০] খাকে হোবে ক্ষয় ।
খাক ছাড়া অইন্নখানে
জা'গা[১১] হোবে নাই ।
কি ওরে অবোধ মন রে ॥

১ পড়িয়াছে ২ জোয়ান ছেলে ৩ জোয়ান ছেলে বৃদ্ধ মাতাকে ভাত-কাপড় দেয় না। অর্থাৎ বৃদ্ধার স্বামী আজ মরিল, তাহার জোয়ান ছেলে কি তাহাকে ভাত-কাপড় দিবে ? মৃত্যু-সঙ্গীতটির এই বিশেষত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এইভাবে অন্যান্য আত্মীদেরও মনোভাব লইয়া তখন-তখনি গান রচনা করিয়া শোক-যাত্রা কালে গাওয়া হয় ৪ মুসলমানদের কবর বেশ চওড়া হয়। হিন্দুদের কবর সরু করা হয়। মুসলমানের কবরে তাই 'আশে পাশে' মাটি থাকে ৫ লইয়া যায় ৬ নদীর ভাটির দিকে হিন্দুর কবর খোঁড়া হয় ৭ অর্থাৎ সমাধি স্থলে ৮ এইখানে একটি পঙ্‌ক্তি মিলে নাই। সমাধি স্থলে যাইবার কালে পথে গানটি গীত হয় ৯ গর্তে, মাটিতে ১০ গলিয়া, প্রবেশ করিয়া ১১ জায়গা।

CENTRAL LIBRARY

ওই হাতে জোখা[১], কান্ধে[২] কোদাল,
মোর গুরুধন রে,
ওই শ্মোশানের ঘাটে রে ;—
আজি বাপোক[৩] ছাপাইতে[৪] যামো
নিধুয়া পাথারে রে ।
কি ওরে অবোধ মন রে ॥
কাঁচা বাঁশের খাট-পালঙ্খী
শুকনা পাটার ডোর :
ভাই-ভাজিতা ভিড়ি' বান্ধে
পায়ে-শিঙ্গে[৫] ডোর ।
কি ওরে অবোধ মন রে ॥

১ গর্ত করিবার সুবিধার জন্য, এক হাত পরিমাণ একটি কাঠি দিয়া মৃতদেহের দৈর্ঘ্য মাপিয়া নেওয়া হয় । শবযাত্রা কালে একজন সেই কাঠি হাতে লইয়া চলে । ২ কাঁধে ৩ মা মরিলে "মাওক"...ইত্যাদি ৪ লুকাইতে, সমাধি দিতে ৫ পা হইতে মাথা পর্যন্ত । সমাধি দিবার কালে গানটি গীত হয় ।

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম অধ্যায়

॥ আনন্দ গীতি ॥

॥ ফাক্‌সালি ও খ্যাচেরা ॥

। ৩২৭ ।

ওগে নাকেশ্বরী বাঘের নাখান[১]
তুই রে চেঙ্গেড়া উড়ালু[২] ।
দিনো কতেক ফুটানি দেখালু ॥
ও চেঙ্গেড়া, তোর ঘর বা কতো দূর,
বাড়ী বা কতো দূর ।
ওই দেখা যায় গছ-বাড়ীখান[৩]
নদীয়া শান্তিপুর[৪] ॥
ওরে বোগোরি কুড়ায়[৫] ঝোপে ঝোপে[৬]
ঢোকে ঢোকে খায় পানি ।
চেঙ্গেড়াগিলার বড়য় ফুটানি ॥

। ৩২৮ ।

অসের চেনা[৭] রে,
তোর কোপালে কইন্যায় নিমিলে[৮] ।
যেইঠে হাতে আইসে খপর[৯]—
সেইঠে মন তোর না মজে ॥

১ গেছো বাঘ-এক মতো ২ তুই রে চেঙ্গেড়া উড়িয়া বেড়াইস ৩ যে বাড়ীতে অনেক গাছ আছে। গাছ থাকা সমৃদ্ধির লক্ষণ ৪ নদীয়া শ্রীচৈতন্য দেবের বাসস্থান, কাজেই সে স্থানকে চির-সুখের স্থান বলিয়া কল্পনা করা হয়। ছেলেটিকে টিট্‌কারি দিয়া মেয়েটি কহিতেছে,—তোমার বাড়ি কি শান্তিপুরে ৫ ভাতের অভাবে কুল খায় ৬ জলপাইগুড়িতে এক ধরণের বন্য কুল গাছ হয়। গাছগুলি আড়াই হইতে তিনফুট উঁচু হয়। গাছগুলি ঝোপ বাঁধিয়া একস্থানে জন্মায়, ফল দিয়াই মরিয়া যায়। এই কুল খাইতে খুবই মিষ্টি ৭ অবিবাহিত যুবক অথবা বিপত্নীক ৮ মিলেনা ৯ খবর।

ওগে ভারী গুষ্টি এক পাল আছে,
কাহোয় মাথা না তুলে[১]।
অসের ঢেনা রে,
তোর কোপালে কইন্যায় নিমিলে ॥
য্যামন চেঙ্গেড়া তোর উপের ছাটা[২]
টুঁটি[৩] সরু তোর, প্যাটটা মোটা।
তাংকু-বাড়ীত্[৪] দিলে হবো নজর-কাটা[৫] ॥

। ৩২৯ ।

আবো, গুরুম-থুরুম[৬] কইন্যা মোরে
মাচার খুঁটি[৭] কইন্যা মোরে—
শাগে-ভাতে নাই[৮] মিল নাই
—মিলিল্ গে মোরে ॥
আবো, দেখিছু কইন্যা লালটিন্-মার্কা[৯]
কইন্যা হয়া গেইল্ ভুত-মার্কা।
—ঠিকে ঠাকে ঢাডিগোনীর[১০] নাথা ॥
আবো, দাউদিয়ানী[১১] হইল্ মোর কইন্যা
কইন্যা চুলকাছে দেহা।
কতয় খস্তু[১২] ভাত-শাগোত আবো
পড়ে উড়িয়া ॥

১ কেহই তোমাকে বিবাহ দিবার জন্ত গা করেনা ২ রূপের ছটা ৩ গলা ৪ তামাকের ক্ষেতে ৫ শস্যক্ষেত্রে যাহাতে কাহারো কুনজর না পড়ে,-সেই উদ্দেশ্যে নজর কাটাইবার জন্ত খড় ইত্যাদি দিয়া এক কিম্ভূত কুশপুত্তলিকার মত তৈয়ারি করিয়া রাখা হয়। ছেলেটির রূপ যেন সেই 'নজর-কাটা' কুশপুত্তলিকার মতো ৬ ছোটোখাটো ৭ মাচার খুঁটি যেরূপ ছোটো হইয়া থাকে ৮ স্বামী-স্ত্রীতে মানান সই হয় নাই ৯ অর্থাৎ সুন্দর ১০ পাড়াবেড়ানী ১১ যে মেয়ের দাদ হইয়াছে ১২ খুশকি, মরামাস।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৩০ ।

হাল বহয়া আসিনু বাড়ী—
খাবার গেনু হাড়ী-বাড়ী[১] ।
মারিনু মাইয়াক হাড়ী-বাড়ীতে ॥
ও কইন্যা, একদিন মারিনু ধরি'
কয়া বেড়াইস টাড়ী-টাড়ী[২] ।
পালেয়া যাইস তোর
বাপো-মাওর ঘরে ॥
ও কইন্যা, হাতো ধরোঁ তোর পাও ধরোঁ,
পালেয়া যাবার বাধা করোঁ ।
কিবা কাড়িয়া কওঁ তোমার আগে ॥
ও কইন্যা, বিয়ার কুলের স্বামী হওঁ—
আর যদি মন্দ কওঁ—
বুড়া-বাম্নী[৩] নাগান গালোতে ॥

। ৩৩১ ।

"মুই আর না বইম্[৪] হালো রে,
বসিয়া খাইম্[৫] ঘরে ।"
"হাল না বো'লে[৬] ওগে মড়া,
তোক কেবা আদর করে ॥"
"বুড়া গোরুর হাল গে শালী,
ঢেক্কাইতে[৭] পান্নার নড়ে[৮] ।
মুই আর না বইম্ হালো রে ॥"

১ রান্নাঘরে ২ পাড়ায় পাড়ায় ৩ বুড়ো খ্যাংরা ৪ বহিব ৫ খাইব ৬ বহিলে
৭ তাড়াইতে, খেদাইতে ৮ পাঁজরা নড়ে। গানটি স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন।

। ৩৩২ ।

মাছ মারিবা[১] গেইল্[১] গোদাটা[২]
উজান আরো ভাটি :
ওইঠে হাতে[৩] মারি' আনলেক
খের্-খেরানী পুঁঠি[৪]।
—গোদা পারে না ॥

মাছ মারিয়া আনিয়া গোদা
থুইল্ আগিনার মাঝে :
উমার বাড়ীর[৫] বেটী ছাওয়াগিলা[৬]
গুপ্ তুলিয়া হাসে[৭]।
—গোদা পারে না ॥

কুমড়া-শাক আন্দিয়া থুইসে
ডোকাত্ ভরেয়া[৮] :
আজগুবিতে[৯] ডাঙ্গাইল্[১০] মোক
ধাক্কাও করিয়া[১১]।
—গোদা পারে না ॥

। ৩৩৩ ।

ডাঁড়ি-পাল্লা[১২] ঘাড়ত করি'
পাইকার বেড়ায় টাড়ী-টাড়ী[১৩]—
কুন্-বা মেশ্টা[১৪] বেচায় রে।
একটা বুড়ার সাতঝন[১৫] বেটা
ওই বাড়ীটাত বেচায় পাটা—
ছোটো বেটা ভাই কইন্যা আনিছে ॥

১ গেল ২ ব্যঙ্গ করিবার জন্য পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত সাধারণ নাম বিশেষ। বহু গানে এই নামটি পাই ৩ ওই স্থান হইতে ৪ ছোটো ছোটো পুঁটি মাছ ৫ উঁহাদের বাড়ীর ৬ মেয়েছেলেগুলি ৭ উচ্চরবে হাসে ৮ হাঁড়ীতে ভরিয়া ৯ হঠাৎ, অকারণে ১০ প্রহার করিল ১১ প্রচণ্ড শব্দে ১২ দাঁড়ি-পাল্লা ১৩ পাড়ায় পাড়ায় ১৪ এক ধরণের পাট ১৫ সাতজন।

"স্বামীধন, স্থট্ করিয়া কছো তোক—
হালের গোরু বেচা তোর ;
গোরু ব্যাচেয়া নোলোর[১] বায়না দে।
স্বামীধন, নোলোটা মুই নাথত[২] দিম,
আশ-পড়োশীর বাড়ীত যাইম,
বসিতে এখান পিড়া পাইম—
তবে সেনি[৩] চিনিবে মান্ বিঁমোক।"
"পাটা বেচানু বারো আনা
খাড়ী কিনিনু তেরো আনা ;
এক আনা মোর ধার হইয়াছে।
হাট হাতে[৪] আসিনু বাড়ী
বিরা[৫] শালী তাড়াতাড়ি—
ত্যাখ্ তো শালী কেইনং শাবাইসে[৬]।"

। ৩৩৪।

মুই ছি আন্দন জানো গে দিদি
মুই ছি আন্দন জানো।
ডাইন ঠ্যাং দি'[৭] ত্যাল আনি'র পারে'।
বাঁও ঠ্যাং দি' ঘাঁটো॥
মোর ননগিলা কয়—
মোর সতোনীগিলা কয়—
মুই বোলে তোরকারি আন্দি'র
জানোই না রে হয়॥
মুই ছি আন্দন জানো গে দিদি
মুই ছি আন্দন জানো।
চ্যাং মাছ ছুবেয়া[৮] তাক
জামুরি দিয়া শানো[৯]॥

১ নোলোকের ২ নাকে ৩ তবে তো ৪ হইতে ৫ বাহির হ' ৬ কিরূপ শোভা পাইয়াছে ৭ দিয়া ৮ পোড়াইয়া ৯ মাখি।

CENTRAL LIBRARY

ময় দিমুঁ, মশলা দিমুঁ,
হুত্তোকি তুঁতিয়া।
ওই দিয়া[১] গেইছে পাত্থড়া পকা[২]
তাক দিমুঁ ট্যাপ্‌কেয়া[৩] ॥

। ৩৩৫ ।

বেশ বেশ বেশ,
আচ্ছা মোজা হইসে তরকারি।
বাইগন ভাজিত্‌ মুন নাই দেয়
মোর আন্দনী[৪] শালী ॥
হয়তো ঘুন্নী[৫] কিচ্‌ কিচ্‌ কালো
আন্দনে-বাড়নে ভালো।
নয়া ভোজী[৬], মোকো[৭] কণেক[৮] ঝোল ॥
ওরে তেপথার বোগোরি[৯] দিয়া
আন্দিসে নাফার আমল[১০]।
নয়া ভোজী, মোকো কণেক ঝোল ॥
চালকুমড়া-নাফাশাক
ছেঁকা[১১] দিয়া আন্দিসে তাক।
এ্যাথে তে শরলো কাল
মোক নাগাইসে ঠং[১২]—
আজি বুঝি খাবো শালী তুই
হালুয়া পেন্টির[১৩] ভাং[১৪] ॥

১ ওই দিক দিয়া ২ গান্ধী পোকা ৩ টিপিয়া।

অতিরিক্ত কথা—

নাউশাগ আন্ধিমু মুই
খ্যাচোর-খ্যাচোর করে।
ডাইলশাগ আন্ধিমু মুই
বিলাই ম্যাও করে ॥

৪ রাঁধুনী ৫ ঘরনী ৬ নতুন বউদি ৭ আমাকেও ৮ অল্প ৯ তিন-রাস্তার উপর যে কুল গাছ, সেই কুল দিয়া ১০ অম্বল ১১ কলাগাছের ক্ষার দিয়া ১২ ঠাট্টা ১৩ হাল বহিবার সময় গোরু খেদানো হয় যে লাঠি দিয়া, তাহাকে 'হালুয়া পেন্টি' বলে ১৪ প্রহার।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৩৬ ।

নারীটা দেখিতে ভালা, চিকন-কালা
কাম কেনে অদরভুসি[১] :
কাঁয় নিবে তোর ঝেংঝেঙ্গা চটি[২] ॥
"মোর চটির দাম ষোলো আনা—
কিনিয়া নিবে মাহাজন।
তোরে মতো আছে কতজন ॥"
বাহে পাইকারের বেটী, বাহে সর্দারের বেটী,—
বেলা হইল্ মই-জুড়ানি[৩],
খাবার কইল্লেন কি ॥
ভিজা মাণ্ডালের খড়ি[৪] আখায় দিয়া
শৌল মাছ আন্দিনু শশুর পাটাশাক দিয়া।
বইসো, বইসো শশুর, স্যাছো বাড়িয়া ;
চ্যাঙ্ মাছ পুড়িয়া থুইনু জামুরি চিপিয়া[৫] ॥
শশুরে যে মাছ মারিলে রে শোল আর বহালি।
ভশুরে যে মাছ মারিলে রে চিতল আর কাতলি।
সনার দেওরা মাছ মারিলে রে চন্দন আর কুরুসা।
পানিয়া-মড়া[৬] মাছ মারিলে রে চান্দা-চপরা[৭] ॥
শশুরেরো মাছ আন্দিনু রে আউলা করিয়া[৮]।
ভশুরেরো মাছ আন্দিনু রে ঝোলাইবন করিয়া[৯]।
সনার দেওরার মাছ আন্দিনু রে ত্যালোতে ভাজিয়া।
পানিয়া-মড়ার মাছ আন্দিনু রে নুনের ছিটা দিয়া ॥

১ অদ্ভুত, এলোমেলো ২ যে চটের সুতার গাঁথনি ফাঁক ফাঁক ৩ লাঙ্গল চালানো শেষ করিয়া, মাটির ঢেলাগুলিকে মই চালাইয়া ভাঙিয়া দেওয়া হয়। লাঙ্গল চালানো শেষ করিয়া মই চালাইতে দুই প্রহর বেলা হইয়া যায় মই চালানোকে 'মই-জোড়া' বলা হয়। 'মই-জুড়ানি' অর্থাৎ দুপুর বেলা ৪ মান্দার গাছের লকড়ি ৫ এক ধরণের বৃহদাকার লেবু ৬ গালি বিশেষ। যাহার শরীরে জল লাগিয়াছে। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া এই গালি ৭ ছোটো মাছ বিশেষ ৮ সতর্কতার সহিত ৯ ঝোল রাখিয়া।

শ্বশুরেক ভাত দিছু রে দণ্ডবৎ করিয়া।
ভশুরেক ভাত দিছু রে আর দূরত থাকিয়া।
সনার দেওরাক ভাত খিলাছু হাসিয়া খেলিয়া।
পানিয়া-মড়াক ভাত খিলাছু ছেকার[১] ছিটা দিয়া॥

। ৩৩৭ ।

"ও মোর ভশুরা[২],
খাবার তমরা[৩] অসুরা[৪]।
—ভাত খাবেন তে ছোয়া নেও[৫]॥"
"ও মোর ভাউশানী[৬] গে,
যেনং[৭] তমার মুখের আও
খাই-খাই পছিয়ার বাও[৮]।
গালাত ফাঁসি নাগেয়া॥
মোক[৯] মরিবা' মনাছে[১০]॥"

। ৩ ৮ ।

শুন্ একটা হাউসালের[১১] কাথা:
হাউস করিবা'[১২] যাবা'[১৩] না দে'[১৪]
হাউসালের মাইয়া[১৫]॥
মুই গেছু ভাই সাজেবা'[১৬]—
চল্ রে দাদা, হাউস করিবা':
হাউসালের মাইয়াটার ধইল্লে আগ[১৭],
ছোয়াটাক আনিয়া দিলেক কলাত[১৮]।
ছোয়াটা কহচে[১৯]—বাপ্ রে বাপ্!

১ কলাগাছের গোড়া পোড়াইয়া, যে ছাই হয়, তাহার ভিজা জল। লবণের বদলে বা এমনি তরকারিতে খাওয়া হইয়া থাকে ২ ভাশুর ৩ তুমি, 'আপনি'। বহুবচন হইলেও আসলে এক বচনের অর্থে প্রযুক্ত ৪ অসুর। ভাত খাওয়ার যম ৫ ভাত খাইতে চাও তো ছোটো ছেলেটাকে খানিক কোলে নাও ৬ ভাদ্রবধূ ৭ যে রকম ৮ পশ্চিমা ঝড়ের মতো থরথরে ৯ আমাকে। 'আমার' এই অর্থে ১০ মরিতে ইচ্ছা করিতেছে ১১ শৌখিন প্রেমিক পুরুষ ১২ করিবার, করিতে ১৩ যাইবার, যাইতে ১৪ দেয়না ১৫ স্ত্রী ১৬ আমি সাজাইয়া দিতে গেলাম ১৭ রাগ ধরিল ১৮ কোলে ১৯ কহিতেছে।

। ৩৩৯ ।

কইন্যা, নাই বুঝিতে নাই সুজিতে
ঢালিয়া দিলো গল্‌গলেয়া ।
পিঠি ছুবিলেন[১] ভাতের মাড়ি দিয়া ॥
কইন্যা, মাছি শালা হইলেক বাদী
পিঠিত্‌ দিল্‌ মোর ছানি পাড়ি[২] ।
ফেনী ত্যালোত[৩] ফুরাইসে ড্যাট্টাকা[৪] ॥
আজি গাওখান করেছে ন্যাতের-ব্যাতের[৫]—
থাকিস বন্ধু বসিয়া ।
আইসে'া[৬] মুই গাও ধুইয়া ॥

১ পোড়াইলেন, পোড়াইলে ২ ছানা পাড়িয়া, ডিম পাড়িয়া ৩ ফিনাইল তেল-এ ৪ দেড় টাকা খরচ হইল ৫ ব্যথায় টনটন করিতেছে ৬ আসিতেছি । এই গানখানির কথান্তর পাওয়া গিয়াছে শ্রীলক্ষ্মীধর রায় (গাবুরারকুথ, প্রধানপাড়া, হলদিবাড়ী, কুচবিহার)-এর নিকট হইতে :

কইনা, আসিবার কলো[১] কড়ান মতো[২]
তোর বাড়ীত মান্‌ষি যতো ।
ভারী ঘরটাৎ[৩] মান্‌ষি না ধরে ॥
কইনা, কোন্‌ঠে[৪] বা তুই আছিস তুই
হাত বাড়েয়া[৫] ছাখোঁ[৬] মুই ।
হাতে পড়ে কার বালিশের উপরে ॥
কইনা, ওইদে'[৭] গেদু মাড়ার তলে
তুই নারী চড়াইছিস ভাত ।
আগম-নিগম না বুঝিলো[৮]—
হারাস করি'[৯] ফ্যালে দিলো[১০]
পিঠি ছুবিলো ভাতের মাড়ি দিয়া—
ঘাউয়াখানাত্‌ পড়িসে পোকা ।

কথান্তর :

১ বলিলি, কহিলি ২ চুক্তি অনুযায়ী ৩ বাড়ীর বাহিরের ঘরে, বৈঠকখানায় ৪ কোনস্থানে ৫ বাড়াইয়া ৬ দেখি ৭ ওই দিক দিয়া ৮ অগ্রপশ্চাৎ ভাবিলি না ৯ হঠাৎ, গলুগল করিয়া ১০ ফেলিয়া দিলি ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৪০ ।

ও মোর ঘেগী বড়াই গে,
ঘ্যাগের উপর ছাড়াকাঠিখান[১]
মোক কেইনং শবাইসে[২] ॥
ঘেগার মাথাত টেরিয়া সিঁতা[৩]
ঘেগীর গালাত চাপকাঠি[৪] ।
উচল-দাঁতীর[৫] না নাগে নিসি[৬] ॥
ঘেগা কইনা, ঘেগী বর—
মিলিয়া দিসে পর্‌মেশর ।
কোপালত মিলাইসে একটা কানা রে মিত্তর[৭] ॥

। ৩৪১ ।

আরে মোশা,
প্যাটকেনা তোর ভাংভুমাডুম্ করে ।
এ্যাখেতে[৮] বাঁশবাড়ীর মোশা
কামড়ালো পড়ে ফোসা[৯]—
মোশার কামুড়ে প্রাণ মোর যায় রে ॥
মোশারে কামুড়ে ঘরে দিনু ধুঁয়া—
গালে পড়িয়া মোশা কহে পিরিতির কাথা ॥
মোশার কামুড়ে রে মুই গেনু বাপের বাড়ী
পিরিতি করিয়া মোশা বেড়ায় টাড়ীটাড়ী[১০] ॥

১ গলার অলঙ্কার বিশেষ ২ কিরূপ মানাইয়াছে ৩ বাঁকা সিঁথি ৪ গলার অলঙ্কার বিশেষ ৫ যে মেয়ের দাঁত উঁচু ৬ মিসি ৭ মিতবর ৮ একে তো ৯ ফোস্কা ১০ পাড়ায় পাড়ায় ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৪২ ।

ছি ছি, মোক নাজ নাগেছে।
বেটীছাওয়ায়[১] তাস খেলাছে—
—কি হইল্ ভগোমান ॥

চ্যাঙ্গেড়া[২] গিলা[৩] বড়য় শয়তান—
চুলকিয়া[৪] দ্যাখেছে পানের টেকাখান[৫] ॥

নানা অঙ্গের হছে খেলা
কাঁহো কাঁহো খাছে গুয়াপান।
চুল্‌কিয়া দ্যাখেছে পানের টেকাখান ॥

। ৩৪২ক ।

মাই, যাবো না কিন্[৬] গে—
চান্-মারীটা[৭] নোকে ভরিছে ॥

সাহেব নোকের দৌড়াদৌড়ি
বিবি নোকে হাসেছে।
চান্-মারীটা নোকে ভরিছে ॥

১ মেয়ে ছেলেরা ২ ছোকরা ৩ গুলি ৪ উঁকি দিয়া ৫ তাস খেলিতে খেলিতে মেয়েটির দেহের স্থান বিশেষের কাপড় সরিয়া গিয়াছিল, টেকার মূল্য তাস খেলায় সর্বাধিক। দেহের সেইস্থানটিকে টেকার সহিত তুলনা করা হইতেছে ৬ নাকি ৭ চাঁদ-মারী। জলপাইগুড়ির রেসকোর্সের মাঠ। পূর্বে এই মাঠে ইউরোপীয়গণ পোলো, গল্ফ ইত্যাদি খেলিত।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৪৩ ।

বাভোণের[১] বাড়ীত্ চাথিরি করে
কোন শালা গে কোন শালা।
বাভোণের বাড়ীত্ চাথিরি করে…
বাভোণ খায় রে লুচি-পুরি
হামাক[২] খিলায়[৩] কাঁচাকেলা ॥
তুই শালা আর মুই শালা
বিচিয়া বাইগন[৪] আর কাঁচাকেলা।
বাভোণের বাড়ীত্ চাথিরি করে… ॥

১ ব্রাহ্মণের ২ আমাদের, আমাকে ৩ খাওয়ায় ৪ যে বেগুনের বিচি হইয়া গিয়াছে।

চাকরের কর্ম-জীবনের দুঃখের গান আরো পাইয়াছি। উপরের গানটির সহিত তুলনীয় অপর একটি গান এই :

ওকি বাপরে বাপ—
মুই তোর না পারোঁ রে
একলা বাড়ীর কাম করিবার।
কাম করি'র না মোনার মোক ১
কাম করি মুই কিসে।
কাম করি'র না মোনায় মোক
এই কমরটার বিষে।
কিসের কি মোর কমরের বিষ
নাঠির ঠেকা দিয়া হাটোঁ।
কিসের কি মোর মাথার বিষ
গলুগলেয়া ছাঁদো ২।
আলোক নতা বাঁশের পাতা
ইন্দ্র পাতার ছাল।
তাক দিয়া জল গরম করি'
মোর কমরে ঢাল

১ আমার কাজ করিতে ইচ্ছা হয়না ২ গলুগলু করিয়া বমি করি।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৪৪ ।

বুড়াটা হরি-নামের মালা জপে,—
একাদশীর বর্ত করে।
সেই বুড়াটা আড়ী নিবা' চায়[১]—
মরি হায় রে হায়॥
উয়ার বড় বেটা উঠিয়া কয়,
আড়ী নিবা' হবা' না-হয়।
ওই আড়ী মোরে নেওয়ার হয়।
মরি হায় রে হায়॥
বুড়া হোঁকা-ছিলিম-তামাক-ভূতি[২]
নিলে আলির মাথাতে।
ওইলা কাথা গাফাগুফা[৩] করে॥

। ৩৪৫ ।

লাইন ভাঙ্গিয়া করিসে ধাই-ধাই[৪]।
ও মোর আবো গে,
চল্ ক্যানে ভাঙ্গা দেখিবা' যাই॥
রবিরাম নেউনিয়ার জোতত্ গে
ঠাকুর বোলে উঠিসে।
কি ভাটিয়া কি বাঙালী,
মাইয়া-ছোয়া যায় সকলি,
কাঁহো নিগায়[৫] দুধ-কদলী,—
ধূপ-ধুনা আর চিনি-মিঠাই।
—চল্ গে আবো,
হামরাও নিগাই॥

১ বিধবাকে বিবাহ করিতে চায় ২ তামাকে আগুন ধরাইবার জন্য খড় পাকাইয়া তাহাতে আগুন জাগাইয়া রাখা হয়। ইহাকেই বলে 'ভূতি' ৩ আলোচনা ৪ রেল লাইন ভাঙ্গিয়া ধুধু হইয়া গিয়াছে ৫ লইয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

ওই যার যে বাসনা ও মোর আবো গে,
পূরণ বোলে করেছে।
ওগে নি-ভাতারীক[1] ভাতার গ্যাছে
ছাওয়া-ছোটার বর:মানেছে।
চল্ গে আবো, হামরাও[2] যাই,—
হোর্ ভাখ আবো, মোরো ভাতার নাই॥

। ৩৪৬।

শুনিবো যদি অসের[3] গান
দিয়া যাবেন মন;
সৈয়বালীর গান শুনিলে
নাগে অনেকক্ষণ।
—গানখান শুনিতে হোবে রে॥
সৈয়বালীর হাটত্[4] যায়
মাথাত্ পানের বিসী[5]।
আস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাছে
ভদ্রনোকের বেটী॥
—হাতখান টেরেঙ্গে[6] যাছে রে।
বারো গাছি গুয়া রে মোর
তের গাছি পান;
তার তলত্ সৈয়বালী
জুড়িছে দকান[7]॥
—দকানখান মেলিয়া দিছে রে॥
সৈয়বালী গুয়া খায়
ঝিঁকিয়া ফেলায় পিক;
যার দিকে দিষ্টি করে
কাঢ়িয়া নেয় তার জীব্।
—দকানখান মেলিয়া দিছে রে॥

১ যাহার স্বামী নাই, তাহাকে ২ আমারও ৩ রসের ৪ হাটে ৫ পানের বোঝা ৬ দোলায়িত করিয়া, তরঙ্গায়িত করিয়া ৭ দোকান দিয়াছে। দিয়াছে অর্থে 'জুড়িয়াছে'।

। ৩৪৭ ।

সারি সারি হাট বেসাইতে[1] যায় যতো নারী—
যাছে নন্দর বউ ;
নয়া নওদারী[2] ॥
কালশোরী, কালটি, ঘটিয়ার বেটী ;
হাতত্ শাংকা, দাঁতত্ মিসি।
মনশোরীটার চিক্কির হাসি[3]
পানখায়া মুখ আঙা টক্-টক্ কইচ্চে বিলাসী ॥
ও যাছে চানমণি পিন্ধি চুনারি[4]।
আগত্ যাছে বাইগন-বেচী
পাছত্ যাছে চান্দর চাচী।
হাতাশু-র মাও হাতত্ নিছে চাউল-বেচা খুঁচি ॥
ভোকশোরী ভাতার-দুলালী
হার-হাঁসুলি, কানত্ বেলি[5]।
উপের জোরে ঝলমল্-ঝলমল্ যায়ছে ঝলমলি ॥

। ৩৪৮ ।

কতয় নোক অং-বেরঙের[6] বান্নিশ মেলা[7],—
কাঁহো নিছে মাথাত্ ত্যাল—
কারো খপা হাদেল্-ত্যাল্ ;
পানগুয়া খায়া কাঁহো
মুখ করিছে লাল।

১ বেসাতি করিতে ২ নববধূ ৩ মুচ্‌কি হাসি ৪ এক ধরণের রঙীন শাড়ী ৫ কর্ণাভরণ বিশেষ ৬ অর্থাৎ বিচিত্র ধরণের ৭ বার্ণিশ মেলা। শহর জলপাইগুড়ির আট মাইল পূর্বে অবস্থিত জল্পেশ তীর্থ। এখানে সতীদেহের বাম পদ পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর শিব-রাত্রির দিন হইতে এক মাস ধরিয়া এক মেলা হয়। ইহা জলপাইগুড়ির সবচেয়ে বড়ো মেলা। গানটিতে এই মেলা উপলক্ষে স্নান-তর্পণ এবং দোকান-পাটের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

—আস্তা উপে উজালা[১]
কারো হাতত্ জলের নটা,
কারো মাথাত্ পানের বঝা ;
ছুহ-চুঁড়া খায়া কাঁহো
প্যাট করেছে মোটা।
আস্তাত্ না যায় হুড় ঠেলা[২] ॥

বহো গোঙ্গা উত্রো সোত[৩]
তায় হইল্ ভাই বাত্রিশ যোগ ॥
ছান-ছিনান করেছে কত হিন্দুজাতি নোক।
কীর্ত্তিনীয়ায় কীর্ত্তন করে
বামনে বেদ-মন্ত্র পড়ে।
বাপের নামে পিণ্ড ত্যাচে
হাটুয়া পাড়িয়া[৪]
আস্তাত্ না যায় হুড় ঠেলা ॥

পূব সারি ভুজারি[৫] সারি
দক্ষিণে ঢাকোয়াল[৬] পট্টি।
বিচখানে[৭] বাসনের দকান
বেচায় থালঘটি।
কাঁহো বেচায় মরিচ-মশলা :
আস্তাত্ না যায় হুড় ঠেলা ॥

১ উজ্জ্বল ২ ভিড় ঠেলা ৩ উত্তর স্রোত। উত্তর বাহিনী গঙ্গার মতো পবিত্র ৪ হাঁটু পাতিয়া
৫ মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা ৬ সওদাগর বিশেষ ৭ মাঝখানে।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৪৯ ।

বেটীয়া-আউলী-গিলা[১] করেছে গপ্[২]—
জগ্দল হাটের[৩] পথত্ :
মোর বেটার নাথা[৪] সোন্ডত[৫] আছে কাঁয়[৬]
য্যামন-ত্যামন[৭] বেটীক জোয়াই[৮]
সবে বায়না হয়[৯] ॥
যেলা মাই মোর ভুকায় ধান[১০]
সেলা উল্টে কইল্জা খান[১১] ।
আর খাড়ীর কোণটা হল্হলাছে
য্যামন পুন্নিমার চান[১২] ॥
যেলা মাই মোর ত্যালতুল বুলায়[১৩]
পছিয়া বাতাস মধু গগনে উড়ায় ।
ঝেচু-কাউয়া[১৪] কতো মধু,
ফাঁকোতে[১৫] ধরিয়া খায় ॥
নথ, চাকী, চন্দ্রহার—
হাতত্ খাড়ু, বাঁকতার,
কানত্ দিছে তোড়লপাত,
মোর ছোওয়া[১৬] হেউতিয়া-জাত[১৭] ।
দুধের সর গে দুধের সর—
জুতে-জাতে গড়-গড়[১৮] ;
উঁচল-বুকি[১৯], কমর খাল[২০]—
হায় রে বাছা চান্দিমাল[২১] ।

১ মেয়ে-ওয়ালী যাহারা অর্থাৎ মেয়ের মায়েরা ২ গল্প ৩ পঁচাগড়ের অন্তর্ভুক্ত একটি হাট। পঁচাগড় থানা বর্তমানে বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ৪ মতো ৫ সুন্দর ৬ কে ৭ যেখানে খুশি সেখানে ৮ বিবাহের সম্বন্ধ করি ৯ যেখানেই মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করি না কেন, সেখানেই বরপক্ষ মেয়েকে লইতে রাজী হয় ১০ ধান ভানে ১১ তখন তাহা দেখিয়া (পুরুষদের) মন উল্টাইয়া যায় (অর্থাৎ তাহারা মোহিত হইয়া যায়) ১২ শাড়ীর আঁচলটি পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করে ১৩ তেল ইত্যাদি মাখিয়া সাজে ১৪ ফিঙে পাখী ১৫ এমনিতেই ১৬ আমার মেয়ে ১৭ হৈমন্তিক ধানের মতো সুন্দর ১৮ ছিপ্‌ছিপে, সুন্দর ১৯ সুপুষ্ট বুক ২০ সরু কোমর ২১ চাঁদের মতো।

CENTRAL LIBRARY

চেঙ্গড়া-দুলালী মোর বেটা গে—
বারোমাসি কাঁঠোয়াল[১]
চেঙ্গড়া-গিলা হাউলি' যায়[২]
ভরতা[৩] দিয়া ভাত খায়।
সোগায় কহে,-ছোটো মাই—
শাক নাইতে, নাই নাই[৪]।
খাড়ীর বাওতে[৫] চেনার জীবন[৬]
ঠাণ্ডা হইল, গে মাই—
পান খায়া বাড়ী যাই[৭]॥

১ বারোমেসে কাঁঠালের মতো। ২ আকৃষ্ট হইয়া উঠে ৩ সিদ্ধ ৪ আমার মেয়ে এতোই সুন্দর যে, পুরুষেরা তাহাকে দেখিয়া তরকারি ছাড়াই ভাত খাইতে পারে ৫ আঁচলের হাওয়ায় ৬ অবিবাহিত যুবকের জীবন-যৌবন আমার মেয়ের আঁচলের স্পর্শে ধন্য হইয়া যায় ৭ গানের সমাপ্তি-সূচক পঙ্‌ক্তি, গায়কের উক্তি। গানটির রচনাভঙ্গিতে পাঁচালী ও হোলির ছাপ আছে।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৫০ ।

॥ হালুয়া-হালুয়ানী ॥

[লাঙ্গল-জোঙ্গাল হাতে লইয়া হালুয়া গান করিতে করিতে আসিতেছে—

॥ গান ॥

ও মুই বাইর হনু[১] রে
নতুন ব'সের হালুয়া[২]
কোনোয়[৩] গিরিয়ে[৪] হাল না দেয়[৫]
ও মোর মাইয়া গ্যাদেরা[৬] ॥
মুই যাছোঁ[৭] হালো-বাড়ী[৮]—
ছোয়া বেড়ায় টাড়ী-বাড়ী[৯] :
কান্দিয়া বেড়ায়—
বাপ্‌রে কি বাপ্‌রে করিয়া ॥
মাইয়া[১০] চাহাচে ছিলিকের শাড়ী[১১],
হাতোত্‌ নাই মোর টাকা-কড়ি—
মাইয়া ধরিছে বাহেনা[১২] ॥

[হালুয়ার আসরে প্রবেশ

জনৈক পথিক ॥ কি রে হালুয়া, খুবে[১৩] যে দুঃখো করেছিত্‌[১৪] ?

হালুয়া ॥ দাদা, কি আর কহিম মোর দুঃখের কাথা। কহিলে আর চলে না[১৫], মাইয়া শালী মোর কাথায়[১৬] শুনে না।

জঃ পঃ ॥ কেনং, কহ দি'[১৭] ?

১ বাহির হইলাম ২ অল্প বয়সের কৃষক ৩ কেহই ৪ গৃহস্থই ৫ চাষ করিবার জন্য আমাকে ভূমি দেয়না। 'হাল না দেওয়া' অর্থ প্রজা হিসাবে জমি চাষ করিতে না দেওয়া ৬ বোকা, বে-হিসাবি, অপরিষ্কার ইত্যাদি অর্থে ৭ যাইতেছি ৮ হাল বহা হয় যেখানে, অর্থাৎ ক্ষেতে ৯ পাড়ায় পাড়ায় ১০ বউ ১১ সিল্কের শাড়ী চাহিতেছে ১২ বায়না ১৩ খুবই ১৪ করিতেছিস ১৫ কওয়া যায়না ১৬ কথাই ১৭ কি রকম, বল দেখি।

হালুয়া ॥ ॥ গান ॥

মাইয়ার বড়ো ঠেলা রে দাদা,
মাইয়ার বড়ো ঠেলা।
মাইয়া পিন্ধেচে অং-চঙের পাটানী
মোর কাঙ্গোতে[১] ছিঁড়া খ্যাতা[২] ॥
ওরে ঢেনা[৩] ছিনু, ভালো রে ছিনু।
বিহো[৪] করিয়া জালাত পইনু—
মাইয়া এলা[৫] ধরিছে বাহেনা ॥

জঃ পঃ ॥ ভাই, তুই যে এতোলা[৬] কাথা কহিলো, মুই তো কিছুই বুঝিবা[৭] নাই পানু।

হালুয়া ॥ ভাই, তুই যখন মোর কথাটা কিছুই বুঝিবা' নাই পারলো[৮], তো দেখেক মোর অবস্থা। এই দেখেক চিঁড়া[৯] ধুতিটা, চিঁড়া পিরানটা, চিঁড়া পাগুড়িটা, চিঁড়া গামছাটা। যেইঠে হাত স্থাছো[১০] ভাই, সেইঠেই[১১] চিঁড়া। কহ কেনে, মোর নাখান[১২] দুঃখ আর কার আছে। ঢেনা ছিনু যেলা, সেলা ভাই জুতা পিন্ধিছুঁ, জামা পরিছুঁ।

জঃ পঃ ॥ অ' হ' তোর তো খুবে দুঃখ!

হালুয়া ॥ দুঃখের কাথা না কহিস রে। মোর দুঃখের কাথা শুনিলে আতি না পোহায়[১৩]। চকুর পানি না নহে[১৪]। তো মুই এলা কণেক হাল বহাবা' যাঙ[১৫]।

[পথিকের প্রস্থান। হালুয়া হাল বহিতে লাগিল। হাল বহিয়া ক্লান্ত হইল। শেষে দেখিল, নিকটেই একটি যুবতী আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সে গান গাহিতে লাগিল—

১ কাঁধে ২ ছেঁড়া কাপড় ৩ অবিবাহিত ৪ বিবাহ ৫ এখন ৬ এতোগুলি ৭ বুঝিবার ৮ পারিলি ৯ ছেঁড়া ১০ যেখানেই হাত দিতেছি ১১ সেইখানেই ১২ মতো ১৩ রাত্রি পোহাইয়া যায়, তবু দুঃখ শেষ হয়না ১৪ না রহে ১৫ এখন আমি একটু হাল বহিতে যাই।

CENTRAL LIBRARY

হালুয়া ॥ ॥ গান ॥

এক-পাক, দুই-পাক হাল বয়হা রে
নদারীক দেখোঁ[১]—
মনটা কহচে রে[২] শালার
এইঠে রে বসোঁ[৩] ॥

[লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হালুয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সেই পথিকের পুনরায় প্রবেশ। সে কহিল—

জঃ পঃ ॥ কি রে হালুয়া, হাল ছাড়ি' দিয়া তুই বসি' গেলো যে ?

[পথিকের কথায় হালুয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হালের মুঠি ধরিয়া হাল বহিতে বহিতে গাহিতে লাগিল—

হালুয়া ॥ ॥ গান ॥

ও মোর এ্যাল গাড়ী রে,
তামানে[৪] কলে রে চলে।
দেখা দে গে মাই তুই নানান ছলে ॥

[গান গাহিতে গাহিতে আবার সে লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। পথিক কহিল—

জঃ পঃ ॥ কি রে হালুয়া, হাল ছাড়ি' দিয়া তুই বসি' গেলো যে ?

[হালুয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাল বহিতে বহিতে গাহিতে লাগিল—

হালুয়া ॥ ॥ গান ॥

একপাক, দুইপাক, হাল বয়হা রে,
নদারীক দেখোঁ—
মনটা কহচে রে শালার
এইঠে রে থাকুঁ[৫] ॥

[লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হালুয়া এবার ক্ষেতের উপর শুইয়া পড়িল। পথিক কহিল—

জঃ পঃ ॥ কি রে হালুয়া, হাল ছাড়ি' দিয়া থাকিলো যে ?

১ নববধূকে দেখি ২ মনটা কহিতেছে ৩ এইখানে বসি ৪ সবই ৫ শুই।

হালুয়া ॥ আর মোর দুঃখের কাথা না কইস। সোগারে মাইয়া খোরাক[১] ধরি' আসিল্। মোর মাইয়া এলাও নাই আইসে। ভোকে-তিষ্‌যায় জানটা মোর নিক্‌লিবা' ধইচ্ছে[২]।

পথিক ॥ ত্থাখেক হালুয়া, তোক একনা কাথা কওঁ। তোর মাইয়া যখন তোর ময়হা[৩] না করে, তখন তুই উয়ার ময়হা কি করিবো। মোর কাথা ধর,—হাল ছাড়ি' দিয়া তুই নিধুয়া পাথারত্ চলি' যা।

[মনের খেদে হালুয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। এদিকে হালুয়ানী টোপলা বাঁধিয়া হালুয়ার খাদ্য-দ্রব্যাদি লইয়া গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল—

হালুয়ানী ॥ ॥ গান ॥

ওগে ননন বাই[৪],
যার হালুয়া গেইসে পাছে—
তার হালুয়া আসিল্ আগে।
মোর হালুয়ার এলাও নাগাল নাই ॥
ওগে ননন বাই,
এক কাঠা চাউলের গুণ্ডা[৫]
হাতোত্ নোটা, পিঠিত্ ছোয়া—
হাটুনি ফাবেনারে[৬] দূরের হালুয়া ॥

[পথিক তাহাকে বলিল—

পথিক ॥ হ' বা'রে বুড়ীর বেটী[৭], তমরা[৮] কোনঠে যাবেন ?

হালুয়ানী ॥ রে বা'[৯], মুই কোন্‌ঠে আর যাইম,—মোর হালুয়াটা গেইসে মাঠে,—উয়াক[১০] যাছো খোরাক দিবা'।

পথিক ॥ তমার হালুয়া তো নাই, উয়ায় পালাইসে!

হালুয়ানী ॥ পালাইসে ? কোনঠে পালাইসে ? কিতায় পালাইসে ?

পথিক ॥ হা বা'রে, যে ভোক নাগাইসে[১১] উয়ার,—হাল ছাড়ি' দিয়া উয়ায় পালাইসে।

১ খাদ্য লইয়া ২ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে ৩ মায়া ৪ ননদিনী দিদি ৫ গুঁড়া ৬ হাঁটিয়া সহজে আসা যায় না ৭ নারীকে সম্মান দেখাইবার সম্বোধন ৮ তুমি। 'আপনি' অর্থে ৯ পুরুষকে সম্বোধন ১০ উহাকে ১১ লাগিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

হালুয়ানী॥ কহদি'[1] মোক, উয়ায় কোনঠে পালাইল্। মুই দেখোঁ দি কণেক অংসেয়া[2] দেখোঁ।

পথিক॥ হোর্ দেখ্, উয়ায় ওই জোঙ্গলটাত্ পালাইসে।

[খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জঙ্গলের মধ্যে হালুয়ানী হালুয়ার সাক্ষাৎ পাইল। দুইজনের মিল হইল॥

। ৩৫০ ক।

॥ কালুয়া-ভেলুয়া ॥

[কালুয়া-ভেলুয়া দুই ভাই। একজনের হাতে সারিন্দা, অপর জনের হাতে দোতরা। এক জনের মুখোস লাল, অপর জনের মুখোস হলুদ। পথে তাহারা গান গাহিয়া চলিতেছে—

কালুয়া-ভেলুয়া॥ ॥ গান ॥

কালুয়া-ভেলুয়া দুই ভাই
অঙে সাজিছে।
সারিঙ্গা[3]-দতরার বাইজ
আপনে বাজিছে॥

[গানটি গাহিতে গাহিতে উভয়ের আসরে প্রবেশ। এবং একই গান উদ্দাম ভঙ্গিতে পাগলের মতো অনেকক্ষণ গাহিয়া চলিবে। এমন সময় এক পথিক প্রবেশ করিয়া বলে—

পথিক॥ কিরে ভাই, তমরা গান করিতে করিতে দুই ঝন[4] যে পাগল হয়া গেলেন। তমরা কাঁয় কহ দি'?

কাঃ ভেঃ॥ হামরা দুই ঝন ভাই হও।

পথিক॥ কাঁয় বড়ো?

কালুয়া॥ মুই বড়ো।

১ বল্ দেখি ২ অনুসন্ধান করিয়া, খুঁজিয়া ৩ সারিন্দা, বাদ্য যন্ত্র বিশেষ ৪ দুইজন।

ভেলুয়া ॥ মুইহে[১] বড়ো।

[এই লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রথমে ঝগড়া পরে মারামারি লাগিয়া যাইবে। সেই পথিক এই মারামারি ছাড়াইয়া দিবে। তারপর সে বলে—

পথিক ॥ ভাই, তমরা যেইনং অসিক[২], তাত্ মুই খুবে খুশি হইছুঁ। তো একনা গান শুনাও দি'।

কাঃ ভেঃ ॥ গান ॥

মনে বড়য় দুখ সখীরে,
চিতে বড়য় দুখ।
ওরে, নদীরো ধাদিনার[৩] মত
ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক।
ওরে মনোকে বুঝামো কতো
ওরে চিতল সখীরে॥
আজি যেইখানে-সেইখানে
ওরে বসি—
কান্দে মন মোর নিরবধি।
ওরে মাও নাইতে কাঁয় বুঝিবে
মোর মনের দুখ॥

[গান গাহিতে গাহিতে উভয়ে শেষে কাঁদিতে লাগিল

পথিক ॥ কিরে ভাই, তমরা গান-টান ছাড়ি' দিয়া কান্দি'র ধল্লেন যে?

কাঃ ভেঃ ॥ ভাই, হামার দুখের কাথা না পুছিস্। হামার বাপ নাই, মাও নাই, কাঁহোয় নাই। ভাই, তুই কোটে যাছিস—তুই যা। হামাক আর কিছু নাই পুছিস। তোর নগদ[৪] আলাপ করিতে করিতে হামার মাও-বাপোর কাথাটা ফম্[৫] পড়ি গেইল্।

[সকলের প্রস্থান

১ আমিই ২ যে রকম রসিক ৩ পাড়ের ৪ সঙ্গে ৫ মনে।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৫০ খ ।

॥ অসিক-বোলানদার ॥

[শিস্ দিতে দিতে রসিকের প্রবেশ—

বোলানদার[১] ॥ কিরে ভাই, তুই এই নাখান কেনে বেড়াছিত ? কহ, তোর কাথা ।

অসিক ॥ ভাই, মোর কাথা না পুছিস । মোর মনত্ সুখ্ খো নাইরো ।

বোলানদার ॥ কেনেরে, কি হইসে ?

অসিক ॥ ভাই, মুই ভোজীর নগদ কাচাল করিয়া[২] বাহির হইসুঁ ।

বোলানদার ॥ কেনং, কহ দি' ?

অসিক ॥ ॥ গান ॥

মোরে কোপাল পোড়া গে ভোজী,
মোরে কোপাল পোড়া ।
যেইঠে যাছুঁ মুই—
সেইঠে পোড়া ॥
মাও নাইতে কাটে পাক্সি[৩]—
জাড়ে-শীতে ওরে শালার দেহা
শাল খুটাটার নাখা ;—
ওরে শালার দেহা ॥

[উভয়ের প্রস্থান

। ৩৫০ গ ।

॥ নলুয়া-নলুয়ানী ॥

[বেটা-ছাওয়ার মুখা পরিয়া নলুয়ার[৪] প্রবেশ । হাতে ছিপ অর্থাৎ নল । সে ছিপ বেচিতে বাহির হইয়াছে। এক যুবকের সহিত তাহার দেখা হইল ।

যুবক ॥ হে বা' নলুয়া, কোনঠে যাছিত্ রে ?

১ যে কথা বলে ২ বউদির সহিত ঝগড়া করিয়া ৩ টাকু ঘোরানোকে 'পাক্সি' কাটা বলা হয় ৪ নল ধরিয়া শিকার করে যে ।

নলুয়া। কোনঠে আর যাইম্ বা', যাছো ছিপ ব্যাচেবা'।

যুবক। ছিপ ব্যাচেয়া করিবো কি ?

নলুয়া। কি আর করিম বা'রে, দুইটা ভাত-শাক খাইম। মোর দুখ্‌খের কাথা ভাই না কইস।

যুবক। কেনে, কি হইল্ তোর ?

নলুয়া। হোবে আর কি, গাবুর ব'স[১] মোর গড়েয়া গেইল্, এলাও মাইয়া নাই ঘরে। বিয়াও নাই হয়। পাইসা নাই, কাঁহোয় মোরঠে কইন্না না ব্যাচায়[২]।

যুবক। তো নলুয়া, মোর একনা কাথা শুনিবো ?

নলুয়া। কিতায় কি, কহো ক্যানে ?

যুবক। মুই কওঁ কি, তোরোঠে তো অ্যানেক ছিপ আছে। মোরোঠে অ্যাখেটাও নাইরো। ওইলা ছিপের বাদে মোর বড়য় হাউস। পাইসা নাই ক্যানং করি' কিনো। তো মুই কওঁ, ওইলা হাতে কয়খান ছিপ তুই মোক দে,—আর তুই মোর বইনিক বিয়াও কর।

নলুয়া। সাচায় কহছিস্ ? · নে ক্যানে এই তিনখান ছিপ।

[নলুয়ার সহিত উক্ত পথিক-যুবকের বোনের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। যুবকের বোনের নাম সন্ধ্যামণি। সে বাড়ী যাইয়া সন্ধ্যামণিকে তাহার বিবাহের কথা জানাইল।

যুবক। বইনি গে, বইনি, বাড়ীত্ আছিস গে ?

সন্ধ্যামণি। ক্যানে দাদা, কি পুছেছিস্ ?

যুবক। তোর বিয়াও ঠিক-ঠাক হয়া গেইসে।

সন্ধ্যা। কারে ঠে, কার নগদ[৩] ?

যুবক। ওই নলুয়াটার নগদ। খুবে ভাল্-মানুষি। মোক তিনটা ছিপ দিলেক ফাঁকোতে[৪]।

সন্ধ্যা। মুই উয়ার নগদ বিয়াও নাই বইসোঁ।

যুবক। কিতায়, কি হইল্ ?

১ যৌবন বয়স ২ বিবাহ দেওয়া ৩ সঙ্গে ৪ এমনিতে।

সন্ধ্যা। উয়াক মোর মনতে না-পায়। উয়ায় আরো ছিপ-ব্যাচেয়া খায়। ওই ছিপ-বেচা নলুয়াগিলাক মুই নাই দেখি'র পারো'।।

যুবক। বইনি গে, তুই আর যেইমন্-তেইমন্[১] না করিস। মুই আও[২] দিয়া আইচো'।।

সন্ধ্যা। ॥ গান ॥

মুই তো ভালো-নোকের ছেলে—
নামে সন্ধ্যামণি।
হায় রে দারুণো বিধি,
এই ছিলো নসিবের কোপালের নেখা॥
ও মোর দাদা গে,
নসিবের হাতত্ খান ব্যাচেয়া॥

যুবক। যা হয়া গেইসে, তা হবে।

[সন্ধ্যামণির সহিত নলুয়ার বিবাহ হইয়া গেল। সন্ধ্যামণি নলুয়ার বাড়ীতে আসিয়া ঘর করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা। মোক আন্ধিবা'[৩] মনায় না। ঘরে ত্যাল নাই, শাক নাই, নুন নাই। কি আন্দিম ?

নলুয়া। যা কেনে, কাইন্টা-বাড়ী[৪] হাতে ঢেঁকিয়া-শাকগিলা নিয়া আয় কেনে। আর ওই পুব-পাখের কালা কচুলা।···মোর নাথান কচু-ঢেঁকিয়া বড়ো নোকেও খাবা না পারে। উমায় ঘর খায় কি,— মাছ। আন্দে কি দিয়া—ঘিউ দিয়া। উমায় না পারে কচু-ঢেঁকিয়া খাবা', না আন্দে ত্যাল দিয়া।

সন্ধ্যা। মোর কোপালত্ এইটায় ছিলো রে নলুয়া···হই, সোয়ামীক তো আর নিন্দা কোরা না যায়!

[সন্ধ্যামণির প্রস্থান। আর একদিনের কথা—

নলুয়া। নলুয়ানী গে নলুয়ানী,—মুই তো নলুয়া। তুই হলো মোর মাইয়া। তো তুই হলো নলুয়ানী। চল্ হনোবনে যাই আজি ছিপ ব্যাচেবা'।

নলুয়ানী। তুই আগত্ যা। মুই পাছোত্ যাছো।

১ আপত্তি ২ কথা ৩ রাঁধিতে ৪ বাড়ীর পিছন।

নলুয়া॥ তুই হলো নওদারী[1] মানুষি। টাড়ীর[2] চেঙ্গেড়াগিলা খুবে খারাপ। নলুয়া তো বাড়ীত্ নাই, সেলা ঘর স্যান্দেয়া হেনে করে, নলুয়ানীক্ ধর্ এলা। কোন্ চেঙ্গেড়াটা কি করে তার ঠিক-পাত্তা নাইরো।

নলুয়ানী॥ উমার-ঘর মোক আরো কি করিবে?

নলুয়া॥ তুই এলাও ছাইলা-পুতার মাও হইস নাই। সোগারে নজরত্ পড়ি' যাবো। চল্ মোরে নগদ ছিপ ব্যাচেবা' যাবো।

নলুয়ানী॥ মোর শরম নাগাছে, তোরে নগদ যাবা'। তুই আগত্ যা, মুই সেলা পাছত্ যাইম্।

নলুয়া॥ হে নলুয়ানী, তুই মোর এ্যাখেটা কাথায় নাই শুনিস।

[ছিপ লইয়া প্রস্থান

নলুয়ানী॥ ॥ গান ॥

বাও নাই, বাতাস নাই,
ও মোর নলুয়া রে—
তোর নল কেইসা হালে[3] রে।
ও মোর নলুয়ারে,—
মোর কোপালে এই ছিলো রে নেখা,
ও মুই হনু নলুয়ানীরে॥

[শেষে নলুয়ানীও স্বামীর পিছু-পিছু আসিতে লাগিল। পথে আসিয়া দুই জনে হাত ধরিয়া হাঁটিয়া চলিল।

১ নতুন বউ ২ পাড়ার ৩ কেমন করিয়া হেলিয়া পড়ে।

CENTRAL LIBRARY

॥ রঙ-পাঁচালি ॥

। ৩৫১ ।

॥ গুলাপীশ্বরীর পালা ॥

॥ বন্দনা ॥

দেব সত্য যুগের নারায়ণ শিব
তৃতীয়াতে রাম।
দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ ;
ওরে একজন তোমরা পঞ্চজন।
আইস প্রভু দয়াময়, করি নিবেদন॥
আসিয়া ছত্র ধর মস্তকের উপর ;
বসিয়া মালা গাঁথ হৃদয়ের ভিতর।
ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা কর আজিকার আসর॥
ওকি ওই মরি রে,
শক্তি লক্ষ্মী সরস্বতী
...[১] স্বর্গের হীরা নটী রম্ভাবতী
অনুরোধ[২], ঊষা—
গীত গাওনে[৩] মোর দেও ভরসা॥

॥ পালা আরম্ভ ॥

। প্রথম অঙ্ক ।

....

নাম বুড়াটা [র] ভোরলখাটি,—
তাহার দুইজন আছে বেটা।
দোন বহিনীর নাম রাখিছে—
জুলাপী, গুলাপী॥

১ এই স্থানে একটি শব্দ বোঝা গেল না ২ অনিরুদ্ধ ৩ গাওনা, যে গান করা হইবে।

তোমরা শুন রে শুন :
বড় বেটীক বেচায় খাইছে[১]—
ছোট বেটীটা গাভুর হইছে ;
এলা[২] গুলাপীটা
বেহাবার লাইক[৩] হয়া গেইছে[৪] রে।
সঙ্গত্ বর-ঘর[৫]
না আসে এখয় ঘরে[৬] রে ॥
ওকি হায় রে,
মরি হায় হায় রে হায়,—
এলা ওই গুলাপীটা··· ॥
·········· ·······[৭]

॥ ভোরলকাটি বুড়ার গান ॥

ছাগল ভেবাছে[৮] ছাগল-ঘরত্
বুড়া-বুড়ীর হইচে ধাকুরবাত্[৯]।
বেটীটা হইছে বোমপাল[১০]—
না করে কাম-কাজ ॥
তোমরা শুন রে শুন,—
ওরে বেলাটা ভাই বড় হইছে—
ছাগল-ছেলীরা[১১] বান্ধিবা' আছে[১২] ॥
···············

১ বিবাহ দিয়াছে। কন্যার পিতাই পণের টাকা পাইয়া থাকে, এইজন্য মেয়েকে বিবাহ দেওয়াকে 'বেচিয়া খাওয়া' বলে ২ এখন ৩ বিবাহের যোগ্য ৪ হইয়া গিয়াছে ৫ উপযুক্ত, সঙ্গত বর-ঘর ৬ একটিও ঘর হইতে ৭ বিন্দু-চিহ্নিত অংশগুলি গায়ক কর্তৃক নাট্য-কাহিনীর বর্ণনা ৮ ডাকিতেছে ৯ কষ্ট, ঝামেলা ১০ পাড়া-বেড়ানী ১১ ছাগল-টাগল ইত্যাদি ১২ বান্ধিবার আছে, বাঁধিতে হইবে।

CENTRAL LIBRARY

এলা গুলাপীটা ওরে
ছাগল বান্ধিবা' গেল্ ভাই
ঘরের পছিমতি[১]।
বান্ধিবা' গেল্ ভাই নদীরতি[২]।
ওরে ছাগল বাইন্তে[৩]
ফম্ পড়েছে[৪] নানান জাতি[৫] ॥
....

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

ওগে, কি কপাল ধরিয়া আছিছু[৬]
মোর এলাও[৭] না হয় বেহা।
দিনে দিনে রূপ-শোভাং মোর
যাছে তো চলিয়া ॥
ওগে, আর কিছু দিন যা'লে—
কন্টা চেঙ্গড়ার মুই থাম্ পসন্[৮]।
কিতায়[৯] গে মোর না হয় মরণ ॥
কি খায়া মাই তুই জড়াবো দেহা[১০]।
ওরে হায় রে অভাগীর মন,
চল্ বগ্‌রি খাবা'[১১] ॥
খা রে মন খা,—
বগ্‌রি খায়া তুই পূরা আশাধন।
ওরে সোয়ামী নাই তে[১২]
অভাগীর কাঁয়[১৩] পূরাবে মন ॥

১ পশ্চিম দিকে ২ নদীর দিকে, ধারে ৩ বাঁধিতে ৪ মনে পড়িতেছে, স্মরণে আসিতেছে ৫ নানান ধরণের কথা ৬ আসিয়াছি ৭ এখনও ৮ পছন্দ হইব ৯ কি জন্যে ১০ দেহ ধারণ করা—এই অর্থে ১১ কুল খাইতে ১২ নাই যে, নাই তো ১৩ কে।

CENTRAL LIBRARY

ওগে, দিনে দিনে বাহুড়িয়া[১] যাছে রূপ-রঙ।
ওগে, আপনা শোভাং মুই
আপনি দেখেচু[২] গে—
শোভাউ না কুমারীর মতন[৩] ॥
ও মোর বিধি রে বিধি,
ওরে কিনা কইচু[৪] তোর দোষ-গুনা[৫]।
কিতায় সোয়ামী মোর
না আসে ঢেনা[৬] ॥
ওরে মোর কপালে তামান তুল্‌হালায়[৭]
মগী-মরা[৮] আসেছে রে ॥
....
এলা গুলাপীটা ওরে
সিনান করিতে ঘাটে বসিয়া কান্দে রে।
দুই চইক্ষের জল পড়ে বয়হা[৯] রে।
ওরে কান্দিয়া, মুছিয়া, সিনান করিয়া
ঘর যাছে চলিয়া রে ॥
ওকি হায় রে মরি হায়,
হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায়,
এলা গুলাপীটা ওরে··· ॥
....
বগ্‌রি খায়া, নদী যায়া, সিনান করিয়া—
ঘর যাছে চলিয়া।
একটা চেঙ্গড়া ধুতি-ঝুলা[১০],
ওইটা চেঙ্গড়ার নাগাল পা'লে[১১]—
নামটা মনভুলা ॥
....

১ ফিরিয়া-ফিরিয়া, চলিয়া ২ দেখিতেছি ৩ এখন আর কুমারী হইয়া থাকা শোভা পায় না ৪ করিয়াছি ৫ দোষ-গুনাহ্‌ ৬ অবিবাহিত পুরুষ ৭ সমস্ত বরগুলিই ৮ মাগ অর্থাৎ স্ত্রী মৃত যাহার, বিপত্নীক ৯ বহিয়া ১০ কোঁচা যাহার ঝুলিয়া থাকে, শৌখীন, অকর্মণ্য পুরুষ। গালি বিশেষ ১১ পাইল।

॥ মনভুলার গান ॥

মনভুলা ডাকাছে[১] :
গুলাপী মাই, ওইঠে[২] গে রহিস—
কিসের ডরে ধ্যোৎ-ধোৎ করি'[৩]
মাই তুই পালাছিস্ ॥
ওগে, শুনতো, শুনতো, শুনতো মাই,
ওগে, সমন্ধের বহিনি হবো[৪],—
দে একটা বগ্ রি খাই ॥

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

দাদা গে,
কুনৃঠে[৫] দেখিলো[৬] মোর কোছায় বগ্ রি।
ওগে, বুঝিনু বুঝিনু গে দাদা
তোর মনের চাতুরী ॥
ওগে, হাত দিয়া নি-দিলো[৭],
হাত মুখ দিয়া দিলো।
ওগে, ঠারে-ঠোরে, আকারে-ওকারে
হৃদং[৮] মোর হাত দিলো ॥
ওই তুই মোর বড় দাদা গে,
তোক জানু[৯] মুই আপনার ভাইর লাথা[১০]।
ওগে, তোর গে দাদা ধর্ম নাই,—
পিসাইর[১১] বেটা হবো ভাই,
তোর মাওটা মোর হবে গে পিসাই ॥

১ ডাকিতেছে ২ ওই স্থানে ৩ ধড়-ফড় করিয়া, হুদ্দাড় করিয়া ৪ বহিনি হইবি। বোন হইস—এই অর্থে ৫ কোনস্থানে ৬ দেখিলি ৭ অর্থাৎ ঈষৎ স্পর্শ করিলি ৮ হৃদয়ে, স্তনে ৯ জানি ১০ ভাইয়ের মতো ১১ পিসিমার।

ওগে, মোর বাপটা
তোর হোবে মামা।
তোক জানে আপনার ভাগিনা।
কিতায়[১] দাদা করেচিস[২] গে তুই পাতকানা[৩] ॥
ওগে, হামার[৪] ঘর বেড়েবা' আছিস[৫],
বেটার নাথা গির্জ্জিয়া আছিস[৬]।
ওগে, বুঝা গেইল্ তোর গিয়ান-অকল[৭]
তুই করেছিস দোসরা ছল ॥
ওগে, এলায় মুই ঘর যায়া
ঘর যা'লে[৮] মুই দিম গে কয়হা[৯] ॥

....

গুলাপীশোরীক বুঝায়[১০]
কথা কহে মনভুলা :
বাই গে[১১], বাই গে, করিয়া ॥

....

॥ মনভুলার গান ॥

কথাটা মাই তুই মনত্ রাখিস,
কাঁহাকো মাই তুই কয়হা না দিস।
ঝুড়ি-খাড়ু[১২] গড়েহা[১৩] দিম তোক
ছুট বহিনি।
আরও দিম তোক ঝাঙ্গা-পাটানী[১৪] ॥

১ কি জন্যে ২ করিতেছিস ৩ যে পাতায় খাইতেছিস, তাহাই ছিদ্র করিতেছিস। অর্থাৎ যাহার আশ্রিত, তাহারই সর্বনাশ করিতেছিস ৪ আমাদের ৫ বেড়াইতে আসিয়াছিস ৬ গর্জন করিয়া আছিস অর্থাৎ আশ্রিত বলিয়া হেয় হইয়া নাই ৭ জ্ঞান-আক্কেল ৮ যাইলে, যাইয়া ৯ কহিয়া ১০ বুঝাইয়া ১১ দিদি গো ১২ অলঙ্কার বিশেষ ১৩ গড়াইয়া ১৪ রাজবংশী মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র।

যদি কাথাটা মনত্‌ রাখিবো
যেই চাহাবো, সেই পাবো[১]।
কামাই-শাঁখো[২] কিনিয়া দিম তোক
যাত্রার বেলা[৩] ;—
আরও দিম তোক বিরছা গে মালা[৪]॥
যদি কথাটা কয়হা দিবো
বাড়ীটাত্‌ মাই তুই কলং থুবো[৫]।
আরহো[৬] লোকে কহিবে :
ও মনভুলায় ধইছে[৭] হাত।
যেইঠে-সেইঠে[৮] মাই
তুহে[৯] খাবো লাজ[১০]॥

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

দাদা গে, সোনা-মালালা[১১] তোর
মুই কি করিম।
ওগে, দৈবক ঘটনা[১২] হোলে গে দাদা,
সেহা মুই কাহাকে সঁপিম[১৩]॥
অতয় করিয়া দাদা
বুঝিবার কার্য নাই।
ওগে, বেশী করি' বুঝালে দাদা
গালি খাবো ভাই॥

১ যাহা চাহিবি, তাহাই পাইবি ২ এক ধরণের শাঁখা ৩ দুর্গা-পূজার সময়। চলিয়া যাইবার সময়—এই অর্থেও নেওয়া যায় ৪ বিছাহার ৫ কলঙ্ক রাখিবি ৬ আরো, এবং ৭ ধরিয়াছে ৮ যেখানে-সেখানে ৯ তুই-ই ১০ লজ্জা পাইবি ১১ সোনার অলঙ্কার ও মালাগুলি ১২ দৈব ঘটনা ১৩ সঁপিব।

বুঝাইস্ না রে বেটার ছোওয়া
তোর মুখখানোত্ কণকয়[১] নাই যে লাজ।
হের্ দেখিস[২] তোর মাওটার
বঁয়া ঠেঙ্গে লাথ[৩]।
ওরে, লাজে হোক কি মোর শরমে হোক,
যেনং লোকের সেনং ঠেলা[৪]
লাগে গে তোক।

॥ মনভুলার গান ॥

যেই হবার হোবে[৫] মাই,—
তোক ধরিয়া লেগামু[৬]।
না জানি তে তোর পিছাত্[৭]
জেহেলখানার ভাত খামু।
ও আর এতই অহঙ্কার,
ওগে, না সহে মোর শরীলে।
না জায় তে ঘর-বাড়ী মোর
যাবে পিছাতে।

[গুলাপীর হাত ধরিল

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

ওগে, আয় গে আয়া[৮],
আগা[৯] গে, আগা—
মনভুলাটা মোক লেগাছে ধরিয়া।

১ একটুও ২ কোন কিছুর প্রতি কাহারও দৃষ্টি ও শ্রবণ আকর্ষণ করিবার জন্ত 'হের্', 'হোর্' ব্যবহৃত হয় ৩ বাম পায়ের লাথ ৪ যেমন লোক তার তেমনি শাস্তি ৫ যাহা হইবার হইবে ৬ ধরিয়া লইয়া যাইব ৭ তোর জন্যে ৮ দিদি ৯ অগ্রসর হ', আয়।

॥ মনভুলার গান ॥

ওগে, আয় গে মামী,
    আগা গে আগা,—
        মহুর হাঞ্চাটা[১] ধরিছে ঘেরিয়া.॥
যেই হবার হইল্ গে মাই,
    সোনার মোর আঙ্গঠিটায় লে[২]।
        মামাটার আগত্[৩] ছিলা কাথা[৪]
            তাঁহো কয়হা[৫] না দিস গে।
ওগে, চলিয়া আছেচে[৬] মামা-মামী—
    না করিস মাই টানাটানি।
        ঘোঙ্গর মারিয়া[৭] বসিয়া রহিমো
            দোন ভাই-বহিনি ॥
ওগে, ঠিকে এহোটা না হয় বুদ্ধি[৮],
    চল্ ঘুরিয়া যাই নদী ;—
        দোনঝনে খেলামো ডুবাডুবি ॥

[ব্যস্ত-ভাবে মামা-মামীর প্রবেশ

ওগে, একখান ঘরি দিলে ভাসায়[৯]—
    কোণেক হামা' গেনো উজায়[১০]।
        তে' নে[১১] হামাক ছাড়িয়া পালাল্
            মহুর হাঞ্চাটায় ॥

[গুলাপীশোরীকে তাহার বাবা-মা ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল

১ মৌমাছির ঝাঁকটি ২ আঙটিটাই নে ৩ সমুখে ৪ এই সমস্ত কথা ৫ তবুও কহিয়া ৬ আসিতেছে ৭ ঘোমটা দিয়া ৮ এটাও ঠিক বুদ্ধি নয় ৯ ভাসাইয়া ১০ একটুখানি আমরা উজাইয়া গেলাম ১১ তবে, তবে তো।

। দ্বিতীয় অঙ্ক।

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

কিসত্[১] কি কাম করনু মুই
হনু বিলের মাছ।
আঙ্গঠি হইল্ মোর বোল্লার টোপ[২],
লিয়া পানু লাজ॥
ওগে, আঙ্গটি খিলালে[৩] গে,
মার গালি, ওরে নারায়ণ।
বিন্ কলঙ্কে আজি মোর।
রাখিলো কলং॥
ওকি ওই মরি রে,
হায় রে হায়, হায় রে, ওকি নারায়ণ,
বিন্ কলঙ্কে··· ॥
বাপ-মায়ের কথা ওরে মন
কেমনে করিব লঙ্ঘন
বাপ-মায়ের কথা না রাখিলে
নরকে গমন॥
ওরে দমত্[৪] কাহাকে ডাকায় আনিয়া[৫]
মার খিলালে গে বড়য় কাম।
বিশয়ঘাতা[৬] ওকি ওগে নিরাশীর মন,
কেমনে করিবো॥
বাপ-মায়ের কাথা না রাখিলে
অবিশ্বাসত্ পড়িবো॥
ওকি ওই মরি রে,
ওগে নিরাশীর মন··· ॥

১ কিসে ২ মাছকে যেমন বোলতার বাচ্চা দিয়া টোপ দেওয়া হয়, আমাকেও তেমনি আঙটির টোপ গিলিতে হইয়াছে ৩ খাওয়াইল ৪ ফাঁকি দিয়া ৫ ডাকাইয়া আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা।

ও গে নিরাশীর মন··· ॥

[গুলাপীশোরীর 'পিসাই'-য়ের প্রবেশ

কথা শুনেক মোর পিসাই,
বাম হইছে মোর ঈশ্বর গোঁসাই।
বিন্ লাঙ্গে[১] পিসাই
মুই হইচুঁ লাঙ্গাই[২] ॥
ওগে, তোর পিসাই ধরুঁ পাও[৩],
সৎ কথা কহচুঁ[৪] গে পিসাই,—
মিছা কথা কহুঁ[৫] যদি
অধোগতি যাউঁ[৬] ॥
পিসাই, শুন মোরে বাণী,—
দুঃক্ষের কাহিনী :
মনভুলা শোক্-পড়ার[৭] দোষে
মুই পিসাই হনু গে কলঙ্কিনী ॥
ওকি ওই মরি রে,
মরি হায় রে হায়,—
পিসাই, শুন্ মোরে বাণী··· ॥
··· ·········
পিসাই-মাওটার বুদ্ধি পা'লে[৮]
গুলাপী-মাই সাহস কোলে[৯]।
মনভুলার ঘর যায়া গুলাপী
মিছা খবর দিলে ॥

১ 'নাঙ', উপপতি ২ উপপতি আছে যাহার তাহাকে 'নাঙ্গাই' বা 'লাঙ্গাই' বলে ৩ পা ধরি ৪ সত্য কথা কহিতেছি ৫ কই যদি ৬ যাই ৭ শোকে পতিত হউক বা শোকে পতিত হইয়াছে যে। গালি বিশেষ ৮ পাইল ৯ করিল।

CENTRAL LIBRARY

ও মনভুলার পিছাত্ মার খাইছে রে
মাইকেনা গোসাতে আছে।
ওরে কস্‌টা[১] মুখে কহে কথা
হলস্-বলস্[২] নাই :
তেরি[৩] মুখে কহে কথা—
'বাপটা যাবার কহিচে ভাই ॥'

[গুলাপীশোরী মনভুলাকে চালাকি করিয়া নিজের বাড়ী লইয়া গেল ও তাহার বাবার হাতের 'মাইর' খাওয়াইল

....

॥ মনভুলার গান ॥

মনের বুদ্ধি খাটে না কখন ॥
হি দেহা[৪] মন তোর নিশির স্বপন ॥
মিছাতে আসিনু মুই গুলাপীর ডাকত্[৫]।
অপমান হনু মুই দশের আগত্[৬] ॥
দশের আগত্ মুই হনু অপমান।
আপনার ধন দিয়া মুই আপনি বেইমান ॥

[মনভুলা চলিয়া গেল

। তৃতীয় অঙ্ক।

॥ চনক-খেলার গান[৭] ॥

চম্পলা নগরে রাজা
ওহোরে মোর চান্দ সদাগর।
তাহারে[৮] না পুত্র হইল্
ওহোরে মোর দুলভ[৯] লখিন্দর ॥

১ বিরস, তিক্ত ২ আমোদ-আহ্লাদ ৩ বাঁকা ৪ এই দেহ ৫ ডাকে ৬ দশের সম্মুখে
৭ সাপ খেলাইবার গান ৮ তাহার ৯ দুর্লভ।

CENTRAL LIBRARY

বাছু বানিয়ার বেটী,
ওহোরে মোর বেহুলা সুন্দরী ॥
তাহাকে করিল্ বিভা[১]
ওহোরে মোর দুলভ লখিন্দর ॥

॥ মন্ত্র ॥

ওরে হিকিলিং-চিকিলিং সার
ওরে হইলো ঝিল্-মিল্[২] ॥
গুলাপীশোরীর মন-আত্মা আনিয়া দে—
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু,
মোর মনতুলার সঙ্গে করায় দেও মিল ॥
....
ওরে, চনক-খেলার[৩] মন্ত্র পায়া
কথা সেটেল্ কোলে[৪] ।
ঠাকুরক প্রসাদ দিয়া
গুলাপীর মন পাগল কোলে ।
ওরে, নাই ঘটক ভাই, নাই ঘোটুকী,—
নিজে পাড়ে পাক ।
রাস্তার ধারে দুই জনার
হইল্ মোলাকাত ॥
ওরে, দুইঃদিলে ভাই একদিল হইছে—
মনে লাগিছে ভাল্ ।
ঘর সন্দেবার[৫] গুলাপীমাই
মনতুলাক দিলে কড়াল[৬] ॥

১ বিবাহ ২ অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি ৩ সাপ খেলার ৪ settle করিল ৫ ঘরে প্রবেশ করিবার ৬ কড়ার, অঙ্গীকার ।

আজি গুলাপীমাই রে পালায় যাবা'[১]
সাজিছে মনভুলার সঙ্গে।
ওরে, এমন ভাই মনভুলার ভাগ্[২]
ভগবান ধইচে পাক[৩]।—
কেমন করি' পালাবে—
গুলাপীর বাপটা পইচে ঝাক[৪]॥

ওকি ওই মরি রে,
বাপের মায়া, বন্ধুর শোক,
মাইকেনা জ্বালাত্ পইচে[৫] খুব।
হিটা করিম না হুটা করিম[৬]—
ও মাইকেনাক বুঝিবার নাইরো[৭] লোক॥

....

॥ মনভুলার গান ॥

ঢেং করিয়া[৮] মাই তুই নিন্দালো[৯]
পিরিতি টুটালো।
তোর মুই টাটির গোড়ত্[১০] বসিয়া ছিনু গে,—
পাও মোর লাগিছে ঝিন্-ঝিন্॥
অতয় করিয়া চালো দিছু[১১] গে
ও তোর বাপটা কুহরিল্[১২]।
মাই তোর কুকুরটা ভুকিল্[১৩]॥

১ পলাইয়া যাইবার ২ ভাগ্য ৩ বাদ সাধিয়াছে ৪ সন্দেহ করিয়াছে ৫ পড়িয়াছে
৬ এইটা করিব না, ওইটা করিব ৭ নাই ৮ ঢং করিয়া ৯ ঘুমাইলি ১০ বেড়ার পিছনে
১১ ইশারা দিয়াছি, করিয়াছি ১২ কাশিল ১৩ ডাকিল।

CENTRAL LIBRARY

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

হে ঈশ্বর, তোক করুঁ ভকতি;
মুই নারী পালায়া যাম আজি ॥
কোণেক আল্‌সি লেছু[1]—
জাগিল্‌[2] মোক করাইস আধ-রাতি ॥
....

ও ভাই, গুলাপীটা থাকিয়া[3]
কাল নিন্দত্‌ পইচে[4]।
এলা রাতিটা ওরে পোহায়য়া ভাই
হয় যাছে কর্‌-কর্‌ ॥
সেলা না'তে[5] মনভুলা ঘুরিয়া যাছে ঘর ॥
ওকি ওই মরি রে,
এলা রাতিটা ওরে পোহায়য়া ভাই ... ॥
ওরে, বেহানে উঠিয়া রে
ও মোর ভাই রে,
যায় মনভুলা জল আনিতে, ওরে।
সেলানা গুলাপীশোরী রে
ও মোর ভাই রে,—
অহো[6] যাছে ভাই জল আনিতে ॥
ওরে, দুই জনে ভরে জল দুই ঘাটে—
মধ্যে-মধ্যে গঙ্গা বয়হা যায়।
মনভুলা ডাকায়য়া গুলাপীক শুধায় ॥
....

১ একটু আলস্য করিতেছি, ঘুমাইতেছি ২ জাগরিত ৩ শুইয়া ৪ পড়িয়াছে ৫ তখন ৬ ও-ও।

॥ মনভুলার গান ॥

মাই, তোর এই কি গে বিচার,
তোর মুখ নাই দেখিমু আর।
সারারাতি ফাঁকোতে[১] মোক
খিলালো জাড়[২] ॥

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

দাদা গে,
গোসা না হইস দাদা মোর উপর।
ওগে, সত্যে-সত্যে যামু মুই তোরে[৩] ঘর।
ওগে, শুন্ দাদা মোর দুঃখের বাণী :
ওগে, কালনিন্দত্ পড়িছু[৪] গে দাদা,—
জাগিলে মুই পাউকে নি[৪] ॥

॥ মনভুলার গান ॥

ও-মাই, তোরে কথা, তোরে বার্তা,
তোহে[৫] কহিলো আনিবা' যাবা'[৬]।
তোরে কাথাত্ আনিবা' গেনু গে
ও মুই আসিনু গে ঘুরিয়া ॥
তোর পিরিতির কার্য গে নাই।
ওই দিনা বোলে পইছিস নিন্দত্,—
উ দিনা নিন্দায় যাবা' আল দিলো[৭]—
কালি মাই তুই কিতায় নি আসিলো[৮]।
—ও মুই আছিছু[৯] ঘুরিয়া ॥

১ এমনি-এমনি ২ শীতে ভোগাইলি ৩ তোর, তোরই ৪ পাই-ই নাই। নিজেকে আমি জাগরিত পাই-ই নাই ৫ তুই-ই ৬ আনিতে যাইতে ৭ অছিলা দেখাইলি ৮ কি জন্তে আসিলি না ৯ আসিয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

তোর পিরিতির কার্য নাই।
ও মুই আন্ধরক গে আন্ধার না কহু[১];
দেবতাক ভয় না করু।
বাঘ-সিংহক মুই কুকুর জানু গে—
সাপক জানু পথের চেরা[২]।
তোর পিরিতির কার্য নাই॥

[গাওনের দ্বারায় কথা মনভুলায় কহচে—ওইখান গান গোলাপীশোরী বুঝিয়া ফেলাল্—যায়া কালীঘর মুছে।—

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

কালী মা,
তোক সিন্দুর দিনু গে হে।
তোক ঠিক্‌কেনা[৩] দুই পহর বেলা যামু—
মা, মুই নদী সিনিবা'
ওইঠে বন্ধুক করাইস গে দেখা॥
সুন্দর কালী গে,
যদি বন্ধুক মানায় দিবো[৪]
শুকল পায়রার[৫] বলি খাবো।
সুন্দর বন্ধুক যদি দেখা নাই করাবো
মোর নিরাশীর মাথা খাবো॥

॥ মনভুলার গান ॥

ওগে, তুই বড় চালাকি—
ওগে, দিনে-দিনে দেছিস[৬] মোক ফাঁকি।
ওগে, কতই আসিনু মুই গে
দিনে-দিনে ঘুরিয়া, গুলাপী॥

১ আঁধারকে আঁধার বলি না। ২ কেঁচো ৩ ঠিক-ঠিক ৪ যদি বন্ধুকে আমার সহিত মিলন করাইয়া দাও ৫ শ্বেত পায়রা। শুক্ল (?) ৬ দিতেছিস।

ওগে, যদি মাই তুই নাই আসিবো
ওগে মোর শালাটার মাথা খাবো।
ওগে, বন্ধু জানিলে[১] নিশ্চয় তুই
আসিবো গে আজি—
ওগে মাই গুলাপী.
আজি না দিস গে ফাঁকি॥

....

এমন ভাই ঈশ্বরের চক্র
ওরে সিরজায়[২] দিছে গুণ আর মন্ত্র।
ওরে মন্ত্রের চোটে গুলাপীর মন করে ধড়ফড়॥
মন কান্দে মনভুলার বাদে[৩]—
ওরে কথা বলে মইলান ভাবে[৪]।
ওরে কটা মুখে[৫] কহে কাথা
বাপ আর মাওকে।
মনে মনে অন্‌ছায় বেড়ায়[৬]
একদিনও ভাই লাগাল না পায়॥
ওরে ক্ষার করিতে[৭] গুলাপীমাই
একদিন নদী যায়।
ওরে নদী যায়া করে ক্ষার,
ও মনভুলার বাদে মন ছছকার[৮]।
ওরে অর্ধেক কান্দন, অর্ধেক গান
নাম নেছে মনভুলার॥

১ আমাকে বন্ধু বলিয়া জানিলে ২ সৃজন করিয়া ৩ জন্যে ৪ মলিনভাবে ৫ পিঙ্গল, ফ্যাকাসে মুখে, কটু মুখে ৬ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় ৭ কলাগাছের গোড়া পোড়াইয়া তাহা দ্বারা কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচাকে 'ক্ষার করা' বলা হয় ৮ ছত্রকার।

CENTRAL LIBRARY

॥ গুলাপীশোরীর গান ॥

দাদা মনভুলা,
কিতায় ভাবি[1] মোক না দিস দেখা।
ওগে, এমন মোর করেছে মন ॥
দাদা এলায়[2] যদি লাগাল গে পাও—
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গে যাও ॥

[এমন সময় মনভুলার প্রবেশ ও গুলাপীর সঙ্গে তার বাড়ীতে গমন। পরে পাড়া-পড়শী মিলিয়া উভয়ের মধ্যে মিলন করিয়া দিল।[1]

১ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ (শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। মূল খাতাখানি উক্ত পরিষদে রক্ষিত আছে। বানান, স্তবক পরিকল্পনা, যতি-চিহ্ন আমাদের। অতিরিক্ত শব্দার্থ ও নাট্য-নির্দেশও স্থানে-স্থানে আমরা দিয়াছি। পাত্র-পাত্রীর উক্তি ছাড়া, নাটকের কাহিনীর বর্ণনা-মূলক অংশগুলিকে বিন্দু-চিহ্ন দিয়া আমরা পৃথক করিয়া দেখাইয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

॥ খাস-পাঁচালি ॥

। ৩৫২ ।

॥ কাঙ্গ্‌ভাঙ্গা-ঢেঙপাড়ীর পালা ॥

॥ বন্দনা ॥

আসরেতে উঠিয়া
ভক্তি করি[1] বন্দু[1] মাতা,—
ওমা কমলা,
বুঝা না যায় বৈভোবের[2] খেলা।
ওমা, খেলাইতে খেলাইতে খেলা,
গগনে ডুবিলো বেলা ;
জলের উপর ভাসে রে শিলা—
একি তমার[3] অনন্ত নীলা[4]।
দেখিয়া কলির ভাব
অন্তরে নাগেছে তাপ ;
কতো আর করিমো ভাবেনা ॥

[কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ

কাঙ্গভাঙ্গা। আরে ভাই বস্তি-আওলার[5] ঘর[6],
কুন্‌দিয়া[7] যাম মুই জালু দেউনিয়ার ঘর।

বাজেলোক। তুই কাঁয় রে ভানি[8]? তোর কি নাম ?

বাউধিয়া। মোর নাম কাঙ্গভাঙ্গা ;
মোর বাপোর নাম নাঢেঙ্গা।
দেউনিয়া দিছে পাশ[9]
মামেলা করি' কত ঝন্‌কাক[10]
খিলায় দিছে মাঁস[11]।

১ বন্দনা করি ২ বৈভবের ৩ তোমার ৪ লীলা ৫ বস্তিওয়ালা, বস্তির বাসিন্দা গণ ৬ 'রা' এই বহুবচন বুঝাইতে ৭ কোন পথ দিয়া ৮ 'জানি' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তুই কে রে বটে, তুই আবার কে রে, ইত্যাদি অর্থে ৯ দেউনিয়াগিরি পাশ করিয়া ১০ কতজনকে ১১ মাংস খাওয়াইয়া দিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

তার বেটা মুই জলটুপা—
ভগমান কইছে মোক
সগারে ভার-উভা[১] ॥

বাজেলোক ॥ কিসের ভার উভাচিত্[২] ?

বাউধিয়া ॥ দহির ভার উভাছুঁ ।
বাড়ীটার কার বেহা হোক—
দহির ভার উভিবা' নাগে মোক ॥
দহি আনিবা' গেইছুঁ একবার
মানিকাডাঙ্গা ।
কাঙ্গ[৩] ভাঙ্গিয়া নাম পইছে[৪] মোর
কাঙ্গভাঙ্গা ॥

বাজেলোক ॥ কাঙ্গ্ ভাঙ্গিচে না কি তে ?

বাউধিয়া ॥ ভাঙ্গিচে না তে !
তাতে ভাই এলা[৫]
দেউনিয়াগি'[৬] শিকিবা' চাহাচুঁ[৭] ॥

বাজেলোক ॥ তা হোলে যা,—
হামার আজি তাংকু[৮] নাই,
বিড়ি একটা খা ।
দেউনিয়ার পাকে[৯] জালু-দেউনিয়া
নামটা কইছে জারি ।
চলিয়া যা, ওইটা হয়
জালু-দেউনিয়ার বাড়ী ॥

[প্রস্থান

বাউধিয়া ॥ ন'স[১০] ভাই, মুই যাও :···
—দেউনিয়া ভাই, দেউনিয়া ভাই,
বাড়ীত্ আছিত্,[১১], না নাই ॥

১ ভার বহনকারী ২ বহন করিতেছিস ৩ কাঁধ ৪ নাম পড়িয়াছে, হইয়াছে ৫ এখন ৬ দেউনিয়া-গিরি ৭ শিখিতে চাহিতেছি ৮ তামাক ৯ দেউনিয়ার মধ্যে ১০ রোস ১১ আছিস ।

আলু। কাঁয়[১] রে বা'[২], তুই কাঁয় ?
ব'স ব'স, ঘরেবৃত্তি[৩] আয় ;
কহদি'[৪] বা' কিতায়[৫]— ?

বাউখিয়া। মুই বা' তোক গুরুদাই[৬] দিবা' আসিছু। মোক দেউনিয়া-গি' শিকাও। মোর একটা কাথা শুন্।

॥ গান ॥

হামার ভাগ্যে কাঁহো[৭] নাই :
বড় দুঃখে দেউনিয়া ভাই,
দিছু গুরুদাই ॥
ধন-সম্পতি ফুরায় যায়য়া
মানষির ভিতরে ও মুই
নাই রে নাই ॥
এমন মোর করমের ফল
খাটে না মোর বুদ্ধি বল ;
থমকে থমকে পড়ে চক্ষের জল।
এই ছিল মোর কপালে লেখা
ঈশ্বর কইছে মোকে কলুর কল ॥
এমন হোলে[৮] ভগবান—
নাইরো মোর মান-সম্মান ;
এমন শালার ধাতিংখিঙ্গা কপালখান[৯]—
অঘনি[১০] জলেছে দেহা—
দুঃখের নাইরো মোর অবসান ॥

১ কে ২ 'বা' দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের অধিবাসিগণ পরস্পরকে সম্বোধন করিবার সময় 'বাহে' রূপে ডাকিয়া থাকে। 'বা' 'বাহে'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এই 'বা'-এর পর চলিত বাঙলার সম্বোধন 'রে'-ও সময় সময় যুক্ত হয়, এবং 'বা'রে' রূপ ধারণ করে। 'বা'র অপর প্রয়োগ অব্যয়রূপে কথার মাত্রা হিসাবে। বর্তমান ক্ষেত্রে 'বা' সম্বোধন ৩ ঘরের দিকে, ঘরের মধ্যে ৪ বল, দিকি, বলদেখি ৫ কি জন্যে ৬ গুরুদায় ৭ কেহই ৮ করিল ৯ পাথর-চাপা কপালটি ১০ আগুনে।

CENTRAL LIBRARY

বাউধিয়া ॥ গুরুজী, শুনিলেন না মোর বা'[১] বড় দুঃখ।
মোর দুঃখের সীমা নাই,
তাতে[২] দিনু গুরুদাই।
মোক বা' দেউনিয়াগি' শিকাও ॥

জালু ॥ হে বা', আজিকালিকার মইধ্যে[৩] মুই
দেউনিয়া হইচুঁ খোপ[৪] ;
দেউনিয়াগি'তে বোকশিশ্ পাইছুঁ
সাহেবের টোপ[৫]।
আর হইচুঁ ইউনিয়ান বোটের[৬] মেম্বর
কুন্ বেটাক্ মুই করিম ডর ॥
আচ্ছা, বা', দেউনিয়াগি' শিকিবো, শিকেক।
কিছুদিন বা' মোর বাড়ী টিকেক[৭] ॥
—কইরো[৮], শুনিলো না?

[ঢেঙপাড়ীর প্রবেশ

ঢেঙপাড়ী ॥ কিতায় ডাকাছিত্[৯]?

জালু ॥ এইটা চেঙ্গেড়া বোলে মোরে ঘর ওভে[১০] ;
শিষ্-বেটা[১১] হোবে।
চেঙ্গেড়াটাক চাইটা খরাক[১২] দে।
মুই যাছুঁ ইউনিয়ান বোট্,—
নিকলায়[১৩] দে একখান দশটাকিয়া নোট ;
কালি হোবে ইলেকশন,
দিবা' নাগে ভোট ॥

[প্রস্থান

ঢেঙপাড়ী ॥ আচ্ছা বাউ[১৪], তোর কাঁয় কাঁয় আছে?

১ এই 'বা' অব্যয়রূপে ব্যবহৃত ২ তাহাতে, সেইজন্যে ৩ মধ্যে ৪ খুব। বড়ো অর্থে ৫ টোপর (?) ৬ বোর্ডের ৭ থাক—এই অর্থে ৮ কই রে ৯ ডাকিতেছিস ১০ রহিবে ১১ শিষ্য-বেটা ১২ খোরাক, খাদ্যদ্রব্য ১৩ বাহির করিয়া ১৪ অল্প বয়সের পুরুষকে আদরের সম্বোধন।

CENTRAL LIBRARY

বাউধিয়া ॥ মোর বা কাঁহোয় নাই।
বেহা-সাদিও হয় নাই।
তমার ত গুরুজীয়ানী,
বুঝি জিহা-পুতা[1] নাই॥

ঢেঙপাড়ী ॥ নাজের কাথা বা কাঁয় কোভে[2],
কুনকালে হামার জিয়া-পুতা হোবে
কান্দিতে-ভাবিতে মোর দিন যাবে॥

বাউধিয়া ॥ দেউনিয়া নোকের টাকা মেলা;
তমার ভানি কিসের জ্বালা।
তমা'[3] আর কিতায় ভাবিবেন!

ঢেঙপাড়ী ॥ মুইতে বাপোই কিতায় ভাবেচুঁ, মোর কাথা শুনেক।

॥ গান ॥

ও মোর বাপোই রে,
নাজের কাথা কভা' না মনায়[4]।
ধানটার পেটত্ চাউলটা বাপোই
জানে না আর কাঁয়॥
কি ভাগ্যের কপালের ফলে
নিধি মোক ছলিল্ কুন্ ছলে হে;
অন্তরে মোর অঘনি জলে,
শাগে-ভাতে না মিলিলে—
পেট ভরে কি চুয়ার[5] জলে?
শুনিয়া তোর গুরুজীর রাও[6]
জলিয়া উঠে মোর গাও;
তোর লাখা[7] স্বয়ামী যদি পাও—
এলাও[8] মুই হবা' পারুঁ[9]
সাত ছাওয়ালের মাও॥

১ ছেলেপিলে ২ কে কহিবে ৩ তোমরা; 'আপনি' অর্থে ৪ কহিতে ইচ্ছা করেনা
৫ কুয়ার ৬ কথা, রব ৭ তোর মতো ৮ এখনও ৯ হইতে পারি।

ঢেঙপাড়ী ॥ শুনিলো না তোর গুরুজীর কাথা।
হিনে সে[১] তোর গুরুজী, দেউনিয়ার পাকে পাশ—
যেই ধইচে অক্[২] মরণ কাশ
কটি[৩] নাইতে
তোর গুরুজী উঠিয়া খায়ঁ্ষাস।
তুইহে[৪] বাপোই,
মোর পূরা মনের আশ॥

বাউধিয়া ॥ যেইটা কাথা কোলো বা
সেইটা ত হয়;
হলা[৫] কাম করিতে মোক
নাগেছে ভয়।
গুরুনাই দিয়া
দেওঁ যদি মন্দ কামত্ পাও—
তমা' তে[৬] হবেন মোর গুরুয়ানী মাও॥

ঢেঙপাড়ী ॥ সেইটা কাথা বাপোই তোর
বুঝিবার ভুল,
গুরুয়ানী মাওটা নদীর কূল।
যেমন নদীর জলে সগায়[৭] করে চান
মাইয়া নোক হামা' নদীর সামান[৮]।
মাইয়া নোকের হামার
দেও-দেবতা নাই;
রাধা ছিলেক মুহাসোতী[৯]
তাঁয় বোলে নাংধাই[১০]।
গুরু-শিষের বাপোই সমন্দে নাই[১১]॥

১ 'এ দিকে তো' অর্থে ২ উহাকে ৩ কোমর। বল, শক্তি ৪ তুই-ই ৫ ওই সমস্ত ৬ তোমরা তো। 'আপনি' অর্থে ৭ সকলেই ৮ সমান ৯ মহাসতা ১০ নাঙ্ অর্থাৎ উপপতি আছে যে নারীর ১১ সম্বন্ধই নাই।

বাউধিয়া ॥ তা হোলে বা' মোরো[১] কাথা শুন্ ।

॥ গান ॥

আজি হাতে[২] তোর হাতত্
সঁপিয়া দিনু জান ;
আথে-মারে যা করে
মোক ভগমান ॥
এই নে[৩] কি মোর কাঁহয় নাই
ইষ্ট-কুটুম বাপ-ভাই ;
গে গুরুজীয়ানী,
তুই আর মোক কি পাকত্ ফেলাইস ভানি[৪] ।
গুরুজী যদি পায় সন্ধান
বাঁচিবা' মোর ন হায় ;
হায় রে হায় রে ভগমান,
গুরুজীয়ানী করেছে মোক যৈবন দান ॥

বাউধিয়া ॥ মরণ-জীয়নটা সে বা' তোরে হাতত্ ;
আজি হাতে থামো মহ[৫] এথে পাতত্[৬] ॥

ঢেঙপাড়ী ॥ দেউনিয়া হোলে আগত্[৭] হবা' নাগে[৮] চোর ।
দেউনিয়াগি' বিদ্যাটার
হুচাখিটায়[৯] গোড়[১০] ।
যাঁয় না করে উছুরামি কাম[১১],
তার কি উঠে বাপোই
দেউনিয়াগি' নাম ?
তুই অয়হা যা, থায়য়া যা,
কিছুই হাতাশ[১২] নাই ;
দেখিবা' পারিবো হামার[১৩]
মাইয়া নোকের ফাই[১৪] ॥

১ আমারও ২ হইতে ৩ একে তো, এমনিতে ৪ জানি না, তুই আবার আমাকে কোন বিপদে ফেলিবি ৫ আমিও ৬ একই পাতে ৭ আগে ৮ হইতে হয় ৯ প্রতারণা করাটাই ১০ গোড়া ১১ ছেঁচড়ামি কাজ ১২ ভয় ১৩ আমার ১৪ ফন্দি, কারসাজি ।

CENTRAL LIBRARY

বাউদিয়া ॥ সেই বা, মুই সে[১] তোরে[২] সে কাথা ধনু।
এইনং করি[৩] একঠে[৪] মুই
ভাগ্যে বাঁচিনু ॥
[এমন সমে[৫] জালু দেউনিয়া বোট্ হইতে বাড়ী ফিরিল। ঢেঙপাড়ীর প্রস্থান

জালু ॥ হাঁ বা' রে কাঙ্গভাঙ্গা, গোরুলার[৬] এলাও জল দিবা' যাইস নাই ?

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ যাছুঁ গে। কণেক তাংকু খাওঁ[৭]।

জালু ॥ আন্ ছিলিমটা, শুল্কায়[৮] আন্, খাই ;
আজি বোটোত্ মামেলার নেখা-জখায় নাই।
[কাঙ্গভাঙ্গার প্রস্থান
—কইরো, শুনেচিত্ না নাই,
আন্, ভাত আন্ ;
ভোকে আজি মোর গেইল্ জান ॥
[ঢেঙপাড়ীর প্রবেশ

ঢেঙপাড়ী ॥ কিতায় ভানি[৯] ডাকাছিত্ ভাই,
জরে-জারি আজি সে মুই ভাতে[১০]
আঙ্কু নাই[১১]।
চেঙ্গেড়াটাও আছে চুঁড়া খায়য়া[১২],
জল খাচে[১৩] খায়য়া খায়য়া[১৪]।
চুঁড়া খাবো তে[১৫] আনেক জল
আজি দেহাটাত মোর কণকয়[১৬] না হয় বল ॥

জালু ॥ এই নে কি মোর শরীল বুড়া
তুই খাবা' কহচিত্[১৭] মোক শুকান চুঁড়া।
এইলাতে[১৮] তুই কিতায় না খাইস গালি
জরটা তোর নিকিলাম[১৯] শালী ॥
তোক আজি মাইরটায় দিন।
[মাইর। ঢেঙপাড়ী অজ্ঞানের ভান করিল

১ কথার মাত্রা। অব্যয় ২ তোরই ৩ এই রকম করিয়া ৪ একস্থানে ৫ সময়ে ৬ গরুগুলির ৭ একটু তামাক খাই ৮ সাজিয়া ৯ কি জন্যে যে, কি জন্যে যেন ১০ ভাতই ১১ রাঁধি নাই ১২ চিঁড়া খাইয়া ১৩ খাইতেছে ১৪ থাকিয়া থাকিয়া ১৫ খাবি তো ১৬ একটুও ১৭ খাইতে কহিতেছিস ১৮ এই গুলিতে, এই সমস্ত কারণে ১৯ বাহির করিব।

জালু ॥ এইনং[১] কিতায় করেছিত্ । এ বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা, দৌড়া দৌড়া ; তোর গুরুজীয়ানী কেনং হয়েয়া গেল্। বাই বাই[২], মোক কি ছেড়িবো !

[কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ হৈ গুরুজী, এলায় তো গুরুজীয়ানীটা সঙ্গতে[৩] ছিলো—

জালু ॥ খালি একটা কোপ দিছু বা'রে
আর কিছুই করু নাই ;
তাহে মাইয়াটার দম-ছুরাশে নাই ।
কামটা বা হইল্, নোকটা বুঝি মইল্ ॥

ঢেঙপাড়ী ॥ কান্দিস না, কান্দিস না মড়া ;
এইলাতে সয়ামী বুঝিস না তুই ।
মুই তো তোক কহচুঁ—
মোক ভাংঘাইস[৪] না, গালিও পাড়াইস না ;
মোক তে[৫] কি দেওটা ধইচে[৬]
দেহাটা সে মোর সহে না ;
তাঁহ[৭] তুই ভাই বুঝিস না ।
ভাত আন্ধিবার বাদে[৮]
ধান ভুকিবা' ধহু[৯] ;
ভুকাইতে ভুকাইতে হালিয়া কাঁপিয়া
জরত্ পহু ॥

জালু ॥ যা মোর বাইটা[১০]
থাকিয়া অহনে যা[১১] ।
মুইহে ধরেচুঁ ধান ভুকিবা' ।
যা বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা,
তুই চুলা-চৌকা নাগা ॥

১ এই রকম ২ 'বাই' কথার অর্থ দিদি। এখানে কথার মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'বাবারে বাবা', 'বাব্বাঃ' ইত্যাদি অর্থে ৩ ভালোই ৪ প্রহার করিস ৫ আমাকে যে—এই অর্থে ৬ দেও অর্থাৎ ভূত ধরিয়াছে ৭ তবুও ৮ জন্তে ৯ ধান ভানিতে ধরিলাম ১০ স্ত্রীকে আদর করিয়া সম্বোধনে 'দিদি' (বাই) বলা হইতেছে ১১ শুইয়া থাক গে।

CENTRAL LIBRARY

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ মুই গুরুজী পারিমো নি।

মুই জল্মে[১] ভাত আন্ধ নি ॥

[জালু নিজেই ভাত আন্ধিলো

জালু ॥ তুই ভাত খাবো না কি? খাবো তে[২] উঠেক।

ঢেঙপাড়ী ॥ দে দি'[৩], কণেক খায়য়া বুঝুঁ।

জালু ॥ ব'স ব'স, আগত্ তোক দেঙ—।

খায়য়া-দায়য়া অহিস তুই,

জোলপইগুড়ি যাছুঁ মুই।

যা বা'রে কাঙ্গাভাঙ্গা,

জোলপইগুড়ি যাই :

যেইনং[৪] জালা পইল্ তে

তোক আথা যাবে নাই ॥

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ মহ[৫] গুরুজী না রহুঁ আর—

তমারে খাইতে হইচে ভার ॥

মুই তমার নি পারিম ভাত আন্ধিবার।

তমা' আজি যাও,

মুই কালি সাকালে যাম।

আজি গুরুজীয়ানীর জরটাও দেখুঁ ॥

জালু ॥ কালি তুই সাকালে যাইস। মুই বা যাছুঁ।

[প্রস্থান

ঢেঙপাড়ী ॥ দেক্[৬] বাপোই, মুই কেমন মাইয়া।

মজা মানু ফাঁকত্।

গাহিনী[৭] দিছুঁ দেউনিয়ার হাতত্।

অয়[৮] কি মোক হেমন্[৯] মাইয়া[১০] পাইছে—

আন্ধি' নি খাবে তে

মোক বিহো কিতায় কইছে[১১] ॥

১ জন্মে ২ খাবি তো ৩ দে দেখি ৪ যেই রকম ৫ আমিও ৬ দেখ্ ৭ ধান ভানিবার মুষল ৮ ও ৯ সেইরকম, যেমন-তেমন ১০ স্ত্রী ১১ রাঁধিয়াই যদি না খাইবে, তবে আমাকে কি জন্যে বিবাহ করিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ সেই তো কাথায় বা।
মাইয়া নোক তমার বুদ্ধি ভারি।
অখড়েবা[১] পারেন তমা'[২]
জিয়ত্ বাঘের[৩] দাড়ী ॥
মুই যাছুঁ জোলপইগুড়ি—
খায়েন তে[৪] আহু নাড়ু-মুড়ি ॥

ঢেঙপাড়ী ॥ শুন্ শুন্ প্রাণো বন্দু,
হাত ধরেছুঁ তোর—
একটা কাথা শুনেক মোর।

॥ গান ॥

ডালে বসি' বাজাও বাঁশী,
তবক-খিলি[৫] বন্দু খা রে খা ;—
ওহোরে কাঙ্গাভাঙ্গা,—
মোর বাউধিয়া[৬] ॥
তুই বন্দু মোর স্বর্গের তারা
মোর নারীটার কপাল পড়া ;
কোন্‌কালে করাবে বিধি রে হে বন্দু,
তুইহে-মুইহে একজড়া ॥
যদি বাপোই মোক ছেড়িবো
মোর নারীটার মাথা খাবো।
মোর নাথাতি ঢকের মাইয়া
রে হে বাপোই,
অংসালে[৭] তুই কুন্‌ঠে পাবো ॥

১ উপড়াইতে ২ তোমরা, আপনারা ৩ জীবন্ত বাঘের ৪ খান যদি ৫ তবক মোড়া পান
৬ প্রেমিক ৭ অনুসন্ধান করিলে, খুঁজিলে।

CENTRAL LIBRARY

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ গুরুজীয়ানী, মোরো একটা কাথা শুন্ ।

॥ গান ॥

এমন দিন গুরুজীয়ানী
আর কুন কালে হোবে ;
ভোকোত্ ভাত, পিয়াসত্ পানি
কাঁয় মোকে দিবে ॥
ওগে জান গেলে নাই ছেড়িম পাছ
তুই হোলো মোর শাস্তির গাছ ;
গে গুরুজীয়ানী,
দেউনিয়া-ভাতারের হাতত্
দিলো গাহিনী ॥
ওগে, নারীজাতি অবিশাস[১]
তাতে মোর না হয় সাহাস ;
তুই যদি মোর পূরাইস মনের আশ ॥

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ গুরুজীয়ানী, মুই যাছুঁ ॥
যাছুঁ তে যাছুঁ,
নাইতে খাড়ায়[২] আসেছুঁ ।

[চেরকেটুর প্রবেশ

—আচ্ছা গুরুজীয়ানী, তমার বোলে ছয়ায় নাই, হিটা[৩] ছয়া কার ?

ঢেঙপাড়ী ॥ হিটা ছয়া পষাণী[৪] আনিছি ।
পরার ছয়া দেখিয়া কি জুড়ায় দেহা ।
তোর গুরুজী কইল্ মোক সাদের বেহা ॥
এইটারতে[৫] অয় করেছে দয়য়া ;
মোর সে নাইরো ময়হা[৬] ॥

[চেরকেটুর প্রস্থান

১ অবিশ্বাসী ২ খাইতাই চলিয়া আসিব ৩ এইটা ৪ পুষিবার জন্ত গ্রহণ করা, দত্তক নেওয়া ৫ এইটার প্রতি, এইটার জন্তে ৬ মায়া ।

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ গুরুজীয়ানী, মোর বেলা হইল্, মুই যাছু ।

[কাঙ্গভাঙ্গার প্রস্থান । জালুর প্রবেশ

জালু ॥ কেনং তে জর তোর
পালাইছে না নাই ;—
কাঙ্গভাঙ্গা জোলপইগুড়ি
কিতায় যায় নাই ?

ঢেঙপাড়ী ॥ গেইছে নি তে, কেত সাকালে গেইছে[১] ।
তহ[২] ছাড়িলো ঘর—
মোরো আসিল্ জর ।
তুই বেড়াছিত্ দেউনিয়াগি' করি'
মোর কাঁয় করে খবর ॥

জালু ॥ তা হোলে তো আজিও ভাত আন্ধিস নাই !

ঢেঙপাড়ী ॥ নি আন্ধু ।

জালু ॥ এতুঁকাচাল[৩] কি করিবা' মনাছে ভাই,—
আজিও ভাত আন্ধিস নাই ॥

[চেরকটুর প্রবেশ ।

ছয়া, চেরকেটু ॥ বা' গে বা', মুই নাড়্ থাম ।

জালু ॥ ধাইৎ, ছয়াটাও আরো কাচাল নাগাইল্ ।
হে নিগা[৪], জুলাপি[৫] আনিছুঁ এক পোয়া—
তোর মাওর নগত[৬] বসিয়া খা ।
মুই যাছুঁ ভাত আন্ধিবা ॥

ঢেঙপাড়ী ॥ কী-টা ভানি আন্ধিবো ভাই—
চাউলের একটা গুষ্ট নাই[৭] ।
ভাত খাবো তে ধান ভুকা
নাইতে তুই কটি শুকা[৮] ॥

১ কতো সকালে গিয়াছে ২ তুই-ও ৩ কচাল । ঝামেলা । বাকবিতণ্ডা ৪ এই লইয়া যা ৫ জিলাপি ৬ মায়ের সঙ্গে ৭ এক কণা চাউলও নাই ৮ না খাইয়া থাক্ । বাগ্‌ধারার বিশেষত্ব ।

CENTRAL LIBRARY

জালু ॥ যেই দিনা বোটু হাতে আসিনু
ভাত আন্ধিয়া খানু।
আজি জোলপইগুড়ি হাতে আসিনু
থকিয়া-নটিয়া[১]—
এলা কি মনাছে ধান ভুকিয়া ভাত আন্ধিবা'।
ন হায় হিলা ভালো কাম[২]
কালি পাঞ্জি[৩] দেখিবা' যাম।
কি দেওটাতে খোলে তোক—
সাঁতেবা'[৪] তুই আছায় খোলো মোক[৫] ॥

[দেউনিয়া ধান ভুকায় ভাত আন্ধিলো

জালু ॥ ভাত খাবো না কি,
তোর বাদে আনিছুঁ মুই ভেজিটেবিল ঘি।
বাদাম তেলের তরকারি
খায়া যা কেনা ;
ঘিউ দিয়া ভাত গুটিক[৬]
খায়া বুঝেক না ॥

ঢেঙপাড়ী ॥ দে দি', কণেক খায়া বুঝুঁ
ভেজিটেবিল ঘিউ ;
চোপোর রাতি জাড়ে মোর
ধস্ ধসাছে'[৭] জিউ ॥
জরে-জারি কি আর
খাবা' মনায় ভাত ;
না পইতাইস[৮] তে আসিয়া মোর
নাড়িয়া দেখ্, দি' হাত[৯] ॥

১ ক্লান্ত হইয়া ২ এই সমস্ত ভালো কাজ নয় ৩ পঞ্জিকা ৪ সন্তাপিত করিতে, মনঃকষ্ট দিতে ৫ ভালো করিয়াই তুই আমাকে মনঃকষ্ট দিতে ধরিয়াছিস ৬ চারটি ৭ ধক্ ধক্ করিতেছে ৮ প্রত্যয়, বিশ্বাস করিস ৯ হাত দেখ।

CENTRAL LIBRARY

জালু ॥ আগত্[1] মুই খাও ভাত—
সেলা[2] তোর নাড়িয়া দেখেচু[3] হাত।
খাবা' বসিচু মুই আন্ধন ঘরটাত্ ॥
[জালু আন্ধন ঘরে খাবা' বসিলো। কাঙ্গভাঙ্গা আসিলো

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ গুরুজীয়ানী, গুরুজীটা কি জোলপইগুড়ি তকা[4] আসিচে ?

ঢেঙপাড়ী ॥ তোর গুরুজী আসিয়া
খাবা' খইচে ভাত ;—
চুপ করিয়া থাকিয়া অহ[5]
মোর বিছিনাত্ ॥
[কাঙ্গভাঙ্গা ঢেঙ্‌পাড়ীর বিছিনাত্ থাকিল। জালু আসিয়া ঢেঙ্‌পাড়ীর হাত নাড়িয়া দেখিল

জালু ॥ বা রে বা, কি ভয়ানক জর ;
তাহে[6] মুই ছেড়িয়া বেড়াছু ঘর।
নাড়ীটা যেমন চলেছে এলগাড়ীর তার[7] ;
দুইখান ঠেং তো তোরে
দুইখান ঠেঙ্গা কার ?

ঢেঙ্‌পাড়ী ॥ দুইখান ঠেঙ্গা জরের
দুইখান ঠেঙ্গা মোর ;
হুলা[8] ঠেং না নাড়িস
জর হোবে তোর ॥
হুয়াটাক নিগিয়া[9]
তোরে শেযাত্[10] থাকা ;
জরে সে আজি মুই
করেছু আঁকাবাঁকা[11] ॥

১ আগে ২ তারপর, তখন ৩ দেখিতেছি ৪ থেকে ৫ শুইয়া থাক ৬ তাহাতে, তার মধ্যে ৭ রেলগাড়ীর মতো সারা দেহ যেন ছুটিতেছে ৮ ওই সমস্ত ৯ লইয়া যাইয়া ১০ শয্যায় ১১ আঁকুবাঁকু।

আল্ু ॥ ঠেং-আওলা জর তো মুই দেখু নাই ;

হিথান[১] জরের এলা[২] কি করু উপাই[৩]।

পান্তি না দেখালে আর চলিবে নাই।

তোর জর দেখিয়া

মোর মুখত্ নাইরো আও[৪] ;

তুই কি মোক ছেড়িবো[৫]

চেরকেটুর মাও ?

—মোর একটা কাথা শুন্।

॥ গান ॥

তুই মোর বড়য় আদরের মাইয়া[৬]

গে হে চেরকেটুর মাও ;

তুই মরিলে মাইয়া কুন্ঠে পাও।

করিয়া তোক বিহো-সাদি

ফুরাইসে মোর ধন-সম্পতি ;

জর দেখিয়া মুখত্ নাই মোর আও ॥

ঠেকাবে কি পর্মেশর

জিউটা মোর নাগেছে ডর ;

কুন্কালে নাই দেখু মুই

ঠেং-আওলা জর ॥

আল্ু ॥ আজিকার আতিটা যদি

ভালে ওলো[৭] তুই ;

পান্তি দেখিবা[৮] কালি সাকালে

যাম মুই ॥

১ এইখান ২ এখন ৩ কি করি উপায় ৪ রাও, রব ৫ ছাড়িবি ৬ বউ ৭ ভালো ভাবে যদি রহিস।

CENTRAL LIBRARY

[জালু পথে চলিতেছে। ফাঁস গান—

রে বল্দা নইয়া[১]
কেমনে যাবো ভোবো-নদীটা বইয়া ॥
ভোবে'-নদীর ওই পারে
সাধুগুরুর থানা ;
সাধু হইলে যাইতে পারে—
পাপী যাইতে মানা ॥
ধন-সম্পতি ফুরায় দিয়া
সাদের কোলো বিহা[২] ;
মাইয়ায় তোর মারিবে জীবন—
শুনেক রে দেউনিয়া ॥

[প্রস্থান

জালু ॥ যাও দি' কণেক[৩]
শামুক পাঞ্জিয়ারের ঘর ;
মাইয়াটাক ধোলে মোর
কেমন জর ।...
—শামুক দাদা, শামুক দাদা,
বাড়ীত্‌ আছিত্‌, না নাই ;
মোর কণেক পাঞ্জি দেখ্‌ তো ভাই।
মোর মাইয়াটার জরখান
পালাবে, না নাই ।

শামুক ॥ হৈ জালুদা, বস' ব'স,
তাংকু খাই ;
পাঞ্জি দেখিয়া এলায় কহচুঁ ভাই।
—আন্‌ তো বেটী. পাঞ্জিখান ।

[বেটী পাঞ্জি আনিলো। পাঞ্জি দেখিয়া

১ নাইয়া ২ সাধের বিবাহ করিলি ৩ যাই দেখি একটু।

CENTRAL LIBRARY

॥ গান ॥

মেষ-বিরিষ-মিথন[১]—
তোর মাইয়াক ধইচে খিয়াল স্বপন।
মকর-কুম্ভ-ধনু-মীন—
জর পালেবার নাইরো চিন্[২]।
কইন্যা-তুলা আর সিং[৩]—
জর চলেছে আতি-দিন।
পান্জি দেখিয়া মোর
নাই নাগিল খোশ্[৪];
তোর মাইয়াক ধইচে
পর ছুঁতি দোষ।
একে শূন্য দশ, দুইয়ে শূন্য বিশ—
ভালো অধিকারী[৫] দিয়া
একটা প্যাবা[৬] দিস্।
তাহোলে পালাবে জর—
পান্জি দেখা হইল্ মোর
চলিয়া যা ঘর ॥

[জালু বাড়ীতে আসিল

জালু। শুনেচিত্[৭] না চেরকেটুর মাও,
জরখান কি আজি
খুবে দেছে তাও?
পান্জি দেখিয়া আসিনু ভাই,
প্যাবা না দিলে বোলে হোবে নাই।
ঠাকুর বাড়ীটা করেক ভাও[৮]
মুই একটা অধিকারীর বাড়ী যাওঁ।
দুত-কলো[৯]-দহি-মিঠাই
বাড়ীত্ নিমো[১০];
তাঁহো[১১] আজি প্যাবা দিমো ॥

১ মিথুন ২ চিহ্ন ৩ সিংহ ৪ খুশি ৫ পুরোহিত ৬ পূজা ৭ শুনিতেছিস ৮ লেপামুছা
৯ দুধ-কলা ১০ কিনিয়া বাড়ীতে আনিব ১১ তবুও।

ঢেঙ্‌পাড়ী ॥ অরে-আরি মুই
ঠাকুর মুছিবা' নি পারিম ;
তুই পারিস তে ভাই কর—
নাইতে '—'[১] অর ॥

জালু ॥ অধিকারী বৈরাগীক
আগত গুয়া দিয়া আসু[২] ;
না পারিস তে মুছিবা'
মুইহে মুছেচু ॥

[জালু-দেউনিয়া নিমতরণ[৩] দিয়া আসিয়া ঘর-দুয়ার মুছিলো। দূত-কেলা-দহি-মিঠাই সপ[৪] আনিলো। মাইয়াটা ছয়াটাক চিম্‌ঠায়[৫], ছয়াটা কান্দে—

জালু ॥ ছয়াটা আরো[৬] কিতায় কান্দেছে হে—
ঢেঙ্‌পাড়ী ॥ তোর,ছয়া কলো চাহাচে[৭] ।
জালু ॥ দে, দে দুইটা, খাউক ।

[এই রকমে ছয়া সেবার খরচ[৮] সপ খাইলো। অধিকারী-বৈষ্টম সবে আসিল

অধিকারী ॥ দেউনিয়া ভাই,
খাবার জগাড় হইচে, না নাই ?
জালু ॥ কত্‌খুনে জগাড় হইচে[৯] !
বৈষ্টম ॥ হরিবোল, হরিবোল ।
জালু ॥ ঠাকুর, ব'স ব'স,
ঠেং-গা ধো ।
ঝলাটা তুলিয়া থো ।
তমা' পান-তাংকু খাও—
ঠাকুর বাড়ীর খরচলা মুই
নিয়া আসু যাও[১০] ॥

১ অশ্লীল শব্দ ছিল, বাদ দিয়াছি ২ পূজা করিবার জন্য বা অন্য কোন নিমন্ত্রণ করিবার সময় পান-সুপারি দিয়া করিতে হয়। গুয়া দেওয়ার অর্থ—নিমন্ত্রণ করা। নিমন্ত্রণ করিয়া আসি ৩ নিমন্ত্রণ ৪ সব ৫ চিম্‌টি কাটে ৬ আবার। ইং Again অর্থে নয়। কথার মাত্রা ৭ কলা চাহিতেছে ৮ পূজার উপচার ৯ কখনই জোগাড় হইয়া গিয়াছে ১০ যাই, লইয়া আসি।

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্টম ॥ নেও বাবা, তাড়াতাড়ি স্থাবা দেও। আমাক ভোক নাগিছে।

[জালু যাইয়া দেখে কলো-মিঠাই কিছুই নাই

জালু ॥ হিলা আরো কেনং কাথা ভাই ;
দহি-চুঁড়া-কলো-মিঠাই
কিছুই নাই।
ছয়াটা কি তামানে খাইল্।
ছয়াটা খাইল্ কি ভুরী[১] টায় খাইল্,
মুই কিছুই বুঝুঁ না ॥

ঢেঙ্‌পাড়ী ॥ তুইহে তো[২] খাবা' কোলো—
মাথার উপর[৩] কুন্ঠে মোর
ভেদ্-ভেদেবা'[৪] ধোলো ॥

অধিকারী ॥ কই-রে ভাই,
ছুত-কেলা এলাও[৫] নাই।
চকর কাটিয়া বসি' আছুঁ[৬]—
নাইতে[৭] মুই চলি' যাছুঁ ॥

জালু ॥ অধিকারী ভাই,
স্থাবা দেওয়া আর হোবে নাই।
ছয়াটা মোর পাইচে আর চাইচে—
ছুত-কেলা-দহি-মিঠাই
তামানে[৮] খাইচে ॥
এইলা কি ভাই ছয়ার ঠাট[৯],
স্থাবা দিলে আরো মোক
করিবা' নাগে হাট।
আজি ভাই যা,
আজি খালি শংটায় বাজা[১০] ॥

১ বা ২ তুই-ইতো ৩ কাণের কাছে ৪ বক-বক করিতে ৫ এখনও ৬ চক্র কাটিয়া বসিয়া আছি ৭ নয়তো ৮ তামাম, সবই ৯ চাল-চলন, ব্যবহার, আচরণ ১০ আজ কেবল শঙ্খটাই বাজা।

—ঠাকুর তমরাও যাও,
স্যাবা দেওয়া হইল্ নাই
পান-তাম্বু খাও ॥

বৈষ্টম ॥ হৈ বাবা, হিনং তোমার কেমন কাথা,
ভোকে[১] যে মোর ঘুরেছে মাথা ॥

জালু ॥ ছলা কাথা ঠাকুর
না যায় কহা ;
তামান খায়য়া ফেলাইসে
মোর আইকস্[২] ছয়া ॥

বৈষ্টম ॥ রামরাম, রামরাম,
ভালো তো ন হায়-বাবা
বৈষ্টম হওয়া কাম।
দহি-চুঁড়া খরাকটা এলা
কনঠে খা'ম ॥
—তা হোলে বাবা, মোর একটা কাথা শুন্।

॥ গান ॥

মুই হয় ভুতিয়া[৩] তমার কথা শুনিয়া ;
খুশী ভং[৪] করিলো তুই
মোক নিমরতণ দিয়া ॥
ওরে, বাড়ী যায়য়া কী-টা খাই
খরাক-পানি কিছুই নাই ;
চুঁড়া চাইট্টা জগাড় কর—
চাহা[৫] দিয়া খাই ॥

জালু ॥ ঠাকুর, দুত-চিনি কিছুই নাই ;
কেমন করি' চাহা খিলাইঁ[৬] ॥

১ ক্ষুধায় ২ রাক্ষস ৩ গানের কথা শুনিয়া আনন্দে আটখানা হইলাম ৪ খুশি ভঙ্গ
৫ চা ৬ কেমন করিয়া চা খাওয়াই।

বৈষ্টম ॥ শুনেক রে দেউনিয়া ভাই,
হুত-চিনি তোর নাইতে নাই—
নুন দিয়া চাহা খিলা[১]
বাড়ী চলিয়া যাই ॥

জালু ॥ ঠাকুর, তুই বড় নোকটা একবাই-একবাই[২];
কহচুঁ তে[৩] হামার চুঁড়ায় নাই।
মোর সে ঠাকুর যাছে জান
তোর খালি হইচে চুঁড়া-দহির টান।
—তুই বাড়ী চলিয়া যা।

বৈষ্টম ॥ আচ্ছা বাবা, যাই।
তোর খাবা আর
খাবা' আসিমো নাই।
—হরিবোল, হরিবোল।

[বৈষ্টমের প্রস্থান

জালু ॥ এখন কি করুঁ, কুন্‌ঠে যাও।
অম্বা[৪] একটা কুন্‌ঠে পাও।
ভাগিনাটা বোলে অম্বা হইচে—
অরে[৫] বাড়ীত্‌ যাও।…
—ভাগিনা, ভাগিনা,
বাড়ী আছিত, না নাই?

শামকুড়া ॥ আয় মামা, ব'স ব'স,
খোপ[৬]আজি গমন[৭]।

১ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সমাজে দুধ-চিনির বদলে নুন দিয়া লাল চা খাওয়া হইয়া থাকে। নেপালী, ভুটিয়া ও মদেশী কুলীরাও এইভাবে চা খায় ২ একবাক্য সার যাহার ৩ বলিতেছি তো ৪ ওষ্ম। ৫ উহারই। শব্দটির আসল উচ্চারণ—'অরহে' ৬ খুব ৭ তুই আসিয়াছিস (গমন করিয়াছিস!), ভালোই হইল।

জালু ॥ হৈ ভাগিনা, বড় কামে আসিছু ।
তুই বোলে অঝা হইচিত্,
তাতে আসিছু ।
তোর মামীর হইচে জর—
তাতে আসিছু তোর ঘর ।
জর দেখিয়া মোর নাগেছে ডর
তোর মামীক ধইচে ঠেং-আওলা জর ।
নে দি'বা', কি কি করিবো, কর ॥

শামকুড়া ॥ তা হোলে মামা মুই বুঝিচুঁ—
হুনং জর[১] মুই কতয় খেদাচুঁ[২] ।
মামীটাক যেইনং জরখান ধইচে—
অয় তো বা ভূতের খেলত্ পইচে[৩] ।
যা মামা, বাড়ী যা—
কালি মুই সাকালে যাম বা' ॥

জালু ॥ সেই বা, কালি ফের যাইস ।
জরখান খেদায় দে,
দুই টাকা থাইস[৪] ।
—মুই বা যাছুঁ ।

শামকুড়া ॥ ব'স্ তো মামা, একটা কাথা শুন ।

॥ গান ॥

মামা, তুই ছাড়ি' বেড়াছিত্[৫] ঘর
মামীক ধইচে যেমন জর,—
মোর মামা গে,
দুখান জর খেদাইতে মামা
খোপদ্দি '—'[৭] খাবে ॥

১ ওইরকম জ্বর ২ কতোই খেদাইয়াছি ৩ ভূতের খেলায় পড়িয়াছে ৪ দুইটাকা লইস
৫ বেড়াইতেছিস ৬ খুব ৭ অশ্লীল শব্দ ছিল, বাদ দিয়াছি ।

CENTRAL LIBRARY

ওগে, যা যা মামা কালি যাম
পছিম পাকের[১] করিম কাম ;
হুখান জর মুই একদিনে খেদাম ॥
ওরে, হুমন জরের বড়র ঠেলা,
নাগে একটা মালভোগ কেলা ;
হিসাবতে তুই তো মামা
খোবে আজেলা[২] ॥

শামকুড়া ॥ তোক তো মামা আজেলা কছে
মামীর হুষী নাই[৩] ।
জরটার দিশাত্‌ তোক
বাতায় দিছে ভাই ।
তাঁহ তুই বুঝিবা' পারিস নাই ।
যা তুই চলিয়া যা ঘর—
কালি যায়য়া খেদায় দিম
ঠেং-আওলা-জর[৪] ॥

জালু ॥ তা হোলে বা, মুই যাছুঁ,
কালি তুই যাইস ।
খরাক যায়য়া মোরে[৪] বাড়ী খাইস ।
—মুই বা যাছুঁ ।

[বাড়ী যায়য়া—

জালু ॥ ॥ গান ॥

শুনেক গে চেরকেটুর মাও,
হিলা আউষোত[৫] কুনঠে পাও ।
অঝার কাথা শুনিয়া মোর
মুখত্‌ নাইরো আও ॥
ওকি রে এ-এ হে ॥

১ পশ্চিম দিকের ২ হ্যালা-ভোলা । কাজকর্ম যে করিতে পারেনা, বোকা । এখানে 'অসুস্থ' অর্থে ৩ দোষ নাই ৪ আমারই ৫ ঔষধ ।

আলোক নতার শিপা[১] নাগে
শলা কচুর[২] পাত ;
ঢোপ ভরেবা'[৩] নাগে বোলে
বন্নুয়া হাতীর দাঁত ॥
ওকি রে এ-এ হে ॥
বেইশার[৪] ঘরের মাটি নাগে
মুচির ঘরের চাম ;
তেল মাড়িবা'[৫] নাগে বোলে
জীয়ত বাঘের ঘাম ॥
ওকি রে এ-এ হে ॥
দার্জিলিঙের পাথর নাগে
অংপুরের[৬] শুকাতি[৭] ;
আরো একটা নাগে বোলে
খাতেরা চিতি[৮] ॥
ওকি রে এ-এ হে ॥

জালু ॥ এ হে, মুই একঠে[৯] যাছুঁ ॥

[প্রস্থান । কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ গুরুজীয়ানী, গুরুজীটা আছে, না নাই ?

ঢেঙ্‌পাড়ী ॥ তোর গুরুজী বাড়ীত্‌ নাই ।
আয় বাপোই,
হামেরা চাহা-চুঁড়া খাই ॥

[এমন সমে অঝাটার প্রবেশ

অঝা ॥ মামা, মামা, ঘরত্‌ আছিত্‌ না নাই ?

১ 'অলগ' লতার শিকড় ২ এক ধরণের কচু ৩ ধুপদানি ভরাইতে ৪ বেশ্যার
৫ বিভিন্ন প্রকার বস্তু দিয়া মন্ত্র-পূত তৈল মাড়িয়া রোগীকে সেবন করিবার জন্য দেওয়া হয়
৬ রংপুরের ৭ শুকনা পাটের পাতাকে 'শুকাতি' বলে ৮ বড় প্রজাপতি ৯ একস্থানে ।

ঢেঙ্‌পাড়ী ॥ কহ দি' বন্দু[1] কেমনটা হইল্!

ভাগিনা তো ধইল্।

যা, যা, ধানের পুড়াটাত[2] সন্দায় অহ[3]।

[কাঙ্গভাঙ্গা লুকাইলো

অঝা ॥ মামী, মামাটা তো ঘরত্ নাই,

তা হলে মোর আসনটা গেল্, যাই[4]।

—ঘরত্ হুটা কাঁয়[5] আও কাড়েচে[6]?

ঢেঙ্‌পাড়ী ॥ কাঁহ ন' হায় বা', কাউহাটা[7] ঘর সন্দাইচে—তাতে আও কাড়েচুঁ। ভাগিনা, ব'স ব'স, আগাঘরটাত্[8] ব'স। কহ দি'বা' কুন্‌ঠে যাবো?

অঝা ॥ মামাটা কালি গেইছে মোর ঘর—

তোর বোলে হইচে জর।

তাতে মামী আসিনু।

হুটে[9] না বসুঁ মুই,

তোরে নগত্[10] বসিম ॥

[জালুর প্রবেশ

জালু ॥ হৈ ভাগিনা, আসিয়া পইচিত্[11]!

কেত্‌খুণে আসিচিত্[12]?

অঝা ॥ কেত সাকালে আসিচুঁ মামা!

নে মামা, তাড়াতাড়ি জগাড় কর।

চট্ করি' মুই যাম ঘর।

আজি মামা তাকত্ পইছে—

কেমন মামীটাক ঠেং-আওলা জর ধইছে।

তাড়াতাড়ি মোক জগাড় করি' দে—

পরীখাটা[13] দেখিয়া নে ॥

১ বন্ধু ২ ধান রাখিবার পাত্র বিশেষ ৩ ঢুকিয়া থাক ৪ তাহা হইলে আমার আসাটাই বৃথা হইল, যাই, চলিয়া যাই ৫ ওটা কে ৬ রা কাড়িতেছে ৭ কাকটা ৮ পূর্ব দিকের ঘরটাতে ৯ ওইখানে ১০ তোরই সঙ্গে, কাছে ১১ পড়িয়াছিস ১২ কতক্ষণ হইল আসিয়াছিস ১৩ পরীক্ষাটা।

CENTRAL LIBRARY

জালু॥ কি নাগে বা', কহ দি' ?

অঝা॥ কিছু মোক না নাগে,

খালি দুত-কেলা আর একটা ঘাণ্টি[১]।

তা না হোলে দেওটা তোর

হবা' না হয় শান্তি।

আর গুটিক দহি-চুঁড়া,

আর একটা ধানের পুড়া;

আজি হাতে জরটার মুই

অঠায় দিম ধুরা[২]॥

[জালু দেউনিয়া সপ জগাড় করি' দিলো। শামকুড়া অঝা পাক জুড়িলো

শামকুড়া॥ মামা, মামীটাক এইঠে ধরি' আন্।

জালু॥ আয় গে আয় পূজার গোড়[৩]—

জরটা আজি খেদাউক তোর॥

ঢেঙ্পাড়ী॥ ছি ছি আই—

পুরা-নাগা[৪] অঝা হামা' দেখি নাই॥

অঝা॥ 'মহ[৫] তো মামী ঠেং-আওলা জর দেখুঁ নাই, তোরেঠে দেখিনু।

[রুগী পূজায় আসিয়া খাড়া হইলো। ধানের পুরা আনা হইলো। অঝা পাক জুড়িলো, হাতে মাশাল[৬] নিয়া।

অঝা॥ মামা, যেলা মুই দমটা ছেড়িয়া দিম, সেলা তুই ঘাণ্টিটা দিয়া পুরাটাত্ কোপ দিস্।

অঝা॥ ॥ ঝাড়ানি ॥

মামার ঘর ছাড়িয়া—

যারে জর তুই দখিণক নাগিয়া[৭]।

এহে কালপীর, নরসিং, তমরা দুই ভাই,

দুত-কলা দিছুঁ মুই চিনি-মিঠাই।

১ লাঠি ২ জরটার নিবাস উঠাইয়া দিব অর্থাৎ জর খেদাইব ৩ পূজার গোড়ায়, নিকটে ৪ ধানের পুড়া লাগে যার ৫ আমিও ৬ মশাল ৭ দক্ষিণ দিক লাগিয়া, দক্ষিণ দিকে।

দহি-চুঁড়া-পূজা-পানি ভইকণ[১] কর্ ;
পূজাত্ নাম্তিয়া[২] আয় রে—
ঠেং-আগুলা জ্বর।
কুনঠে হুকায় আছিত্ শালা পুড়ার ভিতর।
এহে ঢেঙ্পাড়ী মামী মোর
ঠেং-আগুলা জ্বর—
ডাংঘায়[৩] ভাঙ্গিম আজি
জ্বরের কমর ॥

[ডাং মারিলো

কাঙ্গভাঙ্গা ॥ গুরুজী, মোক ছাড়ি' দাও—
ধরুঁ[৪] তমার পাও।
এইলা[৫] পাকত্[৬] ফেলাইল্ মোক
গুরুজীয়ানী মাও ॥

জালু ॥ হা বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা,
তুইহে মোক সাঁতেবা'[৭] ধইচিত্[৮] !
এইলার বাদে মোক
গুরুদাই দিছিত্[৯] ?
দোষ-গুনা[১০] তোর দিনু মাপ :
মুই তো ন' হাও[১১] গৌতম মুনি
দিম অবিশাপ[১২]।
—মোর একটা কাথা শুন।

॥ গান ॥

কাকে কহি ভালো মন্দ
কারয় বিশাস[১৩] নাই।
হিলা[১৪] পাপের ভাগী তোর
কায় হোবে রে ভাই ॥

১ ভক্ষণ ২ নামিয়া ৩ ডাং মারিয়া অর্থাৎ প্রহার করিয়া ৪ ধরি, ধরিতেছি ৫ এই সমস্ত ৬ পাকে ৭ সন্তাপিত করিতে ৮ ধরিয়াছিস ৯ এই সমস্তর জন্যেই কি গুরুদায় দিয়াছিস ১০ দোষ-গুনাহ্ ১১ নহি, নই ১২ অভিশাপ ১৩ বিশ্বাস ১৪ এই সমস্ত।

ওরে পুরাণতে আছে ভাই
গুরু-মাকে নিবা' নাই[১]।
তোর মনত্ কি কাইও-গিয়ান[২] নাই ?
জানিস না কি ইন্দ্র রাজার
কি হইচে সাদাই[৩] ?
ওরে গুরু হইল্ নিদানের বন্দু[৪],
পার করিবে ভোবোসিন্দু[৫]।
সেইটা কি তোর মনে নাই ?
গুরুয়ানী মাওটা শালা
ত্রিজগতের রাই ॥

জালু ॥ ভাগিনা, দে শালাটাক ছাড়ি' দে—
চলিয়া যাউক ঘর।
আজি হাতে[৬] পালাইল্
তোর মামীর জ্বর।
এলা[৭] তো বা' যা ঘর ॥

•

১ কোনো নারীকে বিবাহ করা বা তাহার সহিত যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করাকে তাহাকে 'নেওয়া' বলা হয়। গুরুমাকে নিতে নাই —ইহার অর্থ গুরুমার সহিত প্রণয় বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে নাই ২ কাণ্ড-জ্ঞান ৩ সাজাই, সাজা ৪ অন্তিম কালের, বিপদের দিনের বন্ধু ৫ ভব-সিন্ধু ৬ আজ হইতে ৭ এখন। শ্রীভগীরথ রায় (বড়ুয়াপাড়া, গড়ালবাড়ী, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) -কর্তৃক রচিত এবং তাঁহার নিকট হইতে জুন, ১৯৫৯, সনে সংগৃহীত।

CENTRAL LIBRARY

॥ মান-পাঁচালি ॥

। ৩৫৩ ।

॥ মুকচাটু গঁসাইয়ের পালা ॥

॥ বন্দনা ॥

ওগো মা,
মা মোর, আয় গে আয়—
জোড় হস্তে ডাকি তমায় ॥
তমার মতন আছে কাঁয়
ভক্তি করি মা এ সভায় ।
ওকি গো মা,
এই আসরে দেও ভরসা ॥
তুমি দেবী, তুমি সিদ্ধি
তুমি মা মোর গুণমণি ।
ওকি গো মা,
এই আসরে দেও ভরসা ॥

[হেদেলীর প্রবেশ

হেদেলী ॥ এ বেটী মালতীশোরী, হিততি[১] আয় তো মা ।

[মালতীশোরীর প্রবেশ

মালতী ॥ কিতায়[২] গে মা ?

হেদেলী ॥ হিততি আয় তো মাই
মায়-বেটী আড়ী হনো[৩]
কেনং করি' খাই ।
—একটা মোর কাথা শুনেক দি'[৪] মাই ।

॥ গান ॥

দারুণ বিধি রে,
মায়-বেটীকে কোলো[৫] মান্‌খি-হাসা রে ॥

১ এইদিকে ২ কি জন্তে ৩ মা-মেয়ে দুই জনেই বিধবা হইলাম ৪ শোন্ তো দেখি
৫ করিলি ।

বিধুতাহা[1], কপাল-ভাঙ্গা নদীর ডাঙ্গা
এমন হামার বরাত মান্দা[2]
মায়-বেটী হনো স্বামী-হারা ॥
বিধুতাহা,
ধন-সম্পতি ফুরায় যায়া
কতো আর অহিম কান্দিয়া।
কতো অহিম চিতত্ ক্ষেমা দিয়া[3] ॥

হেদেলী ॥ তুই তে কি বুঝেচিত্[4] মাই,
হিনং করিয়া[5] আর খোওয়া[6] যাবে নাই।
একটা বেটী বুদ্ধি কইছুঁ মুই—
তোর বাদে নাইতে[7]
একটা ডাঙ্গুয়া[8] আনেছুঁ[9] মুই ॥

মালতী ॥ মুই আর মা কি কহিম।
ডাঙ্গুয়া থুবো, আন্।
যেলায়-সেলা[10] মোরো মনটা
হচে ছাতুছান[11]।
মুই মা নদী যাছুঁ—
করিবা' সিনান ॥

[মালতীশোরী সিনান করিতে গেল।
কোকিল পাখীর ডাক শুনিয়া—

১ বিধাতা। হুরের জন্ম 'হা' ২ মন্দ ৩ চিত্ত দমন করিয়া ৪ বুঝিয়াছিস ৫ এই রকম করিয়া ৬ খাওয়া ৭ নয়তো তোর জন্মে ৮ রাজবংশী-সমাজে বিধবারা পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে বিচিত্র উপায়ে। যে প্রথানুযায়ী কোন পুরুষ বিধবাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য বিধবারই গৃহে থাকে স্বামীরূপে, তাহাকে 'ডাঙ্গুয়া' বিবাহ বলে। বিধবার গৃহে প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবেশ করিবার সময় সেই পুরুষ হাতে একটি 'ডাং' বা যষ্টি লইয়া প্রবেশ করে। এইজন্য সেই পুরুষকে 'ডাঙ্গুয়া' এবং এইরূপ স্বামী গ্রহণ করাকে 'ডাঙ্গুয়া রাখা' বলা হইয়া থাকে ৯ আনিতেছি ১০ যখন-তখন ১১ ছত্রখান, খান-খান।

CENTRAL LIBRARY

মালতী ॥ কেন ছাড়ো ওহে কোকিল
কুহু কুহু আও।
তোর বোল শুনিয়া মোর
জলিয়া উঠে গাও ॥

॥ গান ॥

কেনে রে কোকিল ডাকো
বৃক্ষের ডালে!
এই না ব'সে[১] স্বামীধন মোর
নাইরো কপালে ॥
নারীর বসন্তকালে
ভমরা বসিয়া ডালে
মধু করে গান।
এই না ব'সে বিধুয়া[২] মোক
কোলে ভগবান ॥
কী যে মোর কর্মের ফলে
মুই নারী ভাসেছুঁ এলা[৩]
সাগরের জলে।
ধুলিয়া আগুনের পোড়
মোর অন্তরে জলে ॥

মালতী ॥ এই মোর কর্মফল
দিনে পড়ে মোর চক্ষের জল।
নাই মোরে[৪] কালা
প্রেম-জ্বালার বিষে হলাহল।
ভাবিয়া আর কি হোবে ভাই,
সিনান করি' বাড়ী যাই।
দেরি হলে তো গালি দিবে আই[৫] ॥
[সিনান করিয়া মালতী বাড়ী আসিল

১ এই বয়সে ২ বিধবা ৩ এখন ভাসিতেছি ৪ আমার ৫ মা।

হেদেলী। সিনায় আসিলো মাই ?
তোর মনটা মুই একনাথা দেখেছুঁ[১]—
তুই অভা' পারিবো নাই[২]।
ডাঙ্গুয়া না থুলে চলিবে নাই।
মনটাতে ডাঙ্গুয়া মুই
বেছিয়া কইছুঁ[৩] সারা।
শুনেচুঁ[৪] তোর বড় আহুর[৫]
মইচে বোলে মাইয়া[৬]।
তোর বাদে চেঙ্গেড়া কত
করেছে ঘুরাঘুরি।
অঁক্[৭] আনিয়া মুই
বান্ধিয়া দেছুঁ জুড়ি[৮]।
মুই বেটী তোর আহুর বাড়ী যাছুঁ॥
—এ বা'রে মুকচাটু, বাড়ীত্ আছেন'?
মুকচাটু॥ আয় বা', ব'স ব'স! মুই বা' ঠাকুর পূজা করিবা' ধরিছুঁ।
হেদেলী॥ হে বা', তমা'[৯] কি ঠাকুর হইচেন ?
মুকচাটু॥ হৈ মা, তমায় আসেচেন!
চালিত্[১০] বসো, যাও।
মুই কণেক ফঁটালা বুলাও[১১]।
—তমা' কেদুর[১২] যাবেন, মা ?
হেদেলী॥ তমা' তো বা' হামার বাড়ী যাবায় ছেড়িচেন[১৩]!

১ তোর মনটা আমি একরূপ বুঝিয়াছি ২ তুই রহিতে পারিবি না ৩ বাছিয়া সারা করিয়াছি ৪ শুনিতেছি ৫ বড়ো ভগ্নীপতির ৬ বউ ৭ উহাকে ৮ জোড়া বাঁধিয়া দিতেছি ৯ 'আপনি' অর্থে ১০ বারান্দায় ১১ কৌটাগুলি কাটি ১২ কতোদূর ১৩ আমাদের বাড়ী যাওয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মুকচাটু ॥ যাবেন যাবেন বা।
মহ তো ঢেনায়[১] হইচুঁ।
মাইয়া-ছওয়া তামানে[২] খাইচুঁ।
তারে বাদে এলা মুই বৈষ্টম ঠাকুর হইচুঁ।
দিনে কামাও, আইতত্ খাও।
বাড়ীটাতে কারো বাড়ী
বেড়েবা' না যাও॥

হেদেলী ॥ হারে বা, দেহাটা কিতায় শুকিচে ?

মুকচাটু ॥ হে বা, তমা' মোক
নাড়িয়ায় ফেলালেন[৩]।
মুই বা মাইয়া নোকের ছাটায় সহ' না[৪]।
মাস-মাংস[৫]-নারী
এইলা আর মুই দেখিবা' না পারি।
এইটা মোর গুরুর আজ্ঞাকারী।
আরো বা মোক বা সিনিবায় নাগিল্[৬]।

হেদেলী ॥ মুই বা' না জান্থ
তমা' ফট্-ফটিয়া সাধু[৭]।
—মোর একটা কাথা শুন।

॥ গান ॥

ও মোর জোয়াই[৮] বেটা রে,
সোদোর খাবা'[৯] যান একদিন হামার বাড়ী।
তমাক তো অন্‌ছাচে[১০]
হামার মালতীশোরী।

১ অধিক বয়স্ক যে পুরুষের বিবাহ হয় নাই, অথবা বিপত্নীক। বর্তমান ক্ষেত্রে বিপত্নীক ২ সবই ৩ ছুঁইয়াই ফেলিলেন ৪ স্পর্শও সহ্য করি না ৫ মাছ-মাংস ৬ আবার বুঝি, আমাকে স্নান করিতে হইবে ৭ যে সাধু ফোঁটাকাটা ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া খুঁৎ-খুঁৎ করে, ব্যঙ্গে ৮ জামাই ৯ নিমন্ত্রণ খাইতে ১০ অনুসন্ধান করিতেছে, চাহিতেছে।

বটারের গোড়ত্[১] হইল্ বাড়ী
সেই হামারতি[২] অত্যাচারী।
পারেন তে ধরিয়া আইস[৩] গোরু-গাড়ী॥
চাইর শও টাকার গোরু-গাড়ী
আখিতে মোর হইচে ভারি[৪]।
ভগবান করাইছে হামাক
মাইয়া-বেটা আড়ী॥

মুকচাটু॥ হে শাল্-পতিটাও[৫] মইছে নাকি তে?

হেদেলী॥ মইছে নাই তে!
ওইলা তো বা' কাথা,
ঘরটার নাই মোর মাথা[৬]।
তাতে তোরটে[৭] আসিনু মুই—
যেনং সাধু বা হইচিত্ তুই—
তোক দেখিয়া ভুতিয়া পইনু মুই[৮]॥

মুকচাটু॥ নাপ-ঝাঁপ[৯] হুলা[১০] তামান করিছুঁ দূর।
গালাত্ করিছুঁ শুঁটকী মালা
না খাও নিন্দুর[১১]।
মুই তমার ধন- সম্পতি কি করিম,
গোরু-বাছুর কি করিম।
মুই হইচুঁ বা সাধু॥

[হেদেলী বাড়ী আসিয়া মালতীকে সব কথা বলিল

১ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ডারের নিকট ২ আমাদের দিকে ৩ লইয়া আসিয়ো ৪ কষ্ট ৫ শ্যালিকা-পতিটাও ৬ ঘর-গৃহস্থালি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য কোন পুরুষ নাই ৭ সেইজন্য তোর কাছে ৮ তোকে দেখিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম ৯ লাফঝাঁপ ১০ ওই সমস্ত ১১ মুকচাটু বিনয় করিয়া নিজেকে বিড়ালের সহিত উপমিত করিয়া বলিতেছে, সে ইঁদুর খায় না।

মালতী ॥ হা গে মা,
আসুটা বোলে আসেচে হামার ঘর ?
বেশ তো, আসুটা বৈষ্টম হইচে
মহ তো নিসু মন্তর ॥
এলা অয়[১] মোর হাতে
কিতায় খাবে নাই ?

হেদেলী ॥ যেই হইচে অয় কঁটাটিয়া সাধু
কুন বা দিনা মুই অর বাড়ী যাছুঁ ॥

মালতী ॥ তুই মা আজি যা।
চালাক করি' না আনিলে
ন'হায় আসিবা'[২]।
অক্[৩] যায়া তুই স্থাবার গুয়া দে[৪]।
স্থাবার গুয়া পা'লে অয়
আপনে আসিবে ॥

হেদেলী ॥ ওইটা কাথায় হয় নাই ;
তা না হলে অয়
আসিবে নাই ॥

[বুড়ী জামাইয়ের বাড়ীতে গেল

হেদেলী ॥ হে বা' মুকচুটু, গুয়া ধর ;
পাঁচ বৈষ্টমের স্থাবা খাবা'
যাইস হামার ঘর।
চাইরটা বৈষ্টম বা' মিলিছে
আর একটায় মিলে না ॥

মুকচাটু ॥ কোন্ দিনা স্থাবা দিবেন ?

১ ও ২ আসিবার নয় ৩ উহাকে ৪ পূজা করিবার জন্ত কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইলে হাতে পাঁন-সুপারি দিতে হয়। গুয়া দেওয়ার অর্থ হইল—নিমন্ত্রণ করা।

হেদেলী ॥ পাঞ্জি-ফুতি[১] দেখিয়া বা'
আজি পইছ ভাগে।
বেলা গড়িতে গড়িতে[২] মোক
খাবা দিবা' নাগে।
—চট্ করি' যান, দেরি করেন না।

মুকচাটু। আচ্ছা বা' যাও।

[হেদেলী বাড়ী ফিরিয়া আসিলো

মালতী ॥ কেমন মা, আহুটা[৩] আসিবে, না নাই ?

হেদেলী ॥ না আসিলে ছাড়া[৪]।
মোরে আগত্[৫] আয় বেটী
সিনায়-ধুলায় সারা।
—বেটী মোর একটা কাথা শুন্।

॥ গান ॥

বেটী, তোক একটা মুই
বাতেয়া দেছুঁ ছল।
জামাই বেটার ঠেঙ্গত্ আজি
ঢালিয়া দিস গে জল[৬]।
বেটী, মন কান্দেছে নিশি পহাতে।
তোর বাদে ভগবানটা
কণকয় না দেখে[৭] ॥

[মুকচাটুর প্রবেশ

মুকচাটু ॥ হরে কিষ্টো নারায়ণ,
এলাও নাই করেন তমা'
খাবার আয়োজন ?

১ পাঁজি-পুঁথি ২ বেলা গড়াইতে গড়াইতে ৩ ভগ্নীপতিটা। ৪ না আসিলে ছাড়িব না ৫ আমারই সম্মুখে ৬ জামাইয়ের পায়ে জল ঢালিয়া দিবি। কোনো পুরুষের পায়ে কোনো নারী জল ঢালিয়া দিলে, তাহা বিবাহের সমান হইয়া যায়। অনেকটা মালা বদলের মতো। গান্ধর্ব বিবাহেই এই অনুষ্ঠানটি হইয়া থাকে ৭ তোর প্রতি ভগবান একটুও দৃষ্টি দেয় না।

হেদেলী ॥ ব'স ব'স জোয়াই-বেটা,
খাও গুয়া-পান।
স্থাবা দেওয়াটা বা' হামার
হইচে আংসাং[১]।
হামারতো বা' কামজাম করা হইচে ;
ঠাকুর-বসা গুয়া বোলে
ভেল্লা অধিকারীরঠে পইছে[২]।
সগায় মোক সাঁতাছে[৩] বাপোই
মাইয়া দেখিয়া খালি।
হামার সেবাটা বোলে
সাকালে দিবে কালি।
বেশ আসিলো জয়াই বেটা,
আতিটা আজি অহ ;
তমার সঙ্গে একটা দুঃখ-সুখ্খ
কহিম মহ।
পান-তাংকু খাও,
চাইরটা দহি-চুঁড়া খাও॥ [প্রস্থান

মুকচাটু ॥ বেলা বা' চলিয়া যাছে
খরাক খিলাবেন তে খিলাও।
জোগোতে মুই বাড়ী যাঙ[৪]।
রহিবা' পারিবা' ন' হাঙ[৫]।
তমার কাথা কাঁয় বা ধরে[৬]
কাথালা বা ভুয়া ;
তমার বাদে ঘুরায় দিছু[৭]
দুইখান স্থাবার গুয়া।
তমা' বেনাইছেন বা ছায়ার খেল ;
দুই স্থার চাউল মোর চলিয়া গেল্॥

১ গণ্ডগোল হইয়াছে ২ প্রধান পুরোহিত ভেল্লা নামীয় ব্যক্তি ঝামেলা লাগাইয়াছে ৩ সন্তাপিত করিতেছে ৪ এখনি আমি বাড়ী যাইতেছি ৫ রহিতে পারিব না ৬ তোমাদের কথা কে বা শোনে ৭ ফিরাইয়া দিয়াছি।

CENTRAL LIBRARY

মালতী ॥ হৈ আন্থ, তোর এতটায় ধাই-ধাই[১] ;
বারো বচ্ছরে আজি আসিলো ভাই।
ভাত আন্ধ, ভাত খাই—
দনো আন্থ-শালী আনন্দ গাই।
মহ তো আন্থ মস্তর নিয়া হইচু সাঁই।
দনোঝনে[২] আজি নাগামো ধাই[৩] ॥

মুকচাটু ॥ মুই হইচুঁ ভাই ব্রহ্মচারী—
দাড়ি-চুল মোর নাই।
তোক নাগে ভাই
দাড়িয়া গঁসাই।
ব্রহ্মচারী গঁসাই হামার
মাতাজীর দরকার নাই ॥

মালতী ॥ আচ্ছা আন্থ, আগত্[৪] খা।
একটা সেলা কাথা কহচুঁ[৫]—
উত্তর দিয়া যা।
—অহিস আন্থ, তোক করিয়া দেঙ ঠাঁই ॥

মুকচাটু ॥ তুই মাই না করিস ঠাঁই।
তোর হাতে মোর জল চলিবে নাই ॥

মালতী ॥ আচ্ছা ভাই, পরজাটায় হামার[৬]
করিয়া দেওক ঠাঁই[৭]।
—আয়তো বা'রে বাড়ী-ঘুরা[৮],
ঠাকুরটাক হামার খিলা[৯] দহি-চুঁড়া ॥

[মালতীশোরী মুকচাটুর ঝোলাটা লইয়া
ঘাড়ে তুলিতে গেল—

১ এতটাই তোর অহঙ্কার ২ দুই জনে ৩ আনন্দ লাগাইব, করিব ৪ আগে ৫ তারপর একটা কথা কহিতেছি ৬ আমাদের প্রজাটাই ৭ ঠাঁই করিয়া দেউক ৮ প্রজাটির নাম ৯ খাওয়া।

মুকচাটু ॥ হা হা মাই,

ঝলাটা মোর কিতায় নাড়িলো ?

মাইয়ানোক তমা'

না হান ভাল্ ।

বহায় দিলো মোর গুরুর হাল ।

মাইয়ানোকের মুই ছাটায় সহঁ না ;

খালি তমার বাড়ী মুই আস্থঁ না[১] !

মালতী ॥ ঢেল্[২] সাধু দেখিচুঁ তোর নাথাতি[৩] ।

মাইয়ানোকটা নাড়িলে কি তোর

ঝলাটার গেল্ জাতি ?

ঘাড়ত্ করি' বুঝেচুঁ ভাই

মাতাজী মোক শবাচে না নাই[৪] ॥

মুকচাটু ॥ আর খরাক খোওয়া মোর

হইল্ নাই ।

তুই আজি মোক বহায় দিলো মাই ।

এই সমে কচুঁ[৫]—

ঝলাটা তুই খো ;

কি কোভো তে মুক দিয়ায় কহো[৬] ॥

[ঝলা কাড়িয়া নিলো । মালতী মুকচাটুর

পায়ে জল ঢালিয়া দিল ।

মালতী ॥ তোর ঠেঙ্গত্ জল ঢালিছু

আজি হাতে তোক স্বামী বরণ করিছু ।

—আস্থ, মোর একটা কাথা শুন্ ।

১ সাধে তোমাদের বাড়ীতে আসি না ! ২ ঢের ৩ তোর মতো ৪ শোভা পাইতেছে, কি পাইতেছে না ৫ এই সময়ে বলিতেছি ৬ কি কহিবি, মুখ দিয়াই বল ।

CENTRAL LIBRARY

॥ গান ॥

ও মোর ফুল বাগানে
বহে রে মলেয়া বসন্তের বাও[১]।
তোর পিছা মুই
ছাড়িবায় না হাও[২] ॥
প্রেম-আগুনে জ্বলে গাও
হি দেহা[৩] মুই কুন্‌ঠে জুড়াও।
মোর প্রেমের ঘাটে নাই কাণ্ডারী
কাঁয় চালাবে তরী ॥
এমন হামার কপাল পড়া
কমল ফুলে নাই ভমরা।
ভমর বিনা ফুলের মধু
যাছে তো শুকিয়া ॥

মালতী ॥ বুঝিলো আম্ব-ঠাকুর,
ভাঙুয়া যদি না অহিস—
তোরে বাড়ীত্ যাম।
তাঁহ[৪] তোর মাথাটা চেবেয়া খাম[৫]।
তারে বাদে[৬] তোর মুই
ঠেঙ্গত্ দিমু জল;
না অহিস তে ঝলাটা অঠা[৭]—
তোরে বাড়ী চল্ ॥

মুকচাটু ॥ এইলা কি মাই তোর কাম!
রাম রাম রাম।
তুই শালী মোর অঠায় দিলো নাম[৮] ॥

[বাজে লোকের প্রবেশ

১ মলয় বসন্তের বাতাস ২ ছাড়িবই না ৩ এই দেহ ৪ তুবও ৫ চিবাইয়া খাইব ৬ তারই জন্তে ৭ উঠা ৮ নাম উঠাইয়া দিলি অর্থাৎ বদনাম করাইয়া দিলি।

বাজেলোক ॥ কি হইচে রে ঠাকুর ভাই ?

মুকচাটু ॥ দেখ্‌তো ভাই, এই শালী
মোর ঠেঙ্গত্‌ ঢালিয়া দিলে জল।
সাধুগিরিটা মোর বেঠাইল্‌ অসারতল[1] ॥

বাজেলোক ॥ বেশ হইল্‌।
এলা ভাই ভাঙ্গিয়া অহ ;—
ঝলামালা ফেলায় দিয়া হাল বহ ॥

[প্রস্থান। মুকচাটু কান্দিবা' ধরিলো

মুকচাটু ॥ এ তুই ভাই মোক মা'লো।
তপ-জপ মোর তামান খা'লো।
—একটা কাথা শুন্‌।

॥ গান ॥

মিচ্ছায় আসিনু মাই মুই তমার বাড়ী।
আজি হাতে[2] ঘুচি' গেল্‌ ব্রহ্মচারী ॥
গলায় মোর নাগালো দড়ি—
ছি ছি মুই লজ্জায় মরি।
মোর কপালে না-রাজ হইচে হরি ॥
মুই হনু মাই ব্রহ্মচারী
নিবা' হামাক নাই নারী[3]।
তাতে নাই মোর চুলি-দাড়ি,
ও মুই নাই হওঁ কপীন-ধারী ॥

মুকচাটু ॥ তুই মোক মারলো মাই।
ব্রহ্মচারী মন্তরটা কোলো বার-যাই[4] ॥

মালতী ॥ আচ্ছা আহু, ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারী তে করিবা' ধরিচিত্‌[5],—ব্রহ্মচারী কাক্‌ কহে[6], বৈষ্টম কাক্‌ কহে, কহ তো।

১ রসাতলে পাঠাইল ২ আজ হইতে ৩ আমাদের নারীসঙ্গ করিতে নাই ৪ বাহিরে-যাওয়া অর্থাৎ দূর করিয়া দেওয়া ৫ ধরিয়াছিস ৬ কাহাকে বলে।

মুকচাটু ॥ ব্রহ্মচারী হইচুঁ তে মুই জানু না ?
ব্রহ্মাকে জানিবার বাদে ব্রহ্মচারী।
বিষ্টুকে জানিবার বাদে বৈষ্টম।
হুলা[1] মাই মোক কভা' নাগে না[2]।
হুলা মোর তামান আছে জানা।
ব্রহ্মাকে জানিলে মাই
তার উপর আর বস্তু নাই।
নারীক্ নিবা থাক্,
মুখ দেখিতে নাই ॥

মালতী ॥ শাস্ত্র-পুরাণে লেখিচে যত
মহ জানু শত-শত
হুলা মুনি-ঋষির মত।
নারী হইল্ তোর আসল গুরু
কহচে ভাগবত্।
শ্রীমৎ-ভাগবত্ পড়িলে হোবে নাই ;
পড়িলে পণ্ডিত ন'হায়[3],
কাথা বুঝা চাই।
আচ্ছা গঁসাই, কহ তো—
শ্রী-টা মাইয়া না মরদ ?
বৈষ্টম কি হয় খালি
লাল কাপেড়া দিলে ঘাড়ত্ ?
নারীর প্রেমে জগৎ বাঁধা ;
শ্রীগুরু হয় শ্রীমতী রাধা।
নিন্দা করা না যায়,
মন্ত্র নিলে মাইয়ার হাতে মহাজনে খায়।
তোক আরো পুছে কাঁয় ?
—একটা কাথা শুন্।

১ ওই সমস্ত ২ কহিতে লাগিবে না ৩ হয় না।

॥ গান ॥

কোন্ গুরুই তোক মন্ত্র দিছে
বুঝিবার আছে ভুল,
—রে গঁসাই!
ঝলামালা কপীন-ডোর
তামান্‌লায়[১] তো মোর।
মনের সঙ্গে বিচার করেক
কোন্‌খান জিনিস হয় তোর।
—রে গঁসাই!
তুই বোলে তে মুইহে[২] বড়
মাইয়া নোকক্ নিন্দা কর
—রে গঁসাই,
মাইয়া হাতে[৩] হইচেএ দুনিয়াই।
—রে গঁসাই।

মালতী ॥ দেখ্, গঁসাই, নারী নোকের বাড়ী।
নারী ছাড়া নাই হর-হরি ॥
নারী নোকটা আইন মত অনাদি ঈশ্বর;
নারীটায় তো[৪] ব্রহ্মার ঘর
অকে কহে[৫] গঁসাই ব্রহ্মান্তর ॥
কলি যুগে নিমাই চান্
কাটিয়া অষ্ট ফান—
ছাড়িয়া লাফ-ঝাঁপ
কিষ্টো নামে পাগল হয়া
ধরিল্ রাধার ভাব ॥
রাধার ভাবে ভাব ধরিয়া
হইল্ সন্ন্যাস।
দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করে
থাকিয়া পরবাস ॥

১ সবগুলিই, সবই ২ আমিই ৩ স্ত্রীলোক হইতে ৪ নারীটাই তো ৫ উহাকে বলে।

CENTRAL LIBRARY

মাইয়ার গর্ভে জন্ম হয়য়া
মাইয়া নোকটা গেল্ বয়হা[১]—
নিন্দা করিস মোক ,—
ব্রহ্মচারী সাধুটা.
মুই শিক্ষা দিম্ তোক ॥
স্ত্রী-পুরুষ এক দেহা
তাতে নোকে করেছে বেহা ;
মাইয়াক দেছিত্[২] তুই বয়হা ।
দুই দেহায় এক দেহা হলে
ভগবান করে দয়য়া ॥
দুই দেহায় এক দেহা হও,
হরি নাম মন্ত্র কও ;
যুক্তিত্ মরে কুক্তি[৩] ।
যুগল হবা' না পারিলে
দেহার নাইরো মুক্তি ॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
মাইয়াটা হয় অর্ধাঙ্গিনী ।
স্ত্রী-পুরুষ এক ;
দুই জনেতে প্রেম হয়—
শাস্ত্র খুলি' দেখ্ ॥
তুই বোলে তে মুইহে বড় ;
মাইয়া নোকক্ নিন্দা কর ।
তুই কোন্ সাধুর শালা ।
বিনা প্রেমে নাহি মিলে
এ নন্দনালা[৪] ॥
মুকচাটু ॥ তুই তো মাই মালতীশোরী
অনেক কাথায় কোলো ।
বৈষ্ণব-তত্ত্বটা তুই বিচারিবা' ধোলো ॥

১ বহিয়া ২ দিতেছিস ৩ কু-তর্ক, বাজেকথা ৪ নন্দনালয় ।

শাস্ত্রে বলে মাইয়া নোকটা
নরকের দ্বার ;
মাইয়া নোকটা খোবে বাতুল[১]
হরি সাধনার ।
হরিকে লাভ করিবা'
একায় সাধন কর ;
শাশানে-মাশানে[২] বসি'
হরি সাধন বলো ।
নারীকে সঙ্গে রাখিয়া
সাধন হোবে নাই ;
নারীতে মজিয়া যায় বার-যাই[৩] ॥
—একটা মোর কাথা শুন্ ।

॥ গান ॥

ময়হা জ্বালা[৪] বড় জ্বালা,
ময়হাতে হয় পাপ ।
ময়হাতে মজিলে হরি
হোবা' না হায় লাভ ॥
যদি সাধু হোবো ভাল্—
কাটিতে হয় ময়হা জাল ।
ময়হাতে মজিলে হরির
না হয় গে নাগাল ॥
না কাটিলে ময়হা-ডোর
সাধনা না হোবে তোর ;
ময়হা-জালটা বড়য় হারামখোর ।
ঠেঙত্ জল ঢালিয়া দিয়া
জাতি মালো[৫] মোর ॥

১ খুবই অপ্রয়োজনীয় ২ শ্মশানে ৩ নারীকে সঙ্গে রাখিলে জপ-তপের সকল ফল বাহির হইয়া যায়, অর্থাৎ বিফল হইয়া যায় ৪ মায়া-জ্বালা ৫ মাঝিরি ।

CENTRAL LIBRARY

মুকচাটু ॥ না আনিলে ব্রজের ভাব
বৈষ্টম হওয়া নাই লাভ।
মাইয়া-ছোয়া করাটা হামার
এইটায় মহাপাপ ॥

মালতী ॥ মাইয়া-মাইয়া কোলে যায় বহায়
হিটা কাথা[১] তোর না হায়, না হায়।
তুই বুঝিবা' পারিস নাই,—
স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে সমান হওয়া চাই।
যেনং[২] ছিল রাধা—
দনো ঝনে হিষ্ট-পিষ্ট[৩]
কাম-বাসনা নাই।
রাধা-কিষ্টের নাম নিলে
ভোবো-পারে যাই ॥
রসময় রসনা হরি
মাইয়া নোকটা ভোবতরী।
সাধু-শাস্ত্রে কয় ঃ
মাইয়ার কাছে বস্তু আছে—
সাধন-ভজন হয়।
আসা-যাওয়া সেই পথ
তাতে হও অনুগত ;
ওইঠে সাধন কর ॥
মাইয়া হাতে[৪] সৃষ্টি হইচে
মাইয়া নোকটায় বড়।

১ এই কথাটি ২ যেই রকম ৩ হৃষ্ট-পুষ্ট। অর্থাৎ দুই জনের মধ্যে কামহীন অপার প্রেম ৪ স্ত্রীলোক হইতে।

CENTRAL LIBRARY

মাইয়া হইল্ প্রেমের গুরু
অয়হে[১] বাঞ্ছা কল্পতরু,
ভাবুয়া তুই রহ।
সাধু-শাস্ত্র পড়িয়া গঁসাই
জপ করিছো মহ।
নারীকে কর বশ,
সাধন কর পঞ্চরস।
না করিয়ো কাম—
তবে সে যাইতে পার মহা নিত্যধাম॥
—হে মোর একটা কাথা শুন্।

॥ গান ॥

ও মোর গঁসাই রে,
একটা কাথা শুনেক মোর।
মাইয়া বিনা নিদান কালে[২]
কাঁয় দিবে তোর পোড়[৩]॥
সাধন কর্, আর ভজন কর্,
নরদেহা কি হয় পাথর[৪] ?
অবশে[৫] একদিনা হোবে জর
ওইদিনা কাঁয় চিপিবে[৬] তোর
মাথা আর গতর॥
মনের সঙ্গে বিচার কর্,
মান্ষি কি হয় অমর ?
সকলে যাবে যম-ঘর।
কিতায় তুই করেছিত্, গঁসাই
টপর্-টপর্[৭] ?

১ ওই-ই ২ অন্তিমকালে ৩ কে পোড়াইবে। অর্থাৎ নারী না থাকিলে সন্তান হইবে না, সুতরাং মুখে আগুন দিবে কে ৪ নরদেহ পাথর নয়, অসুখ-বিসুখ হইবেই ৫ অবশ্যই ৬ টিপিয়া দিবে ৭ বকর-বকর, বাজে কথা বলা।

মালতী ॥ সাধু হও, সন্ন্যাসী হও,
মরিতে একদিনা হোবে ;
সাধু হোলে কি তুই
বাঁচিয়া রোভো ভোবে[১] ?

মুকচাটু'॥ জন্মিলে মরিতে হোবে—
জানে না আর কাঁয় ?
সাধু হোলে পরকালে—
হরি-পদ পায় ।

এই বলিয়া সাধু হওয়া
অত আর তোক না যায় কওহা,
কাথায় কাথায় মাইর ;
কাজে-কাজে তোর কাছে মুই
হয়া গেনু হাইর[২] ।

মাইয়ার সঙ্গে কি যায় পারা,
পারিনু মুই নাই ।
বৈষ্টম তত্ত্বের মতে মোক
করিবা' নাগিল্ সাঁই ।

বৈষ্টম তত্ত্বের কাথা
তুই মোক অনেক কোলো মাই ;
মাইয়া ছেড়িয়া[৩] সন্ন্যাস কিতায়
হইল্ নিমাই ?

সন্ন্যাস হয়াও যদি মাইয়া করা যায়,
বিষ্টবিয়াগ[৪] নিমাইটা ছাড়িল্ কিতায় ?

১ ভবে বাঁচিয়া রহিবি ২ হার মানিলাম ৩ স্ত্রী ছাড়িয়া ৪ বিষ্ণুপ্রিয়াকে ।

মালতী । কলির জীবক তরাইবার
নিমাই অবতার।
ভগবানের নীলা[1]—
রামনামে জলের উপর
ভাসেছে শিলা।
চাইর যুগে ভগবান দশ অবতার—
কলিতে গৌরাঙ্গ-নীলা দেখিতে চমৎকার।
ডোর-কপীন পরিয়া
নিমাই হইল্ সন্ন্যাস ;
সঙ্গে সঙ্গে গেল্ ব্রহ্ম হরিদাস।
হরিনাম হরিদাস দিলে ঘরে ঘর
হরিনামে ভাসেয়া দিলে[2]
নিতাই তারপর।
ভগবানের অন্তনীলা[3] বুঝা বড় ভার ;
খাড়ায় আকার, খাড়ায় নিরাকার[4]।
বিষ্টপিয়াগ ছাড়িয়া
নিমাই হইল্ সন্ন্যাস ;
এই কাথাটা তোক মুই কও ইতিহাস।
ওই কাথাটার অর্থ তুমি
বুঝিতে পার নাই ;
নিমাই মত কি তুমি হইতে পার ভাই ?
তাঁয়[5] হইল্ আদি পুরুষ, স্বয়ং ভগবান ;
শচীর গর্ভে জন্ম নিয়া
হইল্ নিমাই চান[6]।

১ লীলা ২ ভাসাইয়া দিল ৩ অনন্তলীলা ৪ ক্ষণে আকার, ক্ষণে নিরাকার ৫ সে, তিনি
৬ নিমাইচাঁদ।

CENTRAL LIBRARY

রাধা হইল্ বিষ্টপিয়া
কিষ্টো হইল্ নিমাই ;
দনো ঝনে ছাড়াছাড়ি
তিলমাত্র নাই।
তার নীলা বুঝিতে নাই পারে
ব্রহ্মা আর শিব ;
হামরা কি বুঝিবা' পারি
হয়া[১] মানষি জীব ?
সন্ন্যাসীর পরে সন্ন্যাসী
হবে একদিন ;
নারীকে ত্যাজিয়া যাইতে হবে সেই দিন॥

[মালতীশোরীর এই কথা শুনিয়া মূক-চাটু
তাহার 'ডাঙ্গুয়া' রহিল।

১ হইয়া। শ্রীপ্রভাত চন্দ্র রায় (নূতনপাড়া, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)-এর নিকট হইতে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত।

CENTRAL LIBRARY

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইতরপ্রাণী ও মানুষ

॥ ভাণ্ডী-খেলী ॥

। ৩৫৪ ।

নাচ্ ভাণ্ডী নাচ —
হাটের চুচুরা[১] মাছ, বাড়ীর বাইগন[২] —
তাক খায়া ভাণ্ডী ধইল্লে[৩] নাচন ॥
সোকোল মাছ[৪] খিলালো[৫] ভাই
না খিলালো কই।
বুকের উপর বুক দিয়া
চুইয়া ফেলালেন নই[৬] ॥

১ ছোটো ছোটো মাছ, চুনোমাছ ২ বেগুন ৩ ধরিল ৪ সকল মাছ ৫ খাওয়াইলি ৬ নাচিয়া ঘাম ঝরাইয়া ফেলিলি। 'নই' ঘাম অর্থে ব্যবহৃত। ঘামে নাহিয়া উঠিলি। রক্ত অর্থে 'লহু' হইতেও ইহা আসিতে পারে।

কথান্তর—

নাচ্ ভাণ্ডী ধায়া
চাম্ঠা ১ শিদল ২ খায়া।
হাটের চুচুরা মাছ
বাড়ীর বাইগন,—
তাক খায়া ভাণ্ডীটা বোলে
জুড়িসে ৩ নাচন ॥

১ শুকনা মাছ। মাছ শুকাইলে চামড়ার মতো শক্ত হয়। শুকনা মাছকে বলা হয় 'শুক্টা'। চর্ম হইতে 'চাম' এবং 'শুক্টা' মিলিয়া 'চাম্ঠা' হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ২ শুকনা মাছ ঢেঁকিতে কুটিয়া তাহাতে কচু ও বিবিধ মশলা দিয়া দলা করিয়া রাখা হয়, তাহাকেই বলে শিদল ৩ জুড়িয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে।

। ৩৫৪ ক ।

সেলায়[১] যে কহিচু[২] রে ভাণ্ডী[৩]
ও তুই সেই না জোঙ্গল ছাড়িস :—
সেই না জোঙ্গলের চক্রু পাখে[৪]
ঘিরিবে শিকারী ॥

। ২৫৪ খ ।

আলিরে[৫] গোড়ে-গোড়ে[৬]
নাগাইসে[৭] কুহা[৮] ।
ভাণ্ডা-ভাণ্ডীগিলা[৯]
নাগাইসে তার মাইর[১০] ॥
হলুম-ঝুলুম ভাণ্ডী রে[১১]
যাইস কতো দূর ।
মোর বাড়ী যাবো তে[১২]
চল্ ভজনপুর[১৩] ॥

। ৩২৪ গ ।

এণ্ডাবাড়ী ভেণ্ডাবাড়ী[১৪]
কুহা নাগাইসে ।
ভাড়া-ভাড়ীগিলা[১৫]
মরাই নাগাইসে ॥

[ভল্লুকের প্রবেশ । তাহার জ্বর হইয়াছে ;
সে শুইয়া পড়িল ।

১ তখনই ২ কহিয়াছি ৩ ভল্লুক ৪ চারিদিকে ৫ আলির ৬ গোড়ায়, নিকটে ৭ লাগিয়াছে ৮ কুয়াসা ৯ ভল্লুক ও ভল্লুকনীগুলি ১০ যুদ্ধ, সঙ্গম ১১ রঙ-করা পাট, তৃণ ইত্যাদি দ্বারা মানুষকে ভল্লুক সাজানো হয় । পাট, তৃণ ইত্যাদি দ্বারা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত ভল্লুককে 'হলুম-ঝুলুম' বলা হইতেছে ১২ যাবি তো, যাবি যদি ১৩ স্থানের নাম বিশেষ ১৪ এরণ্ড ও ভেরেণ্ডা ক্ষেতে ১৫ ভল্লুক ও ভল্লুকনীগুলি ।

CENTRAL LIBRARY

॥ মন্ত্র ॥

উত্তরে দখিণে গে গাহিন চালুঁ[১] ফুঁ ;
পাটি-পুটি শিমিলা কটি।
কটি দিয়া বাহির হইল্ আঠামাঠি।
ফুঁ ঝাড়িহু ফুঁকিহু পালাইল্ বিষ—
এক কাঠা মোক কালাই খাবা' দিস[২] ॥

[ভল্লুকের জ্বর এই মন্ত্রে সারিয়া গেল। সে তখন নাচিতে প্রস্তুত হইল। তাহার মনিব তাহাকে নাচাইতে থাকে—

॥ গান ॥

চল্, চল্, বুড়া ভাওী
হাট বেসেবা' যাই[৩]।
তাম্‌শা খেলেয়া
নামিজা[৪] করিমো বোঝাই ॥
ওরে চেঙ্গেড়া-চেঙ্গেড়ী হাট যাবে
ভাওী খেলেয়া পাইসা দিবে—
আর তো দুঃখ নাই।
তাম্‌শা খেলেয়া
নামিজা করিমো বোঝাই ॥

১ লাঠি চালি ২ সমগ্রভাবে মন্ত্রটির কোনই অর্থ নাই। ইহা নিছক বলার জন্যই বলা হইয়া থাকে ৩ হাটে বেসাতি করিতে যাই ৪ থলিয়া।

CENTRAL LIBRARY

॥ বাঘ-নাচানী ॥

। ৩৫৫ ।

হেসেক-পেসেক না হয়[১]
মোর বাঘের খেল্ ;
বল-শক্তি কমেয়া গেইল্[২] ।
হায় রে পর্‌মেশর[৩],
সগায় কহছে[৪] চাড়ি কর্[৫] ॥

১ আজে বাজে নয় ২ কমিয়া গেল ৩ পরমেশ্বর ৪ সকলেই কহিতেছে ৫ এখানে ওখানে ঘুরিয়া খেলা দেখানোকে 'চাড়ি করা' বলা হয়। খুব সম্ভব হিন্দী 'ঢুঁড' হইতে ইহা আসিয়াছে। গানটি বাঘ নাচাইবার সময় গীত হইলেও আসলে ইহা বাঘের কথা নয়,—যে বাঘ নাচায় তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী।

CENTRAL LIBRARY

॥ ফান্দাইত্ ॥

। ৩৫৬ ।

নদীর চিকন[১] বান-বরিষা রে হে
বালার চিকন বাও[২] ।
নারীর চিকন পরো-পুরুষ
ছাইলার চিকন মাও ॥

যারে, যারে, ফান্দী-বেটা রে
ও তোর মাইয়া হোবে আড়ী[৩] ।
আস্তে আস্তে খসি' পড়িবে
ও তোর দোলান কোঠার বাড়ী।

ওকি ছাড়িয়া দে মোর দারুণ ফান্দীত্ রে,
ও ভাই সাথী ছাড়িয়া দে ॥

মোকো[৪] যে মারিলো[৫] ফান্দী রে
তার নাই ওরে দোষ ।
ভাসায়[৬] আছে দুইটি ছাইলা
এই বড়ো আফসোস ॥

আজার হস্তী বন্দী হইল্
ওসার[৭] দড়ি দিয়া ।
মুই পংখী বন্দী হইনো
ফান্দীর ফান্দোত্ পড়িয়া ॥

এ্যাখে তো সুকুলা সুতা[৮] রে
হইলো নোহার গুণা[৯] ।
ফান্দোতে পড়িয়া পংখী
করে টানা-টুনা ॥

১ সৌন্দর্য, শোভা   ২ হাওয়া   ৩ তোর স্ত্রী বিধবা হইবে   ৪ আমাকে   ৫ মারিলি   ৬ বাসায়   ৭ দীর্ঘ   ৮ সরু সুতা   ৯ লোহার শিকলের মতো।

কথান্তর— ফান্দাইত্ ভাই,
তোর ধরুঁ দুইয়ো পাও ।
ছাড়িয়া দে মোক প্রাণের ফান্দাইত্ গে ॥
কান্ বোসাইসে ফান্দাইত্ ভাইয়া রে
ও মোর পুঁটি মাছো দিয়া ।
মুই তো কম্বোক্তা ১ পংখীরে
ও মুই ফান্দে দিনু ২ পাও রে ॥···

১ ফারসী 'কম্বখ্ৎ' অর্থাৎ হতভাগা   ২ দিলাম ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৫৬ ক।

হিরো-হিরো, গিরো-গিরো[১]
কিসের বাইজন বাজে[২]।
তোক ময়রা[৩] মারিবার বাদে[৪]
সাজিছে[৫] পালোয়ান রে ॥
সেলায় না কহিনু[৬] ময়রা
এহান বনো ছাড়ি[৭] ;—
পঞ্চবটীর বনত্ যায়া
সুখ্খে বাসো করি।
ময়রা কান্দে রে ॥
কার-বা খালো[৮] পাকা ধান
কার-বা করিলো[৯] হানি।
খায়া যা ময়রা জঙ্গলের ঘাসো
খা দরিয়ার পানি।
ময়রা কান্দে রে ॥

। ৩৫৬ খ।

আরে ও কান্দে হরনাথ আকুল পরাণে।
তখনে না[১০] কনু[১১] হরনাথ
এই জোঙ্গল ছাড়ি—
আর জোঙ্গলের গোড়ে গোড়ে[১২]
আইচ্চে[১৩] ছয় ঝন ফান্দী[১৪]।
রে হরনাথ কান্দে রে ॥

১ হির্ হির্ গির্ গির্ শব্দে ২ কিসের বাজনা বাজিতেছে ৩ ময়ুর ৪ জন্যে ৫ সাজিতেছে ৬ তখনই না কহিয়াছি ৭ এই বন ছাড়ি ৮ খাইলি ৯ করিলি ১০ তখনই না ১১ কহিলাম, কহিয়াছিলাম ১২ নিকটে, গোড়ায় ১৩ আসিয়াছে ১৪ ছয় জন। যে ফাঁদ পাতে তাহাকে 'ফান্দী' বলে। ষড়রিপু। দেহতত্ত্বের উল্লেখ।

CENTRAL LIBRARY

আজি ফান্[1] বোসাইসে[2]
ফান্দী ভাইয়া মোর
ফানের গান ছান্দি'[3]।
আর এমন ছান্দে বোসাইসে ফান
চিনিতে না পারি।
রে হরনাথ কান্দে রে॥
ফান্ বোসাইসে ফান্দী ভাইয়া
কানের নাই রে ওর[4]॥
কেমনে করিম আহার
গেলে দিন রে মোর।
রে হরনাথ কান্দে রে॥

। ৩৫৬ গ।

ও কুড়ুলা[5] হায় হায়,
ছাড়ো কুড়ুলা বন্ধুর দেশের মায়া[6] রে॥
সনার নাঙ্গল উপার ফাল—
দুই কুড়ুলা জুড়িসে[7] মৈষের হালো রে।
পুবিয়া-পছিয়ার বাও
দুই কুড়ুলা ধুলায় অন্ধিহারা[8] রে॥
পরনেরো আঞ্চল[9] দিয়া
মুছাও কুড়ুলার ওই না গায়ের ধুলা রে।
কও কুড়ুলা,
বন্ধুয়া কেমন আছে রে॥
"আছে বন্ধু ভালে ভালে
দিনা চারি বন্ধুর জরো গেইসে রে[10]॥"

১ ফান্দ, ফাঁদ ২ বসাইয়াছে ৩ ফাঁদের গান ছন্দে রচনা করিয়া, গাহিয়া ৪ শেষ ৫ কুড়া পাখী ৬ মায়া ৭ জুড়িয়াছে ৮ অন্ধের মতো অন্ধকারে হারাইয়া যাওয়া ৯ পরনের কাপড়ের আঁচল ১০ জ্বর গিয়াছে, জ্বর হইয়াছিল। এই অংশ কুড়ুলার জবাব।

। ২৫৬ ঘ ।

ফান্দে পড়িয়া বগা[১] কান্দে রে ॥
ওরে, ফান্দ বোসাইসে[২] ফান্দীর ঘর
পুঁঠি মাছোক দিয়া ;
ওরে, মাছের লোভে বোকা বগা
পড়ে উড়াল দিয়া ॥
ফান্দে পড়িয়া বগা
করে টানাটুনা ;
আহা রে কুকুরার[৩] সুতা
হইল্ নোহার গুণা ॥
ফান্দে পড়িয়া বগা
করে হায় রে হায় ;
আহা রে দারুণ বিধি,
সাথী ছাড়িয়া যায় ॥
উড়িয়া যায় রে চখোয়ার পঙ্খী[৪]
বগীক্ বলে ঠারে ;
ওরে তোমার বগা বন্দী হইসে
ধলা নদীর[৫] চরে ॥
এই না কাথা শুনিয়া বোগী
দুই পাংখা মেলিল ;
ওরে ধলা নদীর পাড়ে যায়য়া
দরশন দিল ॥
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দে রে
বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দে রে ॥[৬]

১ বক ২ ফাঁদ পাতিয়াছে ৩ বিশেষ এক ধরণের পাট। ইহার দ্বারা ফাঁদ, জাল ইত্যাদির সুতা প্রস্তুত হয় ৪ চক্রবাক পাখি ৫ 'ধরলা' নামীয় জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের নদী। বহু সঙ্গীতে এই নদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে ৬ গানটি উত্তরবঙ্গের এক বহুশ্রুত গান। একদা এটি রেকর্ড-গীতি রূপেও বিশেষ খ্যাত হইয়াছিল। গানটির একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অর্থও আছে : দেহ সংসার-জালে আবদ্ধ হইলে আত্মা যে দুঃখ পাইয়া থাকে, ফাঁদে বন্দী বক-বকনীর দুঃখের মধ্যে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। তবে সাধারণ 'কান্দাইতে'র গান হিসাবেও এটি গাহিতে খুবই শোনা যায়। কোচবিহার জেলাতেই গানটির প্রচলন বেশি, ভাষাতেও তাহার প্রভাব আছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ তেলেঙ্গার গান ॥

॥ মৎস্য বিষয়ক ॥

। ৩৫৭ ।

কে কই না মোর কে।
কালি হোবে বালিয়ার বিয়াও—
আজিও চান্দা না আইলো রে ॥
ছোটো পুঁঠি উঠিয়া কয়:
বড়ো পুঁঠি দিদি—
বালিয়া রাজার বিয়াও হোবে
মুই যাইম বৈরাতী[১] ॥
শামুক হইল্ খটুয়া ভাই রে
চান্দা চাইলন বাতি[২]।
পয়া মাছের সইন্তা[৩] দিয়া
জালায় চোপরাতি ॥
কে কই না মোর কে…
পুঁঠি মাছ বৈরাতী হয়া
সাজায় চায়ি-কুলা[৪]।
বোয়ালি মাছ বামন[৫] হইল্…[৬]
কে কই না মোর কে…
মাগুর মাছ মাইলানী[৭] হয়া
জোগায় ফুলের সাজি…[৬]
চিলি মাছে কইন্যা সাজে
বালেয়া মাছে বর।
নল-বাড়ীয়া শাটি মাছে
ধরেছে মিন্তর[৮] ॥

১ এয়ো ২ চান্দন বাতি, বরণ ডালা ৩ সলিতা ৪ চান্দন-কুলা ৫ পুরোহিত ৬ পঙ্ক্তি পাওয়া যায় নাই ৭ মালিনী ৮ মিতবর।

CENTRAL LIBRARY

কে কই না মোর কে…
পানি মাছের[১] পিঠি পালকি
ঠ্যাং চাইরখান খুড়া।
কুঁচিয়া হইল্ পালকির ডাঁড়ি[২]
কাঁকেড়া ব্যাহেরা[৩]॥
কে কই না মোর কে…
চ্যাং মাছ নটুয়া ভাই রে
ভালো নাচন জানে।
সব মাছে যুক্তি করি'
চ্যাংয়ের নাচন ছাখে।
কে কই না মোর কে…
সকল মাছে গুয়ায় পায়
ট্যাপায় না পায়।
ট্যাপা প্যাট ফুলিয়া অয়।
বামী মাছক ডাকিয়া আনি'
ট্যাপার প্যাট্ ফাড়িয়া দেয়।
কে কই না মোর কে…।

১ কচ্ছপের ২ পালকির দাঁড় ৩ বেহারা।

কথান্তর—ছোটো পুঁঠি, বড়ো পুঁঠি
পুঁঠি নানান জাতি।
আহেলা মাছের বিয়াও হচ্ছে
শনিবারের খাতি।
চ্যাং বড়ো নটুয়া ভাই রে
নটু করিবা' জানে।
চ্যাঙের নাচন দেখিয়া চেকা
মুখ মোলিয়া[১] হাসে।
ভোদড়গালি[২] খায় গুয়া
টেপায় না পায়।
কেট্ কেটাইতে কেট্ কেটাইতে
প্যাট ফুলিয়া অয়।

১ মেলিয়া ২ ভোদর বা ভোঁদা মাছ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৫৮ ।

যতো মাছ খালে-বিলে
মিলিয়া করে খেলা ।
বাবু শীতল জলে
চিতোল-কাতেলা ॥
জলে টুক্‌কুনি-খলিসা-খোক্‌সা
চান্দা-চেলী-খট্টি-কুস্‌সা—
ডিমা পাড়ে সব হইলে বষ্‌বা[১]
ইঠা আর ইলিশা ॥
কই-মাগুর আর শিঙ্গি-শাটি
যতো শাল-শোল আর পাপ্তা-পুঁটি
মনের সুখে ছুটা-ছুটি,—
উজান আর ভাটি ॥

সামান্‌জের ১ বাহিরে টেপা
প্যাট ফুলিয়া অয় ।
টুড়ি উঠিয়া বলে :
গোছি ২ মহাশয়,
সাজাও তোমার ভার-ভরোটি ৩
টেপার প্যাট চিরিবা' যাই ॥
এই কথা শুনিয়া টেপা
আনন্দিত-মন ৪ ।
কেট্‌কেটাইতে কেট্‌কেটাইতে
প্যাট্‌ গেইল্‌ সাম ৫ ॥
টেংনা বাজায় ঢোল রে ভাই
টেংনা বাজায় ঢোল ।
শাল মাছ উঠিয়া ক'ছে ৬
কিসের গণ্ডগোল ॥

১ বর্ষাকালে ডিম পাড়ে ।

১ সমাজের ২ মাছ বিশেষ ৩ বোঁচ্‌কা-বুঁচকি ৪ আনন্দিত মন ৫ পেট সমান হইয়া গেল ৬ কহিতেছে ।

CENTRAL LIBRARY

এ সব মাছে করে নদীর জল ঘোলা :
যতো মাছ খালে বিলে
মিলিয়া করে খেলা ॥
বাউস-বোয়ালি-বামুস-ঠোনা
উই-আইচাং-গোছী-গুণা
ফুলবাচ্চা-ফোলি-ভাঙ্গ্না
টেপা আর টেংনা—
এ সব মাছে করে নদীর জল ঘোলা :
যতো মাছ খালেবিলে…
উড়ুয়া যায় জলে ভাসি'
গুণা-গুষ্টি আরো টেংসি।
চুরা-শক্ক, ভাই ভাই অক্ক
না ধরে বোশ্‌শি[১] ॥

। ৩৫৭ ।

॥ খলিসা ॥

হায় রে ইল্‌শা মাছ, তোর ছিল্-ছিল্ কাঁটা[২]।
শহরে-বন্দরে মাছ তোর তিল-তিল বাঁটা[৩] ॥

॥ ইলিশ ॥

ইল্‌শা মাছ উঠিয়া বলে, খইল্‌সা মোরে ভাই।
তুই থাকিস ডাঙ্গায়-দোলায়, মুই গহীন যাই[৪] ॥

॥ খলিসা ॥

খইল্‌সা মাছ উঠিয়া বলে, মোর সে মাথাত্ ফুল।
গলাম চাঁড়ালের বেটা মারলে জাতি কুল ॥

....

ভাটি দেশের ইল্‌শা রে মোর, উজান দেশের বঁটি[৫]।
সেই ইল্‌শা বেচিতে নাগে ভাল্ মান্‌ষির বেটী[৬] ॥

১ শেষাংশ পাওয়া যায় নাই ২ ঘন-ঘন কাঁটা ৩ শহরের লোকেরা তোমাকে ছোটো-ছোটো করিয়া (তিল তিল করিয়া) কাটিয়া খায় ৪ তুমি সাধারণ জলা-ডাঙ্গায় থাক, আমি গভীর জলে থাকি ৫ মাছ কাটিবার বঁটি ৬ গানটি ইলিশ ও খলিসা মাছের কোন্দল।

॥ মৈষালি ॥

। ৩৬০ ।

বিধি রে, এই কি ছিলো মোর কোপালে।
আর কতর দিন[১] থাকিমো
ভইষ নিয়া জোঙ্গলে।
কুন্ বা দিন[২] জোঙ্গলের বাঘ
মোক ধরিয়া খাবে॥
ওরে, মাইয়া-ছোওয়া[৩] টাকা-কড়ি
মোর বুঝি যাবে বিফলে।
বিধি রে, এই কি ছিলো মোর কোপালে॥

। ৩৬১ ।

আরে ও মোর ভইষের পালের বহেলা[৪],
আখিছিস[৫] মোরো[৬] জীবন
তোরো হিয়াত্[৭] ভরিয়া॥
তোর বহেলার এতোর দোয়য়া[৮]
দিনে-আতি দেখিয়া—
ওহোরে বহেলা,
ও মোর নাগে রে দোয়য়া॥
তোর পিঠির উপর চড়িয়া,
নাকর দড়ি ধরিয়া—
মারিতে মারিতে নিগাছো[৯] মুই
জোঙ্গল-বাড়ী দিয়া[১০]।
তোক দেখিয়া মোর নাগে রে দোয়য়া॥

১ কতদিন ২ কোনদিন বা ৩ বউ-ছেলে ৪ বন্যা মহিষ ৫ রাখিয়াছিস ৬ আমারও, আমার ৭ হিয়াতে ৮ তুই মহিষের এতোই দয়া (অর্থাৎ কষ্ট) ৯ লইয়া যাইতেছি ১০ জঙ্গলের মধ্য দিয়া।

। ৩৬২ ।

নবীন ব'সের মৈষাল রে,
ও তুই মোর হিয়াত্ নাগালো ময়হা।
ক্যানং করিয়া[১] করিম দেখা রে মৈষাল,
আছে বাপো-খুড়া ॥
যদি যায়য়া করোঁ রে দেখা—
দেখিয়া ফেলাবে বাপো-খুড়া।
জীবন না বাঁচিবে রে মৈষাল,
ও তোক ফেলাবে মারিয়া ॥
ওকি ও মৈষাল রে,
মুই নারীটা ওভাগোনী—
মোক ধরিয়া না করিস আর পিরিতি।
পিরিতির আছে রে ফাঁসি ॥

। ৩৬৩ ।

সেলায় না কহিনু[২] রে দাদা
মৈষালক্ না দিস্ জা'গা[৩]
স্থাশের মৈষাল স্থাশে রে যাবে
ও মোর মনটায় অবে বান্ধা[৪] ॥
আঁঠিয়া কেলাক কেলায় না কঁও[৫]
বিচি ঘস্-ঘস্ করে।
পর-পুরুষক পুরুষে[৬] না কঁও
হিয়া জর-জর করে ॥
দুয়ারের আগত্[৭] ভইষের রে বাথান
ও মুই গেনু ঘোবি রে কুড়িবা'[৮]।
কুন বা স্থাশের হাউড়িয়া[৯] রে মৈষাল
ও মোর গালের থালে চুমা ॥

১ কেমন করিয়া ২ তখনই না বলিয়াছিলাম ৩ জায়গা ৪ মনটাই বাঁধা রহিবে
৫ বিচিওয়ালা কলাকে কলা-ই বলি না ৬ পুরুষই ৭ সম্মুখে ৮ আমি গেলাম ঘুঁটে কুড়াইতে
৯ গালি বিশেষ।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৬৪ ।

আরে ও মৈষাল ভাই,
বুকো বয়া[১] পড়ে চউখের জল ॥
যদি পিরিত মৈষাল করিতে চাও
ঘরের পাছত্ মৈষাল বাতান দেও[২] ।
তবে পিরিত মৈষাল অবে চিরৎকাল[৩] রে ॥
যদি পিরিত মৈষাল করিতে চাও
মোর সঙ্গে মৈষাল সইত্য কর রে ।
তবে পিরিত মৈষাল অবে চিরৎকাল রে

। ৩৬৫ ।

হি দিয়া[৪] না যান মৈষাল রে
হু দিয়া[৫] না যান মৈষাল রে,
মোর নারীর দুয়ার দিয়া যান ।
হু পারে[৬] সিনান করে গোয়ালেরো নারী রে—
এ পারের মইধ্যম আছো চায়হা[৭] ॥
হু দিয়া না যান মৈষাল রে
এওয়ালি[৮] কাটিবে গাও ।
মোর নারীর দুয়ার দিয়া যাও ॥
চালুয়া থঁপাত্[৯] করি'
তোক মুই করিম পার,—
পার হলে দিমো জাতিকুল ॥

১ বুক বহিয়া ২ বাথান তৈরি কর ৩ চিরকাল রহিবে ৪ এই পাশ দিয়া বা দিক দিয়া ৫ ওই পাশ দিয়া বা দিক দিয়া ৬ ওপারে ৭ এ পারের মাধ্যমে অর্থাৎ এপার হইতে চাহিয়া আছি ৮ এক ধরণের কাঁটাওয়ালা লম্বা জলো ঘাস। গায়ে লাগিলে গা কাটিয়া যায়। ধানের আলির উপর এই ঘাস হয় ৯ বিরাট, চালাও থোঁপায় করিয়া।

ও মোর প্রাণো মৈষাল রে,
না জান্থ[১] মুই সাঁতার,
না জান্থ মুই পহরিবার[২]—
না জান্থ হে ভুরা[৩] বহিবার।
ঢালুয়া থঁপাত্ করি'…।

। ৩৬৬ ।

তিস্তা নদীর পারে পারে
ও মোর বাই গে,—
না জানি মৈষাল বন্ধু মোর
ভইষ চরেবার আসে।
আজি খড়ি কাটিয়া দে রে মৈষাল,
বোঝা বান্ধিয়া দে[৪]।
হাত ধরুঁ[৫], মিনতি করুঁ রে মৈষাল,
মাথাত্ তুলিয়া দে।
হাত ধরুঁ, মিনতি করুঁ রে মৈষাল,
আজি আগ-বাড়েয়া[৬] দে।
আগ-বাড়েয়া দে রে মৈষাল,
বাড়ীত্ পঁছছেয়া দে।

১ জানি ২ সাঁতার দিতে ৩ কলার ভেলা ৪ মেয়েরাই জঙ্গলে বা মাঠে কাঠ কাটিতে বা কাঠ কুড়াইতে যায়। এখানে সেই কাঠ কাটিয়া, বোঝা বাঁধিয়া মাথায় তুলিয়া দিতে মৈষালকে অনুরোধ করা হইয়াছে ৫ হাত ধরি ৬ আগাইয়া।

। ৩৬৭ ।

আজি প্রাণো কান্দে মোর
মৈষাল বন্ধু রে ।
তোর মৈষালোর দুঃখ দেখিয়া
বাড়েয়া দিনু ছাতি[১] ।
আশ-পড়োশীর নোকে[২] বলে
মৈষাল-ভাতারী[৩] ॥
ভার বান্ধো, ভারাটি[৪] বান্ধো
তুলিয়া বান্ধো কিল্লা[৫] ।
মনত্ কয় যে উড়িয়া যাওঁ
ওই মৈষালের ধুরা[৬] ॥
মইষ ছ্যাকেন মোর মৈষাল বন্ধু
গামছা মাথাত্ দিয়া ।
মনত্ কয় যে বগলত বসি'[৭]
পড়ুক[৮] খেদাও যায়য়া ॥

। ৩৬৮ ।

ও মোর মৈষাল বন্ধু রে,
না বাজান তমার খুটারে[৯] দতরা ।
নারীর মন মোর
করিল্ রে ঘর-ছাড়া ॥
ওরে এ্যাখে তে[১০] সুতারো[১১] বাইজন রে
কি না সুরে বাজে[১২] ।
তোর দতরার বাইজন শুনি'
মন না রয়[১৩] মোর ঘরে ॥

১ বুক বাড়াইয়া দিলাম ২ আশে-পাশের পড়শীরা ৩ যাহার স্বামী মৈষাল ৪ বোঁচ্কা-পুঁটুলি ৫ মহিষকে যে বাঁশের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখা হয় ৬ মৈষাল যেখানে আসিয়া বাস করিতেছে, মৈষালের আস্তানা ৭ পার্শ্বে বসিয়া ৮ মহিষের বাচ্চাকে ৯ কাঠের ১০ একে তো ১১ সুতার ১২ কেমন সুরে ১৩ রহে ।

। ৩৬৯ ।

ও মোক ব্যাচেয়া না খাইস রে[১] দাদা—
হালুয়ার[২] ঘরে।
হাল বহয়া[৩] আসিবে,
হালের পেন্টি[৪] দেখাবে—
তাতে মন মোর উড়িয়া যাবে ॥
ও মোক ব্যাচেয়া না খাইস রে দাদা—
তেলিয়ার ঘরে।
ত্যাল ব্যাচেয়া আসিবে,
ত্যালের হাতে ধরিবে—
তাতে মন মোর উড়িয়া যাবে ॥
ও মোক ব্যাচেয়া না খাইস রে দাদা—
পাইকারের ঘরে।
পাইকারি করি' আসিবে,
বাঙ্কুয়াখান[৫] দেখাবে—
তাতে মন মোর উড়িয়া যাবে ॥
ও মোক ব্যাচেয়া খাইস রে দাদা—
মৈষালের ঘরে।
ভইষ চরেয়া আসিবে,
দতরাখান বাজাবে—
তাতে দিন মোর ভালে রে যাবে ॥

১ কন্যার পিতাই বিবাহে কন্যাপণ পাইয়া থাকে। এইজন্যে সেই টাকা নেওয়াকে 'কন্যা বেচিয়া খাওয়া' বলে ২ যে হাল চাষ করে ৩ বহিয়া ৪ গোরু খেদাইবার লাঠি। সেই লাঠি দ্বারা প্রহারের ভয় দেখাইবে ৫ বাঁক। দ্রব্যাদি বহিবার জন্য বাঁশের শক্ত লাঠি।

। ৩৭০ ।

ও মৈষাল রে মৈষাল,
হাতোত্ দেখোঁ রে মৈষাল
নালো রে নাটি[১] ;
কান্ধে[২] দেখোঁ রে মৈষাল
অঙ্গিয়া[৩] ছাতি।
মাথাত্ দেখোঁ রে মৈষাল
মণিরাজ পাগুড়ি ॥
"কইন্যা হে কইন্যা,
তোর কইন্যার পিরিতির আশে[৪]
বাপো-ভাই ছাড়িলাম আশে।
তোর মায়া[৫] মুই কেমনে পাসরিম ॥"
ওকি মৈষাল রে মৈষাল,
এথে মৈষাল তোর পরম রে দুখ
এলুয়া কাশিয়া[৬] কাটিবে রে বুক,
না করিস তুই বাঙ্গর[৭] ভইষের চাখিরি রে ॥

। ৩৭১ ।

তমরা যাবেন[৮] দূরো আশে রে মৈষাল,
হামাক[৯] নাগে রে ধান্দা[১০] ।
পিরিতি করিয়া যাছিত্[১১] রে মৈষাল,
তোর নাইরো[১২] দোয়া ॥

১ হাতে লাল লাঠি দেখিতেছি ২ কাঁধে ৩ রঙীন ৪ আশায় ৫ মায়া ৬ আলির উপর এক ধরণের ধারালো কাশ-খড় হয়, তাহাতে গা কাটিয়া যায় ৭ খাটো, ছোটো ৮ তুমি যাইবে। সম্মানার্থে ৯ আমার ১০ ধাঁধা ১১ যাইতেছিস ১২ নাই। 'রো' ছন্দসঙ্গতিতে।

ধিকো, ধিকো, ধিকো মৈষাল রে,
মৈষাল, ধিকো গাবুর ময়হা।
কেইনং করি'[১] ছাড়িয়া যাছিত্‌ রে মৈষাল
তোর নাইরো দোয়য়া॥
সেলায় না কইসু[২] রে মৈষাল,
না যাইস গোয়ালপাড়া।
কাড়িয়া নিবে হাতর বাঁশী
ছিঁড়িবে গালার মালা॥[৩]

। ৩৭২ ।

চরণ ধরু[৪] রে মৈষাল তমারে[৫]—
ওভাগোনীটাক[৬] ছাড়িয়া না যান বৈদাশে॥
ওকি ও মৈষাল রে,
ফুলো ফুটিস্‌ মানববৃক্ষে,—
ভমর বিনা ফুলের মধু রে মৈষাল,
ফুলতে শুকাবে॥
ওরে মানব-ফুলের ভমর তুই—
ভমর বিনা ফুলের মধু রে মৈষাল,
কাঁয় বসি' খাবে[৭]॥

১ কেমন করিয়া ২ তখনই না কহিয়াছি ৩ স্তবকটি অন্য কোনো গান হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করি ৪ ধরি ৫ তোমার ৬ অভাগিনীটাকে ৭ গানটিতে আধুনিকতা লক্ষ করিবার মতো।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৭৩ ।

চুঁড়া কুটেঁা[১] ঠাকাস-ঠিকিস[২]
নেনিয়া ধানের চুঁড়া।
দূরের মৈষাল দূরে যাবে
দিয়া দারুণ খোঁটা[৩]॥
আলিত্ ফুটে আল-কাশুয়া[৪]
পোখোরিত্[৫] ফুটে হালা[৬]।
ম্যাশের মৈষাল ম্যাশোত্ যাবে
মনটা অবে বান্ধা॥
সেলায় যে কহিনুঁ বাই গে
মৈষালোক না দিস বেটী॥
পব্বতেরো কোলে বাই গে,
জড়া ঘুন্টি বাজে।
ওই না ঘুন্টির বাইজন শুনি'
গোয়ালের বেটা চলে॥

। ৩৭৪ ।

ও মোর মৈষাল বন্ধু রে,
যেইঠে যাবো[৭] রে বন্ধু,
মোকো নিগা[৮]।
আজি যেইঠে দিবেন বন্ধু
ভইষের রে ধুরা[৯]—
মহ ওইঠে বেচাম বন্ধু
পানো-গুয়া॥

১ চিঁড়া কুটি ২ উদূখলে দুইজনে মিলিয়া চিঁড়া কুটিবার-শব্দ ৩ বাধা ৪ আলির উপর হয় যে কাশ ৫ পুকুরে ৬ শালুক-শাপলা জাতীয় ফুল ৭ যেই স্থানে যাইবি ৮ আমাকেও লইয়া যা ৯ আস্তানা।

। ৩৭৫ ।

মৈষাল বন্ধুয়ার সনে
ডেকাইতে[১] আও না কাড়ে[২]
মনের গৈরবে রে[৩]।
কি মোর জঞ্জাল হইলো রে।
পিরতি করিবার কালে
কতো কাথা কহিছেন মোকে।
এলা[৪] স্তাদাও[৫] পিরতির মাথা—
ছাড়োং-ছাড়োং করে রে[৬]।
পিরতি করিয়া ছাড়িয়া গেলু
গুভাগোনীর মন না বুঝিলু।
হায় না বুঝিহু পিরতির কাথা,
তোকে-মোকে বিধি নাই নেখে জড়া রে।[৭]

১ ডাকিলে ২ কথা বলে না ৩ মনের অহঙ্কারে ৪ এখন ৫ পিরিতের মাথায় লাথি মারি ৬ মনে হয় এই পিরিতি ছাড়িয়া দিই ৭ তোমার-আমার একজোট হইবার সম্ভাবনা বিধির বিধানে নাই।

CENTRAL LIBRARY

॥ বিরুয়া ॥

॥ প্রথম পর্যায় ॥

। ৩৭৬ ।

ওকি ও মোর দান্তাল হাতীর[১] মাহুত রে,
যেই দিন মাহুত শিকার যান—
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে ॥
তোমার কারণে মাহুত
সাকালে ধুইনু গাও[২] ।
খাসি মারিয়া রসাই করিনু[৩]
ভাতো খায়া যাও ॥
"না খাই তোমার ভাতো কন্যা হে,
শশুরে দিবে গালি ।"
"বাবা আসিলে বলিয়া দিবো
শিয়ালে মারিসে[৪] খাসি ॥"
ভাতো না খাইতে মাহুত রে
মুখে দিলেন পান ।
ঘরে থাকিতে নিদয়া মাহুত
আউলাইলেন পরাণ[৫] ॥
"সাকালে উঠিয়া কইন্যা
মুখ দেখিনু কার ।
হুকুম হইল যাইতে
রায়মানার শিকার[৬] ॥"
"কি কাথা কহিলেন মাহুত রে,
মাহুত, না কহিয়ো আর ।
তোমার বিনা এই পিলখানা
হইবে আন্ধকার ॥"

১ দাঁতাল হাতীর   ২ সকাল বেলায় গা ধুইয়াছি   ৩ ঝোল রাঁধিয়াছি   ৪ মারিয়াছে   ৫ প্রাণ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিলেন   ৬ আলিপুরদুয়ারের নিকটবর্তী রায়মানা নামক বন । সেইখানে যাইয়া হাতী ধরিবার জন্য হুকুম আসিয়াছে ।

"না যান, না যান, না যান মাহুত রে,
মাহুত, বাড়ীতে বহেন রে হাল।
ভালে না হয় হাতীর চাকিরি
সাথে সাথে কাল॥"
"বাপো-ভাইয়ে নাই শিখায় কইন্যা রে
হালো বহিবারে।
কেইনং করি' থাকিমো কইন্যা
তোমার বাসরে॥
না কান্দো, না কান্দো কইন্যা হে
ভাঙ্গিবে অসের গালা[১]।
খোদায় যদি ফিরিয়া আনে
সোনায় বান্ধিম গালা॥"
"তোরসা নদীর পারে পারে
রে মাহুত,
তোমরা চরান হাতী।
তুই মাহুতের গুণো শুনিয়া
আমরা দিলাম জাতি॥
জাতি দিনু, কুলো দিনু,
রে মাহুত, তোমার নাগিয়া।
এলায় কেনে ছাড়িয়া যাছেন
নিদয়া হইয়া॥"
"ছয়ো মাসো থাকো কইন্যা হে
বাপো-ভাইয়ের ঘরে।
ফিরিয়া আসিমো কইন্যা হে
ছয়ো মাসো পরে॥"

১ রসের গলা, সুন্দর কণ্ঠ স্বর।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৭৬ ক ।

উঠ, উঠ, ভাবের বন্ধু,
চ্যাতোন[১] কর গাও ;
—আতি পোহাইল্ রে ।
কোংকিলায় ছাড়ে আও[২]
শ্বেত-কাউয়া উঠিয়া কয় :
রজনী পোহাও ॥

রাতি না প্রভাত কালে
ও কইন্যা নিন্ পাড়িবার মোজা[৩] ।
সেই সমায় ওঠায় দিলেক[৪]
ফান্দাইস্ শালার ব্যাটা ॥

হাতী বান্দো, হাতী ছান্দো[৫]
হাতীক নাগাওঁ বেড়ি ।
তোর মাহুত যে যাবে আজি
রায়মানার শিকার-বাড়ী ॥

"যারে, যারে ফান্দাইস্[৬] ব্যাটা
ও তোর মাইয়া হোবে আড়ী ।
আস্তে আস্তে ভাঙ্গি' পড়িবেক
ও তোর দোলান-কোঠা বাড়ী[৭] ॥"

১ চেতন ২ কোকিল ডাকে ৩ মজা ৪ সেই সময় ঘুম হইতে উঠাইয়া দিল ৫ হাতীর পিঠে হাওদা ও গদী লাগানোকে 'হাতী ছান্দা' বলে ৬ ফাঁদে যে কাজ করে, যে ফাঁদ পাতে ৭ গানটির শেষাংশ পোষমানা হাতীকে লক্ষ্য করিয়া গীত হয়। গানটি নূতন হাতী ধরিবার পর হাতীকে স্নান করাইবার সময় গাওয়া হয়।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৭৭ ।

আজি,ধার করিয়া করহু বিহো[১]—
আজি মাহাজনটা পাক পাড়েছে[২]
ওহো গে নদারী[৩],
বড়য় দুখে যাছু গে চাখিরি ।
আজি রাজার জালা বিষম জালা—
রাতি পহালে নাগে টাকা গে
ওহো গে নদারী,
বড়য় দুখে যাছু গে চাখিরি ।

। ৩৭৮ ।

ওকি হাতী রে,
তোর ধরি' দুইয়ো পাও[৪] ।
না মারিস মোকে রে হাতী,
কান্দিবে বাপো মাও ॥
ওকি হাতী রে,
বড়য় দুখে ছাড়িনু বাড়ী,
ছাড়িনু ও মুই কোলার নারী ।
ওকি হাতী রে,
বিধি মিলালেক আজি তোরে চাকিরি[৫] ।
ওকি হাতী রে,
চাকিরি করিয়া টাকা ধরি[৬]
দ্যাশতে মুই যাইম রে ।
নারীর কোলাত্ থাকিয়া ও মোর
আশা নাই রে পূরে ॥

১ বিবাহ করিলাম ২ ঘুরিতেছে ৩ নতুন বউ ৪ দুই পা ৫ বিধি তোর চাকুরিই অর্থাৎ মাহুতগিরি আমার কাপালে জুটাইয়া দিয়াছেন ৬ টাকা লইয়া ।

। ৩৭৮ ক ।

ওকি ওহো রে বাউদিয়া[১],
মোক ছাড়িয়া বড়য় দুঃখে
যাছিত্ রে চাখিরি[২] ॥
ওরে তুই যদি চাখিরি যাবো[৩]
মোক কেনে তুই বিয়াও করলো।
কানর সোনা বন্ধক থুইয়া
ঘুরিয়া দে তুই চাখিরির টাকা[৪] ॥
মোক ছাড়িয়া না যাইত্[৫] রে,—
চাখিরি বড়ো দুঃখের রে ॥

। ৩৭৮ খ ।

আরে ও মোর জোঙ্গলিয়া হাতী রে[৬],
মিনতি করুঁ রে তোরে।
ওভাগোনীটাক আড়ী[৭] না করিস
এ ভোব-সইংসারে ॥
হাতী রে, মোর সোয়ামীটা কাঞ্চা সোনা[৮]
তোর পিঠিত্ চড়িবা[৯] রে জানে না ॥

১ প্রেমিকের প্রতি সাধারণ সম্বোধন ২ চাকুরি করিতে যাইতেছিস ৩ যাইবি ৪ আমার টাকা লইয়া, হাতী ধরিবার জন্ত যাহাদের নিকট চাকুরি লইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিস,—আমার কানের দুল বন্ধক রাখিয়া তাহাদের সেই টাকা ফেরত দিয়া দে। অর্থাৎ হাতী-খেদায় চাকুরি লইস না ৫ যাইস ৬ জঙ্গলের হাতী রে ৭ বিধবা ৮ কাঁচা সোনার মতো আমার স্বামী ৯ চড়িতে।

হাতী রে, পায়ে ধরি' মিনতি করি'
কহেছুঁ[১] রে তোরে।
মোর সোয়ামীটাক আখিস রে হাতী
আদরে যতনে॥
হাতী রে, মস্ত বড়ো দেহাটা তোর
সহে না যে তোর মশার কামড়।
ছটফটেয়া[২] না নিগাইস[৩]
সোয়ামীটাক মোর॥

। ৩৭৮ গ।

দুয়ারের আগত্[৪] গাড়িলেন গুয়ার গাছ।
ছাড়িয়া যাবেন মাহুত রে,
কে করিবে আও[৫]॥
আম গাড়িলেন, জাম গাড়িলেন
আরো নারিকোল।
বারো মাসের ফল যেমন
ফুটিয়াছে গাছে।
তুমি ফান্দী[৬] চলি' যাবেন শিকার করিতে॥
আম মউলায়[৭], জাম মউলায়,
কাঁঠোলে ছাড়ে মুচি।
মুই নারী আছোঁ ঘরে
মনত্ নাই মোর খুশি॥

১ কহিতেছি ২ ছট্‌ফট্‌ করিয়া ৩ লইস ৪ সম্মুখে ৫ কে আর কথা বলিবে ৬ যে ফাঁদ পাতে ৭ মুকুলিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৭৮ ঘ ।

বিষুমাতে হইল্ পানি[১]
হস্তী সাজিল্ খানিখানি[২]
যাত্রা করে মাহুত সুনইক্ষণ দেখিয়া ॥
ও মোর কালা পরোদেশীয়া,—
শুনো মোর পিয়ার কাথা ঃ
"চাউলো চাহাছে হে বলদ না দিয়া
সুনো চাহাছে গ্যারে গ্যারে ॥"
ও মোর কালা পরোদেশীয়া,—
ছাই পোড়োক চাকরীর মাথে।
ঘরের যৈবন পরে[৩] ॥

১ বিষুব-সংক্রান্তির দিন বৃষ্টি হইলে তাহাকে সুলক্ষণ বলিয়া মনে করা হয় ২ সারি বাঁধিয়া ৩ ঘরের স্ত্রী অপরে ভোগ করে।

কথান্তর— বিষুমাতে হইলো পানি
কাথা পুছোঁ সারিসারি ১—
যাত্রাকালে সুনইক্ষণো দেখি'।
তোমার পিয়া আছে ভালে
পাঁঠা দেও কইঙ্গা হালে-হালে ২—
যাত্রাকালে সুনইক্ষণো দেখি' ॥…

১ একের পর এক প্রশ্ন ২ পরিমাণ ও সংখ্যা-জ্ঞাপক শব্দ।

অতিরিক্ত কথা— শুনো মাহুদ আমার কাথা
ঘুরিয়া দেও চাখিরির টাকা।
ঘুরিয়া নেও তোমার গুডন পাটের শাড়ী রে।
পত্ত কুড়াল ১ নইয়া হাতে
চড়িনু মাহুদ হস্তীর ঘাড়ে।
তুই কুড়াল মোর নগের ২ সারথি রে।
শুনিয়া মাহুতেরো কাথা
হাটো কইরে কইল্লা মাথা।
কান্দে কইল্লা আগর নয়ন ৩ রে।

১ ছোটো কুড়াল ২ সঙ্গের ৩ হাপুস নয়নে।

। ৩৭৯ ।

ছোটোতে করিছু পিরিতি হইলাম ছাড়াছাড়ি।
বাপো ছাড়িলাম, মাও ছাড়িলাম,
ছাড়িলাম ঘর-বাড়ী।
বিয়াও করিয়া ছাড়িয়া আইনু[১]
তোমার মত নারী॥
টিটির[২] কান্দে, পংখী কান্দে
বালাতে[৩] পড়িয়া।
জোলপইগুড়ির মাহুত কান্দে
ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া॥

। ৩৮০ ।

বারো মাসে বারো ফল
গেলো মাহুত হস্তী-বাড়ী[৪] রে।
ওরে কান্দে মাহুত হস্তীর পিঠিত্ চড়ি'[৫]।
চৈতো-বৈশাখের ওইদ[৬]
পিঠি ফাটি' পড়ে ঘাম—
কান্দে মাহুত হস্তীর কান্ধে[৭] চড়ি'॥
যার মাথাত্ পাগুড়ি—
সেই করুক চাকিরি।
চাকিরির নাই রে বাপো-ভাই।
কান্দে মাহুত হস্তীর কান্ধে চড়ি'॥

১ আসিলাম ২ তিত্তির পাখী ৩ বালিতে ৪ হাতী শিকার-স্থলে ৫ পিঠে চড়িয়া ৬ রোদ ৭ কাঁধে।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৮১ ।

ছয়ো মাসের কড়াল করি'
গেইল্ মাহুত মোর শিকার-বাড়ী ।
ছয়ো মাসো গেইল্ পুরি'
মোর মাহুত না আইলো ঘুরি'‥রে ।
ও মোর হস্তী রে—
যাবার বেলায় গেলো সাথে
একা কেনে হস্তী দরজাতে রে ।
কহো হস্তী, মোর মাহুতের খবর ।
যদি মাহুত মোর আইসে ভালে
পাঁঠা দিম্ মুই হালে-হালে[১] ।
আরো দিম্ মুই উড়ানি পারেয়া[২] রে ।

। ৩৮১ক ।

আমো গাছে জামো ফল
গুয়া গাছে নারিকল ।
আসাম হাতে আসিল্ ভাঁড়ী[৩]—
কাথা পুছে কইন্যা সারি-সারি[৪] :
কহ ভাঁড়ী, মোর পিয়ার[৫] খবর ।
যদি পিয়া মোর আইসে ভালে
পাঁঠা দিম্ মুই হালে-হালে[৬] ।
কহ ভাঁড়ী, মোর পিয়ার খবর ।
"তোমার পিয়া আছে ভালে ।
চাউল চাহাছে স্যারে-স্যারে[৭]—
হুন চাহাছে বলদে না দিয়া[৮] ।"

১ পরিমাণ-জ্ঞাপক শব্দ । জোড়ায়-জোড়ায় ২ দেবতার উদ্দেশে পায়রা উড়াইয়া দিব ৩ সংবাদ দাতা ৪ অনেক্ কথা জিজ্ঞাসা করিল ৫ প্রিয়তমের ৬ পরিমাপ, সংখ্যা-জ্ঞাপক শব্দ ৭ সের-সের ৮ বলদের জন্য । বলদের পিঠে বোঝাই করিয়া ।

। ৩৮১খ ।

আরে ও মোর মেদনী হাতীর[১] মাহুত রে,
বান্ধো হাতী গাছের তলে—
নোহার ছিকল দিয়া।
দনো ঝনে[২] ওরে মাহুত,
যামো চলিয়া॥
ওরে মুই নারীটা ওভাগোনী—
কোলাত্‌ মোর নাই রে সোয়ামী।
কাঁক্‌ দেখিয়া[৩] আখিম[৪] যৈবন
বুকে বান্ধিয়া॥
দনো ঝনে ওরে মাহুত… ॥

। ৩৮২ ।

আর কতয় দিন ঘুরিমো[৫] সিপাই রে!
আজি হস্তী বান্ধো, হস্তী বান্ধো রে সিপাই,
মোর কদমের তলে রে
সিপাই[৬], চাকিন্‌দারের বেটা[৭] রে॥
আজি সারির বাঁশ[৮] কাটিয়া ওহো রে সিপাই,
মোর জোড় বাঙ্গেলা বান্ধিনু রে সিপাই॥
সিপাই, চাকিন্‌দারের বেটা রে… ॥

১ মেয়ে হাতীর ২ দুই জনে ৩ কাহাকে দেখিয়া ৪ রাখিব ৫ কতোদিন ঘুরিব
৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের প্রেম-গীতিতে প্রেমিকা-কর্তৃক প্রেমিক বিচিত্র নামে সম্বোধিত হইয়াছে। 'সিপাই' প্রেমিকের একটি নির্বিশেষ নাম ৭ চাকুরি করে যে পুরুষ ৮ ঝোপের বাঁশ।

। ৩৮৩ ।

কাপড় ধোছিস সুন্দরী কইন্যা গে,—
ও কইন্যা, ঘাটটা ছাড়ি' দেও।
মোর হাতীটাক গরম নাগিছে
হাতীটাক নামেয়া দেওঁ[১] ॥
ওগে, ভাদর মাসের ওউদের চোটে
ডাঙ্গাইতে[২] হাতী মোর না হাঁটে।
যেইঠে ত্থাখে গে নদীর ঘাট মাই,
ও ছেঁছেড়ায়া[৩] নিগায়[৪] মোকে ॥

। ৩৮৩ক ।

"হাতী বান্ধিস, হাতী ছান্দিস, রে মাহুত,
হাতীর ঝাড়িস ধুলা।
সইত্য করি' কও মাহুত
কোন্ঠে তোমার ধুরা[৫] ॥
হাতী বান্ধিস, হাতী ছান্দিস, রে মাহুত,
হাতীক নাগা দড়ি।
সইত্য করি' কও মাহুত
তোর বাড়ীত্ কয় ঝোন নারী[৬] ॥"
"হাতী বান্ধো, হাতী ছান্দো, কইন্যা,
হাতীক নাগাওঁ[৭] বেড়ি।
সইত্য করি' কইলাম কইন্যা
বিয়াও নাহি করি ॥
হাতী বান্ধো, হাতী ছান্দো কইন্যা,
হাতীর ঝাড়োঁ ধুলা।
সইত্য করি' কইলাম কইন্যা
নদীর পাড়ত্ ধুরা ॥"

১ নামাইয়া দিই ২ ডাঙ্গ অর্থাৎ প্রহার করিলে ৩ ছেঁছড়াইয়া, টানিয়া ৪ লইয়া যায়
৫ কোনস্থানে তুমি আস্তানা গাড়িয়াছ ৬ বাড়ীতে কয়জন স্ত্রী ৭ লাগাই।

আমো মউলায়[1], জামো মউলায়,
কাঁঠোলে ফেলায় মুচি।
বয়স হইল্ মোর আঠারো বচ্ছোর
সেই জ্বালায় না বাঁচি॥
আম বাগানের তলে তলে
মাহুতে চরায় হাতী।
আম-কাঁঠোল খাবার তানে[2]
বাড়াইলাম পিরিতি॥
বাপ-মাও মোর দুরাচার
বেচেয়া না খায় ছোটোতে[3]।
যৈবন ঢুলে মোর
পূবাল বাতাসে॥

। ৩৮৪ ।

হস্তী কান্দে হাওদা দেখি'
ঘোড়া কান্দে ঘোড়্শালে।
নারী কান্দে নাইয়রের[4] বাদে[5]॥
মাহুত ভাই,
খুলিয়া দে মোর পায়ের বেড়ি—
বিদায় হয়া যাই॥
জঙ্গলে মোর বাচ্চা দুই
কান্দে দোনো উভরায়[6]—
কে দোয়য়া করিবে উমায়[7]।
ছিলামো আজার কইন্যা
বাস্তোনের জাতি।
কি দোষে করিল্ হস্তী
ওই নিদারুণ বিধি রে॥

১ মুকুলিত হয় ২ খাইবার জন্য ৩ ছোটো বেলাতে বিবাহ দেয় নাই ৪ সধবা নারীর পিত্রালয়ে যাওয়াকে বলে 'নাইয়র যাওয়া' ৫ জন্যে ৬ উচ্চরবে ৭ উহাদের।

ডাইন ঠ্যাঙোতে লোহার বেড়ি রে,
মাহুত, ঝুনুর-ঝুনুর বাজে।
বেড়ির বাইজন শুনি'
মনটা মোর ঝুরে রে ॥

। ৩৮৫ ।

আমি তো বামুনের ছেলে—
নাম সন্ধ্যামণি।
ওকি রে, মাও-বাপের করমো দোষে
ও মুই হনু জালিয়ানী[১]।
— রে নসিবে এই ছিল ॥

নৌতন[২] জালিয়ানী গে হনু
ও মোর মাছের খাঁছা[৩] গে মাথে।
মাছের খাঁছা মাথে লইয়া
ও মোর পড়ে চখুর পানি রে।
— রে নসিবে এই ছিল ॥

সোদর খাবা'[৪] গে গেনু
ও মুই মাও না বাপের ঘরে।
বসিবাক্[৫] দিলে মোকে
ও মোর ডারীঘরের ভিতিরে[৬]।
— রে নসিবে এই ছিল ॥

বাপো দিলে খড়িরে-খুটা[৭]
মাও দিলে রে বাসন।
বহিনি দিলে রে চাউল-সিদা[৮]—
— রে নসিবে এই ছিল ॥

১ জেলেনী হইলাম ২ নূতন ৩ খাঁচা ৪ নিমন্ত্রণ খাইতে। আত্মীয় বাড়ীতে যাওয়াকে 'সোদর খাইতে যাওয়া' বলা হয় ৫ বসিতে ৬ বাহিরের ঘরের ভিতরে ৭ রান্নার জন্য কাঠ ৮ সিধা।

ছোটো বহিনি বারা গে ভুকে[১]
মাজ্‌কিনী বহিনি[২] গে ঝাড়ে।
আজি কোলারে শিশুয়া-বহিনি[৩]
ও মোর গালা ধরিয়া গে কান্দে।
— রে নসিবে এই ছিল॥

। ৩৮৬ ।

হাতে নিলো ফুলের ডালি
কাক্কে[৪] নিলো কলোসী[৫]।
জল ভরিবার গেলো
রায়ডাক নদী[৬]॥
রোজ গেইসিলো কইন্যা
ওইদিয়া-ওইদিয়া।
আজি নাগাল পাহু
ঘাটোতে বসিয়া[৭]॥
কহিতে-বলিতে না নিবো সুমতি।
ভাঙ্গেয়া ভাঙিম কইন্যা
কাক্কের কলোসী[৮]॥
ও হস্তী-কইন্যা রে[৯],
দোয়য়া নাই তোর
পর-পুরুষক দেখিয়া রে[১০]॥

১ ধান ভানাকে 'বারা ভুকানো' বলা হয় ২ মেজো বোন ৩ শিশু বোন ৪ কাঁধে ৫ কলসী ৬ আলিপুরদুয়ারের একটি নদী ৭ রোজ ওইদিক দিয়া যাইস, তাই দেখিতে পাই না। আজ পথে অপেক্ষা না করিয়া ঘাটে বসিয়াই তোর নাগাল পাইলাম ৮ আঘাত করিয়া কাঁধের কলসী ভাঙিয়া দিব ৯ হাতীকে এইখানে 'কন্যা' রূপে কল্পনা করা হইতেছে ১০ গানটি নূতন ধরা হাতীকে স্নান করাইবার পর তাহাকে আদর করিয়া গাওয়া হয়।

। ৩৮৬ক।

আরে ও মোর হস্তী,
মোর কইন্যা রে,
কণেকও দোয়য়া না হয়[1] তোর
পর-পুরুষক নাগিয়া রে ॥
ঘর হইতে হস্তী-কইন্যা
দুয়ারত্ দিলো পাও।
মাথার উপর কাল্ জিঠি[2]
ছাড়ে পাক্ক আও ॥
আরে ও মোর নাল নন্দর আজা রে,
পর-নারীর কইন্যাক দেখি'[3]
ফিরো বাউর হয়া[4] রে ॥
আরে ও মোর বুড়ী বড়াই রে,
কি মতন হস্তী-কইন্যা
দেখাও এক নজর রে ॥
কহিতে-বলিতে[5] মাই তুই
না নিবো সুমতি।
ভাঙ্গেয়া ভাঙ্গেয়া দিম
এ তাম্মার কলোসী রে ॥

....

"জল আনিবা' গেছু গে মাও—
হেঁটা-উচোল[6] মাটি।
পিছিলি পড়ি' ভাঙ্গিল্ মোর
এ তাম্মার কলোসী ॥"

১ কণামাত্রও দয়া হয় না ২ টিকটিকি ৩ পরের বিবাহিত স্ত্রীকে দেখিয়া ৪ বাউর অর্থাৎ পাগল হইয়া ৫ বলিলে কহিলেও, অনুরোধ করিলেও ৬ উঁচু-নীচু।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৮৭।

সুন্দোর মাই গে,
আজার হস্তী বন্দী হইসে
গালাত্ দিয়া রসি।
মুইও মাহুত বন্দী হইনু
করিয়া পিরিতি॥

সুন্দোর মাই গে,
আকাশেতে চন্দ্র নাইরো
কি করিবে তারা।
যেই হস্তীরো মাহুত নাই
দিনে অন্ধিহারা[১]॥

ম্যাঘেতে জলো নাইরো
পব্বত কেনং ঝুরে।
যেই হস্তীরো মাহুত নাই
মন বা ক্যানং করে॥

খোপোতে নাইরো পায়রা
কি করিবে তার খোপে।
যে নারীরো ভাতার নাই
কি করিবে তার রূপে॥

দুয়ারের আগত্ ম্যাটেরা ঘাস
বলদে না খায়, ঘিণে[২]।
আলোয়া চাউলের ম্যাটেরা ভাত[৩]
চেঙ্গেড়ী মাইয়ার গুণে[৪]॥

১ অন্ধকার। অন্ধের মতো ২ দুয়ারের সম্মুখে হওয়া ঘাস নাকি বলদে খায় না, ঘৃণা করে ৩ নরম, বেশী সিদ্ধ হইয়া যাওয়া গলা-ভাত ৪ আতপ চালের গলা-ভাত খাইতে মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু যুবতী স্ত্রী যদি তাহা রান্না করে, তবে তাহাও ভালো লাগে।

॥ বিরুয়া : দ্বিতীয় পর্যায় ॥

। ৩৮৮ ।

প্রাণ-সজনী,
কাহারে বলিব দুখের কাথা।
কিসের মোর আন্ধন,
কিসের মোর বাড়ন,
কিসের মোর হোলোদি বাটা।
ও মোর প্রাণোনাথ অইন্যের গৃহে যায়—
মোর আঙিনা দিয়া যাটা[১] ॥
আর যদি দেখোঁ[২], আর যদি শুনো[৩]
প্রাণোবন্ধু অইন্য জন্মে কাথা[৪]—
এহোন[৫] যৈবনো সাগরে ভাসামো
পাষাণে ভাঙিব মাথা ॥
নিন্দের আলিসে, হাত পইল্ মোর বালিশে
প্রাণো বন্ধু নাই মোর কাছে।
নাড়িয়া স্থাখেছো বুকখান মোর
ছেংছেঙা হইছে[৬] ॥
মোর বন্ধু গান গায় মাথা তুলি' না চায়
মুইও নারী যাওঁ[৭] জলের ঘাটে।
থমকি' থমকি' হাটুঁ[৮]—
চোখেরো ইশারা করু[৯],
মোর বন্ধু না চায় মোর পানে ॥

১ বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি স্মর্তব্য ২ দেখি ৩ শুনি ৪ প্রাণ-বন্ধু অন্যের সহিত কথা বলিতেছে ৫ এ হেন, এই, এইরূপ ৬ বুকটি পুড়িয়া যাইতেছে ৭ যাই ৮ হাঁটি ৯ করি।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৮৯ ।

আজি পর কি আপনার হয় বান্ধব রে।
আজি নলের[১] গুগুন[২] তলে রে তলে
ও খাগেড়ার[৩] গুগুন বাইরে॥
আজি মোর নারীটার অন্তর জলে
ভিতরে বাহিরে।
আজি পর কি আপনার হয় বান্ধব রে॥
চরা কান্দে, চুরী কান্দে
কান্দে বালি হাঁস।
আজি জঙ্গলেরো হরিণী কান্দে
ছাড়িয়া মুখের ঘাস রে॥

। ৩৯০ ।

আঁজি নাল টিয়ার গছত্‌-ডে
শাল টিয়ার ভাসা রে সই।
ও ডালিমের গছত্‌ ঘুগুর ভাসা—
আজি কার হাতে জোগামো বন্ধুর গুয়া[৪]।
আজি বাপোক না ভাঁড়েয়া রে[৫]
এ দই খিলাহু রে সই।
মাওক না ভাঁড়েয়া খিলাহু চুঁড়া।
আজি কলারো সোয়ামীক ভাঁড়েয়া
তুই যৈবন মুই করিহু দান[৬]॥
তুই বন্ধু মোর প্রাণের সুয়া[৭]
আজি কার হাতে জোগামো[৮] বন্ধুর গুয়া॥

১ নলের গাছে আগুন লাগিলে তাহা যেমন চাপা থাকে ২ আগুন ৩ নল ও খাগড়া সমার্থক ৪ একজনের বিবাহিত স্ত্রীর মনে অপর একজনের প্রতি ভালবাসা ৫ ভাঁড়াইয়া, লুকাইয়া রে ৬ দুই স্তন ৭ অন্তরতম ৮ জোগাইব অর্থাৎ দিব।

। ৩৯১ ।

আজি সনার বাটিত্ ক্ষার-খইল[১] হে কইন্না,
উপার বাটিত্ ছেঁকা[২]।
আজি ছান করিতে গেলেন—
ওহো মোর কইন্না
কেশব রাজার ঘাটে।
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে ॥
আজি একো ডুবো, দুইয়ো ডুবো
দিলো হে কইন্না—
তিনো ডুবো রে দিলো।
আজি কোন বা দ্যাশের বুর্ভক[৩] রাজা রে ভাই
নেউকায় তুলিয়া নিলো।
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে।
আজি আগের ডিঙ্গা বাহো হে কইন্না,
পাছের ডিঙ্গাত্ হে বইসো।
আজি আস্তে করি' মারেন বইঠা রে ভাই
ও ভাই পতির কান্দন শুনো।
আজি কেনে আইলাম ছান করিতে ॥
আজি না কান্দো, না ভাবো পতি হে,
কান্দন ক্ষেমা হে কর[৪]।
আজি ঝাঁপি ভরি' টাকা আছে হে নাথো,
আরো বিভাও কর[৫]।
আজি কেনে আইলাম ছান করিতে ॥

১ কলাগাছ পোড়াইয়া প্রস্তুত করা ক্ষার। ইহা লবণের বদলে ভাত-তরকারিতেও খাওয়া হয়,—মাথাও ঘষা হয় ২ ক্ষার ও ছেঁকা সমার্থক। কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচাকেও 'ছেঁকা-পাড়া' বলা হয় ৩ বুর্বক ৪ কান্না থামাও ৫ রাজবংশী সমাজে বর-পক্ষকেই কন্যাপণ দিতে হয়। সেই কন্যাপণের টাকার কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

। ৩৯২ ।

আজি কি করিমো টাকা পাইসা
কি করিমো হে মোতি।
আজি শিশুকালে বিভাও হইসে রে ভাই
ও ভাই, নাই খাঙ পানের খিলি।
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে॥
আজি মাছ[১] মারেন মাছুয়ার ভাই রে[২],
ছেঁকেয়া[৩] মারেন্‌ডে[৪] গোচি[৫] ;
আজি এই দে' নাকুন যাবার দেইখ্‌ছেন-ডে[৬] ভাই
ও ভাই কেশমতী নারী রে।
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে॥
আজি হাল বহেন হালুয়া দাদা রে
নড়িখান হে পাকা।
আজি এই দে' নাকুন যাবার দেইখছেন-ডে ভাই
ও ভাই হোলোদি মাখা নারী রে।
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে॥[৭]

। ৩৯৩ ।

আজি বগু[৮] ধলা, বগী[৯] রে ধলা —
আরো ধলা রে দুধ।
তার চাহিতে অধিক ধলা হে ও কইন্যা,
তোমার হস্তের শাংকা মুঠ[১০]।
— মরি হায় হায়॥

১ মাছ ২ মেছুয়া ভাই ৩ জল ছেঁকিয়া, জল কমাইয়া ৪ 'রে' 'ডে'-র মতো উচ্চারিত হয় ৫ মাছ বিশেষ ৬ এই দিক দিয়া যাইতে দেখিয়াছ নাকি ৭ পূর্ববর্তী গানের জবাব হইল এই গানটি ৮ বক (পুং) ৯ বক (স্ত্রীং) ১০ প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সধবারা পাঁচ-সাতটি শাঁখা একত্র জোড়া করিয়া পরে। ইহাকেই বলে 'শাঁখামুঠ' বা 'শাঁখামুঠি'। পাঁচটি শাঁখা একত্র থাকিলে, তাহাকে বলে 'পাঁচ শাঁখামুঠি'। সাতটি শাঁখা একত্র থাকিলে তাহাকে বলে 'সাত শাঁখামুঠি'। জাতি-কৌলিন্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা পাঁচ শাঁখামুঠি পরে। এই শাঁখামুঠি দিয়া অনেক সময় জাতি-কৌলিন্যের পরিচয় মিলে।

আজি চন্দ্র রাঙা, সূর্য রে রাঙা
রাঙা ডালিমের ফুল।
তার চাহিতে অধিক রাঙা হে ও কইন্যা,
তোমার সিঁতার সেন্দুর।
— মরি হায় হায়॥
আজি বাছুর ডাকে হাম্বা রে হাম্বা
ও গাভী ছাড়ে আও।
আজি ওইমত কান্দেছে হে ও কইন্যা,
তোমার বাপো-মাও।
— মরি হায় হায়॥

। ৩৯৪ ।

আষাঢ়ো না শাবণো মাসে
জলতে শ্যাওয়ালি[1] ভাসে গে সই —
চল্‌ সজনী হামার দেশে॥
হামারো না দেশে যাবো
সুধনা অসিকো[2] পাবো গে সই —
চল্‌ সজনী হামার দেশে॥
আর মুই কান্দেছুঁ মনের দুঃখে
অসিকো জনার প্রাণ রে ফাটে গে সই —
চল্‌ সজনী হামার দেশে॥

১ শ্যাওলা ২ সুরসিক।

CENTRAL LIBRARY

। ৩৭৫ ।

পর্বতেরো কোলে-কোলে
বাঙ্গা[১] আর্জে[২] মেছে[৩]।
সেই না বাঙ্গা তুলিতে
সমারীক ডংশিল্[৪] সাপে।
— ও মাই সমারী[৫] ও ॥

আজি দেওরায় কান্দে আশে-পাশে
সোয়ামী কান্দে বগলে।
আর সনার ভাবের বন্ধুয়া কান্দে
সমারীর বুকে হস্ত দিয়া রে।
— ও মাই সমারী ও ॥

আজি দেওরায় মানে ছাগল-ছেলী
সোয়ামী মানে পাঁঠা।
আর সনার ভাবের বন্ধুয়া মানে
হালের ভইষো জড়া।
— ও মাই সমারী ও।

আজি দেওরায় জোড়ায়[৬] আমো কাঁঠোল
সোয়ামী জোড়ায় বোগোরি।
আর সোনার ভাবের বন্ধুয়া জোড়ায়
ওই না চন্দন-খড়ি ॥
— ও মাই সমারী ও।

আজি সমারীক ছোবা দেছে[৭]
স্বর্গে উঠিল্ ধোমা[৮] ॥
হুপারে[৯] কান্দিয়া বেড়ায়
সমারীর ওই না জ্যাঠো-খুড়া।
— ও মাই সমারী ও ॥

১ ফুলা ২ চাষ করে ৩ মেচ উপজাতি ৪ দংশন করিল ৫ নাম বিশেষ ৬ আনে ৭ পোড়াইতেছে ৮ ধোঁয়া ৯ ওপারে। বহুস্থান হইতে এই গানটির বিচিত্র কথা পাওয়া গিয়াছে।

॥ সোনারায়ের গান ॥

। ৩১৬ ।

দাদা বলরাম রে, হাসিয়া কাথা কয় ।
দুঃশাসনী[1] বাঘ নিয়া নামিল্[2] সনারায় ॥
বাঘ নামিল্ রে চিতিয়া পাথেরা[3]—
ভোর-সাকালে নামিল্ বাঘ মান্‌ষি-কামড়া[4] ॥
পংখী উড়িয়া যায় রে তার জোড় পায়ে নেফুর[5]—
বাঁশী বাজেয়া[6] গান করে সনারায় ঠাকুর ॥
সনারায়ের দক্ষিণা নাগে পুন্ন[7] কুলা ধান ।
তাহারে উপুরা[8] নাগে জোড় গুয়া পান ॥
ধানের কাঙালী না হই, গুয়া তো না চাই ।
স্থানের ব্যবহার কাথা কয়া[9] দিয়া যাই ॥
সনারায়ের দক্ষিণা দিতে যাঁয়ে[10] করিবে হেলা ।
তার ভাতারক নাগাল পাইম গোরু-চরের বেলা[11] ॥
সনারায়ের দক্ষিণা দিতে যাঁয়ে করিবে হেলা ।
হাত পাও খসিয়া পড়ে, চক্ষুর বিরায়[12] ঢেলা[13] ॥
সইত্যের ঠাকুর সনারায়, গারস্তিক[14] সে তুই বর ।
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি[15], চন্দ্র-দিবাকর ॥
গোয়ালিত্ বাড়ুক গাই-গোরু ভাণ্ডারতে ধান ।
দেওয়ানে-দরবারে পাউক বাট্টা-ভরা পান ॥
গোয়ালিত্ বাড়ুক গাই-গোরু জাঙ্গালতে নাউ ।
গিরির ঘরের শত্রু-দুশমন বনের বাঘে খাউক ॥

১ দুঃশাসনের মতো দুর্দান্ত ২ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিল ৩ চিত্রিত, ডোরা-কাটা ৪ মানুষ-খেকো ৫ নূপুর ৬ বাজাইয়া ৭ পূর্ণ ৮ উপরে, আরো অর্থে ৯ কহিয়া ১০ যে ১১ গোরু চরাইবার সময় ১২ বাহির হয় ১৩ ছানি ১৪ গৃহস্থকে ১৫ গৃহস্থ ।

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম অধ্যায়

ভক্তি-গীতি

॥ গারাম পূজার গান ॥

। ৩৯৭ ।

গারাম তলি[১], গারাম তলি
কিসের বাইজন[২] বাজে—
গারাম ঠাকুরের ভোক নাগাইসে[৩]
আবার[৪] জগাড়[৫] করে ॥

॥ নাড়ু-খোয়া গান ॥

। ৩৯৭ ক ।

ও ভগোমান,
কি দিয়া পূজিমো[৬] আভা চরণ ॥
ফুল দিয়া পূজিনু হয়[৭],
আও[৮] ফুল মোর ভমরায় খায় ॥
দুত[৯] দিয়া পূজিনু হয়,
আও দুত মোর বাছুরে খায় ॥
দুবা[১০] দিয়া পূজিনু হয়,
আও দুবা মোর ছাগলে খায় ॥
মন দিয়া পূজিনু হয়,
আও মন মোর ভালে[১১] না হয়[১২] ॥

১ গ্রাম-দেবতার তলা, স্থান ২ বাজনা ৩ ক্ষুধা লাগিয়াছে ৪ পূজার ৫ জোগাড়, আয়োজন ৬ পূজা করিব ৭ পূজা করিতাম ৮ সে-ও ৯ দুধ ১০ দূর্বা ১১ ভালোই ১২ নয়।

॥ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গীতাবলী ॥

। ৩১৮ ।

গয়ুর গয়ুর[১] সোগায়[২] কয় রে
ভাই রে, গয়ুর কারে কয়।
গয়ুর রূপের নাই তুলনা
ধৈয্য[৩] নাহি রয়।
মরি কি হোবে রুপায়[৪] ॥
কোলোটিয়া[৫] কালা সর্পে
ডংশিল্[৬] হামার গায়[৭]।
ভাই রে গয়ুর কারে কয় ॥
বিষে অঙ্গ জর-জর করে
ঝাড়িলে উজান ধায়।
পিরতি না জানে যে জন
গয়ুর ভুলিয়া অয় ॥
গয়ুর ল্যাটা[৮] বিষম ল্যাটা
জানে আমার অন্তরে।
শিমুল গাছের কাঁটার নাখান[৯]
পাটাউ-পাটাউ[১০] করে ॥

১ গৌর ২ সকলেই ৩ ধৈর্ষ ৪ উপায় ৫ 'কালা' এবং 'কেউটিয়া' মিলিয়া 'কোলোটিয়' হইয়াছে, মনে হয় ৬ দংশন করিল ৭ আমার, আমাদের গায়ে ৮ লেঠা, ঝঞ্ঝাট, জঞ্জাল ৯ মতো ১০ জর্জরিত।

। ৩৯৯ ।

আর কতয় দিন[১] দিবো[২] রে কানাই
বাঁশীটার দহাই[৩] ॥
ও তুই গোরু চরাইস তুই বনে রে বনে—
বাঁশীটা তুই বাজাইস কেনে।
ডাগা[৪] দিলো আরে কান্‌হাই
অবলারো পাণে[৫] ॥
ও তোর মা যশোদাক কয়া দিমো,
বাঁশীটা তোর কাড়িয়া নিমো।
ছিঁড়া পাটানী দিয়া
বাঁশীটাক বান্ধিয়া থুমো[৬] ॥

। ৪০০ ।

ওরে শাম[৭] কালা কালা রে,
কি বাদে[৮] ঘটালো এতয় জালা।
ঘাটা[৯] ছাড়ি' দে রে কালা
ঘাটা ছাড়িয়া দে ॥
কারো বাপোর ভয় না করি
ধার ধারি না তোরে।
হুতি কণেক[১০] কালা তুই
সরিয়া যা না রে।
ওরে শাম কালা কালা রে ॥
জল ভরিতে যামো সই গে
হামার ব্রেজের[১১] নারী।
কাঁখোতে কলোসা নয়া[১২]
কেনে কালা করিস ঠারাঠারি ॥

১ কতোদিন ২ দিবি ৩ দোহাই ৪ দাগা ৫ প্রাণে ৬ পাটানী (রাজবংশী মেয়েরা পরিধেয় বস্ত্র) ছিঁড়িয়া তাহা দিয়া তোর বাঁশীর মুখ বাঁধিয়া রাখিব ৭ শ্যাম ৮ জন্যে ৯ পথ ১০ ওদিকে একটু ১১ ব্রজের ১২ কাঁধে কলসী লইয়া।

। ৪০০ক ।

কালার বাদে[১] কান্দিয়া কান্দিয়া
নয়ন জলে বস্‌সন[২] ভিজিয়া যায়—
মরি মোর হায় রে হায়।
কালা বিনা দুই চউক্ষের জল
মুছিয়া দিবে রে কায়।
নয়ন জলে বস্‌সন ভিজিয়া যায়।
ওরে থাকতো যদি দয়েময়ে[৩]
তাপিত পরাণ[৪] জুড়াইন্থ হয়[৫]।
ফুল ফুটিসে[৬] ভমরা বিনা
মধু খাবে কাঁয়[৭]।
যেইমন্[৮] সাদা কাপড়ত্ দাগো ভরে,
ওইমন্ পুরুষের মন নড়ে[৯]।
ওইমন্ দাগা দিলো কালা তুই
আধারো অন্তরে।

। ৪০০ খ ।

ও শাম কালিয়া রে,
কেনে রে কালা বাজান[১০] বাঁশী
ঠুন্ দুফোর সম্[১১]।
এ্যাখেলায়[১২] যাও মুই জলর ঘাটে।
ভুল্‌কি মারি'[১৩] ডেকায়[১৪] বন্ধু
নদী যাবার আলে[১৫]।

১ জন্তে ২ বসন ৩ দয়াময় ৪ তপ্ত প্রাণ ৫ জুড়াইতাম ৬ ফুটিয়াছে ৭ কে মধু খাইবে ৮ যেইরকম ৯ সাদা কাপড়ে যেমন সহজেই দাগ পড়ে, পুরুষের মন তেমনি সহজেই চঞ্চল হয় ১০ বাজাও ১১ ভর দুপুর সময়ে, দুপুর বেলায় ১২ একলাই ১৩ উঁকি দিয়া, হাতছানি দিয়া ১৪ ডাকে ১৫ ছলে, অছিলায়।

CENTRAL LIBRARY

ও আই, হাউক-ডাউক করি,[১]
কলস ডুবাও জলতে।
হাটিয়া যাও, ফিরিয়া চাও—
কাঁহো যদি আইসে[২]—
ওভাগোনী নারীর মন সোদায়[৩] রে কান্দে ॥
শাশুড়ী-ননদীর ঝালায়[৪]
বাহির হবা[৫] না পাও[৬]।
ও আই, মুখ ফাটিয়া মুই
কান্দি'র[৭] না পাও ॥
ও আই, কুন-বা ছলে যাইম মুই
জলর ঘাটে।
ওভাগোনী নারীর মন সোদায় রে কান্দে ॥

। ৪০১ ।

ও সুন্দোরী আধে[৮],
কদমতলাত্ বাজাও বাঁশী
তোক দেখি'র বাদে[৯] ॥
আর যদি বাঁশীত্ মারে[?]। রে ফোঁক—
বসিয়া শুনিবে নগরের নোক।
চোপরাতি তোক সুন্দোরী
বসেয়া[১০] কান্দাম তোক ॥
আর যদি বাঁশী মোর হাতত্[১১] থাকে
তোর সুন্দেরীর নাগাল পাও মুই ঘাটায়-পথে।
জলমে-জলমে[১২] ছাড়ি' দিমো
তুই ছিরাধার কাছে ॥

১ তাড়াতাড়ি করিয়া ২ কেহ যদি আসে ৩ সদাই ৪ জ্বালায় ৫ বাহির হইতে ৬ পারি না ৭ কান্দিবার, কাঁদিতে ৮ রাধে ৯ তোকে দেখিবার জন্য ১০ বসাইয়া ১১ হাতে ১২ জন্মে-জন্মে।

CENTRAL LIBRARY

। ৪০২ ।

দে দে দে, দে রে নাইয়া পার করিয়া।
যাবার বেলা খোয়াইম[১] তোক
আঞ্চলেরো[২] গুয়া ॥
ওরে এ্যাখেতে দুক্কুরো বেলা
ওউদে ঘামিসে মোরে[৩] গাও।
ছি ছি রে চেঙ্গেড়া নাইয়া
নাই কাড়িস আও[৪] ॥
ওরে তুই হলো চেঙ্গেড়া নাইয়া
বাজাইস মোহন বাঁশী।
আগিলা মতন[৫] নাই রে নাইয়া
মোর মুখত্ হাসি ॥

। ৪০৩ ।

ও তোর কুন বা গুণে
মজিল্[৬] প্রাণ রে কালাচন[৭]।
নয়ন বয়া[৮] যায় রেধা[৯]—
এ দেহা মোর কুন বা কাজে
নাগে রে বন্ধু ধন ॥
কাঁকোতে কলোসী নিয়া
জল ভরিমো যমনা[১০] যায়া।
কলোসী ভরিমো নয়নের জলে
রে বন্ধু ধন ॥

১ খাওয়াইব ২ আঁচলের ৩ আমার ৪ কথা বলিস না ৫ আগের মতো ৬ মজিল ৭ কালাচাঁদ ৮ বহিয়া ৯ অশ্রুর ধারা ১০ যমুনাতে। বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই

॥ তৃষ্ণা ও মনঃশিক্ষা ॥

। ৪০৪ ।

মনভোলা, তুই কার ভরোসা কর রে
ওরে মনভোলা ॥
ওরে মরণ কালের বেলা
নিতে হোবে ঝোলা-মালা।
ওরে মনভোলা ॥
আর যেই দিন মন তুই
যাবো মোশান ঘাটে ।
চড়িতে হোবে মন তোর
বাঁশের খাটে ।
ওরে মনভোলা ॥

। ৪০৫ ।

ও মন, তুই কান্দিস কার জইন্ত ।
ও মন, একায় আইচ্চিস এই ভইবর
যাইতে হোবে একায় ॥
ভাই আছে, ভাজিতা[১] আছে
সম্পত্তিরো ভাগী ।
আগোত্‌ নিবে ধনের বাট্টা[২]
পাছোত্‌ দিবে মাটি[৩] ।
ও মন, তুই কান্দিস কার জইন্ত ॥

১ ভাতিজা, ভাইয়ের ছেলে ২ আগে সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করিবে ৩ পরে দেহের সৎকার করিবে ।

CENTRAL LIBRARY

। ৪০৬ ।

মিছা বাড়ী, মিছা ঘর
মন তোর মিছা ময়হার জালা[১] ;
প্রেমের বাজার ভাঙ্গিলো রে নারায়ণ ॥
আসিবে যমের দূত, নিগাবে[২] বান্ধিয়া।
মন তোর মিছা ময়হার জালা ॥
বাপো কান্দে শিতানে[৩] বসি'
মন তোর মাও কান্দে বগলে[৪]।
নিজেরো ওমণী[৫] কান্দে
মন তোর মাটিত্ গড়িমড়ি দিয়া[৬]।
আসিবে যমের দূত নিগাবে বান্ধিয়া ॥
ভাই কান্দে, ভাজিতা[৭] কান্দে,
মন তোর কান্দে গুণের বইন্[৮]।
নিজেরো পুত্র কান্দে—
মন তোর ধুলাত্ লুটিয়া।
আসিবে যমের দূত নিগাবে বান্ধিয়া ॥

। ৪০৭ ।

ময়নার ময়হা[৯] বড়ো ভারী রে।
পায়া[১০] ময়না মনার খাঁচারি রে,
মনে কি হয়না ময়না
যাইতে হোবে উড়ি' ॥
আরে পিছে-পিছে ফিরে শমন
হাতত্ নইয়া[১১] দড়ি।
মনে কি হয় না ময়না
যাইতে হোবে উড়ি' ॥

১ মায়ার জালা ২ লইয়া যাইবে ৩ শিয়রে ৪ পার্শ্বে ৫ রমণী, স্ত্রী ৬ গড়াগড়ি দিয়া ৭ ভাতিজা ৮ আদরের বোন ৯ মায়া ১০ পাইয়া ১১ লইয়া।

CENTRAL LIBRARY

তোমারো খাঁচারি ভাঙিবে
পিঞ্জারা ভাঙিবে—
হোবে গুঁড়া-গুঁড়ি[১]।
ময়হার ছিকল কাটবি যদি
মুখে বলো হরি ॥

। ৪০৮ ।

ওরে পাগল মন,
তোক বুঝাইতে দিন মোর গেল রে,
মন তুই আর ওরে কেমন।
ওরে পাগল মন ॥
কখন মন মোর আগা পারা,
কখন মন মোর পাছা পারা[২],
কখন মন মোর বাড়ীতে না অহে রে মন—।
ওরে পাগল মন ॥
শ্যাম কালা শ্যাম কালা ওরে বইলে,
ঝাঁপ দিমো যমুনা-জলে।
যাউক দুঃখো মোর এখেবারে।
ওরে পাগল মন ॥

। ৪০৯ ।

গোঁসাই, মন মোর ঝুরে রে—
ভাবের নদীটাক দেখিয়া।
ও সেই নদীটাত্ মান্ষি এক জোন[৩]
আছে রে বাঁকা।
মানুষ না যায় রে চিনা ॥
ও সেই মান্ষিটা যায়া আছে[৪]
পেমের ঘরে বসিয়া।
গোঁসাই, মন মোর ঝুরে রে—
ভাবের নদীটাক দেখিয়া ॥

১ গুঁড়াগুঁড়া হইয়া যাইবে ২ কখনো অগ্রসর হয়, কখনো পশ্চাদমুখী হয় ৩ একজন
৪ যাইয়া আছে, রহিয়াছে।

॥ দেহতত্ত্ব ॥

॥ দেহ ও মন ॥

। ৪১০ ।

হামার বোরভাণ্ডো ভিতরে
ভাবিয়া দেখো মন,—
কুন মান্‌ষিটা জলে ভিজি' মরে।
হামার বোরভাণ্ডো ভিতরে ॥

ওরে জলের তলে বান্ধে ঘর,
জলে চাটি[১] ঘিরে ;
কুন্‌ঠৈখানা[২] ওগুন দিয়া
ঘরের টুহি মারে।
বইলা দে, বইলা দে, ওস্তাদ রে ॥

বারো সুজ্জ চব্বিশ চন্দ্র
এ দেহাতে আছে।
কুন্ কুন্ সুজ্জের কিবা নাম
বলো সভা মাঝে রে ॥

। ৪১১ ।

রস্তাদ[৩] বইল্‌তে হইবে রে,—
কুন্ দেহাতে কুন্ খাবোতা
কুন্ বিরাজ করে রে।

কুন্‌ঠৈখানা আছে রে রস্তাদ
বিনা দুধের দই ;
কুন্‌ঠৈখানা আছে রে রস্তাদ
বিনা ধানের খই।
রস্তাদ বইল্‌তে হইবে রে।

কুন্‌ঠৈখানা আছে রে রস্তাদ
বিনা বাঁশের নড়ি।
কুন্‌ঠৈখানা আছে রে রস্তাদ
বিনা পাটার[৪] দড়ি।
রস্তাদ বইল্‌তে হইবে রে ॥

১ বেড়া ২ কোনস্থানে ৩ ওস্তাদ ৪ পাটের।

CENTRAL LIBRARY

। ৪১২ ।

ভাঙ্গা তরীর জল মোর অহে[১] না রে।
এ্যাখে[২]হামার ভাঙ্গা রে তরী,—
ষোলো নামের ষোলো রে খুঁটি,
আর আছে মন সাড়ে চার টাটি[৩] ॥

। ৪১৩ ।

জীবোন[৪], দাদা, আয় রে আয়,—
তুই জীবোন ছাড়িয়া গেলে
মোক আদর করিবে কাঁয় ॥
আর তুই জীবোন ছাড়িয়া গেলে
নিগাবে মোক শ্মোশান ঘাটে।
শ্মোশান ঘাটে দনো-ঝনে[৫] হমো একেঠে[৬] ॥
আর দেহাত্‌ আছে মোর ছয় ঝোন ভাই
কারো সঙ্গে কারো দেখা নাই।
শ্মোশান ঘাটে সনার দেহা
পুড়িয়া করিবে ছাই ॥

১ রহে ২ একে ৩ বেড়া ৪ জীবন ৫ দুইজনে ৬ একত্র হইব।

কথান্তর— দেহা বলিছে, মনা ভাই—
মোক ছাড়িয়া কোন্‌ঠে যাছিত্‌ ১ রে
দনো-ঝনে এক সঙ্গে যাই।
আসিছি ২ দনো ঝনে
যাছিত্‌ তুই এথেলায় ৩ রে
ওরে মনা ভাই,
হুনং জানিলে মুই আসিমুকে নাই ৪।
—ওরে মনা ভাই।
তুই ছাড়িলে মোক বান্ধিবে রে
ওরে মনা ভাই,
শ্মশান ঘাটে নিগিয়া মোক
পুড়িয়া করিবে ছাই।

১ যাইতেছিস ২ আসিয়াছি ৩ একলাই ৪ ওইরূপ জানিলে আমি আসিতামই না।

CENTRAL LIBRARY

। ৪১৪ ।

এখন কান্দিলে কি হোবে,
ও তোর পুত্র-কন্যা
সঙ্গে কেহ না যাবে।
এখন কান্দিলে কি হোবে ॥
ওরে পাঁচ ঝোন মানুষি নিয়া নৌকা
মাঝিয়াত্ দিলে পাড়ি।
ওরে নৌকা ড়ুবেছে[১] দেখিয়া আজি
কান্দেছিত্[২] গালা ছাড়ি' ॥
ওরে হরি বিনা নাই কেহ সম্বল এই ভবে।
এখন কান্দিলে কি হোবে ॥

। ৪১৫ ।

গোঁসাই, কি হোবে হামার গতি।
মিছাকে বড়াই[৩] ছুনিয়ার বসতি ॥
আরে উচ্চল[৪] দেখিয়া
বান্ধিলাম গো বাড়ী ;
হোকোলার তলে[৫] গোঁসাই বসতি ॥
গোঁসাই, দিলো চারিক পরিপাটি
সনার দেহা গোঁসাই খাব মাটি।
মিছাকে বড়াই ছুনিয়ার বসতি ॥

১ ড়ুবিতেছে ২ কাঁদিতেছিস ৩ মিছাই বড়াই ৪ উঁচু ৫ হোগ্‌লার তলে।

॥ গুরুর উদ্দেশে ॥

। ৪১৬ ।

হাড়েরো হাড়খানি চামেরো ছাউনি[১]—
বান্দে'-বান্দে'[২] জোড়া গোঁসাইজী
কুন্ বা ধান্দায় বান্ধিয়াছ ঘর ॥
চেঙ্গড়া কালো গেইল্ হাসিতে খেলিতে
যৌবনো কালো গেইল্ অঙ্গে[৩]।
পড়িল্ বিদ্দ্কাল[৪], ঘটিল্ জঞ্জাল
গুরুক ভাজিমো কুন্কালে, গোঁসাইজী ॥

। ৪১৭ ।

বেরথা[৫] চিন্তা করো রবোধ মন[৬]।
ওরে যার জইন্ত মন কান্দো বসি'
সে কি তোর হয় আপন ॥
কেউ কারো নয় এ সংসারে
আইসাছ[৭] দু'দিনের তরে।
ভবের বাজার ভাঙ্গি' গেলে
এ খেলা আর কতক্ষণ।
বেরথা চিন্তা করো রবোধ মন ॥
অসময় অসিক বলেন
নিজো-নিজো কর্ম করেন[৮]।
শেষের উপায় কইর্তে হলে
ভজো গুরুর ছিচরণ।
বেরথা চিন্তা করো রবোধ মন ॥

১ চামড়া দিয়া দেহ ঢাকা ২ বাঁধিয়া বাঁধিয়া ৩ রঙ্গে ৪ বার্ধক্য উপস্থিত হইল ৫ বৃথা ৬ অবোধ মন ৭ আসিয়াছ ৮ কর্ম কর।

CENTRAL LIBRARY

। ৪১৮ ।

ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে হামারে[১] ।
ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সখী রে
ছিগুরু লাগিয়া
গুরু বিনা কি ধন আছে দেখো না ভাবিয়া ॥
ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সখী রে
বৈভবে[২] আসিয়া ।
গুরু বিনা কি ধন আছে দেখো না ভাবিয়া ॥
ওরে মিছা মায়ায় বন্দী হইনো[৩] ।
দেখো না ভাবিয়া ।
ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সখী রে
ছিগুরু লাগিয়া ॥

। ৪১৯ ।

আরে মনমালী[৪]
কালন্তী নদীটার[৫] তুফান ভারী ।
যদি গুরু করে দোয়য়া[৬]
দিতে পারো পারের খেওয়া ॥
কালো মেঘের বিষ্টি পড়ে—
ভাসিয়া যায় নদীর ফেপেনা[৭] ।
দিল-দরিয়ার তিনটি মোহনা ॥

১ আমার ২ ভব সংসারে ৩ হইলাম ৪ বনমালী (?) ৫ কালিন্দী, কাল-প্রবাহ (?)
৬ দয়া ৭ ফেনা ।

। ৪২০ ।

আজি সোদায় কান্দেছে মন মোর
গুরুর চরণ ধরিয়া রে ;—
নাই করিম মুই গৃহস্থ[1] বাস।
মন বলে, বৈরাগী হইম[2] রে মাধব,
বুঝু[3] ছয়খান রে মাস।
নাই করিম মুই গৃহয় বাস ॥
ধুতি চিঁড়িয়া[4] কোপীন করিমো রে মাধব,
বুঝু ছয়খান রে মাস।
নাই করিম মুই গৃহয় বাস ॥
গুরুই[5] দিলে মহামন্ত্র রে মাধব,
গুরুমানী দিলে মালা।
ওরে আজ্ঞা যদি করেন প্রভু
ছাড়য়[6] গৃহ-আলা রে।
নাই করিম মুই গৃহয় বাস।
আজি ছয়মাস
ছয় দিনকার পথ রে মাধব,
ধূলায় অন্ধ রে কার।
গুরুই-শিষ্যয়[7] সেথায় নাই রে
ডাকাডাকিই সার[8]।
নাই করিম মুই গৃহয় বাস ॥

১ গৃহে ২ হইব ৩ বুঝি, দেখি ৪ ছিঁড়িয়া ৫ গুরুতে ৬ ছাড়ি ৭ গুরুতে-শিষ্যতে
৮ কথান্তর—টিহাটিহিই সার।

। ৪২১ ।

দিল-দরিয়ার শুকনা নদী রে হে ক্ষেপা,
কেমনে হবো পার।
হিপার হাতে[1] দেখা না যায় রে
হে ক্ষেপা, হুপারের[2] কিনার ॥
গুরুই-শিষ্যে দেখা না হয় রে—
হে ক্ষেপা, ঠারাঠারিই সার ॥

। ৪২২ ।

ওরে মান্‌ষির দেহা
এই জীবনের নাই রে আশা,—
কখন চ্যাতোন[3] কখন হয় রে মড়া ॥
ওরে ধান কাটে ধান্থয়ার ভাই রে
ছাড়িয়া কাটে নাড়া।
দেহার মান্‌ষি ছাড়িয়া গেলে
দেহা গোন্ধায় শড়া[4]।
কখন চ্যাতোন, কখন হয় রে মড়া ॥
নিক্তাশের[5] কি বিশ্বাস আছে মন
চলো গুরুর কাছে।
গুরুয় দিয়াছে মন্ত্র
এ দেহা-তরী তোরে ॥
গারস্তি[6] ছাড়িলে বাড়ী,
মন, ছউনী পড়ে ভিটা[7]।
কাঁহো খসায় চালের খ্যাড়[8]
কাঁহো খসায় উয়া[9] রে ॥

১ এপার হইতে ২ ওপারের ৩ চেতন ৪ পচা গন্ধ ৫ নিবাসের ৬ গৃহস্থ ৭ শণের জঙ্গলে ভিটা ভরিয়া যায় ৮ খড় ৯ রোয়া, চালের মোটা বাতা।

॥ হেঁয়ালি ॥

। ৪২৩ ।

এ ঘর ছাড়িয়া কোন্‌ঠে[১]
চলিয়া যাবো[২] রে
ওগে জোড়-ময়না।
ওই পড়ে তোর চখুর জল রে
ওগে জোড়-ময়না॥
আজি ঘর বান্ধিলাম বালুরে[৩] চরে
ওগে, খুঁটি দিলাম জলে।
উপরে হগুলি[৪] দিয়া
চাঙ্‌ পাতিছে তলে রে॥
ওগে জোড়-ময়না॥
সুতার নলে ঠেকিল্‌ রে হস্তী[৫]
নোহাক[৬] খাইল্‌ রে ঘুণে;
বিন্দাবনে নাগিল রে ওগুন[৭]
দেখিল ওসিক[৮] জনে রে।
ওগে জোড়-ময়না॥

। ৪২৪ ।

আর না বোয়াইম্‌ হাল[৯] মন রে,
আর না বোয়াইম্‌ হাল।
আর না বোয়াইম্‌ হাল রে
জমি না হয় ভাল্‌॥
ওরে তামান[১০] জমি পতিত ডাঙ্গা
মাঝের জমি খাল॥

১ কোনস্থানে ২ যাইবি ৩ বালুর, বালির ৪ হোগলা ৫ হস্তী বন্দী হইল ৬ লোহাকে ৭ আগুন ৮ রসিক ৯ আর হাল বহিব না ১০ সব।

ছয় বল্দায়[১] একটা নাঙ্গোল
জমি আবাদ নাই রে হইল্ ।
ওরে ঘরের বিছোন বাইরে ফেলি
ভাইব্‌তে জনম গেইল্[২] ॥
বাঘে-মৈষে হালখান বয়
আবাদ পাবার আশে ।
বোকোরি-ছাগলে বাঘক চিঁসায়[৩]
নাঙ্গল খেক্‌টেয়া হাসে[৪] ॥

। ৪২৫ ।

মহাশয়, আগম দরিয়ায় কেবা হাল বয় ॥
বাঘে-মইষে হালখান বয়
এন্দুরে[৫] ফেলায় রে ধান ।
পানি-কুম্‌ড়ি[৬] থুকুরা[৭] বাছে
সলেয়ায়[৮] কিস্যাণ[৯] ॥
টুনি পোখী ঢ্যাল ভাঙ্গায়[১০]
চিলায় উবায়[১১] রে মই ।
শশকে উবায় নাঙ্গল-জোঙ্গাল
পেন্‌টির[১২] মাথাত্ দই ॥
মড়া মান্‌ষি আহার করে
জীবিতা[১৩] মান্‌ষির প্যাটে ।
সেই মান্‌ষিটার সিপাই-সন্তর[১৪]
আছে লাইখে লাখে ॥

১ বলদে ২ ভাবিয়া জনম গেল ৩ চুঁ মারে ৪ মুখ বাঁকাইয়া হাসে ৫ ইন্দুরে, ইঁদুর ৬ পানকৌড়ি ৭ জমির আগাছা ৮ ইঁদুর ৯ কৃষাণ ১০ মাটির ঢেলা ভাঙে ১১ বহে ১২ গোরু খেদাইবার লাঠি, পাচনি ১৩ জীবিত ১৪ সিপাই-সান্ত্রী ।

CENTRAL LIBRARY

। ৪২৬ ।

তুই মোর অসিয়া[১] নিতাই রে,—
দারণ প্রেম বাড়ালো[২] রে হায়,
বিনা তারে দতরা কে বাজায় ।
ওরে আকাশোতে হালখান জুড়িছুঁ
পাতালোতে মুই এক হাঁটু জলত্
ধুকুরা ছুবেছুঁ[৩]—
তাত্ ফুটিল্ খই ।
তুই বড়ো অসিয়া নিতাই রে ॥
ওরে বাঘে-হরিণে হালখান জুড়িছুঁ
কামাই খাবার আশে ।
বোকোরির চিঁসাতে বাঘ রে ভাই
নাঙ্গল খেকটেয়া হাসে ॥

। ৪২৭ ।

অসিয়া নিতাই রে,
আকাশে মাইমু তীর[৪] :
পইলো[৫] কেলার গছত্[৬] ;
চরু[৭] ফাটিয়া অক্ত পড়ে—
মইলাম[৮] প্যাটের বিষে ॥

১ রসিক ২ বাড়াইলি ৩ ক্ষেতের আগাছা পোড়াইতেছি ৪ মারিলাম তীর ৫ পড়িল ৬ কলার গাছে ৭ উরু ৮ মরিলাম ।

৪২৪ হইতে ৪২৬-সংখ্যক গানের সমভাবাত্মক একটি গান অন্যত্র হইতে মিলিয়াছে :

আর না যাইমু বুড়ীর ভাঙ্গা ঘরে,
রে কালিয়া সোনা । ধু ।
বিলের মাঝে চিলের বাসা কুত্তা (কুকুর) বিয়ায় গাছে ।
সেই চিল ধরিয়া খাইল রামদাড়িকা মাছে ॥
কাকরের মাঝে বোলে আমার ফকির কৈ ।
বাঘে মৈষে হাল জুড়িছে পিপড়া দিছে মই ॥
—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১২, পৃঃ ১৯৩ ।

CENTRAL LIBRARY

। ৪২৮ ।

এ মন পাগেলা,
কার বাড়ীত্ দেওয়ানী কর রে ॥
কালা মান্‌ষিটা গোরা হইল্
কোন্ বা জনমের ফলে ।
সেই মান্‌ষিটা ভাসিয়া বেড়ায়
আগম দরিয়ার জলে ॥
স্বগ্‌গে ছিলো গছের গোড়া
মর্ত্তে[১] মেলে রে ডাল ।
দুই বিরিক্ষের একটা ফল
কোন্ বা ডালে ধরে ।
এ মন পাগেলা
কার বাড়ীতে দেওয়ানী কর রে ॥

১ মর্তে।

॥ ষাইটোন ॥

॥ ৪২৭ ॥

॥ নামানি ॥

ও পারে দরিয়া, এ পারে নদীয়া—
মইদ্ নদীত্[1] থমকিসে[2] ষাটোন মাওর[3] ডিঙ্গা।
কাঙ্গাল বাপ-মাও—
কোন্ঠে পাম[4] সোনার নাও,
আপন হস্তে হয়া আইসো পারো রে।
স্বগ্য হাতে নামুক ষাইটোনের মাও।
স্বগ্য হাতে নামুক,—
মর্কে[5] দেউক পাও।
কুত্তি[6] গেইল্ গে মারেয়া-গিরি[7],
ধোয়াও দুইখান পাও।
কুত্তি গেইল্ গে মারেয়া-গিরি,
মুছাও দুইখান পাও।

॥ বসানি ॥

ও পারে দরিয়া, এ পারে নদীয়া—
মইধ্য নদীত্ থমকিল[8] নিয়াইচের[9] ভারো রে।
ও পারে দরিয়া, এ পারে নদীয়া—
মইধ্য নদীত্ থমকিল্ আলিপনের ভারো রে।
তোক বুলোঁ মুই বাসোমতী[10] মাও রে,
চাইর নেঙ্গুল[11] জায়গা ছাড়ি' দেও রে—
মুই বসাওঁ ষাইটোন মাওর ছাতি রে।

১ মধ্য নদীতে ২ থম্‌কাইয়াছে ৩ ষাইটোন মায়ের ৪ কোথায় পাইব ৫ মর্ত্তে ৬ কোথায় ৭ যাহার গৃহে পূজা হইতেছে, তাহাকে 'মারেয়া' বলে ৮ থামাইল ৯ কলাপাতার অগ্রভাগ ১০ বসুমতী ১১ আঙ্গুল।

॥ চুমানি ॥

গাই বান্দিনু অরণে[1], গাই বান্দিনু বরণে,
দোয়াল[2] আন্নু নানা মিনতি করিয়া :
কুত্তি না গেলো রে, দোয়ালের বেটা রে,
দে দোয়াল মোক একধার[3] দুধো ছেঁকিয়া[4] ।
ওই দুধো দিয়া করিম মুই
ষাইটোন মাওর পূজা ॥
ও পারে বান্দিলাম গাই, এ পারে বান্দিলাম বাছুর,
গাই দেখি' বাছুর হামলায় ;—
দোয়াল আন্নু বড়ো মিনতি করিয়া ॥
ছেকিয়া দে মোক পাক্ক গাভীর দুধ—
মুই বসামু বিষহরির নেওয়াইজ[5] ॥

॥ ষাইটোনের কাহিনী ॥

আজি এগিনা[6] সামটে[7] শরদই[8]—
এগিনায় এড়িয়া যায় আজন :
"আজি আন্দন ঘরে মা তুই
তুলিয়ায় না দিস পাও রে ।
তোক ত্থাথোঁ মা মুই জরমকালের[9] বাঞ্জী রে[10] ॥"
আজি ননন্দা গালি ত্থাছে—
"বাঞ্জী-ত্থাড়ের বেটী রে,
বড়ো ঘরে মোর তুলিয়ায় না দিস পাও রে ।
তুই হইসিদ্[11] জরমকালের বাঞ্জী রে ॥"

১ অরণো ২ যে গাই দোহন করে ৩ একটু ৪ দোহন করিয়া ৫ কলা-পাতার অগ্রভাগ ৬ অঙ্গন ৭ ঝাড়ু দেয় ৮ ষাইটোনের অপর নাম ৯ জন্ম ধরিয়া ১০ বন্ধ্যা রে ১১ হইয়াছিস ।

আজি শাশুড়ী গালি দ্যাছে—
"বাঙ্গী-স্যাড়ের বেটী রে ॥"
আজি বাপে না গালি দ্যাছে—
"বাঙ্গা-স্যাড়ের বেটা রে,
ভারী ঘরাত্[১] বা মোর
তুলিয়ায় না দিস পাও রে।
তোক স্যাথো মুই জনমকালের বাঙ্গা রে।
তোক বাঙ্গাক দেখিলে
সাইদ্-পাত্রা[২] মোর না হোবে—
তোর বাঙ্গীক দেইক্‌কো[৩] বনোবাসে রে ॥"
....

"যা বাঙ্গী তুই সরোবরো-ডীঘি[৪] রে।
যা বাঙ্গী তুই ঘরেক মাথা-গাও রে ॥"
আজি সনার বাটায় ছেকা[৫] বাঙ্গী রে মোর
উপার বাটায় থইলা।
আজি সিনানো করিতে গেইল্ বাঙ্গী মোর
সরোবরো-ডীঘি ॥
"আজা হে,
আজি মোর ওভাগীর নাইরো বাপো-ভাইয়া রে,
ও মুই যাইম্‌কো[৬] কারে বাড়ী।"
"যা বাঙ্গী, যাইস তোর মামার বাড়ী ॥"
"আজা হে,
আজি মোর ওভাগীর নাইরো মামা-মামী রে,
ও মুই যাইম্‌কো কারে বাড়ী ॥"
"যা বাঙ্গী, যাইস মোরো মামার বাড়ী রে ॥"

১ বাহিরের ঘরে ২ শুভ ও মঙ্গল-সূচক কাজ ৩ দেউক, দিব ৪ দীঘি ৫ আর
৬ যাইব। 'কো' কথার মাত্রা।

CENTRAL LIBRARY

আজি আগে আগে বাঞ্জা-আজা
পিছে যায় বাঞ্জী রে।
যায় বাঞ্জী মোর অরণ-জোঙ্গলের মাঝে রে ।
"বাঞ্জা হে,
মোক ভালা বড়োয় আলিস[1] ধরে রে।
এইঠে মুই আলিস মারোঁ রে।
সে বাঞ্জা তোর চরু[2] না ফেলেয়া[3] রে
হামাক ভালা বড়োয় আলিস নাগে রে ॥"
আজি বাঞ্জা-আজা দিলেক
চরু ফেলেয়া রে ;
আজি বাঞ্জী ভালা আলিস দেয়ও রে।
আজি বাঞ্জা ভালা চরু টানায়[4] রে,—
কান্দে বাঞ্জা মোর না হরিষ মনে[5] রে ।
কান্দে বাঞ্জা মোর না হরিষ মনে রে :
" কি হায় রে,
আজি মোর বাঞ্জীক খাছো অরণ-বাসো রে ॥"
কান্দে বাঞ্জা মোর না হরিষ মনে রে।
আজি কানি নেঙ্গুল চিরিয়া[6] রে বাঞ্জা
দেহাত্ মারে ফোঁটা রে ।
কান্দে বাঞ্জা মোর না হরিষ মনে রে :
"কি হায় রে,
মোর কর্মে নাইরো ফোলাফল রে।
আজি বাঞ্জী-বংশক[7] দিনু বনোবাসো রে ॥"
কান্দে বাঞ্জা মোর না হরিষ মনে রে—
গেইল্ বাঞ্জা মোর বাড়ীক নাগিয়া রে ।

১ আলস্য, শ্রান্তি। 'নিদ্রা' অর্থে ২ উরু ৩ ফেলিয়া, পাতিয়া ৪ টানে ৫ বিষাদ মনে
৬ কাটিয়া ৭ বন্ধ্যার বংশ-সন্তুতাকে।

আজি চৈতন পায়া[১] রে বাঙী মোর
চাখে চক্র পাখে[২] রে—
"আজি বাজাক মোর খাইলে বনের বাঘো রে।
আজি মুই অভাগী
যাইমুকো কারে বাড়ী রে।"
— কান্দে বাঙী মোর
অরণ-জোঙ্গলের মাঝে রে।

[জোঙ্গলের ভিত্রে[৩] বাইটোন যেলা[৪] কান্দেছে, সেলা[৫] আরো হুপাখ দিয়া[৬] যাছে ঠাকুর-ঠাকুরাণীর রথখান। বাইটোনের কান্দন শুনি' ঠাকুরাণীর দয়া নাগিল্। ঠাকুরক কইল্, রথখান কনেক থাম্বিবার। ঠাকুরাণী কহছে ঠাকুরক—

ঠাকুরাণী। কাঁয় আরো কান্দা করেছে[৭]! হ' ঠাকুর, তোমার রথখান কনেক থাকেন এইঠে।

ঠাকুর। কিটা আরো কহছিস্[৮] গে ঠাকুরাণী! হিটা অরণ-জোঙ্গলোত্ কাঁয় আরো আসিবে কান্দা করিবা'!

ঠাকুরাণী। কান্দেছে, শুনেন কেনে। থাকেন এইঠে তোমার রথখান। মুই দেখোঁ।

ঠাকুর। হ' হ' বেটী-ছাওয়ার নগদ[৯] ঘাটা[১০] চলা নাই যায়! হি পাখে চাখে, হুপাখে চাখে[১১]। জান্, তাড়াতাড়ি ঘুরি' আসিবেন।

[রথ হাতে ঠাকুরাণী নামিলেক। বাইটোনেরঠে আসিয়া চাখে উয়ায়[১২] কান্দেছে। সেলা বাইটোনক পুছিলেক—

১ চেতনা পাইয়া ২ চারিদিকে ৩ ভিতরে ৪ যখন ৫ তখন ৬ ওইদিক দিয়া ৭ করুণ সুর কাঁদিতেছে, কাঁদিয়া করুণার উদ্রেক করিতেছে ৮ কী আবার কহিতেছিল ৯ সঙ্গে ১০ পথ ১১ এদিকে দেখে, ওদিকে দেখে ১২ ও, বাইটোন।

"আজি কেনে কান্দিস মা তুই
    অরণ-জোঙলের মাঝে রে।"
        "আজি মোর বাবাক খাইছে[১]
            বনের বাঘো রে।"
"আজি নাই খায় বাবাক তোর
    বনের বাঘো রে।
        তোর বাবা গেইছে বাড়ীক নাগিয়া[২] রে।
আজি তোক ভাবোঁ[৩] মা মুই
    জরমকালের বাঞ্জী রে,
        যারে যাসে মা তোক দিসে[৪] বনোবাসো রে।"
"আজি মুই হয়ু[৫] মা জরমকালের বাঞ্জী রে;
    কি হায় রে হায়,
        মুই বোলে বাঞ্জী-ছাওয়ের বেটা রে।
আজি বর দে মা, বর দে,
    বাঞ্জী নাও[৬] মোর ঘুচিয়া দে।"
"মুই না হও তোর বরের অধিকারো[৭] রে।
    আজি পাছোতে আইসেছে[৮]
        চণ্ডী মাওর জিম্মা রে,—
ঔয়ে দিবে[৯] মা তোক ধনো-পুত্রের বরো রে।
    আজি মোর জিম্মাত্ মা তুই
        ভুলিয়াও না দিস পাও রে।
তোক ভাবোঁ মুই জরমকালের বাঞ্জী রে।"

১ খাইছাকে ২ বাড়ীর দিকে, বাড়ীতে। কান্দিতে বাপ, বাবার বিশেষণ ৩ তোকে মনে করি ৪ দিয়াছে ৫ হইয়াছি ৬ নাম ৭ তোকে বর দিবার অধিকার আমার নাই ৮ পিছে আসিতেছে ৯ সেই-ই দিবে।

ওই যে আইসেছে চণ্ডীর ডিঙ্গা রে :
"আজি মুই হনু মা
জরমকালের বাঞ্জী রে ;
কি হায় রে হায়,
মুই বোলে বাঞ্জী-স্যাড়ের বেটা রে।
আজি বর দে মা, বর দে,
বাঞ্জী নাও মোর টুটিয়া দে॥"
"মুই না হও তোর বরের অধিকারো রে।
আজি পাছোতে আইসেছে
পদ্মা মাওর ডিঙ্গা রে,—
তারে দিবে মা তোক ধনো-পুতের বরো রে।
আজি মোর ডিঙ্গাত্ মা তুই
তুলিয়ায় না দিস্ হাতো রে।
তোক স্যাথে মুই জরমকালের বাঞ্জী রে॥"
ওইযে আইসেছে পদ্মা মাওর ডিঙ্গা রে
যায় বাঞ্জী মোর তাক নাগিয়া রে।
"আজি মুই হনু মা
জরমকালের বাঞ্জী রে ;
কি হায় রে হায়,
মুই বোলে বাঞ্জী-স্যাড়ের বেটা রে।
আজি বর দে মা, বর দে,
বাঞ্জী নাও মোর টুটিয়া দে॥"
"সোতোনির[১] ছাওয়াক মা তুই
চখুলাক ভ্যাল্টাইসিদ্[২]।
তারে বাদে মা তুই
জরমের বাঞ্জী হইসিদ্[৩]।

১ সতিনির ২ চোখ দুইটকে উল্টাইয়া দিয়াছিস ৩ হইয়াছিস।

CENTRAL LIBRARY

গুগুনের জাগি[১] মা তুই
ঘরোত্ নাই থুইস।
তারে বাদে মা তুই জরমের বাঞ্জী হইস।
আজি সিনানো করেক মা তুই
সিনানো করেক।
তোক আজি দিম মুই
ধনো-পুতের বরো রে॥"
আজি যায় বাঞ্জী মোর
পড়োশী-মাওর বাড়ী রে:
"আজি তোক বুলোঁ মুই পড়োশী মাও রে
মোক দে মা—
এক মুঠি খইলা আরো ছেঁকা[২] রে॥"
আজি বাঞ্জী-স্থাড়ের বেটী রে,
তোর মাও কি করিয়া থুইসে ধুলা রে?
আজি নাই দিমো হামেরা[৩]
ছেঁকা আর খইলা রে॥"
"আজি আনেক বাঞ্জী তুই
নদীরে ফেপেনা[৪] রে;
ঘষেক বাঞ্জী মোর
মাথা আর গাও রে॥"
আজি নদীরে ফেপেনা রে দিয়া
ঘষে বাঞ্জী মোর মাথা রে।
আজি যায় বাঞ্জী মোর
পদ্মা-মাওর আগে রে॥

১ আগুনের হাঁড়ী, যাহাতে আগুন জ্বালাইয়া রাখা হয় ২ ক্ষার ৩ আমরা ৪ নদীর ফেনা।

আজি ঝোলোঙ্গা[1] ঝাইড়া[2] রে পদ্মা
দিলে আশুব্বাদো[3] রে :
"আজি যা বাঙ্গী মোর
বাড়ীকো নাগিয়া[4] রে ;
তোর বাপ্পা ঘরে বইসা আছে রে ৷"
আশুব্বাদ নইয়া রে বাঙ্গী
বাড়ীক নাগিয়া গেইল্ রে ॥

....

আজি বিয়ানে গেইছেন[5] যাইট মাও মোর
সবিস্কায় আইচ্ছেন[6] ৷
মাথা দেখি ঝিকিমিকি—
ত্যাল কোটে পালো[7] ?
"তেইলানীর বউ-বহুর[8] জনমকালের বাঙ্গী,—
তাক দিসি মাণিক-পুতের বর ৷
তাঁয় দিসে হামাক মাথাত্ চুঁইয়া ত্যালো রে ॥"
আজি বিয়ানে গেইছেন যাইট মা'ও মোর
সবিস্কায় আইচ্ছেন ৷
আজি কোটে পালেন
কোপাল চুঁইয়া সেন্দুরো রে ?
"বাকানীর[9] বউ-বহুর জনমকালের বাঙ্গী,—
তাক দিসি মাণিক-পুতের বর ৷
তাঁয় দিসে হামাক কোপাল চুঁইয়া সেন্দুরো রে ॥"

....

"বাপ্পা হে, তোর নগদ মুই
এক আইত-অজনী[10] গাওয়াইম[11] রে ॥"

১ ঝোলা ২ ঝাড়িয়া ৩ আশীর্বাদ ৪ বাড়ীর দিকে ৫ সকালে গিয়াছেন, গিয়াছে অর্থে ৬ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছেন, আসিয়াছে অর্থে ৭ তেল কোথায় পাইলি ৮ 'বহুর' অর্থই বউ ৷ বউ-বহুর একার্থক ৯ শাঁখাওয়ালার ১০ রজনী ১১ কাটাইব ৷

"বাঙ্গী হে, পাটার[1] মেখলা ভালা[2]
খুলিয়া ফেলাও রে।
পিন্দেক বাঙ্গী তুই আগুনি পাটের শাড়ী রে।
খ'সে ফেলা[3] তুই পিতলের খাড়ু রে।
আজি মায়ে না দেখিলে বাঙ্গী
গালি না দিবে।
বাবায় না দেখিলে বাঙ্গী
ভাঙ্গো না দিবে[4]।
গায়ে হামার[5] দাগা ভালা ভরে রে।
যা বাঙ্গী, তুই ঢেঁকি ঘরের নাইগা রে।"
"বাঙ্গা হে, এক আইত্ মুই অগ্নী ভালা
গাওয়াইম রে।"

....

আজি আগ আইতো[6] গেল
পান-তাংকু খাইতে রে।
আজি পাছা আইতো গেল
অং-উল্লাস করিতে রে।
বাঙ্গীর গর্ভে মোর
নবাই-কুশাই হইল রে।

....

আজি যায় বাঙ্গা ছিরিকোলার[7] বাজারে—
আজি বাঙ্গী-বহুৰ তোর হইসে[8] গর্ভ ভারি রে।
বাঙ্গী মোর সাধ ভালা খাবে রে।
আজি হাটো না ঘসো-ঘসো[9] বাজারের অবশেষো
কিনে বাঙ্গা মোর ডাবা-নারিকল রে।

১ পাটের ২ কথার মা ত্রা, অর্থ নাই ৩ খসাইয়া ফেল্ ৪ প্রহার করিবে ৫ আমার
৬ প্রথম রাত্রি ৭ শ্রীগোলা। বহু গানে বহুবার এই নামটি উল্লিখিত হইয়াছে ৮ হইয়াছে
৯ অর্থহীন।

আরো কিনে ষোলোটিয়া কলা রে[১],
আরো কিনে বাঙ্গা ঝোলোঙ্গা-জামুরি[২] রে,
আরো কিনে বাঙ্গা মোর চহলা পুঁটি[৩] মাছ—
আরো কিনে ঢ্যামেনা চুকা শাক[৪] রে ।

....

"নে বাঙ্গী, তোরে হাউসের খাজা[৫] রে ;
আজি বুঝি মুই বুড়া মাওর মনো রে ।"
"মুই যাছো মাও পড়োশীর বাড়ী রে—
মোর ভাত মাও তুই শিকিয়াত্ তুলি' থুইস্কো[৬] রে ।"

....

"আজি বাঙ্গী মাইয়াক মোর নাই দিল সাদের খাজা রে :
আজি বুড়া মাও মোর খায়া[৭] ভালা ফেলাইল্ রে ।
মোর বাঙ্গীর নাই হয় সাদের খাজা রে ।
মোর বাঙ্গীর নাই হয় হাউসের খাজা রে ।"

....

আজি এহো[৮] সাদো খায়া বাঙ্গীর
নাই পুরিল্ আশ ;—
হাটুয়াত্[৯] ভাঙ্গিয়া খায় নারিকলের শাঁস ।
যুগীর ঘরের মুছিরে মাটি খাবার বড়ো আশ ।
যুগীর ঘরের মুছিরে বাঙ্গী খায় গাসো-গাস[১০] ।
ছুইয়ো ঠোঁটো নোলো-ভোলো[১১]
ধুল্লা[১২] উড়ায় মুখে ।

....

আজি-আজি কালি-কালি দশোমাসো হইল ।
আজি মোর বাঙ্গীর উঠিল্ গরল বিষো[১৩] ।

১ ষোলো ছড়ার কলার কাঁদি অর্থাৎ অনেক কলা ২ বড়ো বড়ো টক লেবু । 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'জোলঙ্গ' শব্দ পাওয়া গিয়াছে ৩ ছোটো ছোটো পুঁটি ৪ বড়ো বড়ো পাতার টক শাক ৫ সাধের খাবার ৬ শিকার উপর তুলিয়া রাখিস ৭ খাইয়া ৮ এই ৯ হাঁটুর উপরে ১০ গ্রাসে গ্রাসে ১১ অর্থহীন ১২ ধুলা ১৩ প্রচণ্ড ব্যথা ।

"আজি তোকো না বুলোঁ[১] পড়শীর মাও রে—
মোর বান্ধীর উঠিসে[২] গরল বিষো রে ॥"
"মুই না যাইম বা তোর বান্ধীর বউয়ের ঘরে রে।
মরুক বান্ধী তোর দুয়ারে হাকর[৩] দিয়া রে ॥"
আজি হাড়-হড়ি ভাইঙ্গা রে
নবাই-কুশাই ভূমিত্ ভালা পইল্ রে—
বান্ধার ঘরে হইল্ নবাই-কুশাই রে।
আজি বান্ধা রাজার টুটিল্ বান্ধা নাও রে ॥
ভূমিতে পইড়া নবকুশা কান্দে কহা-কহা রে।
যা বান্ধা তুই ডাইয়ানীর[৪] ঘরে রে ॥

....

যায় বান্ধা মোর ডাইয়ানীর ঘরে রে।
"ডাইয়ানী, ডাইয়ানী" বুইলা রে
বান্ধা দিলে পাক্ক ডাক রে ॥
ঘরে থাইকা ডাইয়ানী বাহেরে[৫] দিলে আও রে:
"মুই না যাইম বান্ধা রাজার বাড়ী রে।
মুই গেনু[৬] একমুঠ ভিক্ষা না দেয় রে ॥
বান্ধা রাজার বাড়ী গেনু, ঝালকাইঞাত্ বসিনু[৭],—
একমুঠ ভিক্ষা না দেয় রে ॥"
"আজি যা ডাইয়ানী, নবাই-কুশাইর
নাড়ী ভেদন করো রে ॥"
"মুই না যাও বান্ধা রাজার বাড়ী রে—
বে-পরিধন[৮] ভালা আছো[৯] রে ॥"

১ তোকে বলি ২ উঠিয়াছে ৩ হুড়ার ৪ ডাইনানীর ৫ বাহিরে ৬ গিয়াছি, গিয়াছিলাম ৭ ঘরের বেড়ার নিকট, কোণে বসিয়াছি ৮ বস্ত্র-বিহীন অবস্থার ৯ আছি।

CENTRAL LIBRARY

আজি মাথারে পাগুড়ি বান্ধা
        ডাইয়ানীক দেয় গুরে :
তাঁহো ডাইয়ানী যাউকো হামার বাড়ী[১] রে।
আজি যায় ডাইয়ানী বান্ধা রাজার বাড়ী রে।
ধরিয়া নাড়ীর গোটা, বড়ো বাঁশার ছুঁচকোনি[২] দিয়া
করে ডাইয়ানী নাড়ী ছেদন রে॥

....

আজি-কালি করি' নও দিনো[৩] হইল।
নবাই-কুশাইর মোর নাড়ী ভালা পইল॥
যা বান্ধা তুই নাউয়ারো বাড়ী রে।
যায় বান্ধা মোর ধনী নাউয়ার বাড়ী রে॥
"নাউয়া, নাউয়া" বইলা রে বান্ধা
        দিলেক পাক্কো ডাকো রে।
ঘরে থাইকা নাউয়া বাহেরে দিলেক আও রে :
"কেনে বান্ধা ডাকানো[৪] আমাকে রে।"
আমারে ঘরে নবাই-কুশাই হইসে[৫] রে।
তারে ভালা কামান করিবা' নাগে রে॥"

নাপিত॥ হে বা রে বান্ধা, তোমার ঘরে মুই কামান করিবা' না যাও।

বান্ধা॥ কিতায় ?

নাপিত॥ তমার ঘর মুই একদিনা গেইসুঁ, তমার মাইয়াটা[৬] মোক বসিবার নাই দেয়[৭]।

বান্ধা॥ আজি চলেন। আজি তমাক সনার চাইলন বাতি[৮] দিম, এক গাঁ মাটি দিম[৯]।

সনারে চাইলন বাতি, এক গাঁ-র মাটি রে।
নাপিতোক তাঁহো ধরিয়া ভালা আইসে রে।
নবাই-কুশাইর কামান ভালা করে রে॥

....

১ তবুও দাইয়ানী আমার বাড়ী যাউক ২ চাঁচড়ি ৩ নয় দিন ৪ ডাকেন ৫ হই যাছে ৬ বউটা ৭ আমাকে বসিতেই দেয় নাই ৮ চালুন বাতি, বরণডালা ৯ একটি গ্রাম দিব।

এক মাসো, দুই মাসো, চাইর মাসো হইল রে ।
নবাই-কুশাই মোর উবুড়ি[1] ভালা দেয় ওরে ॥
এক মাসো, দুই মাসো, ছয়ো মাসো হইল রে ।
নবাই-কুশাই মোর বসিনা ভালা হইল[2] রে ॥
এক মাসো, দুই মাসো, নয়ো মাসো হইল রে ।
নবাই-কুশাইর মোর অন্‌পারাশন[3] করে রে ॥
যা বাঙ্গা তুই ছিরিকোলার বাজারে রে ।
আনেক বাঙ্গা তুই বড়ো ঠাকুরের পাঞ্জি রে ॥

বাঙ্গা । ঠাকুর, ঠাকুর, বাড়ীত্‌ আছিত্‌[4], না নাই ?

ঠাকুর । কাঁয় রে, কিতায় ?

বাঙ্গা । মুই-হে[5] । মোর নবাই-কুশাইর বা অন্‌পারাশন করিম । পাঞ্জিখান দেখ দি' কণেক[6] ।

ঠাকুর । ভাদর মাসের উন্টা মঙ্গলবারে তোর নবাই-কুশাইর অন্‌পারাশন হবা' পারিবে ।

আজি সোনারে নও বুড়ি কড়ি আঞ্চলে বান্দে ।
যায় বাঙ্গা মোর ছিরিকোলার বাজারে ॥
চৌহাটা বেসেয়া[7], খরচ করিয়া
আইসে বাঙ্গা মোর বাড়ীক নাগিয়া রে ॥
যায় বাঙ্গা মোর নাউয়া-অধিকারীর বাড়ী রে ।
আজি যায় বাঙ্গা মোর দশো ভাইয়ার বাড়ী রে ॥
মোর নবাই-কুশাইর আজি অন্‌পারাশন হচে[8] রে ।
নবাই-কুশাইর আজি অন্‌পারাশন হইল রে ॥

....

একো বৎসর, দুইয়ো বৎসর, তিনো বৎসর হইল রে ।
নবাই-কুশাই ভালা ইস্কুল যাবে রে ॥

১ উপুড় ২ বসিবার উপযুক্ত হইল ৩ অন্নপ্রাশন ৪ আছিস ৫ আমিই ৬ পঞ্জিকাটা একটু দেখ দিকি ৭ হাটের চারিদিকে বেসাতি করিয়া, অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া ৮ হইতেছে ।

একো বৎসর, ছুইয়ো বৎসর, তিনো বৎসর হইল রে।
মোর নবাই-কুশাই ভালা ইস্কুল যায় রে॥
একো বৎসর, ছুইয়ো বৎসর, বারো বৎসর হইল রে।
মোর নবাই-কুশাই ভালা ইস্কুল পড়ে রে॥
একো বৎসর, ছুইয়ো বৎসর, তেরো বৎসর হইল রে।
মোর নবাই-কুশাইর ভালা বিভাও দিমো রে॥
আজি যা বাপ্পা তুই, দেখেক পাত্রী দেখেক রে।
আজি যায় বাপ্পা মোর গপ্‌স রাজার বাড়ী রে॥
"আজ্ঞা আজ্ঞা" বইলা রে বাপ্পা দিলেক পাক ডাকো।
ঘরে থাইকা গপ্‌স রাজা বাহেরে দিলে আও রে॥
"কেনে রাজা ডাকানো আমাকে রে॥"
"তোমার ঘরের শিশু-বালক কইন্যা রে
হামরা বাবা জুড়িবার চাইয়ো রে[১]॥"
আজি গপ্‌স রাজার বাড়ী কাটে গুয়া-পানো রে।
নর নোকের গুয়া রে বুঝে তিনো দিনো রে।
স্বাব ন্নোকের গুয়া রে বুঝে আড়াই দিনো রে[২]॥
দশো গেণ্ডা গুয়া বাপ্পা রে দশোক দিলে খাবার।
পাঁচো গেণ্ডা গুয়া বাপ্পা রে নারদক দিলে খাবার॥
আজি গেইল্ বাপ্পা মোর দশো ভাইয়ার বাড়ী রে।
আজি গেইল্ বাপ্পা মোর পাঁচো গিরস্তেরে বাড়ী রে॥
তোক বুলো মুই দশো ভাইয়া রে।
আজি নবাই-কুশাইর মোর দরগুয়া[৩] রে॥
আজি নব-কুশার মোর হইল্ দরগুয়া রে।
নবাই-কুশাইর মোর বিভার খরচ করে রে॥

১ সম্বন্ধ করিতে চাই ২ বিবাহ-সম্বন্ধ পাকাপাকি করিবার জন্য পাত্র-পাত্রী দুই পক্ষ পান-সুপারি ইত্যাদি অনুষ্ঠানিকভাবে আদান-প্রদান করিয়া থাকে। পান-সুপারি আদান-প্রদানের তিন দিনের মধ্যে উভয় পরিবারে যদি কোন অলক্ষণ দেখা না দেয়, তবেই সেই বিবাহে দেবতার মত আছে বলিয়া মনে করা হয় ৩ যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পান-সুপারি আদান-প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহাকে 'দরগুয়া' বলে।

আজি সোনারে নও বুড়ি কড়ি আঞ্চলে বান্দে রে।
যায় বাপ্পা মোর তিরিকোল্লার বাজারে॥
আজি হাটো না ঘসো-ঘসো, বাজারো অবশেষো।
আজি কিনে বাপ্পা মোর ঘটো-গোছা[১] রে॥
আরো কিনে বাপ্পা সন্দা আর পহরা[২] রে।
আরো কিনে বাপ্পা সোনারে চাইলন বাতি রে॥
আরো কিনে বাপ্পা আগুনি-পাটের শাড়ী রে।
আরো কিনে বাপ্পা শাংকা আর সেন্দুর রে॥
আরো কিনে বাপ্পা এনা[৩] দইয়ো দুধো রে॥

....

আজি যায় বাপ্পা মোর নাউয়া বামনের বাড়ী।
আজি যায় বাপ্পা মোর বাইজ-বাজুনার বাড়ী।
ডাক দেয় "মোর বাইজুনা বাইজুনা" বইলা রে।
ঘরে না থাইকা বাজুন্দার বাহেরে দিলেক আও রে।
"কেনে বাপ্পা ডাকানো হামাকে রে॥"
বসিবারে দিলেক উত্তম সিংহাসন।
কর্পূর-তামাকো দিয়া জিজ্ঞাসে বচন॥
"হামার ঘরে নবাই-কুশাইর বিয়াও রে।
তারে তানে বাইজ-ভাণ্ড নাগে রে॥"
আজি ডাক দেয় "মোর বামুন ঠাকুর" বইলা রে।
আজি ঘরে থাইকা বামুন বাহেরে দিলেক আও রে।
"কেনে বাপ্প', ডাকানো হামাকে রে।"
"হামার ঘরে আছে রে নব-কুশা পুত্র রে।
তারে বাবা বিভাও পড়েবার[৪] নাগে রে॥"
আজি যায় বাপ্পা মোর বই-বৈরাতীর[৫] বাড়ী রে।

১ ঘট প্রদীপ ইত্যাদি   ২ সিলা ও অন্যান্য বেনেতি দ্রব্য।   ৩ অর্থহীন, কথার মাত্রা
৪ বিবাহের মন্ত্র পড়াইবার, পড়াইতে   ৫ স্ত্রী-বরযাত্রী, এয়ো।

হামার ঘরে আছে বাবা নব-কুশা পুত্র রে।
তারে ভালা নাগে বই-বৈরাতী রে॥

....

যায় বই-বৈরাতী বাঙ্কা আজার বাড়ী রে।
সোনারে চাইলন বাতি বৈরাতী সাজায় রে॥
যায় নবকুশার হাউসের বিভায় সাইজা রে॥
আজি এক গুয়া নিছাইতে[১], দুই গুয়া নিছাইতে
নব-কুশায় ভালা ঢলিয়ায় পইল্ রে॥
"কহো বাঙ্গী তোর মনের কাথা রে।
আজি নিসিত্ নিকিন[২] কোন স্থাবের বরো রে॥"
"আজি বাসনা পূরিসে[৩], ফলো না ধরিসে—
নাই স্থাও মুই কুনো স্থাবের বরো রে॥"
আজি নব-কুশো মোর ঢলিয়ায় ভালা পইল্ রে।
আজি বিষোহরি আইসেছে[৪] পড়োশীর বাড়ীত্ রে॥
"বাঙ্কার বাড়ীত্ মা কিসের বাইজন পড়ে রে।"
"আজি বাঙ্কা রাজার হইসে নবাই-কুশাই পুত্র রে।
তারে ভালা বিভাও পইস্সে[৫] রে॥"
কান্দে বাঙ্গী মোর এনা হরিষ মনে[৬] রে।
নব-কুশো মোর ঢলিয়ায় কেনে পইল্ রে॥
"আগুনের পাইলা[৭] মা তুই ঘরত্ না থুইস।
সে বাদে মা তুই জরমের বাঙ্গী হইস্॥
আজি পড়োশীর ছোয়াক মা নাই নিসিত্ কোলা[৮] রে।
সে বাদে মা তুই জরমের বাঙ্গী হইসিদ্[৯] রে॥
আজি মুই দিমু বাঙ্গী-স্থাড়ের বেটাক পুত্র-বর রে।
মোক পূজি'র চাইসে[১০] জোড়ো-মন্দির ঘরে রে॥

১ পান-সুপারি-হলুদ ইত্যাদি দিয়া বরকে বরণ করাকে 'নিছানো' বলে ২ নিয়াছিস নাকি
৩ বাসনা পুরিয়াছে ৪ আসিয়াছে ৫ বিবাহ হইতেছে ৬ বিষাদ মনে ৭ পাতিল, হাঁড়ী
৮ কোলে লইস নাই ৯ জন্মের বন্ধ্যা হইয়াছিস ১০ আমাকে পূজা করিতে চাহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

তারে বাদে মা নবাই ঢলিয়া পড়ে রে।
তারে বাদে মা কুশাই ঢলিয়া পড়ে রে॥"
আজি দৌড় দিয়া আইসে পড়োশী-মাও রে।
"তুই নিসিত্ মা পদ্মা-মাওর বরো রে॥
নিসিত্ নিকিন মা কুনো স্থাবের বরো রে।"
"আজি বাসনা পুরিসে ফলো না ধরিসে—
নাই স্থাও মুই কুনো স্থাবের বরো রে॥"
"তুই নিসিত্ মা বিষোহরির বরো রে।
উমাক পুজি'র চাইসিত্[1] জোড়ো-মন্দির ঘরে রে॥
সেই বাদে মা নবাই ঢলিয়া পড়ে রে।
সেই বাদে মা কুশাই ঢলিয়া পড়ে রে॥"
আজি যায় বাঞ্চী মোর কলার আড়ায়[2] ভিত্তি[3] রে।
আনলেক[4] বাঞ্চী মোর কাকা আরো কেলা[5] রে।
আরো যায় বাঞ্চী ভাণ্ডারো না ঘরে রে।
আজি ভাণ্ডারো ঘরের আলোয়া চাউল[6]।
পদ্মার পূজা বসায় রে॥
করে বাঞ্চী মোর পদ্মা-মাওর পূজা রে॥
... ...
হে নবাই-কুশাই মোর উঠিল্ ভালা রে।
হে নবাই-কুশাই মোর উঠিয়া কাড়ে আও রে॥
আজি নবা-কুশা মোর বিভা ভালা বইসে রে॥
আজি পাঁচ-গোছী মায়েয়ার[7] তলে
সনারে চাইলন জলে;—
বাইজ্য-ভাও সুমঙ্গল—
এত কেনে গণ্ডগোল॥

১ উঁহাকে পূজা করিতে চাহিয়াছিস ২ যেখানে কলা ইত্যাদি রাখা ছিল ৩ সেই দিকে, তাহার প্রতি ৪ আনিল ৫ কাঁচা কলা। 'আরো' এমনিই ব্যবহৃত হইয়াছে ৬ আতপ চাল ৭ বিবাহ-মণ্ডপ।

CENTRAL LIBRARY

আজি বান্ধা আজার নব-কুশার মোর
বিভাও রে—
নব-কুশা মোর বিভাও ভালা করে রে ॥
আজি ঘুইরা-ফিরা ছিটাও ঘটের জল—
বাইজ্য-ভাও সুমঙ্গল—
এত কেনে গণ্ডগোল ॥
আজি আইচ্চেন[১] মিস্তর[২] কি কারণ—
কি তোমার বিভার নামো শুনি',
উত্তম গোঙ্গার জল আনি'—
ঘুইরা-ফিরা করো নমস্কারো রে ॥
ওকি ও মোর মরি রে,
ওরে মিস্তর,
মিস্তর ধইতে[৩] নাগে কি :
কন্না দে, মুই যাওঁ বাড়ী—
দেওয়ান-গঞ্জের[৪] হাট আজি ।
তুই রে মিস্তর জল-ভোদা[৫] :
ধুতি-চাদর এক টাকা—
মিস্তিরাণীর বাদে একটা নালের ফোতা[৬] ॥

॥ সমাপ্তি সঙ্গীত ॥

আজি ঘুরো কি যাইট যাও
ফিরো কি যাইট যাও
জোড়-মন্দির ঘরে ।
কাজলকাটা মন্দির ঘর মোর
গোছা[৭] ঝিল্-মিল্ করে ॥

১ আসিয়াছেন ২ মিস্তর ৩ ধরিতে, বরণ করিতে ৪ স্থান বিশেষ ৫ বোকা
৬ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্র ৭ প্রদীপ ।

আজি যেই-না বরো দিসিত্[1] পদ্মা-মাও তুই
গোয়াল-নন্দন ঘরে—
আজি সেই-না বরো দেকো পদ্মা-মাও তুই
মারেয়ার ঘরে[2] ॥
আজি গোয়ালিতে গোরু বাড়ুক মোর
ভাণ্ডারতে ধন।
আজি কোলারে যাদুয়া বাড়ুক মা মোর
স্বাব নিরঞ্জন ॥

১ দিয়াছিস ২ যাহার গৃহে পূজা হইতেছে, তাহাকে 'মারেয়া' বলে।

শ্রীমতী জ্ঞাদেবী রায়, শ্রীমতী সুখমণি রায়, শ্রীমতী পঞ্চমী রায় (পূর্বমাণ্ডরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)—এর নিকট হইতে ৯.১৯.১৯৫৯ সনে সংগৃহীত।

CENTRAL LIBRARY

অষ্টম অধ্যায়

॥ বিচিত্র ॥

॥ নটুয়া ॥

॥ কুষ্ঠবান্ খণ্ড ॥

। ৪৩০ ।

কালী সাজে, দেবী সাজে,—
এ পাক্ক বহিনি সাজে,
উধবো[১]-মাধবো সাজে—
হমরা দুইয়ো ভাই ॥

... ...

সরিষার ত্যালত্ দিয়া রাম
জুড়ি[১] গেইল্ বাতি[২]।
সইন্ধ্যা করিতে আইলে এহো সইন্ধ্যা বাতি ॥

... ...

কুঞ্জ না বান্দিয়া কুঞ্জের দেখে উপ[৩]।
কুঞ্জতে নিখিয়া দিলে চান্দ আর সুরুজ ॥

... ...

সোনারে আরুনী আধে গে, উপারে ঝাড়ুনী[৪]
উঠো আধে[৫], বান্ধো কেশ ;
বাহড়ো আঙিনাখান গে[৬] ॥

... ...

অলঙ্গা-দলঙ্গা[৭] হে, আরো আলোক নতা।
মধু না মালক্ক ফুলো হে আনি' দে ললিতা[৮] ॥

... ...

১ উদ্ধব ২ বাতি জ্বালিয়া গেল ৩ রূপ ৩ ঝাঁটা। 'আরুনী'র কোনো অর্থ নাই ৫ রাধে
৬ আঙিনাটি ঝাঁট দাও ৭ ফুলের নাম বিশেষ। সুস্পষ্ট অর্থ নাই ৮ ললিতা।

ছুয়াবের আগত্ কুহলি[১] বোলে রে ময়না—
মুই তোরে সঙ্গে যাইম রে দরিয়া ॥

... ...

ছবা গেইল্ শিতানখান[২],
উড়ি' গেইল্ ধোমা।
ওরে এলাও নাই আইসে
ওহো রে মোর গুভাগোনী রে ॥

... ...

ঘোটোতে[৩] ঢালিয়া দিলে পরতু
বাসি গাঙ্গের জল।
উড়ি' যায় সারি-সুয়া—
পড়িয়া অহিল্ সাধের পালং[৪] ॥

॥ নটুয়ার আরো তিনটি বিচ্ছিন্ন স্তবক ॥

ফলো মইধ্যে গুয়া রে পাতারি মইধ্যে[৫] পান ॥
তিরি মইধ্যে[৬] আধে গো পুরুষো মইধ্যে শ্যাম ॥

... ...

হে কালো, কালো গাইয়[৭], কালো হে বাছুর।
কালো গাইয় ছেঁকে[৮] হে আধে কিস্কো ॥

... ...

পিরিতি পাগেলা হয়া ছাড়িনু কলার হালুয়া[৯]।
তোরে বাদে কান্দু,[১০] ওহোরে বন্দু,
বিছিনাত্ থাকিয়া[১১]—
ওহো রে বন্ধুয়া ॥

১ কোকিল ২ বালিশটি পুড়িয়া গেল ৩ ঘটে ৪ কৃষ্ণ আসিল না, রাধিকার শূন্য শয্যা পড়িয়া রহিল। গানটি একটি পুরা পালার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্তবক ৫ পাতার মধ্যে ৬ স্ত্রী লোকের মধ্যে ৭ গাই ৮ গাই দোহন করে ৯ কোলের হালুয়া,—প্রাণের স্বামী ১০ তোরই জন্যে কাঁদি ১১ বিছানায় শুইয়া।

CENTRAL LIBRARY

। ৪৩১ ।

ওহো রে দতরা,
আজি হাতে[১] ভাসিনু রে তোক নিয়া।
গালার স্বরে, হাতের রে টিপে[২]
মন-পাগেলার মন ভুলাইল্ রে দতরা ;
আজি হাতে ভাসিনু রে তোক নিয়া॥
ওহো রে দতরা,
আজি হাতে তুই-হে[৩] মোর কলার রে মাইয়া[৪]॥

১ হইতে ২ হাত দিয়া দোতারা বাজাইতে হয়, তাহার উল্লেখ করা হইতেছে ৩ তুই-ই ৪ কোলের অর্থাৎ আদরের বউ।

গানটির রূপান্তর মিলিয়াছে :

ও ভাবের দতরা,
তুই-হে করালো মোক
জনমের হাতেরা ১॥
যেই দিন দতরা তোক নিনু হাতে—
নিষেদো করে মোর পাড়ার লোকে।
নিষেদো করে মোর দয়ার বাপ-ভাই॥ ইত্যাদি।

১ উদাসী।

গানটি এমন কোন গায়ক নাই যিনি ইহা জানেন না। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ইহার বিচিত্র রূপ পাইয়াছি। কয়েকটি এই :

দতরায় কইরে ১ নড়া-চড়া ২,
দতরায় কইরে বাড়ী-ছাড়া।
দতরায় কইয়ে মোক শখের বাউদিয়া ৩॥
যদি রে দতরা আছিস রে মান
সনা ৪ দিয়া তোর বান্দাইম রে কান।
উপা ৫ দিয়া বান্দাইম দুই রে নয়ান॥

১ করিল ২ মনকে আন্দোলিত ৩ উদাসী ৪ সোনা ৫ রূপা।

CENTRAL LIBRARY

। ৪৩২ ।

ও উড়ানি-জাহাত[1] রে,
তুই মোক অহিবা'[2] না দিস ঘরে ॥
আন্দন-ঘরত[3] ভাই
মোর আন্দনীটা[4] ভাত চড়াইসে[5] ;
ঢেন্-ঢেন্-ভেন্-ভেন্ করিয়া
জাহাত আসিবা' ধরিচে[6] ॥
সেলা[7] উয়ায়[8] কহচে[9] তায়[10] :
কুন্তি গেলো[11] হায় ;
হিতি কণেক[12] আয়,—
বোমায় ফেলায়[13] কি ছোয়ায়[14] চম্‌কায় ॥

১ উড়োজাহাজ ২ রহিতে ৩ রান্নাঘরে ৪ রাঁধুনীটা, স্ত্রী ৫ চড়াইয়াছে ৬ আসিতে ধরিয়াছে, আসিতেছে ৭ তখন ৮ সে ৯ কহিতেছে ১০ তাহাকে, স্ত্রীকে ১১ কোথায় গেলি ১২ এদিকে একটু ১৩ বোমাই ফেলে ১৪ ছেলেটাই।

৪৩১-সংখ্যক গানের রূপান্তর :

ছেচেনাই খুটা ১ কাটিয়া রে দতরা,
বানাসু তোক বাইজন শিখিবার আশে।
বাইজন শিখিনু ওহো রে দতরা,
মাইয়ায় ২ ছাড়িলে মোকে ॥
তোর দতরার এমন রে মরহা ৩
ছাড়িলে না যায় রে ছাড়া।
তুই দতরা করালো মোক
জনমের বাউদিয়া ॥...ইত্যাদি।

১ ছাতিম গাছের কাঠ ২ বউ ৩ মায়া।

আর একটি রূপান্তর :

আরে ও মোর কাঁঠোল খুটার দতরা,
তুই-হে সাজালো মোক সাদের বাউদিয়া ॥
...গান গান করি' সর্বনাশ
তবু না মিটে মনের আশ।
কুল কুলেতে জনুম নিয়া
হইনু গাউনিয়ার ১।
ও মোর পাজীর মন,
ছাড়ি'র না পারাইম ২ মুই এই গানের মরহা ॥

১ গায়ক ২ ছাড়িতে পারিব না।

। ৪৩৩ ।

বিধি রে, তুই-হে[১] করালো[২] মোরে
এইমন[৩] দোশা[৪] রে ।
যেই দিন বিধি তুই মোর হোলো রে বাম—
সেই দিন ছাড়িনু আশের গ্রাম রে ॥
বিধি রে, তুই করিলো মোক জনমের[৫] দুঃখিয়া রে ।
জমি ছাড়িনু, বাড়ী ছাড়িনু,—
বিধি রে, চখুর জল মোর পড়ে বয়হা[৬] রে ॥
ও বিধি রে,
বাড়ীর পাছত্ ছাড়নু
কুরুম নদীর ময়হা[৭] রে ।
বিধি রে, এতয়[৮] দুঃখ আজি দিলো[৯] মোর কোপালে রে ॥

। ৪৩৪ ।

জোলপইগুড়িত্ গে ওগে বান্টা[১০] হয়য়া[১১]
অং-বেরঙের মান্ষি গে
কতয় খাচে হাওয়া[১২] ॥
না-বুঝে[১৩] দুফোর-তাফোর[১৪]
কত মান্ষি থাকিয়া আছে[১৫]
বিছিয়া কাপোড়[১৬] ॥
দুঃখের কাথা গে
কহিম কার আগে[১৭] ॥

১ তুই-ই ২ করিলি ৩ এই রকম ৪ দশা ৫ জনমের ৬ বহিয়া ৭ মায়া ৮ এতোই ৯ দিলি ১০ বাঁধটি। সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর উপর দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে ১১ হইয়া ১২ কতোই হাওয়া খাইতেছে ১৩ দুপুরে ১৪ দুপুর। 'তাফোর' সহচর শব্দ ১৫ শুইয়া আছে ১৬ কাপড় বিছাইয়া ১৭ সম্মুখে।

ওগে, বন্ধু আর বন্ধুয়ানী[১]
হাত ধরিয়া বেড়াছে।
ওইলা[২] দেখিয়া সোদায়[৩] মন মোর
শর-শরাছে[৪]।
মোর হালুয়া[৫] আসিল, হয়[৬]
হাওয়া খাবা' গেনো হয়[৭]।
অং-বেরঙের আমোদ-ফুর্ত্তি কতয় করহু হয়।

। ৪৩৫ ।

ভোটপাটিতে[৮] বসিসে[৯] মিশিন্[১০]
চলো দেখিবা'[১১] যাই।
শুনো মোরে[১২] ওগে বাই[১৩]!
ইঙ্গিরাজের[১৪] বুদ্ধি ভারি
আনিসে[১৫] ধান-ভুকা কল[১৬]।
এক দিক দি'[১৭] অঠেছে ধুঁয়া[১৮]
এক দিক দি' পড়েছে জল।
শুনো মোরে ওগে বাই!
ইঙ্গিরাজের বুদ্ধি ভারি
আনিসে ধান-ভুকা কল।
এক দিক দি' পড়েছে তুষি
এক দিক দি' পড়েছে চাউল।
শুনো মোরে ওগে বাই!
খাজেনার তালে ধনীগিলা
আরো বেচাছে ধান।

১ প্রেমিক ও প্রেমিকা ২ ওই সমস্ত ৩ সব সময়েই, সদাই ৪ শিরশির করিতেছে ৫ স্বামীকে ডাকিবার সাধারণ সম্বোধন ৬ যদি আসিত ৭ হাওয়া খাইতে যাইতাম ৮ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত একটি স্থান ৯ বসিয়াছে, স্থাপিত হইয়াছে ১০ মেশিন, চাউলের কল। ১৯৩০ সনে ভোটপাটিতে যখন চাউলের কল স্থাপিত হয়, তখন সাধারণ মানুষের মনে ও জীবনে তাহা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, গানখানি তাহারই বিবরণ ১১ দেখিতে ১২ আমার ১৩ দিদি ১৪ ইংরাজের ১৫ আনিয়াছে ১৬ ধান ভানাকে 'ধানভুকা' বলে। যে কল দিয়া ধান ভানা হয় ১৭ দিয়া ১৮ ধোঁয়া উঠিতেছে।

আপনার গাড়ী গরুই
মিশিনত্ নিগিয়া আছে ধান[1] ॥
শুনো মোরে ওগে বাই !
ধান ব্যাচেয়া[2] ধনীগিলা
হইসে[3] গাঁটোক্-টোক্[4] ।
কতো ধনী চাউল কিনেছে
আজার হাটত্ ॥
শুনো মোরে ওগে বাই !
ধানের দর হইল্ আট আনা
চাউল চাইর পাইসা ।
ওই বাদে ভুকাতিগিলা[5]
হারাইসে[6] দিশা ॥
শুনো মোর মোরে ওগে বাই !
বড়ো নোকের বাড়ী যায়া দেখোঁ
খালি গালায় সার ।
ধান না পায়া জা'গার আড়ী[7]
ধরেছে ভাতার[8] ॥
শুনো মোরে ওগে বাই !
বড়ো নোকের বাড়ী যায়া
গুয়-পান খাই ।
চট্ করিয়া বিদায় কর
অন্ন বাড়ী যাই ॥
শুনো মোরে ওগে বাই !
আর একটা কাথা মাগে
কইতে নাগে ভয় ।
অচনা[9] করিয়া গান
সবন আড়ী[10] গায় ॥
শুনো মোরে ওগে বাই !

১ আপনার গরু-গাড়ীতে করিয়া ধান লইয়া কলে দিতেছে, অল্প মূল্যে ভানিয়া দিবার জন্য ২ বেচিয়া ৩ হইয়াছে ৪ অহঙ্কারী ৫ যাহারা ধান ভানে ৬ হারাইয়াছে ৭ অঞ্চলের সমস্ত বিধবাগণ। তাহারা অন্যের নিকট হইতে ধান আনিয়া নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধান ভানিয়া দিত ৮ ভানিবার ধান না পাইয়া পুনরায় তাহারা স্বামী গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল ৯ রচনা ১০ সবনেশ্বরী নামক বিধবা। গানটি সবনেশ্বরী রায় (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) -কর্তৃক রচিত।

CENTRAL LIBRARY

পরিশিষ্ট : ক

॥ ঋণাঞ্জলি ॥

যাঁহাদের নিকট হইতে এই গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম-ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। গানের সংখ্যাও উল্লিখিত হইল। এই সকল মানুষেরা নিঃস্বার্থভাবে গানগুলি আমাকে গাহিয়া শুনাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি ঋণ স্বীকার করিতেছি।

১. শ্রীগঙ্গামোহন তন্ত্র (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ১, সং ১২৮, সং ৩১৭ (বামুনতির উদ্বেগ অংশ), ৩১৮ক—৩১৯, সং ৩৭৮ঘ ॥

২. শ্রীভগীরথ রায় (ধাপগঞ্জ, বড়ুয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৪, সং ৩৫২ ॥

৩. শ্রীমতী পুন্নী দেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি : সং ৫, সং ৬, (কথান্তর), সং ৭, সং ৮, সং ৯ (মূল গান ও কথান্তর), সং ১০—১২, সং ২১, সং ৩৬, সং ৪৭ক, সং ৬৫, সং ৬৯, সং ৩৫০গ ॥

৪. শ্রীমতী রাঙা দাসী (খ্যানপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৬, ৬খ (অতিরিক্ত কথা ও কথান্তর), সং ১৪, সং ২৬—২৭, সং ৩১গ, সং ৩৫, সং ৪১, সং ৪৭, সং ৪৮, সং ৫৮, সং ৮১ক, সং ৮২, সং ৮২ক, সং ৮৬ক, সং ৮৯, সং ১৮৭খ, সং ২১৬, সং ২১৯, সং ২৪৬-২৪৮, সং ২৬৬, সং ২৮০, সং ৩৫৬, সং ৪৩১ (কথান্তর) ॥

৫. শ্রীগুরুদাস রায় (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৬ক, সং ১৩৯ক ॥

৬. শ্রীমতী অবনীবালা রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬ক, (অতিরিক্ত কথা), ৬খ, সং ১৩, সং ১৫—১৮, সং ২০, সং ২৮, সং ৩১, সং ৩৪ সং ২৫৩, সং ২৮১, সং ২৯১—২৯২ ॥

৭. শ্রীলক্ষ্মীধর রায় (গাবুরার মুখ, প্রধানপাড়া, হলদিবাড়ী, কোচবিহার) : সং ১৯, সং ৯২, সং ৩৩৯ (কথান্তর), সং ৩৪৪, সং ৪০৭, সং ৪১৭॥

CENTRAL LIBRARY

৮. শ্রীবুধমোহন বসাক (খন্নার খাল, ভোটপাটি, জলপাইগুড়ি) : সং ২৪, সং ২৫, সং ৩৩, সং ৪০, সং ৪২, সং ৪৩, সং ২৫০ ॥

৯. শ্রীমতী ঢুলনশোরী রায় (মন্নাপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ২৯ ॥

১০. শ্রীমতী দেবেশ্বরী তন্ত্র (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ২২, সং ২৩, সং ৩০ ॥

১১. শ্রীমতী গুলেশ্বরী রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১ (অতিরিক্ত কথা), সং ৩২, সং ৫১ ॥

১২. শ্রীমতী কনকবালা রায় (নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১ক, সং ৩৪ (কথান্তর), সং ৫৪, সং ৫৮গ, সং ৬৯গ, সং ১১৪, সং ১৫৪, সং ২৫৯ সং ২৬০খ, সং ২৬৪, সং ২৭৮, সং ২৮৭ক ॥

১৩ শ্রীমতী অসেশ্বরী রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১খ (কথান্তর), সং ৩৫—৩৭ ॥

১৪. শ্রীকালীনন্দন ভট্টাচার্য (রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১খ, সং ৮৫, সং ১২০, সং ১৩৫, সং ৩৮৫, সং ৪১৩ (কথান্তর), সং ৪২০ ॥

১৫. শ্রীমতী দলেশ্বরী বর্মণী (বাঁশকন্ঠিয়া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি) : সং ৩২ (কথান্তর), সং ১০৪, সং ১৩৯গ, সং ২৭৬ ॥

১৬ শ্রীউমেশচন্দ্র রায় (মাণিকগঞ্জ হাট, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৮ সং ১৯০, সং ১৯১ক, সং ২৩২ ॥

১৭. শ্রীমতী অগোনশোরী দেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৯, সং ৪৪ ॥

১৮. শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় (নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৪৫, সং ৪৬, সং ৬০, সং ৬১, সং ৭২ক, সং ১৩৯, সং ১৮১, সং ২১৩ক, সং ২৬৮—২৭০, সং ২৯৯, সং ৪৩৫ ॥

১৯. শ্রীমতী নিন্দেশ্বরী বর্মণী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ৪৯, সং ৫০ ॥

২০. শ্রীমতী দক্ষেশোরী রায় (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৫১ক ॥

CENTRAL LIBRARY

২১. শ্রীমতী পরমা দেবী (মন্নাপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৫২, সং ৫২ক ॥

২২. শ্রীজীবনবন্ধু লাহিড়ী (দিনবাজার, জলপাইগুড়ি) : সং ৫২খ, সং ১৪২ (কথান্তর), সং ১৬৯, সং ২০৪ ॥

২৩. শ্রীটারু দেবনাথ (বারোঘরিয়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৫৩ ॥

২৪. শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৫৪ক।

২৫. শ্রীঅনন্ত অধিকারী (বেলাকোবা বাজার, জলপাইগুড়ি) : সং ৫৫ক, সং ১০৮, সং ১১২, সং ১২৫খ, সং ১২৬, সং ৩৮৮ ॥

২৬. শ্রীমতী ময়ালশোরী বর্মণী (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৫৫খ, সং ১৬০, (কথান্তর), সং ২৯৪ ॥

২৭. শ্রীবিশ্বেশ্বর রায় (সরকারপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৫৯ ॥

২৮. শ্রীমতী নীহার বড়ুয়া (তাঁহার সংগ্রহ হইতে) : সং ৫৪গ, সং ৫৫, সং ৫৫গ, সং ৫৫ঘ, সং ৫৭, সং ৬২, সং ৬২ক ॥

২৯. শ্রীমতী কুলেশ্বরী রায় (অমরখানা, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৫৪খ, সং ৫৬, সং ৫৬ক, সং ৫৮, সং ৫৮ক, সং ৫৮খ, সং ৫৯ক, সং ৬২খ, সং ২২৬, সং ২৭৫, সং ২৮৬খ, সং ২৮৮ ॥

৩০. শ্রীচেকা রায় (মন্নাপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৩, সং ১৬৭, সং ১৭০, সং ১৭৩ ॥

৩১. শ্রীনিরঞ্জন দত্ত (পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি। তাঁহার সংগ্রহ হইতে) : সং ৬৪ ॥

৩২. শ্রীসত্যেশ্বর রায় (বারোপেটিয়া, রংধামালী, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৬ ॥

৩৩. শ্রীশব্দেশ্বর রায় (গাদলঘাটা, বোদাগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৭, সং ৬৮ ॥

৩৪. শ্রীমালেকচন্দ্র বর্মন (কালুয়ারবাড়ী, প্রসন্নগর, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৯ক, সং ১০৭, সং ১১৬, সং ১১৭, সং ১১৯, সং ১২৭ক, সং ২১২ক, সং ৩৯৪ ॥

৩৫. শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৯খ, সং ৭৬,

CENTRAL LIBRARY

সং ৮৩ক, সং ৮৭, সং ৮৭ক, সং ৯২ক, সং ৯৭, সং ১০৬, সং ১১৫, সং ১২২, সং ১২৪, সং ১৩২, সং ১৪৩ঘ, সং ১৫৪ (কথান্তর), সং ১৪৩ক, সং ১৪৩ঘ, সং ১৫১ক, সং ১৫২, সং ১৫৩, সং ১৬১, সং ১৮৫ঘ, সং ২১২, সং ২৫৬, সং ২৬০—২৬০ক, সং ২৬৫, সং ২৭২, সং ২৭৪, সং ২৭৭, সং ২৮৬, সং ২৮৯—২৯০, সং ৩১৪খ, সং ৩১৭ (মাশানের জন্ম অংশ), সং ৩১৮, সং ৩২১—৩২৩খ, সং ৩৭৭, সং ৩৮২, সং ৪০৮, সং ৪২১, সং ৪৩০ (আংশিক), সং ৪৩১ ॥

৩৬. শ্রীমতী কুলেশ্বরী রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি): সং ৭০ক।

৩৭. শ্রীবিজয়দাস ফকির (পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৭০, সং ৭০খ, সং ১৩৯ঘ, সং ১৪০, সং ১৪৭, সং ১৪৮, সং ১৫৬, সং ১৫৭, সং ১৫৮, সং ২৬২, সং ৩০৩—৩০৩ক ॥

৩৮. শ্রীকুধা হাজরা (হাজরাপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৭১ক (কথান্তর), সং ১০০, সং ১০১, সং ১৩৭—১৩৭খ, সং ১৩৮, সং ১৫৭, সং ১৬৪—১৬৪গ, সং ১৬৬, সং ১৬৮, সং ৩০২, সং ৩১৫, সং ৩২৬—৩২৬ক, সং ৩৪২—৩৪২ক, সং ৪৩০ (আংশিক) ॥

৩৯. শ্রীচাম সিং ওঝা (পানিকোয়াড়ি, কামারভিটা, জলপাইগুড়ি): সং ৭১ক, সং ৩১৬, সং ৩২০ ॥

৪০. শ্রীনিমাই পাটনী (বৈরাতীগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ৭২, সং ১১৮, সং ১৬৫, সং ২১০, সং ৩৪৭, সং ৩৫৮, সং ৪১০, সং ৪২৪-৪২৫, সং ৪২৮ ॥

৪১. শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৭৩, সং ৭৪ ॥

৪২. শ্রীপরশুরাম রায় (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৭৭খ, সং ১২৯, সং ২১২খ, সং ২২১, সং ২৩৬, সং ২৪০, সং ২৪৪, সং ২৪৫ক, সং ২৫৩ক, সং ৩১৭ (বেশীর ভাগ), সং ৩৫০—৩৫০খ, সং ৩৫৬ (কথান্তর), সং ৩৬৫, সং ৩৬৬, সং ৩৭৩, সং ৩৮০, সং ৩৮১ক, সং ৪৩১ (কথান্তর) ॥

৪৩. শ্রীশুকদেব রায় (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ৭৭ঘ, সং ১২৩, সং ২১৫, সং ২২০, সং ২৯৩, সং ৩৭০ক, সং ৪০০ক, সং ৪১৫ ॥

CENTRAL LIBRARY

৪৪. শ্রীধর্মনাথ রায় (চুকানীটাড়ী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৭৮ক, সং ১১১, সং ১৯৩ ॥

৪৫. শ্রীমণিকান্ত রায় (ঐ) : সং ৭৯, সং ৩৩৫, সং ৪০২ ॥

৪৬. শ্রীউমাপদ সেন, (খ্যানপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৮০, সং ১৩৪, সং ২১৩ক (কথান্তর) ॥

৪৭. শ্রীগণেশ রায় (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৮৩, সং ১৩১, সং ২১৭, সং ২৬২ক ॥

৪৮. শ্রীতুলাচরণ রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ৮৪, সং ৯৮, সং ১১০ ॥

৪৯। শ্রীফুলেশ দেবনাথ (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৭৬ক, সং ৮১, সং ৮৬, সং ১৮৭, সং ২০১, সং ২৩৯, সং ২৪৫, সং ২৪৯ (কথান্তর), সং ৩৬০-৩৬৩, সং ৩৬৮—৩৬৯, সং ৩৭১—৩৭২, সং ৩৭৪—৩৭৫, সং ৩৭৮, সং ৩৭৮খ, সং ৩৮১খ, সং ৩৮৩, সং ৪৩৪ ॥

৫০. শ্রীগন্ধেশ্বর রায় (দফাদার পাড়া, মাণিকগঞ্জহাট, জলপাইগুড়ি) : সং ৮৮, সং ১৭৫, সং ১৭৮, সং ১৮০, সং ১৮৮ক, সং ১৮৯, সং ১৯০ক, সং ৩১৩ক, সং ৪০৪ ॥

৫১. স্বর্গত বৈয়দ্দীন মহম্মদ (মাহুতপাড়া, ডেঙ্গুয়াঝাড়, জলপাইগুড়ি) : সং ৭১, সং ৭৫, সং ৯০ ॥

৫২. শ্রীবংশীদাস রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৯১, সং ১৮৬, সং ৩৩০, সং ৩৭০, সং ৩৯৭—৩৯৭ক, সং ৪০০খ—৪০১, সং ৪১১ ॥

৫৩. শ্রীরবিধন রায় (হাদলাপাড়া, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৭৭গ, সং ৭৮, সং ৯২খ, সং ৯৩, সং ৯৫, সং ৯৫ক, সং ৯৯, সং ৩৪৫, সং ৪০৩ ॥

৫৪. শ্রীরূপা দেবনাথ (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৭৬খ, সং ৯২গ ॥

৫৫. শ্রীরূপা রায় (হল্‌দিবাড়ী, কোচবিহার) : সং ৯৪ ॥

৫৬. শ্রীখগেশ্বর রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৯৬, সং ৩৫৬ক ॥

৫৭. শ্রীদেবেন রায় (গোঁসাইয়ের হাট, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ৯৬ক ॥

৫৮. শ্রীমদন রায় (রাঙ্গারবাড়ী, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি): সং ১০২ সং ১০২ক, সং ২০৬, সং ৩৫৪ (কথান্তর) ॥

৫৯. শ্রীমতী সুখমণি রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১০৩, সং ৪২৯ (আংশিকভাবে) ॥

৬০. শ্রীহিয়ালু রায় (পূর্বদহ, হলুলুডাঙ্গা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১০৫, সং ১৭১, সং ৩০৪খ ॥

৬১. শ্রীবৃক্ষনাথ রায় (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি): সং ১০৬, সং ১০৬খ ॥

৬২. শ্রীকাশীনাথ মোহান্ত (ঐ): সং ১০৬গ, সং ১০৬ঘ, সং ২০৮, সং ৩৫৪ ॥

৬৩. শ্রীহৃদয়নাথ বর্মণ (ফকিরটিপ, প্রসন্ননগর, জলপাইগুড়ি): সং ১০৯ ॥

৬৪. শ্রীপ্রভাত রায় (নতুনপাড়া, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি): সং ১১৩, সং ৩৫৩ ॥

৬৫. শ্রীদয়ারাম রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) সং ১১৬ (কথান্তর), সং ৩৪৬, সং ৩৯৯—৪০০ ॥

৬৬. শ্রীকাবাউ বর্মণ (সারিআম কালীবাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি): সং ১২১ ॥

৬৭. শ্রীবলাই ঋষি (পদমতী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১২৮ক সং ২১৩, সং ২১৪ক, সং ২২৩, সং ২৪৩, সং ৩৫৬গ, সং ৩৬৭, সং ৩৮৬ক ॥

৬৮. শ্রীকালীনাথ রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১২৫ ॥

৬৯. শ্রীকুচু রায় (গোঁসাইয়ের হাট, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১১৫ক, সং ১৮৫খ, সং ১৯৮ক, সং ২৮৪ ॥

৭০. শ্রীকোকোন রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১২৭ ॥

৭১. শ্রীপ্রণয়কুমার বর্মণ (কালুয়ার বাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) : নং ১৩১ক, সং ১৩১খ ॥

৭২. শ্রীতারাকান্ত রায় (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১২৮খ, সং ১৩০, সং ১৩৩, সং ২৪২, সং ৩৩৪, সং ৩৭৮ঘ (অতিরিক্ত কথা), সং ৪১৬ ॥

৭৩. শ্রীমতী ঝোকোশোরী সাহা (তেলীপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ১৩৬, সং ১৩৬ক, সং ১৩৬খ ॥

৭৪. শ্রীমতী আন্ধাশোরী বেওয়া (নজরাজোত, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ১৩৬গ ॥

৭৫. শ্রীকুশা রায় (ব্রহ্মতলপাড়া, ৫ নং খড়িয়া ইউনিয়ন, জলপাইগুড়ি) : সং ১৩৮ক ॥

৭৬. শ্রীটেপেরু বসাক (ঠাকুরবাড়ী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৩৮খ, সং ৩৭৮ঘ (কথান্তর), সং ৪২৭ ॥

৭৭. শ্রীদীপকান্ত রায় (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪১ ॥

৭৮. শ্রীমতী অক্ষেশোরী দেবী (প্রধানপাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪২ ॥

৭৯. শ্রীভোলো রায় (ঐ) : সং ১৪৩, সং ৩১০, সং ৩১৪, সং ৩৫৪ক, ৩৫৪খ ॥

৮০. শ্রীহরনাথ রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪৩গ ॥

৮১. শ্রীশম্বেশ্বর দাস (ঝাকুয়াপাড়া, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪৩গ (কথান্তর) ॥

৮২. শ্রীধরণীকান্ত রায় (বড়ুয়াপাড়া, ভিতরগড়, প্রাক্তন জলপাইগুড়ি) : সং ১৪৪ ॥

৮৩. শ্রীমতী গুণেশ্বরী রায় (গোঁসাইয়ের হাট, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪৫, সং ২০০ (অতিরিক্ত কথা) ॥

৮৪ শ্রীমতী ময়নাশোরী দেবী (প্রধানপাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪৬ ॥

৮৫. শ্রীমতী বুধোশোরী রায় (অমরখানা, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪৯ ॥

CENTRAL LIBRARY

৮৬. শ্রীঅন্বেশ্বর রায় (প্রধানপাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি): সং ১৪৯ক, সং ১৫৯॥

৮৭. শ্রীমতী যামিনীবালা রায়, (পানিকোয়াড়ি, কামারভিটা, জলপাইগুড়ি): সং ১৪৯ক (কথান্তর)॥

৮৮. শ্রীগুণেশচন্দ্র রায় (প্রধানপাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি): সং ১৫০॥

৮৯. শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী রায় (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি): সং ১৪৩খ, সং ১৫০ক, সং ১৫০খ, সং ৩০৫ (কথান্তর), সং ৩০৬ক॥

৯০. শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র রায় (পশ্চিমমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১৫৫॥

৯১. শ্রীআশিন রায় (পানিকোয়াড়ি, কামারভিটা, জলপাইগুড়ি): সং ১৬০, সং ৩০৪, সং ৩০৬॥

৯২. শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (কুন্দরদীঘি, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি): সং ১৬০ (কথান্তর), সং ৩৫৪গ—৩৫৫॥

৯৩. শ্রীমতী টেপেশ্বরী রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১৩৯খ, সং ১৫১, সং ১৬২, সং ১৬৩, সং ২১৪—২১৫, সং ৩০৮॥

৯৪. শ্রীমতী বাজারী রায় (ধলেশ্বরী, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ১৭০ক—১৭০গ॥

৯৫. নফিরুদ্দীন আহম্মদ (মন্নাপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ১৭২॥

৯৬. শ্রীবালিয়া রায় (ধলেশ্বরী, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ১৭৪, সং ২০৭ক॥

৯৭. শ্রীশেলডু রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১৭৭, সং ২০৫, সং ২১১॥

৯৮. শ্রীযোগেশ রায় (নতুনপাড়া, প্রসন্ননগর, জলপাইগুড়ি): সং ১৮২, সং ২৩৩॥

৯৯. শ্রীহরিমোহণ বর্মণ (সারিআম কালীবাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি): সং ১৭৯, সং ১৮৫ক, সং ১৮৫গ, সং ২১৪, সং ২১৭খ, সং ২৫১-২৫২॥

CENTRAL LIBRARY

১০০. শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় (গোঁসাইয়ের হাট, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৮৬ক, সং ১৯০ঘ—১৯১, সং ১৯৩ক—১৯৩ঘ, সং ২০০ক, সং ২২৯, সং ২৪১, সং ৩৩৯, সং ৪০৯।

১০১. শ্রীরমণীমোহন সরকার (বড়ুয়াপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ১৮৭ক, সং ২০৩।

১০২. শ্রীকমলচরণ রায় (জমিদারপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ১৭৬, সং ১৮৪, সং ১৮৫, সং ১৮৭গ—১৮৭ঘ।

১০৩. শ্রীযতীন দাস (ধ্যানপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ১৮৮।

১০৪. হুকু মহম্মদ (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৩গ, সং ২৬৩, সং ২৭৩।

১০৫. শ্রীখগেন বর্মণ (কালাকাটা, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৪।

১০৬. শ্রীরতিকান্ত রায় (পুর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৫।

১০৭. শ্রীকান্দুড়া বসাক (বসাকপাড়া, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৬।

১০৮. শ্রীনবচন্দ্র রায় (পদমতী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৭ সং ২২২, সং ৩৪০।

১০৯. শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া রায় (পুর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি : সং ১৯৭ক, সং ২২৫।

১১০. হাসেরুদ্দীন মহম্মদ (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৮, সং ৩৩১, সং ৩৫৭ (কথান্তর)।

১১১. শ্রীযোগেন রায় (ঘাসীপাড়া, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৯।

১১২. শ্রীঅনিলচন্দ্র দাস (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ২০০।

১১৩. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায় (খল্‌টাজোত মাঝিয়ালী, আমবাড়ী ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি) : সং ২০২।

১১৪. শ্রীমতী সরলতা দেবী (হাকিমপাড়া, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি) : সং ২০৭, সং ৪১৯।

CENTRAL LIBRARY

১১৫. শ্রীইন্দ্রমোহন রায় (সরকারপাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি) সং ২০৯।

১১৬. শ্রীকমলাকান্ত রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি): সং ২১৭ক, সং ২৩৭।

১১৭. শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তন্ত্র (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ২১৮।

১১৮. চেকু মহম্মদ (নন্দনপুর-অমরখানা, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি): সং ২২৪।

১১৯. শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায় (ছোবারহাট, তাড়িয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ২২৭, সং ৩৩৭।

১২০. শ্রীযাদব দাস (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ২৩২।

১২১. আজিদার রহমান (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ২৪২ (কথান্তর)।

১২২. শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায় (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ২৪৫খ।

১২৩. শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক (ভাঙ্গামালী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ২৪৯।

১২৪. শ্রীপ্রণয় কুমার বর্মণ (কালুয়ারবাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি): সং ২৫৭খ।

১২৫. শ্রীমতী রাজ্যমণি বর্মণী (নজরাজোত, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): ২৫৭খ (কথান্তর), সং ২৫৮।

১২৬. শ্রীমতী মোহিনীশোরী বর্মণী (ঐ): সং ২৬১।

১২৭. শ্রীমতী পাটেশ্বরী দাসী (বড়োভিটা, আমবাড়ী-ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি): সং ২৬১ক, সং ৪১২।

১২৮. শ্রীমতী ভেমেরী রায় (গড়ালবাড়ী, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ২৬৪ক।

১২৯. শ্রীরামপ্রসাদ রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ২৬৭।

১৩০. শ্রীমতী স্বর্ণবালা বর্মণী (বড়ুয়াপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ২৭৭ক।

১৩১. শ্রীবসন্ত অধিকারী (খ্যানপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ২৭৯।

CENTRAL LIBRARY

১৩২. শ্রীসুন্দর বর্মণ (প্রধানপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ২৮২।

১৩৩. শ্রীমতী নগেনশোরী রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ২৮৫।

১৩৪. শ্রীমতী সুশীলাবালা রায় (রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ২৫৫, সং ২৫৬খ—২৫৭ক, সং ২৭১, সং ২৮৭, সং ২৯৫।

১৩৫. শ্রীমতী ফুলেশ্বরী রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ২৮৩, সং ২৮৬ক, সং ২৯৬—২৯৮।

১৩৬. শ্রীমতী মাহাজনী রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ৩০০।

১৩৭. শ্রীমতী কুলেশ্বরী রায় (ঐ) : সং ৩০১।

১৩৮. শ্রীমতী ভবানীশোরী রায় (বোদাপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৩০১ক—৩০১ঘ।

১৩৯. শ্রীলক্ষ্মীন্দ্র রায় (চিল্‌কাপাড়া, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি) : সং ৩০৪ক।

১৪০. শ্রীনিশিকান্ত রায় (কুন্দরদীঘি, পানিকোয়াড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৩০৫।

১৪১. শ্রীমতী ধনেশ্বরী বর্মণী (বাঁশকণ্ঠীয়া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি) : সং ৩০৭।

১৪২. শ্রীমতী শরদিনী রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৩০৯।

১৪৩. শ্রীগেন্দু রায় (রাঙারবাড়ী, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১১।

১৪৪. শ্রীশশিমোহন রায় (ঐ) : সং ৩১১ক—৩১১খ।

১৪৫. শ্রীরাজমোহন রায় (কালিয়াগঞ্জ, ডেঙ্গুয়াঝাড়, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১২।

১৪৬. শ্রীবিন্না রায় (প্রধানপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১৩।

১৪৭. শ্রীউপেন রায় (গোমস্তাপাড়া, ডেঙ্গুয়াঝাড়, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১৪ক।

১৪৮. শ্রীকাহার সিং (১ নং মাস্তাটাড়ী ইউনিয়ন, রাজগঞ্জ, জলপাই-গুড়ি) : সং ৩১৭ (ঝিমিলার পুনরুজ্জীবন অংশ)।

CENTRAL LIBRARY

১৪৯. শ্রীমুনীরাম রায় (সারিআম বাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি): সং ৩২৩গ (আম্বাশূলার মন্ত্র)॥

১৫০. শ্রীদেবীকান্ত রায় (বড়ুয়াপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ৩২৪—৩২৪খ, সং ৩২৫—৩২৫ক, সং ৩২৫গ—৩২৫ঘ॥

১৫১. শ্রীসুখেন্দুনারায়ণ রায় (আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি): সং ৩২৫খ॥

১৫২. শ্রীকানাই রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ৩২৭-৩২৮, সং ৩৫৬খ, সং ৩৫৯, সং ৩৬৪, সং ৩৯৫, সং ৪১৩, সং ৪১৮॥

১৫৩. শ্রীজিতুল রায় (নতুনপাড়া, বেলাকোবা, জলপইগুড়ি): সং ৩২৯॥

১৫৪. শ্রীমতী ন্যাদেমী রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ৩৩২, সং ৪২৯ (আংশিকভাবে)॥

১৫৫. শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবনাথ (ধলেশ্বরী, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ৩৩৬॥

১৫৬. শ্রীঅর্থ সিং (গোকুলভিটা, কামারভিটা, জলপাইগুড়ি): সং ৩৩৮॥

১৫৭. শ্রীদয়ারাম রায় (পদমতী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ৩৪১॥

১৫৮. ছমিয়াল হক (কচুয়া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি): সং ৩৪৩॥

১৫৯. তমিজউদ্দীন আহাম্মদ (নন্দনপুর-অমরখানা, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি): সং ৩৪৮॥

১৬০. শ্রীরসিক বর্মণ (পচাগড়, প্রাক্তন জলপাইগুড়ি): সং ৩৪৯॥

১৬১. শ্রীদৈত্যমোহন দাস (খ্যানপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৩৫৭॥

১৬২. আব্দুল মজিদ (টিকিবেচিপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৩৭৮গ॥

১৬৩. মহম্মদ ঈশাক আলী (ঐ): সং ৩৭৬ক, সং ৩৮৩ক॥

১৬৪. মহম্মদ তহ্‌ছিম আলী (ঐ): সং ৩৭৯, সং ৩৮৬॥

১৬৫. মহম্মদ রুস্তম আলী (ঐ): সং ৩৭৬, সং ৩৮১, সং ৩৮৪, সং ৩৮৭॥

১৬৬. শ্রীকটীন্দ্রনাথ রায় (কালুয়ারবাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৮৯-৩৯৩ ॥

১৬৭. শ্রীসুখমেলা রায় (বারোঘরিয়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৯৬ ॥

১৬৮. শ্রীখগেন্দ্রনাথ বর্মণ (টিকিবেচিপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৯৮ ॥

১৬৯. তুফান মহম্মদ (ঐ) : সং ৪০৫ ॥

১৭০. ছমতুল মহম্মদ (ঠাকুরবাড়ী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৪০৬, সং ৪৩১ (কথান্তর) ॥

১৭১. শ্রীজীবন রায় (বৈরাগীপাড়া, হলদিবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৪১৪ ॥

১৭২. শ্রীবিশ্বেশ্বর রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৪২২ ॥

১৭৩. শ্রীকালাচাঁদ রায় (দফাদারপাড়া, মাণিকগঞ্জ হাট, জলপাইগুড়ি) : সং ৪২৩ ॥

১৭৪. শ্রীতরুণকান্ত রায় (দক্ষিণবড়ুয়াপাড়া, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি) : সং ৪২৬ ॥

১৭৫. শ্রীমতী পঞ্চমী রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৪২৯ (আংশিকভাবে) ॥

উল্লিখিতদের মধ্যে সকলেই গায়ক বা গায়িকা নহেন। শ্রীগুরুদাস রায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমতী কনকবালা রায়, শ্রীমতী নীহার বড়ুয়া, শ্রীজীবনবন্ধু লাহিড়ী, শ্রীনিরঞ্জন দত্ত, শ্রীকালীনন্দন ভট্টাচার্য—এই কয়জন মূলত গায়ক বা গায়িকা নহেন, সংগ্রাহক। শ্রীমতী কনকবালা রায় জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠস্থিত পুরানো পাণ্ডাপাড়া হইতে তাঁহার প্রদত্ত গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। বাকী ১৬৮ জন গায়ক-গায়িকা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে গানগুলি শুনাইয়াছেন। এই নিরক্ষর মানুষগুলির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সমস্ত গানগুলি ১৯৫৭—১৯৬০ সনে সংগৃহীত হইয়াছে। কিছু গান টেপ-রেকর্ডে তুলিয়া আনিয়াছি, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে রক্ষিত আছে।

CENTRAL LIBRARY

॥ পরিশিষ্ট : খ ॥

। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল প্রসঙ্গ ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়-কর্তৃক লিখিত

—১—

আমি সামান্য একজন গায়ক মাত্র, লেখক বা গবেষক কোনোটাই নই। তথাপি আমার অনুজ-প্রতিম শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক যখন প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখে দিতে বললেন, তখন তা উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বাঙলার লোকসঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে মোটামুটি কড়ি মধ্যম ছাড়া আর সমস্ত পর্দাই ব্যবহৃত হয়। কখনো-কখনো উদারায় ও তারায় পঞ্চম লাগে। প্রান্তিক উত্তর বাঙলার কোনো কোনো লোকসঙ্গীতে, বিশেষ করে নারীর গানে, পঞ্চম স্বরের বেশি পর্দা লাগে না।

প্রান্তিক উত্তর-বাঙলার লোকসঙ্গীতের নানা বিষয় আছে। এর মধ্যে 'ভাওয়াইয়া' এবং 'চট্‌কা'র নাম সুপরিচিত। এ গানগুলোর উৎস-ভূমি হল কোচবিহার। গানগুলি এতোই কাব্য-সমৃদ্ধ যে, কোচবিহার জেলা ছাপিয়ে তা তরাই-ভূমিতে, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরে প্রচলিত হয়ে গেছে বহুদিন থেকেই। বর্তমান বাঙলা দেশ সম্পর্কে আমি কোনো আলোচনা করছি না, যদিও 'ভাওয়াইয়া' ও 'চট্‌কা' গানের প্রচলন সেখানেও কিছু কম নেই।

জলপাইগুড়ি জেলার লোকসঙ্গীতের নিজস্ব একটি রূপ আছে, তাতে কিন্তু ওই 'ভাওয়াইয়া' বা 'চট্‌কা'র প্রভাব বিশেষ পড়ে নি। জলপাইগুড়ির লোকসঙ্গীতের সুর আপন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। এই জেলার লোকসঙ্গীতের বিষয়-বৈচিত্র্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাধারণ ভাবে, যে কোনো দেশের লোকসঙ্গীতকেই দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক গান বলতে কোনো একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ গান বুঝি। ওই সব অনুষ্ঠানে প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ গান ছাড়া অন্য কোনো গান গাওয়া

CENTRAL LIBRARY

যায় না। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের আনুষ্ঠানিক গান বলতে আমরা মেছেনী-ভেদৈ খেলী, হুদ্‌মা, বিয়ের গান, ভাঁড়া বিষহরি, প্রভৃতির গান বুঝব। এই সব গানে আর নতুন একটি পঙ্‌ক্তিও যোজনা করবার সুযোগ নেই। যা চলে আসছে, তাই গাইতে হবে, তার কোনো হের-ফের হবে না। অনানুষ্ঠানিক গানে অবশ্য সে সুযোগ আছে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝেছি যে, লোকসঙ্গীতের (এবং সাধারণ ভাবে গোটা লোক-সাহিত্যেরই) সঠিক এবং আদিম রূপটি নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অনেক সময়েই দেখেছি, একটি গানের পঙ্‌ক্তি অন্য একটি গানের ভেতরে গিয়ে ঢুকে আছে। আনত ও আসল গান কোন্‌টি, তা বোঝাই মুশকিল হয় তখন। জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায়, দুটোই ঠিক। সুতরাং আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীতের মৌলিক রূপটি নিরূপণের সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের মেয়েলি লোকসঙ্গীতের গঠনটি লক্ষ করবার। এদের গানে থাকে দুটি পদ বা কলি : একটি আস্থায়ী এবং একটি অন্তরা। সাধারণ ক্ষেত্রে এই হলো এখানকার নারীর গানের কাঠামো। স্ত্রীলোকের গানে সাধারণ ক্ষেত্রে কোনো বাদ্য-যন্ত্রই ব্যবহৃত হয় না, হাতে তালি বাজানো ছাড়া। এভাবেই তাল রক্ষা করা হয়। 'হুদ্‌মা' ছাড়া অন্য সব গান বা নাচের সময়ে স্ত্রীলোকেরা 'ফোতা' বা 'পাটানী' (রাজবংশী নারীর পরিধেয় বস্ত্র) পরে নেয়। পুরুষদের গানে ঢোল, খোল, মন্দিরা, খমক, সারিন্দা (সারিন্দা), মুখাবাঁশি, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ির লোকসঙ্গীতে দোতরার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। বিষহরির গানে খোল, করতাল এবং মুখাবাঁশি ছাড়া অপর কোনো যন্ত্র-ব্যবহার নিষিদ্ধ। গারাম, গমীরা, চোক্‌-চুন্নী (চোর-চুন্নী), পালাটিয়া, মনঃশিক্ষা প্রভৃতি গানে ঢোল-খোল-করতালের ব্যবহার বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোতরা ব্যবহার করা হয় বটে, তবে তার প্রচলন ৪০।৫০ বছরের বেশি নয়।

আলোচ্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে সচরাচর যে ক'টি তাল মেলে, তা এই : ১. কাহারবা ২. দাদ্‌রা ৩. তেওরা ৪. ঝুমুর। কিন্তু তাল খুব স্পষ্ট ও প্রখর হয়ে ওঠে না। যেমন, কাহারবা তালের বেলায়। এর চার-চার মাত্রার বিভাগটি বিভিন্ন নক্‌শায় বা প্যাটার্নে ভেঙে গিয়ে শেষে ঠিক চার মাত্রার

হিসেবে আট মাত্রার পূর্ণ তাল রচনা করে। ছন্দ অনেক রকমের আছে, কিন্তু মাত্রা চার-মাত্রার এক-একটি 'ইউনিটে' সীমাবদ্ধ। শুধু উদাসী বা লম্বা সুরের দীর্ঘ বিলম্বিত গানগুলি তাল-ছাড়া হয়। এতে সুস্পষ্ট ভাবে কোনো তালের অনুসরণ থাকে না (ঠিক যেমন, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি গানে)।

...২...

এইবার প্রান্তিক উত্তর-বাঙলার কয়েকটি নির্বাচিত গানের স্বরলিপি দিচ্ছি। স্বরলিপির মাধ্যমে লোকসঙ্গীতের মাটির গন্ধটি ফুটিয়ে তোলা বড়োই কঠিন, কেননা তা এক হিসেবে অসাধ্য ব্যাপার। তবু, মোটামুটি ভাবে আলোচ্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের কয়েকটি 'টাইপ'কে এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। যে গানগুলো বেছে নিলাম, তা বিষয়ের দিক থেকে যেমন, সুর-রূপের দিক থেকেও 'প্রতিনিধি স্থানীয়'। প্রথমে নারীর কণ্ঠে গীত গানের স্বরলিপি দিচ্ছি :

১. মেছেনী : করলা গাড়িহু সারি গে সারি—
স্থাও করলা মোর নন্দে ছেঁকে পানি।
শশুরে দিলেক ঝিঁকেরে হাঁকারি,
ভাশুরে দিলেক ঝাঙতে অঠেয়া গে—
করলা না মোর করলা॥

।গা	পা	পা।	পা	পা	পা।	গা	পা	পা।	গা	-া	রা।
ক	র	লা	গা	ড়ি	হু	সা	রি	গে	সা	•	রি
											ন
।গা	-পা	পা।	পা	ধা	ধা।	ধা	-া	ধা।	পা	-ধা	ধা।
স্থা	ও	ক	র	লা	মোর্	ন	ন্	দে	ছেঁ	•	কে
।পা	-া	-া।	গা	-া	-রা।	গা	পা	পা।	গা	-পা	পা।
পা	•	•	নি	•	•	ক	র	লা	না	•	মোর্
।গা	-া	গা।	রা	-া	-া॥						
ক	•	র	লা	•	•						

CENTRAL LIBRARY

। পা পা পা। পা -া পা। গা গা গা। গা গা রা।
খ ত রে দি • লেক্ ঝিঁ কে রে ঝাঁ কা রি
ন

। পা পা পা। ধা -া ধা। ধা ধা ধা। পা -ধ ধা।
ভা ত রে দি • লেক্ ঝা ও তে অ • ঠে

। পা -া -া। গা -া -রা॥ করলা না মোর···
রা • • গে • •

২. ভেদৈখেলী : ও তোর টাকা-খাইয়া মুখত্‌ বান্ধিনী ভাঙ্গাও
তোর গে আই,
এমন বেসালেন জামই
আর মুলুকত্‌ বর কি পালেন গে নাই ॥

সা না
ও তোর্

সা রা রা রা। রা রা রা গা। পা পা পা পা।
টা কা খাই য়া মু খ ত্‌ বান্ ধি নি ভাং গাও

ক্ষা ক্ষা গা রা। সা সা সা সা। রা রা গা গা।
তোর্ গে আ ই এ ম ন্ বে সা লেন্ জা মই

-গ
গা পা পা পা। গা পা -া পা। গা পা গা রা।
আর্ মু লু কত্‌ বর্ কি • পা লে ন্ গে •
রা রা -া -া।
না ই • •

৩. হুদ্‌মা : হিল্‌হিলাছে কমরটা মোর শির্‌শিরাছে গাও
কোন্‌ঠেকেনা গেইলে এলা হুদ্‌মা-দেওয়া পাও।
পাটানীখান পড়েছে খসিয়া—
আইসেক রে হুদ্‌মা-দেওয়া
তোর বাদে মুই আছো বসিয়া ॥

। পা -া পা। পা পা -া। পা পা -া। পা পা -া।
হি ল্ হি লা ছে ॰ ক ম র্ টা মো র্
। পা -া পা। পা পা -া। রা -া রা। -া -া -া।
শি র্ শি রা ছে ॰ গা ॰ ও ॰ ॰ ॰
। রা -া রা। রা রা -া। রা -া রা। গা গা -া।
কো ন্ ঠে কে না ॰ গে ই লে এ লা ॰
। গা -া গা। রা -া রা। সা -া সা॥
হ দ্ যা দে ও য়া পা ॰ ঊ
। পা পা -া। পা পা -া। পা পা পা। পা গা -পা।
পা টা ॰ নি খা ন্ প ড়ে ছে খ সি ॰
। পা -া -া। পা -া পা। পা -া পা। পা গা -া।
য়া ॰ ॰ আ ॰ ই সে ॰ ক্ রে হ দ্
। গা রা রা। রা -া রা। গা গা -া। গা গা -া
যা দেও য়া তো র্ বা দে মু ই আ ছো ॰
। রা রা সা। -া -া -া।
ব সি য়া ॰ ॰ ॰

৪. বিয়ের গান : বরকে স্নান করাবার সময় গীত হয় :

সাতো গে বহিনি হামরা জল আনিতে যাই
জলের ঘাটে সিনান করে—
আজিকার জল দিয়া সিনাও রে বাপই।

। পা পা ধা। -া ধা। পা পা। গা -া রা। রা -া। গা -মা।
সা তো গে ॰ ব হি নি হা ম্ রা জ ল্ আ ॰
। গা -পা গা। রা -া। রা -া॥
নি ॰ তে যা ॰ ই ॰
। পা পা পা। -া -া। ধা ধা। ধা ধা ধা। -া পা। পা -া।
জ লে র ॰ ॰ ঘা টে সি না ন ॰ ক রে ॰
। সা সা সা। -া -া। রা -া। গা -পা পা। পা পা। রা -া।
আ জি কা ॰ র্ জ ল্ দি ॰ য়া সি নাও রে ॰
। গা রা -া। -া -া। -া -া॥
বা প ॰ ॰ ॰ ॰ ই

৫. চোক্‌-চুম্নী (চোর-চুম্নী) :

চুম্নী, খালি-খুড়ি কম্বল
জেহেলখানার সম্বল ;
শালা ছাড়া গালি নাই
হালি ছাড়া বেড়ান নাই।
পাকোয়ারী ঝাঙর শালাক কয়া কি হোবে—
মোরো মতন উয়ার মাইয়া ভাতার ধরিবে॥
ওকি মরি হায় রে হায়…

ণা	ণা।	ণা	সা	সা	ঋা।	সা	-া	সা	-া।
চু	ম্নী।	খা	লি	খু	ড়ি	ক	ম্	ব	ল্
	।	ণা	ন্স	সা	ঋা।	সা	-া	সা	-া।
		জে	হেল্	খা	নার্	স	ম্	ব	ল্
	।	ণা	সা	সা	ঋা।	সা	সা	সা	-া।
		শা	লা	ছা	ড়া	গা	লি	না	ই
	।	ণা	সা	সা	ঋা।	সা	সা	সা	-া।
		হা	লি	ছা	ড়া	বে	ড়ান্	না	ই
	।	মা	মা	গা	মা।	পা	পা	পা	পা।
		পা	কো	য়া	রী	ঝা	ঙর্	শা	লাক্
	।	সা	সা	সা	সা।	ণা	-া	-পা	-া।
		ক	য়া	কি	হো	বে	•	•	•
	।	মা	মা	মা	মা।	পা	পা	ধা	ধা।
		মো	রো	ম	তন্	উ	য়ার্	মাই	য়া
	।	সা	-া	ণা	-া।	ণা	-া	ণা	-া।
		ভা	•	তা	র্	ধ	•	রি	
	।	পা	-া	-া	-া॥				
		বে	•	•	•				
	।	র্সা	র্সা	ণা	র্সা।	র্ঋা	-া	র্গা	-র্সা।
		ও	কি	ম	রি	হা	য়্	রে	•
	।	পা	-া	-া	-া।	-া	-া	-া	-া॥
		হা	•	•	•	•	•	য়	•

৬. মনঃশিক্ষা, তুক্কা : আরে ও মন অসনা,

মানব দেহটার গৈরব কৈরো না।

এই দেহাটা মাটির ভাণ্ড—

ভাঙিলে হোবে খাণ্ড-খাণ্ড ;

ভাইরে, জড়া দিলে জড়া লাগিবে না ॥

চার মাত্রা। দুনো লয়।

					ম		গা		
সা	রা।	মা	-া	-া	গা।	গা	রা	গা	-সরসা।
আ	রে	ও	•	•	ওমন্	অ	স	না	• • •
	।	সা	রা	গা	গা।	রগা	গা	সা	সা।
		মানব্	দে	হা	টার্	গৈ•	র	ব্	কৈরো
	।	সা	-া	সা	রা ॥				
		না	•	"আ	রে"				
	।	সা	রা	গা	গা।	রা	রা	সা	-া।
		এই	দে	হা	টা	মাটির্	ভা	ণ্ড	•
	।	রা	মা	মা	রা।	গা	গা	রা	সা।
		ভাঙ্গি	লে	হো	বে	খাণ্ড	খা	ণ্ড	ভাইরে
	।	সরা	রা	গা	গরা।	রা	গা	রা	গরা।
		জ•	ড়া	দি	লে•	জ	ড়া	নাগি	বে•
	।	সা	-া	সা	রা ॥				
		না	•	"আ	রে"				

৭. ভাওয়াইয়া :

কান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।

ফাঁদ বসাইচে ফান্দিয়াল ভাই

পুঁটি মাছো দিয়া ;

মাছের লোভে বোকা বগা

পড়ে উড়াল দিয়া ॥

। গা -া -া মা। পা -া পা -ধা। পা -া মা -া। -া -া গা পা।
কা • • ন্ দে • প • ড়ি • য়া • • • ব পা
। পা -া -া -া। ঋা -া -া -া। সা -া -া -া। -া -া -া -া।
কা • • ন্ দে • • • রে • • • • • • •
। গা -া গা গা। গা -া সা -া। ঋা -া সা -া। পা পা -া -া।
ফা ন্দ্ ব সাই চে • ফা ন্ দি • য়া ল্ ভা ই • •
। সা গা -া মা। পা -া ধা -া। পা -া -া -া। -া -া -া পা।
পুঁ টি • মা ছো • দি • য়া • • • • • • ওরে
। পা -া পা -া। পা -া পা -া। পা -া পা -া। পা -া পা -া।
মা • ছে র্ লো • ভে • বো • কা • ব • গা •
। -া -ধা -া -া। -া -া -া -া। -া -পা -ধা -পা। পা -া পা -া।
• • • • • • • • • • • • প • ড়ে •
। মা -া ধা -া। পা -া মা -া। গা -া -া -া॥
উ • ড়া ল্ দি • য়া • রে • • •

৮. চট্‌কা : বাপই তুই হলো গলামের ছাইল্যা
তোর সঙ্গে নাই করিম পিরিত।
মোক বলে ব্যাচেয়া খা'চে—
টিন-ওলা বাড়ীত্॥

ঝুমুর। দ্রুতলয়।
সা সা। সা -া ঋা। ঋা মা -া। গা ঋা -া। ঋা -া ঋা।
বা পই তু ই হ লো গ • লা মে র্ ছা ই ল্যা
। পা -া পা। মা -া -া। ঋা -া -া। -া গা -মা।
তো • র্ স • ঙ্ গে • • • • •
। গা -া গা। ঋা -া সা। সা -া -া। -া -া -া।
না ই ক রি ম্ পি রি • • • • ত্
। প্‌া -া প্‌া। প্‌া প্‌া -া। সা সা -া। ঋা গা -া।
মো ক্ ব লে বে • চে য়া • খা চে •
। গা -া গা। ঋা -া ঋা। সা -া -া। -া -া -া॥
টি ন্ ও লা • বা ড়ী • • • • ত্

৯. দোতরার উদ্দেশে : আরে, ও মোর কাঁঠাল খুটার দতরা রে,
অল্প বয়সে করলু মোক তুই
জনমের বাউদিয়া ॥
যেই দিন দতরা হাতত্‌ রে নেও
নিষেধ করে মোর বাপো রে মাও
নিষেধ করে মোর পাড়ার পড়শী ॥

চারমাত্রা । দ্রুত লয় ।

সা রা । মা -া -া মগরা । মা গুরা সা ধণা ।
আ রে ও ॰ ॰ ওমোর্‌ কাঁঠল্‌ খুটার্‌ দোত রা॰
। পা -া -া -া । ণ্‌া ণ্‌া সা গা ।
রে ॰ ॰ ॰ অল্প ব'সে করলু মোকতুই
। গপা মা গগা রা । সা -া -া সরা ॥
জন মের্‌ বাউ দি য়া ॰ ॰ "আরে"
। মা গমা পা -া । ণা ণা ধা -পা ।
যেই দিন্‌ দোত রা হা তত্‌রে নে ও
। পা -া ধা নণাধপা । পধা -া পধা পমা ।
নিষে ধ্‌ করে মোর॰ বা ॰ পোরে মা॰ ॰ ও
। পমা -পা পা ধা । পধমা পধা পা মা ।
নিষে ধ্‌ করে মোর্‌ পা॰॰ ড়ার্‌ প ড়
। মা -া -া সরা ॥
শী ॰ ॰ "আরে"

…৩…

স্থানাভাব এবং সময়াভাবে বেশি পরিমাণে স্বরলিপি দিতে পারা গেল না। কিন্তু যে ক'টি দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই আলোচ্য অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের সুর ও তালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়।

১-সংখ্যক ("করলা গাড়িছু সারি গে সারি") গানের তাল পরিচিত দাদরা, ৩+৩=৬ মাত্রার। লক্ষ করলেই দেখা যায়, ঠিক এই হিসেবে তালের সম-ফাঁক বেশ মিলে গেছে, এবং ৬ মাত্রার শেষেই কলির

শেষ হয়েছে। একই ব্যাপার ঘটেছে, ২-সংখ্যক গানেও ("ও তোর টাকা খাইয়া মুৎত্") : এটি ৪+৪=৮ মাত্রার কাহরবা তালের অনুরূপ, ঠিক আট মাত্রাতেই এসে কলি শেষ হয়েছে; কিন্তু ৩-সংখ্যক গানের ("হিল্‌হিলাছে কমরটা মোর") তাল সম্পর্কে একথা বলা যায় না: এটি ছ' মাত্রার ঝুমুর তাল, সেই তিন-তিন করে দাদ্‌রারই রকম-ফের মাত্র। লক্ষ করবার বিষয় হলো, প্রথম কলি অপূর্ণ ই থেকে গেছে :

। গা -া গা। রা -া রা। সা -া স।
হ দ্ মা দে ও য়া পা ॰ ঙঁ

৩+৩ করে ধরলে 'দেওয়া' পর্যন্ত তালের এক ফেরা হয়, 'পাঙঁ' পর্যন্ত কেবল তিন মাত্রা। বাকী তিন মাত্রা গেল কোথায়? এখানেই আলোচ্য অঞ্চলের তালের বিশেষত্ব। আমি আগেই বলেছি, আলোচ্য অঞ্চলের গানের তালে কোনো শাস্ত্র-সম্মত পূর্ণাঙ্গ তালকেই বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া যাবে না। সম-ফাঁকের বাঁধা-বাঁধি এখানে নেই। মোটামুটি তিন বা চারের ছন্দে একটি তালের বাঁধুনীকে ঢিলেঢালা রকমে অনুসরণ করা হয় মাত্র। আসলে খাঁটি সব লোকসঙ্গীতেই তাই। গান হতে গেলে তাল এবং ছন্দ থাকতেই হয়, তবে লোকসঙ্গীতে তার কড়াকড়ি তেমন নেই। এই জন্যে বর্তমান ক্ষেত্রে আকার মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করলেও দণ্ড চিহ্ন এবং জোড়া দণ্ড চিহ্ন দিয়ে তালের আরম্ভ ও শেষ প্রদর্শন করি নি।

৪-সংখ্যক গানটি ("সাতো গে বহিনী হামরা") প্রচলিত তেওরা তালে। লোকসঙ্গীতে এবং স্ত্রীলোকের গানেও যে বেজোড় সংখ্যক মাত্রার তাল ব্যবহৃত হতে পারে, এটি তারই প্রমাণ। কিন্তু গায়ন-কালে ঝোঁক যে ঠিক-ঠিক ৩+২+২ এই ভাবেই বিশ্লিষ্ট হয় তারও কোনো মানে নেই। ছন্দটি অনুসরণ করলে এই ভাবটিই আসে, এটুকু বলা যায় মাত্র।

'মেছেনী' ও 'হুদমা' গান দুটির স্বরলিপি লক্ষ করলেই দেখা যাবে, মধ্যম স্বরকে এখানে বাদ রাখা হয়েছে। এ জাতীয় সব গানেই এটি লক্ষ করেছি। এর কারণটা কি, সে সম্পর্কে বেশ কয়েক বছর আগে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে আলাপ করেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, পাহাড় অঞ্চলের নারীর কণ্ঠে মধ্যম ও নিখাদ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না; কারণ, ও দুটি স্বর অত্যন্ত প্রতিধ্বনিময়, পাহাড়ের স্তরে-স্তরে তার বেশ বড়ো বেশিক্ষণ

CENTRAL LIBRARY

স্থায়ী হয়, যার ফলে পরবর্তী স্বরটির রেশ সামান্য ব্যাহত হয়। আমার সঙ্গে আলোচনা কালে তিনি একটি চীনীয় লোকসঙ্গীত শোনালেন। তাতেও দেখা গেল, মধ্যম ও নিখাদের ব্যবহার নেই।

'ভেদৈ-খেলার' গানের (এও মেয়েদের গান) সুরে প্রতিবেশী নেপালী গানের সুরের প্রভাব লক্ষ করি।

যে 'ভাওয়াইয়া' গানটির ("ফান্দে পড়িয়া বগা") স্বরলিপি দিয়েছি, তা থেকে দেখা যাবে, খাঁটি ভাওয়াইয়া গানে কোমল নিখাদের ওপরে কোনো পর্দা ব্যবহার করা হয় না। কোমল নিখাদের ব্যবহার এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের সুরের এক বৈশিষ্ট্য। প্রদত্ত স্বরলিপিগুলি থেকেই তা বোঝা যাবে। তা হলে, মোট কথাটা দাঁড়ালো এই, নারীর গানে একদিকে নিখাদ স্বরের অব্যবহার, অপর দিকে পুরুষের গানে কোমল নিখাদের অতি ব্যবহার না হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহার এই লোকসঙ্গীতের সুর-বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। নারী রক্ষণশীল, কাজেই প্রাচীন সুরের স্বর-বৈশিষ্ট্যকে সে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারতীয় সঙ্গীতে কোমল নিখাদ ব্যবহার করলে করুণ-রসের প্রাধান্য হয়। সেদিক থেকেও এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মত॥

॥ সংযোজন : শ্রীবাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য ॥

"...অনেক আধুনিক শাস্ত্রকার মনে করেন, এমন কিছু রাগ আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আছে, যার উৎপত্তি পল্লীসঙ্গীতের সুরের মাঝখান থেকে। অনেকে এ ব্যাপারে পাহাড়ী, গারা, খাম্বাজ, মাড় প্রভৃতি রাগের নামও উল্লেখ করে থাকেন। অবশ্য বাঙলার পল্লীসঙ্গীতের উপর এদের, বিশেষ করে গারা, খাম্বাজ, মাড়, ভায়রো, ভৈরবী প্রভৃতি রাগের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।"

"কোন এক সঙ্গীতজ্ঞের মুখে শুনেছিলাম বাঙলার পল্লীসঙ্গীতে ভূপালীর ছায়াও পাওয়া যায়। আমি অন্তত এ রকম কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই নি। তবে ভীমপলশ্রী রাগের প্রভাব উত্তর বাঙলার পল্লীসঙ্গীতের উপর এত প্রবল যে, বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। অসংখ্য গান ঘেঁটে দেখেছি, ভীমপলশ্রী সেখানে প্রাণসত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।...মধ্যমকে সুর করে প্রতি

CENTRAL LIBRARY

গানের উৎপত্তি আর ভীমপলশ্রীর কোমল নিষাদ ও কোমল গান্ধারকে আশ্রয় করে এর বিকাশ। ভীমপলশ্রী এখানে চকিতে এসে আভাস দিয়ে মিলিয়ে যায় না, বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এই গানগুলির উল্লেখ করা যায় : ১. 'শোন শোন শোন মইষাল রে, মইষাল শোন দুঃখের কথা' ২. 'দিদির বিয়োর শানাই শুনিয়া' ৩. 'বাপোই চ্যাঙ্গেড়া রে' প্রভৃতি। ভীমপলশ্রীর রূপ যতটা সম্ভব এখানে নিটোল।"

"আবার কিছু গানে এই কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের বিস্ময়কর ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। সেখানে কোমল গান্ধার ও নিষাদ সাধারণ কোমল গান্ধার ও নিষাদের চাইতে কিছুটা কম, ঠিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যেমন শ্রুতির ব্যবহার। পাকা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ যেখানে শ্রুতির ব্যবহারে প্রায়ই ব্যর্থকাম হন, সেখানে সাধারণ পল্লীসঙ্গীত শিল্পী একাজ করেন অনায়াস দক্ষতায়।...এসব গ্রামীণ শিল্পী প্রায়ই অশিক্ষিত, কাজেই নিষাদ গান্ধারের এই ব্যবহার ভাববার বিষয় : বাঙলার অদ্বিতীয় পল্লীসঙ্গীত গায়ক স্বর্গত আব্বাস উদ্দীন সাহেবের মুখে একদিন একটি ভাওয়াইয়া গান শুনে চমকে উঠেছিলাম। গানটির কথা ছিল, 'আরো গয়ার আগল ভোলে'। গানটিতে অদ্ভুত রকম খাম্বাজ রাগের প্রভাব লক্ষ করেছিলাম। গানটি 'সা' কে খরজ করে গাওয়া হয়েছিল এবং স্বর সঙ্গতি পুরোপুরি খাম্বাজের আধিপত্য বজায় রেখেছিল গান্ধারের প্রাধান্য ছিল, ধৈবত ও মধ্যমের স্বর সঙ্গতি 'ধা মা গা' এবং দুই নিষাদের প্রাধান্যও এতে পুরোপুরি বজায় ছিল। এমন কি, নিধ, মপ, ধ, মগ পকড়টুকুর আভাসও এতে পেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে খাম্বাজ প্রভাবিত আরো কয়েকটি গান শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যেমন, 'ও বসন্ত উড়িয়া যায় রে', 'বন্ধু সিদল দিয়া খাবেন ভাত', 'বাপরে বাপ, ব্যাচাইয়া না খান মোক্' প্রভৃতি।"

"আরেকবার বিখ্যাত অন্ধ দোতরা-বাদক ও ভাওয়াইয়া গায়ক টগর অধিকারীর মুখে একটি গান শুনেছিলাম। 'বন পোড়া যায় রে উড়িয়া পড়ে ছাই...'। আশ্চর্য হয়ে এতে দেশ ও তিলক কামোদের ছায়া লক্ষ করেছিলাম। যদিও পরবর্তীকালে অপর এক গায়কের মুখে শোনা এই গানে রাগের এই বৈশিষ্ট্যটুকু খুঁজে পাই নি।..."

"উত্তর বাঙলার নমঃশিক্ষা, দেহতত্ব প্রভৃতি বহু গানে ভৈরব রাগের

ছায়া এবং প্রভাব আমি লক্ষ করেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'জনের মধ্যে রসিক যে জন, তাঁয় জানে ভাই খবর তার,' 'ছাইতন কাঠের দোতরাটা আর মাটির এ দেহাটা'—এই গান দুইটিতেও ভৈরব রাগের ছায়া আমি লক্ষ করেছি। তবে সে ছায়া চকিতে এসে মিলিয়ে যাওয়ার মতো। উত্তর বাঙলার পল্লীসঙ্গীতে ভৈরবের ছাপ, আমার মনে হয়, দেশ বিভাগের পরবর্তীকালে কিছু বাউল পূর্ববঙ্গ থেকে এসে উত্তরবঙ্গে বাসা বাঁধার প্রভাবেই পড়েছে। বহু ভাওয়াইয়া গানেই অনেক সময় রাগের ছায়া লক্ষ করেছি। আবার পর মুহূর্তে সেই একই গান অন্য গায়কের মুখে শুনে হতাশ হয়ে রাগের অনুপস্থিতি লক্ষ করেছি। একই গানে জেলা ভেদে সুরেরও পার্থক্য ঘটেছে। কোচবিহার জেলার গায়কী এবং জলপাইগুড়ি জেলার গায়কীতে অনেক পার্থক্য। শুধু তাই নয়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে একই গানের বিভিন্ন রূপ দেখে বিস্মিত হতে হয়।…"

"উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় রাগের মতো তালেরও আধিপত্য লক্ষ করেছি উত্তর বাঙলার পল্লীসঙ্গীতে। দশমাত্রায় ঝাঁপ, ষোল মাত্রায় ত্রিতাল, সাত-মাত্রায় ধ্রুপদাঙ্গের তেওরা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ তাল ব্যবহারের অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে। কীর্তনাঙ্গের কিছু তালের ব্যবহারও উত্তর বাঙলার পল্লীসঙ্গীতে নেই এমন নয়।"

"রাগের উপস্থিতি ছাড়াও উত্তর বাঙলার পল্লীসঙ্গীতে আর একটি জিনিসের প্রাধান্য লক্ষ করেছি, সেটা কোন বিশেষ স্বরের প্রাধান্য।… অধিকাংশ বিখ্যাত বা শ্রুতিমধুর ভাওয়াইয়া গানের ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ করে দেখেছি, প্রায় সবগুলো গানেই 'মধ্যম' স্বরের প্রবল আধিপত্য। মধ্যম স্বরকে সুর করেই গানগুলির উৎপত্তি এবং মধ্যমের সাহায্য নিয়ে নিয়ে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদে এদের বিকাশ, শুদ্ধ নিষাদ এক রকম অনুপস্থিতই বলা চলে। গান্ধারে স্বরের আধিপত্য যে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে নেই, একথা বলছি না, কারণ খাম্বাজের ছায়া যেখানে দেখা যায়, সেখানে গান্ধারকে বাদ দেওয়া যায় না। মধ্যমের প্রাবল্যের জন্য গানগুলি বিশেষ ভাবে মনকে নাড়া দেয় ও মাদকতার সৃষ্টি করে।…গ্রাম বাঙলার এ সুরের সাদৃশ্য সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ইউরোপীয় সঙ্গীতের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায়।…"